মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
রচনাসমগ্র

অষ্টম খণ্ড

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীঅলোক রায়
শ্রীঅরুণকুমার বসু
শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র
শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য
শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য : ১৬০ টাকা

ISBN 81-86908-66-8 (Set)
ISBN 81-7751-041-X

প্রকাশক

সচিব, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০

মুদ্রাকর

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২

সূচি : অষ্টম খণ্ড

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পশ্চিমবঙ্গ সবকাব

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সবকাব

প্রধান সচিব
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সংস্কৃতি অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী
শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিবঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীঅংশু শূর
শ্রীনিমাই ঘোষ

তথ্যসংগ্রহে সহায়তা

রবীন্দ্রভাবতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
ববানগর পিপলস লাইব্রেবি
বয়েজ ওন লাইব্রেবি
ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব লাইব্রেবি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
রিজার্ভ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিযেশন
শ্রীপ্রভাতকুমার দাস
শ্রীঅশোক উপাধ্যায
শ্রীঅনিলকুমাব সিংহ
শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার
শ্রীস্বপন মুখোপাধ্যায

সম্পাদনা সহায়তা

শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা
শ্রীশ্যামল মৈত্র
শ্রীমুক্তিরাম মাইতি
শ্রীমতী মহুয়া বসু
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅমলকুমার রায়
শ্রীনন্দদুলাল সেনগুপ্ত
শ্রীপারিজাতবিকাশ মজুমদার

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের এক অলোকসামান্য পুরুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আটচল্লিশ বছরের অকাল নিমীলিত জীবন ও আটাশ বছরের সৃষ্টিকালের মধ্যে তিনি রেখে গেছেন বিপুল দান হিসেবে ৩৯টি উপন্যাস, ২৬০-এর কিছুবেশি ছোটোগল্প এবং বেশকিছু কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ছোটোদের উপযোগী রচনা। মৃত্যুর চারদশক পরেও এই ব্যতিক্রমী ও বিস্ময়সৃষ্টিকারী লেখক আমাদের সাহিত্যে ও মননে অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন। স্রষ্টা মাত্রেই কিছু পরিমাণে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। কিন্তু মানিকের স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতার রহস্যভেদ ও অনুসন্ধান আজও বোধ করি অসমাপ্ত। কল্লোলের কুলবর্ধন বলে তাঁকে দাবি করা হলেও তাঁর সাহিত্যে অতিরিক্ত যা ছিল তা হল অতিআধুনিকের প্রতিবাদ থেকে নাস্তিক্যের বিদ্রোহে উত্তরণ। যুগ-ব্যাধি তাঁর সাহিত্য-শরীরের আয়তক্ষেত্রে নির্মম নিরাভরণ অথচ রহস্যময় রূপে ছড়িয়ে আছে। পারিবারিক আনুকূল্যের মসৃণজীবনের পথ ত্যাগ করে শুধুই সাহিত্যের জন্য যে অনিশ্চিত জীবন তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, দুরারোগ্য ব্যাধি দারিদ্র্য সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও তার কক্ষপথের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের কেন্দ্রে ছিল সাহিত্যসাধনা। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সংলগ্ন যে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন, তার ইতিবৃত্ত রচনায় মানিক-সাহিত্য অপরিহার্য।

এই ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসমগ্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। পাঠক-মনের সামনে থেকেও দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে তাঁর রচনাবলি—এ কাম্য নয়। মানিক-সাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন আজও অসম্পূর্ণ। মানিক-সাহিত্যচর্চা, বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে গবেষণা বেশকিছু হলেও মানিকের যাবতীয় রচনার সুসম্পাদিত পাঠ থেকে পাঠকসমাজ বঞ্চিতই রয়েছেন। এর আগে গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড সাধ্যমতো একগ্রন্থ রচনাবলি প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন তা বাজারলভ্য ছিল না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং লেখক পরিবার ও গ্রন্থালয়-কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সমগ্র মানিক রচনাবলি নতুন করে প্রকাশের পথে বাধা দূর হয়েছে। সকল পক্ষের ঐকমতো এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে বাংলা আকাদেমির উপর। কাজটি সহজসাধ্য নয়।

লেখকের ভগ্নস্বাস্থ্য, গৃহিণীপনার অভাব, বারবার বাসস্থান পরিবর্তন, প্রথম যুগের প্রকাশকদের অন্যমনস্কতা ইত্যাদি কারণে যাবতীয় পাণ্ডুলিপি, প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা সহজ নয়। তবে শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় . ডায়েরি ও চিঠিপত্র' গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রামাণ্য তথ্যসংগ্রহের কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছেন। লেখকের পরিবারের পক্ষ থেকে দুর্লভ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আকাদেমির অভিলেখাগারে প্রদান করার ফলেও কিছুকিছু পাঠনির্ণয়ে অভাবনীয় সুবিধা ঘটেছে। কাজে হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিছু রচনা এখনও অসংকলিত রয়েছে, বহু তথ্য সন্ধান করতে হচ্ছে, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখকের সংশোধন-পরিমার্জন-পরিবর্তন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কৌতূহল উদ্রেককারী বহু বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা আকাদেমি এই দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করেছে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে যথাসম্ভব প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসারে দশখণ্ডে এই রচনাসমগ্র প্রকাশে ব্রতী হয়েছে।

মানিক-পরিবারের সর্বাঙ্গীণ সহায়তায় এবং সম্পাদকমণ্ডলীর শ্রম ও দক্ষতায় মানিক সাহিত্যের এক আদর্শ-পাঠ পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বহু নতুন তথ্য, দুষ্প্রাপ্য দলিল এবং লেখকের বিভিন্ন সময়ের স্বল্পপরিচিত ছবি, পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ রচনাসমগ্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়েছে। গ্রন্থপরিচয় ও পরিশিষ্ট অংশ এই রচনাবলির অন্যতম সম্পদ। বানানের সমতাবিধানের প্রয়োজনে বাংলা আকাদেমির বানানবিধি এবং যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছতা-প্রয়াস অনুসৃত হয়েছে। প্রকাশনসৌষ্ঠব ও সম্পাদনার উন্নতমান অক্ষুণ্ণ রেখে দাম যথাসম্ভব পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সহায়তার ফলেই এটা সম্ভব হল। এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদের সকলের কাছেই বাংলা আকাদেমি কৃতজ্ঞ। প্রথম সাতটি খণ্ড প্রকাশের পরে সমস্ত মহল থেকেই প্রশংসা পাওয়া গেছে। অষ্টম খণ্ডও প্রকাশিত হল সময়সূচি রক্ষা করেই। ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক প্রচেষ্টাও করা হয়েছে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব



জন্ম : ১৯ মে ১৯০৮ মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬

ইতিকথার পরের কথা



ইতিকথার পরের কথা প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

এই উপন্যাসটি 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হয়েছে।

ভাদ্র, ১৩৫৯ — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১

স্টেশনের গা ঘেঁষে কারখানার লম্বা শেড।

গেটের পাশে পিতলের ফলকেও নাম লেখা আছে- -ছোটো ছোটো অক্ষরে। আলকাতরা দিয়ে বাইরের দেওয়ালে বিরাট বেমানান হরফে লেখা—নব শিল্পমন্দির।

এই ছোটো নগণ্য স্টেশনটি ঘেঁষে একক শিল্প প্রচেষ্টার অভিনবত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এত বড়ো হরফ সন্দেহ নেই। কিন্তু পথের সঙ্গে সমান্তরালভাবে গড়া ইটের দেওয়াল ও টিনের ছাউনিওলা লম্বাটে চালা ও লোহার চিমনিটাই সে কাজ আরও ভালোভাবে করছে, বেখাপ্পা হরফ দিয়ে এ রকম ঘোষণার কোনোই দরকার ছিল না। নজরে পড়ার মতো এ রকম আর কিছুই নেই স্টেশনে বা আশেপাশে। স্টেশনের সংলগ্ন লাল ইটের ঘর কয়েকটি যতদূর সম্ভব ছোটো এবং সংক্ষিপ্ত। স্টেশন মাস্টারের দু-কামরার কোয়ার্টারটি দেখলে মনে হয় ছাদে মাথা ঠুকে যায় না তো, পা ছড়িয়ে শুতে পারে তো ? পথের দুপাশে শুধু খড় ও টিনের কতকগুলি ঘর এবং চালা, মাত্র কয়েক ঘর মানুষের বসবাস ও দোকান চালাবার প্রয়োজনে এগুলি উঠেছে। কাছাকাছি নাগালের মধ্যে বড়ো গ্রাম নেই। স্টেশনের লাগাও বসতিটার মতোই এখানে ওখানে থোপা থোপা বসানো ছাড়া ছাড়া বসতি, ছোটো ছোটো কাঁচা কতকগুলি ঘরের সমষ্টি। গ্রাম অবশ্যই আছে, বাংলার সর্বত্রই ঘন ঘন গ্রাম। স্টেশন থেকে একটু দূরে দূরে পড়েছে গ্রামগুলি। যেন সযত্নে হিসাব করে সমস্ত বড়ো বড়ো গ্রাম থেকে যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতেই স্টেশন করার জন্য এই স্থানটি বেছে নেওয়া।

আসলে কিন্তু তা নয়। এখান থেকেই বারতলার জমিদার বাড়ি সব চেয়ে কাছে হয়, মাইল চারেক। অন্য গ্রামের হিসাব ধরাই হয়নি। স্টেশনের নামও বারতলা।

দুপাশের স্টেশন দুটি বারতলা থেকে বেশি দূরে দূরে নয়। ওই দুটি স্টেশন থেকেই এই এলাকার বেশির ভাগ গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা। বারতলায় তাই যাত্রীর ভিড় হয় না। প্ল্যাটফর্মে হাঁটলে চোখে পড়ে এখানে ওখানে ঘাসের চাপড়া গজিয়ে আছে লাল কাঁকর ঢেকে দিয়ে। স্টেশন থেকে বারতলা পর্যন্ত সিধে রাস্তার দুপাশের কয়েকটি ছোটোখাটো গ্রাম আর ওই বারতলার যাত্রীরাই শুধু এই স্টেশন ব্যবহার করে।

রাস্তা করার সময়েও অন্যান্য বড়ো গ্রামগুলির কথা ভাবা হয়নি—জমিদার যেখানে বাস করে সেই বারতলা গ্রামটি ছাড়া যেন রাস্তাঘাটের প্রয়োজন অন্য গ্রামের নেই।

ভিড় হয় বর্ষাকালে। আশেপাশে এই রাস্তাটিই বর্ষাকালে কাদা শূন্য থাকে। খানিকটা বেশি পথ হাঁটতে হলেও অনেক গ্রামের লোক তখন এই স্টেশন দিয়েই যাতায়াত করে,—কর্দমাক্ত পিছল পথে হাঁটা যতটা সম্ভব কম করার জন্য।

যুদ্ধের সময় ছোটোবড়ো সব শিল্প যখন মেকি ঐশ্বর্যের গরমে খুব ফুলছে, তখন বারতলার জমিদার জগদীশের ছেলে শুভময়ের দুঃসাহসী স্বপ্ন এই কারখানার রূপ নেয়। আত্মীয়বন্ধু নিষেধ করেছিল। টাকা ঢালতে চাও, নবশিল্প গড়তে চাও, শহর থেকে এত দূরে কেন ? শহরের চারিদিক বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল, এমন কত স্টেশন আর রাজপথের ধারে কত জমি সস্তায় বিকিয়ে যাবার জন্য সাইনবোর্ড বুকে নিয়ে পতিত হয়ে আছে। একটা সুবিধামতো স্থান বেছে নিয়ে টাকা ঢালো, কারখানা করো, ভবিষ্যৎ আছে। এত দূরে এখানে কি এ সব কারখানা চলে ? সে রকম বড়ো কারখানা হয়, যাকে ঘিরে আপনা থেকে একটা লোকালয় গড়ে ওঠে, ওয়াগন বোঝাই হয়ে হয়ে কাঁচামাল আসে আর তৈরি মাল চালান যায়, সেটা হয় আলাদা কথা। স্টোভ ল্যাম্প লণ্ঠনের মতো টুকিটাকি জিনিসের কারখানা এখানে চলতে পারে না।

আত্মীয়বন্ধু কেন চারিদিকের জীবন ও পরিবেশও যেন তাকে একবাক্যে নিষেধ করেছে, এখানে নয়, এখানে কিছু হবে না। মনুষ্যত্ব ছাড়া কিছু নেই এখনকার মানুষের। মানুষ যে প্রকৃতিকে জয় করেছে, মানুষ যে পশু নেই, তার আদিম কিছু প্রমাণ শুধু মেলে লাঙল দিয়ে জমি চষায়, তাঁত বোনায়, মাটির হাঁড়িকলসি গড়ায়, কুঁড়েঘরে উনানের আঁচে লোহা তাতিয়ে কামারের হাতুড়ি ঠোকায়। দুঃখ দৈন্য রোগ শোক ক্ষুধা আর উগ্র অসন্তোষ নিয়ে মানুষ বাস করে, মনের আদিম অন্ধকারে পথ হাতড়ায়। বর্ষায় ঘর ভাসে, খরায় মাঠের ফসল জ্বলে যায়, ডোবা পচে, মশার ঝাঁক ওড়ে, প্রতিটি দিনের সঙ্গে শেষ হয় পথের অভাবে মাঠ ভেঙে চলাফেরা আর স্থূল শিথিল কাজকর্ম, তেলের অভাবে সন্ধ্যাবেলাতেই সন্ধ্যাদীপ নিভে গিয়ে শুরু হয় নিষ্ক্রিয় ঝিম-ধরা দীর্ঘ রাত্রি। কী দিয়ে রচিত হবে নবশিল্প ?

তবু শুভ থামেনি। কে জানে পল্লিমায়ের শান্ত মধুর স্নেহসিক্ত বিষাদের হতাশা থেকে জিদ এসেছিল কি না। শহর থেকে দূরেই নবশিল্প গড়া দরকার। দূরত্ব ? রেললাইনের ধারে পঞ্চাশ-যাট মাইল কীসের দূরত্ব ? মজুরের অভাব কীসেব ? ভূমিহীন কত চাষি উপোস দিচ্ছে, দলে ভিড়ে, আন্দোলন আর হাঙ্গামা করে ক্ষুধার্ত বাঘের মতোই মরিয়া নিষ্ঠুর থাবার ঘায়ে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে সমাজ সংসার। ওদের একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে মজুরের অভাব হবে না।

মজুরি পেয়ে ওরাও বাঁচবে, শান্ত হবে।

যুদ্ধের সময়টা বেশ চলেছিল কারখানা। বারতলা আর আশেপাশের গাঁ থেকে যারা প্রাণ বাঁচাতে শহরের শিল্পাঞ্চলে গিয়ে কারখানায় ঢুকেছিল, তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক ফিরিয়ে এনেছিল জগদীশ। বিদেশে কেন, ঘরে বসে তার ছেলের কারখানায় খেটে রোজগার কববে। তাছাড়া ঘষে মেজে তৈরি করেছিল স্থানীয় কিছু আনাড়ি ভূমিহীন চাষিকে।

যুদ্ধ থামার পর ক্রমে ক্রমে কারখানাও থেমে এসেছে। প্রকট হয়েছে একটা সত্য, শিল্পরানি অসতী নয়। কোটিপতি পতি ছাড়া কারও দাসীত্ব সে করবে না। পতি চাইলে তবেই দুদিনের জন্য একটু ভাব করবে ছুটকো মাঝারি প্রেমিকের সঙ্গে, আসলে তার পতি-অন্ত প্রাণ।

রাত নটার গাড়ি আসছে। চাঁদের আলোয় খানিকটা আলো হয়েছে চারিদিক, স্টেশনের বাতি কটা টিমটিম করে জ্বলছে। কুয়াশার সঞ্চারটা অস্পষ্ট অনুভব করা যায়। এখনও ভালোভাবে চোখে ধরা না পড়লেও টের পাওয়া যায় যে ধীরে ধীরে ঘন কুয়াশাই নামছে।

রাত্রির এই গাড়ি থেকে দু-তিনজনের বেশি যাত্রী কোনোদিনই নামে না। কোনোদিন গাড়িটা শুধু একটু থেমে দাঁড়িয়ে একটি মানুষকেও নামিয়ে না দিয়ে সিটি মেরে চলে যায়। স্টেশনের বাইরে অন্য দোকান কটি আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, আলো জ্বলছে শুধু দুটি দোকানে। গজেনের পান বিড়ি ও চিড়েমুড়ির মেশাল দোকান এবং সনাতনের দেশি খাবার ও তেলেভাজার দোকান।

সব গুছিয়ে ঠিকঠাক করে দোকান বন্ধের আয়োজন করে রেখেছে দুজনেই। গাড়ি থেকে কেউ নামে কি না, কিছু কেনে কি না দেখেই ঝাঁপ বন্ধ করবে।

সনাতন এখানেই থাকে, দোকানের পিছনটায় তার বাস। গাড়ি আসবে বলে প্ল্যাটফর্মের বাতি কটা জ্বালানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরের ঘরে সুরমা কুপি জ্বালে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে নয়, দোকানের আলো থেকে ছেঁড়া এক টুকরো কাগজ জ্বেলে নিয়ে। রাত্রে পেটপূজার বাকি আয়োজনটুকু সেরে ফেলবে। রাত্রে তারা দুজনে একসাথে গল্প করতে করতে খায়। কপালে যেদিন যা জোটে, সেদিন তা খায়।

কুপি জ্বালাবার সময় গজেন বেদনায় মুখ বাঁকিয়ে বলে, ও মামি পা-টা বড়ো টাটাচ্ছে গো। ঘরে আজ ফিরতে পারব না। একটু ভাগ দিয়ো, তোমার খেয়ে তোমার ঘরে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব। কী করি !

সনাতন বোঝে না, সত্যই ধরে নেয় গজেনের খোঁড়া পা-টা ব্যথা করছে। তাদের ঘরে শুয়ে রাত কাটাবার কথাটা যোগ না দিলে ধরতে পারত না সে তামাশা করছে, বিপাকে পড়ে যেত। নিজের দোকানঘরটা থাকতে তাদের ঘরে রাত কাটাবার কথা বলায় তামাশা ফাঁস হয়ে গেছে তার কাছে।

সে বলে, বেশ তো ভাগনে, খেয়ো। পেঁয়াজকলির চচ্চড়ি রেঁধেছি। আমার সাথেই শুয়ো।

তামাশার জবাবে তামাশা কিন্তু একটুও হাসে না সুরমা। কুপি জেলে পিছনের ঘরে যায়। কাঁচা-পাকা বাবরি চুল পিছনে ঠেলে দিয়ে খোঁড়া পায়ে একটা থাপ্পড় মেরে হাসি মুখে বিড়ি ধরিয়েছিল গজেন। নাঃ, মেয়েটা সত্যি চালাকচতুর। নইলে এই অচল অবস্থায় স্টেশনের ধারে এই চালাঘরে একগুঁয়ে সনাতনকে নিয়েই শেষ পর্যন্ত একটা সুখের নীড় গড়তে পারত !

তার বড়োমেয়ের বয়সি হবে সুরমা। তবু তাকে সে মামি বলে ডাকে। কারণ সনাতন দূর সম্পর্কে তার ভাগনে হয়।

দূরে গাড়ির আলো দেখা গেলে সেদিকে চেয়ে সনাতন চিন্তিত ভাবে বলে, পা-টা হঠাৎ টাটাল যে মামা ?

গুলির চোটে ঠ্যাং খোঁড়া হলে মাঝে মাঝে অমন টাটায়। তুই কী বুঝবি ?

ঝাঁপ আমি লাগাবখন মামা। তুমি এসে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো। একটা মালিশ টালিশ হলে—

গজেন বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বলে, তুই সত্যি গোমুখ্যু সনাতন !

সশব্দে ট্রেনটা এসে থামে। আওয়াজ শুনে খেঁকি কুকুরটা এসে দাঁড়িয়েছে দোকানের সামনে, খাবার কিছু কেনাকাটা হলে পাতাটা চাটতে পাবে। সম্প্রতি বাচ্চা পেড়েছে, সমস্ত শরীরটা চামড়া ঢাকা কঙ্কালের মতো শীর্ণ, শুধু আকণ্ঠ খিদের আগুন। জালা পেটটার নীচে ঝুলছে সরস দুধে ফুলে ওঠা স্তনগুলি।

একজন যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা চলে যায়। মোটে একজন ? সনাতন চটে বলে, দ্যুৎ ! একঘণ্টা বসে থাকাই সার হল।

কেন, দশ-বারোগন্ডা পয়সা বেচলি না ?

তা বটে। এই শেষ গাড়ির আশাতেই কী আর তারা দোকান খোলা রেখেছে এতক্ষণ। গাঁয়ে হাঁটা পথিক খদ্দের দু-চারজন না জুটলে আটটার গাড়ি বেরিয়ে গেলেই ঝাঁপ বন্ধ করত।

মাথা ঢেকে গায়ে চাদর জড়ানো যাত্রীটির। চেনা না গেলেও বোঝা যায় বয়স্ক ভদ্রলোক। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, তাদের দোকানের দিকে এক নজর তাকিয়ে পা বাড়ায়। কিছু কেনার তাগিদ নেই।

গজেন ডেকে বলে, বাবু যাবেন কোথা ? পান বিড়ি নিয়ে যান. আর পাবেন না।

বারতলা যাব। পান বিড়ি খাই না বাবা।

সনাতন চেষ্টা করতে ছাড়বে কেন ? সে চেঁচিয়ে বলে. সে তো দু-কোশ পথ বাবু। নতুন গুড়ের ভালো সন্দেশ ছিল, দুটো মুখে দিয়ে যান। এত রাতে গাঁয়ে কিছু মিলবে না কিন্তু।

খানিক দূর এগিয়ে গিয়েছিল মানুষটা, থমকে দাঁড়ায়। গটগট করে ফিরে এসে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, কে ডাকলে সন্দেশ খেতে ? নতুন গুড়ের সন্দেশ ! সব ব্যাটা সন্দেশ খাওয়ালো, বাকি আছ তুমি ! জীবনভোর জেল খাটিয়ে ঢের সন্দেশ খাইয়েছ, বুড়ো বয়সে আর তামাশা কেন বাবা ?

মাথা থেকে চাদরটা খসে গেছে। বয়স ষাটের কম হবে না। গায়ের লোম ওঠা মোটা গরম চাদরটিতে বাড়িতে আপন হাতে সস্তায় সাফ করার চেষ্টাটা খুব স্পষ্ট, সাবান-কাচা ধুতি ও জামাটিতেও ইস্ত্রিহীনতার দীনতা। পায়ে বাদামি রঙের ক্যাম্বিশের জুতো। দোকানের আলোয় গভীর শ্রান্তি ও অবসাদের সঙ্গে তীব্র বিরক্তি মেশানো তার থমথমে মুখ দেখে সনাতন চুপ করে থাকে।

গজেন বলে, ছি ছি, তামাশা কীসের ? রাত হয়েছে, গাঁয়ের দিকে খাবার-টাবার জুটবে না, তাই বলা—

তবু গরম মেজাজ নরম হয় না ভদ্রলোকের।

হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, সব জানি। তাই বলা যে সন্দেশ খেয়ে যান ! লোক দেখে টের পাও না লাটবেলাটের গদি পায়নি, লাখ দুলাখের পারমিট পায়নি ? খেতে জোটে না, ঠান্ডা রাতে পায়ে হেঁটে চার মাইল পাড়ি দিচ্ছে, সন্দেশ খাবে ! যারা সব গুছিয়ে নিয়ে বসেছে, তাদের ডেকে সন্দেশ খাইয়ো। আমাকে কেন !

পাগলাটে বুড়োর বাচালতা মনে হয় না, জোরের সঙ্গে গুছিয়ে বলার ভঙ্গিটা সুন্দর, বক্তৃতার আমেজ আছে ! ঝাঁঝটা সত্যই আন্তরিক। গজেন বলে, আপনারে চিনি চিনি মন করে—

চিনি চিনিই মন করবে। এখন আর চিনবে কেন ? দরকার কী !

মানুষটা আর দাঁড়ায় না, হনহন করে চলতে শুরু করে। ধীরে ধীরে কুয়াশা ঘন হচ্ছে, আরও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে জ্যোৎস্না। দেখতে দেখতে সেই কুয়াশার সঙ্গেই ছায়ার মতো মানুষটা মিলিয়ে যায়।

সুরমা বলে কী মেজাজ গো বাবা ! সত্যি চেনা নাকি ?

গজেন বলে, চেনা চেনা যেন লাগল।

সনাতন এতক্ষণে বলে, ভাবলাম দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দি। অত মুখ কীসের ? তা, কেমন যেন মায়া হল !

সুরমা হেসে বলে, মায়া হল তো মাগনা দুটো সন্দেশ খাইয়ে দিলে না কেন ?

গজেন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে। তাকেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাড়ি দিতে হবে এই পথে। ছোটোখাটো যে চাষিপাড়ায় তার ঘর, এখান থেকে এক মাইল পুরো হবে না। কিন্তু নেংচে নেংচে গিয়ে পৌঁছতে তার প্রায় একঘণ্টা লেগে যাবে। পয়সার থলিটা কোমরে বাঁধা ছিল, চালের ছোট্ট পুঁটুলিটা ছেঁড়া চাদরের আস্ত কোণটাতে বেঁধে নিয়ে কাঁধে ফেলে, বেগুন দুটোর বোঁটা বাঁকিয়ে কোমরে গুঁজে দু-হাতে মোটা লাঠিটা বাগিয়ে ধরে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রওনা দেয় ঘরের দিকে।

দিনের বেলা এখান থেকে তার ঘরের পাশের তালগাছ কটা চোখে পড়ে। গুলি লেগে পা-টা খোঁড়া হবার আগে কত সংক্ষিপ্ত ছিল এই পথটুকু। দিনে দশবার যাতায়াত করলেও মনে হত না পথ হাঁটা হয়েছে। আজ কত দীর্ঘ হয়ে গেছে পথটা তার কাছে।

পাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গজেন পথের পাশ থেকে ডাক শোনে, কে যায় ? একটু শোনো ভাই, শুনে যাও।

মনে হয় সেই মানুষটার গলা, তবু গজেন শক্ত করে মোটা লাঠিটা বাগিয়ে ধরে। ঠাহর করে দেখে বুঝতে পারে সামনে অল্প দূরে পা ছড়িয়ে বসে আছে একটা মানুষ—মনে হয় সেই মানুষটাই। তবু সেইখানে দাঁড়িয়ে গজেন জিজ্ঞাসা করে, কে ?

আমি রে বাবা, আমি ! ভয় নেই, একটু এগিয়ে এসো।

আপনি ইস্টেশান থেকে এলেন না ?

হাঁ, হাঁ, স্টেশন থেকে এলাম। তুমিই আমাকে সন্দেশ খেতে ডেকেছিলে নাকি ? রাগ করিস না বাবা, বড়ো বিপাকে পড়েছি !

গজেন কাছে এসে বলে, আজ্ঞে না, আমি সে নয়। মোর পান-বিড়ির দুকান। আপনার হল কী ?

ভদ্রলোক বলে, আর হল কী, মন্দ কপালে যা হবার তাই হল, গর্তে পড়ে পা মচকে গেল। ভেঙেছে কিনা কপাল জানে। এখন করি কী? রাস্তার ধাবে পড়ে মরা অদেষ্টে ছিল শেষকালে!

গজেন বলে, রাম রাম, মরবেন কেন! মানুষেব জগতে মানুষ এমনি করে মরতে পায়?

একটু ভেবে বলে, হাঁটতে পারবেন না আস্তে আস্তে? টেনেটুনে দেব পা-টা? মোদের পাড়া এই খানিকটা পথ হবে।

টেনেটুনে দেখেছি, পা পাততে পারি না। এক পা হাঁটতে গেলে মরে যাব। এখুনি যা যন্ত্রণা হচ্ছে কী বলব বাবা তোমাকে।

গজেন উবু হয়ে বসেছিল, উঠে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সখেদে নিশ্বাস ফেলে বলে, যদি বা একটা মানুষ এলাম, মোর পা-টা ফের খোঁড়া! ধরে যে নিয়ে যাব পথটা সেটুকু খ্যেমতা নেই। খানিক বসেন তা হলে, লোকজন ডেকে আনি।

একটু শিগগির করিস বাবা!

শিগগির কী চলতে পারি বাবু? খানিক এগিয়ে হাঁক মারব, কেউ শুনতে যদি পায় তো ভালো।

গর্তে আচমকা হোঁচট খেয়ে খোঁড়া একটা মানুষকে আবছা কুয়াশায় পথের ধারে বসিয়ে রেখে আরেক খোঁড়া সাহায্যের খোঁজে যতটা পারে তাড়াতাড়ি চলবার চেষ্টা করে। সেই কবে চাষি আন্দোলনে নেমে গুলি লেগে খোঁড়া হয়েছিল পা-টা, এমনি সব প্রয়োজনের সময় এত জ্বালা বোধ হয় যে বুঝতে পারা যায় খুঁড়িয়ে চলাটা এতদিনেও অভ্যাস হয়নি। তার ক্ষোভ আর আপশোশে যেন চারিদিক স্তব্ধ হয়ে আছে, শিয়াল পর্যন্ত ডাকে না।

আধঘণ্টা পরে পাঁচজন জোয়ান চাষি এসে পড়ে, একজনের হাতে একটা কালি পড়া লণ্ঠন। ভদ্রলোককে খুঁজতে হয় না, দূর থেকে আলো দেখেই সে হাঁকডাক করে নিজের অবস্থান জানিয়ে দেয়।

দুখানা মোটা বাঁশে একটা বড়ো পিঁড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে আনা হয়েছিল। দু-তিনজনে ধরাধরি করে তাকে পিঁড়িতে বসায়, তারপর দোলার মতো চারজনে বাঁশ দুটি কাঁধে তুলে নেয়।

লোচন বলে, বাঁশটা ধরে ভালো হয়ে বসেন, মোবা পা চালিয়ে চলি। চুন-হলুদ গরম করছে, লাগিয়ে দিলে যন্ত্রণা কমবে।

জানো বাবারা, ধরা-গলার ভিজে আওয়াজ থেকে সন্দেহ জাগে যন্ত্রণাকাতর মানুষটার চোখেও নিশ্চয় জল এসে গেছে,—এ দেশে খাঁটি মানুষ থাকে। একটা দুটো নয়, অনেক মানুষ!

গাঁ নয়, ছোটো পাড়ার মতো গায়ে গায়ে ফাঁকে ফাঁকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো বারো-চোদ্দোখানা খড়ের ঘর। দুখানা টিনের ঘর ছিল, টিন যখন সস্তা ছিল এবং পাওয়া যেত সেই সময় করা হয়েছিল—পুরানো ঝাঁঝরা হয়ে গেলেও ইদানীং আর টিন না জোগাতে পেরে সে দুটোরও খড়ের চালা হয়েছে। পশ্চিমের ডোবার ধারে চারখানা ঘর ছিল অন্য ঘরগুলি থেকে একটু তফাতে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে গত দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়। সে ঘরগুলি আর ওঠেনি।

লোচনের ঘরের ঢাকা দাওয়ায় তাকে বসিয়ে বুড়ো রসিক অন্ধকারেই নানাকথা বলে যায়। এই চাষিপাড়ায় সেই সবার চেয়ে মান্যগণ্য। পাড়ার মেয়েপুরুষ অনেকেই এসে হাজিব হয়েছে। কে এসেছে ক-জন এসেছে অন্ধকারে ঠাহর করা যায় না। শুধু কথা বললে গলার আওয়াজ থেকে মানুষটা কে বুঝে নেওয়া চলে। রাস্তার কথাই বলে রসিক। সাধে কী গর্তে পা পড়েছে ভদ্রলোকের, সারা রাস্তায় শুধু গর্তের ফাঁদ পাতা। কারও মাথা-ব্যথা নেই রাস্তার জন্য। অমন পয়সাওলা জমিদার বারতলার, তার গ্রামের নামে স্টেশনের নাম, কারখানা তুলতে অত টাকা নষ্ট করতে পারে, রাস্তাটা ঠিক করার দিকে নজর নেই।

গর্তে পড়ে মোদের নয় ঠ্যাং মচকাল একবার দুবার। দামি গাড়িব চাকা ভাঙবে কার ?

কথা বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে রসিক ঝেঁঝে ওঠে, লেন্টানটা আন না বাবা কেউ ? একটু চুন-হলুদ করতে যে রাত কাবার হল।

মেয়েলি গলায় জবাব শোনা যায়, লেন্টান নিয়ে গেছে। পিদিম জ্বাললে হয়।

রসিক বলে, হয় তো জ্বাল না কেনে পিদিম একটা ছোটোবউ ?

মেয়েলি গলায় তেমনি ফিসফিস আওয়াজে দৃঢ় স্পষ্ট জবাব আসে, বলে দিলেই পিদিম জ্বলে। কে এল না কে এল, আলো জ্বালবে না আঁধাব রইবে জানবো কীসে ?

মোটা সলতের বড়ো প্রদীপ জ্বলে উঠে দাওয়ার অন্ধকাব দূব কবে। শাঁখা-পবা হাত তিলচিটে ভাঙা কাঁসার গ্লাসটা আগন্তুকের সামনে উপুড় করে রেখে তাব উপব প্রদীপটা বসিয়ে দেয়, আঙুল দিয়ে উসকে দেয় সলতে।

রসিক এক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে থেকে নিজের দুই কান মলে ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলে, হা রে আমার পোড়া কপাল, আপনি জীবনবাবু ! এতক্ষণ কথা কইলাম, গলা শুনে চিনলাম না ? আরে ও গজেন, তুইও চোখের মাথা খেয়েছিস, জীবনবাবুকে চিনলি না ?

গজেন সোজা তাকিয়ে থাকে দাওয়ার বাইরেব অন্ধকাবের দিকে, গুলিতে পঙ্গু পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে রুক্ষ কঠোব সুরে বলে, না, চিনলাম আর কই ? চিনি চিনি কবেও তো চিনলাম না। চিনলে কী আর খোঁড়া পা নিয়ে উঠিপড়ি খবর দিতে ছুটে আসতাম ? যেথায় থাকা উচিত ছিল সেথায় পড়ে রইত তোমার জীবনবাবু।

চারদিক থমথম করে। গজেন এসে শুধু খবরটাই দেয়নি, পাশেব গাঁ থেকে নন্দ ডাক্তাবকে ডেকে আনার প্রস্তাবও সে কবেছিল। লন্ঠনটা নিয়ে ডাক্তার ডাকতে লোক চলে গেছে। বিদেশি একজন ভদ্রমানুষ তাদের দেশ গাঁয়ে এসে বিপাকে পড়েছে, এটুকু না কবলে তাদেব মর্যাদা থাকে না। শুধু পা মচকানোর জন্য ডাক্তার ! এটা তার বাড়াবাড়ি মনে হলেও কৈলাসকে পাঠানো হয়েছে নন্দ ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্য।

কাবণ গজেন আরও একটা যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল, পায়ে যখন গুলি লাগল কী যে না করেছিল বাবুরা মোর জন্যে ? তাদের জন্যই তবু খুঁড়িয়ে হাঁটতে পাবি।

চাষিরা শোভাযাত্রা করে শহবে গিয়েছিল, সেই পুরানো ঘটনা। তাই বটে ! তাই বটে ! তাদের সকলেব প্রাণের মানুষ রসিককেও শহরেব এক ভদ্রবাড়ির অন্তঃপুরে লুকিয়ে রেখে মেয়ে বউবা সেবা করে বাঁচিয়েছিল, হাসপাতালে গেলে একেবারে জেল ঘুরে কতদিনে সে ফিরত কে জানে ! শহরের বিদেশি মানুষটার জন্য যথাসাধ্য করতে হবে বইকী। গজেন ঠিক বলেছে।

সেই গজেনের মুখে এই কথা ! চিনতে পারলে জীবনকে সে পথের ধাবেই পড়ে থাকতে দিত।

জীবন খানিক স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে, দেখলে তো রসিক ? শুনলে তো কথা ? সাবা জীবন জেল খেটে আর ত্যাগ করে কপালে কী পুরস্কার জুটেছে দেখলে তো ? আমি তো বাবা তোর ঠ্যাং খোঁড়া করিনি!

গদি পেলে করতেন।

মৃদু হাসির একটা গুঞ্জন উঠেই থেমে যায়, সে হাসির নিষ্ঠুরতা প্রকট হয়ে পড়ে তাদের কাছেই। একজন শ্রান্ত আহত জীবন্ত মানুষ, অর্ধেকের বেশি চুল সাদা হয়ে গেছে, মুখে পড়েছে জীবনব্যাপী দুঃখ ও দারিদ্র্যের রেখা। আড়ালে চলে, মানুষটার উপস্থিতি অবলম্বন করে প্রকাশ করা চলে প্রাণের জ্বালা, কিন্তু সামনাসামনি তাকেই কী আর বিদ্রূপ করা যায় !

এ মানুষটার জ্বালাও কম নয়। স্টেশনে নতুন গুড়ের সন্দেশ কিনতে বলা নিয়ে তার তেড়ে ওঠার গল্প গজেন সকলকে শুনিয়েছে। দাওয়ায় এসে বসার পর কথায় কথায় কতভাবে যে

বেরিয়ে এসেছে বঞ্চিত মানুষটার অন্তরেব জ্বালা। তবে তাদের জ্বালা এর জ্বালায় যেন বিষ আর আগুনের ফারাক। লক্ষ কোটি মানুষের জগৎটা এর একার জীবনের ব্যর্থতাব আপশোশে আড়াল হয়ে গেছে। নইলে এতক্ষণে একবার জিজ্ঞাসা করে না বিশ বছব আগেকার দেশ-গাঁ ও কর্মক্ষেত্রের খবরাখবব, পুরানো দিনের চেনা মানুষের কুশল ? বিশ বছব আগে এদিকে তার আন্দোলনে রসিক ছিল তার বড়ো সহায়, ছায়ার মতো মুখের কথায় ওঠা-বসার ভক্ত সাথি ছিল অল্পবয়সি গজেন—আজ বুঝি সে সব কথা তার মনেও নেই। জীবনের সব স্মৃতি তুচ্ছ হয়ে গেছে দুঃখ ও ত্যাগের প্রতিদানে কী পায়নি তারই হিসাব ছাড়া।

গজেন বলে, কী হল চুন হলুদ ? আজ বাতে গরম হবে ?

অল্পবয়সি একটি বউ গরম চুন হলুদের বাটি এগিয়ে দেয়। জীবন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে, গাঁয়ের কচিবউদের ঘোমটা কী অদ্ভুত রকম হ্রস্ব হয়ে গেছে ? এতগুলি পুরুষ ও বিদেশি একটা মানুষের সামনেও, মুখ পর্যন্ত দেখা যায়। এ অবস্থায় একদিন এই বউটিরই বুকের কাপড়ে টান পড়িয়েও একগলা ঘোমটায় মুখটা আড়াল না করা ছিল নিন্দার কথা।

রসিক বলে, ডাক্তার এসে পড়বে এখুনি, চুন হলুদটা থাকত, না কি বল ?

গজেন বলে, গরম গরম লাগিয়ে দিলে আরাম হবে। ডাক্তার এলে তুলে ফেলতে কতক্ষণ ?

কিন্তু চুন হলুদ পায়ে লাগাবার আগেই সাইকেলের ঘণ্টা শোনা যায় নন্দ ডাক্তারের, টর্চেব জোরালো আলো নজরে পড়ে।

নন্দর বয়স বেশি নয়, রোগা লম্বা চেহারা। সে দাওয়ায় উঠে পিঁড়িতে বসলে রসিক পরিচয় দিয়ে বলে, ইনি বড়গাঁর জীবনবাবু। স্টেশন থেকে আসছিলেন, গর্তে পড়ে পা-টা মচকে গেছে।

অনেককাল আগে গাঁ ছেড়ে শহরে বড়োছেলের কাছে চলে গেলেও এ এলাকায় এখনও লোকে তাকে বড়গাঁর জীবনবাবু বলে চেনে।

জীবন বলে, তুমি নারাণ কর্মকাবের ছেলে না ? দ্যাখো তো বাবা হাড়টাড় ভেঙেছে নাকি। পাস করে গাঁয়েই বসেছ ?

পাস করিনি। বিয়াল্লিশে জেলে গেলাম, এদিকে বাবা মারা গেলেন, পাস করা হল না।

বোঝা যায় সে পাস-করা ডাক্তার নয় বলে জীবন বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গেঁয়ো ডাক্তার নন্দ তার পা টিপেটিপে টেনেটুনে পরীক্ষা করে, জীবন মাঝে মাঝে কাতরায়। বেশ ফুলেছে জায়গাটা। এতক্ষণ সে যে একবারও কাতরায়নি এটা খেয়াল করে সকলে মনে মনে তার সহ্যশক্তির প্রশংসা করে।

হাড় বোধ হয় ভাঙেনি।

বোধ হয় ভাঙেনি ? জীবন প্রায় ধমকে ওঠে, বোধ হয় কী বকম ? ঠিক করে বলো !

পায়ের গোড়ালি থেকে টর্চের আলোটা একবার তার মুখে ফেলে ধীর গলায় নন্দ বলে, গেঁয়ো ডাক্তার, এর বেশি তো বলতে পাবব না। বড়ো হাড় ভাঙেনি, এইটুকু জোর করে বলতে পারি। ছোটো হাড় ভেঙেছে কি না এক্‌স-বে না করে স্পেশালিস্টও বলতে পারবে মনে হয় না।

জীবন লজ্জিত হয়ে বলে, কিছু মনে করো না বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো। মন মেজাজ ঠিক থাকে না আজকাল। বড়োছেলেটা মারা গেল, ক-বছর কী দিয়ে কী করি, কোন দিক সামলাই—

জীবন একটা নিশ্বাস ফেলে। সকলে চুপ করে শোনে।

বুড়ো বয়সে কত সয় বলো ? দেশের ঘর আর জমিটুকু জগদীশ কিনে নেবে লিখল—তা লিখল একেবারে শেষ মুহূর্তে। কালকেই নাকি কোথায় চলে যাবে। বিবেচনাটা দ্যাখো একবার ! কেন রে বাবা, দুদিন আগে জানাতে তোর হয়েছিল কী ? রাতের বেলা এসে নইলে আমার এ দশা হয়।

জগদীশের বাবা জীবনের বিশেষ অনুগত বন্ধু ছিল। সেই কথা উল্লেখ করে জীবন আবার বলে, বুঝেছ, তামাশা জুড়েছে সবাই। ইংরেজকে তাড়িয়েছি, আর খাতির কীসের ?

মমতা ও সহানুভূতির একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সকলের সঙ্গে, মানবতার সেতু তৈরি হচ্ছিল আপন-পরের ব্যবধানে, সবার প্রাণের তিক্ত বেদনার স্থানটিতে ঘা লাগায় সেটা আবার ভেঙে যায়।

গজেন বলে, আপনারাই তবে তাড়িয়েছেন ইংরাজকে ?

সাধে কী বলি ! সাধে কী বলি ! উত্তেজিত হয়ে উঠতে উঠতে জীবন ঝিমিয়ে যায়। তার কথাই বোঝে না এরা, এদের সে কী বলবে। দাওয়া আর দাওয়ার বাইবে লোক আরও বেড়েছে। এ পাড়ার লোক আগেই এসে গিয়েছিল, ব্যাপার শুনে কৌতূহলের বশে আশেপাশের গাঁ থেকে আরও অনেকে এসে গিয়েছে।

সামান্য ঘটনা। জগৎ ও জীবনের এতটুকু এদিক ওদিক হবে না এ ঘটনার ফলে। কাল সকাল বেলাই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে জীবনকে বারতলা পৌঁছে দিয়ে আসবার। সেইখানে ইতি হবে এ ব্যাপারের। তবু কী আগ্রহ এতগুলি লোকের ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শোনার।

কিন্তু উৎসুক প্রাণগুলির স্পর্শ পায় না জীবন, সঞ্জীবনী প্রেরণা জাগে না। গজেনেব কথার আঘাতেই সে মুষড়ে গেছে। নিজের নালিশ আর জ্বালায় একেবারেই সে ভুলে গেছে প্রাণ দিয়ে প্রাণের সঙ্গে কারবার, শুকিয়ে ছিঁড়ে গেছে প্রাণের সঙ্গে যোগাযোগের নাড়িটা।

এ কথা ঠিক যে মানুষ হিসাবে তার জন্য সকলের এ আগ্রহ নয়। ঘটনাচক্রে অতীতের একটি জীবন্ত-প্রতীক, মানুষের রূপ ধরা একখণ্ড ইতিহাস এসে পড়েছে গাযে, একেবারে তাদের কুঁড়েঘরের দাওয়ায়, মানবিক নিদর্শনের মধ্যে সেই অতীত ইতিহাসটুকু দেখাশোনা জানাবোঝার আগ্রহ সকলেব।

তবু, নন্দ ভাবে, সেই ইতিহাসের একজন রচনাকারী হিসাবে তাজা হয়ে উঠতে তো বাধা ছিল না জীবনের ! এমনি পরিবেশে এসে পড়ে কিছুক্ষণের জন্যও কি আদর্শের জন্য জীবনের ত্যাগ আর দুঃখ স্বীকারকে ইতিহাস বলে গণ্য করতে পারে না মানুষ ? ইতিহাসও তো মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, উদ্দীপনা দেয়, পথ দেখায়।

তার নির্দেশে চুন হলুদটাই লাগানো হয় জীবনের পায়ে। সে বলে, ঘুমের একটা ওযুধ দিচ্ছি, শোবার আগে খাবেন।

কাল সকালের মধ্যে আমার পৌঁছানো চাই বাবা।

গজেন বলে, বনমালীর গাড়িতে পাঠিয়ে দেওযা যাবে।

ঘরের মধ্যে সেকেলে আমকাঠের ভারী চৌকিতে ময়লা কাঁথা বালিশ সরিয়ে অতিথির জন্য বিছানা পাতা হচ্ছে। সাঁতরাদের ছেলের বিয়ে হয়েছে অল্পদিন আগে, তার বিয়ের নতুন তোশক বালিশ আর ফরসা চাদর আনা হয়েছে। যাতনাকাতর মানুষটাকে সাঁতরাদের বাড়ি সরানোর চেয়ে তোশক বালিশ নিয়ে এসে এখানে শোয়ার ব্যবস্থা করাই ভালো মনে করেছে সবাই।

একটা কথা শোনো।

নন্দকে কাছে ডেকে তার কানে কানে জীবন বলে, গোবুর গাড়িতে তোমার ওখানে গেলে হত না ? এদের রকমসকম কী রকম যেন লাগছে। রাতে যদি—

নন্দ বলে, আপনি পাগল হয়েছেন ? দেশের মানুষকে ভুলে গেছেন ? গাঁয়ের অতিথি বলে ঘরে তুলেছে, আপনার জন্য আজ বরং এরা প্রাণ দেবে। কী আশ্চর্য, এমন কথাও মনে আসে আপনার !

গজেন কোথায় উঠে গিয়েছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাকে আসতে দেখা যায়। কাছে এসে সোৎসাহে বলে, মাছ পড়েছে একটা, নিতাই জেলেটা কাজের মানুষ। তবু মাছভাত দিতে হত শুধু, ভাগ্যে রসিক খুড়োর গাইটা দোয়া হয়নি বিকেলে।

সকলে খুশি হয়, স্বস্তি বোধ করে। রসিক বলে, চুক্ চুক্, কপাল রে !

তার মানে হল, গাঁয়ের কপালকে নিন্দা করে আপশোশ জানানো।

মানেটা বোঝে সকলেই। হাড়ে হাড়ে বোঝে। গাঁয়ের পুকুর থেকে জেলে একটা মাছ ধরতে পেরেছে, এটা হল বিশেষ আনন্দ সংবাদ ! ঘটনাচক্রে একটা গোরু দোয়া হয়নি বলে গাঁয়ের অতিথির জন্য একটু দুধের ব্যবস্থা হয়েছে, এটা হল সৌভাগ্য ! এদিকটা কি খেয়াল করেছে জীবন ? না করুক, তাকে মাছ দুধ খাওয়াতে ওই গজেনেরও উৎসাহ দেখে পরম নিরাপদে সেবাযত্ন আদর আপ্যায়ন পেয়ে রাতটা কাটাবার আশ্বাস তো অন্তত পেয়েছে জীবন ?

কিন্তু নন্দকে যাওয়ার আয়োজন করতে দেখে এখনও সে ভীরু অসহায় চোখে চারিদিকে তাকায়। পাস করা ডাক্তার না হোক একমাত্র ভদ্রবেশধারী নন্দই তার ভরসা। চারিদিকে ঘিরে আছে রুক্ষকেশ মলিনবেশ দীনতা দারিদ্র্যের সব জীবন্ত প্রতিমূর্তি, শীতের রাতে কারও গায়ে একটা সুতির চাদর, কারও শুধু কোঁচার খুঁট, কারও ছেঁড়া চট। পিছন দিকের মানুষগুলিকে আবছা আলোয় দেখাচ্ছে কালো কালো ছায়ার মতো। নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলাবলি করছে—কে জানে কী কথা, কীসের পরামর্শ।

চললে নাকি নন্দ ? কাতরভাবে জীবন জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ যাই, রাত হল।

গজেনের মেয়ে লক্ষ্মী বলে, ভিড়টা ভাগিয়ে দিয়ে যান। বাবারে বাবা, গাঁয়ে একটা লোকের পা দেবার জো নেই, জোঁকের মতো ছেঁকে ধরবে সবাই !

তার হাতে মুখে তুলো আর ধুলো লেগেছে। জীবনের জন্য সাঁতরাদের ছেলের নতুন বিয়ের শয্যাটি পাতার জন্য পুরানো কাঁথা বালিশ সরাতে গিয়ে এটা ঘটেছে। একটা বালিশ আগে থেকেই ফেঁসে ছিল।

একজন বলে, সং সেজেছ কেন গো লক্ষ্মী মাসি ?

ঢং করতে, আবার কেন ? এবার যাও না যে যার নিজের ঘর ?

কেউ জবাব দেয় না। বিদায় নিতে সমবেত মানুষগুলির অনিচ্ছা সেই নীরবতায় স্পষ্ট হয়ে থাকে।

কৈলাস হাত বাড়িয়ে ছেঁড়া কাগজের একটা মোড়ক লক্ষ্মীকে এগিয়ে দেয়, তোমার তামুক পাতা ধরো।

এনেছ ? সত্যি ?

মোড়কটা এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে লক্ষ্মী এক টুকরো তামাকপাতা ছিড়ে মুখে দিয়ে বারকয়েক চিবিয়ে নেয়।

মাথা নেড়ে বলে, তেমন সুবিধে নয়। তবু যে এনেছ আমার ভাগ্যি !

কৈলাস শহরে কাজ করে, প্রতি সপ্তাহে বাড়ি আসে। লক্ষ্মীকে ভালো দোক্তা পাতা এনে দেবার দায়িত্বটা তাকে স্থায়ীভাবে দেওয়া আছে। সেও খুশি হয়ে দায়িত্ব পালন করে। এ সপ্তাহে অসুখ হয়ে বাড়িতে আটকে যাওয়ায় লক্ষ্মীর তামাকপাতা শহর থেকে সময়মতো আনা হয়নি।

কৈলাস বলে, সে জিনিস এদিকে কোথা পাব ?

একটু তামাকপাতা এনে দেয়, তাতেই দেমাক কত ?

মুখে পিক জমেছে, ঠোঁট বেঁকিয়ে চেপে চেপে লক্ষ্মীকে কতা কইতে হয়। জীবন তীব্রদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করে, যেন ভস্ম করে ফেলবে।

অসন্তোষ চাপতে না পেরে বলে বসে, মেয়েদের নেশা করা উচিত নয় !

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে গিয়ে জানালার ফাঁকে পিক ফেলে আসে। নিজের মনে বলে, একটা পান পর্যন্ত দিলে না কেউ। পান দেওয়া বন্ধ করাও আইন হয়েছে না কি রে বাবা !

অল্পবয়সি সেই বউটি একগাল হেসে চুনসুপারি খয়ের দিয়ে একটা বোঁটাসুদ্ধ আস্ত পান তাকে এনে দেয়, তেমনি মৃদু কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলে, লক্ষ্মীদি আর সব পারে, শুধু পানটি নিজে নিয়ে খেতে পাবে না !

কেন খাব ? পান কি নিয়ে খাবার জিনিস ?

নিজের ঘরেও নয় ?

এতটুকু গেঁয়ো বউ, বয়সে কিশোরী, তার পাকা কথা দৃঢ় আচরণ জীবনকে আশ্চর্য করে দেয়। সেটা লক্ষ করে রসিক পরিচয় দিয়ে বলে, এটি আমাদের লোচনের ছোটোছেলের বউ। এ ঘরটা আজ্ঞা লোচনের। পাঁচ-ছমাস হল ছেলেটির কোনো খোঁজখবর নেই।

বউটি প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে শোনে।

জীবন বলে, পালিয়ে গেছে ?

লোচন আগাগোড়াই কথা বলছিল কম, এবার সে নিশ্বাস ফেলে বলে, সেটার কথা বাদ দেন। নিজেরও মাথা খারাপ হল, বউটার মাথাও বিগড়ে দিয়ে গেল।

বউটি লক্ষ্মীর কানে কানে কী যেন বলে। লক্ষ্মী মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জীবনকে বলে, পালাবে কেন, মাথা খারাপ হবে কেন, সে পয়সা কামাতে গেছে। রোজগার করতে না পারলে ঘরেও ফিরবে না, খবরও দেবে না। সবাই কি জগতে এক রকম হয় ? তুই বসুই ঘরে যা গাঁদা।

গাঁদা মুখ তুলে বলে, কেন ? আমি চোর নাকি ?

যাবার জন্য সাইকেল ধরে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েও নন্দ ইতস্তত করছিল। গেঁযো বাত বলেই, নইলে বাত আর সত্যি সত্যি এমনকী বেশি হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ সকলে যদি এখানে ভিড় করতে চায় নবাগত মানুষটাকে ঘিরে, তাদের নিশ্চয় সে অধিকার আছে। লক্ষ্মী স্পষ্ট ভাষার ভিড় ভাঙার কথা বললেও কেউ উঠে যায়নি। সকলে আরও কিছুক্ষণ বসতে চায় তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাভ কিছু হবে কি ?

তাই সোজাসুজি সকলকে যাবার কথা না বলে সাইকেলের ঘণ্টাটা একবার বাজিয়ে দিয়ে সে গলা চড়িয়ে বলে, আমরা আর কেন তবে রাত বাড়াই ?

একজন বলে, কথাবার্তা হল না কিছু, মোদের আশা মিটল না।

আরেকজন বলে, তাই বটে তো। কী শুনলাম ? মোটে কিছু নয়। কত আশা করে এলাম—

কী সে আশা ? ভাষায় তার প্রকাশ কী ?

রুগ্ণ নয় অথচ পাঁকাটির মতো রোগা নারাণ বলে, ব্যাপার-ট্যাপার হালচাল যদি খানিক বুঝিয়ে দিতেন—

খবরের কাঙালি বনেছ তোমরা নারাণ খুড়ো। সেই যে হাপিত্যেশে ছেঁকে ধরেছ, আর রেহাই নেই।

জীবনকে হঠাৎ যেন একটু উৎসাহিত মনে হয়। সে অমায়িকভাবে বলে, শুনতে চায় ভালোই। সকালে বারতলার কাজটা সারি, পা-টা সারুক, একদিন বরং একটা সভা ডেকে—

সেই ভালো ! সেই ভালো ! একদিন মস্ত মিটিং হবে সবাই বক্তৃতা শুনো !

লক্ষ্মীর উচ্ছ্বসিত হাসিই ফেটে পড়ে আগে, তাই মনে হয় সেই বুঝি হাসির তরঙ্গ তুলে দিয়েছে। জীবন গুম খেয়ে ধীরে ধীরে চিবুকে হাত বুলায়। টর্চ জ্বালিয়ে নন্দ আধমরা ডোবাটার পাশ দিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে সাইকেল সমেত অদৃশ্য হয়ে যায়। উপস্থিত মেয়ে-পুরুষও এবার গা তোলে, দেখতে দেখতে দাওয়া আর অঙ্গন প্রায় শূন্য হয়ে যায়। আজ যে ঘরোয়াভাবে ভালোমন্দ কিছু বলবে না, পরে একদিন মিটিং ডেকে ভালো করে সব বুঝিয়ে দেবে—এ কথা জানিয়ে জীবন যেন একবাক্যে বিদায় করেই দিয়েছে মানুষগুলিকে !

তারা আজ দেশ-বিদেশেব খবরাখবরেব কাঙালিই বটে কিন্তু নগদ বিদায়ের কাঙালি। একদিন কাঙালি ভোজন হতে পাবে এটুকু ভরসা পাবাব আশায় তাবা আর ধন্না দিতে রাজি নয়। যেদিন ভোজ দেবে সেদিন খবর জানিয়ো, দেখা যাবে। আজ পাত কুড়োনো ফেলনা যা দিতে তাই খুশি হয়ে নিতাম, দেবার যখন গরজ নেই তোমাব, আমাবও পাবার গবজ নেই।

লক্ষ্মী উবু হয়ে বসে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাই তুলে জীবনকে বলে, কিছু মনে করবেন না যেন। সাদাসিদে গেঁয়ো মানুষ সব—

লক্ষ্মীই যেন সবার আগে হাসিতে ফেটে পড়েনি !

কৈলাস মুচকে হাসে। কিছুদিন ঘটনাচক্রে কলকাতা শহবে কাটিয়ে লক্ষ্মী মস্ত শহুরে হয়ে গেছে !

জীবন মাথা হেঁট কবেছিল, ধীরে ধীবে মাথা তুলে বলে, কীসের জোরে রাগ করব মা ? আমাব সব গুলিয়ে গেছে। এরা মিটিং চায় না কেন ?

কে বললে চায় না ? কালকেই তো মস্ত মিটিং ইস্টিশানেব ডাঙা মাঠে—সবাই ভিড় করে যাবে। তবে শুধু মিটিংযে কি পেট ভরে ? মুখোমুখি সোজাসুজি কথাও শুনতে চায়। দেখুন না কেন, আজকে বললে আপনি যেমন কবে যে সব কথা কইতেন, মিটিংযে কি আব সেভাবে কইবেন ?

বক্তৃতা শুনতে চায না ?

কৈলাস বলে, কেন চাইবে না, আবও বেশি শুনতে চায। শুধু ছাঁকা বক্তৃতা শুনতে চায় না। শুধু মিটিংযে বলবেন আর—

রসিক বাধা দিয়ে বলে, হাঁ হাঁ, তার মানেই হল তাই। জীবনবাবুকে তোমার আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। উটাও মিটিং হয়েছিল—মিটিং আর কাকে বলে ? শবীর ভালো নয, উনি আজ কিছু বলবেন না, বাস ফুরিয়ে গেল।

আধঘণ্টার মধ্যে জীবন মোটা চালের গরম ভাত পেট ভবে খায। পরিবেশন করে লোচনের বড়ো ছেলে ঘনরামেব বউ দযা। গাঁদাব সাধ ছিল বুড়োকে সে নিজে হাতে খাওযাবে কিন্তু যতই ধীর স্থিব ও ভারিক্কি হোক তাব চালচলন, নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাকে এ কাজের ভার দেবার সাহস তাব জা-শাশুড়িব হয না, লক্ষ্মীও নিষেধ কবে। সে টেব পেয়েছে, তাকে আর গাঁদাকে জীবনের মোটেই পছন্দ হয়নি।

দয়া আর তারা অবশ্য একই গোয়ালেব জীব। তবে দযা বেশির ভাগ বসুইঘবেই ছিল এতক্ষণ, একটা বড়ো বকম ঘোমটা টেনে সেই ভাত দিক মানুষটাকে।

খিদে পেয়েছিল, কিন্তু বেশি খেতে পাবে না জীবন। খিদে পায়, খাওয়ার শক্তি নেই। শবীর পুষ্টি চায় কিন্তু প্রয়োজনীয় খাদ্য হয়ে দাঁড়াবে পেটেব পক্ষে অসহ বোঝা। দুধটুকু সবটা চুমুক দিতে সে কতবার যে ইতস্তত করে !

খেয়ে উঠেই ঘুমে আর শ্রান্তিতে অবসন্ন হযে আসে দেহ, পায়েব যন্ত্রণা ঘা মেরে তাকে সচেতন করে রাখে। খানিক পরেই সে নন্দ ডাক্তাবের যন্ত্রণানাশক ঘুমের ওষুধটা খেয়ে শুতে যায়। এবং সত্যসত্যই ওষুধটা মিনিট দশেকের মধ্যে তাব বোধশক্তিকে ভোঁতা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

লক্ষ্মী অন্য কথা তোলে। তার মুখে শহরের গল্প শুনতে মেয়েরা বড়ো ভালোবাসে। মেয়েরা সাগ্রহে শোনে, নানা প্রশ্ন করে—আবার তার মুখের শোনা কথা নিয়ে আড়ালে তার নিন্দাও করে, বলে, সোয়ামি নেয না, এ সব ধিঙ্গিপনাতেই তো তোর মজা !

তবে দেশের জন্যে তাদের দশজনের জন্যে গজেনেব ঠ্যাং খোঁড়া হওযা ছাড়াও অনেক কিছু গেছে কিনা, ওই কাজে নেমে লক্ষ্মীরও পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা জুটেছে কিনা, নিন্দাটা তেমন জমাট বাঁধে না।

রান্নাঘরের ডিবরিটা তেলের অভাবে দপদপ করে উঠলে লক্ষ্মী গা তোলে, বলে, নাঃ, এবাব পালাই !

গাঁদা তার সঙ্গে বাইরের দাওয়া পর্যন্ত আসে। লোচন আর ঘনরাম দাওযার পাশের ঘেবা জায়গাটুকুতে আগাগোড়া চাদব মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ কোথাও জেগে নেই।

কী করে যাবে লক্ষ্মীদি ? ভয় পাও যদি ? তোমায় যদি কিছু ধরে একলা পেয়ে ?

এতক্ষণের গাঁদাকে যেন চেনা যায় না। সবজান্তা ভাবিক্কি নারীর পালা শেষ করে ছুটি পেয়ে সে যেন ছেলেমানুষটির মতোই কাতর হতে পেরেছে বাড়ি ফেরার পথে লক্ষ্মীকে পাছে ভূতে ধবে এই ভাবনায়।

ভয় দেখাসনে, থাবড়া খাবি। এইটুকু তো পথ। দম নিয়ে ছুট দেব, ঘরে গিয়ে দম ছাড়ব।

আমি সাথে যাই ?

প্রস্তাব করে গাঁদা নিজেই মাথা নাড়ে, আমাকে আবার কে পৌঁছে দেবে ? তোমার সাথে শোবোখন, অ্যাঁ ? একলাটি ভালো লাগে না। রাতের বেলা মনটা এমন করে !

লক্ষ্মী তার মাথাটা দুহাতে বুকে চেপে ধরে। বলে, শাশুড়ির কাছে শুবি তো।

ও তো বুড়ি !

তোর এখন বুড়িই ভালো। ছোঁড়াটা ফিরে শুনবে তো তার নিজের মা রোজ রাতে তোকে বুকে আগলে রেখেছে ? রাতে কি তোর বাইরে যেতে আছে রে ছুঁড়ি !

লক্ষ্মী তার মাথার চুল ঘেঁটে আদর করতে করতে আবার বলে, এই ফাগুন চোতে যদি না ফেরে মোর নাক-কান কেটে নিস।

কী করে জানলে ?

ও সব আমি জানি। তোর জন্যে পয়সা কামাতে গেছে তো ? পয়সা কামাক না কামাক, দম ফেলতে আসতেই হবে। এসে ফের চলে যাক, আসতে হবেই একবারটি।

একবারটি এলে হয়। সবার কাছে মোকে দোষী করে বেখে গেছে !

বাতা চেঁছে রাখ, এলেই ক-ঘা লাগিয়ে দিস।

না সত্যি, মোর কী দোষ বলোই ? একটা মাকড়ি নিয়ে বেচে দিলে। ভাবলাম, কেমন মানুষরে বাবা, নতুন বোয়ের মাকড়ি বেচে দেয় ! দুদিন বাদে ফের চাইলে আরেকটা দাও।

বলেছিস তো অনেকবার, কত শুনব ?

আরেকবার শুনলে কী হয় ? দু-দণ্ড শুনতে গায়ে জ্বর আসে তোমার ? সাদাসিদে কাহিনি। মহিম আবার মাকড়ি চাইলে গাঁদা গিয়ে শাশুড়িকে জানিয়ে দিয়েছিল, তোমার ছেলে ফের মাকড়ি বেচতে চায় গো। তাতে প্রাণে আঘাত লাগে মহিমের। হাতে পয়সা নেই বলেই তো তার এই অপমান—পয়সা রোজগার করতে না পারলে সে বাড়িও ফিরবে না, বোয়েরও মুখ দেখবে না। শেষ রাতে উঠে সে এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কী জন্যে মাকড়ি বেচবে আগে সে কথা কিছুই জানায়নি গাঁদাকে, এটাই তার সবচেয়ে বড়ো আপশোশ। বলেছে পরে, গুরুজনের ধমক খেয়ে ঘরে গিয়ে ঝগড়া করার সময়। ভাগচাষের জোরালো আন্দোলন চলছিল, তারই ফান্ডে কার বউ তাগা দিয়েছে, কার বউ চুড়ি দিয়েছে, গাঁদাকেও মাকড়ি দিতে হবে। সে কথাটা বললে তো হয় ? মাকড়ি নিয়ে তুমি নেশা করবে না ফান্ডে দেবে, গাঁদা জানবে কী করে ?

তুই ঠিক করেছিস। এবার ঘরে যা।

তাকে ঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে লক্ষ্মী দাওয়া থেকে নেমে যায়। এবারকার যুদ্ধের আগে উন্মাদিনী ছাড়া গাঁয়ের সবচেয়ে দুঃসাহসী মেয়ের এত রাত্রে একলা এভাবে ঘরের বাইরে এক মিনিটের পথও পাড়ি দিতে সাহস পেত না। ভয় হোক আর সাহস হোক চেতনার অনুপাতে ছাড়া তো হতে পারে না। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ সৈন্য পুলিশ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ধানের লড়াই একেবারে ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে চেতনা। আঁতে ঘা খেয়ে খেয়ে সাফ আর শক্ত হয়েছে মাথাগুলি। প্রচণ্ড ঘটনার আধুনিক ট্র্যাক্টর চষে দিয়ে গেছে অনুভূতির খেত, এখনও দিয়ে চলেছে। নিজের সঙ্গে নিজের তুলনা করা যায়, আশ্চর্য হওয়া যায়। মনে হয় না আমি একজন তুচ্ছ চাষির মেয়ে, কুটার মতো শুধু ভেসেছি ঘটনার বন্যায়, কোথায় ছিলাম কী ছিলাম একটা নিরিখ পেয়েছি, নিজেকে খানিক যাচাই করতে পারি !

লক্ষ্মীর গা ছমছম করে, গাঢ় কুয়াশার আবরণে ছোটোবড়ো কোনো কোনো গাছটাকে সেই চিরকেলে ভয়াবহ মূর্তি মনে হয়, বুকটা ধড়াস করে ওঠে, মন তার আপন মনে রামনাম জপ করে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়, ভয় তো সে পায়নি। অশরীরী জীবের ভয় তাকে আটকে রাখতে পারেনি লোচনের দাওয়ায়, সাথি ছাড়া এইটুকু পথ পার হওয়া তার পক্ষে অসাধ্য করেনি। লক্ষ্মী জানে, ভূত-প্রেত যদি থাকেও মানুষের তারা ক্ষতি করে না। ওটা শরীরী মানুষেরই একচেটিয়া কারবার। কুয়াশা ভেদ করে একটা ভূত বা প্রেত বা পেতনি যদি নেহাত এখন তার সামনে এসে দাঁড়ায়, অভ্যাসবশে হয়তো সে মূর্ছা যাবে,—ভয় পেয়ে নয়। আজও ভয় করে, অনেক রকম ভয়, কিন্তু কোনো ভয় আর তাকে কাবু করতে পারে না একেবারে।

ভূত নয়, তার সামনে দাঁড়ায় কৈলাস। তার জন্যই কৈলাস অপেক্ষা করছিল। পাছে সে ভয় পায় এ জন্য স্পষ্ট গলায় বলতে বলতে সে সামনে আসে : আমি কৈলাস গো, কৈলাস। ডরিয়ো না, আমি কৈলাস। মাদুলি দেখাব, সেই কুন্দু ঠাকুরের মাদুলি, ডরিয়ো না !

মন্ত্রপূত মাদুলি দেখিয়ে কৈলাস প্রমাণ করবে সে রক্তমাংসেরই কৈলাস। মহাশূন্যের অধিবাসীরা মানুষের সামনে আসতে হলে অনেক সময় চেনা লোকের রূপ ধরে আসে। আর সবই তারা নকল করতে পারে, শুধু মাদুলি কবচ এগুলি বাদ যায়। তাকে দেখে লক্ষ্মী পাছে চিৎকার করে ওঠে বা মূর্ছা যায় এই ভয়টাই কৈলাসকে ব্যাকুল করেছিল।

কী কাণ্ড যে তুমি কর !

দুটো কথা কইব বই তো নয়।

দুটো কথা কইতে তখন থেকে ঘুপচি মেরে রয়েছে ? একলাটি আসব জানলে কী করে ? কেউ যদি পৌঁছে দিতে আসত ?

ঘুপচি মেরে রইতাম।

ষষ্ঠীতলা এখন দেখা যায় না। অনেকদিনের ষষ্ঠীতলা। বটতলায় কয়েকটা ইটপাথর, হাতখানেক উঁচু মাটির বেদি। দিন হলে দেখা যেত, দুটি সাজানো মাটির প্রতিমা দুরকম ভঙ্গিতে ভেঙে পড়ে আছে, তাদের বাহন গাধা দুটিরও একই অবস্থা। সাধারণ পাথরের ছোটো একটি মূর্তি ছিল তারও একটি হাত এবং একটি পায়ের পাতা ছিল না। কবে কোন পুকুর খুঁড়তে পাওয়া গিয়েছিল মূর্তিটি, কেউ খেয়াল রাখেনি, যদিও কুন্দু ঠাকুর সাঁতরাদের পুকুরটা খোঁড়ার সময় স্বপ্নাদেশ পাওয়া থেকে শুরু করে গোপনে মূর্তিটি সংগ্রহ করে মাটিতে চুপিচুপি পুঁতে রাখা পর্যন্ত অনেক চেষ্টা ও কষ্ট করেছিল ঘটনাকে সবার স্মৃতিতে চিরস্থায়ী করে গেঁথে দেবার জন্য। প্রায় এক বছর ধরে নিয়মিত স্বপ্নাদেশ ও প্রচার এবং পুণ্যতিথিতে পুকুর খুঁড়ে মূর্তি পাওয়া—অনেক হইচই আশা করেছিল কুন্দু ঠাকুর। কিন্তু বিশেষ সাড়া মেলেনি। বরং বহু দূরের গান্ধীজির অনশনের সমর্থনে সেও যখন এই গ্রামে এগারো দিন একটানা উপোস করেছিল, প্রচারের চেষ্টা না করলেও মুখে মুখে প্রচার হয়েছিল অনেক বেশি, দলে দলে মেয়ে পুরুষ তাকে দর্শন করতে এসেছিল। সে ঘটনা যদি বা কারও কারও স্মরণ

থাকে, মূর্তি পাওয়ার ঘটনা দিন দিন বেশি অলৌকিকত্ব পাওয়ার বদলে একেবারে মন থেকে মুছে গেছে মানুষের।

মূর্তিটিও নেই। গড়ান লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে যখন সৈন্যদের একটা ছাউনি পড়েছিল, দুজন বিদেশি অফিসার ভারতীয় অসভ্যতার প্রতীক হিসাবে মূর্তিটি চুরি করে নিয়ে গেছে।

এসেছিল অবশ্য মেয়ের খোঁজে। গরিব চাষির মেয়ে।

লক্ষ্মী বলে, হেথায় একদণ্ড দাঁড়িয়ে তোমার সাথে কথা কইতে পারব না।

কেন ? কে জানছে ?

তুমি আমি জানছি। চোর যে চুরি করে, কে জানতে যায় ?

চুরি কী রকম ? একটা সুযোগ পেলাম তুমি আমি—

আ মরি, কী সুযোগ ! এ সুযোগ ঘটবে বলে তুমি হাপিত্যেশ করে বসেছিলে ? মোরা চাইলে এমন সুযোগ যেদিন খুশি হয়, রাতের বেলা চুপিচুপি বেবিয়ে এলেই হল।

সে তো তুমি আসবে না !

তাই তো একে চুরি বলছি। চোর খেটে খাবে না, সুযোগ পেলে চুরি করবে। তোমাব মতলব বুঝিনে আমি ? রাত দুপুরে এমনিভাবে বাগিয়ে ধরবে, মোর মাথাটাও বিগড়ে যাবে, নরম হযে নেতিয়ে যাব। যাই বলি আর যাই করি, মেয়েমানুষ তো !

আমি তা ভাবিনি, মোটে নয় !

কী জানি।

খানিক গুম খেয়ে থেকে কৈলাস বলে, সত্যি ও সব ভাবিনি লক্ষ্মী।

তুমি কথা কইছিলে হাসছিলে, তোমায় দেখতে দেখতে এমন রাগ ধরে গেল আজ—

আমার ওপর রাগ ?

না, এমনি। কেন, আমরা মানুষ নই ? আমাদের সাধ-আহ্লাদ নেই ? আমি ভেসে এসেছি না তুমি ভেসে এসেছ ? আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। পাপ হোক যাই হোক—

কৈলাস তার হাত চেপে ধরে।

লক্ষ্মী কাতরভাবে বলে, পাপের কথা নয় গো। পাপ হলে নয় নরকে যাব। আসলে তুমি আমি তেমন লোক নই, মোদের এ সব পোষাবে না।

কৈলাস রাগতভাবে বলে, কেন ? সোয়ামি আছে বলে ? সাত বছর খোঁজ নেয় না, দিব্যি আরেকজনের সঙ্গে ঘর করছে, তোমার অত সতীপনা কেন ?

সতীপনা চুলোয় যাক।

তবে কেন দগ্ধে মারছ ?

প্রাণ থেকে সায় দেয় না, আমি কী করব বল ?

কৈলাসের মুখ দেখা যায় না। অতি মৃদুস্বরে লক্ষ্মী বলে, সেই ধরলে তো হাত ? মাথাটা গুলিয়ে দিতে চাও ?

কৈলাস হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, আমায় নিয়ে খেলা করছ, টের পেলাম আজ।

এতকাল পরে টের পেলে ? এদিকে তো বেশ চালাক-চতুর ! আমার বেলাই কেবল গোসা করতে জানো। এটুকু বোঝো না, সবাই মোদের ঘেন্না করবে, টিটকারি দেবে ? জানুক না জানুক, সবাই যে জন্য ঘেন্না করবে আমি তা লুকিয়েও করতে পারব না।

লক্ষ্মী এবার নিজে হাত বাড়িয়ে কৈলাসের হাত ধরে, বলে, এই দ্যাখো খেলা করছি।

বলে, সত্যি বলব তোমায় ? নিজেকে আমার বড়ো ভয়। পুলিশের হাতে জাত গেছে, তাতে আমার বুক জ্বলে কিন্তু দশজনের সাথে বুক ফুলিয়ে মিলিমিশি, মাথা উঁচু রেখে কথা কই। মোরা

নয় লুকিয়ে পিরিত করলাম কেউ জানল না। কিন্তু আমি ঠিক জানি, আমি নিজে নিজেই সবার কাছে চোর বনে থাকব।

কৈলাস বলে, তোমার বড়ো খুঁতখুঁতানি।

কী করব বলো ? যেটা আছে সেটা নেই ভাবব কী করে ? যদি পার খুঁতখুঁতানি সারিয়ে দাও— কথাটি কইব না। নয় তো অন্য কোনো উপায় কর যাতে তোমার কাছে রাত কাটিয়ে বুক ফুলিয়ে সবার সামনে হাঁটতে পারি।

গোকুল শালা বেঁচে থাকতে কোনো উপায় নেই।

লক্ষ্মী তার গলা জড়িয়ে কাঁধে মাথা রেখে বলে, তবে আজ লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরে যাও। তোমার ওই গোকুল শালাকে মেরে ফেলে উপায় করতে চাও, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমায় শুধু জানতে দিয়ো না তুমি খুন করেছ।

লক্ষ্মী চোখ বুজে ছিল, সে টের পায় না। কৈলাস হঠাৎ বলে, চট করে ঘরে যাও। পুলিশ গাঁ ঘেরাও করছে।

লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ঘরের দিকে জোরে জোরে পা চালায়।

কৈলাসও আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। চোখের পলকেই সে যেন গাছপালার সঙ্গে মিশে যায়। ষষ্ঠীতলার বটগাছটার ডালে একটা রাত্রিচর পাখি কর্কশ আওয়াজ তোলে। দূর থেকে শোনা যায় কুকুরের ডাক।

ভোর ভোর বনমালীর গোরুর গাড়িতে জীবনের বারতলা রওনা দেওয়ার কথা, সে কিন্তু রওনা হল মাঝরাত্রেই, মোটরগাড়ি চেপে।

জীবনকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত পাড়াগাঁটা নিজেও ঘুমিয়ে পড়ে। এত বেশি খাটে সকলে আর এত কম খায় যে ঘুমের টনিক ছাড়া বাঁচাই অসম্ভব তাদের। ঘুমের জন্য তপস্যা করতে হয় না, চাটাই মাদুরই যাতে হোক গা এলিয়ে ছেঁড়া বালিশ বা ন্যাকড়া জড়ানো খড়ের পুঁটুলিতে মাথা রাখলেই ঘুম যেন মশার ঝাঁকের আগেই এসে যায়। কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবার কী জো আছে গাঁয়ের লোকের, পা মচকে স্বদেশি সাধনায় কোনো সাধক গাঁয়ে আশ্রয় নিলে ! আধঘণ্টা বাদে বারতলা থেকে গাড়ি বোঝাই পুলিশ এলে, পনেরো মিনিট বাদে তাদের সঙ্গে জগদীশের গাড়িতে জীবন বারতলায় রওনা দিলে প্লট ঘোরালো হবে কি না জানি না তবে সেটা বিচ্ছিন্ন বা খাপছাড়া ঘটনা হবে না নিশ্চয়। জীবনের পা মচকে এ গাঁয়ে আশ্রয় নেওয়ারই সেটা জের, নইলে গাড়ি বোঝাই পুলিশ নিয়ে জগদীশের ছুটে আসা প্রয়োজন হত না।

দাওয়ায় মাথা থেকে পা ঢাকা মশারি শীতের আবরণ চাদর খুলে উঠে বসে একেবারে টর্চের আলোর মুখোমুখি লোচন ও ঘনরামের ঘুম ভাঙে। ভালো করে চোখ রগড়ে ঘুম তাড়াবার সুযোগও পায় না।

কে এসেছিলেন এদিকে ? কাকে তোমরা গুম করেছ ? কোথায় তিনি ?

আজ্ঞে এ বাড়িতেই আছেন।

কোথায় ?

খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন মশারির নীচে।

হইচই হট্টগোলে জীবন অবশ্য ততক্ষণে জেগে গিয়েছে—গ্রামের লোকেরাও জেগেছে।

মশারির তলা থেকে জীবন বলে, কে ? কী ব্যাপার ?

তার গলার আওয়াজে দারুণ আতঙ্ক !

জগদীশের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে ব্যাপারটা বুঝে তবে তার বুকেব ধড়ফড়ানি থামে।

জগদীশ বলে, জীবনবাবু আপনি ! আমরা খবর পেলাম---

জগদীশ একজন বিখ্যাত পদস্থ ব্যক্তির নাম করে। গাঁয়ের লোক নাকি তাকে খুন করার মতলবে গুম করে ফেলেছে, এই খবর গিয়ে পৌঁচেছে বারতলায়।

পুলিশ অফিসার ভুবনমোহন বলে, তাই তো ভাবছিলাম, এ কী ব্যাপার ! বলা নেই কওয়া নেই, উনি হঠাৎ এ গাঁয়ে আসবেন কেন ?

জগদীশ চটে বলে, সে ব্যাটা গেল কই ? বিপিন ?

একজন পুলিশ আলোয়ান জড়ানো মাঝবয়সি বেঁটে একটি মানুষকে সামনে ঠেলে দেয়। তাব মুখভরা বসন্তের দাগ, কান দুটি মাথাব সঙ্গে লেপটেই আছে।

জেনেশুনে খবর দিতে পাবিস না শূয়ার ? শীতের বাতে মিছিমিছি দৌড় করালি ?

বলতে বলতে রাগের মাথায় জগদীশ তার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দেয়।

ভুবনমোহন বিপিনকে পিছনে ঠেলে দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ায়, অসন্তোষের সঙ্গে বলে, মেরে বসলেন একেবারে ! এ রকম ভুলভ্রান্তি হয়। ইনি তো এসেছেন, একটা হইচই তো হয়েছে চারিদিকে—একেবারে বানিয়ে খবর দেয়নি। এ রকম মারধোর কবলে কেউ খবর-টবর দেবে না আর।

জীবন কাতর কণ্ঠে জগদীশকে বলে, আমি তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম বাবা, আজ তোমার চিঠি পেলাম। পা-টা মচকে গিয়ে এখানে আটকে গেছি। এবা খুব কবেছে আমার জন্যে।

বাইরে খানিক তফাতে লোক জমেছে। যখন তখন যে কোনো অবস্থায় চটপট জড়ো হবাব শিক্ষাটা ভালোভাবেই পেয়েছে গ্রামের মানুষ।

জগদীশ বলে, আপনি এখন কী করবেন ? আমি কাল কলকাতায় যাব। খোকন পরশু দেশে ফিরছে।

ফিরছে ? বেঁচে থাক, সত্যিকারের বিদ্বান হয়েছে ছেলেটি তোমার। কাগজে পড়ছিলাম, অল্প বয়সে বিলেতে অত বড়ো ডিগ্রি পাওয়া কী সোজা কথা !

ছেলের প্রশংসায় খুশি হয়ে জগদীশ বলে, আপনি কী বাকি রাতটা এখানে ঘুমোবেন ? না আমাদের সঙ্গে যাবেন ?

জীবন ইতস্তত করে বলে, এরা বলছিল ভোর ভোর গোরুর গাড়িতে করে পাঠিয়ে দেবে—

তার চেয়ে আমার মোটরেই চলুন ? গিয়ে একেবারে ঘুম দেবেন, সকালে কথাবার্তা হবে ?

তাই যদি বলে জগদীশ তবে তাই সই। গাঁয়ের যারা তার জন্য এত করেছে তাদের ভালো করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নেবার সুযোগ জোটে না বলে জীবনের মনটা সত্যই খচখচ করে। এরা হয়তো ভাববে যে বড়োলোক জমিদার এল আর অমনি সে পাততাড়ি গুটিয়ে তাড়াতাড়ি তার মোটরে গিয়ে উঠল। কিন্তু কী করবে তার উপায় নেই। কাল জমি-জায়গার বদলে জগদীশের কাছ থেকে টাকাটা না পেলে সে তলিয়ে যাবে একেবারে।

অল্পঅল্প হাওয়া ছেড়েছিল ইতিমধ্যেই কোনো এক সময়ে। কনকনে উত্তুরে হাওয়া। এই হাওড়ায় ছেড়ে শীতটা এত জেঁকে না পড়লে জগদীশ হয়তো রাগের মাথায় নিতাইয়ের গালে চড়টা বসিয়ে দিত না। সন্ধ্যারাত্রের সেই ঘন গাঢ় কুয়াশা আশ্চর্যজনকভাবে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। চারিদিকে মাঝ আকাশের চাঁদের আলো ছড়ানো। অস্পষ্টতা ঘুচে গিয়ে এখন এদিক ওদিক নজর চলে। জীবন চারিদিকে তাকায়।

গজেন কই ? গজেন ?

খোঁড়া গজেন তফাতে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, নাম ধরে ডাকাডাকি শুনেও সে এক পা এগোয় না।

জীবন লোচনকে বলে, গজেনকে বোলো আমি আবার আসব। ক-দিন বাদেই আবার আসব।

দুজন পুলিশের কাঁধে ভর দিয়ে জীবন খোঁড়াতে খোঁড়াতে জগদীশের গাড়ির দিকে এগোয়। সাবা জীবন ব্রিটিশের পুলিশ, তাকে শুধু ধরেছে বেঁধেছে জেলে পুরেছে আর মেরেছে, আজ পঁয়ষট্টি বছর বয়সে সত্যই তবে তার পুলিশের কাঁধে ভর দিয়ে চলার সুযোগ জুটল ! সে ইচ্ছা করলে এদের দুজনের ওপর চোটপাট করতে পারে, গালাগালি দিতে পাবে !

ভগবান কি আছেন ? পা মচকানো থেকে, গাঁয়ে আশ্রয় পাওয়া থেকে, ঘন কুয়াশার সঞ্চার থেকে, আকাশ বাতাস সাফ করে আবাব জ্যোৎস্না ঢালা থেকে সারা জীবন পুলিশ তাড়িত তাকে পুলিশের কাঁধে চড়ে জগদীশের মোটরে ওঠানো পর্যন্ত অঘটন যিনি ঘটাতে পারেন, সেই ভগবান ? যে ভগবানকে বাদ দিয়ে কোনো মানে করা যায় না তার একটা রাত্রির জীবনেরও ?

ভগবান কি আছেন ? মচকানো পায়ের ব্যথাটা কী কমিয়ে দিয়েছেন তিনিই ? কিন্তু ওই যে সারিবদ্ধ মানুষ জ্যোৎস্নালোকে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে তার হয়ে মোটরগাড়িতে চড়া দেখছে, কয়েকদিন পরে ফিরে এসে এদের একটু আয়ত্তে আনার চেষ্টা কী ভগবান সফল কববেন ?

জনতার জোরে ভাগ্য ফিরিয়ে দেবেন ?

২

নবশিল্প মন্দির ভালো না চলায় শুভব বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। হঠাৎ সে বিদেশ চলে গিয়েছিল তার বিজ্ঞানের শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। শুভ বিদেশ থেকে ফিবছে আরও বড়ো বৈজ্ঞানিক হয়ে, নতুন ডিগ্রি নিয়ে।

গিয়েছিল জাহাজে চেপে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে, ফিরছে আকাশপথে প্লেনে। যাওয়ার সময়ের চেয়ে সে এখন নিঃসন্দেহে অনেক বড়ো বৈজ্ঞানিক।

শুভময় ছেলেবেলায় কবিতা লিখত। সব কিছু জানার একটা জোবালো ঝোঁক ছিল। বাড়িতে স্নেহ আদরের যান্ত্রিক সমারোহে আর স্কুলে কিছু না জানতে দিয়ে বিদ্যাদানের ব্যবস্থায় তা ব্যাহত হয়। সেটাই সব কিছু রহস্যময় অজানা সম্পর্কে জানার ব্যাকুলতায় দাড়িয়ে গিয়ে কিশোর বয়সে কবিতা হয়ে বেরিয়ে আসত। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তার মাথা খুলে যায়। তরতর করে কলেজে পরীক্ষার ধাপ বেয়ে উঠেছিল, একটা ডক্টরেট নিয়ে থামত সন্দেহ নেই। সকলে সেই পরামর্শই দিয়েছিল। কিন্তু ডক্টরেটের জন্য পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ সে কেন থমকে দাঁড়াল কেউ জানে না।

সাধারণ পানা ও কচুরিপানার সবুজ বর্ণসত্তার তারতম্যের জন্য আলোকরশ্মির বিস্মরণ ও কেন্দ্রীকরণ এবং ম্যালেরিয়াবাহী মশা ও সাধাবণ মশার স্নায়ুতন্ত্রীর উপর ঘুঁটের ধোঁয়ার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্যের সাহায্যে কী ভাবে আবিষ্কার করা যায় গ্রীষ্ম-মেখলা দেশে কেন পানা ও মশার উৎপাত আর পশ্চিমের সাম্রাজ্য বিস্তার—এই রকম কোনো নিগূঢ় জটিল বিষয়ে একেবারে নতুন রকম থিসিস লেখার কথা ভাবতে ভাবতে কেন সে মত পালটেছিল আত্মীয়বন্ধু কাউকে তার একটু আভাস পর্যন্ত সে দেয়নি।

পরীক্ষা পাসের মাপকাঠিতে পদার্থ বিজ্ঞানে একটা ডক্টরেট পাওয়ার মতো বিদ্যা আয়ত্ত করে সে পত্তন করেছিল স্টোভ ল্যাম্প লণ্ঠন তৈরির ওই নবশিল্প মন্দির।

বিদেশে কী শিখতে গিয়েছিল তাও খুলে বলে যায়নি। শুধু এইটুকু জানিয়েছিল যে ডিগ্রি-ফিগ্রির লোভ তার আর নেই, ফলিত বিজ্ঞান শিল্প বিজ্ঞান এ সব যা পারবে যতটা পারবে শিখে আসবে। এ দেশের বিশেষ অবস্থায় বিজ্ঞানের যে বিশেষ শিক্ষা বিশেষভাবে কাজে লাগবে।

শুভর দোষ ছিল না। বিজ্ঞানের এত ভালো ছাত্র, বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকেব সঙ্গে তাব যোগাযোগ অথচ এই সহজ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাটুকু সে কারও কাছে পায়নি যে ভাবের বশে এ রকম এলোমেলোভাবে বিজ্ঞান শেখা যায় না। বিজ্ঞান শেখার পদ্ধতিটাও বৈজ্ঞানিক।

দমদম এরোড্রোমে জগদীশ ও কয়েকজন আত্মীয়বন্ধু তার প্লেনের জন্য অপেক্ষা করছিল। সকলের মধ্যে গভীর অস্বস্তিবোধ। যাই শিখতে গিয়ে থাক, এ এক রকম শখের বিলাত যাওয়া। তাও আবার বিয়ে-টিয়ে না করেই গিয়েছে। কী মূর্তিতে কী ভাবে ছেলে ফিরছেন কে জানে !

জগদীশ বলে, ওকে ধরলে আমাদেব এলাকায় দুজন বিলেত-ফেরত হল। তাও এক বাড়িতে। কাকা জোর করে গিয়েছিলেন, সে আজ প্রায় চল্লিশ বছর হল। আগেব বারেব বড়ো যুদ্ধটাব ঠিক আগে। আরও দু-চারজনের শখ হয়েছিল, কাজে কিছু হয়নি। সিদ্ধেশ্বরেব ছেলেটা সব ঠিকঠাক করেও শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি পেয়ে আর গেল না।

জীবন বলে, স্বদেশির তোড়টা বেড়ে যাওয়ায় বিলেত যাওয়ার নেশাটা কেটে গিয়েছিল।

জগদীশের বন্ধু ও চিকিৎসক বিলাত-ফেরত স্পেশালিস্ট ডাক্তাব ভূদেব প্রায় সাদা হয়ে আসা মাথাটা নেড়ে বলে, কে বললে আপনাকে ? বিলাত যাবে, তার সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলন বাড়া-কমার সম্পর্ক কী ? পরে তখনকার চেয়ে ঢের বেশি এসেছে গিয়েছে। আজকাল তো ডালভাত।

কলকাতায় ভূদেবেব জবর পশার। গোড়ার দিকে কম পয়সাব দিনে ছিল উগ্র সায়েব, দেশি মানুষের পয়সা বেশি পরিমাণে ঘরে এসে জমতে জমতে একেবারে স্বদেশি বনে গেছে। মাঝে মাঝে গ্রাম্য অশ্লীল রসিকতা পর্যন্ত তাব মুখে শোনা যায়।

একটু বেমানান বেখাপ্পা হয় রসিকতা। যেন, কল্‌কে থেকে দা-কাটা তামাক চুরুটে কিংবা সিগারেটে ঢেলে সাজা হয়েছে !

নন্দ বলে, ডালভাত ? ডালভাত নয়, একটা স্পেশাল ক্লাসেব মাংস-রুটি বলুন ! আগে থাকত ডবল মুক্তির লোভ, গোঁড়া ফ্যামিলির বাঁধনটাও খসত, কেরিয়ারও ছিল একেবারে বাঁধা। আজকাল শুধু কেরিয়ার, তাতেও আবার ভীষণ কম্পিটিশন !

ভূদেব খুশি হয়ে চুরুট নামিয়ে বলে, তুমি তো ছোকরা ধরেছ ঠিক ! ঠিক কথা, আমি কী শালা শুধু ডাক্তার হতে বিলেত গিয়েছিলাম ? আরও কত মতলব ছিল।

জীবন বলে, সে সব দিনকাল আর নেই।

ভূদেব বলে, একেবারে নেই বলি কী করে ? শুভ খানিকটা ভিন্ন রকম মতলব নিয়ে গেছে এইমাত্র। তফাত এই, যাওয়ার জন্য ওকে মারামারিও করতে হয়নি, একটা বিয়েও করতে হয়নি যাওয়ার আগে।

ভূদেবের স্ত্রী করুণাময়ী, তার চুলেও পাক ধরেছে, বলে, বিয়ে করে গিয়ে কি ঠকেছ ?

ঠকেছি ? ফিরে এসে তোমাকেই বিয়ে করতাম না !

তবে ? দোষটা কী ?

কিছু না। দোষের ব্যাপার হলে জগদীশও কী শুভর বিয়ের জন্য অত চেষ্টা করত ! কোনোমতে বাগানো গেল না তাই, নইলে একটি ইয়ং ওয়াইফকেও এখানে ওয়েট করতে দেখতে পেতাম। সে সব দিন নেই বলে উড়িয়ে দিলে কি চলে জীবনবাবু ?

চারিদিকে সব কিছু পালটে গেল—

সব কিছু ? এক রাজা গেছে, আরেক রাজা এসেছে। আপনি আমি বুড়ো হয়েছি, আমাদের জগদীশ প্রৌঢ় হয়েছে—

ভূদেবের স্ত্রী বলে, তোমার সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি।

ভূদেবের মেয়ে মায়া নন্দর সঙ্গে নিজেই খানিক আগে পরিচয় করেছিল। তাকে সে ধরে নিয়েছিল দূর সম্পর্কের কোনো গরিব আত্মীয় বলে—না ডাকলেও যারা আত্মীয়তা বজায় রাখার এই সব সুযোগ যেচে গ্রহণ করে, যদি কোনোদিন কিছু সুবিধা মেলে এই আশায়। এ সব আত্মীয়দের সঙ্গে আলাপ করার একটা ঝোঁক আছে মায়ার। কথা বললেই যারা কৃতার্থ হয়ে যায়, তাদের সঙ্গে কথা বলে সে একটা বিশেষ ধরনের সুখ পায়।

বলেছিল, আত্মীয়স্বজনের শাখা-প্রশাখা এত বেড়েছে, সবার সঙ্গে চেনা থাকাই দায়। আমি ওই ওনার মেয়ে।

সে ভূদেবের মেয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট। আর কিছু বলার দরকার আছে কি ?

নন্দ বলে, আমি আপনাকে চিনি। শুভর সঙ্গে অনেকবার আপনাকে বারতলায় যেতে আসতে দেখেছি। গাঁয়ের রাস্তায় হেঁটে বেড়াতেও দেখেছি। শুভর কাছে অনেক শুনেছি আপনার কথা।

মায়া ভড়কে গিয়ে বলে, সে কী ? তবু আপনাকে চিনতে পারছি না ?

নন্দ নিজের পরিচয় দেয়। আত্মীয় নয়, সে শুভময়ের স্কুলের ক্লাসফ্রেন্ড।

মায়া সংশয়ভরে বলে, শুভর ফ্রেন্ডদের মধ্যে আপনাকে তো—

নন্দ বলে, সে রকম ফ্রেন্ড নই। স্কুলে ক-বছর একসঙ্গে পড়েছিলাম। তারপর মাঝে মধ্যে দেখা হয়েছে এইমাত্র। গত এক বছরে তিন চারখানা চিঠি লিখেছে আমায়। পরশু হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম, জানিয়েছে আজ এই প্লেনে এসে পৌঁছবে। ভাবলাম আমি হাজির থাকি এটা বোধ হয় চায়, নইলে মিছিমিছি আমায় টেলিগ্রাম করবে কেন ? না কি বলেন ?

বুঝেছি। ভালো কোনো কাজের প্ল্যান ভাঁজছে। আপনাকে দরকার হবে। শুভ চিরকাল এইরকম। নইলে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয় না ? আপনার নাম আমায় বলে না ? অথচ যে প্ল্যান ভেঁজে আসছে তাতে আপনাকে দরকার হবে।

কীসের প্ল্যান ?

তা কী করে জানব ? দেশের গরিবদের বড়োলোক করার কোনো একটা প্ল্যান হবে !

মায়ার বয়স অনুমান করা অসাধ্য। বয়স গোপন করার চেষ্টা সে করেনি আর দশজন যেমন করে তার চেয়ে বেশি রকম, তার চেহারাটাই ওই ধরনের। নন্দ কয়েকবার তাকে ভালোভাবে নজর করে দেখে চোখের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। রূপলাবণ্য যা আছে তা যে কোনো মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট। তবে তার রূপলাবণ্য যেন একটু আলাদা ধরনের অর্থাৎ যে জন্য রূপলাবণ্য সমাজের সব শ্রেণিতে মেয়েদের বিশেষ গুণ বলে গণ্য হয়েছে ঠিক সে রকম নয়। একবার দেখে আরেকবার দেখার কৌতূহল জাগে অসীম, আর কোনো সাড়াই যেন জাগে না।

আশ্চর্য সুন্দর সাবলীল সুললিত গড়ন। চুপ করে দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত যেন নৃত্যছন্দে দোলায়িত। জগদীশের ছোটো মেয়ে লজ্জা জর্জেট পরা ভাগনে-বউ প্রীতিলতাকে তার পাশে একটু মোটাই মনে হয়। অথচ তাদের দুজনের গায়ে একফোঁটা বাড়তি মেদমাংস আছে কিনা সন্দেহ।

ভাগনে ফণীন্দ্র সকলের দেখাশোনা করছিল। যেখানেই যাক এটা তার বাঁধা দায়িত্ব। স্যুটপরা হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি নিজে খেতে, আর পাঁচজনকে খাওয়াতে, বড়ো ভালোবাসে।

অবশ্য বড়োলোক আত্মীয়বন্ধুর খরচে !

সে মায়াকে বলে, ছোটোমাসি কিছু খাবে ?

প্লেনের কি দেরি আছে ?

এই কিছুক্ষণ।

তবে শুভ মাটিতে নামুক, একসাথে হবেখন।

শুভমযকে দেখলেই বোঝা যায় যে সে অসুস্থ অথবা সদ্য রোগে ভুগে উঠেছে—কিংবা অস্বাভাবিক রকম শ্রান্ত। জগদীশেব ব্যাকুল প্রশ্নের জবাবে সে বলে, না না, শরীব ভালোই আছে আমার। তোমরা সবাই কেমন আছ খবর বলো।

আত্মীয়স্বজন গ্রাহ্যেব মধ্যেও আনে না তার জবাব। পুরুষের গলায় শোনা যায সে সত্যি বড়ো কাহিল হযে গেছে বলে আপশোশ, মেয়েলি গলায় শোনা যায় শুধু রাস্তাব কষ্টে কী করে সে এত বেশি কাবু হয়ে পড়তে পারে এই বিস্ময়সূচক প্রশ্নটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উচ্চাবণ করাব প্রতিযোগিতা। একটা লাগসই জবাব না দিয়ে শুভর রেহাই নেই। সত্যই তো, সুখের স্বর্গ বিলেত, সেখানে গিয়ে হৃষ্টপুষ্ট হাসিখুশি হয়ে আসার বদলে রোগা হয়ে ম্লান বিমর্যমুখে শুভ দেশের মাটিতে পা দেয় কোন যুক্তিতে ?

শুভ আচমকা চটে যায়, সেটাও আরেক ভাবে প্রমাণ দেয় যে বিদেশে ছেলেটা স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করে এসেছে। শুধু দেহের নয়, হয়তো বা মনেবও স্বাস্থ্য !

কী সর্বনাশের কথা !

শুভ চেঁচিয়ে বলে, বলছি আমার কিছু হয়নি, তোমবা এমন কিচিবমিচির করছ কেন ? তোমবা গায়েব জোরে আমাকে রোগী বানাবে নাকি ?

সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়।

এতদিন পরে ফিরে এসেছে, সকলে স্নেহ জানাবে শারীবিক-মানসিক কুশল সম্পর্কে নানাবকম উদ্‌বেগ প্রকাশের মারফত—খুশি হওয়ার বদলে এ দেখছি বেগে যায় ! জগদীশ ভয় উদ্‌বেগ ও ভর্ৎসনা মেশানো দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

শুভ চেঁচিয়ে বলে, আমি ঠিক আছি, আমার কিছু হযনি। মনটা শুধু একটু খাবাপ হযে গেছে। কত কী ভেবেছিলাম, এখন বুঝতেই পারছি না কী রকম স্বাধীন দেশে এলাম।

সর্বনাশ ! এতকাল পরে দেশে পা দিতে না দিতে দেশেব হালচাল ভালো কবে বুঝবার আগেই দেশের জন্য মন খারাপ ! দেশের অবস্থা ভালো করে জানবার পর তার মনের অবস্থা কী দাঁড়াবে ?

ভূদেবের তুলনায় পাশ না করা ডাক্তার নন্দকে হাতুড়ে বলা যায়। কিন্তু ভূদেব শুধুই ডাক্তার, সে তাই ধরতে পারে না শুভর এ রকম অভদ্রভাবে মেজাজ বিগড়ে যাবার কারণ কী। নন্দ কি না বন্ধু, সে বুঝতে পারে। আর মজা দেখা উচিত নয় ভেবে নন্দ সামনে এগিয়ে বলে. চায়ের ব্যবস্থা রেডি আছে শুনছিলাম ? শুভ যখন পৌঁছেই গেছে, দেরি করে লাভ কি ?

শুভর দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলে, পেট যতক্ষণ খারাপ না হচ্ছে, হাজার মন খারাপ হলেও কিছু আসে যায় না।

নন্দ এসেছ ? ভালো হয়েছে, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে অনেক।

তার যেন ধৈর্য ধরছে না। চায়ের টেবিলে সে নন্দকে পাশে বসায, তার দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় বলে, সবাই বলছে শরীর খারাপ। আসলে আমি একেবারে ভড়কে গেছি ভাই। আকাশ থেকে একেবারে পাতালে আছড়ে পড়েছি। এরা কেউ বুঝবে না। তুমি যদি বুঝতে পার।

খুলে বলো। কেন বুঝব না ?

কটা প্ল্যান ঠিক করে এসেছিলাম। এসেই কাজ আরম্ভ করে দেব। আরও বছর খানেক থাকা দরকার ছিল, কিন্তু প্রাণ মানল না।

আস্তে চুমুক দাও। জিভ পুড়িয়ে লাভ কী ?

দিনরাত শুধু এই চিন্তা করতাম। প্ল্যানগুলো পারফেক্ট করতাম। দেশে ফিরেই কাজ আরম্ভ করব। পরশু বোম্বায়ে নামামাত্র টের পেলাম আমার সমস্ত প্ল্যান বাজে, আমি শুধু মনগড়া খেলা খেলেছি নিজের সঙ্গে। কী শক্ যে পেয়েছি কী বলব তোমাকে। আমি ভাবুক না বৈজ্ঞানিক ? যে

কাজে গেলাম সেটা হল না, সস্তা একটা ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলাম। দেশে পা দেবার আগে টেরও পাইনি আমার প্ল্যানগুলি সব আজগুবি।

নন্দ শান্তভাবে বলে, এত মুষড়ে যাচ্ছ কেন ? আমার তো মনে হয় তুমি ঠিক প্ল্যান করনি, স্বাধীনতার আনন্দে মশগুল হয়ে ভাবছিলে এবার দেশটাব কী হওয়া উচিত, কী ভাবে হওয়া উচিত।

ওটাই তো আহাম্মকেব দিবাস্বপ্ন।

গরিব যদি ভাবে তারও বাড়ি-গাড়ি থাকা উচিত, সুখাদ্য পাওয়া উচিত সেটা কি দিবাস্বপ্ন ? তোমার প্ল্যানের সব কথা পরে শোনা যাবে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না তুমি একেবারে উদ্ভট অসম্ভব প্ল্যান ভেঁজেছিলে। অন্য অবস্থায় হয়তো প্ল্যানগুলি খাটত। তুমি বৈজ্ঞানিক বলেই দেশে পা দেওয়া মাত্র টের পেয়েছ তুমি যা ভেবেছিলে এখনকার অবস্থায় ও সব করা যাবে না। মন খারাপ করার বদলে নিজেকে তোমার বরং তারিফ করা উচিত।

এতক্ষণে শুভর মুখে হাসি দেখা যায়।—নাঃ, নন্দ আমাদের তেমনি আছে, মন বুঝে কথা কইতে ওস্তাদ।

কিন্তু সে হাসি লক্ষ করে কেউ খুশি হয় না। সকলকে অগ্রাহ্য করে কেবল বাল্যবন্ধুর সঙ্গেই কি সে হাসিগল্প চালিয়ে যাবে ? গেঁয়ো একটা ডাক্তারের সঙ্গে ?

শুভময় হাসে কিন্তু বোঝা যায় মনের দুঃখ সে ভুলতে পারছে না। পাঁচজনের সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা কবার মতো সজীব হতে পারছে না।

জীবন সাগ্রহে তাকে প্রশ্ন কবে, ওখানকার অবস্থা কী রকম দেখে এলে বাবা ? ভারতবর্ষ হারিয়ে নিশ্চয় খুব দুরবস্থা ?

বলব, সব বলব।

তার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে শুভ নন্দকে বলে, শুধু বাজে প্ল্যান করেছিলাম বলেই নয়। দেশে এসে দেখছি আমি কী করব তাই জানি না। আমার কিছুই করার নেই।

শুভময়ের খেদও ফুরায় না, নন্দকে সে ছাড়তেও চায় না। আর কারও সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ বা উৎসাহ তার নেই। গায়ে পড়ে কেউ আলাপ জমাবার চেষ্টা করলে যেমন তেমন একটা জবাব দিয়ে তার মান রেখে আবার সে নন্দর সঙ্গে কথায় মেতে যায়।

ক্ষোভে ও অপমানে কালো হয়ে যায় আত্মীয়বন্ধুর মুখ।

চা খাওয়া শেষ হতেই ভূদেবের স্ত্রী বলে, চলো আমরা যাই। শুভ খুব ব্যস্ত, ওর কথা কওয়ার সময় নেই।

নন্দ শুভকে বলে, সবার সাথে আলাপ করো। এ সব কথা হবেখন।

তখন ব্যাপারটা খেয়াল করে নিজে উদ্যোগী হয়ে শুভ সকলের মুখের কালিমা দূর করে। কথা বলে মানুষের মন ভুলাতে সে চিরদিনই পটু। অকারণে নিজেকে বেশি জাহির না করে যে যেমন তার সঙ্গে তেমনিভাবে কথা বলা—কথা বলার এই অতি সহজ আর্টটিও কত মানুষের আয়ত্ত হয় না কিছুতেই !

জগদীশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তার ভয় হচ্ছিল বিদেশে মাথাই বুঝি বিগড়ে গেছে ছেলের।

নন্দকে সে ভালো করেই চেনে। যদিও সেটা দেখা হলে কথা বলে ভদ্রতা রাখার চেনা নয়। এখানে বিশিষ্ট আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে কামার জাতের গেঁয়ো ডাক্তারটিকে দেখে সে মোটেই খুশি হতে পারেনি।

সকলকে অবহেলা করে শুভকে কেবল তার সঙ্গে কথা কইতে দেখে রাগে এতক্ষণ গা তার জ্বলে যাচ্ছিল।

এবার ভেবেচিন্তে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে উদারভাবে বলে, আজ রাত্রে তুমি আমার ওখানে খাবে।

নন্দ একটু বিব্রতভাবে বলে, আত্মীয়স্বজনকে যদি শুধু বলে থাকেন—

জগদীশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

না, ওখানকার কিছু লোককে বলব ভাবছি। পরে শহরে এসে একদিন আত্মীয়স্বজনকে খাইয়ে দেব।

জগদীশের মতে কয়েকদিন শহরে থেকে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু শুভ আগেই লিখে জানিয়ে রেখেছে যে এরোড্রোম থেকে সে সোজা বারতলা চলে যাবে, সেই ব্যবস্থাই যেন করা হয়।

সকলের সঙ্গে কথা বলে সকলকে খুশি করে শুভ ঘোষণা করে, গ্রামের জন্য মনটা ছটফট করছে, আজ তাই চললাম। কয়েক দিনের মধ্যে আসব, আপনাদের সঙ্গে দেখা করব।

শহরের আত্মীয়বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে তারা গাড়িতে ওঠে। মায়া তার সঙ্গে বারতলায় যাবে।

জীবনকে ভূদেব তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবে। জীবন শুভকে আরও একবার বলে, কদিন বাদেই আসছি বাবা। দু-চারদিন থাকব।

বেশ তো, আসবেন, সুখের কথা !

দূর থেকে জনা লেভেল ক্রসিংয়ে ভিড় দেখে জগদীশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এ জমায়েত নিশ্চয় তার ছেলেকে অভিনন্দন জানাবার জন্য ! খবরটা সে যতদূর সম্ভব ছড়িয়েছে, অনুগত সকলের কাছে এক রকম মুখ ফুটে প্রকাশও করেছে যে এ রকম একটা কিছু অভ্যর্থনার অয়োজন করলে সে সুখী বই অসুখী হবে না !

গ্রামে না করে এত দূর এগিয়ে লেভেল ক্রসিংয়ে এসে সবাই দাঁড়িয়েছে এটা আরও আনন্দের ব্যাপার।

দেখা যায় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শুভর মুখ।

কাছে গিয়ে দেখা গেল, ভিড় অন্য কারণে। একটি ছেলে ট্রেনে কাটা পড়েছে কিছুক্ষণ আগে। ভুলা বাগ্‌দির ছেলে বলাই।

গাড়িটা থামানো যায়নি। বারতলা স্টেশনেও এ ট্রেনটা দাঁড়ায় না। ছেলের মৃতদেহের পাশে কোমরে হাত রেখে গাড়িটা যেদিক অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই দিকে মুখ করে সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ভুলা চিৎকার করে অভিশাপ ও গালাগালি দিয়ে চলেছে।

নন্দ বলে, আমি এখানে নামব।

শুভ বলে, আমিও নামব। এ কী অ্যাবসার্ড ব্যাপার ! একটা মানুষ কাটা পড়ল, গাড়িটা দাঁড়াল না পর্যন্ত ! এর ব্যবস্থা করতেই হবে।

জগদীশ বলে, দাঁড়াও আমি দেখছি ! গদা, ছুটে গিয়ে স্টেশন মাস্টারকে ডেকে আন তো— বলিস আমি ডাকছি।

কে জানত বলাই এত ভাগ্য করেছিল যে স্বয়ং জগদীশেরা বাপ-ব্যাটায় তার ছেলে ট্রেনে কাটা পড়ার পরবর্তী ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। গালাগালি বন্ধ করে ভুলা মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে—জগদীশের সামনে তার হাত দুটি আপনা থেকে জোড় বেঁধে গেছে।

তার বা হাতের একটি আঙুল কাটা। অনেকদিনের কথা, বারো-চোদ্দোবছরের কম নয়, জগদীশের সামনে তারই হুকুমে আঙুলটা কেটে ভুলাকে এক গুরুতর অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ঘরের চাল সারাই করতে করতে শুভর দুর্বুদ্ধির জন্য পড়ে গিয়ে সে শুভকে চড় মেরে বসেছিল, একেবারে টুকটুকে ফরসা গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে।

ভুলা আর চাষি বাগ্‌দিরা ছাড়া সকলেই ঘটনাটা ভুলে গেছে। শুভ তাই তার সঙ্গে দু-চারটা কথা বলতে বলতে অনায়াসে জিজ্ঞাসা করে বসে, তোমার আঙুলটা কাটা গেল কী করে ?

আজ্ঞে দুগ্‌ঘটনায়।

ভুলা ফ্যাল ফ্যাল করে শুভর ফরসা মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার গালে আঙুলের দাগ খুঁজবার জন্য নয়। শুভর গালের আঙুলের দাগ কবে মিলিয়ে গেছে কিন্তু তার কাটা আঙুল আর জোড়া লাগল না ভেবে আপশোশ করার জন্যও নয়।

হাঙ্গামা চুকিয়ে ফেরার পথে নন্দ মাঝের গাঁয়ের কাছে নেমে যায়। বারতলা পর্যন্ত সঙ্গে গেলে সে দেখতে পেত শুভকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য জগদীশের বাড়ির কাছে লোক মন্দ জমেনি।

এবং সকলেই তারা অনুগত অনুগ্রহপ্রার্থী নয় !

আশেপাশের গ্রামের লোক ভেঙে পড়লেই জগদীশ খুশি হত। তবু এত লোক যে জমেছে, শাঁখ বাজিয়ে শুভর গলায় মালা পরিয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করছে সেটা মন্দের ভালো বলতে হবে।

মায়া উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, গ্রামের লোক তো তোমায় খাতির করে খুব।

শুভ মাথা নাড়ে।

খাতির ? মজা দেখতে ভিড় করেছে।

সব লোক মিলেমিশে একাকার হয়ে ভিড়টা জমালে সে এটা ধরতেও পারত না। কিন্তু ফুলের মালা-টালা নিয়ে দপ্তরের কর্মচারী, বাড়ির লোক আর গাঁয়ের কিছু অনুগত লোক মিলে করেছে ছোটো একটা ভিড়, খানিকটা তফাত বজায় রেখে অন্য লোকেরা এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

অভিনন্দন পর্বের অংশীদার নয়। তারা শুধু দর্শক।

নিজেদের লোক আর অনুগতেরা হইচই করে আগে "মা না হলে এরা হয়তো দর্শক হিসাবেও এসে দাঁড়াত না।

এ ব্যাপার শুভ জানে। স্বাধীনতার জন্য যখন প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছে, দেশের প্রাণের মানুষেরা হাজারে হাজারে জেলে গিয়েছে, কলকাতার রাজপথে লাটবেলাটকে গাড়ি চেপে যেতে দেখতে, তখনও পথের দুদিকে মানুষ ভিড় করেছে।

সম্মান জানাতে নয়, শুধু দেখতে। লাটবেলাট এসে পড়বার অনেক আগে থেকে সে পথে আরম্ভ হয় নানারকম পুলিশের গাড়ির ছুটোছুটি ব্যস্ততা—লোকে ভাবে, কে আসছে, ব্যাপার কী, একটু দেখাই যাক দাঁড়িয়ে !

দিন কয়েক শুভ যেন নন্দকে আঁকড়ে থাকে।

সকালবেলাই মাঝের গাঁয়ে হাজির হয়। নন্দকে বলে, চা খাবার সব খেয়ে এসেছি, আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। নিজের কাজ ঠিকমতো করে যাও। আমার দিনরাত ছুটি, তোমার বাড়তি টাইমে আমার সঙ্গে কথা বললেই ঢের হবে।

নারাণ কর্মকারের পৈতৃক ভিটা জীর্ণ কুঁড়ে ক-খানার গা ঘেঁষে বারান্দাওলা নতুন একখানা কাঁচাঘর তুলে নন্দ ডিসপেনসারি দিয়েছে। ওষুধের আলমারিটার মাথায় একটি গণেশের মূর্তি, পিছনের দেয়ালে কালীর পট। একটি লোহার চেয়ার এবং বাড়িতে মিস্ত্রি এনে তৈরি করা দুখানা

কাঁঠাল কাঠের টেবিল,—একটি টেবিলে সে প্রেসক্রিপশন লেখে এবং অন্য টেবিলটিতে নিজেই সেই প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ বানায়। এ ছাড়া ঘরে আসবাব আছে পাটি বিছানো একটি তক্তাপোশ ও একখানা বেঞ্চি।

চাষাভূষা রোগী এবং ওষুধ ও পরামর্শপ্রার্থী মেঝেতে উবু হয়ে বসে। একটু যারা ভদ্র, অন্তত একটা ফতুয়া গায়ে দিয়ে কিংবা কাঁধে বিশ বছরের প্রাচীন ও পোকায় কাটা হলেও কোনোরকম একটা চাদর ফেলে আসে, তারা বসে তক্তাপোশে কিংবা বেঞ্চিটাতে।

শুভ এসে সকাল থেকে বেঞ্চি বা তক্তাপোশে জাঁকিয়ে বসে থাকা আরম্ভ করার পর এদের বেশির ভাগ অবশ্য দাঁড়িয়েই থাকে—সাহস করে বসে কেবল ব্রাহ্মণ গুরুজন স্থানীয় দু-একজন। নন্দর ডাক্তারি পেশায় কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাতে না চেয়েও শুধু উপস্থিত থাকার জন্যই শুভ নানা গোলমাল সৃষ্টি করে। মনে যার যাই থাক, জগদীশের মতো ডাকসাইটে মস্ত জমিদারের বিলাত ফেরত ছেলের অস্তিত্ব উপেক্ষা করার অবাস্তব কল্পনাকে কেউ প্রশ্রয় দেয় না।

দু-একজন দেয়। যেমন তালতলার সাঁতরাদের মেজো ছেলে হরিপদ। সম্প্রতি তার বিয়ে হয়েছে এবং সেদিন রাত্রে তারই বিয়ের বিছানা পেতে জীবনকে শুতে দেওয়া হয়েছিল। সবাই জানে বিয়েটা তার বাপভায়েরা এক রকম গায়ের জোরে দিয়েছে,—বারতলা স্টেশনটা উড়িয়ে দেবার জন্য বাড়িতে সে কলেরাপটাশের পটকা-বোমা তৈরি করতে মেতে গিয়েছিল। অ্যাটম বোমার যুগেও সে ভুঁইপটকা দিয়ে রেল স্টেশন উড়িয়ে দিয়ে জগতে কীর্তি রেখে যাবার স্বপ্ন দ্যাখে।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে সে ডিসপেনসারিতে আসে, শুভকে দেখে মুখ বাঁকায়, সিগারেট জোরে টান দিয়ে এমন ভাবে ধোঁয়া ছাড়ে যেন শুভর মুখের উপর ছেড়ে দিতে পারলেই খুশি হত। শুভর কাছেই ধপাস করে বসে। তীক্ষ্ণ বেপরোয়া সুরে বলে, পেটের ব্যথাটা কাল বেড়েছিল নন্দদা !

পেটে কী হয়েছে ভাই ?

শুভ তার গায়ে পড়া বেয়াদপি গায়ে মাখে না। সহজ ভাবেই প্রশ্নটা করে।

আপনাদের ভেজাল খেয়ে যা হয়—আলসার।

মুখ তুলে নির্বিকার দুঃসাহসের ভঙ্গিতে সে চেয়ে থাকে। পেটে আলসার হয়েছে—পেটে আলসার আর বুকে থাইসিস না হয়ে কী রেহাই আছে এই দুর্ভাগা দেশের যুবজনের—হয়েছে হোক ! আমি কি মরতে ডরাই ? এ তো তুচ্ছ আলসার !

আবার যেমন প্রৌঢ়বয়সি শশাঙ্ক। খালি পায়ে খালি গায়ে আটহাতি একটি ধুতি পরে কাঁধে একটি তেলচিটে রোঁয়া ওঠা শতজীর্ণ রেশমের পাকানো চাদর-মোটা দড়ির মতো ঝুলিয়ে এ দেশের একমাত্র স্বাধীনতা পাওয়া ব্যক্তির মতো ডিসপেনসারিতে ঢোকে, জগতের সমস্ত অশুভের সঙ্গে শুভময়ের মতো বিলাত-ফেরত জমিদার বাচ্চাকে পর্যন্ত মন্ত্রের জোরে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে : শুভমস্তু !

শুভর গা ঘেঁষে বসে বলে, সিগারেট হবে নাকি একটা ?

সমস্তই ভগবানের লীলাখেলা, নন্দ ডাক্তারের খড়ের ঘরের ডিসপেনসারিতেও মানুষকে আশ্রয় করে তার প্রকাশ—দীনহীন দরিদ্র ভিখারি ব্রাহ্মণ যেন এর মজাটা টের পেয়ে গিয়েছে ! কেঁচোর মতো নরম অসহায় কৃপাপ্রার্থী সেজে থেকে কিছুই হয় না, তবে আর মিছে কেন পরোয়া করা ! বরং আমি সবার সেরা সবার প্রণম্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ—এ ভাব দেখালে তবু একটু খাতির জোটে মৌখিক !

শুভই যেন খানিকটা অনুগত কৃপাপ্রার্থীর মতো নিজেকে এখানে টিকিয়ে রাখে। দেশের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবটা সে অনুভব করছে তীব্রভাবে। নন্দর মারফত সেটা খানিক পূরণ হবার আশা সে রাখে।

কী দিয়ে কী ভাবে সেটা হবে তা কিন্তু সে জানে না। কী যোগাযোগ সে চায় দেশের সঙ্গে সেটাই সে জানে না—সুতরাং কী ভাবে সেটা ঘটবে তা জানাও সম্ভব নয়।

নন্দ দেশের কথা বলবে ? নতুন কথা কী তাকে জানাবার আছে নন্দর—তথ্য বরং সে বেশিই রাখে নন্দর চেয়ে। মানুষগুলিকে চিনবে ঘনিষ্ঠতা দিয়ে ? মানুষগুলি তার অচেনা নয়—তাদের আর্থিক সামাজিক শারীরিক ও মানসিক ইত্যাদি সকল দিকের পরিচয় সে ভালোভাবেই রাখে।

ইতিমধ্যে দেশে কী ঘটেছে না ঘটেছে তাও তার অজানা নয় কিছুই।

শুধু স্থানীয় অবস্থা ও ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ কিছু নন্দ তাকে দিতে পারে, এখানকার সাধারণ মানুষের সাম্প্রতিক মনের গতিটা কোনদিকে খানিক জানাতে পারে।

কিন্তু সেটা জানা কি প্রয়োজন শুভময়ের ?

তার শুধু দেশের শিল্প বাড়াবার চিন্তা। অভিনব এক পরিকল্পনা গড়ে তুলে প্রাণ ভরা উৎসাহ নিয়ে সে দেশে উড়ে এসেছে, দেশে পা দিতেই অবাস্তব বলে নিজের কাছেই বাতিল হয়ে গেছে পরিকল্পনাটা। এখন তার প্রয়োজন নতুন একটা সম্ভবপর বাস্তব পরিকল্পনা। কিন্তু এ বিষয়ে নন্দর কাছে সে কি সাহায্য পেতে পারে ?

নন্দ তার অনেক কথা বুঝতেই পারে না। সে বলে যে শিল্প নয়—সে গড়তে চায় শিল্প আন্দোলন। শিল্প সম্পর্কে কী আন্দোলন ? জাতীয় শিল্প গঠন ও সংরক্ষণ ? মূল শিল্প জাতীয়করণ ? এ সব তো দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেই আছে !

কিন্তু না, শুভময় তা বলেনি।

সে আবার তার বাতিল করা পরিকল্পনার কথা বলে। পরিকল্পনাটা বাতিল হয়ে যায়নি—ও বিষয়ে একটা ধারণা করে না নিলে সে নতুন কী পথ খুঁজছে বোঝা অসম্ভব। নন্দর মুশকিল হয়েছে এই যে শুভ কী ভেবেছিল সব শুনেও সে ভাবনার আসল মর্মটি সে আয়ত্ত করতে পারে না।

শিল্পে পিছানো দেশ। বহুকালের পরাধীন দেশ। এশিয়া নামক বিশেষ অবস্থা ও অবস্থানের মহাদেশটির অন্তর্গত দেশ। শিল্প কম, চাষ বেশি,—দরিদ্র অন্নহীন কর্মহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিরাট জনশক্তি। এখান থেকে শুভ যখন শুরু করে সব জলের মতো পরিষ্কার লাগে। তারপর শুভ যখন আসে শিল্পোন্নতির ধরাবাঁধা পথের বদলে দেশের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিশেষ প্রাথমিক ব্যবস্থার প্রয়োজনের কথায়, তখনও নানাপ্রশ্ন মনে এলেও কথাটা মোটামুটি বোঝা যায়।

কিন্তু ওই বিশেষ ব্যবস্থার মানে সে যখন বোঝাতে চায়, শিল্প প্রচেষ্টাগত বিশেষ ব্যবস্থা—ইওরোপ আমেরিকার অগ্রসর যন্ত্রশিল্পের বদলে এ দেশের উপযোগী ব্যাপক প্রাথমিক শিল্প প্রচেষ্টা, যাতে যন্ত্রশক্তি প্রধান নয়, প্রধান হল জনশক্তি—তখন সব গুলিয়ে যায় নন্দর !

কুটিরশিল্প নয়। না, সেটাই ছিল শুভর বাতিল করা পরিকল্পনা। বড়ো শিল্প যখন গড়া যাবে না, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কবলে সব বড়ো শিল্প কিন্তু তাও সামান্য—তখন তার বিরুদ্ধে সংগঠিত কুটিরশিল্প গড়ে তোলা, বিরাট কারখানার মতো সংঘবদ্ধ কুটিরশিল্প। টাটার কারখানা আছে থাক—লাখ লাখ কামার যে ছাড়াছাড়া ভাবে টিনের নীচে হোগলার নীচে ঠুকঠুক হাতুড়ি ঠুকছে, তাদের একত্র করে বিশাল কামারশালা সৃষ্টি করা। শুধু অপচয় বন্ধ হবে না—শিল্পপ্রধান দেশে আধুনিক ধরনের বিরাট কারখানার মতো এই সব সংঘবদ্ধ কামারশালা তাঁতশালার মধ্যে খাটুয়েরা সংঘবদ্ধ হবে।

শুভ তীব্র জ্বালাভরা হাসি হাসে,—বোম্বায়ে কাপড়ের কলগুলি দেখে স্বপ্ন ভেঙে গেল শুভর। এত বিজ্ঞানচর্চা করেও গান্ধীজির চরকা আর খদ্দরের স্বপ্ন এখনও এমন ভোল বদলে মাথায় আসে ! এ দেশে কাপড়ের মিল গড়ার জন্যেই তো চরকার আন্দোলন। কারখানা গড়ার জন্য খানিক সুযোগ ও স্বাধীনতা আদায়ের উদ্দেশে সংঘবদ্ধ কামারশালা গড়ার আন্দোলন হয়তো একদিন চলত, সে দিনকালও আর নেই।

তোমার মনে হয়নি এ রকম কামারশালার মানে হয় না ? দু-চারজন দা কুড়ুল কাস্তে এ সব বানায়, আশেপাশে বেচে পেট চালায়—আশেপাশের লোক লাঙলের ফলাটলা সারাই করতে আসে। তোমার ওই কামারশালায় এক জায়গায় সব তৈরি করলে চালান দিতে হবে—তার মানেই কারখানা দাঁড়িয়ে গেল। তাছাড়া চাষবাসের যন্ত্রপাতি সারাতে চাষি কি দুশো মাইল হেঁটে তোমার কামারশালায় পাড়ি দেবে ?

শুভ বিরক্ত হয়ে বলে, আমি কী ছেলেমানুষ, এ সব ভাবব না ? আমার আসল কথাটাই তুমি ধরতে পারছ না। আমি কি সারাদেশের কুটিরশিল্প কুড়িয়ে এনে এক জায়গায় করার কথা ভাবছিলাম ? চারিদিকে এ সব যতটা দরকার ছড়িয়ে আছে এবং থাকবেও। আমি বলছিলাম বাড়তি যে ম্যান পাওয়ার স্রেফ অপচয় হয়ে যাচ্ছে সেটাকে এই রকম প্রাথমিক শিল্প প্রচেষ্টায় সংঘবদ্ধ করা, কাজে লাগানো। বড়ো বড়ো মডার্ন কারখানা না গড়লে এই লাখ লাখ লোকের বেকারত্ব ঘুচবে না, আমার মতে এটা ভুল ধারণা। এটা হচ্ছে পরের স্টেজ। মডার্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে মডার্ন ইন্ডাস্ট্রি আমরা যখন এখনই বাড়াতে পারছি না—কুটিরশিল্পের স্টেজের প্রাথমিক ইন্ডাস্ট্রি আমরা গড়তে পারি। ইওরোপ আমেরিকায় এটা হয় না, এ দেশে সম্ভব।

কী করে ?

তাই তো ভাবছি ! সেই জন্যই তো তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা।

নন্দ চিন্তিতভাবে বলে, তুমি পণ্ডিত হয়েছ পদার্থবিজ্ঞানে, আমি শিখেছি খানিকটা ডাক্তারি বিদ্যা। আমার মনে হয়, ভালো করে ইকনমি না পড়ে পলিটিক্স না ঘেঁটে আমরা দুজনে পরামর্শ করে কিছু ঠিক করতে পারব না। মার্কসবাদও ভালো করে জানা দরকার।

শুভ জোর দিয়ে বলে, কিছু কিছু সবই আমি পড়েছি। পুঁথির বিদ্যা দিয়ে কিছু হবে না। সায়ান্স আমাকে এটা শিখিয়েছে। বাস্তব অবস্থা জেনে বুঝে কাজ করতে হবে।

নন্দ বলে, কিন্তু বাস্তব অবস্থা জানবার বুঝবার জন্যই তো বিদ্যা দরকার। কীসে কী হয়, কেন হয়, না জানলে চলবে কেন ? একটা আন্দোলন গড়তে হলে নিজেকে সব বুঝতে হবে, দশজনকে বুঝিয়ে দিতে হবে—

শুভ এবার বিরক্ত হয়ে বলে, আমার আসল কথাটা তুমি ধরছ না, অনেক কিছু সাপোজ করে নিচ্ছ। আমি কি ও রকম আন্দোলনের কথা বলছি ? আমি যা করব নিজে করব, নিজের জন্য করব—নতুন রকম কিছু। আমার সাক্সেস দেখে দশজনে আমায় ফলো করবে। একেই আমি বলছি ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন একটা আন্দোলন সৃষ্টি করা। এ দেশের বিশেষ অবস্থায় যেটা উপযোগী হবে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বুঝতে পারছ কথাটা ? কোনো কাজে আমাকে লাগতে হবেই। বাপের জমিদারি আছে বলে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারব না। আমার চাকরি করার মানে হয় না। ওটা শুধু কাজ করা হবে—কোনো পজিটিভ রেজাল্ট নেই। কোনো ল্যাবরেটরিতে গিয়ে কিংবা নিজে ল্যাবরেটরি দিয়ে রিসার্চ করতে পারি—

তাই কর না ?

কিন্তু লাভ কী ? জগতে রিসার্চ কম হয়নি, আবিষ্কারও কম হয়নি। তার কতটুকু কাজে লাগছে এ দেশে ? রিসার্চ করে আমি সায়ান্সকে এগিয়ে নিতে পারি, কিন্তু আমার দেশ কি তাতে এগোবে ? সায়ান্স যেখানে এগিয়েছে, দেশটা অন্তত তার খানিকটা নাগাল ধরুক।

এলোমেলোভাবে রোগী ও রোগিনীরা আসে যায়, তাদের আত্মীয়বন্ধু আসে যায়—অকারণে মানুষ ডাক দিয়ে দু-দণ্ড আড্ডা মেরে যায়। বেকার মানুষ। পেটের জন্যেও আয় করার উপায়হীন মানুষ। তা, ও রকম মানুষ অসংখ্য আছে দেশে। অনেকের আছে বছরে কিছুদিনের কাজ—বাকিটা কর্মহীন সময়ের বোঝা বয়ে বেড়ানো জীবন। নন্দ ভাবে, এটা না শোষিতের দেশ ? জীবিতের খাটুনি

আর সময়রূপ জীবনটাই তো শোষণের আসল সামগ্রী ? এত মানুষ প্রাণপাত করে খেটে শোষিত হবার জন্য সারা দেশে চরে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের ভালো রকম শোষণ করার চেষ্টা নেই,—এ কী রকম শোষণ ব্যবস্থা ?

কিন্তু শুভময়েব মনেব কথাটা সে ধরতে পারে না !

সে রোগী দেখতে যায়। ফিবতে মোটামুটি কতক্ষণ লাগবে জেনে নিয়ে শুভ চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে।

রাস্তার ধারে একখণ্ড ফাঁকা পরিষ্কার জমিতে সে গাড়ি রেখেছিল। নন্দর বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি যাওয়ার রাস্তা নেই। মাঝের গাঁয়েব দিকে ঢুকে এসেছে কাঁচা শাখা রাস্তাটি—এখানে বেশ নির্জন। তার ওপর ফাঁকা জায়গাটুকুর তিন দিক গাছপালায় ঢাকা।

ইতিমধ্যে গাড়ির দুটি টায়ার ও কিছু আলগা পার্টস চুরি হয়ে গিয়েছে।

লক্ষ্মী এগিয়ে এসে বলে, দুজন কী ঠুকঠাক করছিল, আমায় দেখে ছুটে পালিয়ে গেল।

চেনো ?

না কী করে চিনব ?

গাঁয়ের লোককে চেনো না ?

গাঁয়ের লোক নয়। কিন্তু কিছু তো নিয়ে যেতে দেখলাম না। চাকা দুটো দেখা যেত !

তাহলে অন্য লোক আগে নিয়েছে—এরা দুজন কিছু বাগাতে পারেনি। কী আশ্চর্য ব্যাপার, গাঁযেও মোটর পার্টস চুরি যায় ! খুলল কী করে ?

তার ভাব দেখে লক্ষ্মী সশব্দে হেসে ওঠে, আপনারা গাঁ বলতে কী বোঝেন ! গাঁয়ে শুধু হাবাগোবা চাষি ভূত থাকে, মোটর দেখলে দশ হাত তফাত থেকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে ? কত রকমের কত লোক এদিক ওদিক যাতায়াত করছে তার ঠিক আছে কিছু ! বুদ্ধি করে গাঁয়ের একজনকে ডেকে গাড়িটা দেখতে বলেও যেতে পারলেন না !

আমি কী জানি এমন হবে !

চার-পাঁচবছরেব একটি উলঙ্গ মেয়ে এসে লক্ষ্মীর আঁচল ধরে টানে, রাস্তার অপরদিকে খানিক তফাতে ছোটো কুঁড়েঘরটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয়। লক্ষ্মী তাকাতেই ঘোমটা টানা একটি বউ হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকে। বউটির অর্ধেক শরীব জীর্ণ বেড়ার আড়ালে।

লক্ষ্মী এগিয়ে গিয়ে তার কথা শুনে আসে। শুভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় বউটির শাঁখাপরা হাত নাড়ার ভঙ্গি চেয়ে দেখে।

ফিরে এসে লক্ষ্মী শুভকে বলে, বউটি দেখেছে, সাইকেল চেপে দুজন এসে চাকা-টাকা খুলে নিয়ে চলে গেছে। কে নাকি একজন হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল। ওরা বলছে, আপনি ওদের পাঠিয়েছেন, ওরা মিস্ত্রি।

কাছেই এক পাড়ায় রোগী দেখে এই পথেই নন্দকে আরেক পাড়ায় যেতে হবে। সাইকেল থেকে নেমে সব শুনে সে মুখ গম্ভীর করে থাকে।

শুভ বলে, থানায় খবর পাঠাব না ?

নন্দ বলে, না।

লাভ নেই বলছ ? অনর্থক হাঙ্গামা হবে ?

হাঙ্গামা তো হবেই। সে জন্য বলছি না। আসলে এটা ঠিক চুরি নয়। এ ভাবে গাঁয়ের মধ্যে গাড়ি থেকে টায়ার ফায়ার চুরি করার সাহস চোরের হয় না ! ঠিক আজ তুমি এখানে গাড়ি রাখলে আর আজকেই সাইকেল চেপে দুজন ও রকম চোর এখানে হাজির হল—নাঃ, এ অন্য ব্যাপার।

লক্ষ্মী সংশয় ভরে বলে, আমারও মনটা যেন বলছিল—

নন্দ বলে, সত্যি চুরি হলে এতক্ষণ ভিড় জমে যেত না ?

লক্ষ্মী বলে, তাই তো বটে ! এ যেন গাঁয়ে জনমনিষ্যি নেই !

শুভ বলে, কী ব্যাপার ? সব যে রহস্যময় ঠেকছে ?

নন্দ বলে, রহস্য কিছু নয়, সাদাসিদে ব্যাপার। তুমি বরং আমার ওখানে গিয়ে বসবে যাও। দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়।

ব্যাপারটা শুনি না ?

ব্যাপার এই—তোমার সঙ্গে একটু তামাশা করেছে। তোমায় একটু জব্দ করতে চায়।

শুভ যেন আকাশ থেকে পড়ে, জব্দ করতে চায় ? আমাকে ? সবেমাত্র দেশে ফিরলাম, আমি তো কারও কিছু ক্ষতি করিনি !

নন্দ হেসে বলে, তুমি হয়তো করনি। যে বুদ্ধিমানের মগজে প্ল্যানটা গজিয়েছে তোমাদের জাতটার ওপরেই হয়তো তার রাগ। তোমায় গাড়িটা রেখে যেতে দেখেই ভেবেছে, তামাশা করার বেশ সুযোগ মিলেছে !

কিন্তু এ তো একজনের কাজ নয় !

নন্দ মাথা নাড়ে।

গাঁ-সুদ্ধ লোক সায় দিল ?

শুভর গলার আওয়াজে বিস্ময় বা আপশোশের চেয়ে কাতরতা বেশি ফুটেছে খেয়াল করে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলে, না না, তাই কখনও দেয় ! দু-চারজন কাজটা করেছে, অন্যেরা তফাত হয়ে থেকেছে এইমাত্র।

মাথা হেঁট করে শুভ নন্দর ডিসপেনসারিতে ফিরে যায়। বিদেশে অনেক মাথা ঘামিয়ে গড়া পরিকল্পনা মাথার মধ্যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার ব্যাপারটা তুচ্ছ হয়ে গেছে একেবারে। আজ এখন যেন সত্যি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তার সব কল্পনা আর স্বপ্নের ভিত্তি। প্রতি পদক্ষেপে তার মনে হয়, চারিপাশে কাছে ও দূরের ঘরগুলির জানালা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে তার দিকে চেয়ে গাঁয়ের মেয়েপুরুষ নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে, খেতে আর মাঠে মানুষ তাকে দেখে তার দিকে পিছন ফিরছে, হাসি চেপে রেখে পথ দিয়ে লোক তার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

এর চেয়ে টায়ার আর পার্টস কটা সত্যিসত্যিই চুরি যাওয়া অনেক ভালো ছিল। সম্পূর্ণ গাড়িটা চুরি গেলেও তার এতখানি দুঃখ হত না।

আধঘণ্টা পরে নন্দ ফিরে আসে। জানায় যে গাড়ির খুলে নেওয়া অংশগুলি ফিট করা হচ্ছে।

তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে ভাই। যদি তুমি চাও সামনে এসে মাপ চাইতেও রাজি আছে।

শুভ নীরবে মাথা নাড়ে।

নন্দ বলে, দুঃখ করো না। তোমার মনে কী আছে কেউ তো জানে না, তোমাকেও দলে ভিড়িয়ে দিয়েছে। লক্ষ্মী যা বলেছে কথাটা ঠিক, কাজটা আসলে দু-পাঁচজনের। আগে হলে হত কী, গাঁয়ের দশজন ওদের বাধা দিত। আজকাল সবার প্রাণে বড়ো জ্বালা।

তা হলে একলা পেয়ে আমাকে ওরা খুন ও তো করতে পারে, দশজনে তাকিয়ে দেখবে ?

অকারণে খুন কেউ করবেও না, দশজনে সইবেও না। সে জন্য আগে তোমাকে তাহলে একটা বড়ো রকম অপরাধ করতে হবে, দশজনে যাতে তোমার মরাই ভালো মনে করে। তখন কেউ এগিয়ে গিয়ে তোমায় মারলে সবাই চুপ করেই দেখবে। এখানে কেন, সব দেশেই এই নিয়ম।

নন্দ ভেবেছিল, শুভ বোধ হয় পরদিন আর আসবে না। পরদিন সকালে সেইখানে গাড়ি রেখে সে হেঁটে নন্দর ডিসপেনসারিতে যায়। মাথা হেঁট করে নয়, মুখ তুলে এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে দেখতে।

সেদিন ছিল ছুটি। কৈলাস একটু ওষুধের জন্য নন্দর কাছে এসেছিল। কাল রাত্রে এক ভক্তের বাড়ি মানত পূজার বলির মাংস খেয়ে এসে তার বাবা ত্রিভুবনের খুব পেট ব্যথা হয়েছে। আজকাল মাঝে মাঝে তার কলিক হয়। বয়স যে বসে নেই অন্যের বাড়ি খাওয়ার সময় এটা তার খেয়াল থাকে না।

ত্রিভুবন শ্যামা সংগীতে বিখ্যাত গায়ক, নামকরা সাধকও বটে। তার মুখে শ্যামাসংগীত শুনতে এককালে দশ গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ত। আজকাল বয়স হওয়ায় গলার আর তেমন জোর নেই।

তবু এখানে ওখানে, বিশেষত ভক্তদের বাড়িতে, তার নিমন্ত্রণ জোটে প্রায়ই।

তাকে খাইয়ে পুণ্যও আছে নামও আছে।

নন্দ পুরিয়া তৈরি করছিল, আগের দিনের হেঁটমাথা মনমরা শুভর ভাবান্তর দেখে জিজ্ঞেস করে, কী হল ?

আমি সত্যি বোকা। কাল ধরে নিয়েছিলাম ওরা বিশেষভাবে আমাকেই জব্দ করতে চেয়েছে—রাগটা ওদের আমার ওপরেই। কিন্তু তা কেন হবে ?

নন্দ আর কৈলাস আশ্চর্য হয়ে তার কথা শোনে। গরিবেরা সব বড়োলোকের উপরেই চটা, জব্দ করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। বিশেষভাবে শুভর গাড়ি বলে নয়, অন্য কেউ ও ভাবে গাড়ি চেপে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে গাড়ি ফেলে রেখে কোথাও গেলে তার গাড়ির পার্টস খুলে নিয়েও ও রকম তামাশা করত।

কাল রাত্রে হঠাৎ নাকি এটা তার খেয়াল হয়েছে।

কৈলাসের মুখে হাসি দেখা যায় কিন্তু কথা সে বলে খুব কড়া।

আপনি যে গাঁয়ের লোককে একসাথে ছ্যাবলা আর বজ্জাত বানিয়ে দিচ্ছেন ! গাড়ি চেপে যেই আসুক গাঁয়ের মানুষ তার সাথেই ইয়ার্কি জুড়বে তাকে জব্দ করার সুযোগ খুঁজবে ?

বোঝা যায় গাঁয়ের লোকের মিথ্যা অপবাদে সে চটেছে।

কৈলাসকে তুমি বলবে না আপনি বলবে ? শুভকে একটু ভাবতে হয়। নন্দ তাকে তুমি বলে কিন্তু সেটা তাকে কৈলাসদা বলার জন্য। ত্রিভুবন দত্তের ছেলে হিসাবে এবং বয়সে বড়ো বলে তাকে আপনি বলা যায়। কিন্তু এদিকে আবার একজন কম্পোজিটরকে আপনি বলতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকে !

তখন শুভর মনে পড়ে গাঁয়ের লোকের উপর কৈলাসের প্রভাবের কথা। কৈলাসের সম্পর্কে এ কথা সে ইতিমধ্যেই শুনেছে—স্বয়ং জগদীশের মুখে। ছেলেকে জমিদারির অবস্থা বুঝিয়ে দেবার সময় জগদীশ কৈলাসের প্রসঙ্গ তুলেছিল—প্রশংসা করতে নয়, গায়ের জ্বালায়। যাদের বুদ্ধি পরামর্শে প্রজারা বিগড়ে যাচ্ছে, হাঙ্গামা করছে, কৈলাস নাকি তাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি।

ভেবেচিন্তে অন্যসব বিচার বাদ দিয়ে গাঁয়ের লোকের সম্মানকে স্বীকৃতি দেওয়াই শুভ ভালো মনে করে !

বলে, আপনি কি বলতে চান আমার ওপর বিশেষ ভাবে রাগ আছে সকলের ? নবশিল্প মন্দিরটা করে আমি অনেককে রোজগারের সুযোগ দিয়েছিলাম—

তেমনি আবার ছাঁটাইও করেছেন।

কারখানা না চললে আমার কী দোষ ? কিছুকাল তো কিছু লোক পয়সা কামিয়েছে। তারপর আমি চলে গেলাম বিদেশে। বিশেষভাবে আমার ওপর লোকে চটবে কেন ?

যার উপর বিশেষভাবে চটবার অনেক কারণ আছে, আপনি তার ছেলে বলে।

নন্দ বলে, থাক না কৈলাসদা।

শুভ কিন্তু গম্ভীর মুখে বলে, থাকবে কেন ? এটা সম্ভব বইকী। বাবা বুঝি খুব দাপট চালিয়েছেন ? এ সব কিছু এখনও শুনিনি, তাই এদিকটা আমার খেয়াল হয়নি।

কৈলাস মনে মনে বলে, খেয়াল হয়নি কেন ? নিজের বাপটিকে তুমি চেনো না ? ছেলেবেলা থেকে তোমার জন্য কত লোক বেত খেয়েছে, তুমি দোষ করেছ কিন্তু অন্যের আঙুল কাটা গেছে, কতকাল ধরে তোমার বাবা লোকের মাথা ফাটিয়ে ঘরে আগুন দিয়ে আসছে—দু একটা বছর বাইরে থাকার সময় বাপ আবার নতুন নতুন অত্যাচার চালিয়েছে না শুনলে বুঝি এ সব খেয়াল হতে নেই !

কিন্তু মুখে সে কিছু বলে না। তার বাপের জন্য গাঁয়ের লোকের রাগ আর ঘৃণার ভাগ স্বাভাবিক নিয়মে সেও পাবে শুভ এটা মেনে নেবার পর আর কিছু বলা চলে না।

জমিদারের ছেলে হবার বদলে সে যে প্রাণপণে অন্যরকম কিছু হবার চেষ্টা করে আসছে অনেকদিন ধরে, এটাও মনে রাখতে হবে বইকী !

৩

কৈলাস অ্যান্টনি অ্যান্ড কোম্পানির ছাপাখানায় কাজ করে। সকলের ধারণা পেটে তার ইংরাজি বিদ্যা বেশ খানিকটা আছে। শুধু সেকেন্ড ক্লাস পর্যন্ত স্কুলে পড়ার বিদ্যা নয়।

বিখ্যাত কালীভক্ত ত্রিভুবন দত্তের আশা ছিল ছেলে তার আপিসের চাকরে হবে। মার দয়ায় একদিন হয়তো ছোটো একটি বাড়িও করবে কলকাতার আশেপাশে। শেষ জীবনটা ত্রিভুবন কাটাবে সেইখানে। সকাল সন্ধ্যা মন্দিরের দ্বারে আর গঙ্গাতীরে বসে প্রাণভরে শ্যামাসংগীত গাইবে।

তার গান শোনার জন্য ভিড় করবে শহরের হাজার হাজার শান্তিহীন দুঃখী নরনারী।

ত্রিভুবনের মুখে কালীসংগীত গান শুনতে তখন দশ গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ত। আজকাল বুড়ো হয়ে গলা ভেঙে গেছে।

একটি আমের আঁটি মোড় ঘুরিয়ে দিল বাপের আশার আর ছেলের জীবনের।

সত্যিসত্যি অবশ্য আমের আঁটিটাই নয়।

রূপকথার মতো মনে হবে সে কাহিনি। কিন্তু যুগযুগান্তের সংস্কার স্বৈরাচার আত্মধর্ষণের ইতিকথার সে কাহিনি বাস্তব বইকী। নবজন্মের সংগ্রাম যাব মধ্যে প্রচ্ছন্ন অন্ধ আবেগ।

শুভ তখন ছোটো বারতলা স্কুলের নীচের ক্লাসের শখের ছাত্র। খুশি হলে স্কুলে আসে, খুশি না হলে আসে না। টিফিনের সময় বোম্বাই আম চুষে আঁটিটা সে ছুঁড়ে মেরেছিল কৈলাসের গায়ে। বিশেষভাবে কৈলাস বলে নয়, কৈলাসের উপর তার কোনো রাগ ছিল না। কৈলাস কাছে দাঁড়িয়ে তার দুধ সন্দেশ আম ইত্যাদি দিয়ে টিফিন করাটা বেশ খানিকটা কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখছিল বলে। অতটুকু ছেলে, কী কচি আর কোমল মুখখানা, এই সামান্য অপরাধে তার কান মলে লাল করে দেওয়া কী ভীষণ নিষ্ঠুরতা উঁচু ক্লাসের বয়সে বড়ো ছেলের ! কী ভয়ানক অপরাধ।

ঢিল ছুঁড়লে পুলিশের গুলি চালাবার তবু একটা যুক্তি আছে। ঢিল লাগুক না লাগুক, প্রজা ঢিল ছুঁড়লেই পুলিশের প্রেস্টিজ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু জমিদারের বাচ্চা ছেলে প্রজার বয়সে বড়ো গায়ে জোরওয়ালা ছেলের গায়ে একটা আমের আঁটি ছুঁড়লে তার গয়ে হাত তোলার কোনো যুক্তি বা সমর্থন নেই। অতটুকু কোমল ছেলের গায়ে কতটুকুই বা জোর, দামি খাস বোম্বাই আমের আঁটিই বা হয় কতটুকু !

হেডমাস্টার বীরেন চাটুয্যে কৈলাসকে কয়েকটা বেত মারলেই বোধ হয় ব্যাপারটা চুকে যেত। কিন্তু মানুষটা ছিল কংগ্রেসের সভ্য, ব্রিটিশ রাজের পাহাড় প্রমাণ বীভৎস অন্যায়ের অহিংস প্রতিবাদী। সেই অপরাধেই মাথার উপর তার বরখাস্তের খড়্গ ঝুলছিল।

এদিকে সেই খড়্গটাই আবার ঠেকিয়ে রেখেছিল জগদীশ !

ঠিক একই অবস্থায় তার নিজের ছেলের কান মলে দিলে কৈলাসকে শাস্তি দেবার কথা বীরেন ভাবতেও পারত না, কিন্তু জগদীশের ছেলে শুভর কান মলে রাঙা করে দিয়ে একেবারে রেহাই পাবে কৈলাস, এটাও ভাবা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু বেত মারা ? না, বেত মারা যায় না। বীরেন ছুটি পর্যন্ত কৈলাসকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

বেত মারেননি কেন ? আপনাকে লিখিনি অন্য ছেলেদের সামনে বেত মারাই এ সব গুন্ডা ছেলের উপযুক্ত শাস্তি ?

আজ্ঞে আমের আঁটি গায়ে ছুঁড়ে মারলে রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক।

অগত্যা জগদীশের পক্ষ থেকেই কৈলাসের শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। এবং বীরেনকে শায়েস্তা করারও।

কৈলাসের শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল নায়েব কালীচরণ। বীরেনের দায়টা নিয়েছিল জগদীশ স্বয়ং।

রক্তবমি করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কৈলাস।

দশজন ছেলের সামনে কৈলাস জগদীশের ছেলের গায়ে হাত তুলতে সাহস করেছে, ছেলেদের সামনেই তার শাস্তি পাওয়া উচিত।

পরদিন টিফিনের সময় কালীচরণ স্কুলে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শাস্তি দিয়েছিল।

খবর পেয়ে ত্রিভুবন ছুটে যায়। যেতে যেতেই সব ব্যাপার শোনে। স্কুলে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছেলের নিঃস্পন্দ দেহের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শ্যামাসংগীত ধরে দেয়।

গান গাইতে গাইতে দু চোখ দিয়ে জল পড়ে, কিন্তু গলা কী ত্রিভুবন দত্তের ! হঠাৎ গান থামিয়ে ছেলের দেহটা দু-হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে সে হাঁক ছাড়ে, জয় মা চামুণ্ডে ! জয় মুণ্ডমালিনী !

ছেলেকে বুকে করে দৃঢ়পদে সে গিয়ে হাজির হয় স্বয়ং জগদীশের বাড়ির লাগাও তারই বাপের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরের চত্বরে। মন্দিরের দরজার সামনে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে যোগাসন করে বসে গান ধরে দেয়।

সব বাছা বাছা কালীসংগীত একে একে গেয়ে চলে।

প্রথম গানটাই ধরে কালী মির্জার—

প্রসীদ পরমেশ্বরি, অধীন দীনে।
ঘুচাও দুর্গতি সতি গতিবিহীনে।।
কংসারে নিশুম্ভারে, বারংবারে ত্রিপুরারে,
এ-দুস্তরে কে নিস্তারে মা তোমা বিনে।।
তুমি পুরুষ প্রকৃতি, তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি,
হয়, লয় হয় তব কটাক্ষেরি কোণে ;
ও পদ আপদ পদ, আমার ঘোর আপদ,
কালিকে রাখ চরণে।।

সে তো গান করা নয়, সোজাসুজি প্রার্থনা জানানো যে তুমি কত দৈত্যদানব বধ করেছ— আরেক দানবকে শাস্তি দাও !

মন্দিরের বুড়ো পুরোহিত বলে, এ কী করছ দত্ত ?

ত্রিভুবন বলে, এই ধন্না দিলাম। এ অন্যায়ের প্রতিকার না হলে বাপ-ব্যাটায় এইখানে দেহত্যাগ করব।

দেখতে দেখতে লোকারণ্য হয়ে যায় মন্দির-প্রাঙ্গণ। শুভর মার বুক ঢিপঢিপ করে। জগদীশেরও বুক কাঁপে।

খবর পেয়ে আসে তান্ত্রিক ভট্টাচার্য। বলে, ছি, ত্রিভুবন এ কী ছেলেখেলা শুরু করেছ ? মায়ের কাছে প্রতিহিংসা চেয়ে এতদিনের সাধনা নষ্ট করবে ? তুমি তো আসলে ভক্ত নও মায়ের ! তুমি বলে দেবে তবে মা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবেন ? মা-র নিজের বিচার নেই ?

আবার বলে, তোমার ছেলে অপরাধ করেছে, শাস্তি পেয়েছে। সেটা যদি কারও অপরাধ হয়, মহামায়া নিজেই বিচার করবেন। তুমি কেন মহাপাপ করবে ? যাও ছেলেকে নিয়ে বাড়ি যাও। আমি বলে দিচ্ছি, জগদীশের গাড়ি তোমাদের দিয়ে আসবে।

কিন্তু আর কি তখন পিছোবার উপায় আছে ! মানুষের ভিড় জমে গেছে চারিদিকে তাদের ঘিরে, উৎসুক উত্তেজিত নরনারী জেনে গিয়েছে সে কী পণ করে ধন্না দিয়েছে মায়ের দুয়ারে। মনে খটকা লাগলেও তর্কে আর পরাজয় মানা যায় না।

ছেলেমানুষ শুভ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে। তারও কৌতূহলের সীমা নেই। ব্যাপারটা পরিষ্কার ধারণা করতে না পারলেও সে বুঝেছে এ ব্যাপারে সেও জড়িত।

হঠাৎ জনতার কলরবকে ছাপিয়ে ওঠে তারই গলার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। ভিড়ের মধ্যে টেনে নিয়ে কে একজন তার বাঁ-হাতটা এক মোচড়েই ভেঙ্গে দিয়েছে !

জগদীশ তখন বাড়িটা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিল। শুভর মা ইতস্তত করছিল নিজে এসে ত্রিভুবনের পায়ে ধরে অনুনয়-বিনয় করে তাকে শান্ত করবে কিনা। ভক্তের কাতর আবেদন মা-র কতক্ষণ সহ্য হবে ? মা ক্রুদ্ধ হলে কী সর্বনাশ হবে কে জানে ! তার চেয়ে মানসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে—

এমনি সময় চাকরের কোলে চেপে ভাঙা হাতের যাতনায় চিৎকার করতে করতে শুভ অন্দরে এল।

সর্বনাশ ! মা তবে রেগেছেন ! ভক্তের মান রাখতে সক্রিয় হয়েছেন ! শুভর মা আর দ্বিধা করে না, কোনো দিকে না তাকিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে পাগলিনির মতো মন্দিরে ছুটে যায়।

ভিড়ের মধ্যে তার জন্য পথ হয়ে যায় আপনা থেকেই। ত্রিভুবনের পায়ের কাছে ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে শুভর মা আর্তকণ্ঠে বলে, রক্ষা করো বাবা, ছেলের আমার একটা হাত গেছে, এতেই সন্তুষ্ট হও।

শুভর মুচকে বাঁকানো হাতটা কালচে মেরে এসে ফুলে উঠেছিল। ত্রিভুবন বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। মুখ তার এমন বিবর্ণ হয়ে যায় যেন কেউ কালি মাখিয়ে দিয়েছে।

এ প্রতিকার তো সে কামনা করেনি। এতটুকু ছেলের এই শাস্তি সে তো চায়নি। ত্রিভুবন যেন ঝিমিয়ে নিভে যায়, ভীত হয়ে ওঠে। নিজের কাছে নিজে সে অপরাধী পাষণ্ড হয়ে যায়।

তাকেই যেন শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার প্রার্থনা পূর্ণ করে !

দেবেন বলে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে ত্রিভুবন ?

মন্দিরের ভিতরে মূর্তির দিকে চেয়ে ত্রিভুবন আর্তকণ্ঠে বলে, আমায় ভুল বুঝলি মা ?

কৈলাসের তখন একটু একটু জ্ঞান ফিরে আসছে। এত বড়ো ছেলেকে ত্রিভুবন অনায়াসে বুকে করে বয়ে এনেছিল, এবার যেন তাকে কোলে তুলবার শক্তি সে দেহে খুঁজে পায় না।

কৈলাসকে শাস্তি দেবার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাটা করেছিল নায়েব কালীচরণ। গোরুর গাড়িতে কৈলাসকে নিয়ে ত্রিভুবনের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থাও সেই করে দেয়।

ততক্ষণে প্রাথমিক একটু চিকিৎসার পর ছেলেকে নিয়ে মোটরগাড়িতে জগদীশ কলকাতা রওনা হয়ে গেছে।

স্থানীয় দুই কুঠরির হাসপাতাল নামেই আছে। অসংখ্য স্থানীয় রোগী আর দেশের বিরাট ব্যাপক মুক্তি আন্দোলনকে ভাঁওতা দেবার জন্য নামমাত্র সরকারি ব্যবস্থা। ভাঙা হাড় জোড়া লাগাতে একটু এদিক-ওদিক হলে ছেলে তার সারা জীবন তাই নিয়ে ভুগবে।

কিন্তু শুভর হাতটা এমনভাবে মুচড়ে দিল কে ?

শুভ বলে, একজন কালো ধুম্‌সোপানা লোক !

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কালো ধুমসোপানা লোকটির পাত্তা মেলেনি। হয়তো এই জন্যই মেলেনি যে শুভর চোখে কালো ধুমসোপানা দেখাবে এ রকম ঢের লোক বারতলাতেই আছে।

দেবেন বলেছিল, কার খোঁজ করাচ্ছ। সে কী এই পৃথিবীর মানুষ ? দেবীর আজ্ঞা পালন করতে দেহধারণ করেছিল, আবার কোন শূন্যে মিশে গেছে.... ।

শুনে কালীচরণ আর দেরি করেনি। তার মুখেও কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছিল, ভয়ার্ত চোখ দুটি পিট্‌পিট্‌ করছিল। জাতে সে ব্রাহ্মণ বলেই এতক্ষণ কোনোরকমে নিজেকে সামলে রেখেছিল। এবার সোজা ত্রিভুবনের বাড়ি গিয়ে তার পা চেপে ধরে বলেছিল, আমায় মাপ করুন দত্তমশাই।

সেখানেই ইতি হয়নি ঘটনার।

মাটির পৃথিবীর বাস্তব জীবনে যুগযুগান্তের বিশ্বাস ও সংস্কারের জের টানা যে ঘটনায়, এত সহজেই কী তার সমাপ্তি ঘটে।

বাস্তব জগৎ আর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথক তো নয়. হৃদয় আর মগজের কোষে কোষে জড়ানো জীবনে শিকড়-গাড়া বিশ্বাস আর ধারণা।

শুভর কচি হাড় সহজেই জোড়া লেগেছিল। হাতটা শুধু তার একটু বাঁকা হয়ে আছে। এ হাতে জোরও পায় কম !

ত্রিভুবনের প্রাণে বিঁধেছিল শেল। আজও তার জের চলছে অন্যভাবে। কৈলাসের জীবনের গতিই ঘুরে গিয়েছে অন্যদিকে।

অশান্ত উন্মনা হয়ে থাকে ত্রিভুবন। শ্যামাসংগীত ধরতে গেলে কে যেন তার গলা চেপে ধরে। গলা দিয়ে অন্নজল নামতে চায় না। রাত্রে ঘুম হয় না।

কৈলাস সুস্থ হয়ে উঠছে। কিন্তু কী এক সংশয় আর আতঙ্কে যেন অস্থির উন্মাদ হয়ে উঠেছে ত্রিভুবন। ছেলের দিকেও সে ফিরে তাকায় না।

একদিন সে দেবেনের কাছে ছুটে যায়।

দেবেন বলে, তখনি তোমায় বলেছিলাম ত্রিভুবন !

মায়ের সে যে ভক্ত তাতে সন্দেহ কী ! মা সঙ্গে সঙ্গে অমনভাবে সাড়া দিলেন সেটাই তো সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ যে সে মায়ের ভক্ত ! প্রাণের জ্বালায় গিয়ে ধন্না দিল, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হাত মুচড়ে ভেঙে দিল তার ছেলেকে যে প্রহার করেছিল তার ছেলের হাত।

কিন্তু ভক্ত কি এ রকম কাজে লাগায় মায়ের উপর তার ভক্তির দাবি ? ভক্তি দিয়ে কি মায়ের সঙ্গে ব্যাবসা করে ভক্ত ?

যাক, প্রায়শ্চিত্ত কর। মা আবার প্রসন্ন হবেন।

প্রায়শ্চিত্তের বিধানও দেবেন দিয়েছিল। অর্থাৎ দেবেন তাকে দিয়ে যথাবিধি তার প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দেবে।

কিন্তু আনুষ্ঠানিক প্রায়শ্চিত্তে ত্রিভুবনের মন ওঠেনি। সে তো যোগী নয়, সন্ন্যাসী নয়, পূজা অর্চনা সাধনার এক নিয়ম ভঙ্গ করে সে তো মাকে বিদ্রূপ করেনি যে আরেক নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করলেই তার প্রতিকার হবে।

তারপর নাকি স্বপ্নে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ এসেছিল।

এক বছর ত্রিভুবন কৈলাসের মুখ দেখবে না। জীবনে কোনোদিন ছেলের রোজগার ভোগ করতে পারবে না।

ঠিক। শাস্তি বললে শাস্তি, পুরস্কার বললে পুরস্কার। এই তো দরকার ছিল তার। বড়ো বেশি মায়া জন্মেছিল ছেলের উপর, বড়ো বেশি আশা করেছিল ছেলেকে মানুষ করে তার রোজগার ভোগ করে সুখ পাবার !

পুরো এক বছর কৈলাস মামাবাড়ি ছিল। তারপর এলোমেলো উলটো-পালটা জীবন। শেষে কম্পোজিটারি শিখে এই কাজে ঢুকেছিল।

আজও ত্রিভুবন তার উপার্জনের একটি পয়সা ছোঁয় না, তার কেনা কোনো জিনিস ব্যবহার করে না, ফলটুকু পর্যন্ত খায় না ; তার পয়সায় কেনা খড়ে ছাওয়ানো চালের ঘরে বাস পর্যন্ত করে না। নিজের জন্য একটি পৃথক ছোটোঘর সে করে নিয়েছে।

মা আছে, ভাইবোন আছে কৈলাসের। বিয়ে করেছিল,—লক্ষ্মীর চেষ্টায় লক্ষ্মীরই একটি খুড়তুতো সম্পর্কের বোনকে।

সুন্দর টুকটুকে পুতুলের মতো ছিল মেয়েটি—কার সাধ্য আছে মায়া না করে পারে ? বিয়ের ছমাসের মধ্যে সাপের কামড়ে কৈলাসের কচিবউটি মারা যায়।

তারই বাপের বাড়ির অনেকদিনের জানাচেনা এক রকম পোষা বাস্তুসাপ ! পায়ের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও কামড়ায় না।

কিন্তু অসাবধানে লেজ মাড়িয়ে দিলে যদি ছোবল দেয়, পোষা সাপের কী দোষ ?

শুধু ওঝা নয়, ওঝা ডাকা হয়েছিল শুধু নিয়মরক্ষার জন্য, পাস করা ডাক্তার আনিয়েই চিকিৎসা করানো হয়েছিল। কিন্তু দূর থেকে তাড়াহুড়ো করেও ডাক্তার আনতে যত সময় লাগে এ সাপের বিষ তার মধ্যেই বাগিয়ে নেয় মানুষকে।

বউকে পুড়িয়ে ফিরবার আগে কৈলাস সেই অপরাধী সাপটি এবং তার সঙ্গে আরও একটি সাপকে মেরে এসেছিল।

কেউ আপত্তি করেনি!

একটু উদাসীন নিস্পৃহ মনে হয় মানুষটাকে। গা-ছাড়া ভাব নয়, একটু বেপরোয়া রকমের নির্বিকার ভাব—কিছুতেই যেন কিছু আসে যায় না। মনে হয়, মানুষটা বুঝি কথাও কম কয়। চুপচাপ গম্ভীর হয়ে থাকে না, দশজনের সঙ্গে হাসি-গল্পে মেতে যেতে তার কিছুমাত্র কার্পণ্য নেই। তবু অনেক হাসি

কথা আলাপ-আলোচনার পর রীতিমতো অস্বস্তির সঙ্গে মনে হয় নিজেকে সে যেন একেবারে চেপে গিয়েছে, কমবেশি সকলেই নিজেকে প্রকাশ করেছে, তার আসল স্বরূপটির এতটুকু হদিস মেলেনি!

সাধারণ মানুষ, সাধারণ চালচলন, সাধারণ কথাবার্তা—তার আবার স্বতন্ত্র আসল স্বরূপ কী থাকতে পারে ? রহস্যময় গোপন জীবনও তার নেই। কলকাতায় তার ঠিকানা অনেকেই জানে। গলির মধ্যে পাকা ভিতের উপর লম্বা একটা দোতলা কাঠের বাড়ি, চাল টিনের। দোতলায় পাশাপাশি ছোটো ছোটো খোপের মতো অনেকগুলি ঘর, সামনে সরু লম্বা রেলিং দেওয়া বারান্দা। ওরই একটা ঘরে সে থাকে ; নিজে রান্না করে খায়। নীচে সামনের দিকে গোটা তিনেক ছোটো ছোটো দোকান আর বিড়ির পাতা ও শুখা তামাকের গুদাম আছে, ভিতরে বহু পুরানো একটি ট্রেডল মেশিন নিয়ে ছোটো একটি ছাপাখানা।

আসলে, পাঁচজনের কাছে কৈলাসের দাবিদাওয়া বড়োই কম, এক রকম নেই বললেই হয় ! সংসারে বন্ধুও বন্ধুত্ব চায়, আদায় করে চলে। পাঁচজনের খাতির ভালোবাসাটা মানুষ সুখের ভাবে। যাকে অপছন্দ হয়, যে আঘাত করে, তাকে হিংসা করার তুচ্ছ করার একটা আনন্দ আছে। সংঘাত আর আত্মীয়তা, বিরোধ আর ভালোবাসা, এই নিয়ে তো সম্পর্ক সংসারে। নিজের নিজের স্বার্থ আর স্বভাব অনুসারে মানুষ এই সম্পর্ক ভেঙে গড়ে উলটেপালটে নিজের মনের মতো করে নেবার অক্লান্ত চেষ্টায় মেতে থাকে—নানামানুষের সঙ্গে নানাসম্পর্কের জটিল বিচিত্র জীবন মসৃণ হোক, সুন্দর হোক, আনন্দময় হোক।

এ কোনো কঠিন বা জটিল জীবনদর্শন নয়। মূর্খ চাষাও মুখে প্রকাশ করতে না পারুক বেঁচে থাকার এই ধর্মটা অনুভব করে। ভাই বলো বন্ধু বলো মা বোন মাগ বলো আর দোকানি মহাজন পুলিশ পেয়াদা জমিদার বলো সবার সাথে যার যেমন তার তেমন কারবার করে চলাই তো এই সম্পর্কের টানাপোড়েন।

এক হাতে তালি বাজে না গো। না পিরিতের তালি, না লাথি মারার।

লক্ষ্মী কিছু কিছু বুঝতে পারে কৈলাসের ব্যাপার। বুঝতে পারে, শত্রু মিত্র কারও সঙ্গেই নিজের দরকার মতো সম্পর্ক গড়বার এই চেষ্টাটুকু তার নেই। সে বন্ধুর কাছেও প্রত্যাশা করে না আরেকটু ঘনিষ্ঠতা, শত্রুর কাছেও আশা করে না একটু কম শত্রুতা।

তাই, সেদিন কুয়াশার রাত্রে তার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ পাওয়ার হিসাবে রাস্তার ধারে তার জন্য কৈলাসের দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্মীর কাছে এক মহাবিস্ময়কর ব্যাপার।

দেখা হয়, কথা হয়। দেশ-গাঁ-র বিপদের কথা এত প্রাণ খুলে এমন আগ্রহের সঙ্গে আর কারও সঙ্গেই হয় না, তাদের দুজনার যেমন হয়। সুখ-দুঃখ ঘরকন্নার কথাটা যতটা আপন হয়েছে জানান দেয় তার বেশি কখনও কোনোদিন জানতে চায় না কৈলাস।

মন জানাজানি হতে কি আর দেরি হয়েছিল তাদের ? কোনোদিন কোনো ছলে কখনও কৈলাস দাবি করেনি যে ও রকম জানাজানি নয়, সোজাসুজি একটু পষ্টাপষ্টি জানাজানি হোক।

বরং মাঝে মাঝে ধানের শীষের দুধটুকুকে ঘন ফসলের দানা বাঁধতে দেবার অবসর সময়ে অলস দুপুরে চাষির মেয়ে লক্ষ্মীর মনটা জ্বালা করেছে যে, মানুষটা কী ! একদিন হাতটাও চেপে ধরতে পারে না আপন ভুলে ? বলতে পারে না, আমি তোমায় চাই ?

কয়েক মুহূর্তের দিবাস্বপ্নের ঘোর কেটে যেতে নিজেই আবার লজ্জাবোধ করেছে লক্ষ্মী। তার স্থায়ী আতঙ্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

হাত ধরে কোনো লাভ নেই, আবেগ ভরে আমি তোমায় চাই বলে কোনো লাভ নেই, এটা জেনেই তো কৈলাস চুপচাপ আছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

তাই না তার এত স্বস্তি। তাই না তার এত ভালো লাগে মানুষটাকে, এত মায়া হয়।

সে জানত কেন ভয়ে তার মন শক্ত হয়ে যায় কৈলাস নিশ্চয় সেটা আন্দাজ করেছে। কৈলাসের নিজেরও হয়তো ওই একই আতঙ্ক হয়।

একটু ঢিল দিলেই তারা আর সামলাতে পারবে না।

একদিন সংযম হারালেই ভেঙে যাবে হৃদয় মনের সমস্ত বাঁধ। সমাজ সংসার তুচ্ছ হয়ে যাবে তাদের কাছে। অন্য সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে জগৎ সংসার ভুলে গিয়ে তারা শুধু মেতে থাকবে পরস্পরকে নিয়ে, মশগুল হয়ে থাকবে।

আশেপাশের কয়েক জোড়া মেয়েপুরুষের বেলা যেমন হয়েছে তার চেয়েও জোরালো হবে। কারণ, তারা বহুদিন প্রাণপণে চেপে আসছে কামনা আর উন্মাদনা।

কল্পনা করলেও রোমাঞ্চ হয়, সর্বাঙ্গেই শিহরন বয়ে যায়।

কিন্তু রোমাঞ্চ আর শিহরন হলেই তো হয় না। ও তো ফুরিয়ে যায় চোখের পলকে।

ক-দিন তারা মেতে থাকতে পারবে ওভাবে পরস্পরকে নিয়ে ? কতদিন স্থায়ী হবে তাদের দুর্দান্ত উন্মাদনা ? ক-দিন টিকবে তাদের শুধু পরস্পরকে নিয়ে মেতে থাকার সুখ ?

ঘরের কোণের লাজুক মেয়ে বউ সরল পাগল প্রেমিকের সঙ্গে সব তুচ্ছ করে বেরিয়ে গিয়ে ঘরই তো বাঁধতে চায় এই বিরাট সংসারের অন্য আরেকটা কোণ খুঁজে নিয়ে।

সংসারের বাস্তবতা দুদিনে শুকিয়ে দেয় তাদের ভালোবাসা, চুরমার করে ভেঙে দেয় তাদের স্বপ্নের মতো ক্ষণস্থায়ী সুখের জীবন।

তারা তো দুজনেই ঘা-খাওয়া পোড়-খাওয়া ঘাগি মানুষ সংসারের। ক-দিন টিকবে তাদের বেহিসেবি প্রেম ?

কল্পনা করেও লক্ষ্মী শিউরে ওঠে !

সে জানত কৈলাস এটা জানে, কৈলাস বোঝে যে বাঁচতে হবে অনেকদিন, দুদিনের জন্য পাগল হবার উগ্র আনন্দের জন্য সমস্ত জীবনটা নষ্ট করা বিষাক্ত করা শুধু ছেলেমানুষি নয়, বোকামিও বটে।

তাই সেদিন রাত্রে কৈলাসের অধীরতার মানেই বুঝতে পারে না লক্ষ্মী। একা সে লোচনের বাড়িতে রয়ে গেছে শুধু এইটুকু জেনে যদি সে একাই ঘরে ফেরে এই আশায় তার জন্যে অপেক্ষা করা !

এত অন্যায় জগতে, তার মধ্যে কেবল তারা কেন মিলতে পারবে না এই অন্যায়টুকুকে সবচেয়ে বড়ো করে তুলে জগৎসংসার তুচ্ছ করে তার হাত চেপে ধরা !

মানুষটা নিজেকে সামলে নিয়েছিল অনায়াসেই। সেটা অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয়। গভীর রাত্রে নির্জনে তাকে একা পাকড়াও করতে পেরেছে বলেই তার বিনা অনুমতিতে হাত ধরার বেশি কি এগোতে পারে কৈলাস !

কিন্তু মনটা খুশি নয় লক্ষ্মীর।

কে জানে কী নিয়ম জীবন আর জগতের। কুয়াশা কেটে চাঁদ উঠেছিল। অনেক কথা বলার পর সে গলা জড়িয়ে বুকে মাথা রেখেছিল কৈলাসের।

তারপর অবশ্য জীবনের সন্ধানে পুলিশ গ্রাম ঘিরে ফেলতে যাওয়ায় নিজেদের ছিনিয়ে নিয়ে তারা ঘরে ফিরেছিল।

জীবনের খোঁজে পুলিশ না এলে সে রাত্রে কী ঘটত ?

যেদিন লোচনের পা খোঁড়া হয়েছিল গুলিতে, সেইদিন অফিসার গণেশ সর্বনাশ করেছিল লক্ষ্মীর। মাথায় রিভলবার ঠুকে তাকে অজ্ঞান করে।

সেদিন পর্যন্ত লক্ষ্মীর ধারণা ছিল না যে কোনো মেয়েমানুষ সায় না দিলে কোনো পুরুষ তাকে ভোগ করতে পারে।

কৈলাস যদি না দীর্ঘদিন ধরে প্রমাণ দিত যে পুরুষ মানুষও মানুষ হয়, প্রাণের জ্বালায় নিষ্ফল আক্রোশে বিকারের তীব্রতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত লক্ষ্মীর জীবন—তাকে নিয়ে হয়তো ছিনিমিনি খেলত কয়েকটি মানুষ।

কৈলাস তার মনুষ্যত্বে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে।

বড়োই মায়া হত লক্ষ্মীর। সারা দেশের হর্তাকর্তা বিধাতাদের পোষা একটা পশু-ইচ্ছা জাগা মাত্র বন্দুকধারী পাহারা দাঁড় করিয়ে নবকের বাসর রচনা করে অনায়াসে তাকে ভোগ করল—আর এ বেচারি স্রেফ মনুষ্যত্বের খাতিরে তার মানসিক সায় পেয়েও হাতটা চেপে ধরে তাকে বিব্রত করে না।

লক্ষ্মী নিজেই উদ্যোগী হয়ে সুন্দরীর সঙ্গে কৈলাসের বিয়ে দিয়েছিল।

কৈলাস শুধু বলেছিল, বিয়ে-টিয়ে করে সুখ পাব কী?

লক্ষ্মী বলেছিল, কেন পাবে না ? সুখ কি বাজারে সের দরে বিক্রি হয় ? দশজনে করছে তুমিও সংসার করো। সংসার ছাড়া ছিষ্টিছাড়া সুখ খুঁজো না।

এতকাল পরে সেই সুখ কি খুঁজেছিল কৈলাস কুয়াশার রাতে ?

একটা কথা বলা দরকার ভেবে পরের রবিবার সকালবেলাই লক্ষ্মী তার খোঁজে যায়। তামাক পাতা এবার ভাইয়ের মারফত পাঠিয়েছে কেন সেটাও জিজ্ঞাস্য ছিল।

বাড়ির লাগাও তরকারির খেতে কৈলাস কাজ করছিল। সপ্তাহে একদিনমাত্র সে তরকারি খেতের যত্ন নেয়। কিন্তু তা নেয় বলেই সারা সপ্তাহ ধরে বাড়ির লোকের যত্ন নেবার উৎসাহ বজায় থাকে। অযত্ন দেখে যদি রাগ করে কৈলাস !

গেলে না যে কাল ?

কী হবে গিয়ে ?

বেশ তো ! শেষে এই বুদ্ধি হল ?

কৈলাস হাসে ! গোড়া খুঁড়ে কটা মুলো তুলতে তুলতে বলে, তোমার যন্ত্রনা বাড়িয়ে লাভ কী ?

ও, দরদ বেড়েছে ! সেদিন রাতে তোমার কী হয়েছিল সত্যি বলবে ?

মনটা বড়ো খারাপ ছিল।

জিজ্ঞাসা করতেই জবাব। টালবাহানা নেই, এ-কথা সে-কথা নেই ? লক্ষ্মী ঠোঁট কামড়ায়। এ মানুষটার মন খারাপ হতে পারে এ সব যেন তারও হিসেবের বাইরে ছিল।

ঠিক সিঁথির নীচে কপালে লক্ষ্মী একটা আঙুল ঘষে। ওইখানে রিভলভারের বাঁট ঠুকে গণেশ তাকে অজ্ঞান করেছিল। আজও মাঝে মাঝে ওখানটা টনটনিয়ে ওঠে।

কৈলাস মুলো কটা বাড়িয়ে দিলে সে পাতাগুলি মুঠো করে ধরে বলে, এমনি মন খারাপ ? না, বিশেষ কিছুর জন্যে ?

কৈলাস ধীরে ধীরে বলে, সেই জন্যে, আবার কীসের জন্যে। আজও কিছু ঠাহর পেলাম না তো আর কবে পাব। এটায় হবে না ওটায় হবে না করেই দিন গেল,—হবে কীসে জানতে জানতে কি চিতেয় উঠব শেষে ?

শুনলে মনে হবে, কৈলাস বুঝি আপশোশ করছে যে তার আর লক্ষ্মীর কোনো উপায় হল না, দিন গড়িয়ে গড়িয়ে জীবন ফুরিয়ে এল। লক্ষ্মীর ভুল হয় না। সে এই আপশোশের ইতিহাসও জানে মানেও বোঝে। সবটা বোঝে না, খানিক খানিক।

শহর আর গাঁয়ের নানা আন্দোলনে সে যোগ দেয় প্রাণের তাগিদেই কিন্তু দোমনা ভাবটা নাকি তার ঘোচে না। সে বুঝে উঠতে পারে না কীসে আর কীভাবে কী হবে। উৎসাহ তার ঝিমিয়ে আসে—মনটা বড়োই ব্যাকুল হয়ে পড়ে। নানাকথা নানামত শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে যায়। না জেনে না বুঝে অন্ধের মতো কাজ করতে পারে কেউ ? শুধু বুকের জ্বালা সম্বল করে ? আর পাঁচজন লড়ছে,---শুধু এই উৎসাহ নিয়ে ? কেউ যদি সহজ সরল ভাবে তার বোধগম্য করে দিত ঠিক কীভাবে শতরকমের দুর্দশা ':চবে মানুষের ? কিন্তু কে কার কৈফিয়ত চায়, কে বুঝতে চায় কার মন ! ওজনওয়ালা মানুষ, দশজনের বিশ্বাসওলা প্রভাবশালী কত মানুষ প্রাণটা আকুল করে শত প্রশ্ন আর খটকা তুলে সরে গেল, ফিরে চাওয়াও দরকার মনে করল না কেউ---তুচ্ছ সাধারণ কৈলাসের জন্য কে মাথা ঘামায়।

লক্ষ্মী ছাড়া চেনাজানা কেউ একজন একদিন একটু কৌতূহলের বশে শেষ পর্যন্ত জানতে চায়নি, কী ভাবছে কৈলাস, প্রাণটা তার কেন আর কীসে টনটন করছে !

নন্দ পর্যন্ত নয় !

লক্ষ্মী বলে কী ভাবছ ? নতুন কথা কিছু ভাবছ না কি ?

কৈলাস বলে, হাঃ, নতুন কথা ভাবতে পারলে আর ভাবনা ছিল ? ওই তো মন্দ কপাল। মরে আছি তো ওই জন্যে। আমি শালার সাধ্য আছে ভেবে ভেবে ভাবনার কূলকিনারা পাই ? কূল মেলাবার মানুষ মিলল না একজন !

লক্ষ্মীও নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু আশ্বাস দিয়ে বলে, মিলবে। না মিলে কি যায় ? একলাটি তোমার তো নয়, এত মনিষ্যির প্রাণ চাইছে সে কি আর মিছে হবে ? দশজনার প্রাণের টানে ভগবানকে পর্যন্ত নামতে হয় না পৃথিবীতে ?

একটু থেমেই বলে, কাজ কর না একটা ? জীবনবাবু মিটিং করতে চাইছে সেই থেকে, মোদের ডাক্তারকে ধরেছে চেপে। ডাক্তারের বুঝি মন নেই, এড়িয়ে যাচ্ছে কথাটা। গা লাগিয়ে করাও না মিটিংটা আর রোববার ? কলকাতা থেকে দু-চারজনকে নিয়ে এস ?

মিটিং ? তা মিটিং একটা হলে ক্ষতি নেই। মিটিংয়ের অভাব অবশ্য কৈলাস বোধ করে না, সে কলকাতায় থাকে। তার আসল অভাব মেটে না ও সব মিটিংয়ে, তার ভাবনার একটা কিনারা মেলে না,—তার পথ কী, তার কী করা উচিত। বলছে অনেকে অনেক কথা, প্রাণে লাগছে কই—একেবারে মর্মে মর্মে জানছে কই যে হ্যাঁ, ঠিক, এই তো আসল কথা !

অনেকদিন আগে ওই জীবনের বক্তৃতা শুনে যেমন জলের মতো সোজা হয়ে যেত স্বাধীনতা আদায় করার কথা, প্রাণটা সায় দিয়ে লাফিয়ে উঠত।

তবে এটা হবে গাঁয়ের মিটিং। হয়তো এখানে বক্তৃতা হবে ভিন্ন রকম। দশবার শোনা কথা জানা কথা আরও একবার জটিল করে না বলে সহজ করে আসল কথা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

হয়তো তারও এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার অবসান হয়ে যাবে।

নন্দ বলে, মিটিং ? তুমি তো হালচাল জানো ভাই। মিটিং ডাকার কথা হয়েছে। জীবনবাবু চাইছেন, ওর জন্যেই একটা মিটিং ডাকা হোক। তিনি সব সমস্যা নিয়ে তার মত বলবেন। শুভ বলছে, জীবনবাবুকে সভাপতি করে একটা মিটিং ডাকা হোক, আলোচনার বিষয় হোক আমাদের পররাষ্ট্র-নীতি কী ভাবে শিল্পোন্নতি ঠেকাচ্ছে। লোচনেরা বলছে, ফসল কাটার বেশি দেরি নেই, ধানের দর ঠিক করা, গায়ের জোরে ধান সিজ করা এ সব বিষয়ে চাষিরা কী করবে তাই নিয়ে মিটিং হোক। জীবনবাবু সভাপতি হলে আপত্তি নেই। গজেনেরা বলছে, বিষ্ণুদাকে অভ্যর্থনা জানানোর মিটিং হোক- -সেখানে যার যে বিষয়ে খুশি বলবেন। জীবনবাবু যদি রাজি হন, তিনিই সভাপতি হবেন, বিষ্ণুদা হবেন প্রধান অতিথি।

বিষ্ণুদা ছাড়া পেয়েছেন ? এদিকে আসবেন কবে ?

দু-একদিনের মধ্যেই।

কৈলাস খানিক চুপ করে থেকে বলে, তা ডাক্তার, তুমি নিজে কোন মিটিং ডাকতে চাইছ ?

নন্দ হেসে বলে, আমি ভাবছিলাম আরেকটা শান্তির মিটিং ডাকলে ভালো হয়। গতবারের সভা খুব জমেছিল।

শুভ সিগারেট কেস ফেলে গিয়েছিল ! তা থেকে নন্দ কৈলাসকে একটা সিগারেট দেয়। সিগারেট টানতে টানতে কৈলাস বাইরে চেয়ে থাকে।

গাঁয়েরও ছুটির চেহারা আছে রবিবারের। স্কুল বন্ধ, পোস্টাপিস বন্ধ, শহরের আপিস আদালত বন্ধ। কৈলাসের মতোই যারা দু-পাঁচজন পেটের ধান্ধায় সারা সপ্তাহ বাইরে থাকে, তারা গাঁয়ে এসেছে। তক্তা কাটা ব্যাট আর রবারের বল দিয়ে স্কুলের কয়েকজন ছেলে মাঠে ক্রিকেট খেলছে। চক্রবর্তীর দাওয়ায় তাসের আসরটা বেশ জমাট। কিছু তফাতে নারাণ পোদ্দারের দালান বাড়ির ঘর থেকে ভেসে আসছে রেডিয়োতে ছুটির দিনের একপেশে খবর আর গান ! এ রেডিয়ো রোজই বাজে। ডোবায় মেয়ে বউ বাসন মেজে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে নাইতে নাইতে একপেশে একঘেয়ে বক্তৃতা আর হরেকরকম সুন্দর মার্জিত গান শোনে।

কৈলাস বলে, ডাক্তার, সব রোগ সারিয়ে দেয় এমন ওষুধ আছে তোমাদের?

নন্দ বলে, আছে। একটা কেন অনেক আছে। এক ডোজে ভব-যন্ত্রণা ঘুচে যায় ! সায়ানাইড, স্ট্রিকনিন, মরফিয়া—

কৈলাস উৎসাহের সঙ্গে বলে, তাই করা যাক।

নন্দ আশ্চর্য হয়ে বলে, কী ব্যাপার কৈলাসদা ? কী বলছ তুমি ?

কৈলাস হেসে বলে, না না, ও কথা নয়। একটা কথা ভাবছিলাম। এমনি মিটিংটা আগে না ডেকে, যারা পাঁচ রকম মিটিং চাইছে তাদের একটা মিটিং করা যাক। কীসের মিটিং করা উচিত, তাই নিয়ে মিটিং। চাষিদের অবস্থা সত্যি বড়ো কাহিল দাঁড়িয়েছে। ফসল তোলা তক একটু সামাল না দিলে বেশ কয়েকটা নিকেশ হবে। ধরণী এক ধার থেকে গলা কাটছে। জীবনবাবুদের বলে কয়ে যদি রাজি করানো যায়—নন্দ মাথা নাড়ে, সভায় শুধু গবর্নমেন্টকে গাল দেওয়া হবে গ্যারান্টি দিলে হয়তো রাজি হতে পারেন। জগদীশের নামে কিছু বলা হলে ওনার অসুবিধা আছে। কিন্তু তা তো আর ঠেকানো যাবে না ? অন্যেরা ধরণী জগদীশদেরও শ্রাদ্ধ করবে। শুভও এ রকম সভায় যেতে পারবে না। কাজেই বুঝতে পারছ তো, এদের নিয়ে কীসের মিটিং করা উচিত ঠিক করতে মিটিং ডেকে তোমার সুবিধা হবে না কৈলাসদা।

শুভ ভিতরে ঢুকে বলে, বাইরে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি তোমাদেব কথা শুনছিলাম, কিছু মনে কোরো না। চাষিদের জন্য মিটিং করলেই বাবাকে গাল দেওয়া হয় ? বাবার জন্যই চাষীদেব অবস্থা কাহিল হয়েছে ?

কৈলাস নীরবে একটা বিড়ি ধরায়।

নন্দ যেন তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলে, একা তোমার বাবাব জন্য নয়। আরও কতজনে কতভাবে গরিব চাষির দফা নিকেশ করছে ! ধরণী মোটব চাপে না, সেকেলে চালচলন, খুব ধার্মিক লোক। পারলে ওকে কুটিকুটি কবে ছিঁড়ে ফেললেও বোধ হয় চাষিদের গায়ের জ্বালা মিটবে না।

একটু ভেবেই নন্দ যোগ দেয়, একদিন সকালের দিকে ধরণীর বাড়িব দিকে যাও না বেড়াতে বেড়াতে ? কারও ঘরে ধান নেই, ঘাড় মটকাতে দেবার জন্য কীভাবে লোকে ভিড় করে গিয়ে ধন্না দেয় দেখতে পাবে। খানিকটা টেরও পাবে লোকের প্রাণে এত জ্বালা কেন।

কৈলাস মাথা নেড়ে বলে, তুমি তো বেশ পবামর্শ দিলে ডাক্তার ! উনি গেলে কি আর টের পাবেন ? ওরা সব চুপ করে যাবে, ধরণী ওনাকে সম্মান করতে ব্যস্ত হবে। একটু বেশিক্ষণ বসলে সেদিনকার মতো হয়তো খেদিয়েই দেবে সকলকে। কর্জ না পেয়ে সবাই ওনার ওপব চটে যাবে।

নন্দ বলে, তা বটে।

শুভ গম্ভীর মুখে আপশোশ করে বলে, ওই তো হয়েছে মুশকিল। নিজে দেখে শুনে সব জানতে আমার এত ইচ্ছে কিন্তু কাছে ঘেঁষবাব উপায নেই। শামুকের মতো খোলাব মধ্যে নিজেকে গুটিযে নেবে। একেবারে ছাপ মারা হয়ে গেছি।

কৈলাস মনে মনে ভাবে, কেন, বাংলা দেশে আর গাঁ নেই, তোমায যেখানে কেউ চেনে না ? গরিব সেজে ঘুবে এসো না দুটো দিন, এতই যদি জানবাব ইচ্ছে। যেটুকু দেখবে শুনবে তাতেই চোখ ছানাবড়া হযে যাবে না তোমার !

তবু তার জানবার বুঝবার ইচ্ছাটাকে স্বীকার না কবে কৈলাস পাবে না। শখের কৌতূহল হতে পারে। তা হোক। সেটুকুই বা কজনের আছে শুভব মতো মানুষের !

খানিক চুপচাপ থেকে সে হঠাৎ প্রশ্ন কবে, এক কাজ কববেন ? চাষিরা নিজেদেব মধ্যে কী বলাবলি কবে আপনাকে শোনাতে পারি।

কৈলাসের বুদ্ধিটা সহজ। মানুষের দাঁড়িয়েছে একান্ত কাহিল অবস্থা, ঘবে ঘরে ধান নেই, ধরণী সুদ বাড়িয়েই যাচ্ছে। লোচনের বাড়িতে আশেপাশের দুঃস্থ চাষিদের একটা বৈঠক হবে পরামর্শ করার জন্য—ধরণীর সুদের বাড়টা ঠেকাবার কোনো উপায় যদি খুঁজে পাওয়া যায়।

তা, শুভ ইচ্ছা করলে বৈঠকটা কৈলাস লোচনের বাড়ির বদলে নন্দর ডিসপেনসাবির দাওযায বসাবার ব্যবস্থা করতে পারে। শুভ আগে থেকে এসে ভেতরে বসে থাকবে। দাওয়ার কথাবার্তা ভেতর থেকে অনায়াসে শুনতে পাবে।

কিন্তু একটু সাবধান থাকতে হবে আপনাকে। কেউ না টের পায়। বৈঠকটা পণ্ড হয়ে যাবে।

শুভর মুখ লাল হয়ে উঠেছে দেখে নন্দ তাড়াতাড়ি বলে, কী ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ কৈলাসদা !

শুভ বলে, চোরের মতো লুকিয়ে কথা শুনতে হবে ? স্পাইয়ের মতো ? আপনার গেঁয়ো মাথায় বুদ্ধি এসেছে ভালো !

সে আপনার বিবেচনা। চাষিরা প্রাণ খুলে কথা কইবে আর আপনি শুনবেন—এ ভাবে ছাড়া তা হয় না।

মনে মনে কৈলাস যোগ দেয়, কস্মিনকালে হবেও না !

ডেকে বসালে নিজেদের বৈঠকেও চাষিরা একেবারে প্রাণ খুলে সহজভাবে কথা বলতে পারে না, গুরুতর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হচ্ছে, হালকা কথা বাজে কথা বলে ফেলাটা মোটেই সঙ্গত হবে না এই ভাবনাতেই বাধোবাধো বোধ করবে। তবু অভিমান না করে কৈলাসের পরামর্শ শুনলে শুভর একটা নতুন অভিজ্ঞতা হত সন্দেহ নেই।

সেটা স্বীকাব করেও নন্দ কিন্তু পরে কৈলাসকে অনুযোগ দেয়, তুমি কী করছিলে বলো তো ? বৈঠকে কি সবাই শুধু ধরণীর মুণ্ডপাত কবত ? ওর বাপের নামেও যা তা বলত না ?

সব শুনত। বুঝত চাষাভুসো ওদের কত ভক্তি করে ভালোবাসে।

সেটা খানিক বোঝে।

খানিক বোঝার চেয়ে একদম না বোঝা ভালো। ফাঁকা দরদ দেখাবার সাধ হয় না।

৪

আজকাল ভোরবেলা চারিদিক ঘন কুয়াশা ঢেকে যায়। অল্প দূরেও নজর চলে না। কুয়াশায় রাত্রি শেষ হয়, আবার হিম হিম কুয়াশার যেন আভাস মেলে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। কুয়াশা কাটতে বেলা হবে, তখন দেখা যাবে খেত ঢেকে গেছে আগামী ফসলের বাড়ন্ত সবুজ চারায়। ছড়ানো বীজ থেকে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে জন্মেছিল শিশু, গোছায় গোছায় সাজিয়ে রোপণ করেছে চাষি। সারাদিন কাঁচা সবুজ শিষগুলি বাতাসে দোলে। নবাগত উত্তুরে বাতাস এখনও খেয়ালি, চপল। থেকে থেকে হঠাৎ থেমে যায়, বায়ু বয় পুব থেকে, তা-ও আবার হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে বইতে শুরু করে দখিনা হয়ে। ধানের শিষ এখনও দানা বাঁধেনি, টিপলে এখনও গাঢ় আঠার মতো দুধ বেরোয়, মার স্তনের দুধের চেয়ে বুঝি মিষ্টি। চাষিরা বলে যে তা হবে না কেন, মানুষ-মায়ের বুকে দুধ তো আসে মাটি-মায়ের দানা-বাঁধা এই দুধ খেয়েই।

লোচনের দাওয়ায় এত ভোরেই কয়েকজন চাষি জড়ো হয়েছে। ডেকে বসানো বৈঠক নয়, কেউ কাউকে ডেকে আনেনি। ধরণীর কাছে কর্জার জন্য ধন্না দিতে যাওয়ার আগে এরা কয়েকজন একে দুয়ে নিজেরাই এসে এখানে জমেছে। কী ভাবে যেন তারা টের পেয়ে গিয়েছে যে ধরণীর দরজায় হাজির হবার আগে জনকয়েক একসাথে বসে খানিকক্ষণ এলোমেলো কথা বলে গেলেও যেন বুকে বল পাওয়া যায়, ধরণী কারও উপর বেশিরকম অন্যায় করতে চাইলে সে বেচারার পক্ষে কথা বলার দু-চারজন লোক মেলে।

কুয়াশা বটে ! ভুঁই ফুঁড়ে মেঘ উঠছে মন করে যেন।

ভূষণ বলে, রসিক আর তোরাব আলিকে। দাওয়ায় বসে চেনা যাচ্ছে না কয়েক হাত দূরে মাটির রাস্তায় কে হেঁটে যাচ্ছে।

কৈলাস এসে তাদের বলে, চলো দিকি সবাই মিলে মোদের ডাক্তারের ওখানে গিয়ে বসি। আরও কজনা আসবে। কম সুদে ধান কর্জ মেলে নাকি একটু সলা হোক।

শুভ রাতারাতি মত পালটে রাত থাকতে নন্দর কাছে এসেছিল। আড়াল থেকেই সে চাষিদের আলাপ আলোচনা শুনবে। এ বাস্তব সত্যকে তো আর অস্বীকার করা যাবে না যে চাষিরা তাকে আপন ভাবে না, ভাবতে পারে না, সে হাজির আছে টের পেলেই তারা মুখ খুললেও প্রাণ খুলবে না। তার উদ্দেশ্যও যখন খারাপ নয়, লুকিয়ে ওদের কথা শুনলে দোষ কি ?

নন্দ গিয়ে কৈলাসকে ডেকে তুলে বলেছিল, আমার ওখানেই বৈঠকটা বসাও কৈলাসদা। বাবু শেষরাত্রে হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হয়েছে।

কৈলাস বলেছিল, সে বৈঠক তো আজ নয় ? আমি আজ সকাল সকাল কলকাতা রওনা দেব। বৈঠক হবে রোববার।

যাঃ, বেচারা মিছিমিছি এত কষ্ট করে এল। খুব আগ্রহ নিয়ে এসেছে। রোববার আসতে বলব ?

কৈলাস একটু ভেবে বলেছিল, আচ্ছা বসতে বলবে যাও, আজকেই চাষিদের কথাবার্তা শুনিয়ে দিচ্ছি। ছোটো ছোটো বৈঠক এখানে ওখানে রোজ বসছে দুবেলা, কজনে জড়ো হয়ে বসে মন্দ কপালের নিন্দা করতেও ভালো লাগে।

রসিক বলে, ধরণী ব্যাটা ঘুমোবে বেলা তক। একটু দেরি করেই রওনা দেব মোরা, না কি বলো মিঞা ?

রসিক লোচনের বোনাই, বারতলার দিকে এগিয়ে সোনামাটিতে তার ঘর। তোরাব এক রকম প্রতিবেশী রসিকের, দুজনের বাড়ির মধ্যে ব্যবধান শুধু একটা বাঁশঝাড় আর কয়েকটা কুলগাছের।

দেরি হয়ে যাবে না ? ছুতা করে আজ যদি কর্জ না দেয় ?

তোরাব বেশ একটু উদ্‌বেগের সঙ্গেই বলে। ধরণী তরফদার ধান কর্জ না দিলে কাল পরশু ওদের দুজনের ঘরেও উপোস শুরু হয়ে যাবে কিন্তু তোরাবের ঘরে কাল থেকে একদানা চাল নেই।

কৈলাস বলে, দেবার মতলব না থাকলে রাত থাকতে গিয়ে ধন্না দিলেও দেবে না। মতলব থাকলে যখনই যাও মিলবে।

সে কথা ঠিক। আগেকার দিনে ধরণীর কাছে কর্জ চাইতে যেতে হলে এরাই হয়তো একজন চুপিচুপি আরেক জনের আগে গিয়ে নিজের জন্য কর্জটা আগে-ভাগে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করত। কিন্তু আজ চাষিরা প্রায় সকলেই টের পেয়েছে ওতে কোনো ফল নেই, কে আগে এল তোষামুদে কথা কইল বা কান্নাকাটি করল সে সব বিচার করে না ধরণী। যাকে না দেবার তাকে কিছুতে দেয় না, যাকে দেবার তাকে দেয়, সকলকে সমান বাঁধনে বাঁধে। ভাণ্ডারও তার তাদের শুষে শুষে হয়ে আছে অফুরন্ত, মন্বন্তরের রিলিফখানার খয়রাত নয় যে আগে গিয়ে মারামারি কামড়াকামড়ি না করলে ফুরিয়ে যাবার ভয়। তবে কি না বুঝেও মনটা যেন বুঝতে চায় না, আজও না খেয়ে থাকতে হলে মুশকিল, বউটা তোরাবের আসন্ন-প্রসবা, বড়ো কমজোরি হয়ে পড়ছে শরীরটা তার এমনিতেই।

এরা আজ এ বেলাই ধরণীর কাছে কর্জের জন্য যাবে। নন্দর বাড়ির দিকে চলতে চলতে কৈলাস আরও কয়েকজনকে ডেকে সঙ্গে নেয়। শুভর সাধ মেটানোটাই তার উদ্দেশ্য নয়। এদের কথাবার্তা শুনে শুভ যদি বুঝতে পারে কীভাবে ধরণী শোষণ চালাচ্ছে ফসল তোলার আগে এদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে, চাপ দিয়ে ধরণীর বাড়াবাড়িটা ঠেকাবার চেষ্টা একটু হয়তো সে করতেও পারে—এটুকু আশা করতে দোষটা কী ?

নন্দর ডিসপেনসারির দাওয়ায় তারা বসে। যারা কর্জের আশায় যাবে তাদের মনে ওই এক চিন্তা—আজও যদি ধরণী ফিরিয়ে দেয় ! তিন-চারদিন নানা ছুতায় সে কর্জ দেওয়া বন্ধ রেখেছে।

গদিতেই আসে দু-তিনঘণ্টা দেরি করে।

নারাণ বলে, দেড়ভাগি চাপাবে ঠিক। না তো দেবে না মন করে।

তা মানবো না মোরা।

না, তা মানবো না, আল্লার কিরে।

এক মুহূর্তে তোরাব যেন ভয়-ভাবনা-উদ্‌বেগ ভুলে যায়, হাঁটুতে জোরে চাপড় মেরে বলে, পোয়া সুদের এক কুনো বাড়তি মানব না, না দেয় কর্জ না দেবে।

গত বছর ফসল কাটার দশ-বারোদিন আগে বিপদে পড়ে দেড়ভাগি শর্তে ধান নিতে হয়েছিল তোরাবকে ফজলু মিঞার কাছে, সে জ্বালা আজও সে ভোলেনি। মাঠে যখন লাঙলও পড়েনি, বীজধান কার কী আছে কেউ জানে না, বৃষ্টি হবে না ধানের চারা মাঠে শুকিয়ে যাবে অথবা বন্যায় শেষ করে দিয়ে যাবে কি যাবে না অতিবৃষ্টিতে মাঠ ভরা তেজি ধান গাছগুলিকে তাও যখন কেউ বলতে পারে না—তখন মহাজন দু-মন ধান দিয়ে ফসল উঠলে তিন মন আদায় করুক, বলার কিছু নেই। নাঃ, কিছুই বলার নেই। চাষিটাই টিকবে কিনা, দুমন ধান সমস্তটাই বরবাদ হয়ে যাবে কিনা কিছুই যখন জানা নেই, দু-দশবার এ রকম লোকসান যখন সইতে হয়েছে মহাজনকে—ও অবস্থায় সে দেড়ভাগিই চালাক। যেমন দুরবস্থা তাদের তেমনই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কিন্তু ফসলের দুধ যখন ঘন হয়ে দানা বাঁধতে শুরু করেছে মাঠে, অনাবৃষ্টি আর বন্যা দুটোকেই ডিঙিয়ে চাষি ফসল তোলার দিন গুনছে, তখন দেড়ভাগি সুদ চাপানো !

দেখাই যাক অদেষ্টে কী আছে। গরজ তো মোদের, ও ব্যাটার কী ?

রসিক বলে কলকেতে সুপারির মতো একগুলি তামাক দিয়ে হাতের তালুতে নারকেল ছোবড়া পাকাতে পাকাতে।

বটে না কি ? কৈলাস বলে ব্যঙ্গের সুরে, ও ব্যাটার কী ? কর্জ না দিলে তো ঘরের ধান ঘরে বইয়ে বাড়বে এক দানা ? ওর কারবার এই, কর্জ দেবার গরজ কিছু কম নয়।

ঘনরাম বলে, ঠিক, ঘুপটি মেরে বসে থাকে মোদের খেলাতে, মোরা হার মানি, নয় তো—

কুয়াশা নড়ে না, হালকা হয় না। চালা থেকে টপটপ জল পড়ছে। হাত বদল করে তার কলকেতে কয়েকটা ছোটোছোটো আর একটা বড়ো টান দিয়ে তামাক খায়, চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। ঘনরামের ছেলেটার জ্বর এসেছিল পরশু, কাল রাত্রে খুব ঘাম দিয়ে তাড়াতাড়ি জ্বরটা ছেড়ে গিয়েছে, ছেলেটা ছটফট করেছে গোঙিয়ে গোঙিয়ে।

হাসপাতালে যাবে না একবার ? তার বউ শুধিয়েছিল আসবার আগে, বাসন ঠোকার আওয়াজে তাকে ভিতরে ডেকে।

হাঁ, হাসপাতাল হয়ে ফিরব।

লোচন কাল সদরে গিয়েছে একটা মামলার ব্যাপারে, আজ শুনানি হবে, এই মামলার জন্যই ঘনরাম টাকা ধার করতে চলেছে ধরণীর কাছে। কাল গিয়েছিল, সুবিধা হয়নি। আজ টাকা জোগাড় করে তাকে সদরে পৌঁছতেই হবে।

কৈলাস জানে এদের এই এলোমেলো আলোচনা থেকে শুভ ধরতেও পারবে না ধরণীর কাছে ঋণের ফাঁস গলায় পরতে যেতে এদের এত গরজ কেন, কীসের দায়। সে তাই থেকে থেকে একে ওকে ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করে, ধান বা টাকা কীসের কর্জ দরকার জানতে চায়।

কান পেতে নিজের কানে শুভ শুনুক এ সব কাহিনি। বুঝুক কী অবস্থায় মানুষকে জবাই করে ধরণী।

পিনাক সামন্তকে যেতে দেখে সে ডেকে আনে। শুধু জমিহীন গরিব চাষিই নয়, মধ্যবিত্ত চাষিকেও কেন ধরণীর কাছে হত্যা দিতে যেতে হয় তাও জানুক।

সব জেনেশুনেও পিনাককে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় চলেছ সামন্ত খুড়ো ?

আর কোথা যাব বল ? চলেছি ধরণী ব্যাটার কাছে। ব্যাটার ওলাউঠা হয় না, শকুনে ছিঁড়ে খায় না ব্যাটাকে।

ভূষণ বলে, যা বলেছ দাদা। মানুষকে এমন ডাহা মিথ্যে মামলায় জড়াতে ধরণী ছাড়া কেউ পারবে না।

পারবে না ? খোদ বড়োকত্তা নিজে গণশার চালায় আগুন দিয়ে রাজেন দাসদের জেল খাটালে না ? সব এক ঘাটের কুমির। ধরণী বলে আমায় দ্যাখ, জগদীশ বলে আমায় দ্যাখ। কুষ্ঠও হয় না ব্যাটাদের, আশ্চর্যি।

এই গাঁয়েরই শেষ প্রান্তে পিনাক সামন্তের টিনের আর খড়ের কোঠায় মেশান বাড়ি, নন্দের বাড়ি থেকে পোয়াটেক মাইল দূর। মানুষটার বয়স খুব বেশি হয়নি, অকালে বুড়িয়ে জীর্ণ আর বাঁকা হয়ে গেছে সত্তর বছরের বুড়োর মতো। তরফদারের কাছে তার প্রয়োজন ধানের কর্জ নয়, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো এক চোরাগোপ্তা একতরফা মামলায় জমি নিলামের নোটিশের প্রতিবাদে কাকুতি-মিনতি করা। তার ছেলে গেছে বিদেশে খাটতে, ফসল কাটার সময় আরও নিকট হলে ফিরবে। কী করবে ভেবে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পিনাক।

বলে, মরণ হলে হাড় জুড়াত, অদেষ্টে মরণ নাই। সেই যে গোল বাধালে ছেলেটা নাথুর হয়ে সাক্ষি দিলে ফৌজদারি মামলায়, ধরণীর জরিমানা হল, সে রাগটা ঝাড়লে তরফদার। মরণ হলে হাড় জুড়াত, অদেষ্টে মরণ নাই !

সবাই জানে সব, বোঝেও সব। গিয়ে ধরে পড়লে যে কিছু হবে না এও সকলের জানা কথা। ভাঙা জীর্ণ শরীর নিয়ে ছুটোছুটি করে পিনাককেই ঠেকাতে হবে নিলাম, লড়তে হবে মিথ্যে মামলা ফাঁস করতে, অবশ্য যদি লড়তে পারে। তার ছেলে দুখিরাম এসে কেঁদেকেটে মাপ চেয়ে নাকে খত দিলে বড়ো জোর আপস হবে একটা, দয়া করে কিছু কমে-সমে রেহাই দেবে ধরণী। নয় তো যাবে জমি নিলাম হয়ে।

ঘনরাম শুধায়, দুখির শ্বশুর না মরো-মরো হয়েছিল ?

মরল কই ?

পিনাক বলে দারুণ হুতাশে, যে মরলে ভালো সে কি মরে ? উয়াব মরণ নাই, মোর মরণ নাই, মোর চিরজীবী হয়ে রইব। ধরণীটাও মরবে না !

ভূষণের শ্বশুরের দুটি মাত্র মেয়ে, সে মরলে তার জমি-জমা ঘর দুয়ার ভাগাভাগি করে মেয়েরা পাবে। তার অসুখ-বিসুখের খবর পেলেই জামাই দুজন ছুটে যায় দেখতে, এমনিও যখন তখন যায়। পূজার পর কঠিন রোগে পেড়ে ফেলেছিল, কিন্তু বুড়ো আবার বেঁচে উঠেছে।

এরাও অনেকে ধরণীর কাছে যাবে শুনে পিনাক বসে।

ডিসপেনসারির দরজা বন্ধ। কৈলাস ভাবে, কে জানে ঘরের ভিতরে বসে ধরণীর সঙ্গে তার বাপের মরণ কামনার ফোঁড়ন দেওয়া কাহিনি শুনতে শুনতে কী মনে হচ্ছে শুভর।

তখন নাকে তার ভেসে আসে দামি সিগারেটের গন্ধ !

গরিব বিপন্ন চাষিদের কথা শুনতে শুনতে মশগুল হয়েই কি শুভ সিগারেট ধরিয়েছে ? অথবা এমনিই তার খেয়াল নেই যে এ সিগারেটের গন্ধ শোঁকা চাষাভুসোদের অভ্যাস নেই ?

সে ডাক দিয়ে বলে, ও ডাক্তার, ঘরে বসে সিগ্রেট না টেনে বাইরে এসো না, এদের একটু বুদ্ধি পরামর্শ দাও ?

সে জানত নন্দ ঘরে নেই। তার বাড়িতে শুভর আসবার খবর দিয়ে সে ফেরেনি, জরুরি ডাকে চলে গেছে। রোগীর অবস্থা তার নিশ্চয় কাহিল, নইলে এতক্ষণে ফিরে আসত।

কাল্লু নিচু গলায় কৈলাসকে বলে, ছোটোবাবুর সাথে নাকি মোদের ডাক্তারবাবুর খুব খাতির হয়েছে ? হরদম আসেন যান ?

কথাটা শুনতে পেয়ে বিপিন বলে, কোনো মতলব আছে মন করে। মোদের ডাক্তারকে সাবধান করে দেয়া উচিত।

কৈলাস জোর দিয়ে বলে, না না, ও সব ভেব না। কারখানা-টারখানা করার মতলব আছে ছোটোবাবুর, খারাপ মতলব নেই। জ্ঞানীগুণী লোক, লেখাপড়া শিখে মানুষটা খাঁটি হয়েছে।

পিনাক বলে, তুমি জানলে কী করে মানুষটা খাঁটি হয়েছে ?

রকম দেখে জানা যায়। নেশা নেই, বদখেয়াল নেই, লেখাপড়া আব কাজ ছাড়া কোনো দিকে মন নেই। দেশের জন্য দরদ আছে—

ঘনরাম হেসে বলে, তুমি যে ছোটোবাবুর হয়ে ওকালতি শুরু করলে কৈলাস !

কৈলাস বলে, সত্যি কথা বলব না ? বাপকে দিয়ে ছেলের বিচার কবতে যাব কেন ? নিজে মন্দ কাজ করলে তখন নিন্দা করব।

শুভ ঘরেব ভিতর থেকে শুনছে জেনে অবস্থাটা কৈলাসের বেশ নাটকীয় মনে হয়।

কিন্তু নাটক যে তখন পর্যন্ত শুরু হয়নি এটা সে টের পায় বিপিনের মন্তব্য শুনে।

বিপিন তীব্র ঝালের সঙ্গে বলে, যা বললে দাদা, মন্দ কাজ করেনি, হাঃ ! বাপ মোদের রক্ত শুষছে, সে টাকায় মোটর চাপছে আরাম করছে—এটা খুব ভালো কাজ, না ?

কৈলাসকে বলতে হয়, যাক গে যাক, কাজের কথা বল। দেড়ভাগি কর্জ তোমবা ছোঁবে না ঠিক করলে তো ?

ফকির বলে, ইচ্ছা তো তাই। তবে কিনা পাঁচজনে মানলে না ছুঁয়ে উপায় থাকবে কী ?

ঘনরাম প্রশ্ন করে, ডাক্তার তো বার হল না ? এ কী রকম ব্যাপার ?

ভিতরে ব্যস্ত আছে। এবার তবে রওনা দাও, বেলা হয়ে যাবে।

পিনাকের সঙ্গে হেঁটে দীঘিপাড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে কুয়াশা খানিকটা হালকা হয়ে আসে, এবার তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। দীঘিপাড়ায় ঘন বসতি, টিন বা খড়ের চালার ঘরই বেশি, দালানও আছে কয়েকটা। সোনামাটির এই দীঘিপাড়া ও কুয়াতলাতেই গাঁয়ের যে কজন স্বচ্ছল, সম্পন্ন এবং গরিব ভদ্র গৃহস্থের বাস।

ধরণী এখনও দর্শন দান করেনি, তবে আর খুব বেশি দেরি যে তার হবে না অন্দর থেকে সদবে আসতে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তক্তপোশের ফবাশ ঝেড়ে বাঁধানো হুঁকোটা রেখে গেছে কানাই, বুড়ো ইন্দ্র সরকাব চোখে চশমা এঁটে খেরো-বাঁধানো খাতা খুলে বসেছে, ধরণীর ভাগনে আচমকা এসে উঁকি দিয়ে দেখে গেছে।

তারা ছাড়াও অনেকে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আগে থেকে অপেক্ষা করছিল, তারা বসতে বসতে আরও দুজন এল। রাজেন দাসকে দেখে একটু অবাক লাগে সকলের, তার অবস্থা ভালো বলেই জানত সকলে, বছরের কোনো সময় ভাতের অভাব হয় না। ধান কর্জ চাইতে এসেছে রাজেন দাস, না টাকা ? অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে ? যেমন বিপন্ন ভাব তার, কারও দিকে না তাকিয়ে যে ভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখ পেতে রেখেছে কদম গাছটায়, তাতে মনে হয় অনুগ্রহই বুঝি চাইতে এসেছে ধরণীর কাছে—যে কাজটা করা তার অভ্যাস নয়। সোনামুদ্দি আর তিনকড়িই বা কেন এসেছে কে জানে ? নিঃস্ব পথের ভিখারি হয়ে গেছে দুজনেই ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে, এক কাহন খড়ও নেই ওদের যে ধরণীর কাছে কোনো দয়া প্রত্যাশা করতে পারে।

পরস্পরের মধ্যে কথা চলতে থাকে ধীরে ধীরে, নতুন কিছু জানার বা বলার থাকলে জিজ্ঞাসা ও জবাব, দু-একটি শব্দে আপশোশ বা সমবেদনা প্রকাশ ! চিরকালের স্থায়ী দুঃখ-দুর্দশার কথা কেউ বলাবলি করে না, কারও অজানা নেই কার কী দায় বা দুর্ভোগের জের চলছে তো চলছেই, সে হিসাবে সবাই তারা সমান দুর্ভাগা, কমবেশি যদি হয়তো সেটা সাময়িক, জোয়ার-ভাটার খেলা মাত্র। রাজেন দাস পোড় খায়নি, তার লজ্জা করতে পারে, ঘরে অন্ন না থাকাটা দশজনের জেনে ফেলার মধ্যে তার লজ্জার কিছু থাকতে পারে, কিন্তু এটা যে অপৌরুষের বা অপদার্থতার প্রমাণ সেটা অন্যেরা বহুকাল আগেই ভুলে গেছে।

ভূষণের জিজ্ঞাসার জবাবে বাজেন দাস একটু কাঁচুমাচু হযেই বলে, একটু কাজে এয়েছি। দরকার আছে একটা।

শ্রীনাথ মাইতি বলে, আর দাদা, কপাল ! ফের মলজোড়া বাঁধা দিতে এয়েছি, ঘরে হাঁড়ি চড়া বন্ধ।

বলাবলি যা হয় সব চাষাড়ে কথা। হাটে-হাটে ধান-চালেব লাটসাহেবি দর, কেমন হবে এবারের ফসল, ভাগ, আবোয়াব আদায়, জুলুম ইত্যাদির কথা। আর সেদিন বামপুরে পত্তনিদার মদন শাসমলেব লোকের সঙ্গে চাষিদের যে মারামারিটা হয়ে গেল সেই আলোচনা। রাখাল একটা নতুন খবর এনেছে আজ, মদন শাসমলের ভাইপো না কি জখম হয়েছিল দাঙ্গায়, হাসপাতালে মারা গেছে। তার চেয়েও জবর একটা খবর শুনে এসেছে তিনু, সত্য কি মিথ্যা জানে না। হাঙ্গামার পর পুলিশ এসে রামপুরে ধর-পাকড়-জুলুম চালাচ্ছিল, হঠাৎ না কি পুলিশ চলে গেছে গাঁ ছেড়ে। একেবারে হঠাৎ, সকালেও দলকে দল পুলিশ হাজির ছিল, বেলা খানিক বাড়তে না বাড়তে মার্চ করে চলে গেল স্টেশন রোডের দিকে। তিনু এসেছে সকলের পরে এই অদ্ভুত কাহিনি নিয়ে, কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিযে সবাই যে জিজ্ঞেস করবে এক কথা দশবার কবে ব্যাপাবটা হৃদয়ঙ্গম করার দাবুণ আগ্রহে, তার সময়ও বেশি পাওয়া গেল না। ধরণী এল বৈঠকখানায়।

বলল, বেশ, বেশ। তোমরা এয়েছ দেখছি। তা বেশ, তা বেশ ; জয় দুর্গা শ্রীহবি। তামাক আনতে বুড়ো হলি শালার ব্যাটা ?

ঘরের মধ্যেই ভেতরের দরজার কাছে দাঁড়িযে কানাই কলকেতে ফুঁ দিচ্ছিল, নজর পড়ায় ধরণী বলল, এই যে এনেছিস।

একেবারে যে মোটা গোলগাল তা নয়, নাদুস-নুদুস চেহাবা ধবণী তরফদারের, বেঁটে বলে বেশি মোটা দেখায়। টানা চোখ, মুখখানা থ্যাবড়া না হলে হয়তো কোনোমতে মানাত, আর যদি ভুরু না হত দামাল মোচের মতো ঘন। টানা চোখে একবাব সে তাকিয়ে নেয় সবার দিকে, কে কে এসেছে, কেন এসেছে, মোটামুটি আন্দাজ করে নিতে। দিনকাল বড়ো খারাপ পড়েছে, একদিন সকালে বৈঠকখানায় নেমে যদি দ্যাখে যে একদল আধিয়ার হাতিয়ার নিযে অপেক্ষা করছে, মোটেই সে আশ্চর্য হবে না। ব্যবস্থা অবশ্য সে করে রেখেছে আত্মরক্ষার। দুনলা বন্দুকে ছর্‌রা টোটা ভরে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ভেতরের দরজার ও পাশে, রামদা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে বঘু আর বিষ্ণু। তাছাড়া, লোকজন সকলকে বলাই আছে যে, বৈঠকখানায় একটু হট্টগোল শোনামাত্র যে যেখানে থাকে ছুটে আসবে দা-লাঠি যা পায় হাতের কাছে তাই নিয়ে।

উপস্থিত এদের মধ্যেও তার ভাড়া করা লোক মিলেমিশে আছে দু-চারজন। ওরা তার চরের সামিল, চাষিরা কী ভাবছে কী পরামর্শ করছে খবরাখবর পৌঁছে দেয—হঠাৎ দরকার হলে ওরাও তাকে বাঁচাবে।

তবু, বলা তো যায় না। যা দিনকাল পড়েছে।

রাজেন যে ? খবর কী ?

রাজেনের দিকে তাকিয়েই কিছুক্ষণ হুঁকো টেনে ধরণী জিজ্ঞাসা করে।

একটু দরকার ছিল।

বোসো। জয় দুর্গা শ্রীহরি।

হাই তুলে তুড়ি দেয় ধরণী, বলে, শরীরটা ভালো নেই।

হুঁকো টেনে যায় ধরণী, খানিকটা চোখ বুজে, চুপচাপ। বিষয়কর্মে তার যেন মন নেই, এতগুলি লোক কেন তার কাছে এসেছে সে যেন জানতেও চায় না, পরম গভীর কোনো এক অপার্থিব চিন্তায় সে যেন ডুবে গেছে। নিজে থেকে সে কিছু বলবে না, তার গরজ নেই, এ জানা কথা। তোরাব একটু সামনে এগিয়ে বলে, মোরা কর্জের জন্য এয়েছিলাম কত্তা।

কর্জ ? তা বেশ। ফজলু মিঞার খবর কী?

তেনা ভালো আছেন। তা, তেনা কাত্তিকে দেড়ভাগি আপস চান তাই আপনার কাছে এয়েছি।

বটে ? তা বেশ। কাত্তিকে দেড়ভাগি অন্যায় জুলুম বটে।—ধরণী যেন মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসে হঠাৎ, মুখটা দেখায় গম্ভীর : ইন্দ্র, ধান কি আছে কর্জ দেবার মতো ?

কিছু আছে। অল্প-স্বল্প দেয়া যায়।

তখন ধরণী বলে, শোনো বলি, কাত্তিকে দেড়ভাগি চাইব না আমি, আমার বাপু বিবেক আছে। ও সব গোলমালে কাজ নেই। ধানের বাজার-দরে ধান দেব, টাকায় সুদ ধরব—ধরণী গলা খাঁকরায়,—সুদখোর মহাজন হলে আট আনা ধবত, চার আনা দিয়ো, তাই ঢের।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় উপস্থিত সকলে। সকলে মরিয়া হয়ে প্রাণপণে নাড়াচাড়া করে প্রস্তাবটা মনে মনে, বোকা চাষাভুসো মানুষ, কথাটার যে মানে বুঝেছে তা হয়তো ভুল, হয়তো অন্য মনে আছে।

তোরাব বলে, কত্তা ?

রাজেন দাস বলে, এটা কী বলছেন ?

কেন ?—ধরণী আশ্চর্য হয়ে যায়,—দেড়ভাগিতে মনে আধমন সুদ দিতে হত তোমাদের, টাকায় আট আনা। আমি কি চামার, মাসে আট আনা সুদ চাইব ? চলতি দরের হিসেবে টাকার খত দিয়ে ধান নাও, চার আনা সুদ দেবে, টাকায় বা ধানে যা তোমাদের খুশি।

ধানে শোধ দিলে—? সংশয়ভরে প্রশ্ন করে একজন।

ধানেই দিয়ো, নির্বিকারভাবে বলে ধরণী, টাকায় চার আনা ধরে দর হিসেবে ধানেই দিয়ো।

এবার জ্বালা বোধ করে সকলে। এতই বোকা ঠাউরেছে তাদের ধরণী তরফদার ? আজ ধানের দর কোথায় ফসল ওঠার আগে, ফসল উঠলে তা কোথায় নেমে যাবে। চার আনা সুদ !—বিনা সুদে এই কড়ারে ধান কর্জ নিলে দেড়ভাগি হিসাবেরও অনেক গুণ বেশি ফিরিয়ে দিতে হবে ধরণীকে। ব্যাটা ধড়িবাজ ডাকাত।

রাখাল বলে, আজকের চোরাবাজারি দরে মোরা ধান নিতে পারি কত্তা ? চার আনা সুদে ?

তবে দেড়ভাগি হিসেবে নাও।

পুলিন যেন হাঁফ ছাড়ে, ধরণীর চলতি দরের হিসাবে কর্জ দেবার প্রস্তাব শুনে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল !

তাই দেন, কত্তা তাই দেন।

রও দাদা, রও। তড়ফিয়ো না অত।—তোরাব বলে ধমক দিয়ে, দেড়া ভাগির কর্জ মোরা ছোঁব না কেউ।

বটে না কি ? মুচকে হাসে ধরণী, তুমি দেখছি নেতা হয়ে উঠেছ তোরাব। তা হম্বিতম্বিটা ফজলু মিঞার হোতা করলে হত না ? জাতভাই ছিল, তারিফ করত ?

গরিব চাষার জাতভাই !

তোরাবের এই কথার পিঠে কথা চাপিয়ে খোঁচা দেবার স্পর্ধায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ধরণী দুবার গলা-খাঁকারি দিয়ে গম্ভীর মুখে তামাক টানতে থাকে। তার ভাবটা এই যে, এতই যদি তেজ তোমাদের, আমার কাছে এলে কেন বাপু ?

এক কাজ কেন করেন না সামন্ত মশায় ? রাজেন দাস বলে মধ্যস্থের ভঙ্গিতে, ছ-আনা মেনে নেন। দেড়পো ভাগেই ধানটা দিয়ে প্রাণটা বাঁচান গরিবদের। আপনার কথাও থাক মোদের কথাও থাক।

বাজারে যেন দর করছে জিনিসের !

তোমার কাছে দুআনা কিছু না রাজেন দাস, রাখাল বলে, তোমার ভাত খায় কে। ওই দুআনায় মোদের মরণ-বাঁচন।

নিতে আর কী, সোজা কাজ, তিনু বলে, দিতেই যে শ্বাস ওঠে রে দাদা।

পুলিন বলে, কত্তা যদি দয়া করেন—

কচকচিতে কাজ কী ? হাকিমের রায় দেবার সুরে বলে ধরণী, হাট না বাজার পেলে তোমরা এটা জিগ্যেস করি ? দরাদরি কোরো না বাপু। ধানের দরে টাকার সুদে না তো দেড়ায় নেও তো নেবে, নয় তো এসো গে ভালোয় ভালোয়। সোজা কথা।

এর পর আর কথা কী ?

মুহ্যমানের মতো তারা বসে থাকে। তোরাব ভাবে বাহরণের কথা, ভরামাসের উঁচু পেটে দু-রোজ অন্ন পড়েনি। চেষ্টা করে উচিত সুদে ধান মিলল না। আরও যদি চেষ্টা করে দেখতে চায়, আরও দু-একরোজের উপোস কি সইবে বাহরণের ? ওর কিছু হলে তখন বিনা সুদে ধান পেলেই বা কি লাভ হবে তার। ভূষণ ভাবে রোগা ছেলেটার কথা, প্রথম বিয়ানি মেয়েটার কথা, তাকে নিতে কাল জামাই এসে দুদিন থেকে যাবে, সে কথা। রসিক হিসেবি, সে ভাবে, চার বিঘে খাজনা জমির যে পনেরো-ষোলো মন আর তিন বিঘে ভাগের চাষের পাঁচ-ছ মন থেকে আবোয়াব আদায় বাদে থাকবে মোটামুটি পনেরো মন, আগের কর্জা বাবদ যাবে সাড়ে তিন মন সুদে আসলে, দু-একমাস বাদে ভিটে বাঁধা না দিলে মরণ নির্ঘাত—দেড়ভাগিতে আজ ধান কর্জ না নিলে তাকে আগেই বাঁধা দিতে হবে ভিটেটা, তার চেয়ে দেড়ভাগি মেনে নিলে এখন তো বাঁচবে ফসল তোলা তক। রাখাল ভাবে, বেশি খেটে খরচা কমিয়ে, কম খেয়ে নয় পুষিয়ে নেবে বাড়তি সুদটা উপায় কী। তিনু ভাবে, আচমকা লাফিয়ে উঠে তরফদারের টুঁটিটা যদি কামড়ে ধরে, মরণ-কামড় দেয় একেবারে, নিজে মরবে তবু ছাড়বে না এমনি কামড় বসায়, তরফদার কি মরবে, না শুধু তার মরণ-খাটুনিই সার হবে ? সবাই ভাবে এমনিভাবে, ক্ষোভে হতাশায় জ্বলে যায় সবার বুক, এক সুরে অভিশাপ বাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণগুলিতে : মরুক, মরুক তরফদার, শকুনে ছিঁড়ে খাক তাকে।

এতগুলি মানুষের তীব্র প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে এতটুকু অদল-বদল এদিক ওদিক হয় না ধরণীর বার-কাছারির আদালতি চালচলন ঠমক আর কার্যপদ্ধতি। আইন ছাড়া এখানে কথা নেই, আইনের মারপ্যাঁচ ছাড়া। ধরণী তরফদারের কাছারিতে তার বিধান ছাড়া রীতিনীতি নেই, তার চালবাজি ছাড়া গতি নেই। চাষিরা রাজার আদালতও জানে, জোতদারের কাছারিও জানে—একটু বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জানে। প্রত্যেকের মনে হয় সে যেন খুনি আসামি। ফাঁসির দড়িটা গলায় দেবার দিনটা ক-দিন পিছিয়ে দেওয়াই অসীম দয়া হাকিম আর জোতদারদের।

ঢিমেতালে কাজ চলে। শ্রীনাথ মাইতি লোচন সরকারের হাতে বউয়ের মল দুটি তুলে দিয়ে ঠায় বসে থাকে একঘণ্টা, তার পর দয়া করে কটা টাকা তাকে দেওয়া হয় দুমাসের সুদ কেটে রেখে।

আগের বার আগাম সুদ তো কাটেননি কত্তা ?

শ্রীনাথ নিবেদন জানায় সবিনয়ে।

আগের বার জানতাম সুদ দিতে পারবে, তাই কাটিনি! ধরণী তাকে বুঝিয়ে দেয়, আসল টাকাটা এবারে মারা যাবে কি না খটকা আছে বাপধন !

খানিক চুপচাপ মাথা ঘামিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে হয় শ্রীনাথের। রুপার মল বাঁধা দিয়েছে, বোধ হয় আদ্দেক দামে। আসল না দিক, সুদ না দিক, রুপার মল দুটো তো থাকবে ধরণীর। তবে তার লোকসানের ভয়টা কীসের ?

মল তবে ফেরত দেন কর্তা।—একটাকার নোট কটা শ্রীনাথ বাড়িয়ে দেয় লোচনের দিকে, মল বেচেই দেব সুধী কামারকে, আর বাঁধা রেখে কাজ নেই।

আর হয় না, লেখাপড়া হয়ে গেছে, ধরণী বলে গম্ভীর আওয়াজে, বেচে দিলেই পারতে ? গোড়াতে বললেই হত ?

রাজেন দাস বলে, অনভিজ্ঞ বোকার মতোই বলে শ্রীনাথের পক্ষ নিয়ে, ভুল করে বাঁধা দিয়েছে, ছাড়িয়ে নিতে চায়।

নিক।

উদাসভাবে অনুমতি দেয় ধরণী।

মল ছাড়িয়ে নাও না ছিনাথ ? এ তো সোজা পথ !—রাজেন উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু তা তো হয় না। মল বাঁধা রেখে এখুনি যে টাকাটা পেয়েছে শ্রীনাথ, সে টাকা দিয়ে তো আর ছাড়ানো যায় না মল—লেখাপড়া হয়ে গেছে ! লেখাপড়া বাতিল হতে পারে না।

উকিলবাবুকে ফি দিলে না ছিনাথ। এমন পেটোয়া পরামর্শ দিল ? ওকালতি করলে তোমার ভালো পশার হত রাজেন।

ধরণী বলে হাসিখুশি ভরা ব্যঙ্গে, তার পরেই গর্জে ওঠে, যাক যাক। ছিনাথের দুটো রুপোর মল নিয়ে আমি রাজা হব ! লোচন, মল ফিরিয়ে দাও। লেখো যে সুদ-সমেত কর্জের টাকা পরিশোধ করায় মল ফেরত দেওয়া হইল। টিপসই নাও ছিনাথের যে মল ফেরত পেল। আর তোমাকে বলি ছিনাথ, ফের যদি তোমাকে দেখি এখানে, কান ধরে জুতো মেরে দূর করে দেব।

শ্রীনাথ সকাতরে বলে, কত্তা, মাপ করেন। পা-ধোয়া জল খাই, মাপ করেন।

কিন্তু ধরণী আর তাকায় না তার দিকে। গর্জন করে যে হুকুম দিয়েছে ধরণী তা পালন করতে চরম গাফিলতি দেখা যায় ইন্দ্র সরকারের, অথচ তার সামান্য একটি ইঙ্গিত মানতে পর্যন্ত সে কখনও ভুল করে না। মল শ্রীনাথ মাইতির দখলে আর যায় না। অগোচরে কোনো ইঙ্গিত বা সংকেতই বুঝি করে থাকবে ধরণী ইন্দ্রকে।

অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে থেকে শ্রীনাথ তাগিদ দেয়, ম ন ' দেন ?

টাকাটা সে বাড়িয়ে দেয়।

খাতার পাতা থেকে চোখ না তুলেই ইন্দ্র ফ্যাঁচ করে ওঠে, দাঁড়াও বাবু, নুলো বাড়িয়ো না। দেখছ না ভিড় ?

অন্যদের আবেদন নিবেদনের ফাঁকে কাল্লু আর ফকির তাদের প্রার্থনা জানায়, কেউ কান দিচ্ছে মনে হয় না। ধরণী কয়েক মুহূর্ত নির্লিপ্তভাবে তাকায় তাদের দিকে, তারা উৎসাহিত হয়ে ওঠে, মনে হয় ধরণী বুঝি শুনছে তাদের কথা। তেমনি নির্লিপ্তভাবেই চোখ ফিরিয়ে নেয় ধরণী।

পিনাক সাহস করে সামনে এগিয়ে যায়, বলে .মাম একটা বিহিত করেন কত্তা, তুমি ধম্মোবাপ, মশাটারে মারতি নিলামের নুটিশ কেনে ডাকিয়ে এক থাপড় দিতেন। তোমার সাথে বিবাদ করে বুকের পাটা কার ?

তুমি কে বটে ?

তাকে চিনতে পারে না ধরণী !

পিনাক সামন্ত, হুজুর।

তাকে না .চনা হাস্যকর হত অন্য অবস্থায়, এখানে বেশ মানিয়ে যায়, জোতদার রাজার অবজ্ঞা আর চাষি প্রজার হা-হুতাশ ঠাসা এই কাছারি সভায়।

দুখীরামের বাপ এনা—মহেন্দ্র আরও চিনিয়ে দেয়।

মহেন্দ্র ধরণীর লোক, বিশেষ কোনো দরকার বা দরবার তার নেই, এমনি এসে বসে আছে একপাশে উবু হয়ে, আনুগত্য জানাতে।

সে বলে, ওর ছেলের কত কাণ্ড। বিলের ধারে জমিটা ভাগে নিয়ে তেভাগা চাইছিল। তোমার মনে নেই ধরণী ?

ধরণী একটু বিরক্ত হয়ে কড়া চোখে তাকায়।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলে, মনে তোমার অবিশ্যি আছে। তুমি কী ভুলবার না ভুল করবার মানুষ ! ক্ষমা ঘেন্না করতে চেয়ে নিজের লোকসান কর। তোমার কাছে ধান টাকা কর্জ না পেলে কেউ বাঁচত ?

মস্ত একটা ভুল চাল দিয়ে ফেলেও মহেন্দ্রকে বিশেষ দুঃখিত বা চিন্তিত মনে হয় না। ধরণী নিজেই তাকে বাহাল করেছে মোলায়েম বিরোধিতার ভূমিকায়। চাষিদের পক্ষ নিয়ে মহেন্দ্র মাঝে মাঝে ধরণীকে খোঁচা দেবে, সমালোচনা করবে। চাষিরা তাকে ভালোবাসবে—তার কথা শুনে চলবে। সে অনেক চাষিকে বলি করে এনে দিয়েছে ধরণীর দরবারে। একটা ভুল করেছে বলেই চোখ রাঙালে চলবে কেন ! তাকে ছাড়া তো উপায় নেই ধরণীর।

ধরণী চোখ বুজে মিনিট দুই তামাক টানে।

তোমার ও নিলামের ব্যাপার আমি কিছু জানি না সামন্ত। যা বলার অশ্বিনীকে বোলো।

অশ্বিনী সিকদার ধরণীর কর্মচারী। সে যে হাজির নেই লক্ষ করেছিল সবাই। এতক্ষণে সকলে খেয়াল হয় যে বেলা হয়ে গেছে অনেক, আবেদন-নিবেদন দরবারে ঘটা চলেছে রোজকার মতোই কিন্তু কাজ বিশেষ এগোয়নি। যা হয়েছে সাদামাটা কাজ, ঘটি-বাটিটা বাঁধা রাখা, সুদ জমা দেওয়া, অনুগ্রহ মঞ্জুর পেয়েও যারা কদিন ধরে হাঁটাহাঁটি করছে তাদের দু-একজনের নিষ্পত্তি করা। তোরাবদের দেড়ভাগির আর শ্রীনাথের মল বাঁধার টাকা থেকে আগাম সুদ কেটে রাখার প্রতিবাদ ছাড়া কোনো বিশেষ বা নতুন নালিশ প্রার্থনার মীমাংসায় স্পষ্ট রায় দেয়নি ধরণী। নছিবনের নাকছাবিটি হাতেই আছে জৈনুদ্দীনের। আগামী ফসলের ভাগ বেচে দিয়ে আজই নীলমণি চলে যাবে গাঁ ছেড়ে, পড়তা বা দর কিছুই সে জানতে পারেনি এখনও। ধরণীর শর্তেই আপস চেয়ে বসে আছে গড়পা-র বিষ্টু মালিক আর কান্দুলির সোনামদ্দি সরকার ; শর্ত দূরে থাক আপস মানবে কি না ধরণী তাও তারা জানে না।

সিকদার মশায় এসবেন না সরকার মশায় ?

এসবে, এসবে।

কুয়াশার চিহ্ন নেই বাইরে, শীতের গোড়ার দিকের তাজা চনমনে রোদ। নতুন বাছুরটা থেকে থেকে তড়পাচ্ছে সামনের মাঠে, গায়ে যেন তার সাদা লোমের ফেনা মাখানো। বন্যা আর বড়ো মন্বন্তরে চাকা-ভাঙা জীবনযাত্রার চাষাড়ে যানটি প্রায় অচল হয়েছে, শোষণ আর অব্যবস্থার পাহাড়ে ঠেকে, এইখানে যাত্রা শেষ কি না জানে না কেউ—আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত হয়ে আছে বুকগুলি, সর্বদা জ্বলে। ধরণীর এই কাছারিতে অল্প প্রত্যাশা নিয়ে এসে বসে থাকতে থাকতে সমস্ত আশা-ভরসার লেশটুকু পর্যন্ত উপে গিয়েছে, ভগবান এবং আল্লাও যেন এই তাজা রোদের উজ্জ্বল সকালে অস্ত গেছেন চিরতরে।

তবু কাছাকাছি এসে বসেছে যখন সকলে তারা, চিন্তা-ভাবনা ভুলেই যেন নিজেদের মধ্যে ধীরে-সুস্থে তারা আলাপ করে নিরুত্তেজ শান্ত কণ্ঠে, ধৈর্যের যেন তাদের সীমা পরিসীমা নেই।

পরস্পরের ঘরোয়া সুখদুঃখের কথা।

ফসলের কথা।

তার মধ্যে অল্পে অল্পে আলাপের বিষয়টা আবার কেন্দ্রীভূত হতে থাকে রামপুরের ঘটনায়। সকলেই উৎসুক কৌতূহলী হয়েছিল ও ব্যাপারে। অভাব অনটন রোগ শোক দুর্ভাবনার কথা যেন ক্রমে ক্রমে চাপাই পড়ে যায় রামপুরের ঘটনার আলোচনায়। ওই নিয়েই বলাবলি করে সকলে। প্রতাপ দিঘিকে দিঘি বলা হলেও আসলে সেটা প্রকাণ্ড একটা বিল, এক ক্রোশ চওড়া দেড় ক্রোশ লম্বা হবে। কবেকার দিঘি, কোনো রাজা বা নবাব বানিয়েছিল অথবা প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি করেছে কেউ জানে না। বিলের চারিদিকে ঘুরলে বোঝাও যায় না মানুষ কোনোদিন বাঁধ দিয়েছিল কি না অথবা এমনিই কিছু বাঁধের মতো উঁচু হয়ে আছে বিলের চারিদিকের মাটি।

বর্ষায় থইথই করছিল বিলটা বিনা নোটিশে যখন সর্বনাশা লোনা জলের বন্যা এল। প্রায় সমতল হল দিক্-দিগন্তে ছড়ানো অথৈ বন্যা আর বিলের জল, কিছু লোনা হল বিলের জল, তবে খুব বেশি নয়।

পরের বর্ষায় প্রায় কেটে গেল বিলের জলের অল্প লোনা স্বাদটুকু !

ডোবা পুকুর দিঘি ভাসিয়ে সাফ করে নিয়ে গেছে বন্যা। মাছ গিজগিজ করছে প্রতাপ বিলে। জগদীশের ম্যানেজারের হাতে টাটকা কড়কড়ে নগদ টাকার অনেকগুলি নোট গুনে দিয়ে বিলটা জমা নিয়েছে মদন দাস। সে আবার বিলটা বিলি করে দিয়েছে জেলেদের কাছে মোটা সেলামি আর চড়া বন্দোবস্তে, নগদ পেয়েছে খুব কম, কারণ জেলেদের তখন আধপয়সা নগদ দেবার সাধ্য ছিল না কয়েকজন ছাড়া। তাতে ক্ষতি বা আপত্তি ছিল না মদন দাসের—নগদ যে বেশি পায়নি সেটা ভালো করেই পুষিয়ে নিচ্ছে।

এদিকে জলের অভাবে ফসল বাঁচে না চারিদিকের শত শত বিঘা জমিতে। আগের বছর উর্বরা খেতকে বন্যা মেরেছে, পরের বছর মেরেছে অসময়ে অতিবৃষ্টি আর সময়ে অনাবৃষ্টির দাপটে এ বছরও মারতে চাইছে কৃপণ আকাশ, পক্ষপাতী ইন্দ্র। তা চাষিরা ভাবে কী, দেবতা এক হাতে বজ্রের কারবার করুক, আরেক হাতে করুক অপ্সরাদের বস্ত্রহরণ, তাদের একটু জল পেলেই হয় ! লাখো লাখো সবুজ চারা শিষ বিয়োতে উদ্যোগী হয়েও রসের অভাবে বিবর্ণ হতে হতে বাতাসে দুলছে, শুকিয়ে মরবে না মা হবে কতগুলি জীবন্ত দানার ? বিলের কিছু জল পেলে তারা বাঁচে—বাঁচাতে পারে কয়েকজন মানুষকে।

তাই, চাষিরা চাইল, প্রতাপ বিলের জল কিছু তাদের খেতে আসুক। মদন দাস বলল, বিল থেকে এক ফোঁটা জল অপচয় হলে হাজার হাজার টাকার মাছ প্রাণত্যাগ করবে ! জল দেওয়া চলতে পারে না।

চাষিরা বলল, ধম্মোবাপ ! এক হাত দেড় হাত জল নামা হলে কী হবে মাছের ? জলের খাজনা নেন, জল দেন।

কিন্তু বিলের মাছেদের প্রতি বড়োই দরদ মদন দাসের, জল কমিয়ে তাদের অসুবিধা ঘটাতে সে রাজি নয় ! তার খাস জমিতে আর তার বর্গাদের জমিতে বিল থেকে জল সেঁচে দেওয়া হচ্ছে, অন্যের জমির ফসল নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই।

সে বলল, জল কি আমার ? জেলেদের জমা দিয়েছি, ওরা জলের মালিক।

মরিয়া চাষিরা একদিন পাড় কেটে বার করতে গেল জল। জেলেদের দিক থেকে বিশেষ বাধা এল না, মদনের আদায়ের বহরে মাছ ধরে তাদের বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। মাছ ধরার শর্ত ব্যবস্থার অদল-বদল চেয়ে বারবার ধর্না দিয়ে ফল পায়নি। মদনের ভাগনে বীরেন আর চোপীন জেলের উসকানিতেও কয়েকজন ছাড়া জেলেরা হাত গুটিয়ে রইল। মারামারি হল এক রকম মদনের লোক আর চাষিদের মধ্যে।

কিন্তু সরকারি হিসাবে সেটা দাঁড়াল চাষি ও জেলেদের মধ্যে দাঙ্গা। খবরের কাগজে রিপোর্টও বার হল সেই ভাবে।

এ সব জানা কথা। টাটকা খবর হাসপাতালে আহত বীরেনের মৃত্যু আর বলা নেই কওয়া নেই রামপুর ছেড়ে পুলিশের অন্তর্ধান।

তিনু বলে ভূষণ আর তোরাবকে, বিত্তান্ত শুনি নাই সব। চাষি আর জেলেরা না কি একজোট হয়েছে এই মাত্তর খপর।

ভূষণ বলে জৈনুদ্দীনকে, চাষি আর জেলেরা না কি একজোট হয়ে আপস-টাপস কী করে ফেলেছে।

জৈনুদ্দীন জানায় বিষ্টুকে, মিটমাট করিয়েছে বুঝি চাষি আর জেলেরা একজোট হয়ে—চেপেছে মদনকে। তাই সরে গেছে পুলিশ !

মুখে মুখে জানাজানি হয় যতটুকু জানা গেছে। মুখে মুখে বলাবলি হয় অনুমান।

যা বলেছ। গাঁয়ের মানুষকে জোট বাঁধতে দেখলে আর থাকে ?

বাবা, ভোলে নাই তো সে সনের শিক্ষে !

চটপট পালিয়েছে ল্যাজ গুটিয়ে ! কী জানি কী হয়।

অনুমানটাই স্পষ্ট রূপ নিতে নিতে প্রায় সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে দাঁড়িয়ে যায় যে রামপুরের চাষি আর জেলেদের জোট বাঁধতে দেখে পুলিশ ভয়ে সরে পড়েছে গাঁ থেকে।

তারপর আসে অশ্বিনী।

গায়ে পুরোনো র‍্যাপার, মাথায় কানঢাকা গোল উলের টুপি, মোজা-পরা পায়ে ধূলিধূসর চটি জুতো। মানুষটা রোগা, মুখে একটা যাতনা ভরা বিমর্ষতার চিরস্থায়ী ছাপ।

তাকে দেখেই সাগ্রহে ধরণী বলে, হল ?

না বাবু।

শুনে বিমর্ষ হয়ে যায় ধরণী।

নিজের জায়গায় বসে অশ্বিনী, ধরণীর ডান পাশে সামনের দিকে অল্প তফাতে, তার দিকে পাশ করে। এ ভাবে বসে কাজের সুবিধা হয়। বাঁয়ে মাথা ঘোরালে ধরণীর সঙ্গে মুখোমুখি হয় অথচ মুখটা প্রায় চোখের আড়াল হয় উপস্থিত লোকদের, ডাইনে মুখ ঘোরালে মুখোমুখি হয় ওদের সঙ্গে। ধীরে সুস্থে ঢিমেতালে প্রায় যেন ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই সে চটপট কাজ সারে, কোনো বিষয়ে তার দ্বিধা সংশয় নেই। মাঝে মাঝে কিছু বলার আগে হয়তো দু-একটা কথা বলে নেয় ধরণীর সঙ্গে, হয়তো শুধু একবার তাকিয়ে নেয় চোখে চোখে।

নীলমণি মিনতি জানায়, সিকদার মশায়, আইজ বেলাবেলি রওনা না দিলে মারা পড়মু।

অত তাড়া কেন হে বাঙ্গাল, অশ্বিনী বলে টেনে টেনে, বেলা যায় নাই। দেন তো ওর হিসাবটা মিটিয়ে সরকার মশায়। চার দেড়ে ছমন আটের দরে ছত্রিশ টাকা। ছাঁটাই মাড়াই খরচ-খরচা বাদে তিরিশ টাকা দেন রসিদ নিয়ে।

ইটা কী কন ?

নীলমণি বলে ভড়কে গিয়ে, বিঘায় দেড় মন ধরলেন আধাভাগ, চার পাঁচ মন ফসল হয় ? দর দিলেন ছ-টাকা।

তোমার দেখি মাঠে ফসল গোঁফে তেল !

অশ্বিনী বিড়ি ধবিয়ে বলে, ভগবান না কি তুমি পাকতে পাকতে কিছু হবে না ফসলের জেনে বেখেছ ? দর কী দাঁড়াবে তাও জেনেছ ? ঠিকানা রেখে যাও, ধান বেশি হয়, দর বেশি হয়, পাওনা টাকা মনিঅর্ডারে পাবে।

গোপাল ভাঁড়ের মতোই যেন রসিকতা করেছে একটা এমনি ভাবে কয়েকজন হেসে ওঠে।

হাসপাতাল হয়েই বাড়ি ফেরে ঘনশ্যাম। বারতলার ছোটোখাটো লোক দেখানো হাসপাতাল, একটি পাকা ঘর ও একটু চালা। ওষুধ বা পরামর্শ কিছুই পাওয়া গেল না, সময় পার হয়ে গেছে। আটটার আগে না এলে ও সব মেলে না।

বেদম জ্বরটা ছেড়েছে ডাক্তারবাবু, তবু বড়ো বেশি রকম ছটফট করছে--

কাল এসো, কাল।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সে মড়াকান্না শুনতে পেল। কয়েকটি স্ত্রীলোকের গলার মধ্যে দয়াব গলাটি সব চেয়ে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট।

গাঁদাও কাঁদছে জায়েব সঙ্গে।

৫

বিষ্ণু চক্রবর্তীর বাড়ি সদর টাউনে। শুধু এই এলাকায় নয় আরও ছড়ানো তার নাম, লোকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে। তেভাগা আন্দোলনে জেলে গিয়েছিল, সদ্য ছাড়া পেয়েছে।

দু-চারদিনের মধ্যে তার এদিকে আসার কথা। একটা জাঁকালো রকম সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন হচ্ছে। পয়সা খরচের হিসাবে নয়, লোক জমানোর হিসাবে জাঁকালো সংবর্ধনা।

তা, খবর পেলে লোক জমবে তাতে সন্দেহ নেই।

নন্দর ডিসপেনসারিতে বসে এই কথাই কৈলাস আলোচনা করছিল, এমন সময় এল গাঁদা। সঙ্গে কেউ নেই, অল্প একটু ঘোমটা টেনে একলাই এসেছে। উত্তেজনা চেপে রাখতে নিশ্বাস ফেলছে ছোটো ছোটো।

দেখতে গেছলেন কাল ? কেমন আছে ?

ভালোই আছে ; শরীরটা একটু দুর্বল, সেরে যাবে।

গাঁদা আঙুলের কোণটা আঙুলে জড়ায়। তার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। চোখ তুলে দুজনের দিকে একবার চেয়ে মাথা নামায়। মৃদুস্বরে বলে, বিষ্ণুবাবু ছাড়া পেল আরেকজন কবে ছাড়া পাবে ?

দুজনকে চুপ করে থাকতে দেখে তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে কৈলাসের দিকে চেয়ে গাঁদা অভাবনীয় ব্যঙ্গ আর ঝাঁজের সঙ্গে আবার বলে, বুঝতে পারছ না কৈলেসদা ? তোমার খাতিরের ছোটো শালা গো, শম্ভু নাম দিয়ে তোমরা যাকে জেলে পাঠিয়েছ।

নন্দের দিকে সে তাকায় না। বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে আধখানা পিছন ফিরেই থাকে। কুটুম সম্পর্কে সে শুধু কৈলাসের শালার বউ নয়, তার সঙ্গে নিবিড় স্নেহের ঘনিষ্ঠতাও আছে। গাঁয়ের চেনা মানুষ জানা ডাক্তার, —নন্দের সঙ্গে এইটুকু তার সম্পর্ক। নন্দ যেন হাজির নেই এই ভাণটুকু ছাড়া এই সুরে এমন ভাবে কথা কওয়া চলে না তার মতো ছেলেমানুষ বউয়ের।

কৈলাস একটু ভড়কে গিয়ে বলে, তোর ভাতারটিকে কেউ জেলে পাঠায়নি, শম্ভু নামও দেয়নি। সে নিজেই নাম ভাঁড়িয়ে জেলে গেছে। কিন্তু তুই কার কাছে শুনলি গাঁদা ?

তুমি আর কথা কয়ো না কৈলেসদা। লক্ষ্মীদিকে সব বলতে পেরেছ, চেপে যাওয়া হল মোর কাছে ? কী মানুষ তুমি মাগো ! লক্ষ্মীদিকেও বলিহারি যাই। একটা মানুষের ছ-মাস খোঁজ নেই, দিবারাত্তির ভেবে মরছি—

জেলে আছে শুনে ভাবনা কমেছে নাকি ?

কমবে না ? মানুষটা যেখানে হোক বেঁচেবর্তে আছে হদিস মিলল, ধড়ে প্রাণ আসবে না ? অ্যাদ্দিন কী বলে কথাটা চেপে রেখেছিলে নিজেদেব মধ্যে ?

যার কথা তাবই হুকুমে। ওকে চিনতাম শুধু আমি, আমায় পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল কাউকে কিছু বলতে পাব না। তোর কথা ভুলিনি, স্পষ্ট শুধিয়েছিলাম, গাঁদাকে চুপিচুপি বলব তো ? কিন্তু শালার হুকুম মেলেনি। পরিষ্কার বলে দিয়েছে তোকে জানালেও সাংঘাতিক বিপদ ঘটবে। আমি তবু লক্ষ্মী আর ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেছিলাম, কী করা যায়। ওরাও বললে, কেন নাম ভাঁড়িয়েছে, কেন সবাইকে বলতে বারণ করেছে, এ সব না জেনে চুপ কবে থাকা ছাড়া উপায় নেই। শেষকালে হিতে বিপরীত হবে ?

গাঁদা যেন কান খাড়া করে শোনে। নন্দের বিস্ময় কমতে চায় না। গাঁদাকে সে শক্ত তেজি মেয়েই বলে জানত, কিন্তু এতটা জানত না। এমন একটি অল্পবয়সি বউ একা তার ডিসপেনসারিতে এসে এতখানি মুখরা হয়ে উঠতে পারে আবার এমন ধীব একাগ্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে শুনতে পাবে যে সব কথা তার হৃদয়কে তোলপাড় করে দিচ্ছে, এটা সত্যই নন্দের ধারণাতীত ছিল।

কৈলাস বলে, জানিস দিদি, জেলে একবার দেখা করতে যেতে পারিনি, সোজাসুজি খবর নিতে পারিনি। বাবুর আসল পরিচয় যদি ফাঁস হয়ে যায় ! শম্ভু দাস নাম, পাকিস্তানেব উদ্‌বাস্তু—একী আর ওরা বিশ্বাস করেছে ? আগে কোনোদিন কিছু করেনি, পয়সা কামাতে কলকাতা গিযে দু-তিনটে মাস একটু বাড়াবাড়ি করেছে, নাম-ঠিকানা জানিয়ে দিলে অ্যাদ্দিনে বোধ হয খালাস পেযে যেত। তোব ভাতারের নিজের মতলবটা কী জানা গেল না সেটাই হয়েছে মুশকিল।

ভাতার ভাতার করছ কেন ?

ভাতার বলেই তো রোজগার করতে খেদিয়েছিলি।

ইস্ ! নিজের পেট নেই ? নিজে বুঝি ন্যাংটো হয়ে থাকে ? সব দোষ আমার, না ?

কার দোষ তবে ? এই শাড়িটা তো ছিল, ছেঁড়া ফ্যাসা কাপড় পরেছিলি কেন ? কোঁদল করেছিলি কেন ?

গাঁদা দুহাতে মুখ ঢাকে।

তাও বলেছে তোমায় ?

বলবে না ? বেচারা গেল আদর করতে, শুনিয়ে দিলি চটাং চটাং কথা !

আঃ, চুপ করো না ?

গাঁদাকে আজ যেন বেশি রকম কনেবউ মনে হচ্ছিল। এতক্ষণে নন্দ খেয়াল করে চেয়ে দ্যাখে যে গাঁদার গায়ে দামি কাপড় উঠেছে—বিয়ের শাড়ি নিশ্চয়। এ কাপড় শখ করে সে পরেনি সেটা জানা কথা। গাঁয়ের পথে বার হবার মতো সাধারণ কাপড় থাকলে গাঁয়ের মেয়ে-বউ এক রকম সাজ করে না। আস্ত কাপড় নেই, লজ্জা ও অভাব বোঝে না, উপায় কী ! শুধু গাঁদা নয়, দু-একখানা যা তোলা ভালো কাপড় সম্বল ছিল তাই আজ আরও অনেককে পরতে দেখা যায়।

কৈলাস একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, তোকে খবরটা কে জানাল তা তো বললি না গাঁদা ?

চিঠি লিখেছে।

চিঠি ? ইদিকে আমায় হুকুম দিলে চুপচাপ থাকো, ডাকে চিঠি লিখল তোর কাছে ?

ডাকে লেখেনি। বিষ্টুবাবুর হাতে পাঠিয়েছে। এই তো খানিক আগে সাঁতরাদের নতুন বউ মোকে দিলে। হরিদা সদরে গেছিল, ওকে দিয়ে পাঠিয়েছে।

তাই বল ! কী লিখেছে একটু বল তো শুনি ?

গাঁদা ফিক করে একটু হেসেই আঁচল দিয়ে কপাল মুছবার ছলে মুখের হাসিটুকুও মুছে নেয়। হাসি দেখে কৈলাস খুশি হয়, নিশ্চিন্ত হয়। হাসির এই ছিলিটুকুই প্রমাণ দিয়েছে যে নিরুদ্দেশ মহিমের জন্য অজানা অনির্দিষ্ট আশঙ্কার বিশ্রী পীড়ন থেকে সত্যই মেয়েটা মুক্তি পেয়েছে। মানুষটা জেলে আছে শুনেও তাই সম্ভব হয়েছে হাসিটুকু।

কৈলাস হেসে বলে, আরে লজ্জা কীসের ? ভালোবাসার কথা যা লিখেছে শুনতে চাইছি কি ? অন্যকথা যদি বা লিখে থাকে দুটো একটা, তাই একটু শুনিয়ে দে।

শোনাবার গরজ নেই। পড়ে দেখলেই হয়।

আঁচলের খুঁটেই বাঁধা ছিল চিঠিটা। গিঁট খুলে চিঠিটা গাঁদা দ্বিধা না করেই এগিয়ে দেয়, তার মুখে শুধু একটু পোঁচ পড়ে লজ্জার।

পড়ব তো ? কৈলাস তবু অনুমতি চায় আরেকবার।

দিলাম তো পড়তে ?

কয়েক লাইনের ছোটো চিঠি—রসকষবিহীন। প্রাণেশ্বরী গাঁদা বলে যে শুরু করেছে সেটাও যেন নেহাত নিয়ম রক্ষার জন্য—চিঠিতে বউকে সম্বোধন করার এটাই চিরকেলে রীতি, তাই।—তুমি নিশ্চয় আমার উপর রাগ করিয়াছ, অন্য নামে জেলে থাকায় এতদিন খবর দিতে পারি নাই, কৈলাসদার কাছে সব জানিতে পারিবা, তোমাদের জন্য সর্বদা মন কেমন করে। সাবধান, কাহারও নিকট এই চিঠির কথা প্রকাশ করিবা না।—এই হল চিঠি।

পড়ে কৈলাস বুঝতে পারে গাঁদা কী জন্য এত সহজে তাকে চিঠিটা পড়তে দিয়েছে।

বলে, এমনিতেই শালা হয়, নইলে শালা বলে গাল দিতাম। বউকে যেন অফিসিয়াল নোট পাঠিয়েছে।

চিঠি পড়ে সে কী বলে শোনার জন্য গাঁদা উৎকর্ণ হয়েছিল, সে প্রতিবাদ করে বলে, বাঃ রে, লোকের হাতে লুকিয়ে পাঠাল, আবার কী লিখবে ?

তা বটে, তুই ঠিক বুঝে নিয়েছিস !

তুমি কী বুঝলে বলো না ?

কী বুঝলাম ? বুঝলাম মোদের গাঁদার জন্য ছটফট করছে, খবর না জানিয়ে থাকতে পারল না।

গাঁদা হতাশার সুরে বলে, শুধু এই বুঝলে ? শিগগির ছাড়া-টাড়া পাবে বলে খবরটা জানিয়েছে, ও সব কিছু নয় ?

কৈলাস উৎসাহিত হয়ে বলে, হাঁ হাঁ ঠিক কথা, তাও হতে পারে ! তুই ঠিক ধরেছিস দিদি। তুই ছাড়া ওর মনের কথা কে এমন করে ধরতে পারবে বল ?

গাঁদা খুশি হয়ে বলে, না, এবার পালাই। মা টের পেলে ধুয়ে দেবে।

নন্দের বোন গঙ্গা মাঝখানে একবার ভেতরের দরজায় উঁকি দিয়ে তাকে ডেকে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কথা সেরে আসতে ভিতরে গিয়ে খানিক পরে গঙ্গার সাথে সে বেরিয়ে আসে।

গঙ্গা বলে, আমি একটু ও পাড়ায় যাচ্ছি নন্দ। রায়েদের বউ নাকি বাঁচে কী মরে।

নন্দ বলে, সে তো জানি। কিন্তু তুই মিছেই যাচ্ছিস গঙ্গা, কিছুই করতে পারবি না। আমাকে ওরা মরে গেলেও ডাকবে না, ডাকলেও চিকিৎসা হতে দেবে না। ওরা চায় বউটা মরে যাক।

তুমি যদি নিজে বসে থেকে জোর করে ওষুধ খাইয়ে ইনজেকশন দিয়ে—?

নন্দ মাথা নাড়ে—জোর করব কীসের জোরে ? ঘোষদের সেজো বউটা বিষ খেয়েছিল, ওরাও চেয়েছিল মরে তো মরে যাক। থানা পুলিশের ভয় দেখিয়ে জোর করে গিয়ে বসে চিকিৎসা কবেছিলাম। কিন্তু এ যে অসুখ। বিনা চিকিৎসায় খুন করলেও কারও কিছু বলার নেই, করারও নেই।

গঙ্গা এক মুহূর্ত ভাবে। নন্দের চেয়ে সে মোটে বছব দেড়েকের ছোটো হবে, ছেলেবেলা থেকে পরস্পরের নাম ধরে ডাকার অভ্যাসটা বজায় রয়ে গেছে। ছিপছিপে দিঘল গড়ন, কালো রং, মাথায় সামান্য কোঁকড়ান একরাশি চুল—খোঁপাটা হয়েছে প্রকাণ্ড।

গুমোটো মতো মুখে থমথমে ভাব। চাউনি দেখলে মনে হয় যে বুঝি কোনো কারণে ভয়ানক রেগে অছে। কথা শুনলে এ ভুল ভেঙে যায়। আশ্চর্য রকম ধীর শান্ত আর সুমিষ্ট তার গলাব আওয়াজ।

এক কাজ করা যাক না নন্দ ? আন্দাজে ওষুধ দিয়ে দে না, পারি তো খাইয়ে দেব ? ইনজেকশন দরকার হলে তাই বরং ঠিকঠাক করে আমায় দিয়ে দে। এমনি তো মরবেই, যদি বাঁচানো যায়—?

নন্দ একটু হাসে, এত শেখালাম পড়ালাম, শেষে এই তোর বিদ্যে হল ? জোর করে ওষুধ খাওয়াবি, ইনজেকশন দিবি ! মরে গেলে তোকে যখন খুনের দায়ে ফেলবে, তখন কী হবে ? আমার ভাই ডাক্তার, ভাইয়ের কাছে ডাক্তারি শিখেছি বলতে তো শুনবে না লোকে।

যা পারে করবে আমার। বউটা তো বাঁচবে।

নন্দ চুপ করে থাকে। গঙ্গার এটা বড়াই নয়, নিছক মুখের কথা নয়। নিজের ভালোমন্দ সম্পর্কে এই চরম অবজ্ঞাটুকু সম্বল করেই সে দুবছর আগে স্বামীর ঘর ছেড়ে ভাইয়ের কাছে চলে এসেছিল।

দুবছরে হতাশা কাটাতে পেরেছে কিন্তু নিজের সম্পর্কে এই বেপরোয়া উদাসীনতা আজও তার ঘোচেনি।

গঙ্গা বলে, তবে শুধু একটু দেখেই আসি। বলে কয়ে যদি কিছু করা যায়।

গাঁদা আর গঙ্গা চলে গেলে তীব্র আপশোশের সঙ্গে কৈলাস বলে, সত্যি মারছে বউটাকে। লক্ষ্মীও তাই বলছিল। বাঁচানো যায়, অথচ তাকে মরতে দেওয়া ? এ তো খুন ভাই !

খুন বইকী। সংসারে এমন কত খুন হচ্ছে।

একটু থেমে নন্দ যোগ দেয়, এরা চিকিৎসা না করিয়ে মারছে। চিকিৎসার অভাবে যারা মরে ?

কৈলাস বলে, খেতে না পেয়ে যারা মরে ?

তারা স্থিরদৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।

মহিমের ব্যাপারের খাপছাড়া জটিলতাটুকু সত্যই মহিমের নিজের সৃষ্টি।

রোজগারের চেষ্টা করার জন্যই মহিম শহরে পালিয়েছিল, আর কোনো উদ্দেশ্যই তার ছিল না। শহরে গিয়ে পয়সা কামাবে, গাঁদাকে বুঝিয়ে দেবে সে অপদার্থ নয়। ঠিক এই কারণে এ ভাবে একটা জোয়ান ছেলের পক্ষে ঘর ছাড়া খুবই সাধারণ ব্যাপার।

তার উৎসাহ আর আত্মবিশ্বাস দেখে এ প্রশ্ন মনে জাগা সম্ভব ছিল যে এও কি সেই বহু পরিচিত কাহিনির পুনরাবৃত্তি, এও কি সেই অনভিজ্ঞ রোমান্টিক তরুণের অজানা জগৎকে জয় করতে বুক ঠুকে বেরিয়ে পরার অ্যাডভেঞ্চার ? কিন্তু মহিম তো চাষির ছেলে, সে কোথায় পাবে এই অবাস্তব আশা আর দুঃসাহস, মিথ্যা স্বপ্ন আর কল্পনার রসেই যা পুষ্ট হয় ? পেটের দায়ে গাঁ থেকে দলে দলে যারা রোজগারের আশায় শহরে যায়, তাদের হাল কি সে জানে না ? জন্ম থেকে মাটির

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে সে বড়ো হয়েছে, সে কি খবর রাখে না, গাঁয়ে হোক শহরে হোক তাদের স্তরের মানুষের দু-পয়সা রোজগার করাটাই কি কঠিন কাজ ?

রোজগার করতে সে শহরে যাক, বাপভাই এককালে সম্পন্ন চাষি ছিল এবং এখন পর্যন্ত খানিকটা তাদের আড়ালে থেকেছে বলে অভাবের আসল চাপটা সোজাসুজি না বুঝে, বউয়ের কাছে পৌরুষ বজায় রাখতেই যাক, কিন্তু সে ভুলে যাবে কোন হিসাবে যে কাজটা মোটেই সহজ হবে না ? এ ভাবে সে কী করে যাবে যেন অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়েছে ভয়-ডর চিন্তাভাবনার কারণ নেই, বেরিয়ে পড়াটাই একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার ?

বাড়িতে কিছু জানাবে না এই শর্ত করে নিয়ে মহিম কৈলাসের কাছে আশ্রয় নিলে তার নির্ভয় নিশ্চিন্ত উল্লাসের ভাব দেখে এই প্রশ্ন কৈলাসেরও মনে জেগেছিল। কিন্তু সে কিনা নিজেও চাষির জগতের মানুষ এবং মহিমকে সে কিনা খুব ভালো করেই চিনত, তাই সে ছেলেটাকে অভিনব একটা ব্যতিক্রম বলে ধরে নিয়ে প্রশ্নটা বাতিল করে দেয়নি।

সোজা এবং মোটা খাঁটি মানেটাই ধরতে পেরেছিল।

বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবটা সব ক্ষেত্রে সবার কাছেই এক ব্যাপার। খানিকটা একপেশে বাস্তববোধ জন্মায় বলেই চাষির ছেলের বেলা নিয়মটা অন্যরকম হয়ে যায় না। চাষির বাস্তববোধ কি ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে স্বপ্নের চেয়েও খাপছাড়া কুসংস্কার, আত্মহত্যার চেয়েও যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস ? মহিম সবই জানে কিন্তু তার যে অভিজ্ঞতা নেই ! বাপভায়ের সাথে চাষের কাজে হাত লাগিয়েছে, শহরে রোজগার করতে নিজে সে তো আসেনি কোনোদিন। অন্য অনেকের ভাগ্যে কী ঘটেছে সে জানে, কিন্তু তার বেলাও যে ঠিক ওই রকম ঘটবে তার কি মানে আছে ? এমন তো নয় যে গাঁ থেকে শহরে পয়সা কামাতে এসে একজনের ভাগ্যেও শিকে ছেঁড়েনি।

শহরে এসে অনায়াসে উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছে এমন লোকও তো আছে দু-চারজন।

তার বেলাই বা সেটা ঘটবে না কেন ?

অনায়াসে নাই বা ঘটল, প্রাণপাত করতে সে তো অরাজি নয়, কষ্ট করেই সে নয় পথ খুঁজে নেবে।

মহিমের কথাবার্তা থেকেও এটা বোঝা গিয়েছিল। কী করবে কিছুই সে ভেবে আসেনি। একটা কিছু করবে। যেমন হোক একটা কিছু।

বিরাট শহর বিপুল সমারোহ বিশাল জনসমুদ্র তাকে দমিয়ে দেয়নি বরং আশা আর উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে। যেখানে এমন অসংখ্য রকম উপার্জনের উপায়, সেখানে তার কি একটা উপায় হবে না ?

শহর অবশ্য তার একেবারে অজানা অচেনা ছিল না। অনেকবার এসেছে, দু-চারদিন থেকে গিয়েছে। কিন্তু সে যেন ছিল অন্য একরকম ভাবে আসা আর যাওয়া—পরের মতো একটু শুধু উঁকি মারার জন্য। এবার সে এসেছে শহরের আপন হতে, শহরের লাখ লাখ মানুষের সংখ্যা আরেকটি বাড়াতে, স্থায়ীভাবে এখানকার জীবন স্রোতে মিশে যেতে।

সে বলেছিল, উঁহু কিছু না করে বাড়ি ফিরছি না কৈলাসদা। এসে ভালো করেছি। আর কত সয়ে গাঁয়ে পড়ে থাকা যায় বলো তো ? নিজের বউকে একটা কাপড় দিতে পারি না, অপমান হতে হয় ! সেলাই করা ছেঁড়া কাপড় ফেঁসে যাবে আর রাত দুকুরে কাঁদাকাটা গালাগাল শুনতে হবে !

কৈলাস ব্যাপারটা অনুমান করে বলেছিল, বটেই তো। আদর করতে বউকে টানব, তার কাপড় যাবে ফেঁসে। আদর করা চাঙে উঠবে, বউ রেগে মেগে কেঁদেকেটে খালি বলবে, একটা কাপড় দেবার মুরোদ নেই, শুয়ারের মতো গায়ের কাপড়টুকুও ফাঁসিয়ে দিতে পারেন।

বলো তো কৈলাসদা ? মানষের সহ্য হয় ?

বটেই তো। তাও আবার যেমন তেমন বউ নয়, ভালোবেসে বিয়ে করা বউ।

মহিম গিয়েছিল চটে।

তোমাদের মুন্ডু করা বউ ! কেখেকে তোমাদের মাথায় যে ঢুকল এটা ! বিয়ের আগে চেনা ছিল, বাস্, অমনি পিরিত হয়ে গেল ?

এ নিয়ে তামাশা করলেও মহিম বরাবর চটে গিয়েছে। কারণ বোধ হয় সে নিজেই জানে না। বিয়ের আগেই গাঁদাকে সে ভালোবেসেছিল এ যেন মস্ত দোষের কথা, তার একটা লজ্জাকর দুর্বলতার প্রমাণ। পাশের গাঁয়ের মেয়ে, মায়ের সঙ্গে কী রকম কুটুম্বিতার একটা সম্পর্ক আছে মেয়ের বাপের সঙ্গে, তাই না দেখা হয়েছে কথা হয়েছে মেয়েটার সঙ্গে তার, তাই না সে আম-জাম পেড়ে দিয়েছে মেয়েটাকে, কাকডাকা ভোরে ফুল তুলতে বার হলে একবার কুকুর তাড়া করেছিল বলে ভোরবেলা ফুল তোলার সময় সাথে থেকেছে ? পুজোর সময় বর্ষার ভরা জলাটার টলটলে জল দেখে কার না নাইতে সাধ যায় ? একলা অত দূর নির্জন জলায় গিয়ে তো নাইতে পারে না মেয়েটা, তাই না সে তাকে সাথে নিয়ে নাইতে গিয়েছে ? এ সব করলেই ভালোবাসা হয়ে গেল !

বিয়ের আগে একবার যদি সে টের পেত যে এ সব থেকে তাদের ভালোবাসা হয়েছে ধরে নিয়ে গাঁদার মাসি তার মাকে চেপে ধরেছিল আর লোচনের বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইচ্ছামতী উঠে পড়ে লেগে গাঁদাকে বউ করে ঘরে এনেছিল—মজাটা সে টের পাইয়ে দিত সবাইকে।

লক্ষ্মীর সঙ্গেও তামাশার সম্পর্ক। লক্ষ্মী ভড়কে যাবার ভান করে বলত, বলো কি গো ? কী মজা টের পাইয়ে দিতে ? বিয়ে করতে না ওকে ?

নাঃ !

তাতে অন্যের ক্ষতিটা কী হত ? তোমবাই মজা টের পেতে ! তা এক কাজ কর না ? বিয়ে তো আর ফিরবে না, গাঁদাকে ছেড়ে দাও। আমিই ওকে পুষবখন, কবব কী ! কিন্তু খপর্দাব, দুদিন যেতে না যেতে সুড়সুড় করে গিয়ে হাজির হলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

এখনকার কথা বলছি নাকি !

তাব মানে এই যে বিয়ের পর গাঁদার সঙ্গে তার ভালোবাসা হয়েছে এ কথা যত খুশি বলুক সবাই মহিমের কোনো আপত্তি নেই। বিয়ের আগেই ভালোবাসা হয়েছিল এই মিছে কথা তুলে সবাই তাকে খোঁচাবে কেন ?

কৈলাস বলেছিল, আহা বেশ তো, তাই নয় হল ? বিয়ের আগে কিছু ছিল না তোমাদের, গাঁদাকে দেখলেই তোমার গা জ্বালা করত। এখন তো ভালোবাসা হয়েছে ? কিছু না বলে তোমার শালা পালিয়ে আসার কি দরকার পড়ল !

কে বললে পালিয়ে এসেছি ? পরিষ্কার বলে এসেছি কাজকম্মেব খোঁজে যাচ্ছি। এখন কোথায় থাকি কী করি তা জেনে তাদের কী দরকার ?

কদিন ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিল এদিক-ওদিক। শনিবার সময় এসেছিল কৈলাসের গাঁয়ে ফেরার। আবার তাকে কথা দিতে হয়েছিল কৈলাসকে যে তার বিষয় বাড়িতে কিছু জানাতে পারবে না। এ বিষয়ে বেশ খানিকটা ভাবতে হয়েছিল কৈলাসকে, বিশেষ করে ভয়ার্ত অপরাধ আর বিপন্নতা বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি গাঁদাকে দেখার পর। তার সঙ্গে অন্য সকলের ভয়ভাবনাও দূর করতে পারে—অন্তত চুপিচুপি গাঁদাকে জানাতে পারে মহিমের খবর। মহিমকে কথা দিয়েছিল বলেই কৈলাসের মাথা ব্যথা ছিল না, বিচার বিবেচনা বাদ দিয়ে যন্ত্রের মতো সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে এই গ্রাম্য কুসংস্কারে বহুকাল থেকেই আস্থা নেই কৈলাসের।

বিচারের বিষয় ছিল শুধু এই যে বাড়ির সকলকে জানাক বা শুধু গাঁদাকে জানাক—তার নিষেধ মেনে নিয়ে জেনেও কি ওরা চুপচাপ থাকতে পারবে ? ইচ্ছামতী কি টিকতে দেবে বাড়ির মানুষকে ? শুধু গাঁদাকে জানালে এখনকার মনের অবস্থায় সেও কি গোপন রাখতে পারবে কথাটা ?

কৈলাস জানত, মহিমকে ফিরিয়ে আনতে গেলে ফলটা হবে খারাপ।

শেষ পর্যন্ত চুপচাপ থাকাই ভালো মনে করেছিল কৈলাস। ছেলেমানুষি করেছে মহিম কিন্তু সময় সময় ছেলেমানুষকে ছেলেমানুষি করার স্বাধীনতা না দিয়েই বা উপায় কী ? মানুষের ভুল করার অধিকারকে পর্যন্ত তো মানতে হয় সংসারে !

ঘটনাচক্রে মহিমেব সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছে, এইমাত্র। মহিম তার কাছে না গেলে নিজের জীবন নিয়ে তার নিজস্ব পরিকল্পনা আর পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রশ্নই উঠত না !

সে তাই শুধু ভরসা দিয়েছিল সকলকে। গাঁদাকেও। ব্যাপারটা তুচ্ছ কবে দিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল, গিয়েছে যাক না ? ব্যাটাছেলে দু-চাবমাস ইদিক উদিক চরে বেড়াতে গেলে কি এসে যায় ?

দু-চারমাস !

দেখতে দেখতে কেটে যাবে লো ছুঁড়ি, ভাবিস নে। রোজগারের পথ খুঁজে নেবে, বোজগার করবে, দুটো পয়সা জমাবে, তবে তো ফিরবে ? সময় লাগবে না ?

কৈলাস শহরে ফিবতেই মহিম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছিল, সবাই কী করছে ? কী বলছে ?

কী করবে ? খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে !

আমার কথা কিছু বলাবলি করছে না ?

করছে বইকী। সবাই বলছে, আগে থেকেই মাথার চিকিৎসা করা উচিত ছিল। আর আমাদের গাঁদা—মুখখানা এমন গম্ভীর করেছিল কৈলাস যে মহিমের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল।

গাঁদা টুকটাক বাপের বাড়ি যাচ্ছে আর রায়দের বুনোর সাথে গুজগাজ ফুসফাস চালাচ্ছে।

মহিম হেসে ফেলেছিল।—তাই বলো ! আমি ডরিয়ে গেলাম, কিছু করে বসেছে বুঝি !

হাসির কথা নয়, টের পাবে। সোজা মেয়ে পাওনি ওকে। তুমি মজা করে পালিয়ে বেড়াবে, সে শুধু ঘরে বসে কাঁদবে ভেবেছ, না ? ওহ্ বুনোর সাথেই না শেষে ঘর ছাড়ে মেয়েটা !

তবু মহিম হেসেই চলেছিল। ক্ষোভে দুঃখ অভিমানে তার গাঁদা উদ্ভট আর খাপছাড়া অন্য যা কিছু হোক করেছে শুনলে হয়তো সে বিশ্বাস করবে, গাঁদা অন্য কারও দিকে তাকাবে, এর চেয়ে হাস্যকর তামাশার কথা তার কাছে আর কিছু নেই।

তামাশার জের টেনে কৈলাস শুরু করেছিল জেরা।

তামাশা নয়, সত্যিসত্যি জিজ্ঞেস করছি। অমন বউটাকে ফেলে এসেছিস,—ভাবনা-টাবনা হয় না ? তুই ভেগেছিস জানলেই দু-চারজন নিশ্চয় নজর দেবে !

দিক না নজর। নজর দিলে কি গায়ে ফোস্কা পড়ে ?

মন ভোলাবার চেষ্টা করবে তো !

করুক না। ভুলবার মন হলে ভুলবে, আমি তার করব কী ? পাহারা দিয়ে মন ঠিক রাখতে হবে, অমন মন দিয়ে কাজ নেই বাবা !

ফিরে গিয়ে যদি কানাঘুষো কানে আসে ?

সে তো আসতেই পারে। এটা ধরে ওটা ধরে বানিয়ে বানিয়ে রটাবার মানুষ গাঁয়ে আছে জানো না ? তোমার নামেই তো শুনে এলাম। মুলো খেতে লক্ষ্মীদির সাথে হাসি-তামাশা করছিলে, হাত ধরে টেনেছিলে, নিধুর পিসি গিয়ে পড়েছিল তাই রক্ষা !

গাঁদার নামে যাই শোনো বিশ্বাস করবে না ?

তোমার হল কি বলো তো কৈলাসদা ? ওই এক কথা নিয়ে প্যাচাল পাড়ছ ?

কৈলাসের মনে আছে, খুশি হয়ে সে বিড়ি ধরিয়েছিল। লোকে বলে সন্দেহবাতিক নাকি পিরিতের সেরা প্রমাণ ! মাঝে মাঝে ভাবত কৈলাস, লক্ষ্মী যেখানে সেখানে যায়, যার তার সঙ্গে মেলামেশা করে, শহরে হপ্তা কাটিয়ে গাঁয়ে ফিরে মাঝে মাঝে কানাঘুষো কানে আসে, কিন্তু কই, মনে তো তার খটকা লাগে না একবারও ? মহিমকে জেরা করে সে যেন নিজের মতো আরেকজনকে আবিষ্কার করার স্বস্তি পেয়েছিল।

তাই বটে, বিশ্বাস ছাড়া ভালোবাসা ?

সে যেন রস ছাড়া রসগোল্লা, নুন ছাড়া ব্যঞ্জন !

সম-আদর্শবাদী আরেকজনকে আবিষ্কার করে খুশি হওয়ার আসল মানেটা অবশ্য কৈলাস জানে না। সে তো হিসাবে আনেনি লক্ষ্মী আর তার মধ্যে কী সম্পর্ক আর কী সম্পর্ক এই মহিম আর গাঁদার মধ্যে ! লক্ষ্মী তার সামাজিক ধারও ধারে না, ভাতকাপড়ের ধারও ধারে না—সন্দেহ অবিশ্বাস নিয়ে নিজে নিজে জ্বলে পুড়ে মরার বেশি তার কোনো অধিকার নেই, মুখ ফুটে কথাটি কওয়ার পর্যন্ত নয় ! তাই না তার এত ঝোঁক অন্ধ বিশ্বাসের দিকে, এত দবকার নির্ভেজাল বিশ্বাস বজায় রাখার।

দু-তিন সপ্তাহ কাটে কি কাটে না মহিমের আবেগময় উৎসাহ উদ্দীপনা ধোঁয়াব মতোই শূন্যে উপিয়ে দেয় মহানগরী, মুখ থেকে মুছে নেয় অহেতুক আশা আনন্দেব জ্যোতি। বিয়ের আংটি বেচা পয়সা আসে ফুরিয়ে, ট্রামে বাসে শহর চষে বেড়ানোটা বেড়ানোর পর্যায় থেকে নেমে আসে কষ্টকর হাঁটাহাঁটির প্রক্রিয়ায়, দেহ টের পেতে শুবু করে শ্রান্তি ক্লান্তি আর খিদে কাকে বলে, মন আবার নতুন করে জানতে থাকে অনেকদিনের জানা কথাটা যে সংসারে মানুষের বাঁচাটা বড়োই কঠিন করে দিয়েছে মানুষ।

কৈলাস জানত এ রকম হবে।

বড়ো বড়ো কথায় মুখর ছেলেটা চুপচাপ হয়ে আসবে, শুকিয়ে শরীরটা রোগা হয়ে যাবে, মুখে দেখা দেবে বুক্ষ কঠিন ভাব, চোখে ফুটবে নালিশ আর জ্বালা। সেও খোঁজাখুঁজি করছিল যদি কিছু জুটিয়ে দেওয়া যায় মহিমকে। কিন্তু আসল মুশকিল ছিল এই যে এতকাল মহিম শুধু বাপ-দাদার সঙ্গে চাষের কাজেই হাত লাগিয়েছিল, অন্য সব কাজেই সে একেবারে আনাড়ি।

শেষ পর্যন্ত তাকে যেখানে হোক শিক্ষানবিশ মজুর হয়ে ঢুকতে হবে সন্দেহ ছিল না কৈলাসের। কিন্তু সেটাও যেমন ছিল খোঁজ-খবরের ব্যাপার তেমনই দরকার ছিল মহিমের এ রকম কাজ মেনে নেবার মতো মনের অবস্থা তৈরি হবার।

মহিম কাজের চেষ্টায় ঘুরছে, ব্যর্থতার ক্ষোভে জ্বলছে, হতাশার সঙ্গে লড়ছে আর চুপচাপ শুকনো মুখে আকাশ-পাতাল ভাবছে—এই দেখে কৈলাস শনিবার বাড়ি গিয়েছিল। গাঁদার পরনে দেখেছিল আট হাত একটি নতুন শাড়ি, তার ভাই ভূতো অনেক চেষ্টায় জোগাড় করে দিয়েছে। আট হাতি কাপড় আঁট করে পরতে হওয়ায় তাকে দেখে টের পাওয়া যাচ্ছিল টানাটানির শাকভাত খেয়েও বিয়ের পর কী রেটে যৌবনের বাঁধুনি আসতে শুবু করেছে তার দেহে।

শহরে ফিরবার পর কেমন একটু আনমনাভাবে মহিম সকলের খবরাখবর জিজ্ঞেস করেছিল, খানিক উশখুশ করে আচমকা সুস্পষ্ট উদাসীনতার ভান করে শুধিয়েছিল, রায়দের বুনোবাবু গাঁয়েই আছে নাকি ?

যেন কথার কথা জিজ্ঞাসা করা, আর কোনো মানে নেই, এমনি একটা ভাব দেখাবার চেষ্টা করেছিল মহিম। ভিতরে চমক লেগেছিল কৈলাসের, বাইরে সহজভাবেই বলেছিল, গাঁয়েই আছে। অসুখে ভুগছে খুব।

কী অসুখ ?

জ্বব আমাশা। মোদেব ডাক্তাব দেখছে।

ব্যাটার মরাই ভালো। খালি বাবুগিবি আর বজ্জাতি। নিজের বড়ো ভায়ের বিধবা বউটাকে নিযে পর্যন্ত—

কৈলাস ধমক দিযেছিল, ছি মহিম, ছি। তুইও শেষে শোনা কথা নিয়ে শুরু করলি ?

লোকটা তো বজ্জাত ?

সেটা কি তার ভাজের দোষ ? তোমার বউয়েব দিকে নজর দিত, ওকে তোমার যত খুশি গাল দাও। আরেক বেচাবা দুটো বাচ্চা নিয়ে ওর সংসাবে মুখ গুঁজে আছে, তাকে মন্দ বলবে কেন ?

মনটা খারাপ হয়ে যায় কৈলাসেব। মহিমের এ কী রকম কথাবার্তা গাঁদার উপর সহজ বিশ্বাসের জোবে এই তো সেদিন বুনোবাবু লোক ভালো কী খারাপ এ প্রশ্নটাই সে অনায়াসে তুচ্ছ করে হেসে উড়িযে দিতে পেরেছিল। খাবাপ লোকে নজর দিলেই গায়ে ফোস্কা পড়বে না গাঁদার। বুনোবাবু হাজার চেষ্টা করেও এতটুকু পাত্তা পাবে না তার গাঁদার কাছে।

গাঁদাব মন কেউ নরম কবতে পারবে এটা একেবারে হাস্যকব কথা।

সেই মহিম এ ভাবে বুনোবাবুব খবব জিজ্ঞাসা করছে, বুনোবাবু বজ্জাত বলে তার গায়ে এমন জ্বালা ধবেছে।

দিন যায়। কত তাড়াতাড়িই যে নানাদিকে চোখ খুলতে থাকে মহিমের। বিরাট শহরের বুকে ছড়ানো ক্ষোভেব সঙ্গেও পরিচয় ঘটে, নিজের ব্যক্তিগত ক্ষোভের সঙ্গে সে এই সমবেত ক্ষোভের সামঞ্জস্য খুঁজে পায়।

মাঝে মাঝে তাকে বলতে শোনা যায়, দাঁড়াও সব চুবমাব কবে দিচ্ছি, উলটে দিচ্ছি সব। খাটব, বোজগাব কবব, তাও কবতে দেবে না !

কৈলাস আশ্চর্য হত না। শহবের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জীবন যে চুম্বকের মতো বিচ্ছিন্ন লোহাটিকে টেনে নিযে বিক্ষোভের ধর্ম আরোপ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। তার কথার ঝাঁজ ও উগ্রতায় সে শুধু একটু চিন্তিত হত।

মাস তিনেক পরে একটা সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় শিক্ষানবিশ মজুর হয়েই ঢুকেছিল মহিম—শম্ভু দাস ছদ্মনামে, উদ্‌বাস্তু পবিচয় দিয়ে।

আত্মপবিচয় গোপন করার রহস্য তার সেইখান থেকে শুরু—জেলে যাবার কথাটা হিসাবে ধবেছিল।

প্রথমে রোজগারের অঙ্ক শুনে হিসাবপত্র করে বলেছিল, এ তো বেশ ব্যাপার হল ! এতে আমারই তো চলবে না !

এর বেশি জুটবে না গোড়ায।

বউকে একটা শাড়ি দেবার সাধ্যি হবে কবে ?

একদিন হবে। তোমারও হবে, সবাবই হবে। আপাতত নিজেব পেটটা চলুক !

তাই হোক। মহিম রাজি হয়েছিল। কলকাতায় থাকা তো চলবে।

আমার কথা বলেছ নাকি কৈলাসদা ?

না বলিনি কিছু। খবর পেলাম লোক নিতে পারে, কাঁচা হাত। চেনা লোক আছে একজন, তাকে বললে হয়ে যাবে।

তখন মহিম নাম বদলের কথা জানিয়েছিল। কৈলাস আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, কেন, নাম ভাঁড়াবে কেন ?

লড়াই করব।

লড়াই করবে তো নাম ভাঁড়াতে যাবে কেন ?

কারণ আছে, সে তুমি বুঝবে না কৈলাসদা।

বুঝিয়ে বললেই বুঝি !

মহিম কথা ঘুরিয়ে নিয়েছিল : অন্য নামে কাজ পাব না ?

কাজ পাবে না কেন ? নাম ভাঁড়াবার দরকারটা কেন হচ্ছে একটু বলো না শুনি !

দরকার নিশ্চয় আছে। নইলে কি খেলা করছি ?

মহিমও বুঝিয়ে বলেনি, আজও ব্যাপারটা খোলসা হয়নি কৈলাসের কাছে। নানাকথা মনে হয়েছে, তার মধ্যে সব চেয়ে লাগসই ঠেকেছে যেটা সেটা হল এই যে ছেলেমানুষি বুদ্ধি খাটিয়ে সে বাড়ির মানুষ আর গাঁদাকে হাঙ্গামার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছে। তাকে যদি কোনো হাঙ্গামায় পড়তে হয় অন্যায় অবিচার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে, ওদের যেন কোনো ঝঞ্ঝাট না পোযাতে হয়।

এ সব পুরানো কাহিনি। কিন্তু বেশিদিনের পুবানো নয়।

ঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রায়দের বাড়ির কাছাকাছি এসে কৈলাস শুনতে পায়, বিধবা মেজো বউটা মারা গেছে। কিন্তু বিনা চিকিৎসায় যাকে মারা হল তার জন্য কে কাঁদছে, কেন কাঁদছে ?

৬

শুভর দেশে ফেরা উপলক্ষে কলকাতায় সম্ভ্রান্ত আত্মীয়বন্ধুদের একটা প্রীতিভোজ হবে ঠিক ছিল। শুভর জন্যই ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছিল দিন। তার শুধু সময়ের অভাব নয়, এ রকম প্রীতিভোজেই তার আপত্তি। বিদেশ যাওয়া ভারী একটা ব্যাপার, তাই নিয়ে ভোজ-টোজ দেওয়া হাস্যকর নয় ? কিন্তু জগদীশও এদিকে ছাড়বে না ! উঁচুস্তরের বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হলে এ সব করা দরকার। শুভ শেষে রাজি হয়—এক শর্তে। দেশে ফেরার বদলে উপলক্ষ হবে তার জন্মদিনে।

নন্দ যাতে এই উৎসবে যায় সে জন্য শুভ পিড়াপিড়ি করে।

নন্দ বলে, তুমি খেপেছ ? বিশ্রী বেখাপ্পা হবে না ? সবাই ভাববে না হাঁসেদের মধ্যে এ একটি আবার কে এল রে বাবা ! মেশাল প্রীতিসম্মেলন হত, আমার মতো আরও দশজন হাজির থাকত সে ছিল আলাদা কথা।

নন্দ হাসে।—আমার জামাকাপড় পর্যন্ত নেই, গেঁয়ো বেশে যেতে হবে। তোমার বাবা খেপে যাবেন, ঘরের চালায় আগুন লাগিয়ে দেবেন আমার।

তুমি ছদ্মবেশে যাবে। আমার পোশাক তোমায় ঠিক মানাবে। কেউ টেরও পাবে না তোমার শুধু একটা দুটো লংক্লথের পাঞ্জাবি সম্বল।

কিন্তু আমি যে চালচলন রীতিনীতি কিছুই জানি না ভাই ? ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের দশা যদি হয় ?

শুভ নাক সিঁটকে বলে, সাধে কী বলি গেঁয়ো হলেই ভীতু হয় ? তোমরা ভীতু বলেই শহুরে বড়োলোকরাই শুধু এ দেশে নেতা হয় ?

নন্দর রং কালো, ছেলেবেলার বসন্তের কিছু কিছু দাগ থাকলেও তার মুখের গড়নটার মধ্যেই একটা অদ্ভুত জীবন্ত ভাব। টানা না হলেও তার যে রকম বড়ো বড়ো চোখ সেটা কেবল বিশেষ জাতের বুনোদের আর মাঝে মাঝে ধাঙ্গর মেথর মুচিদের মধ্যে ছাড়া চোখে পড়ে না।

চোখে ভর্ৎসনা ফুটিয়ে রেখে নন্দ বলে, ভীতু ? গাঁয়ের লোক ? তুমি জটিল কথা বোঝ সহজ কথা বুঝতে পার না। এ পর্যন্ত শহুরে বড়ো বড়ো লোক নেতা হয়েছে সত্যি। তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু নেতা কি তারা হয়েছে টাকার জোরে সাহসের জোরে কালচারের জোরে ? গেঁয়ো লোকের সাহসটাই তাদের একমাত্র জোর। একজন নেতার নাম করো তো গাঁয়ের ভীতু মানুষেরা পিছনে না দাঁড়ালেও যিনি নেতা হতে পেরেছেন ? নেতারা শুধু জেলে যান, গেঁয়ো লোকেরা প্রাণ দেয়।

শুভ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, তুই সত্যি ভারী ঝগড়াটে।

তুই তো ঝগড়া বাধাস।

নন্দর বোন গঙ্গা চা এনে বলে, তোমাদের ঝগড়া হচ্ছে নাকি ?

দামি নতুন টি-সেটটার দিকে চেয়ে মুখভার করে শুভ বলে, আমার জন্য আনা হয়েছে বুঝি ?

গঙ্গা বলে, এগুলি কেনা নয়, চরণ ঘোষ আমাকে প্রেজেন্ট দিয়েছে। কলকাতায় খাবার বেচে খুব পয়সা কামায়, ভালো ভালো জিনিস খায়। দেশবাড়িতে এসে শাকচচ্চরি খেলেই ওর কলিক হয়। কী দরকার তোর ও সব খাবার ? মাছ দুধ খেলেই হয়। তা বলে কী, মাঝে মাঝে দু-একদিনের জন্য গাঁয়ে আসে, শাকচচ্চরি না খেলে তৃপ্তি হয় না !

গঙ্গা চুপচাপ চা তৈরি করে কাপ এগিয়ে দেয়, তাকে চরণ ঘোষের দামি টি-সেট উপহার দেওয়ার সঙ্গে তার শাকচচ্চরি খেয়ে কলিক হওয়ার সম্পর্ক কী, এ কাহিনিটা যেন সে বলবে না।

শুভ ধৈর্য ধরে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকায় খুশি হয়ে গঙ্গা আবার শুরু করে, দাদা সেদিন কলকাতা গিয়ে ফিরতে পারেনি। মাঝরাতে চরণের ছেলে এসে ডাকাডাকি, চরণ নাকি কলিকের ব্যথায় আছাড়ি পিছাড়ি করছে। দাদা নেই শুনে বেচারার মুখ শুকিয়ে গেল। এখন উপায় ? বারতলা থেকে ওষুধ আনতে আনতে রাত কাবার হয়ে যাবে। এদিকে চরণ কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছে। আমি ভেবেচিন্তে বললাম, দাঁড়াও, একটা ওষুধ দিচ্ছি। আমার মনে হচ্ছিল, আলমারিতে একটা শিশির গায়ে যেন কলিক-টলিকের ওষুধ বলে লেখা আছে পড়েছি। শিশিটা খুঁজে বার করে বুক ঠুকে খানিকটা পাউডার দিয়ে দিলাম। এমন ভয় হচ্ছিল কী বলব আপনাকে—যদি কিছু খারাপ হয় !

গঙ্গা একটু হাসে।

শুভ বলে, সেই ওষুধে সেরে গিয়েছিল তো ?

নন্দ বলে, সেরে যাবে না ? একবারে কতটা পাউডার দিয়েছিল জানো ? পাঁচ-ছটা ডোজের কম নয়।

শুভ বলে, তোমার তো সাহস আছে সত্যি !

আপনি তো বলছেন সাহস—বাড়ি ফিরে দাদার সে কী বকুনি ! কলিকে মানুষ মরে না, আমার আন্দাজি ওষুধ খেয়ে মানুষটা যদি মরে যেত ! আমারও সত্যি সেই ভয় হচ্ছিল।

শুভ আবার প্রীতিভোজে যাওয়ার কথা তুললে নন্দ বলে, এত পিড়াপিড়ি করছ কেন ?

এ সমাজে তোমার একটু মেলামেশা দরকার মনে করি।

লাভ কী ?

একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশে এদের সম্বন্ধে তোমার কী রকম ধারণা হয় জানতে চাই। আমার ধারণার সঙ্গে মেলে কিনা দেখব।

নন্দ একটু ভেবে বলে, যেতে আমি পারি—কিন্তু ময়ূর সেজে ছদ্মবেশে যেতে পারব না। আমার যা আছে তাই পরে যাব।

শুভ আহত হয়ে বলে, সংস্কারের চোরাবালিতে তুইও গলা পর্যন্ত ডুবে আছিস। নীতিকথার বাঁধা নিয়মে চলতে হবে, এতটুকু এদিক ওদিক করা চলবে না।· আমি গরিব মানুষ, আমি কেন বড়োলোক সেজে বড়োলোকের ভোজে যাব ? একদিন গেলেই পৃথিবী উলটে যাবে, আমার গরিবের আত্মসম্মান—

থাম তো। বেশি বিদ্যা হয়ে সোজা কথা তুই দিন দিন কম বুঝছিস। আমি আপত্তি করছি এই জন্য যে এ রকম খাপছাড়া নাটুকেপনা করে লাভটা কি হবে ?

লাভ হবে। তুই যদি মিশ খেয়ে যাস, খাপ খেয়ে যাস, কস্মিনকালেও যে এ সমাজে মিশিসনি টের না পাওয়া যায়, প্রমাণ হবে যে পোশাকটাই সব ! আসলে কোনো তফাত নেই।

নন্দ হেসে বলে, প্রমাণ দরকার নেই। আমি বলে দিচ্ছি, পোশাকটাই সব নয়, অনেক তফাত আছে। আমি ভালোরকম খাপ খেয়ে গেলেও কিছু প্রমাণ হবে না। আমি বাইরেব চালচলন নকল করব, অভিনয করব, কিছুই টেব পাওয়া যাবে না। তাতেই কি প্রমাণ হয়ে যাবে অ্যারিস্টোক্র্যাট আব গেঁয়োভূতের মধ্যে তফাত শুধু পোশাকের ?

তবু শুভ নাছোড়বান্দার মতো বলে, তা হোক, তোকে যেতেই হবে। একটা একস্‌পেরিমেন্ট করতে দোষ কী ?

এক্‌সপেরিমেন্ট ? তার সঙ্গে বন্ধুত্ব কবাও যে শুভর একটা একস্‌পেবিমেন্ট ছাড়া কিছু নয় নন্দর তা ভালো করেই জানা আছে। তবু তাকে দিয়ে এক রকম সোজাসুজি একস্‌পেবিমেন্ট করাব প্রস্তাবে নন্দর অপমান বোধ হয়। সে কি বৈজ্ঞানিক শুভর কাছে ইঁদুর খরগোশের শামিল ?

কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারে না। রাগ হলে কথা না বলাই তার স্বভাব।

তারপর সহজভাবেই বলে, আচ্ছা বেশ, যাব।

শুভ তাকে নিয়ে একস্‌পেরিমেন্ট করতে এত উৎসাহী. সেই বা শুভকে নিযে একস্‌পেরিমেন্ট করবে না কেন ?

বারতলার জমিদার বাড়ি যার দেখা আছে জগদীশের কলকাতার বাড়ি দেখলে তার চোখে পলক পড়বে না।

যে মানুষটা বছরের বেশির ভাগ সময় বারতলার ওই মন্দিব চত্বর দপ্তর অন্দর ঘেরা দিঘিওলা সেকেলে বাড়িতে থাকতে ভালোবাসে সে কি না মাঝে মাঝে শহরে এসে বাস করার জন্য মডার্ন প্যাটার্নের এমন বাড়ি তৈরি করেছে যে আধুনিকতার সেই বাড়াবাড়ির মধ্যেই যেন ফুটে বেরিয়েছে তার গ্রাম্যতা।

ভিতরে গ্রাম্যতার কিছু কিছু প্রকাশ্য নিদর্শনও আছে। বাড়িতে ঢুকেই সেটা নন্দর চোখে পড়ে গিয়েছিল।

শুভর সঙ্গে সে এসেছিল দিনের বেলা, অতিথি সমাগমের অনেক আগে।

দুপুরবেলাই বলা চলে।

বাগানে কাজ করছিল উড়িয়া মালি। হঠাৎ ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সাবিত্রী ব্যস্তভাবে ব্যাকুলভাবে কী যেন বলল তাকে। বাগানের ও পাশে চাকর বামুন মালিদের জন্য এক ইটে গাঁথা কয়েকটা কুঠরি। তারই একটার মধ্যে ঢুকে খানিক পরে মালি বেরিয়ে এল পোকায় কাটা পট্টবস্ত্র পরে কাঁধে নামাবলি ঝুলিয়ে খালি পায়ে। বাগানে কাজ করার সময় তার গায়ে মোটা ধবধবে পইতেটা নন্দর চোখে পড়েনি। ওটাও বোধ হয় তোলাই থাকে।

খানিক পরেই বাড়ির ভিতর থেকে শোনা গিয়েছিল শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ।

শুভ নিজেই বলেছিল, আব বলিস কেন। পিছন দিকেব একটা ঘবেব মধ্যে একটা মন্দিব কবা হয়েছে। মা কিছুতেই ছাডবে না। সকাল সন্ধ্যায় পূজা আবতি হয়। আজ বাবা বোধ হয় বলে দিয়েছেন বিকাল থেকে লোকজন আসবে, ও সব চলবে না। কবলেও চুপচাপ নিঃশব্দে কবতে হবে। মা তাই মালিকে দিয়ে তাডাতাডি সন্ধ্যাপূজাটা সেবে বাখছে।

দুপুবে সন্ধ্যাপূজা ?

উপায় কী? তবু নিয়মটা বক্ষা হল।

নন্দ গম্ভীব মুখে বলে, এনে বোধ হয় ভালোই কবেছিস আমায়। তোকে যে এতখানি মানিয়ে চলতে হয় সয়ে যেতে হয় খেয়াল হত না, আমি জেনে বাখতাম এ সব তুই ডোন্ট কেযাব কবে উডিয়ে দিস।

তাই কখনও হয়? ধর্ম কর্ম নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না —যাবা মাথা ঘামায তাদেব জিজ্ঞাসা কবতে যাই না এ সব কী দবকাব। কিন্তু অতিথিবা কী মনে কববেন বলে বাগানেব মালিকে দিয়ে দুপুববেলা সন্ধ্যাপূজা সেবে বাখা—এটা কী মাবাত্মক অবস্থা ভাব তো?

নন্দব মনে পডে ছেলেবেলা স্কুলে একসঙ্গে পডবাব সময় মাঝে মাঝে শুভ তাকে জোব কবে বাডিতে টেনে নিয়ে যেত। শহবেব বাডিতে এই প্রীতিভোজেব উৎসবেও টেনে এনেছে।

শুভ আজও জানে না বন্ধুত্বেব নামে কী নির্যাতন কী অত্যাচাবটাই সে কবত কামাবেব ছেলেকে শুধু এক ক্লাসে পডে বলেই ঝোঁকেব মাথায় বন্ধু হিসাবে বাডি নিয়ে গিয়ে।

অল্প বযস। কিন্তু সে টেব পেত দবোযান থেকে জগদীশ পর্যন্ত প্রকাণ্ড জমকালো বাডিটাব সকলেই তাকে অস্বীকাব কবছে। শুভ যেন একটা মাটিব পুতুল কিনে এনেছে, ছেলেমানুষি খেযালে বাস্তা থেকে একটা ফেলনা ইট পাথব কুডিয়ে এনেছে।

একমাত্র সাবিত্রীই তাকে খাতিব কবত। আদব কবত। সে খাতিব আব আদব ছিল তাকে লুচি পবোটা সন্দেশ বসগোল্লা ঠেসে ঠেসে খাওয়ানোতে।

শুভ আব একটা বসগোল্লা চাইলে ধমক দিয়ে বলত, আজ দুটো সন্দেশ, তিনটে বসগোল্লা বেশি খেয়েছিস। পেট ব্যথা হবে না তোব পেটক কোথাকাব?

সে আব খেতে পাবছে না জেনেও তাব পাতে আবও ক'যেকটা খাবাব দিয়ে বলত, খাও, খেয়ে নাও। না খেলে আমি বাগ কবব কিন্তু।

কোনোবাব পেট ব্যথা হত। কোনোবাব পেট খাবাপ হত।

দু একটা দিন ভুগতে হত নন্দকে।

তখন জোযাব ভাটা চলত শুভব বন্ধুত্ব কবায়। ঠিক যেন নদীব জোযাব ভাটা।

বাডিতে ডেকে নিয়ে যাওযাটা যেন ছিল পূর্ণিমা আব অমাবস্যাব জোযাব। সবচেয়ে জোবালো বন্ধুত্বেব সময়।

তাব পবেই ভাটা শুবু হত শুভব বন্ধুত্বে।

শুধু কাছে গিয়ে দাঁডানোব জন্য শুভ বিবক্ত হয়েছিল, এমন অনেকদিনেব কথা মনে আছে নন্দব।

সাবিত্রীকে বহুদিন সে সামনাসামনি দ্যাখেনি। এবোড্রোমে অনেকেই গিয়েছিল কিন্তু বিদেশ-যেবত ছেলেকে অভ্যর্থনা জানাতে সাবিত্রী কেন যাযনি আজ নন্দ তাব মানেটা বুঝতে পাবে।

এবোড্রামে উডোজাহাজ থেকে যে নামবে সে তো পুবোপুবি ছেলে নয় সাবিত্রীব। সে একটা ভিন্ন বকম বিদেশি-বকম যুবক।

মাসে একবাব দুবাব শুভ টেনে নিয়ে গেলেও, জোব জববদস্তি কবে ভালো দামি দামি খাবাব খাইয়ে পেট ব্যথা পেট খাবাপ কবে দিয়ে থাকলেও পটেব ছবিব জীবন্ত বাজবানিব মতো সাবিত্রী

কাল্পনিক কাহিনির ডাকিনী যোগিনী মোহিনী মহামায়ায় এক মিশেল দেবীত্বের মহিমায় মনটা তার আচ্ছন্ন করে রেখেছিল অনেক বয়স পর্যন্ত।

প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে সমারোহের সঙ্গে। জগদীশের বড়ো শালা, সাবিত্রীর একমাত্র দাদা, পঞ্চান্ন বছরের মহেশ্বর কলকাতায় এই বাড়িটার চার্জে আছে এক যুগের বেশি। তার বউ নেই ছেলেমেয়ে নেই। একতলায় ছোটোঘরে থেকে সে জগদীশের শহরের বাড়িটা রক্ষণাবেক্ষণ করে।

মাসে মাসে ঝি বদলায় রাঁধুনি বদলায়। জগদীশ যা বলে দিয়েছে তার একটি পয়সা বেশি খবচ করে না।

তীর্থে ধর্মশালায় যেমন পুণ্যার্থী যাত্রীদের দু-চারদিন ঘর ভাড়া দিয়ে রোজগার করা হয়, জগদীশের এই শহরের বাড়িটার দু-চারখানা তেমনই শহুরে আনন্দপ্রার্থী আর প্রার্থিনীদের ঘণ্টা হিসাবে রাত্রি হিসাবে, বা বিশেষ ক্ষেত্রে দু-তিনটা দিন বাত্রির হিসাবে ভাড়া দিয়ে মহেশ্বর ফেঁপে গেছে।

সন্ধ্যার আগেই আত্মীয়বন্ধু সমাবেশে বাড়িটা সরগরম হয়ে ওঠে জগদীশের।

আত্মীয়কুটুম্বদের মধ্যে আজ অবশ্য ডাকা হয়েছে তাদেরই সম্রান্ত গণ্যমান্য মানুষেব সমাবেশে যারা নিজেদের মানিয়ে নিয়ে মিলতে মিশতে জানে।

জগদীশের এই এক জ্বালা।

আজ বিশেষভাবে যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তার আত্মীয়কুটুম্বেব বেশিব ভাগেরই তাদের সমাজে মিশবার যোগ্যতা নেই।

জগদীশ একাই সকলকে অভ্যর্থনা করে। সাবিত্রী ভিতব থেকে বেরিয়ে আসে আলোগুলি জ্বালিয়ে চারিদিক ঝলমল করে দেবার পর।

তার নাকি মাথা ধরেছিল। সে নিজের ঘরে শুয়েছিল।

নন্দর মতো অন্য সকলেও যেন কয়েকবার পলক ফেলতে পারে না তাকে দেখে। রাজরানি সেজে রাজরানির মতোই ধীর শান্তপদে সে সকলের মধ্যে নেমে এসেছে।

একাল দিয়ে সংশোধন করা সেকেলে রাজরানি। প্রৌঢ় বয়সেও তার জমকালো রূপ আর সাজসজ্জায় কয়েক মুহূর্তের জন্য উপস্থিত তরুণীদের রূপ-যৌবন সাজসজ্জা যেন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তবে কয়েক মুহূর্তের জন্যই ?

সাবিত্রী এগিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসতে না বসতে চাপা চাপা মৃদু মৃদু হাসাহাসি শুরু হয়ে যায় এদিকে ওদিকে।

নন্দ চোখ ফেরাতে পাবে না। একেই কি সে দুপুরবেলা আলুথালু বেশে বাগানে ছুটে যেতে দেখেছিল মালিকে দিয়ে সন্ধ্যাপূজা সেরে নেবার জন্য ?

চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না বলেই, আত্মবিস্মৃত হয়ে চেয়ে থাকতে পারে বলেই, নন্দ অল্পক্ষণের মধ্যে টের পায় সাবিত্রী অভিনয় করছে,—রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের সামনে পাকা অভিনেত্রী যেমন তার বিশেষ ভূমিকা অভিনয় করে তেমনি ভাবেই অভিনয় করছে।

নন্দ ভাবে, তাই বটে। তাছাড়া উপায় কী সাবিত্রীর ? তার ছেলের সম্মানে একটি সন্ধ্যার জন্য এমন এক জমজমাট সমাবেশ হয়েছে। পিছিয়ে আড়ালে থাকলে চলবে কেন ?

কাউকে ডাকে না সাবিত্রী, কারও সঙ্গে যেচে কথা কয় না। অতিথিরাই একে দুয়ে গিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে দু-একমিনিট আলাপ করে তার মর্যাদা রেখে আসে।

সাবিত্রীব সঙ্গো একটি সুদর্শন যুবকেব পরিচয় করিয়ে দেবার সময় শুভ নন্দকেও ডেকে নেয়। বলে, এর নাম ফিরোজ রহমান। আমরা একসঙ্গো বিসার্চ কবছিলাম।

নন্দ জিজ্ঞাসা করে, এখন কী কবছেন ?

ফিরোজেব হাসিটি সুন্দর। দাঁতগুলি ঝকঝকে।

চাকরিব চেষ্টা।

আপনারা দুই বন্ধুই দেখছি বৈজ্ঞানিক হয়ে দেশে ফিবে বিজ্ঞান ত্যাগ করছেন।

আমি ঠিক ত্যাগ করছি না—বিজ্ঞান নিয়ে যাতে থাকা যায় তার উপায় খুঁজছি। না খেয়ে তো বিজ্ঞানচর্চা করা যায় না ? সুবিধামতো চাকরি না পেলে হয়তো রিসার্চ বাদ পড়বে, যেটুকু শিখেছি তাই নেড়ে চেড়ে খেতে হবে।

ফিরোজের কথায় একটু টান আছে। নন্দ জিজ্ঞাসা করে, আপনার দেশ কি পাকিস্তান ?

সারা পৃথিবীটাই সায়েন্টিস্টদেব দেশ। এখন এটাই দেশ করেছি, পাকিস্তানে যাবার উপায় নেই।

রাজনৈতিক ব্যাপার ?

অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তিগত। একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি আছেন, তাঁর একজন আত্মীয়কে চাকরি দেওয়া নিয়ে গোলমাল করেছিলাম। তিনি একটি মামলা সাজিযে রেখেছেন, গেলেই জেলে পুরবেন।

নন্দ আপশোশ করে বলে, সব দেশেই ক্ষমতার বাঁকা গতি, অপব্যবহার।

ফিরোজ বলে, সব দেশে বলবেন না, সোভিয়েট চীন এ সব দেশগুলিকে বাদ দেবেন।

ও ! আপনি সোভিয়েটের চীনের ভক্ত। তবে আব কথা কী আছে ! কোয়ালিফিকেশন দাম পাবে না।

শুভ বলে, সত্যি। এ দেশে আত্মীয়পোষণ যেখানে পৌঁচেছে শুনছি তাতে রুই-কাতলার আত্মীয় হওয়াই একমাত্র গুণ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

সাবিত্রী বলে, মানুষ বড়ো হলে আত্মীয়ের জন্য করবে না ?

শুধু আত্মীয় বলে করবে ? আর কিছুই দেখবে না?

মায়া এসে দাঁড়ানোয় কথার মোড় ঘুবে যায়। মায়া ফিবোজকে বলে, কেমন আছেন ? বিয়ে কবছেন শুনলাম।

ফিরোজ বলে, শুনে রাগ করেছেন তো ? আপনাকে বাদ দিয়ে শুভকে একা নিমন্ত্রণ করেছি ! আমার কিন্তু দোষ নেই। সেদিন শুভ কেবল পবিচয় কবিযে দিয়েছিল, আর কিছুই জানায়নি। আজ এখানে এসে শুনলাম দুদিন পরে বলতে হলে আপনাদেব দুজনকেই বলতে হবে।

ফিরোজের কথায় ব্যবহাবে চেহারায় সহজাত আভিজাত্যের ছাপ। বুঝতে দেরি হয় না সে সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের ছেলে।

দুহাত একত্র করে বলে, যাই হোক, কৈফিয়ত থাকলেও অপবাধ নিশ্চয হয়েছে। সেটা মার্জনা করে শুভর সঙ্গো আপনার যেতে হবে কিন্তু।

শুভ বারবার মার দিকে তাকাচ্ছিল। তার বিব্রতভাবটা স্পষ্টই চোখে পড়ে। এবার সে বিব্রতভাবেই বলে, আমার আবার ও সময়টা বাইরে যাবার কথা। যদি থাকি তা হলে অবশ্য—

সাবিত্রী হাসিমুখে ফিরোজকে বলে, জানো বাবা, শুভ কথাটা চাপা দিচ্ছে। তোমার বিয়েতে গিয়ে খানা খাবে জাত যাবে শুনে ওর সেকেলে কনজারভেটিভ মা-টি যদি হার্ট ফেল করে বসে ! মাকে অত সেকেলে ভাবিসনে শুভ।

তিনজনে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সাবিত্রী হাসিমুখে বলে চলে, আমি জাতধর্ম মেনে চলি, আমার কথা আলাদা। তোর বন্ধু আমায় নেমন্তন্ন করলে মুশকিলে পড়ব। যদি বা যাই, জলটুকুও খেতে পারব না। কিন্তু আমি কি

বলতে যাব, তোদেরও আমার মতো হতে হবে ? তুই আর মায়া জাত-টাত মানিস না। তোরা যেখানে খুশি যাবি খাওয়া দাওয়া করবি, সে তোদের ইচ্ছা। আমি কিছু মনে করতে যাব কেন ? আমার নিয়ম আমার, তোমাদের নিয়ম তোমাদের। যে যার নিয়ম মানবে। তুমি কি বলো ফিরোজ ?

আপনি খাঁটি কথা বলেছেন।

নন্দ ভাবে, এই সাবিত্রীই কি মালিকে দিয়ে দুপুরবেলা পূজা সাঙ্গ করে রেখেছিল ?

জগদীশ বহুলোককে বলেছে। সমাগম ঘটেছে শুধু বড়োলোক নয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও। জমজমাট সমাবেশ।

অনভ্যস্ত পোশাকে অনভ্যস্ত পরিবেশে নন্দ বড়োই অস্বস্তি বোধ করছিল। শুভর একস্‌পেরিমেন্টের আসল ফাঁকিটা ক্রমে ক্রমে তার কাছ ধরা পড়ে যায়।

শুভ যা জানতে চায় এ ভাবে পরীক্ষা করে তা জানা অসম্ভব। একদিন হঠাৎ একজন গরিব গেঁয়ো মানুষকে লাগসই পোশাক পরিয়ে এ রকম সমাবেশে আনা যায়, দু-চারজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু সমাবেশের মানুষগুলি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করতে হলেও যেটুকু ঘনিষ্ঠতা দরকার কিছুতেই তা সৃষ্টি করা যায় না।

সে আর নিমন্ত্রিত কারও মধ্যে শুধু চলতে পারে ভাসা-ভাসা আলাপ।

শুভ অনুযোগ দেয়, কী হল ? নার্ভাস হয়ে পড়েছিস ? ভালো করে মিশতে পারছিস না যে কারও সঙ্গে ?

নন্দ একটু হেসে বলে, আমিও পারছি না অন্যেরাও পারছেন না। ভুলে যাস না সবাই যেমন আমরা অজানা অচেনা, আমিও তেমনি সকলের কাছে অজানা অচেনা !

তবু দু-একজনের সঙ্গে চেষ্টা করে—

চেষ্টা করেছি। পরস্পরকে না জানলে তো পরিচয় জামে না ? অপরজন কী করে কোথায় থাকে দুপক্ষেরই সেটা জানা দরকার। দু-চারজনের সঙ্গে এ পর্যন্ত এগিয়েছি। কিন্তু আমি অজ পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারি করি, পাশ করিনি এটুকু শুনে প্রত্যেকে ধরে নিলেন গাঁয়ে থেকে সম্পত্তি দেখাশোনা করি, আমার শখের ডাক্তারি। পয়সার অভাবে পুরো ডাক্তার হতে পারিনি শুনেই প্রত্যেকে ঘাবড়ে গেলেন। বারবার পোশাকটার দিকে তাকাতে লাগলেন। ব্যাস, সেইখানেই ইতি।

নন্দ একটু হাসে।

৭

বিদেশ থেকে ফিরে একটা ব্যাঘ্র-ঘটিত ঘটনাচক্রে শুভর প্রথম পদার্পণ ঘটে নবশিল্প মন্দিরের ভিতরে।

নব নব শিল্প পরিকল্পনায় মাথাটা ঠাসা হয়ে থাকায় তার একবার মনেও পড়েনি নবশিল্প মন্দির দেখে আসার কথা। তার ধারণা বন্ধ কারখানার ভিতরে এতদিন ধরে ধুলো জমা হয়েছে, দেখে আসবার কিছু নেই। সে জানত না এখনও ওখানে তারই কিছুকাল আগের একটা বাস্তব শিল্প-প্রচেষ্টা মরোমরো অবস্থায় ঠুকঠাক চলছে।

জগদীশ ভুলেও ছেলের কাছে নবশিল্প মন্দিরের কথা উল্লেখ করে না। কারখানাটা একেবারে বন্ধ করে না দিয়ে কিছু কিছু কাজ যে সে চালু রেখেছে ছেলেকে এ কথা জানাতে জগদীশ সাহস পায় না। কে জানে সে চটে যাবে কিনা, যা মতিগতি হয়েছে ছেলের। বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে আদর্শ ভেঙে গেছে, চেষ্টাও শেষ হয়েছে, ব্যাপারটা চুকে বুকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অতীত জীবনের একটা ভুলে। সামান্য লাভের জন্য এমনভাবে জোড়াতালি দিয়ে সেই ভুলের জের টেনে চলা !

হয়তো খেপেই যাবে শুভ।

সামান্য হলেও লাভ হয়। একটা পোয়্যেরও হিল্লে হয়েছে, কাদম্বিনীর ছেলে বঙ্কিমের। সে কারখানাতেই থাকে, কাজকর্ম দেখাশোনা থেকে তৈরি মাল চালান দেওয়া পর্যন্ত সব কিছু সে-ই করে। জগদীশের কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না।

শুভ কি এ হিসাব বুঝবে ? যথেষ্ট সন্দেহ আছে জগদীশের। হয়তো বঙ্কিম তার নবশিল্প মন্দিব চালায় এটা শুনেই তার মাথা বিগড়ে যাবে।

দি গ্রেট ইউনিটি সার্কাস নেমেছিল বারতলা স্টেশনে। প্রতি বছব এ সময় প্রকাণ্ড মেলা বসে বারতলায়, তিন দিন একটানা মেলা চলে, দূর থেকেও দলে দলে মানুষ এসে এসে ভিড় বাড়ায়। খাস কলকাতা শহর থেকে পর্যন্ত লোক আসে গাঁয়ের এই মেলায়। শুধু দেখতে নয়, সস্তায় এটা ওটা কিনতেও বটে। যাতায়াতের খরচ ধরলে অবশ্য সস্তা হয় না মোটেই, কলকাতায় বসে কেনার চেয়ে বেশি পড়ে যায় দাম। কিন্তু যাতায়াত তো জিনিসগুলি কেনার জন্য নয়—মেলা দেখার আনন্দের জন্য।

সেই জন্য সস্তা হয়।

গাঁয়ের মানুষ যেমন কলকাতায় দেখতে যায় বারোমেসে শহুরে মেলা, কলকাতাব কিছু মানুষেরও তেমনি দেশি ভাবের সেকেলে ধাঁচের গেঁয়ো মেলা দেখবার শখ জাগবে সেটা বিচিত্র কী !

ছোটো ছোটো সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়াখেলার দল তালি-মারা জীর্ণ তাঁবু সম্বল করে এই সব মেলায় পয়সা লুটতে যায়। মেলার আসল আনন্দ ধামা কুলো, পাটি মাদুর, দা বঁটি বাসনপত্র খেলনা প্রভৃতি কেনাকাটা আর তেলে ভাজা খাবার খাওযায় কিন্তু মজার খেলা জুয়াখেলা, নাগরদোলার আমোদ ছাড়া সে আনন্দ নিরামিষ হয়ে যায়। অন্তত দুটি পযসা দিয়ে মানুষের আয়না সাজানোর কাযদায় কাটামুণ্ড দেখে আর সেই কাটামুণ্ডকে কথা কইতে শুনে আরেকবার আশ্চর্য না হলে যেন মানেই থাকে না মেলায় আসার।

সার্কাসওয়ালাদের সঙ্গে ছিল একটা ম্যাদামারা বাচ্চা বাঘ। তাঁবুর মতো সব কিছুতেই তাদের জোড়াতালি, বাঘের খাঁচাটি পর্যন্ত ছিল নড়বড়ে। খাঁচা থেকে পালিয়ে বাঘটা গিয়ে লুকিয়েছিল নবশিল্প মন্দিরের ভিতরে।

খবর পেয়ে শুভ এল বন্দুক নিয়ে মাঘ মারতে। আব সার্কাসেব লোক এল বাঘটাকে ধরে খাঁচায় পুরতে।

তারা ছিল একান্ত নিশ্চিন্ত। ও বাঘ একটা ছাগলকেও আঁচড়াবে না, বনে-জঙ্গলেও পালাবে না। যেখানেই গা-ঢাকা দিক, লোকে দেখতে পেয়ে হইচই করবে, খবর পেয়ে তারা গিয়ে ধরে নিয়ে এসে খাঁচায় পুড়বে।

খবর তারাও পেল, শুভও পেল। কিন্তু শুভই পৌছল আগে আর পৌছেই জানালার ফাঁক দিয়ে তাক করে তিন গুলিতে খতম করে দিল বেচারা বাঘের জীবন.

সার্কাসের লোকেরা এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

এ কী করলেন বাবু ? আমাদের রুজি-রোজগার মেবে দিলেন ?

ছাড়ো কেন বাঘ ? কাকে মারবে, জখম করবে—

এ বাঘ কী জখম করে বাবু ? ও শুধু নামেই বাঘ, লোক দেখানো বাঘ।

কিন্তু তখন আর এ সব বলে লাভ কী। মরা বাঘটার দাম হিসাবে কয়েকটা টাকা তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল। যতই হোক—শিকার করা বাঘ, চামড়াটা চিহ্ন হিসাবে ঘরে টাঙানো থাকবে। কিন্তু এ সব কীসের যন্ত্রপাতি মালমশলা ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে, মরচে ধরে যাচ্ছে ?

একপাশে টুকটাক করে তৈরি হচ্ছে কী জিনিস ?

হাসিমুখে বঙ্কিম এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। বয়সে শুভর চেয়ে কিছু বড়ো হবে, বেঁটে মোটাসোটা চেহারা। ছেলেবেলায় খুবই হাবাগোবা ছিল, বয়স বেড়ে বুদ্ধি একটু পাকলেও ধার আসেনি বিশেষ।

কাদম্বিনী কোনো এক সম্পর্কে শুভর মাসি হয়। আজ প্রৌঢ় বয়সেও তাকে দেখলে অবাক হয়ে ভাবতে হয় বয়সকালে না জানি তার কেমন আগুনের মতো রূপ ছিল। শুভর মা সাবিত্রীও অসাধারণ সুন্দরী, কিন্তু তার রূপ অন্য ধরনের, রাজরানির মতো জমকালো।

অল্প বয়সে কাদম্বিনী বিধবা হয়। সাবিত্রী আগ্রহ করে তাকে এনে আশ্রয় দিয়েছিল। জগদীশের নাগালের মধ্যে তাকে এনে আশ্রয় দেওয়া আর বাঘের নাগালে কাঁচা মাংস নেওয়া সমান জেনেও গ্রাহ্য করেনি !

কিছুই গ্রাহ্য করেনি।

শুভ এ সব জানে। কিন্তু মাথা ঘামায় না ! কারণ সে এটাও জানে যে সমাজ-সংসারের সাধারণ নিয়মেই জমিদার জগদীশের সমগ্র জীবনে এ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, একটা ব্যাপারকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বড়ো করে তোলার কোনো মানে হয় না।

তা ছাড়া কাদম্বিনী নিঃসন্দেহে কাজে লেগেছিল তার মার। কাদম্বিনীকে দিয়ে—হয়তো বা অন্যভাবেও—সামলে ছিল বলেই জগদীশের যৌবনের দুর্দান্ত বিকারের জন্য বাইরে মদ আর মেয়েমানুষের প্রয়োজনটা বড়ো হয়ে উঠতে পারেনি।

তুমি এখানে কী করছ বঙ্কিম ?

আমিই তো কারখানা চালাই।

কারখানা চালাও ? কীসের কারখানা ?

স্টোভ আর লন্ঠনের কারখানা ফেঁদেছিল শুভ আজ সেখানে তৈরি হয় কাচঘেরা চারকোনা টিনের ল্যাম্প আর টিনের ছোটো ছোটো সুটকেস !

সাপ্তাহিক উৎপাদন গোটা পঞ্চাশ ল্যাম্প আর ডজনখানেক সুটকেস। আশপাশ থেকে ক-জন মাত্র দেশি কামার কারিগর খাটতে আসে।

বঙ্কিম সগর্বে বলে, তুমি তো সব লোকসান করে দিয়েছিলে, আমি মুনাফা তুলছি। মেসোমশায় ভারী খুশি। চুটকি মালের কারখানা থেকে লাভ করার নিয়ম কী জানো ? শুধু খরচ কমাও—বাস, আর কিছু চাই না।

শুভ বুঝতে পারে কথাগুলি জগদীশের, বঙ্কিম শুধু মুখস্থ বলছে। জগদীশের খরচ কমানোর নীতিটা চোখকান বুজে পালন করে সে মুনাফাও তুলছে কারখানা থেকে।

জগদীশ মিথ্যা অনুমান করেনি। তার নবশিল্প মন্দিরের পরিণতি দেখে প্রাণে বড়োই আঘাত লাগে শুভর।

কত সমারোহের সঙ্গে নবশিল্প মন্দির স্থাপন করেছিল, আজ তার এই দশা ! তার শিল্প বিস্তারের প্রচেষ্টাকে কামারশালা হয়ে দাঁড়াতে দেখে আত্মীয়বন্ধু আর চারিপাশের মানুষ না জানি কত হাসাহাসি করেছে।

বাড়ি ফিরেই বলেছে, এ তামাশা রাখার মানে ? একেবারে বন্ধ করে দিলেই হত !

জগদীশ লজ্জিত হয়েই কৈফিয়ত দেয়, তাই দেব ভেবেছিলাম। তবে চলতে লাগল, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, কিছু পয়সা আসছে—

ধরাবাঁধা তালে মাল তৈরি হয়, বাঁধা খাতে বাইরে যায়, কিছু পয়সা ঘরে আসে। লোকসান যা যাবার সে তো গিয়েছেই, এখন বিনা হাঙ্গামায় যে ক-টা টাকা ঘরে আসে।

আয়ব্যয়ের ব্যাপার নিয়ে সেদিন পর্যন্ত জগদীশ কখনও ছেলের সঙ্গে কোনোরকম আলোচনাই করেনি। আজ টাকা ঘবে আসার প্রসঙ্গে আপশোশ করে বলে, জানো, চারদিকে খরচ শুধু বেড়েই যাচ্ছে। এদিকে আদায়পত্র সুবিধে নয। বজ্জাত ব্যাটারা যেন পণ করেছে উৎসন্ন যাবে তবু জমিদারের পাওনা দেবে না। কী করে যে আমি চালাই—

শুভ ভেবেছিল রাগারাগি কবে অবিলম্বে নবশিল্প মন্দিব নিয়ে তামাশাটা বন্ধ করে দেবে। টাকার কথা তুলে জগদীশ তার মুখ বন্ধ করে দেয়। খরচ বেড়ে গেছে, আয় কমে গেছে, জগদীশের টাকার টানাটানি !

তার পিছনেও এ পর্যন্ত শুধু টাকা ঢেলেই এসেছে জগদীশ, আজও ঢালছে।

এদিকটা সেদিন প্রথম খেয়াল হয়েছিল শুভর। টাকার চিন্তায় জগদীশ একটু কাতর। সাধারণ একটা কামারশালার মতো টিনেব ল্যাম্প আর বাক্সো তৈরিব কারখানাটুকু থেকে সামান্য যে কত টাকা আসে তারও মূল্য আছে জগদীশেব কাছে, সেটাও সে হিসাবে ধরে !

ভাসা-ভাসাভাবে ব্যাপার খানিকটা অনুমান করেছিল শুভ, খুবই আলগাভাবে। প্রজার দফা নিকেশ হয়ে এসেছে বলে জমিদারের পক্ষেও আগের চালের সঙ্গে নতুন চাল বজায় রেখে চলা দায় হয়ে পড়েছে। শোষণ ঠিক আছে কিন্তু বক্তই শেষ হয়ে এসেছে প্রজাব। থাবার ঘায়ে বাঘ ঘাড় মটকাতে পারে কিন্তু রক্ত না থাকলে সে শুষবে কী ?

তাকে অনুযোগ দেয়নি জগদীশ। শুভ তা জানে। এখনও বেশ কিছুকাল সময় তাকে দেওয়া হবে, ভুলেও জগদীশ তাকে ইঙ্গিতে পর্যন্ত জানাবে না যে এবাব তার কিছু করা উচিত। তার কাছে অনেক আশা করেছে জগদীশ, আপাতত সে আশা করেই সন্তুষ্ট। টাকা-পযসার দিক দিয়ে কোনো সাহায্যই সে এখন তার কাছে চায় না।

সে চায় না কিন্তু তাব প্রয়োজনটা তো স্থূল বাস্তব সত্যের উপলব্ধি হযে ধরা দেয় শুভর কাছে। সে টের পায় যে জানা কথাই আরেকবার জানায তফাত কী। আদর্শ ও পরিকল্পনা কেটেছেঁটে নেবার বা বর্জন কবার প্রশ্ন ওঠেনি, যা-ই সে কবতে চাক তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়নি কিন্তু পরিবারের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা তাব কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কেবল ওদিকটা নয়, এদিকও একটা আছে তার বড়ো কিছু কবতে চাওয়াব !

এ দায়িত্ব আর কর্তব্যের কথা ভুলে গেলে চলবে না !

একটু মন খারাপ করেই শুভ মেলা দেখতে বেরিয়ে যায।

স্কুলের পিছনের মস্ত ফাঁকা মাঠ আর আমবাগান ভরে গিয়ে রাস্তা পর্যন্ত ঠেলে এসেছে জমজমাট মেলা। চাষির কিন্তু এবার যেন আরও বেশি ভিড হয়েছে মেলায়। কত কী দবকার সংসারে, কেনা যায় না। যদি একটু সস্তায় পাওয়া যায় মেলাতে, যাদ চোখকান বুঝে মরিয়া হয়ে কিনে ফেলা যায় জরুরি একটা জিনিসও। কিন্তু মেয়েরা যেন এবার কম এসেছে মেলায়।

মেলায় শুভ লক্ষ্মীকে দেখতে পায়।

লক্ষ্মী কাঁসার বাসন দর করছিল।

কী কিনছ লক্ষ্মী ?

একটা গেলাস দর করছি। কাঁসার দামও কোথায় চড়েছে !

কাচের গ্লাস ব্যবহার করো না কেন ? কিংবা প্ল্যাস্টিকের ? খুব সস্তায় পাবে।

লক্ষ্মী হেসে বলে, কাচের গেলাস ? যেমন সস্তায় পাব তেমনি সস্তায় যাবে। টং করে ভাঙলেই হল। ভালো কাঁসার একটা জিনিস হলে একজনের জীবন কেটে যাবে। ফেটে যাক ফুটো হোক্ তবু কাঁসার দামে বিকোবে।

শুভ মাথা নেড়ে বলে, যুক্তিটা ঠিক মনে লাগছে না লক্ষ্মী। পাথরের বাসন তো তোমরা কিনছ ? কাচ আর চীনা মাটিতে এত অরুচি কেন ? হাত থেকে পড়লে পাথরের জিনিসও ভাঙবে, কাচের জিনিসও ভাঙবে। কাচের জিনিস বরং বেশি সস্তা।

পাথরের জিনিস সহজে ভাঙে না তো।

কেন ভাঙে না ?

ভারী যে। কাচের গেলাস কত হালকা।

এত বড়ো বৈজ্ঞানিক শুভ একটু নির্বোধের মতোই তাকিয়ে থাকে।

লক্ষ্মী বুঝিয়ে বলে, বুঝলেন না ? ভারী জিনিস হলেই মানুষ সেটা শক্ত করে ধরে। ও আর ভেবেচিন্তে ধরতে হয় না, আপনা থেকে ধরা হয়ে যায়।

তাই বলো !

শুভ সত্যিই একটু লজ্জা বোধ করে। নিজের বুদ্ধির অভাবের জন্য নয়, লক্ষ্মীব এই সাধারণ বুদ্ধিটা একেবারে অপ্রত্যাশিত মনে করার দরুন। দেশের সাধারণ মানুষকে সে মোটেই হীন জ্ঞান করে না। আদর্শের জোরে, দেশকে ভালোবাসার জোরে এ সব মানুষের উপর শ্রদ্ধা ঠেলে ঠুলে খাড়া রাখবার প্রয়োজনও তার হয় না। এদের বাদ দিয়ে দেশ কথাটার মানে হয় না, দেশের স্বাধীনতার বা এগিয়ে যাবারও মানে হয় না—শিক্ষিত সমাজে এই সহজ সত্যটা থিয়োরিতে স্বীকৃত হয়ে থাকার বদলে সাধারণ বাস্তব উপলব্ধির চারা হয়ে মাথা তুলেছে। অনেক স্বপ্ন আর কল্পনা গুঁড়ো হয়ে গিয়ে অনেক ব্যর্থতার জ্বালায় পুড়ে পুড়ে বোধ জন্মাচ্ছে যে এই সব সাধারণ মানুষেরা তাদেরও ভবিষ্যতের জন্য শুধু প্রয়োজনীয় নয়, একেবারেই অপরিহার্য। নিজের, নিজের শ্রেণির ভবিষ্যৎ স্বার্থ—এই বাস্তববোধটাই কিনা ভিত্তি সকল আত্মীয়তা বোধের, তাই শুভও স্বাভাবিক মমতা আর আত্মীয়তা বোধ দিয়েই শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার প্রশ্নটাকে বাতিল করে দিতে পেরেছে। যে কারণে এদের সংকীর্ণ নিঃস্ব জীবন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, শিক্ষাহীন ভোঁতা মন—সেই কারণের বিরুদ্ধে যে জ্বালা স্থায়ীভাবে জ্বলছে তার মধ্যে তাতেই অসম্ভব হয়ে গিয়েছে এদের পরের মতো হীন ভাবা, অনাত্মীয়ের মতো নিচু স্তরেব অশ্রদ্ধেয় জীব মনে করা। সে কথা নয়। দেশের মানুষকে আপন মানুষ ভাবতে পারার পর এদের পিছনের অন্ধকারে ঠেলে রাখা বোকাহাবা নোংরা ভাঙা মানুষ আর কুসংস্কারের ডিপো ভাবার এ জন্য নিজের কাছে লজ্জা পাবার কারণ ঘটে না। দেশের মানুষ যেমন তাকে ঠিক সে রকম জেনে রাখা ভেবে নেওয়ার মধ্যে দোষেরও কিছু নেই লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই।

শুভ তা জানে।

জানে বলেই তার বৈজ্ঞানিক মন মাঝে মাঝে তাকে টের পাইয়ে দিচ্ছে যে বিদেশ থেকে ঘুরে এসে কী যেন হয়েছে তার, এ সব মানুষকে একটু বেশিরকম পিছিয়ে পড়া জীব মনে হচ্ছে, যতটা সত্যই তারা নয়। এ জন্য অবশ্য অবজ্ঞা নেই, আছে আপশোশ। কিন্তু কেন সে নিজের মনে বেশি পিছিয়ে দেবে দেশের মানুষকে, বেশি অন্ধকারের জীব মনে করবে ? বিচার করার তুলনা করার কোনো মাপকাঠি সে গড়ে নিয়েছে ?

লক্ষ্মীর এই সাধারণ বাস্তববুদ্ধি আর অভিজ্ঞতাটুকু তাই তাকে আশ্চর্য করে দিয়েছে, পরক্ষণে তা তাকে লজ্জিত করেছে নিজের কাছে।

ওজন করা হলে কাঁসার গেলাসটার দাম শুনে লক্ষ্মী মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় !

নেবে না ?

কাল নেব।

শুভ যেন কাচের গ্লাসের সপক্ষে প্রচারেব ভার নিয়েছে। সে আবার বলে, ক-আনা দিয়ে একটা কাচের গ্লাস কিনেই নাও না আজ ? দেখই না ব্যবহার করে। সুবিধেও নিশ্চয় আছে। নইলে এত লোক কিনছে কেন, ব্যবহার করছে কেন ?

লক্ষ্মী বলে, সুবিধে আছে বইকী। যাদের সুবিধে হয় তারা ব্যবহার করছে। আসলে কী জানেন, কাঁসার বাসন কাচের বাসন মিশিয়ে তো কাজ চলে না, এক রকম রাখতে হয়। শহরে ঘরে ঘরে চা জলখাবারের জন্যে কাচের গ্লাস কাপ-ডিস চলে, ভাত খেতে কাঁসাব বাসন। গাঁয়ের গেরস্ত ঘরে কি ওসব পাট আছে ? কাচের গেলাস নিতে বলছেন, পাঁচটা কাঁসার থালা-গেলাসের সঙ্গে একটা কাচের গেলাস মাজতে ধুতে রাখতে বড়ো ঝঞ্ঝাট।

শুভ খুশি আর উৎসাহিত হয়ে বলে, ঠিক বলেছ, এটাই আসল কথা। আমি উলটো ভাবছিলাম।

কী ভাবছিলেন ?

ভাবছিলাম, তোমাদের বুঝি সংস্কারে বাধে। মা কাচের গ্লাসে জল খায় না। চা খাবে কিন্তু পাথরবাটি চাই। তাই ভাবছিলাম তোমাদেরও বুঝি একই ব্যাপার, শুধু অভ্যাস আর সংস্কারটাই আসল। এখন দেখছি তা তো নয়। মা-র বরং সংস্কারে বাধে, তোমাদের হল সুবিধা-অসুবিধার বিচার।

আশ্চর্যরকম খুশি মনে হয় শুভকে !

একটু খাপছাড়া মনে হলেও শুভর কথাবার্তা খাবাপ লাগে না লক্ষ্মীর। তার আন্তরিকতা লক্ষ্মীর অন্তর স্পর্শ করে—ফাঁকা দরদে লক্ষ্মীকে ফাঁকি দেবার সাধ্য কোনো মানুষেরই বুঝি আর নেই। আন্তরিকতার ধাপ্পাবাজিও চিনতে দেয় না হৃদয়মনের যে বিষম রোগ, অতি কড়া বিষের ডোজে সে রোগ তার প্রায় সেরে গেছে।

কাঁসার বাসন কাচের বাসন থেকে সংস্কারের প্রসঙ্গে এল কথা। কিন্তু শুভ কি সত্যিই বুঝেছে তার কথা ? এঁটো বাসন হুড়মুড় করে কুড়োতে, ঘাটে নিয়ে গিয়ে মেজে ঘষে ধুয়ে আনতে একটা ঠুনকো কাচের গেলাস কী যন্ত্রণা দিতে পারে সেটা ধারণা করতে পেরেছে কি শুভ ?

কে জানে ! তবু, তার সরল সহজ কথা আর ব্যবহারকে মেনে নিয়ে লক্ষ্মীও সহজভাবে খোলা প্রাণে কথা কয়।

গরিবের কি বেশি সংস্কার পোষায় ছোটোবাবু ? হিসেব ছাড়া চলে ? এমনিই দুর্ভোগের অন্ত নেই, সংস্কারের খাতিরে দুর্ভোগ কখনও আরও বাড়াতে পারে মানুষ ?

পারে না ? তুমি কি বলতে চাও চাষিদের মধ্যে কুসংস্কার নেই ? অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে তারা অকারণে বেশি কষ্ট পায় না ?

লক্ষ্মী স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। একটু ভর্ৎসনার সুরে বলে, আপনারা এত লেখাপড়া শিখেছেন, এমন সোজা কথাটা ধরতে পারেন না কেন ? সব জিনিসের কলের মতো মানে করেন কেন ?

শুভ ক্ষুব্ধ ও গম্ভীর হয়ে যায়। নন্দও তাকে এই অনুযোগ দিয়ে থাকে। লক্ষ্মী বলে যায়, কুসংস্কার গাদা গাদা আছে, অদৃষ্টও সবাই মানে। না করছে কে ? কিন্তু কুসংস্কারের জন্য অদৃষ্টের খাতিরে চাষাভুসো মানুষ মিছিমিছি নিজেকে কষ্ট পাওয়ায় এ ধারণা কোত্থেকে আসে আপনাদের ? তাদের রাতদিন শুধু চিন্তা কষ্টটা কী করে একটু কমানো যায়। কষ্ট কমাবার উপায় পেলে ভগবান অবতার কোনো কিছুকে কেয়ার করবে না। আপনি দিন না উপায় করে কষ্ট কমাবার ? দেখবেন, কুসংস্কার অদৃষ্ট এ সব কেমন চটপট বাতিল করে দেয়।

আঁচলের গিট খুলে লক্ষ্মী এক টুকরো তামাকপাতা মুখে পুরে দেয়।—কষ্টের চেয়ে বড়ো হবে সংস্কার ! কেন, আপনি কি দ্যাখেননি গাঁ থেকে চাষি বউ কলকাতায় গিয়ে ডাস্টবিন থেকে এঁটো কুড়িয়ে খেয়েছে ? ক-দিন আগেও তার এঁটো এঁটো ছুঁচিবাই ছিল, দিনে দশবার পচা ডোবায় গা ডুবিয়ে শুদ্ধ হত ?

শুভ বিব্রতভাবে বলে, সে হল আলাদা কথা। যেমন ধর নন্দ বলছিল, অনেকে রোগে কষ্ট পাবে কিন্তু যেচে দিলেও বিলাতি ওষুধ খাবে না।

এবার লক্ষ্মী হাসে।

আমার কী আস্পর্ধা বলুন তো ? এত বেশি জানেন বোঝেন, আপনার সাথে তর্ক জুড়েছি ! হাসছেন তো মনে মনে ? তা হাসুন তবু বলব একটু কম জানলে বুঝলে ভালো করতেন। রোগে কষ্ট পাবে তবু বিলাতি ওষুধ খাবে না ? খাবেই না তো। সাতপুরুষে রোগ হলে বিলাতি ওষুধ খেতে পায়নি, জানা-চেনা কেউ পায়ও না খায়ও না। সে কোন সাহসে আপনার ওষুধ খাবে ? ব্যবস্থা করে দিন না, রোগ হলে সবাই যাতে বিলাতি ওষুধ পায়—ওটা রেওয়াজ হয়। কে ওষুধ খায় না একবার দেখব। দু-একজন ঢং করে খাবে না, বাহাদুরি করার জন্য খাবে না দু-চারদিন। বাকি সবাই খাবে।

শুভ বলে, তোমায় তো ঠিক চাষির মেয়ে চাষির বউ মনে হচ্ছে না লক্ষ্মী !

কী করে মনে হবে ? ছোটোবাবু যেচে কথা কইছেন, তবু গদগদ হয়ে নেতিয়ে পড়িনি যে !

শুভ রাগ করে এগিয়ে যায়। লক্ষ্মীর এবার খেয়াল হয় অসীম বিস্ময় নিয়ে শত শত চোখ মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের আলাপ করা দেখছিল।

রাগ বলে রাগ ! ভিতরটা যেন পুড়ে যেতে থাকে শুভর, দু-কান গরম হয়ে ঝাঁঝাঁ করছে। সে টের পায় যে হাত-পা পর্যন্ত তার থরথর করে কাঁপছে।

মনের মধ্যে দাপড়িয়ে বেড়াচ্ছে অশান্ত অবাধ্য একটিমাত্র চিন্তা : খুশি হলেই যাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্ধঘরে চরম অপমান করতে পারে সে কিনা এমন বেয়াদবি করতে সাহস পায়।

বৈজ্ঞানিক শুভ নিজের মনকে বলে, শান্ত হও ! শান্ত হও !

কিন্তু বলে কি সঙ্গে সঙ্গে শান্ত করা যায় এখনকার এই মনকে। একটা চাপা-পড়া আগ্নেয়গিরির যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে ভিতরে, হলকায় হলকায় বেরিয়ে আসছে ক্রোধের আগুন আর উন্মাদ লালসা। আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিতে চাইছে বুদ্ধি ও চেতনাকে। কোমল কান্তিময়ী মায়ারা যেন ছায়া হয়ে দূরে সরে গিয়েছে, বন্ধ ঘরে কেবলি শাড়ি কেড়ে নেওয়া চলছে মাটির কাছের খাটুয়ে চাষি মেয়ে লক্ষ্মীর ঠাসবুনানি দেহ থেকে।

এটাই যেন তার চিরদিনের ধ্যানধারণা এমনিভাবে শিকড় গেড়েছে চিন্তাটা। চেষ্টা করেও মন থেকে তাড়াবার সাধ্য যেন তার হবে না।

বৈঠকখানায় আরাম কেদারায় বসে জগদীশ তামাক টানছিল। তফাতে মেঝেতে উবু হয়ে বসেছিল বুড়ো ভীম মণ্ডল। তার হাত দুটি জোড় করা।

জগদীশ উদ্‌বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে শুভ ? তোমার মুখ এমন দেখাচ্ছে কেন ?

কিছু হয়নি—এমনি।

জগদীশ ক্ষুব্ধ চোখে তাকায়। মাঝে মাঝে কী যে হয় শুভর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে দাঁড়িয়ে ভালো করে জবাবটা পর্যন্ত দেয় না, এমনিভাবে অবজ্ঞা করে চলে যায়।

এই একটা মারাত্মক দোষ একালের শিক্ষার।

অন্দরের বারান্দায় সাবিত্রীর চুলে তেল মাখিয়ে দিচ্ছিল কাদম্বিনী। সাবিত্রীও ছেলের মুখ দেখে ভড়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে শুভ ? ওনার সঙ্গে আবার—?

শুভ নীরবে মাথা নাড়ে। কয়েক মুহূর্ত মা আর কাদম্বিনীর দিকে চেয়ে থেকে সে নিজের ঘরে চলে যায়।

ঘরে হালকা আসবাব। স্তরে স্তরে সাজানো বই।

একটা মোটা বই টেনে নিয়ে শুভ চেয়ারে বসে। বইয়ে মন বসাবার চেষ্টা করার দরকার হয় না। ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল।

কত তাড়াতাড়িই যে কেটে যায় তার বাগ আর লক্ষ্মীর ঠাসবুনানি দেহটার জন্য উগ্র পাশবিক লালসা—বেয়াদবি করার অজুহাতে গায়ের জোরে তাকে ভোগ করার অন্ধ উন্মাদ তাগিদ।

তার বদলে উথলে ওঠে তীব্র ঘৃণা আব বিদ্বেষ। একা জগদীশের বিরুদ্ধে নয়, পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে, বংশের বিরুদ্ধে। যে বংশ তাকে এই রোগ দিয়েছে। একেবাবে রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছে রোগ। হঠাৎ হোক সাময়িকভাবে হোক, বেশি ক্ষণ তাকে কাবু করতে না পারুক, তার এত দিনের এত চেষ্টা এত সাধনাকে ঠেলে সরিয়ে রোগটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

শুভ জানে, এই জ্বালাবোধেব তীব্রতাও ধীরে ধীরে কমে আসবে—এটা শুধু প্রতিক্রিয়া। মন তার শান্ত হবে। কিন্তু এখন তো বিশ্রী লাগার সীমা-পরিসীমা থাকছে না।

লক্ষ্মীর জন্যই কি বাসন সম্পর্কে সচেতন হল শুভ ?

কে জানত নবশিল্প মন্দিরকে পিতল কাঁসা ভবনের বাসন তৈরির কারখানায় পরিণত করার কথা শুভর মাথায় এসেছিল এবং ধারণাটা যুগিয়েছিল মেলারই বাসনের অস্থায়ী দোকানগুলি আর বাসন সম্পর্কে মানুষের লোভ ও আগ্রহ।

ছেলেবেলা থেকে এ মেলার সঙ্গে তাব ঘনিষ্ঠ পবিচয়। কলকাতায় পড়বার সময়েও বাড়িতে এসে তিন দিন সে মেলা চষে বেড়িয়েছে। কিন্তু আগে কোনোবার লক্ষ করেনি যে মেলায় এতগুলি বাসনের অস্থায়ী দোকান হয়, এত লোক বাসন কিনতে চেয়ে পছন্দ আর দরদস্তুব করে, এত বাসন বিক্রিও হয়।

এবার মেলায় ঘুরতে ঘুরতে এটা খেয়াল কবে সে নাকি সত্যই আশ্চর্য হয়ে গেছে।

ভিড় ? না, ঠিক ভিড় হয না বাসনওয়ালাদেব কাছে, যেমন ভিড় অন্য অনেক রকম সস্তা জিনিসের দোকানে হয়। কিন্তু সেটাই তো স্বাভাবিক। মফস্বলের মেলায় ভিড় করে আসে দীনহীন গরিব মানুষ যাদের মধ্যে কতজনকে না জানি ঘরের বাসন বাঁধা রাখতে হয়েছে মেলায় আসার খরচের জন্য ! বাসনের মতো দামি জিনিসের দোকানে ও রকম ভিড় হওয়াই তো অসম্ভব।

তবু এই গরিব মানুষের মেলায যত লোক বাসন কিনতে চায় এবং কেনে সেটা খেয়াল করলে আশ্চর্য হবারই কথা !

পরদিন মেলাতেই লক্ষ্মীর সঙ্গে আবার তার বাসন নিয়ে কথা হয়।

আগের দিন যে সময় গিয়েছিল আজ তার খানিকটা আগেই শুভ মেলায় যায়। লক্ষ্মীর ঠাসবুনানি দেহটার আকর্ষণে নয়, তার সঙ্গে বাসন নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলাপ করার তাগিদে।

বাসনের কথা ভাবতে ভাবতে, হাতেনাতে একটা কাজ আরম্ভ করার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ওই চিন্তা আর কল্পনার খুঁটিনাটি নিয়ে সে মশগুল হয়ে গেছে রাতারাতি।

লক্ষ্মীর দেহটা গায়ের জোরে অথবা প্রেমের জোরে ভোগ করা না করা নিয়ে তার আর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

একটি বাসনের দোকানের মালিকের সঙ্গে শুভ আলাপ-আলোচনা চালায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। বাসনের কথা লক্ষ্মীর কাছেই জানা যাবে, দোকানির কাছ থেকে শুভ জানবার চেষ্টা করে বাসন যারা বানায় আর বিক্রি করে তাদের কথা। সকলে তারা কাঁসারি নয়। কোনো দোকানের মালিক নিজেই বাসন তৈরি করে, কোনো দোকানের মালিক তৈরি বাসন কিনে নিয়ে লাভ রেখে বিক্রি করে। এ সমস্যাটাই একটু মুশকিলে ফেলে দেয় শুভকে। যে নিজে বাসন তৈরি করে আর যে অন্যের তৈরি বাসন কিনে বিক্রি করে তারা পাশাপাশি দোকান দিয়ে একদরে বাসন বেচছে।

কাঁসারি গোষ্ঠকে সে তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করছিল। গোষ্ঠ ভাবছিল সেদিন বেরোবার সময় লক্ষ্মীর পটে কপাল ঠেকাবার সময় গোটা কপালটা ঠেকায়নি। নইলে এমন বিপদ ঘটে ? খদ্দের

ভিড় করেছে দোকানে, সেদিকে তার নজর দেবার উপায় নেই, ছোটোবাবুর আবোল-তাবোল প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সসম্ভ্রমে।

যে সোনার রূপার থালা বাটিতে খায় তার কেন কাঁসার বাসন তৈরি করা বিক্রি করা নিয়ে এত কৌতূহল ?

একটু ভয়ও করছিল গোষ্ঠর।

এমন সময় লক্ষ্মী এসে তাকে রেহাই দিল।

লক্ষ্মীর গেলাসটা কেনা হয়েছিল। হাতেই ধরা ছিল জিনিসটা। পয়সা কম পড়ায় আগের দিন কিনতে পারেনি।

গেলাসটা কিনে ছাড়লে ?

কী করি। ছ-মাস ধরে কিনব কিনব করছি, অ্যাদ্দিনে কেনা হল।

অনেকে পয়সা জমিয়ে জমিয়ে বাসন কেনে, না ?

কেনে না ? এমনি মেলায়-টেলায় কিনবে বলে অনেকে ছ-মাস একবছর আগে থেকে পয়সা জমায়। নইলে গরিবের সংসারে ক-জন ঝাঁ করে নগদ বার কবতে পারে বলুন ?

একটু থেমে বলে, শুধু বাসন কেন, অনেক কিছুই এমনিভাবে কিনতে হয়। একটা জিনিস চাই, জোগাড় করতে দু-তিনবছরও লেগে যায় কারও কাবও !

বলে সে একটু হেসেছিল, কেউ কেউ অবিশ্যি সারা জীবনেও জোগাড় করতে পাবে না।

তার সে হাসির মানে বোঝেনি শুভ, একটু ক্ষুণ্ণ হযেছিল। তাকে দেখে লক্ষ্মীবও কি গা জ্বালা করে ? তার ধারে কাছে না এসেও তার নাম শুনেই যেমন জ্বালা করে অনেকের বুক ? গাড়ির পার্টস খুলে নিয়ে তাকে জব্দ করতে চাওয়ার ঘটনা তুচ্ছ হয়ে গেছে নন্দর ডিসপেনসারিতে লুকিয়ে চাষিদের কথাবার্তা শোনার পর থেকে। সেদিনের অভিজ্ঞতায় নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান এবং আবেকটি অগ্রসব জগৎ সম্পর্কে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা তুচ্ছ বা বাতিল হয়ে যায়নি কিন্তু প্রাণে তার শেল বিঁধেছে।

কৈলাস শুধু তার মনুষ্যত্বটুকু মানতে বলেছিল ওদের। এত বড়ো বৈজ্ঞানিক, হোক সে জমিদারের ছেলে, ওকে অন্তত তোমরা মানুষ বলে গণ্য কর !

এটুকুও মানতে পারেনি তারা।

লক্ষ্মীও কি ওদেরই একজন ? এমন ঠেস দিয়ে খোঁচা দিযে বলার নইলে আর কী মানে হয় যে ওগো বাবু, তুমি কি জানো এ দেশে অনেকে সারা জীবন কাটায় সামান্য একটা কাঁসার গেলাস কেনার সাধ না মিটিয়েই ?

তোমার কথা বুঝতে পারছি না লক্ষ্মী। এ রকম যাদের অবস্থা তারা কাঁসার গেলাস চায় কেন ? কাচের গেলাস নয় নাই কিনল—মাটির গেলাস মাটির ভাঁড় তো পাওয়া যায় ?

কাঁসার গেলাস আর মাটির ভাঁড় ! মাটির ভাঁড় তৈরি করা দেখেছেন ? বনবন চাকা ঘুরছে, জল ভেজানো হাতে যেন চোখের পলকে একটা কাঁচা ভাঁড় তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সুতো দিয়ে তলাটা কেটে নামিয়ে রাখছে। মিনিটে একটা করে ভাঁড় তো বটেই। তবু ওদের দৈনিক রোজগার কত জানেন ? রোজ একজন চারশো থেকে পাঁচশো ভাঁড় বানায়। নিজের ঘরে নিজের যন্ত্র নিজের জিনিস নিজের মেহনত দিয়ে বানায়। তবু কলে যারা খাটে তাদের মতোই রোজ তাদের বেশি হলে টাকা দুই রোজগার হয়।

শুভ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

বাসনের দোকানি ভাবে, ছোটোবাবু ফ্যাসাদে পড়েছেন। এই ছুঁড়িটাকে নিয়ে ফুর্তি করবেন না অন্য কাউকে পছন্দ করবেন ঠাহর হচ্ছে না !

শুভ একটা সিগারেট ধরায়। দামি গন্ধওলা সিগারেট।

বলে, রাগ কোবো না। তুমি সত্যি চাষির মেয়ে চাষির বউ নও।

লক্ষ্মী মুচকে হেসে বলে, আমি তবে আকাশ থেকে নেমে আসা কেউ ?

বাসন নিয়ে শুভর বাড়াবাড়ি সেদিন বড়োই অদ্ভুত মনে হয়েছিল লক্ষ্মীর ! কী চিন্তা রূপ নিচ্ছে শুভর মাথায় সেটা ধাবণা করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে।

পরে নবশিল্প মন্দিরে বাসনের কারখানা স্থাপনের তোড়জোড় শুরু হলে ব্যাপারটা খানিক স্বচ্ছ হয়েছিল তার কাছে। একটু শঙ্কাব সঙ্গে তাকে ভাবতেও হয়েছিল যে তার কথার উপর নির্ভর করে, সংসারে বাসনকোসনেব স্থানকে সে অনেক তুলে ধরেছিল বলে, শুভ তো এ মতলব করেনি ?

বাসনের পক্ষে তার গাউনি শুনে বাসন সৃষ্টি করার জন্য তার এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে তাকে তো শেষে দায়িক করবে না শুভ ?

কথা হয় মেলায় ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে, লক্ষ্মী অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু শুভর যেন কোনো দিকেই খেয়াল নেই।

মাটির ভাঁড়ের প্রসঙ্গে প্রায় জেবা কবাব ভঙ্গিতে শুভ জিজ্ঞাসা করে, বাসনও তো তোমরা দামি সম্পত্তি মনে কব ?

সে জবাব দেয়, গয়নার পরেই বাসন। তবে একটা কিন্তু আছে এতে। গয়না ছাড়া দিন চলে, বাসন ছাড়া রাঁধাবাড়া খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। গয়না শুধু গযনাই, বাসনটা দরকারি। ভাত কাপড় ঘর, তার পরেই বাসন।

শুভ বলে, মাটির হাঁড়িতে কিন্তু ভাত রাঁধা যায়। কলাপাতে খাওয়া যায়।

সে হেসে জবাব দেয়, গাছতলায় নেংটি পবে থাকা যায়। পুরুষের একটা নেংটিতেই চলে, মেয়েদেব দুটো লাগে। তাই তো বলি ছোটোবাবু, আমবা যেন হিসেবের শেষ কড়ার কড়ি দাঁড়িয়েছি। কাঁসার একটা বাসন কিনলে ধারণা হয়, তবে তো এরা গরিব নয়, না খেতে পেয়ে মরছে না, চাল না কিনে কাঁসার গেলাস কিনছে আজও ! এ যে কী মুশকিল হয়েছে মোদের, কী বলব আপনাকে ছোটোবাবু ! চাল খেয়ে নাকি মানুষ বাঁচে ? মানুষ কি গোব যে তার জল খেতে গেলাস লাগবে না ?

আরও কত কথা সে বলে ফেলত কে জানে ! গাঁদা সে তাব নাগাল ধরার মতোই আঁচল চেপে ধরে কথাবার্তা থামিয়ে দেয়।

বাঃ রে লক্ষ্মীদি বেশ ! মোকে ফেলে পালিয়েছ ?

তোকে আবার ফেললাম কখন ? শাউড়ি ননদের সাথে লটারি খেলছিস দেখলাম তো তুই।

এত দেখলে, মোর ইশারাটা দেখলে না ? ওদের সাথে মেলায় আসার সুখ আছে আধ ছটাক ? জানলে না যে কাটিয়ে পড়ে তোমাব সাথে ভিড়তে চাই ?

গেলাস কিনে ফতুর হয়েছি গাঁদা।

বেশ করেছ। এসো না লক্ষ্মীদি।

আঁচল ধরে টেনেছিল গাঁদা।

মোর বুঝি পয়সা রইতে নেই ? এ জন মোর মাকড়ি বেচে শখ করে জেলে যেতে পারবেন, আমি কিছু বেচতে পারিনে ? আসবে তো এসো লক্ষ্মীদি, নইলে আমি একলাটি আজ—

শুভর দিকে সে ফিরেও তাকায় না, যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না তার উপস্থিতি। অথচ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে শুভর সঙ্গে কথা বলছিল এটা নিশ্চয় নজরে পড়েছে গাঁদার।

লক্ষ্মীর মনে একটা সন্দেহ জাগে।

দেখা যায় সন্দেহ তার মিথ্যা নয়।

শুভ একটু তফাত হতেই গাঁদা বেশ খানিকটা গর্বের সঙ্গে বলে, দেখলে তো কেমন বাঁচিয়ে দিলাম তোমাকে !

লক্ষ্মী হেসে বলে, থাবড়া খাবি ?

বাসনের কারখানা ? জগদীশ যেন আকাশ থেকে পড়ে। শুভ শেষ পর্যন্ত পেশা নেবে কাঁসারির !

শুভ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, আমি ঠিক লাইন ফলো করছি। আমি আগের বার ভুল করেছিলাম। আপনি টিনের ল্যাম্পের কামারখানা বজায় রেখে আরেকটা ভুল করেছেন। আমি সব ভুল সংশোধন করে নিচ্ছি।

বটে !

জগদীশ চটবে না অভিমান করবে বুঝতে পারে না।

শুভ বুঝিয়ে বলে। এখানে নবশিল্প মন্দির গড়ে শুভ যে স্টোভ আর গ্যাসের লন্ঠন তৈরি করতে চেয়েছিল তাতে দুটো আসল হিসাবেই থেকে গিয়েছিল গলদ। ও সব জিনিস তৈরি করার কারিগর আর মাল কাটাবার বাজার দুই-ই ছিল তার আয়ত্তের বাইরে। ও সব জিনিস তৈরি করার কাজ যারা শিখেছে তারা হয়ে গেছে শহরের শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা, এই বিচ্ছিন্ন এলাকায় কারখানা করা মানেই তাদের উঠিয়ে এনে নূতন করে বসতির ব্যবস্থা করা। যে জগতের যে বাজারের সঙ্গে শুভর যোগাযোগ গড়া সম্ভব, সেখানে কি স্টোভ আর লন্ঠন কাটে ? যারা পোড়ায় কাঠপাতা আর জ্বালায় ডিবরি প্রদীপ, তাদের স্তরে কি মার্কেট আছে স্টোভ আর লন্ঠনের ? সে আলাদা মার্কেট, সে মার্কেট দখল করার অন্য ব্যবস্থা।

বিরাট কারখানা যদি গড়তে পারত শুভ, কারখানা কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে পারত শ্রমিক নগর, ঠিক পথে ঠিক ভাবে সেল অর্গানাইজ করতে পারত, তা হলে বরং অন্য কথা ছিল। ও সব জিনিসের এ ছোটো কারখানা কি এখানে চলে, এভাবে চলে ? শুধু মজুর এনে বসানোর খরচাটাই যে পোষাবে না ! সেল অর্গানাইজ করা থেকে আরও কতদিকে কত খরচ।

ঘটেছেও ঠিক তাই। শিক্ষিত কারিগর যারা এসেছিল বিদায় হয়ে গেছে, স্টোভ আর লন্ঠনের বাজার বাতিল হয়েছে। স্থানীয় মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি হচ্ছে ল্যাম্প আর টিনের সুটকেস, বিশেষ কোনো ব্যবস্থা দরকার হয়নি সে মাল কাটাবার জন্য। বঙ্কিমের মতো একটা গোমুখ্যুকে দিয়ে সে কাজ করানো গেছে।

বাসনের কারখানার বেলাতেও এই নীতি খাটবে।

চারিদিকে গ্রামে শহরে বিচ্ছিন্নভাবে কারিগরেরা ছড়িয়ে আছে, তাদের এনে খরচ করে বসাতে হবে না, নিজেদের গরজেই তারা এসে মাথা গুঁজবার ঠাঁই খুঁজে নেবে নিয়মিত মজুরির লোভে। বাসনের বাজার মিলবে সহজেই। ও বাজারটা তাদের জানা, প্রভাবও খাটবে।

বাসন বিক্রি হবেই। যারা লন্ঠন কেনে না, তারাও দুটো একটা বাসন কেনে।

তাছাড়া বাসন পচবে না গলবে না নষ্ট হবে না।

এ সব কথার চেয়ে জগদীশের বড়ো আশ্বাস মেলে শুভকে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে শুনে যে এটা তার সাময়িক উদ্যম, সাইড লাইন। বাসন তৈরি তার জীবনের ব্রত হবে না।

আসলে এটা জগদীশের কারখানা। সে শুধু গড়ে দেবে, তারপর দেখাশোনা কাজ চালানোর ব্যবস্থা জগদীশ নিজেই করতে পারবে।

টিনের ল্যাম্প আর সুটকেস বেচা কটা টাকা পেয়ে জগদীশ খুশি হয়, মোটা লাভ আসবে তার এই কারখানা থেকে।

নন্দকে সে বলে, চুপচাপ বসে থাকব ? জল্পনা কল্পনা সম্বল করে ? তার চেয়ে এটাতেই হাত লাগলাম আপাতত। নতুন প্ল্যান ঠিক করি ততদিনে।

এর নাম উৎসাহ, একে বলে কর্মপ্রচেষ্টা। তবু কেমন একটা হতাশা জাগে তার কথা শুনলে। বড়ো কিছু করা যাচ্ছে না হাজার ইচ্ছা নিয়েও, সুতবাং চুপচাপ বসে না থেকে যা হোক কিছু করা যাক, দমে না যাবার প্রমাণ হলেও কথাটা যেন দমিয়ে দেয় !

শুধু নন্দ নয়, লক্ষ্মীও তাই বলে। বাসন সম্পর্কে শুভর কৌতূহলের কারণ বুঝতে পেরেছে কিন্তু মনটা তার খারাপ হয়ে গেছে শুভকে বাসনের কাবখানা নিয়ে মাততে দেখে—সে দুদিনের জন্যে মেতেছে জেনেও।

কৈলাস বলে, তা হবে না ? আসল কাজ গোড়ায় যেমন তেমন শুরু করলেও মনে ফুর্তি লাগে। এটা হল একদম অন্য কাজ, অকাজ।

কিন্তু আসল কাজটা কী ? শুভর কাছে কোনো বড়ো কাজ আসলে তারা প্রত্যাশা করছিল যার গোড়াপত্তন হিসাবে বাসনের কারখানাটা গড়ে উঠছে না বলে তাদের খারাপ লাগছে ?

না, শুভর কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনাব খবব তারা জানে না। কিন্তু প্রত্যাশা তারা করে। এটাই ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয় তাদের কাছে। শুভ মহাসমারোহে বাসনের কারখানা গড়ার কাজে লেগে যাওয়ায় তাদের হতাশা জাগার মানেটা ধরা যায়। শুভ কী করবে না জানলেও তারা আশা করেছে যে সে এমন কিছু করবে যা থেকে দেশ ও দশের স্বার্থ বাদ পড়বে না। শুভ টাকার কথা ভাববে না, তার অর্থাগম হবে না, এ কথা তারা ভাবেনি।

কিন্তু শুধু লাভের জন্য সে ব্যাবসা করবে, তার নিজের লাভ ছাড়া আর কোনো মানেই থাকবে না তার কর্মপ্রচেষ্টার, এটাই তারা আশা করতে পারেনি শুভর কাছে।

বাবতলা স্টেশন এলাকা আবার সরগরম হয়ে উঠেছে নর্বশিব মন্দিরের নবজন্ম লাভের প্রক্রিয়ায়।

খবরটা রটে গেছে চাবিদিকে। কারখানার অদল-বদলেব কাজ আরম্ভ হতে না হতে শুধু ব্যাপার জানতেই যে কত লোক আসে, কাজ বাগাবার আশায় আবির্ভাব ঘটে কত বেকারের !

একদিন সকালের গাড়িতে আসে তিনজন মাঝবয়সি লোক। দুজনের গায়ে ছিটের হাতকাটা ছোটো শার্ট, একজনের পায়ে চটের মতো সস্তা ক্যাম্বিসের জুতো, অন্য দুজনের ছেঁড়াচটি।

গজেনের দোকানে বসে তারা চা খায়, বিড়ি কিনে টানে। কারখানা সম্পর্কে নানাকথা জিজ্ঞাসা করে গজেনকে।

বাসন তৈরি কবে বেচা তাদের তিনজনেবই বংশগত পেশা। শুভর কারখানা স্থাপনের খবর শুনে ছুটে এসেছে উদ্‌বেগ ও আশঙ্কা বুকে নিয়ে।

শুভ তাদেব না জানুক, বারতলার জমিদারের ছেলেকে তারা চেনে।

এত লেখাপড়া শিখে শেষে এ সব বুদ্ধি মাথায় ঢুকল ছেলেটার ? জগতে এত জিনিস থাকতে বাসনের কারখানা করার শখ !

তাদের মধ্যে একজনের রং বেশ ফরসা, কটা চোখ। তার নাম গোষ্ঠ। মেলায় তাকেই শুভর বাসন সম্পর্কে জেরা করেছিল। সে সখেদে বলে, এ তো স্রেফ মোদের অন্ন মারার ফিকির !

গজেন সায় দিয়ে বলে, বটে তো। মানুষের অন্ন মারার ফিকির ছাড়া বাবুদের কলকারখানা ব্যাবসা চলে ? হাতের কাজ কলে করিয়ে একজনা ঘাড় ভাঙবে দশজনার।

তিনজনে তারা পরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে।

গোষ্ঠ জিজ্ঞাসা করে গজেনকে, ছোটোবাবু ইদিকে আসেন কখন ?

এইবার আসবে। সারাদিন এখানেই থাকে। একেবারে কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে।

তারা শুভব প্রতীক্ষায় বসে থাকে।

আধঘণ্টা পরে শুভর গাড়ি এসে দাঁড়ালে কাছে গিয়ে তিনজনে প্রণাম জানায়। গোষ্ঠ নিজেদের পরিচয় দেয়।

শুভ খুশি হয়ে বলে, তোমরা যেচে এসেছ, এতে আমি বড়ো আনন্দ পেলাম গোষ্ঠ। তোমাদের মতো লোকেরই আমার দরকার। অনেক পরামর্শ আছে তোমাদের সঙ্গে।

পরামর্শ ? তিনজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

গোষ্ঠ বলে, মোরা নালিশ জানাতে এয়েছি ছোটোবাবু। এ কারখানা কেন খুলছেন, মোদের বুজি রোজগার মেরে দিচ্ছেন ?

তাদের নালিশ শুনে শুভ যেন আকাশ থেকে পড়ে।

কী বলছ তোমরা ? তোমাদের রুজিরোজগার বাড়াবার ব্যবস্থা করছি। তোমাদের নাম-ঠিকানা বলো।

বলে সে পকেট থেকে নোটবুক বার করে।

শুনে তিনজনেরই মুখ শুকিয়ে যায়।

এতক্ষণ মুখপাত্র হিসাবে কথা বলছিল গোষ্ঠ, সে আর মুখ খুলবে না টের পেয়ে সুখন সবিনয়ে বলে, মোরা কী এমন করলাম ছোটোবাবু, নাম-ঠিকানা লিচ্ছেন, থানা-পুলিশ করবেন ? মোবা এযেছি একটু দরবার করতে বই তো নয়।

সুখনের গায়ে টিকিনেব একটা ফতুয়া, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, মাথার চুল কদম ছাঁটার চেয়ে ছোটো, বোধ হয় সম্প্রতি বাপ-মা মারা যাওয়ার মতো কোনো কারণে ন্যাড়া হয়েছিল।

শুধু নম্রভাবে নয়, আশ্চর্যরকম ধীরভাবে সে কথা কয়। মনে হয় মানুষটা বুঝি সে এমন ধীর শান্ত যে গ্রাম্য জীবন কেন আশ্রমজীবনের পক্ষেও সে আদর্শ পুবুষ। শুভ শুনলে বিশ্বাস করতে পারত না যে বদমেজাজের জন্যই গ্রামের মানুষ তাকে ভয় করে, রাগ হলে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

তার বিনয় আর কথা দুই-ই অপমানের মতো বাজে শুভর। এর চেয়ে মনের আসল কথাটা প্রকাশ করে গরম হয়ে দুটো গাল দিলেও যেন অনেক ভালো ছিল। আবার গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তাকে ভাবতে হয় যে, হায়, শুধু জমিদারের ছেলে বলেই ছোটোবাবু সে এদের কাছে অমানুষ, এখন পর্যন্ত অমানুষিক কিছুই যে সে করেনি সেটা গণ্যই নয়। এ কথাও তাকে ভাবতে হয় কী সুলভ এদের জীবনে কারণে-অকারণে থানা-পুলিশের ঝঞ্ঝাট !

চিরকাল দাপট সয়ে সয়ে কী ভীবু আর নিরীহ হযে গেছে গাঁয়ের মানুষ, দিবারাত্রি সশঙ্কিত। ক্ষমতাবান একটা মানুষ ভালোভাবে নাম-ঠিকানা চাইলে পর্যন্ত আতঙ্ক জাগে, ভয়ে যেন কাদা হয়ে যায়।

কী আপশোশের কথা !

অতি নিরীহ মানুষের বিনয় করার ভঙ্গিতে ভয়ে ভয়ে সুখনের কথা বলার পিছনে যে সত্যিকারের ভীরুতা নেই জানলে শুভ আরও কতটা দমে যেত কে জানে !

ভয়ের বাস্তব কারণকে এ জগতে ভয় করে না কে ?

ভয় পাওয়া আর ভীরুতা এক নয় !

এ রকম নম্রতা আর ভীরুতার ভান যে ওদের বাস্তব জীবনে হাঙ্গামা এড়িয়ে চলার বাস্তব কৌশল, সেটা তলিয়ে বুঝবার সাধ্য শুভর ছিল না। কারণ, তাহলে সত্যসত্যই জমিদারের ছেলে ছোটোবাবু সে যে এদের কাছে কতখানি খেয়ালি আর আক্রোশী মানুষ, স্বার্থপর নিষ্ঠুর মানুষ, সেটাও ভালোভাবে উপলব্ধি করা দরকার হয়। সেই জন্যই বিনয় ! উন্মাদ ছাড়া কে ঝগড়া করতে যাবে

বাঘেব সঙ্গে, অসময়ে এবং অকারণে ? খালি হাতে বাঘেব সামনে পড়লে পিছু হটে পালিয়ে গিয়ে বাঘকে থাবা মারাব সুযোগ না দেওয়াকে কাপুরুষতা ভেবে লজ্জা পাবে ?

তার পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করাব পবেও সুখনরা তাকে খুব ভালোমানুষ ভেবে বসে না। বাঘটাকে এবার তাবা একটু খাপছাড়া উদ্ভট বাঘ বলে চিনতে পারে। এ বাঘ ভালো করার নামে সহৃদয়ভাবে ঘাড় মটকায় !

গোষ্ঠ আবাব কথা বলে।

এটা কী রকম কথা হল ছোটোবাবু ? মোবা বাসন তৈরি বন্ধ করে হেথা এসে কুলি খাটব ?

কী মুশকিল—কুলি খাটবে কেন ? তোমরা কারিগর, বাসন তৈরি করো, এখানেও বাসন তৈরি কববে।

সে তো আপনাব বাসন ছোটোবাবু। মোবা কাবিগর বটে, ফের তৈরি বাসনগুলিও মোদের রয় বটে তো।

দু-চারজন কাবিগর মোবাও তো খাটাই। আপনার কাবখানায় খাটলে তো মোদের পোষাবে না ছোটোবাবু।

সুখন হাত জোড় করে।—দোহাই ছোটোবাবু, বাসন করার মতলব ছেড়ে দেন। আরও কত কী আছে জগতে তার কোনো একটার কারখানা করুন, মোদেব প্রাণে মারবেন না। মোরা তিনজন মোটে এয়েছি, চাদ্দিকে আরও লোক আছে, সবাব অন্ন মারা যাবে। দু-চারটা লোক নিয়ে ঢালাই পেটাই চালাই, আপনার সাথে কি পাল্লা দিতে পারব কেউ ? ছেলেপুলে নিয়ে সবাই শেষ হয়ে যাব একদম।

এতক্ষণে শুভ বুঝতে পারে এরা শুধু কারিগর নয়, বাসনপত্রের ছোটো ছোটো কুটিরশিল্পের মালিক। গোষ্ঠব মুখে 'মোরা বাসন বানাই' পবিচয় শুনে প্রথম ধরতে পারেনি।

এদের এ সমস্যার কথা সে এ পর্যন্ত ভাবেনি, তাই কী বলবে হঠাৎ ভেবে পায় না। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ কবাব প্রয়োজন হয়। মনে মনে সে আপশোশ করে যে কারখানা ঢেলে সাজার কাজ আরম্ভ করাব আগে এই সব টুকরো টুকবো গ্রাম্য কাবখানা দু-একটা দেখে আসা উচিত ছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তিনজনকে সে ব্যতিব্যস্ত কবে তোলে। এদের হাঁড়ির খবর যেন বার করে নিতে চায়—নিজে গিযে দেখে শুনে এলে যে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা জুটত এ বেচারিদের জেরা করে এখনই সে যেন তা আযত্ত করে নেবে। কজন খাটে, কীভাবে খাটে, কীভাবে কত বাসন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তৈবি হয়, খবচ পড়ে কত, কোন বাজাবে কীভাবে মাল যায়, কত লাভ থাকে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অফুরন্ত প্রশ্ন।

জবাব শুনে সে খুশি হতে পারে না। মনে হয় এরা কোনো হিসাবপত্রই রাখে না অথবা তার কাছে অধিকাংশ কথা গোপন করে যাচ্ছে।

কত বাসন তৈরি কবে কী রকম আয় হয় ?

কোনোমতে দিন চলে যায় ছোটোবাবু।

এ কি একটা জবাব ? কোটিপতি শিল্পপতির হিসাবে থাকে একটি পাই-এর আসা যাওয়া, ট্যাক্‌স্‌ ফাঁকি দিতে যতই সে প্রকাশ্য হিসাব পালটে দিক। বিজ্ঞান আর শিল্প ভাই ভাই, বিজ্ঞানের মতো শিল্পেও সূক্ষ্ম সঠিক হিসাব চাই। হোক কুটিরশিল্প—কখনও ভালো দিন আসে, কখনও মন্দা পড়ে, শুধু এই নাকি তার মোট হিসাব !

অথবা এরা তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে ?

মেজাজ হঠাৎ চড়ে যায় শুভর। একটা এলোমেলো দুর্বোধ্য দুঃসাধ্য সমস্যার ফাঁদে ফেলে তাকে নিয়ে একটু রঙ্গ করার জন্যই যেন গ্রাম্য বিনয়ের প্রতিমূর্তি তিনজন কাঁসারি তার কাঁসার বাসনের কারখানা বাতিল করতে এসেছে।

প্রশ্নে প্রশ্নে মুখর হয়ে উঠেছিল শুভ, আচমকা সে নির্বাক ও গম্ভীর হয়ে যায়। তিনজনের আপাদমস্তক এমনভাবে নিরীক্ষণ করে যেন কোনো নেতা তার নিজের কার্টুন দেখছে !

তোমরা কাল সকালে এসো।

তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওযি করে।

চোখের চাওয়ায় মুখের ভাবে আর মাথা নাড়ার সংকেতে তাদের মধ্যে যেন দুর্বোধ্য একটা পরামর্শ হয়ে যায় চটপট।

সকালে আজ্ঞা ? দুপুরে না তো বিকেলে এলে হয না ? সকালে মোরা পাঁচজনা দুটো কথা কইতে বসব কাল।

এই নিয়ে সাংকেতিক পরামর্শ। এই ব্যাপাব নিযে কাল সকালে তাদের সলাপবামর্শের বৈঠক বসবে, সেটা তাকে জানাবে কী জানাবে না। জানানোই ভালো মনে কবেছে তিনজনে। শুভ যেন না মনে করে যে তাদের তিনজনের দরবার করতে আসার মধ্যেই এ ব্যাপাবের আবম্ভ আব শেষ।

সহজে তারা ছাড়বে না।

শুভ কারখানার ভিতর চলে গেলে গজেন তাদেব ডেকে দোকানে বসায। বিনযী সুখন মন্তব্য করে, ব্যাটাছেলে ভাবী চালাক। দাবোগার মতো কেমন জেরা করলে দেখেছ ?

গোষ্ঠ বলে, বিলেত থেকে শানিয়ে এয়েছে, বাপেব চেয়ে বুদ্ধি চোখা।

গজেন বলে, ছেলেমানুষের কাঁচা বুদ্ধি তো, এমনি কত খেয়াল জাগবে।

এ খেয়ালটা যে সাবাড় কববে মোদের !

এই সংঘাত অনিবার্য ছিল এবং সুখনদেরও বিপদেব এই সূত্রপাতকে এড়িয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব।

বড়ো শিল্প গড়া যখন সম্ভব নয়, বরং দেশে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকায বড়ো শিল্পের মাঝারি সংস্করণগুলির আত্মরক্ষাই দায় হয়ে উঠেছে, তখন মহৎ সংকল্প আর উদার সদিচ্ছার যুক্তি দাঁড় করিয়ে অরক্ষিত কুটিরশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা ছাড়া শুভদেব গতি কী ? শুভর প্রতিভা আছে মানতে হবে। মুখে যাই বলুক, মনে যাই ভাবুক, সে উন্মুখ অসহিষ্ণু হয়ে তল্লাশ করছিল কী কবা যায়, কোন লাইন ধরা যায়। মেলায় বাসনপত্রেব কেনাবেচা দেখে আর লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলে দেশের মানুষের কাছে সোনারুপার আভরণের পরেই যে সংসার করার পিতল কাঁসার উপকরণগুলির দাম এটা উপলব্ধি করেই সে ঠিক ধবে ফেলেছে কোন কুটিরশিল্পটা গ্রাস করার সুবিধা।

এদিকে খুব বড়ো একটা অঞ্চলের গ্রাম-নগরে আজ পর্যন্ত বাসন উৎপাদনের শুধু পুরানো ব্যবস্থাটাই প্রায় অনাহত ছিল। ছোটো ছোটো ঢালাই-পেটাইয়েব ঘরোযা কারখানাগুলিই এদিকের অধিকাংশ মানুষের বাসনের চাহিদা মিটিয়ে এসেছে।

পাল্লা দিয়েছে নাম-করা জায়গার ভালো বাসনের সঙ্গে।

সুখনদের সমস্যাটা শুভ সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচনা করে। ওদের সর্বনাশকে ছোটো করে দেখবার তার উপায়ও নেই। তার প্রচেষ্টা সফল হওয়া মানেই ওদের বাসন তৈরি বন্ধ করা। ওরাও ডুববে না অথচ তার কারখানাও ভালোভাবে চলবে এই অসম্ভব আর সম্ভব হয় কী করে ? তাই, তার নিজের প্রচেষ্টার কল্যাণকর দিকগুলি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মনের মধ্যে খুব বড়ো করে রাখা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় শুভর পক্ষে।

সেকেলে পচা উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে একটা জাতীয় শিল্প মুক্তি পাবে, বহু লোক কাজ পাবে, দেশের সম্পদ বাড়বে—এ জন্য সুখনদের মতো কয়েকজন মানুষকে যদি ডুবতে হয়, উপায় কী ?

কুটিরশিল্প টিকিয়ে রেখে তো আর শিল্পেব যুগোপযোগী বিকাশ সম্ভব হয় না। নতুন গড়তে হলে পুবানোকে ভাঙতে হবেই।

দেশের শিল্পোন্নতিব খাতিরে সুখনদের সমস্ত ক্ষতিকে তুচ্ছ কবে দিতে হবে। জমিদারের ছেলে হয়েও তাকে যেমন তুচ্ছ কবে দিতে হবে জমিদাবি ব্যবস্থা লোপ করা হলে নিজের সমস্ত লোকসান। সারাদিন আত্মীয়বন্ধু অনেকেব কাছেই সুখনদেব কথা তুলে সে দুঃখ প্রকাশ করে। এদিকটা সত্যই আগে ভাবেনি। বাস্তব কী কঠোব, কিছু লোকের ক্ষতি তাকে কবতেই হবে একটা ভালো কাজ করতে গিয়ে !

সুখনদের জন্য তাকে মাথা ঘামাতে দেখে কেউ কেউ আশ্চর্য হয়ে যায়। বাসন তৈরি কি একচেটিয়া সুখনদেব, আর কেউ বানাতে পাববে না ? কাববার মানেই তো পাল্লা দেওয়া, অন্যের বাজার দখল করা !

এ আলোচনা থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয শুভব কাছে। তার কারখানা কতদিন চলবে, প্রতিযোগিতায় সে নিজেই টিকবে কিনা, এ বিষয়ে অনেকেব মনে বেশ খানিকটা সন্দেহ আছে !

জীবনকে সে কাবখানায় একটা চাকবি দেবে বলেছে। কিন্তু জীবনের ভাব দেখে মনে হয় না যে কারখানা শৈশব পেরিয়ে বেঁচে থাকবে এ আশা সে পোষণ করে।

কাহিল সে হয় নন্দর কাছে। তার এই শিল্প প্রচেষ্টাব মহত্ব এবং গুরুত্ব দুটোই স্রেফ বাতিল করে দেয় নন্দ।

তবে নন্দর সঙ্গে কথা বলে একটা সুবিধা হয শুভর। পবদিন সুখনদের কী বলবে সেটা আন্দাজ কবতে পারে।

নন্দ তাকে সোজাসুজি বলে, কবছ কর, তুমি না করলে আবেকজন কবত। ও সব বড়ো বড়ো কথা বোলো না। সুখনরা বাসন বানিয়ে কিছু লাভ করছে, তমি বাসনের কাবখানা করে তাতে ভাগ বসাতে চাও। এ ছাড়া আব কোনো মানে নেই তোমার বাসনের কাবখানাব।

শুভ ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, কী বকম ?

রকম খুব সোজা। শিল্পেব কঠিন ব্যারাম, গড়ছেও না বাড়ছেও না। বিদেশিবা মুনাফা খাচ্ছে আর শুধু কটা দেশি বুই-কাতলাব মুনাফার পাহাড় জমছে। তোমাদেব মতো যাবা দেশের শিল্পোন্নতি করে কিছু লাভ চাও, তোমরা কোন দিকে যাবে, কী কববে, দুটো মোটে রাস্তা। চোরাবাজারে নেমে চুবিব মুনাফায় কিছু ভাগ বসানো নয়তো কুটিবশিল্পেব ঘাড় ভেঙে ছড়ানো লাভের কিছুটা মেরে দেওয়া ! তুমি শেষটা করছ। তোমার কিছু মুনাফা হবে, কিন্তু তোমার বাসনেব কাবখানা দিয়ে দেশের সম্পদও বাড়বে না, লোকেব কোনো উপকাবও হবে না।

আমি শুধু মুনাফা চাই ?

মনে চাও না, কাজে চাইছ। তুমি যে অনেস্ট ! শুধু মুনাফাখোব হলে তো চোরাবাজারেই নেমে যেতে। ওটা পারবে না বলেই এ পথ নিয়েছ। নইলে বাসনেব কাবখানার এখন কী দরকার পড়েছে দেশে ? লোকে তো বাসন পাচ্ছেই—অবশ্য যে কিনতে পাবে। ঘরের বাসন যাবা বেচে দিচ্ছে তাদেব কথা নয় ছেড়েই দিলাম।

শুভ একটু গুম খেয়ে থাকে। কারখানা করার নৈতিক ভিত্তিটা এমন সরাসরি উড়িযে দেওয়ায় সে চটেছে।

গেঁয়ো ডাক্তার, সবজান্তা হয়েছ, তোমার সব একঘেয়ে একপেশে কথা। বেশি বাসন তৈরি হবে, লোকে সস্তায় বাসন পাবে, কতগুলি লোকের কাজ জুটবে, এ সব কিছুই নয় তোমার কাছে।

তার রাগ দেখে নন্দ হাসে।—চটছ কেন ? আমরা তর্ক করছি বই তো নয়। বেশি বাসন তৈরি হবে ? তোমার কারখানায় হয়তো হবে—সুখনদের এক-একজনের তুলনায ! মোট বাসন বাড়বে না। তুমি যত বাড়াবে, সুখনদের তত কমবে। লোকের বাসন কেনার ক্ষমতাটা আগে বাড়িয়ে নাও, তারপর বেশি বাসন তৈবি করে দেশের সম্পদ বাড়িয়ো !

শুভ গুম খেয়েই থাকে।

নন্দ বলে, বেকারকে খেটে খাওয়ার সুযোগ দেবে ? তুমি তা হয়তো কয়েকজনকে দেবে, সুখনরা কারবার গুটিয়ে নিলে ওদিকে কয়েকজন বেকার হবে। সস্তায় বাসন দেবে ? কত সস্তায় ? পিতল কাঁসার দর তো নামবে না তোমার জন্য। সোনার গয়নার মতো বাসন ওজন দরে বিক্রি হয়। গয়নার মজুরি ধরা হয় ভিন্ন করে, বাসনের দরেই ওটা কষা থাকে। সুখনরা ভাগে ভাগে কম বাসন বানায়, তুমি এক জায়গায় বেশি করে বানাবে। কিন্তু সুখনদের অন্য সুবিধে আছে, ওরা নিজেরাও কারিগর, নিজেরাই সব দেখাশোনা করে, হিসাব রাখে। তোমাকে এ সবের জন্য লোক রাখতে হবে। কত আর কম দামে তুমি বাসন ছাড়তে পারবে বাজারে ?

শুভর মুখের গুমোট এবার কেটে যায়। সে অমায়িকভাবে বলে, সাধে কি বলি গেঁয়ো বুদ্ধি ! আমার প্ল্যানটাই তোমার মাথায় ঢোকেনি। আমি কি কচি খোকা যে ও সব হিসেব না করে, কস্টিং না কষে, একটা কারখানা গড়ছি ? বাসন কেনা-বেচার এই সিস্টেমটাই আমি পালটে দেব। বাসন শখের জিনিস নয়, বাসন ছাড়া সংসার চলে না। এটার ওপরেই আমি জোর দিচ্ছি। পিতল কাঁসার দর ঠিক থাকবে, লোকের পয়সাও আমি বাড়াতে পারব না জানি কিন্তু বাসন কেনাতে পারব।

মন্ত্রবলে ?

কম-দামি বাসন বানিয়ে।

নন্দ অসহিষ্ণু হয়ে বলে, এইমাত্র বললাম না বাসনের দাম তেমন কিছু কম কবা যাবে না ?

শুভ শান্তভাবেই বলে, করা যাবে। সায়ান্টিফিক মেথডে আমাব বাসন তৈরি হবে, তুমি সেটা ভুলে যাচ্ছ। সুখনরা পারে না, আমি পারব। ধর, অ্যাভারেজ সাইজের একটা কাঁসার গ্লাস। টেঁকসই গ্লাস করতে সুখনদের যতটা কাঁসা লাগে, আমার তার চেয়ে অন্তত ওয়ান-থার্ড কম লাগবে। তা ছাড়া সস্তা ধাতু মেশাল দিয়ে সস্তা মজবুত বাসন হবে।

ওঃ ! তাই বলো।

নন্দ খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, ভুলে যাচ্ছিলাম তুই সদ্য সদ্য বৈজ্ঞানিক হয়েছিস, বাসনও এখন পর্যন্ত বানাতে শুরু কবিসনি।

এ কথা বলছিস কেন ?

এতক্ষণ তুমি তুমি কথা হচ্ছিল, নন্দ যে হঠাৎ তুই বলেছে এটা খেয়াল না করেই শুভও তুই-এ নেমে আসে। এ রকম মাঝে মাঝে ঘটে তাদের মধ্যে।

নন্দ বলে, ঘর চিনিস না, ঘরোয়া জিনিস বাসনের ব্যাপারটাও ধরতে পারছিস না। একটা কথা লিখে রাখবি ? ও সব কোনো সায়ান্টিফিক কৌশল বাসনের বেলা খাটবে না। সায়ান্টিফিক মেথডে আরও ভালো বাসন বানাতে পারিস, প্ল্যাস্টিকের বাসনে বাজার ছেয়ে ফেলতে পারিস—কম কাঁসা সস্তা ধাতু এ সব কোনো নতুন কৌশল চলবে না। এতকালে ও সব ঠিক হয়ে যায়নি ভাবিস ? মানুষ কি হাঁদা ? কত কম কাঁসায় টেঁকসই বাসন হয়, মেশান ধাতুর বাসন কেমন হয়, সব জানা হয়ে গেছে। বাসন মাজতে হয়, ঘষতে হয়। যতটা পাতলা চলে তার চেয়ে কম কাঁসার পাতলা গ্লাস তোর কেউ কিনবে না। কলাই করা গেলাস-টেলাস কিনবে, নয় মাটির ভাঁড়ে জল খাবে। গয়নার বেলাও এই নিয়ম। যে কিনবে সে যতটা কম সোনায় টেঁকসই গয়না হয় ততটা সোনার গয়নাই কিনবে, যে তা কিনবে না সে একেবারেই কিনবে না।

আকাশে রাত্রির ছায়া রূপ নিতে শুরু করেছে। কাছে ও দূরে শাঁখ বাজতে আরম্ভ করেছে। ডিসপেনসারির কেরাসিনের টাঙানো ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে এনে গঙ্গা শুভকে বলে যায়, যাবেন না। চা আনছি।

শুভ বলে, তবে কি বলতে চাও সুখনদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না ?

নন্দ বলে, কেন পারবে না ? তবে ওই যে সস্তা বাসন বানিয়ে ওদের কাবু করবে ভাবছ, ওভাবে পাববে না। তুমি নানা প্যাটার্নের বাসন গড়বে, তোমার সব বাসন সমান নিখুঁত হবে, লোকে চোখ বুজে তোমার বাসন কিনতে ভরসা পাবে। কিন্তু ওদের ক্ষতি করলেও একেবারে হটাতে পারবে না।

কেন ?

জিনিসটা বাসন বলে, সস্তা বাসন দিতে পারবে না বলে। মস্ত গয়নার দোকানের পাশে স্যাকরার কতটুকু ছোটো দোকানও চলে দেখেছ তো ? বড়ো দোকানে কত প্যাটার্নের গয়না, লোকে কত নিশ্চিন্ত মনে কিনতে পারে যে এখানে ঠকবে না। তবু ছোটো স্যাকরার দোকান উচ্ছেদ হয়নি। বড়ো দোকান অনেক কিছু পারে, শুধু কম দামে গয়না দিতে পারে না। তার দাম বরং কিছু বেশিই হয়। কাপড়ের মিল তাঁতিদের শেষ করেছে, গয়না বা বাসনের মিল করে স্যাকরা বা কাঁসারিদের শেষ করা যায়নি।

শুভ চুপ করে কথাটা ভাবে। কাল এই ভরসা দেওয়া চলবে সুখনদের !

নন্দ বলে, মেয়েদের অবস্থা যেদিন পালটাবে, গয়না গায়ে আঁটার দরকার থাকবে না, সেদিন শেষ হবে স্যাকরারা। আর কাঁসারিরা শেষ হবে তোমরা বৈজ্ঞানিকরা যেদিন কাঁসার চেয়ে সস্তা কিন্তু কাঁসার মতো টেকসই বাসন দিতে পারবে। একটা কাঁসার বাসনে একজনের জীবন কেটে যায়।

গঙ্গা চা এনে দেয়।

দুজনকে কাপে দিয়ে নিজে চলটা-ওঠা কলাই-করা গ্লাসটা নিয়ে রোগীদের বেঞ্চটাতে বসে। সে প্রায় সব কথাই শুনেছে দুজনের। কথা শোনার জন্য ভিতরের দরজার কাছে বসে ল্যাম্প সাফ করেছে, চাও করেছে ওইখানে বসে। বিলাতফেরত একজন বৈজ্ঞানিক আর একজন ডাক্তার এতক্ষণ ধরে মশগুল হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পিতল কাঁসা ঘটিবাটি নিয়ে আলাপ করতে পারে—এটা উদ্ভট ঠেকছিল গঙ্গার কাছে। চিনামাটির কাপে চুমুক দিতে দিতে শুভ বারবার তার হাতের কলাই করা গেলাসটার দিকে তাকাচ্ছে দেখে গঙ্গার প্রায় হাসি পেয়ে যায়। কী চিন্তাক্লিষ্ট গুরুগম্ভীর এই অবিবাহিত ছেলেমানুষটা !

জমিদারের ছেলে বলে কী ? স্বামীর ঘরে থাকার সময় প্রায় এই বয়সি আরেকজন জমিদারের ছেলেকে সে কয়েকবার দেখেছে, বাইরে রাত কাটাবার জন্য তার স্বামীকে যার দরকার হত। সে ছিল হালকা হাসিখুশিতে উজ্জ্বল তামাশাপ্রিয় আর সাপের মতো বজ্জাত। তার হাত ধরে টানার কথা বোকামি করে স্বামীকে বলে দিয়েছিল বলে স্বামীকে দিয়েই কত লাথি যে সে বজ্জাতটা তাকে খাইয়েছিল প্রতিশোধ নিতে !

তার সামনেই অমৃত জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি নাকি কাল ওর হাত ধরে টেনেছ ?

সৌমেন অম্লান বদনে হেসে বলেছিল, বউদির সঙ্গে তামাশা করছিলাম। রাগ করেছ নাকি বউদি ?

অমৃত মন্তব্য করেছিল, মেয়েমানুষের মন তো নয়, আস্তাকুঁড়।

সৌমেন চলে যাওয়ামাত্র অমৃত একটা লাথি মেরেছিল তাকে।

শুভ সৌমেনের মতো নয়। ওর মুখ দেখলে কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন বুড়োর কথা মনে পড়ে যায়।

৮

অ্যাটম বোমার যুগে একটা বাসনের কারখানা কী আর এমন ব্যাপার ছিল ? তবু চারিদিকে হইচই সমারোহ না হওয়ায় শুভ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়। এ পর্যন্ত ধাবে কাছে যা ছিল না সে তাই করেছে। লোকের কি কৌতূহলও জাগে না ?

স্টেশনের কাছটা বেশ একটু সরগরম হয়েছে। নতুন কয়েকটা চালাঘর উঠেছে কারিগরদের থাকার জন্য। এতদিন টিং টিং করছিল গজেন আর সনাতনের পান বিড়ি চিড়ে মুড়ি তেলেভাজার দোকান, দেখতে দেখতে আরও তিনটে দোকান গজিয়েছে।

ছোটো মুদির দোকানটি দিয়েছে এ অঞ্চলের চেনা লোক গিরীন, তার মুদিখানার একপাশে কিছু তরিতরকারিও রাখা হয় বিক্রির জন্য।

অন্য দুটি দোকানই পান বিড়ি ও খাবারের—এবং দোকান দুটি দিয়েছে পাকিস্তান থেকে সপরিবারে উৎখাত হয়ে আসা দুটি মানুষ। যেন ওত পেতে ছিল, শুভর কারখানায় কাজ শুরু হতে না হতে কোথা থেকে উড়ে এসে গজেন আর সনাতনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোজগারে ভাগ বসাতে দোকান খুলে বসেছে !

সনাতন ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, কোথা ছিলে বাবুরা অ্যাদ্দিন ? টিকিটি তো দেখতে পাইনি ? যাও না, নিজের দেশে ফিরে যাও না, হোটেল খুলে বোসো গে যাও।

নিমাইও ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, যেখানে খুশি দোকান দিমু, তোমার কী ? পিথিমিটা কিনা রাখছ ?

সুরমার তবু তিন-চারমাস বিলম্ব আছে, নিমাইয়ের বউ সুখদাকে দেখলেই বোঝা যায় তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। সনাতনের যতই গা জ্বালা করুক, দুদিন আড়চোখে সুখদার উঁচু পেটটা নজর করে করে সুরমা নিজেই গিয়ে ভাব না করে থাকতে পারে না।

একেবারে একলাটি ? বাপের কুলে শ্বশুরকুলে কেউ নেই এ সময় কাছে থাকে?

আছে না ? দ্যাশে আছে, কইলকাতায় আছে, যমের ঘরে আছে। কে কারে দ্যাখে কও ?

তবু এ সময়টা—

কিয়ের সময়, কিয়ের অসময় !

নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব। মনের মধ্যে একটু হুহু করে সুরমার। বিয়ে-করা স্বামীর কাছে আছে তাই কি এতটুকু ভয়-ভাবনা নেই ? তার যে এখন থেকেই মাঝে মাঝে ভয়ে-ভাবনায় মনটা খিঁচে যায় তার কারণ কি তবে এই যে সনাতন তার স্বামী নয় ? তা আশ্চর্য কিছুই নয়। দাঙ্গায় স্বামী মরার সাতদিন পরে সনাতনের ঘাড়ে নিজের দায় চাপাতে হয়েছিল। পেটের বাচ্চাটা কার তাও সে জানে না। ভাবতে গেলেই মনে হয় ছেলে হোক মেয়ে হোক সংসারে কি দশা দাঁড়াবে তার কে জানে ?

ভাবতে গিয়ে অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় গা ছমছম করে তার।

কারিগর নিয়ে চিন্তায় পড়েছিল শুভ। সুখনদের কারিগর ভাঙিয়ে আনা ছাড়া উপায় নেই এই ছিল তার ধারণা। সুখনরা পরামর্শ করে প্রাণপণে চেষ্টা শুরু করেছিল, বাসনের কাজ জানে এমন একটি লোকও যাতে শুভর কারখানায় কাজ না নেয়। শাসানো হয়েছিল নানাভাবে।

কিন্তু যে বাজার ! ভাতকাপড় জোটে না লোকের, বাসন কেনে ক-জন ? বাসনের কাজ জানে এমন কত লোক যে বসেছিল বেকার হয়ে, শাসান দিয়ে কি আর তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় ?

পাকা কারিগর পর্যন্ত কাজের জন্য যেচে এসে আশ্চর্য করে দিয়েছে শুভকে।

আশেপাশের শহর আর কলকাতা শহর থেকে কারখানা দেখতে আসে আত্মীয়বন্ধু—শুভর খেয়ালের কারখানা ! বাসনের শিল্পে যুগান্তর সৃষ্টি করবে শুভ, বাসন ব্যবহারের ফ্যাশন দেবে পালটে।

আত্মীয়বন্ধু ছাড়া অন্যলোকও আসে। ব্যবসায়ী এজেন্ট, দাঁওবাজ, চাকুবিপ্রার্থী।

এরা শুভব মন থেকে খানিকটা মুছে দেয় চাবিদিকে বিশেষ সাড়া না জাগার ক্ষোভ।

খোঁড়া গজেনের জন্য লক্ষ্মীকে দিনে অন্তত একবাব দোকানে হাজিরা দিতে হয়—রাত্রে গজেন ঘরে ফিবে যায়, দুপুবের ভাতটা লক্ষ্মী দোকানে দিয়ে আসে।

শুভ একদিন তাকে বিশেষভাবে বলে, বোজ একবাব কারখানায ঘুরে যেয়ো। তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। তোমার পছন্দ-অপছন্দটা আমি কাজে লাগাব।

মাইনে দিতে হবে কিন্তু।

তুমি তামাশা কবলে—আমি সত্যি মাইনের কথা ভাবছিলাম!

ওমা, বলেন কী! দু দণ্ড কথা বলাব জন্য মাইনে নেব কী রকম?

শুভ শান্তভাবে বলে, এমনি কথা বলা থাকছে না তো এখন, আমার কাজের জন্য তোমাকে দরকার হচ্ছে। উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াবের পবামর্শ নিলে পয়সা দিতে হয়—তোমায় দেব না কেন?

অপমান বোধ করা উচিত কিনা বুঝতে না পেবে লক্ষ্মী বিব্রতভাবে বলে, ওদের কথা আলাদা। আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ—

শুভ বলে, এই জন্য হঠাৎ তোমায় বলতে ভবসা পাইনি। তুমি হযতো চটেই যাবে। মন দিয়ে আমার কথাটা শোনো। কাবখানাব কাজেব জন্যই তোমার মতো গেবস্ত ঘরের একজনকে আমার দবকাব। সাধাবণ গেবস্ত ঘবেব পছন্দ-অপছন্দ ঠিকমতো যাচাই করা খুব বড়ো ব্যাপার আমার কাছে। ধবো, কত বকমেব তো বাসন আছে, আমি কী জানি কোনটা না হলেই চলে না, কোনটা তার চেয়ে একটু কম দবকারি, কোনটা না হলেও চলে? অনেক বাসন আছে, কী কাজে লাগে তাই জানি না; আবও কত বিষয়ে আমাব জ্ঞান নেই। এমনি গেলাসেই জল খাওয়া চলে, আফ্‌ফোরা কেন তৈরি হল? শুধু গেলাসের বকমাবি হিসেবে না বিশেষ সুবিধে কিছু আছে? আমি এটা ভেবে পাই না। কাবণ, গেবস্ত ঘরে গেলাস আব আফ্‌ফোরাব ব্যবহাব আমি দেখিনি। তুমি হযতো আমায় বুঝিয়ে দিতে পাববে।

লক্ষ্মী খুশি হয়ে বলেছিল, তা পারি। এমনি গেলাসেব তলা থেকে ওপব পর্যন্ত সিধে, আফফোরার দিকটা বাইবের দিকে বেঁকে একটু ছ্যাদবানো দেখেছেন তো? ওতে দুরকম সুবিধে। গেলাস পাশ থেকে ধরতে সুবিধে কিন্তু ওপব থেকে আঙুলে ঝুলিযে ধরতে আফফোরায় সুবিধে বেশি। তাছাড়া, চুমুক না দিয়ে উঁচু থেকে মুখে জল ঢেলে খেতে গেলাসেব চেয়ে আফফোরায় ভালো। মুখে না ঠেকিয়ে জল খেলে বারবার ধুতে হয না।

শুভ উৎসাহিত হয়ে বলেছিল, দেখলে তো, কত কিছু জানবার বুঝবার জন্য তোমাকে আমার দরকার? শুধু তাই নয়। আমি নতুন ধরনের বাসন বানাব ভাবছি। নমুনা দেখে তুমি আমায় বলতে পারবে গেরস্ত ঘরে পছন্দ করবে কি না।

একটু থেমে সুর পালটে বলেছিল, কাজেই বুঝতে পারছ, হঠাৎ দেখা হল, খানিকক্ষণ কথা বললাম, তাতে আমার কাজ চলবে না। তোমায় নিয়মমতো কারখানায় আসতে হবে, দু-তিনঘণ্টা থাকতে হবে। তার মানেই চাকরি। চাকরি করে মাইনে নেবে না কেন?

লক্ষ্মী বলেছিল, কাল বলব।

কৈলাস সব শুনে বলেছিল, নিশ্চয়, রোজ যেতে হলে মাইনে নেবে বইকী?

তারপর হেসে বলেছিল, দেখো, আবার অন্য চাকরি না করিয়ে ছাড়ে।

সে রাজি হওয়ায় শুভ সুখী হয়ে বলেছিল, এই তো চাই। তোমার নাম লক্ষ্মী, তুমি এটুকু লক্ষ্মী মেয়ে না হলে দেশের কী উপায় হবে?

তারপর হেসে বলেছিল, তোমার যখন স্পেশালিস্টের কাজ, তোমার কাজের টাইম বেঁধে দেব না। কোনোদিন একঘণ্টা কোনোদিন দুঘণ্টা—দরকার হলে ঘণ্টা তিনেক। যেদিন যেমন দরকার হবে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইমে তোমায় আসতে হবে। বাবার জন্য কটায় ভাত নিয়ে আসো ?

ঠিক আছে কী ? কোনোদিন বারোটা কোনোদিন একটা।

কী করে জানলে ? তোমাদের তো ঘড়ি নেই !

থানায় পেটা ঘড়ি বাজে না ?

শুভর মনে খুব আনন্দ। সে যেন অসাধ্যসাধন করেছে, লক্ষ্মীকে সমস্ত সংস্কার কাটিয়ে মাইনে নিয়ে তার কারখানায় চাকরি করতে রাজি করিয়েছে। যেমন সে কৃতজ্ঞ লক্ষ্মীর কাছে, তেমনি গর্বিত !

বলে, ভাবছিলাম তোমায় একটা ঘড়ি প্রেজেন্ট দেব। ভেবে দেখলাম, এখন সেটা ঠিক হবে না। লোকে নানাকথা বলবে। এখন দিলে সেটা আমার দেওয়া হবে কিনা। কাজ আরম্ভ হোক, তারপর কারখানার পক্ষ থেকে কাজের সুবিধার জন্য তোমায় ঘড়ি দেওয়া হলে কেউ কিছু বলতে পারবে না।

লক্ষ্মী সহজভাবেই বলেছিল, ঘড়ি দেননি বলেই লোকে কিছু বলছে না ভেবেছেন নাকি ?

শুভ যেন চমকে উঠেছিল, ভড়কে গিয়েছিল।

সত্যি নাকি ?

লক্ষ্মীর কাছে আশ্চর্য দুর্বোধ্য লেগেছিল তার এমনিভাবে ঘাবড়ে যাওয়া ! চাষাভুসোর সঙ্গে ভাব করতে চায়, ঘনিষ্ঠ হয়ে জানতে বুঝতে চায় তাদের হৃদয়মন, এটুকু সাধারণ বুদ্ধি শুভর নেই ? জগদীশের ছেলে গজেনের মেয়ের সঙ্গে মেলায় রাস্তায় এখানে ওখানে এত আগ্রহ নিয়ে এতক্ষণ ধরে কথা বলছে দেখেও—শুধু প্রকাশ্যভাবে কথা বলছে বলেই লোকে চুপ করে থাকবে, এই শেষে ধারণা হল তার ?

লোকে তো বলবেই। তারা কিঁ জানছে আপনার আমার কথা ? জানছে যে আপনার মাথায় বাসন ঢুকেছে, আপনি বাসন নিয়ে পাগল, আমার সাথে শুধু বাসনের কথা বলেন ? খাপছাড়া ব্যাপার তো হচ্ছে এটা ? দশটা দুঃখী মানুষ বুঝবে কী করে বলুন ?

লক্ষ্মীর গলা কেঁপে যায়।

বলছে বলুক, আমি গা করি না। কারখানা যদি গড়তে পারেন, দশটা লোক খেতে পায় কারখানা থেকে, কী আসবে যাবে লোকে একটা অসম্ভব কথা বানিয়ে বললে ? কী জানেন, খাপছাড়া কিছু দেখলে লোকে যন্তরের মতো মানে করে বসে, বিচার করে দ্যাখে না। ছোটোবাবু নজর দেবে লক্ষ্মীর দিকে, তাও যদি কচি কাঁচা হতাম। কী বিবেচনা মানুষের, বলিহারি যাই !

শুভর মুখ দেখে লক্ষ্মী ভড়কে যায়।

ঘাবড়ে গেলেন না কী ছোটোবাবু ? না না, আপনি মোটে ভাববেন না। আপনার তো বদনাম হয় না। লোকে যদি হাসাহাসি করে তো মোকে নিয়ে করবে। তা করুক গে যাক। অমন আগেও করেছে পরেও করবে।

শুভর বুক কেঁপে গিয়েছিল। একটা তোলপাড় উঠেছিল হৃদয়ে। তবে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেটা মিলিয়ে যায়। মনপ্রাণ তার ডুবে গেছে কাজের মধ্যে, নতুন কিছু গড়ে তোলার চেষ্টার মধ্যে। তবু লক্ষ্মীর কাছে আচমকা তাদের নিয়ে কথা রটেছে শুনে ভিতরটা তার মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠেছে।

বংশগত রোগ। রক্তমাংসে মজ্জায় মেশানো রোগ। চমক লাগার মতো মাঝে মাঝে অতর্কিতে শুভর ভয় করে, বুক কেঁপে ওঠে।

ভূদেব, করুণাময়ী এবং কয়েকজন বন্ধু এবং বান্ধবীদের সাথে মায়া সেদিন কাবখানা দেখতে এল।

ভিতরে লক্ষ্মীর সঙ্গে কথায় শুভ মশগুল। মায়াদের আবির্ভাবজ্ঞাপক শ্লিপটি দারোয়ানেব কাছ থেকে যথারীতি বাঁ হাতে নিয়ে না পড়েই শুভ হুকুম দেয়, ঠাহ্বনে বোলো।

লক্ষ্মী সেদিন একটা ছাপা শাড়ি পরে এসেছিল। সস্তায় ছাপা সস্তা শাড়ি। রোজ কারখানায় যেতে হবে, চাকরি করছে, কৈলাসকে সে কলকাতা থেকে একটা শাড়ি কিনে আনতে দিয়েছিল— কলকাতায় নাকি সস্তায় ভালো শাড়ি মেলে। কী যে রুচি আর পছন্দ কৈলাসেব, এনে দিয়েছে এই ছাপা শাড়িটা। নিজেব পকেট থেকে কিছু দিয়েছিল কিনা কে জানে !

গজেন দেখে বলেছিল, বাঃ, খাসা কাপড়টা।

কিন্তু তার পছন্দ হয়নি, সে শিউরে উঠেছিল লজ্জায়।

কাপড়টা সাত-আটদিন লক্ষ্মী পরেনি। সাবান কাচা মোটা খাটো শাড়ি পরেই কাবখানায় এসেছে গিয়েছে। কী ভারী শাড়ি ! ধুলে এক পরলে ছাড়া নিঙরানো যায় না। অমন শক্ত মোটা শাড়িটাও ফেঁসে গেছে।

সে জন্যই বোধ হয় তেমন লজ্জাও করছে না তার।

এই শাড়িখানা তার পরনে না দেখলে হয়তো রাম সিং দারোয়ান মায়ার সই করা চিরকুট দেখার সময় একটু বিশদ করে জানাত কী ধরনের কেমন লোকেরা ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শুনে শুভও হয়তো সচেতন হত। কিন্তু এ রকম একটা শাড়ি পরা মেয়ের সঙ্গে বাবুকে এমন আত্মহাবা হয়ে কথা বলতে দেখে তাকে কিছু বলার সাহস রাম সিং খুঁজে পেল না।

নিয়ম সম্পর্কে শুভ ভারী কড়া। সুখনন্দের সম্পর্কে মনে মনে তার একটু আশঙ্কাও ছিল। তাই গেট পাশ বা হুকুম ছাড়া কারও কারখানায় ঢোকা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

শুভর কারখানার গেটের সামনে মায়াদের তাই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অনেকক্ষণ মানে মিনিট দশেক।

বাগ চড়তে চড়তে মায়া পৌঁছে যায় টং হবার অবস্থায়।

এই ! বাবু ভিতরমে হ্যায় ?

হুজুর।

হাম ভিতর চলতা।

হুকুম নেহি হুজুর।

চোপরাও ! হুকুম নেহি !

মায়া গটগট করে ভিতরে ঢুকে যায়।

বাসন নিয়েই লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল শুভব। নতুবা এতটা সে মশগুল হযে পড়ত না। গরিবের মেয়ে একটু তেজি আর সপ্রতিভ হলেই সিনেমায় তার জন্য জমিদারের ছেলের ভীষণ টান জন্মায়, দেশি বাংলা সিনেমা দু-চারটির বেশি দেখেনি বলেই বোধ হয় শুভর বেলা সেটা ঘটেনি।

সাধারণ চাষির ঘরে কী ধরনের বাসন সবচেযে বেশি ব্যবহার হয়, বিয়েতে মোটামুটি কী কী বাসন যৌতুক দেওয়া হয়, গরিবের ঘরেও মেয়েরা যে ঝকঝকে করে মাজার জন্য ঘষে ঘষে দামি বাসনও ক্ষয় করে ফেলে এই বেহিসেবি ব্যাপারের আসল মানেটা কী, এই সব নানাকথা সে খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছিল।

শহুরে আব গ্রাম্য বাসনে তফাৎ আছে কিনা আর থাকলে সেটা কী রকম তফাত বুঝবার চেষ্টা করতে চাওয়ায় লক্ষ্মী হেসে ফেলে।

বাসনের কী শহর আর গাঁ ভেদ আছে ছোটোবাবু ? বাসনের তফাত হল গিয়ে পয়সার তফাত। গরিবের ঘরে সাদামাটা ছোটোখাটো বাসন, বড়োলোকের ঘরে রকমারি দামি দামি বাসন।

কলসিই ধরুন না। শহরেও কলসিতে জল রাখে, গাঁয়েও তাই রাখে। গেঁয়ো বউয়ের পুকুরে ডুবে মরতে সুবিধা হবে বলে কি গাঁয়ের জন্য ভিন্নরকম কলসি বানায় ?

মায়ার আবির্ভাব ঘটে ঠিক এই সময়।

দেখতে পায় সামনে মুখোমুখি চেয়ারে বসে লক্ষ্মী আঁচলে বাঁধা কৌটা থেকে পান দোক্তা নিয়ে মুখে দিচ্ছে, শুভ একান্ত দৃষ্টিতে তাই দেখছে !

শুভ ? এটা কী ব্যাপার ?

তাকে দেখে খুশি হয়ে শুভ বলে, এসো, এসো। তুমি যে হঠাৎ ?

তার খুশিকে অগ্রাহ্য করে মায়া মুখের ভাবে আর গলার সুরে যতটা পারে রাগ দেখিয়ে বলে, বাবা এসেছে, মা এসেছে, আমার বন্ধুরা এসেছে, আমাদের আধঘণ্টা গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন ?

আমি জানতে পারিনি।

কখন স্লিপ পাঠিয়েছি দারোয়ানকে দিয়ে।

তখন হাতের স্লিপটার কথা খেয়াল হয় শুভর। লজ্জিত হয়ে বলে, ইস্, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি বোসো মায়া, আমি নিজে গিয়ে সকলকে নিয়ে আসছি।

থাক। আর আদরে কাজ নেই। আমরা কেউ তোমার কারখানায় ঢুকব না।

বলে মায়া আপিস ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সুতরাং শুভকেই গিয়ে তার সঙ্গ ধরতে হয়।

চলতে চলতে মায়া বলে, তোমার এতদূর উন্নতি হয়েছে ? কারখানার একটা কুলি মাগিকে চেয়ারে বসিয়ে হাসিগল্প চালাও ?

শুভ বলে, ছি, মানুষকে এত অশ্রদ্ধা কোরো না মায়া। ও কারখানায় চাকরি করে কিন্তু গাঁয়ের গৃহস্থ ঘরের মেয়ে।

গাঁয়ের গৃহস্থ ঘরের মেয়েকে তুমি পেলে কোথায় ?

আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—

আলাপ ! এদের সঙ্গেও তোমার আলাপ হয় ?

শুভ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, তোমার কী হয়েছে বলো তো ? তুমি তো এ রকম ছিলে না ? বাড়ির ঝিকে অপমান করলে তুমি কাকিমার সঙ্গে ঝগড়া কর—

পিছন থেকে লক্ষ্মী বলে, ঝিকে চেয়ারে বসিয়ে কেউ তো তার সঙ্গে হাসিগল্প করে না ছোটোবাবু ?

কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মী।

না। এঁর রাগ হয়েছে কেন বুঝতে পারছেন না ? আমার সঙ্গে আপনার ভাব হয়নি, আপনার এখন বাসনময় প্রাণ বলে বাসনের কথা কইতে জগৎ সংসার ভুলে গেছলেন, তাই ওনাদের একটু দাঁড়াতে হয়েছে—এ সব বুঝিয়ে বলুন, রাগ কমে যাবে।

একটু টেনে টেনে সে কথাগুলি বলে। সে যে কিছু মনে করেনি এটা তাতে অপ্রমাণিতই হয়ে যায়। একজন অপমান করলেও কিছু মনে করবে না, এ রকম বেখাপ্পা উদারতা লক্ষ্মীর অনেককাল উপে গেছে।

সে চলে গেলে মায়া মন্তব্য করে, আমি দেখেই বুঝেছি, মেয়েটা ভালো নয়। নইলে এ রকম শাড়ি পরে ?

তুমি ওকে চেনো না তাই—

চিনে কাজ নেই আমার !

লক্ষ্মী সনাতনের ঘরে গিয়ে সুরমার কাছে জল চেয়ে খায়। সুরমার হাতে জল খেয়ে লক্ষ্মীর মা-মাসির জাত যেত, লক্ষ্মীরও কী আর একটু অস্বস্তি বোধ হত না আগে ? রাজকীয় ধর্ষণে জন্মের মতো তার জাত যাওয়ায় সুবিধা হয়েছে।

শুভর কারখানা এখনও ঠিকমতো চালু হয়নি, তবু ইতিমধ্যেই দোকানের বিক্রি বাড়ায় সনাতন খুব খুশি। শুধু দলে দলে লোকে ভাগ ফলাতে আসছে এই যা একটু মুশকিল। দোকানের তেলেভাজা খাবার শুধু নয়, দু-একটা ভালোমন্দ জিনিস সুরমাকে খাওয়াতে পারবে। কিন্তু কী যে বেখাপ্পা ব্যাপার মেয়েদের, এই দুর্দিনে ভালোমন্দ জিনিস সামনে ধরে সাধাসাধি করলেও সুরমা খেতে চায় না !

৯

এদিকে চাষিদের চরম দুরবস্থা। পেটে আগুন, বুকে আগুন।

শনিবার গাঁয়ে ফিরেই কৈলাস খবর শোনে, পিনাক ভূষণ পুলিন তোয়াবদের মতো কিছু মরিয়া চাষি ধরণীর মরাই লুট করার কথা ভাবছে।

রামপুর এলাকা জগদীশের খাস তালুক। সেখানে লোকে নাকি জোর করে খামারের ধান বার করে সকলের সামনে ন্যায্য দরে বিক্রি করে দিয়েছে, একান্ত দুঃস্থদের দিয়েছে ঋণ হিসাবে। এরাও ওইরকম কিছু করতে চায়। রাজেন দাস পর্যন্ত নাকি সায় দিয়েছে।

কৈলাসকে খবর জানায় লক্ষ্মী। মানুষটাকে নিয়ে তার রীতিমতো দুর্ভাবনার কারণ ঘটছে। শুভর কারখানায় সে কাজ নেবার পর আরও যেন বিগড়ে গিয়েছে কৈলাসের মন।

এ সব খবর শুনে যদি তার একটু ভালো লাগে এই আশায় লক্ষ্মী উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। খবর শুনিয়ে বলে, মরিয়া হয়ে নিজেরা নিজেরাই সব ঠিক কবছে' ডাক্তারকে পর্যন্ত ডাকে না পরামর্শের জন্যে। তুমি বাবু এদিকে একটু নজর-টজর দাও।

রাত্রেই শশী দু-চারজন চাষির সঙ্গে কথা বলে। নন্দর সঙ্গে পরামর্শ করে।

সকালে বেরিয়ে পড়ে রামপুরের ব্যাপারটা নিজে গিয়ে দেখে শুনে বুঝে আসতে।

মেটে পথ ধরে চলতে চলতে কৈলাস ভাবে, চাকরি পেয়ে লক্ষ্মী হঠাৎ কেমন বদলে গেছে ! উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মুখখানা পর্যন্ত। এ কী শুধু মেয়েমানুষ হয়েও দুটো পয়সা কামাচ্ছে বলে ?

শুভর খেয়ালের কারখানায় তারই খেয়ালে দেওয়া চাকরি। তাকে নাকি বেশ খাতিরও করে শুভ। কে জানে কীসের খেয়ালে করে ? তাকে নিয়ে মায়ার সঙ্গে শুভর চটাচটির কাহিনি শুনে লক্ষ্মীকে শুভর এত বেশি খাতির করা মোটেই পছন্দ হয়নি কৈলাসের।

মেটে পথ, জমি থেকে হাত দেড়েক উঁচু, স্থানে স্থানে সমতল। দুটি গোরুর গাড়ির পাশ কাটাবার মতো চওড়া খুব কম জায়গাতেই। যে গাড়ির বোঝাই কম বা যার বাঁ দিকে ঢাল কম খাড়াই বেশি, সেই গাড়ির মাঠে নেমে অন্য গাড়িকে পথ ছেড়ে দেওয়া রেওয়াজ। কদাচিৎ দূর থেকে মোটর গাড়ির আওয়াজ পেলেই, গোরুর গাড়িগুলি চটপট মাঠে নেমে যায়, ডাইনে বাঁয়ে যে দিকে সুবিধা। ছোটো ছোটো গ্রাম পড়ে দুপাশে, কতগুলি মাটির ঘরের সমাবেশ, কিছু ফলফুলের গাছ, লাউ-কুমড়ার মাচা, বাঁশঝাড়, ডোবা বা অবাঁধান ছোটো অগভীর কুয়া, চৈত্র-বৈশাখ মাসে কোনটাতে একটু তলানি জল থাকে, কোনোটা একেবারে শুকিয়ে যায়। যতটুকু ঠাঁই পায় ঘর তুলতে চাষি তারও সবটুকু জুড়ে বড়ো করে ঘর বানাতে পারে না, ছোটো নীচু কুঁড়ে বাঁধে। অনেকদিনের পুরানো গ্রামও আজ এমন রিক্ত যে দেখে মনে হয় অস্থায়ী বস্তি বুঝি, যে কোনোদিন মানুষগুলি চলে যাবে গাঁ ছেড়ে, খাঁ-খাঁ

করবে শূন্য পরিত্যক্ত ভিটেগুলি। চোখে পড়ে ও রকম পবিত্যক্ত দু-একটা সাঁওতাল বস্তি, জমিদার জোতদারের শোষণ আর অত্যাচার সইতে না পেরে দল বেঁধে চলে গেছে।

বড়ো একটি গ্রাম পড়ে মাঝপথে, নাম আনিখা। আনিখার কাছাকাছি কাঁচা রাস্তাটা পড়েছে বাঁধানো পথে, গাঁয়েব মাঝখান দিয়ে ডাকঘরের সামনে দিযে পথটা চলে গেছে। কযেকটি পাকা-বাড়িও আছে আনিখায়, হপ্তায় দুদিন গ্রাম-প্রান্তে হাট বসে। এখানে গুড় তৈরি হয়, তিল আর সর্ষের চাষ হয় ভালো, প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে শহরে চালান যায় কলে পিষে তেল তৈরি হবার জন্য। তাঁতের কাপড়-গামছা কিছু তৈরি হয়।

আগে ত্রিশ ঘরের বেশি তাঁতির বাস ছিল, একটু নাম ছিল আনিখার কাপড়-গামছার। যুদ্ধের ক-বছরে দশ-বারো ঘর উৎখাত হয়ে গেছে সুতোর অভাবে, অন্যেরা টিকে আছে শোচনীয় অবস্থায়, অনেকের তাঁত পর্যন্ত মহাজন দাদনদারেব কাছে বাঁধা। পথের ধারে পান বিড়ি, চিঁড়ে মুড়ি, দই মিষ্টির দোকান, গ্রাম্য মুদিখানা, মশলাপাতি তেল নুন জ্বালানি কাঠ থেকে চায়ের প্যাকেট চিরুনি কাঁটা মাথার তেল সবকিছু মেলে। একটি বেঁটে খাটো ওষুধের আলমাবি নিয়ে চিরঞ্জীব ডাক্তারের ওষুধের দোকান। কুণ্ডুর দই-মিষ্টির দোকানে চিনির চায়ের সঙ্গে গুড়ের চা-ও মেলে, দু-চির করা বাঁশের বেঞ্চে বসে কোঁচার খুঁটে গরম কাচের গেলাস ধরে জিরিয়ে জিরিয়ে পান করা যায়।

গুড়ের চা আগে বুচত, শহরে খাটতে যাওয়ার পব রুচিটা বদলে গেছে। বেশি দামে আধা গেলাস চিনির চা-ই খায় কৈলাস—শুধু চা। আজ ঠান্ডা পড়েছে বেশ, তাড়াতাড়ি শীত এগিযে আসছে। অথবা কে জানে, এ বছর খোরাক কম পড়েছে আরও, দেহের শক্তিতে যে কত ভাটা পড়েছে সে তো টের পাওয়া যায় স্পষ্টই, এখান পর্যন্ত হাঁটতেই কষ্ট বোধ হয়েছে রীতিমতো। দেহে তেজ নেই, শীতের গোড়ার দিকেই তাই ঠান্ডা মনে হচ্ছে বেশি।

রামপুর থেকে আসছিল গুড়ের ব্যাপারি ইনাবালি, রোগা লম্বা চেহারা, দেড় আঙুল নুব, গায়ে আধময়লা কোরা মার্কিনের হাতকাটা শার্ট, কাঁধে পুটলি-বাঁধা গামছা।

তার সঙ্গে চেনা ছিল কৈলাসের। যুদ্ধের পর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার দিনে শুধু এই ইনাবালির চেষ্টায় রামপুরে বড়ো হাঙ্গামা বাধাবার সমস্ত উসকানি ব্যর্থ হয়ে যায়। মানুষটা সে ছিল অত্যন্ত রসিক প্রকৃতির। মানুষটাকে পছন্দ করত সকলেই। ডাক দিয়ে ইনাবালিকে বাঁশের বেঞ্চে বসিয়ে দু-একটা কথা বলতে বলতেই কৈলাস টের পায় মানুষটার সহজ স্বাভাবিক রসকষ প্রায় শুকিয়ে গেছে। কেমন একটু চিন্তিত সচকিত ভাব। রসিকতা আজও করে কিন্তু সেটা কৃত্রিম মনে হয।

রসিকতা করেই বলে, চা মিলবে তো কুণ্ডুবাবু ? আমি কিন্তু বাবা একদম খাঁটি মোস্‌লা।

চা বানাতে বানাতে কুণ্ডু বলে, না মিলবে না ; পাকিস্তানে যান।

কৈলাস আলাপ করে ইনাবালির সঙ্গে। রামপুরের খবর ? আব রামপুব, হাঙ্গামা লেগেই আছে রামপুরে। বারবার খালি বন্দুকধারী পুলিশ এসে আস্তানা গাড়ছে সেখানে, একেবারে তছনছ করে দিচ্ছে মানুষের জীবন।

প্রতাপদিঘি বিলের জেলেরা জাল্পের খাজনা, মাছের আবোয়াব ভাগ আদায়, ওজনে চুরি, কম দর এ সব নিয়ে গোলমাল করেছিল তার উপর মদনের চোরাই চালানের চাল আটক করে কন্ট্রোলের দরে সকলকে বেচে দেওয়া নিয়ে বেধেছিল আর একটা হাঙ্গামা। প্রথমে সমিতির ভলান্টিয়াররা চাল আটক করে, মদনের লোকজন আর থানার পুলিশ এসে তাদের মারতে আরম্ভ করলে ছুটে আসে সবাই, জেলেরা পর্যন্ত। সেইখানে সবার সামনে ওজন করে নগদ দামে চাল বেচে টাকা দেওয়া হয় মদনের লোককে।

বিশ-পঞ্চাশজনাকে ধরেছে লুঠের দায়ে।

লুঠ ?

লুঠ, মদনের গুদোম থেকে লুঠে নে গেছে চাল।

তাছাড়া কী ? মদন হাত পেতে দাম নিল চালের কিন্তু ওদের ধরা হল লুঠের দায়ে। রাতারাতি লাইশেন পেল মদন, ও চালানি কম দামে রিলিফ বিলানোর চাল। গুদাম থেকে লুঠে নিয়ে গেছে, ডাকাতি করেছে, ধরবে না ?

কৈলাস বলে, হুঁ, তা এখন কী ব্যাপার ? বড়োকর্তার খামারের ধান নাকি লুঠ হয়েছে ?

ভাঁড়ের চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে ইনাবালি গলা নামিয়ে বলে, লুঠ ? তা লুঠ বললে লুঠ, নইলে না।

মদনের চোরা চালের মতোই ঘটনা। দল বেঁধে খামাবের ধান ছিনিয়ে বাব করে উচিত দরে বিক্রি করা হয়েছিল—নেহাত যারা দুস্থ তাদেব দেওযা হয়েছিল ঋণ হিসাবে। দুঃস্থই নাকি ছিল বেশির ভাগ। এই তো সেদিনের ঘটনা। তারপর পুলিশি ঝড় বয়ে গেছে রামপুরের উপর দিয়ে। জগদীশের লোকেরা তাণ্ডব চালিয়েছে। রামপুর এখনও প্রায় ঘিরে বেখেছে পুলিশ আর জগদীশের লোকেরা।

যাই ইবার। অনেকটা পথ।

সাধে কী রসকষ শুকিয়ে গেছে ইনাবালির। কৈলাসও সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে বলে, আমিও যাব রামপুর।

কী দবকার ? হয়রানি সার হবে। নতুন লোক দেখলেই ধরবে, নাজেহাল হয়ে যাবেন। চার-পাঁচদিনের কমে হবে মালুম হয় না। কী আর দেখবেন ব্যাপার ? সে দেখাই আছে। ফিরে যান ভাই।

ইনাবালির উপদেশ মেনে নেয় কৈলাস। আজ সন্ধ্যায় লোচনের বাড়িতে পিনাক সামন্তদের জমানোর ব্যবস্থা করেছে। তাকে হাজির থাকতেই হবে।

দাওয়ায় একটা প্রদীপ জ্বালিয়েছে লোচন এতগুলি লোকের জন্য। সরু সলতের ডগায় ক্ষীণ মুমূর্ষু শিখাটি জ্বলছে, সতর্ক নজর রেখেছে লোচন, মাঝে মাঝে একটু উসকে দিচ্ছে সলতেটা। সে আলো যেন ছাযাপাতও কবেনি মাটির মেঝেতে চাটাইযে বসা জ্যান্ত মানুষগুলির, চেনা বলেই কোনো মতে চিনিয়ে দিতে পারছে মুখগুলি। অন্দরের আঁধার থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের ছাড়া ছাড়া কথার আওয়াজ আর থেমে থেমে দয়ার বিনিয়ে কাঁদার সুর ! সেই বুঝি একা একটু শোক করছে ছেলেটার জন্য, বাড়িতে যদিও স্ত্রীলোক মোট পাঁচটি, বাচ্চা কটা বাদ দিয়েও। তবে তীক্ষ্ণ গলা ঝিমিয়ে মিইয়ে অস্ফুট হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই দয়ার। পুত্রশোকও জলো হয়ে গেছে মানুষের শোকে শোকে, এমনই তো বছর প্রায় ঘুরত না মড়াকান্না না কেঁদে, তার ওপর লাঠিগুলি বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী আর হিংসার মামলা যদি জোট বেঁধে এসে কাঁদাতে চায অবিবাম, একটাব বদলে এক সাথে দশটা মরণের ঘায়ে বুক ফাটিয়ে, কাঁহাতক শোক করতে পারে মানুষ ?

সদরের আদালতে সব ঢেলে দিয়েছে লোচন। এক ছটাক তামাক কেনার নগদ পয়সা পর্যন্ত তার নেই। অথচ রাজেন দাস আজ এসেছে তার বাড়িতে !

ঘনরাম গিয়েছিল একটু তামাক ধার চাইতে প্রতিবেশী বটুকের কাছে। ফিরে এসে বলে, খুড়োর তামাক নেই।

এক ছিলুম নেই ? এক ছিলুম দিলে না ? হতাশার রাগে গলা চড়ে যায় লোচনের।

বলল তো কাল থেকে তামাক ফাঁক। তামাক টানতে টানতে বলল।

অ ! ব্যাটা কঞ্জুস !

আর বলল কি শুনবে ? উপোস পেটে তামুক খেলে রক্তবমি হয়। গাঁজা টানো, সিদ্ধি পাবে। হাসি কী, ঠিক যেন শ্যালের গলায় কাশি ঠেকেছে।

বেজম্মা, বজ্জাত ! ব্যাটার বউটাকে ঘর ছাড়ালে !

রাজেন বলে, ইন্দ্র ফুসলেছে না ?

ফুসলেছে, অমন সবাইকে ফুসলায়। কে কোথা ফুসলায় আর ওমনি ঘর ছাড়ে ঘরের বউ, না কি বটে ? কারও ঘরে মেয়ে-বউ রইত না তালি। খেতে দিত না তো কী করবে ঘর না ছেড়ে ?

পিনাক বলে, ঠিক কথা, ভাতের ঘাটা নেই বটুকের। তবু ব্যাটার বউটাকে না খেতে দিয়ে ঘর ছাড়ালে।

তামুক ছাড়া জমে না।—আরেকবার আপশোশ করে লোচন। নাতির মরণে সে যেন তেমন কাতর নয়, তামাকের জন্য আপশোশটা বেশি। বিশেষ করে রাজেন দাস আজ যেচে এসে তার দাওয়ায় বসেছে বলে। মাননীয় ব্যক্তির পদার্পণে ধন্য হয়ে তাকে খাতির করার সাধ মেটানো গেল না বলে নয়, যে ছিল পরম শত্রু সে আজ বাড়িতে এসেছে বলে। সাপ-বেজির সম্পর্ক ছিল তাদের অনেককাল। রাজেনের বোন সুখদা ছেলেপিলে নিয়ে আজ সাতবছর ঘর করছে শিয়াপোলের অনন্তের, তাকে ঘনরাম বিয়ে করেনি কথাবার্তা পাকা হবার পব—এই ছিল ঘটনা। ঘাটের পথে সাঁঝের বেলা একলা সুখদাকে নিমাই ছোঁড়ার সাথে কথা কইতে দেখেছিল, হেসে হাত নেড়ে কথা কইতে দেখেছিল ঘনবাম নিজের চোখে—এই ছিল কারণ। কথা সে-ই কইতে গিয়েছিল নিজে, দুটো মিষ্টি মিষ্টি প্রাণের কথা আর বলা হয়নি প্রাণের জ্বালায়। খটকা একটা এমনিই ছিল ঘনরামের মনে যে তার সাথে লুকিয়ে ভাব করতে পারে যে মেয়েটা সে কি আর অন্যের সাথে পারে না ? এ ক্ষেত্রে অবশ্য ভাবটা হয়েছে তারই সাথে, কিন্তু কথা হল, স্বভাব ভালো যে মেয়েব সে তো এ রকম ভাব-সাবের ব্যাপার করে না কারও সাথেই ! যে খুঁতখুঁতানি মনে ছিল সেটা প্রত্যয় হল হেসে হেসে নিমাইয়ের সাথে হাত নেড়ে কথা বলা দেখে বাঁশঝাড় গাছপালায় ঘেরা যে নির্জন স্থানটিতে শুধু তারই সাথে কথা বলার কথা ছিল সুখদার ! ছেলের কথায় বিয়ে তাই ভেঙে দিল লোচন, নিজে যেচে বরণ কবা যন্ত্রণায় ঘনরামও দিশেহারা হয়ে রটিয়েও দিল মেয়েটার নামে মনগড়া কলঙ্ক।

তারপর ঘটনা রটনা গালাগালি হাতাহাতি পুরানো হয়ে তলিয়ে গেল অতীতে, জিদ বজায় রইল মুখ-দেখাদিখি বন্ধ রাখার, শত্রুতা করার।

বিয়াল্লিশ সালে দেশজুড়ে ব্যাপার হল একটা। বন্দুক উঁচিয়ে সৈন্য পুলিশ এসে অন্য কটা ঘরবাড়ির সাথে পুড়িয়ে দিল রাজেনের বাড়ি, আর এমনি মজার যোগাযোগে অদেষ্টের যে, দু-কোশ তফাতে কেঁদা গাঁয়ে লোচনের মামা জগন্নাথের বাড়িতে সপরিবারে আশ্রয় নিয়ে দুটো রাত কাটাতে হল রাজেনকে সপরিবার লোচনের সাথেই। রাজেন ভেবেছিল, মামাকে বলে ভূষণ তাদের খেদিয়েই দেবে বেহদ্দ মার-ধোর খুন-জখম বলাৎকার ঘর-পোড়ানোর তাণ্ডবের মধ্যে। তা, কথাটা লোচনও ভেবেছিল একবার, এতকালের শত্রুকে জব্দ করার এমন খাসা সুযোগ আর আসবে না জীবনে। কিন্তু দুটো দিন বিপদে পড়ে একসাথে থাকার পর সেই থেকে বিদ্বেষ ঘুচে গেছে তাদের, পথেঘাটে দেখা হলে দুটো-একটা কথা তারা বলে এসেছে পরস্পরে, কিন্তু শুধু ওই শত্রুতার অবসান ঘটা ছাড়া বেশি আর এগোয়নি তাদের সম্পর্ক। কেউ পা দেয়নি কারও বাড়ি, ক্রিয়াকর্মে আপদে-বিপদে কেউ ডাকেনি অন্যকে। এতকাল পরে রাজেন আজ নিজে থেকে এসেছে তার বাড়ি। ওকে দু-টান তামাক না টানতে দিতে পারলে কেমন লাগে মানুষের ?

তিনটে বিড়ি নিয়ে আসে রসিক। তাই একটা রাজেনকে দেয় লোচন, পিদিম থেকে ধরাতে গিয়ে নিবে যায় শিখাটুকু। ফের হাঙ্গামা করতে হয় আগুন সৃষ্টি করার। দু-একটান টেনে বিড়িটা রাজেন বাড়িয়ে দেয় তোরাব আলিকে।

লোচনের তামাকের অভাব টের পেয়েই কৈলাস ইশারা করেছিল লক্ষ্মীকে। খানিক পরে কাঠের আখার জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে সাজানো কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে গাঁদা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে শ্বশুরের মান রক্ষা করে।

আনমনা ছিল তোরাব। এনতার তাকে ডেকে বলে, বিড়ি ধরো মিএল।

এ বড়ো আশ্চর্য কথা যে এতগুলি মানুষ তারা বসে আছে প্রায় চুপচাপ। কথার কামাই নেই বটে কিন্তু একসাথে কথা বলছে না একজনের বেশি, কথার আওয়াজে মোটে সরগরম নয় চোদ্দোজন চাষির আসর। কাটা-কাটা ছাড়া-ছাড়া সাধারণ চলতি আলাপ এটা-ওটা নিয়ে, তাই মন দিয়ে শুনছে সকলে যে যখন মুখ খুলছে। বিশেষ কিছু একটা শুনবার জন্য যেন প্রত্যাশা সকলের, আবার কথা উঠছে না বলে আগ্রহ চেপে যেন অপেক্ষাও করে আছে সকলেই। সবার মনের কথা কে আগে তুলবে, কী ভাবে তুলবে তাও জানা নেই কারও। বেশি উৎসুক এনতার, কেবলই উশখুশ করছে আর বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে চুলকিয়ে চলেছে ঘন রুক্ষ দাড়ি-ঢাকা চিবুক।

খাবি না মোহন ? এসে শুধিয়ে যায় ঘনরামের পিসি সুখতারা।

শ্বশুরের মামলায় যাচ্ছে গায়ের গয়না, সোনার ক-টার পর পায়ের রুপোর মল পর্যন্ত, কোলের ছেলেটা মরে গেল বিনা চিকিৎসায়। শ্বশুর আর স্বামীর অবহেলায়। দয়া তাই নিজের ন-বছরের বড়ো ছেলে মোহনের দিকে ফিরেও তাকায় না। মরে তো ওটাও মরুক, দায় চুকে যাক দয়ার।

খা গা যা মোহন।

খাবানে পরে।

একটা লণ্ঠন চলে যায় বড়োতলার সড়ক দিয়ে ; ঝক্‌ঝকে নতুন লণ্ঠন, সযত্নে কাটা পলতের উজ্জ্বল তেজি শিখা। কনস্টেবল শশী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে দারোগা মৃণালবাবুকে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্ত কেঁউ কেঁউ চিৎকারে বাতাস চিরতে চিরতে পথ ছেড়ে ছুটে পালায় রসিকের বাড়ির কুকুরটা। কে জানে দারোগাবাবুর চলার রাস্তায় পুঁটি কী খুঁজছিল বাড়ির চালার কোণে এক গন্ডা বাচ্চা ফেলে রেখে !

ও হ্যাঁ, ঠিক কথা, কাল মৃণালের মেয়ের বিয়ে কলকাতায়। লোকজন গাড়িটাড়ি সব গিয়েছে রামপুরে। একজন কনস্টেবলকে নিয়ে হেঁটে তাই তাকে স্টেশনে যেতে হচ্ছে ট্রেন ধরতে।

লুকিয়ে যাচ্ছে, ছুটি চুরি করে ! রামপুরে অমন হাঙ্গামা, মেয়ের বিয়ে বলেই কি তার ছুটি জোটে ?

কৈলাসের ব্যাখ্যা সবাই মেনে নেয়। পুলিশের দারোগার আবার যে সামাজিকভাবে মেয়ে-টেয়ের বিয়েও হয় এটা তারা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল !

বলি কী—রাজেন দাস হাই তুলে বলে, উপায় একটা না হলে তো নয়। সব দিকে মরার জোগাড়।

অ্যাদ্দিনে জানলে সেটা ? তিনু বলে খোঁচা দিয়ে।

আঃ হাঃ ! বড়োই বিরক্ত হয় তোরাব, ছেঁদো কথা রাখো না এখন, ঘরে গিয়ে চাটনি খেয়ো।

গাঁদা তামাক সেজে দিয়ে গেছে। কলকিটা হুঁকোয় বসিয়ে বাড়িয়ে দিলেও রাজেন দাস নেয়নি। ঘনরাম তাই চট করে পেঁপেগাছের একটা ডাল কেটে নল বানিয়ে দিয়েছে রাজেনকে। হুঁকোয় নল লাগিয়ে তারপর এমনভাবে তামাক টানছে রাজেন যেন সে ছাড়া ঘরে আর কেউ তামাকের ধোঁয়া টানতে শেখেনি, সে ছাড়া সবাই নাবালক।

হঠাৎ সে হুঁকোটা লোচনকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে,—বলি কী, একটা উপায় চাই। এত বড়ো নিরুপায় জন্মে হইনি কোনোকালে। অজন্মা এল তো বুঝি না তো এও বুঝি শালা মন্বন্তর ঘটেছে, ও-সব যা করেন তা ভগমান করেন, তেনার নীলা-খেলা আর মোদের অদেষ্ট। কিন্তু ই কী রে বাবা, অজন্মা না, দুর্ভিক্ষ না, খাসা ফলন, তবু হাঁড়ি চড়বে না, ছেলেপিলে খিদেয় কাঁদবে ?

শুধু কাঁদে না কি ?—তিনু বলে, মরে না ?

শ্রীনাথ বলে, বিন্দাবনের বড়ো ছেলেটা মরেছে, ছোটোটা মরবে। ওই যে মণিবাবু, জ্ঞানবাবুর ভাগনে তেনা ছুটে শুধোতে এল—

আঃ হাঃ ! কাজের কথা কন !—বিরক্ত হয়ে তোরাব বলে।

কিন্তু এবার তার বিরক্তি ও আপত্তি খণ্ডন করে রাজেন বলে, না না, শুনি ব্যাপার।

শ্রীনাথ থেমে হুঁকো টেনে নিয়ে টান দিচ্ছিল, ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে কেশে খানিকটা কথা তুলে থামেনি, বলে চলে, কলকাতার কাগজে লিখবে কিনা না খেয়ে মরেছে, তাই শুধোতে এল জ্ঞানবাবুর ভাগনে মোদের ওই মণিবাবু। তা ইদিকে মিণালবাবু শাসিয়ে গেছে, উপোসে মরছে তা বলতে পাবে না, বলবে যদি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে, কয়েদ করবে। বিন্দাবন কী করে, মণিবাবুকে বলল, না বাবু, না খেয়ে মরেনি ছেলে, ব্যারামে মরেছে। মণিবাবু শুধোল, তা ব্যারামটা কী হয়েছিল ? তা কি বুজি বাবু চাষাভুসো মানুষ ? কী জানি কী পেটের ব্যারাম। মণিবাবু ধমক দিয়ে বললেন, তোমার ভয় নেই বিন্দাবন, যে যেথা আছে তোমার ছেলের মিত্যুর শোধ নেবে। ঠিক করে বলো, ছেলে তোমার মরল কেন ? জাত হারাও কেন বিন্দাবন ? বেঁচে কি থাকবে চিরকাল ? কালে কালে মরবে না তুমি ? বাচ্চাটাকে কারা মেরেছে বলতে তোমায় এত ভয় ? তবু বিন্দাবনটা বলে কী, না, ব্যারামে মরেছে ছেলেটা বাবু। না খেয়ে মরেনি।

গলা-খাঁকারি দিয়ে থুতু ফেলে শ্রীনাথ বলার শেষে।

তারই কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে রাখাল বলে আস্তে আস্তে, মণিবাবু এক পসারি চাল দিল বিন্দাবনকে। আর দুটো কমলা দিল বিন্দাবনকে ছেলেটার তরে। বলল কী, লেবু এট্টু এট্টু রস করে ছেলেটাকে দিয়ো বিন্দাবন। থানায় দশটা রাত পিটেছে, তখন মণিবাবু এমনি করে চাল দিয়ে কমলা দিয়ে এমনি করে বলতে বিন্দাবন কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। স্বীকার করলে যে না বাবু, ছেলেটা ব্যারামে মরেনি, না খেয়ে মরেছে। কলকাতার কাগজে বেরুবে খপর।

এতগুলি চাষাড়ে মানুষ বাক্যহীন হয়ে থাকে। বুকে জ্বলে যায় কৈলাসের, সে ভুলে যায় সোজা কথাটা যে বিপদের মানে চাষিরা যদি বোঝে সে বিপদ তারা হইচই করে ঠেকায়—বাঘ-কুমির ঠেকানোর মতো। কিন্তু মানেই বুঝছে না তারা এই চিরকেলে সহজ সরল ব্যাপারটার যে, কোনোরকমে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় না একটা বাচ্চাকে। এ যে দুর্বোধ্য বিপদ—খেতে পেলে মাই দিয়েই বাচ্চাটাকে দু-বছর সে কি বাঁচিয়ে রাখতে পারত না ? মাই শুকিয়ে গেলে সে করবে কী ?

বলি কী, রাজেন বলে খানিকক্ষণ নিজে আর অন্য সকলে চুপ করে থাকার পর, কী করা যায়। আর তো সয় না। মোদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে না কি শালার ব্যাটা শালা ধরণী শালা ? ই কী রে বাবা, গাঁ পিতিবেশী চাইলে মানুষ ধান দেয় যে হাঁ আজ বাদে কাল ফিরিয়ে দেবে। মোরা তোর গাঁয়ের মানুষ, একটা মাসের তরে দু-মুঠো ধান দিবি, কর্জ দিবি, তাতেও তোর দেড়ভাগি চাই ? বলি, মাগ যে তোর বছর-বিয়ানি দু-তিনমাস ছুঁতে পাস না ফি বছর, তা ভাতকাপড় কি বন্ধ রাখিস মাগের ? না কুজা জেলেনির পিছে যা খরচ করিস তার সুদ কষিস ?

খিলখিল করে হেসে উঠে অপ্রস্তুত হয়ে থমকে থেমে যায় অল্পবয়সি কিশোর মোহন। ভূষণ মুখভার করে তাকায়। যেন এই এক সলতে পিদিমের মৃদু আলোয় কেউ তার মুখের ভাব দেখতে পাবে। অন্যেরা বিরক্ত হয় না, তবে বুঝেও উঠতে পারে না রাজেনের কথায় এমন কী রসিকতা আছে। রাজেন স্পষ্ট করে জমাট করে প্রকাশ করেছে সবার মনের এলোমেলো অশান্ত খেদ। এ তো সত্যি কথাই যে ধরণী যেন লাটবেলাট জগদীশের পরেই রাজা-বাদশা, ঘরের বউ পরের মেয়েছেলেকে খুশিমতো ভোগ করবে, টাকা নাড়াচাড়া করবে যেন পয়সা হাতের ময়লা মাত্র, নতুন ফসল ওঠার আগেও ধান ভরা থাকবে পাঁচটা খামারের দুটোতে আর হেথা-হোথা ছড়ানো

মরাইয়ে—নিজের একটি পরিবারকে সে যে এখন ছোঁবে সে সামর্থ্য কই, ছোঁয়াছুঁয়ি সইবার শক্তি কই সে বেচারার, গর্ভবতী বউগুলির কথা তো আলাদাই, তারা বাঁচে কিনা নিত্য এ ভয় ভরামাস হবার আগেই। টাকা আর ধান শুধু তাদের ঋণের খত। ফসল ফলানো নিছক ধরণী জগদীশের জন্যই—ওরা খাবলে নেবে বলে। জমি যার আছে দু-বিঘে তার, এক মুঠো মাটিতেও যার স্বত্ব নেই তারও। ঠিক কথাই তো বলেছে রাজেন।

খাবা না ? ফের এসে শুধিয়ে যায় পিসির বিধবা মেয়ে হারানি। পিসি নিজে না এসে এবার মেয়েকে পাঠিয়েছে।

দুত্তোর নিকুচি করেছে তোর খাওয়ার, রেগে তেড়ে-মেড়ে ওঠে মোহন, দিবি তো দুধ-পোয়া মাপে আলুনি ফ্যানভাত, ডাকের কামাই নেই, লুচি-পোলাউ ভোজ খেতে ডাকছে যেন হারামজাদি।

ফোঁস করে কেঁদে ওঠে হারানি কলের দড়ি-টানা বাঁশির মতো যুবতি মেয়ের মনটা যেন চড় খেয়ে কেঁদে-ওঠা শিশুই আছে এখনও, আর নাক দিয়েও তার সিকনি নামে সেই ছেলেবেলার মতো, নাক টেনে টেনেও সামলাতে পারে না। মরণ ঠেকাবার উপায় খোঁজার খাতিরে জড়ো এই চাষির আসরে যেন ছেঁড়া তালি দেওয়া জীর্ণ কাপাসে আধ-ঢাকা মূর্তিমতী বিঘ্ন। পুরাণে নজির আছে, পিনাক সামন্ত ভাবে খুশি হয়ে, অর্জুনের তপস্যা ভাঙতে এমনি ভাবে এসেছিল উর্বশী—মেয়েগুলো মরে না, এই যুবতি মেয়েগুলো ?

কেন গাল দিলি ? আমি ডেকেছি তোকে ? মা বলল না ডাকতে ? নিজে যদি এসে ডেকে থাকি তো—নাকের জল চোখের জল খেতে খেতে কথা বলতে গিয়ে বিষম লাগে হারানির। আচমকা অন্দরেব আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঠাস করে গালে তার একটা চড় বসিয়ে দয়া তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে যায়। ভিতরে যাওয়া মাত্র পিসিও বোধ হয় গুমগুম করে কয়েকটা কিল বসিয়ে দেয় মেয়ের পিঠে।

এরা দুদিনের অতিথি। সদরে মামলা করতে গিয়ে লোচন সঙ্গে এনেছে। তামাক কেনার নগদ পয়সা নেই, তবু এনেছে। সঙ্গে আসার জন্য জিদ ধরেছিল মোহন। তা সে এলে পিসিকেও আসতে হয়, মা মরা ছেলেটা ভিন্ন পিসির কাছে জগৎ সংসারে সব কিছু মিছে—ওই হারানি ছাড়া। পিসির কী সোজা জ্বালা ? একদিনের জন্য চোখের আড়াল করতে পারে না বোকা-হাবা মেয়েটাকে। বোকা নোংরা, নাকে সর্বদা সিকনি ঝরছে। কিন্তু বয়সকালের দেহটা হয়েছে যেন মুনিঋষির পদস্খলন ঘটবার মতো। এ মেয়ে হাবা হয়ে যে কী বিপদ ঘটেছে পিসির।

পুলিন জিজ্ঞাসা করে, মোহনের বাপ কী করে হে সদরে ?

মধু কুলি খাটে একটা জুতার কারখানায়। লোচন নির্বিবাদে বলে, দোকান আছে।

কীসের দুকান ?

লোচন চুপ করে থাকে।

ফকির বলে, শুনি তো কত কাল মধু না কি দুকান করে, তা দুকানটা কীসের ?

কী জানি কীসের দুকান। এবার রেগে বলে ভূষণ।

আঃ হাঃ, তোরাব বলে জোর দিয়ে, দুকানের কথা যাক। ধরণীর দুটো খামারের ধানের কথা বলাবলি, উয়ার মদ্যি দুকান ! কী দুকান, কীসের দুকান ! কাজের কথা কও। সাতনলার খামারে লোকজন বেশি রয় না।

শুনে সবাই আবার ধাতস্থ হয়ে গুম খায়। কৈলাস গোড়া থেকেই একটু চুপচাপ আছে। এদের ধাত সে ভালোরকম জানে। বিষয় যত গুরুতর, আলোচনা করতে বসে এরা যেন তত বেশি ধীরস্থির হয়ে যায়—এলোমেলো সাধারণ কথা বলে। এদেরই একজন আবার তোরাবের মতো অসহিষ্ণু হয়ে আসল কথা তোলে—সকলে ধাতস্থ হয়। তোরাবের বদলে সে যদি কাজের কথা টেনে আনত, সকলে

বোধ করত অস্বস্তি। কারণ, সে এদের সকলকে ডেকে এখানে জমা করেছে বুদ্ধি পরামর্শ দেবার জন্য।

সে বেশি গরজ দেখালে এরা ভড়কে যাবে। ধরণীর একটা খামার আছে সাতনলায়। ধান বোঝাই খামার। তা সে খামার তো আগেও ছিল, এখনও আছে, কী তাতে ? সবাই জানে আজ এই মরিয়া বেপরোয়া মানুষগুলির আসরে ধরণীর ওই ধান-বোঝাই খামাবের কথা ওঠার মানে কী, খামারে লোকজন বেশি থাকে না এ কথা বলারও মানে কী। তবে কি না, জানা কথা শোনা কথাও সবার মিলেমিশে একসাথে একভাবে জানা শোনা তো দরকার !

তা বটে, রাজেন বলে, উয়ার মরাই-ভরা ধান, মোদের দুর্দশা।

ধানে উয়ার স্বত্ব কী ?

লুঠের ধান না ?

আসলে মোদেরই ধান তো, না কি বলো ?

গায়ের জোরে কেড়ে নেছে বই তো না ?

এ তো একই কথা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা। এত দূর এগিয়েও পরের কথাটা জিবের ডগায় এসে আটকে আছে অনেকের। ধীর, অতি ধীর জীবন এদের—অকালে বুড়িয়ে ঝরে যায়, তবু ধীর। ঘুম ভাঙে, হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে, সন্দেহ করে যে সত্যি রাত শেষ না চাঁদের আলোয় আভা বাইরে—না, ভোরই হচ্ছে, কাকের ডাক শোনা যায়। মাঠে গিয়ে লাঙলের ফলা মাটিতে ডাবায়, ফসলের আশা তার কাল নয়, পরশু নয়, মাসকাবারে নয়, সেই ফসল ফলাবার পর। তাই সে আশায় ধৈর্য ছাড়া তার কি চলে, ধীর না হয়ে উপায় আছে ?

এবার কৈলাস বলে, লুঠের ধান কী বলছ ? লুঠ কবা তো বেআইনি কাজ। রাজার আইনে ঘার ভেঙে কেড়ে নেয়া ধান বলো।

তখন পিনাক বলে, ধান যদি মোদের, কেড়ে নিতে, লুঠে নিতে পারি না মোরা ? না, ওটা ধরণীদের একচেটে ?

বলি কী—রাজেন বলে—কথাটা বিবেচনা করি এসো মোরা। লুঠে আনতে চাও যদি তো চলো যাই আজ রাতেই হানা দি সাতনলার খামারে। তবে কি না হাঙ্গামা হবে তা বলে রাখি, বিষম হাঙ্গামা হবে। তখন দুষো না মোকে।

সে-ই যেন এতক্ষণ ধরণীর সাতনলার ধানের খামার লুঠ করার প্ররোচনা দিচ্ছিল সকলকে, পরামর্শটা গ্রাহ্য হওয়ায় সাফাই গেয়ে রাখছে যে হাঙ্গামা হলে তাকে দোষী কবা চলবে না, আগে থেকে সে দিয়ে রাখছে হুঁশিয়ারি। সে নিজে লুঠ করতে যাবে না, হাঙ্গামায় মাথা গলাবে না, তাব শুধু পরামর্শ দেওয়ার অধিকার। জীবনের সঙ্গে ঘরে কাটা চরকার সুতোয় মদন তাঁতিকে দিয়ে বোনানো খদ্দরের কাপড় আব কামিজ গায়ে সতেরো দিন হাজত খেটেছিল রাজেন। বিয়াল্লিশে ঘোষণা করেছিল, গান্ধিজী স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাকে আদেশ দিয়েছেন যে স্বরাজ এসে গিয়েছে, এবার থানা পোড়াও, পুলিশ মারো।

তোরাব খুশি হয়ে বলে, হাঙ্গামার কমতি কোথা ? হাঙ্গামা ছাড়া ক-দিন কাটে ? ঘর তো করি হাঙ্গামা নিয়ে। রামপুরে মোর চাচা থাকে, এ গোস্তাকির মাপ নেই, পরশু রোজ তাই হানা দেয়নি মোর ঘরে ? হাঙ্গামার কথা বলো না দাদা, ওটা খোদার নজরানা।

তোরাবের বউ একটা মরা ছেলে প্রসব করেছে পরশু। নিজে বাঁচবে কিনা জানা নেই।

তিনু বলে, কী আর হবে হাঙ্গামায় ? নয় প্রাণটা যাবে। মরার বড়ো হাঙ্গামা তো নেই ?

কচু করবে মোদের, যা করার করেছে।

যা বলেছ দাদা। ফাটক দিক মাবুক কাটুক বয়ে গেল। মারুক। মরেই আছি।

হাঃ, মরে আছি ! কেন বাবা মরে রইবো ? খালি খালি মরে রইবো ? মারতে জানি না দু-ঘা দিয়ে ?

বলি কী—রাজেন বড়ো গম্ভীর, গলার আওয়াজ গমগমে,—চলো তবে আজ রাতেই যাই। কথা তবে শুনে রাখো কিন্তু, লুঠবে গিয়ে একসাথে, তারপর যে যার সে তার দায়িক। ধান নিয়ে চটপট সরে পড়বে। ঘরে রাখবে না ধান।

কোথা রাখব ?—একজন শুধায়।

তাও জানো না ?—রাজেন বলে হতাশায় অবজ্ঞায়,—ধান ফেলে রাখবে বনবাদাড়ে, বাঁশ ঝাড়ে, জঙ্গলে ডোবার ধারে। খানিক বরবাদ যাবেই, উপায় কী ?

মনে হয়, ধরণীর খামার আজ রাত্রেই লুঠ করা বুঝি সাব্যস্ত করে ফেলেছে তারা, এখন সমস্যা হচ্ছে এই যে শুধু লুঠের ধান কোথায় রাখবে, কী করবে। পিনাক তিনু তোরাব মধু এরা ক-জন উৎসাহ বোধ করে, অন্য সকলে উশখুশ করে অস্বস্তিতে। ধান লুঠের প্রস্তাবটা যে একান্ত অবাস্তব স্তরে রয়েছে এটা অবশ্য অনুভব করে সকলেই।

রাত্রে গোপনে আচমকা হানা দিয়ে লুঠপাট করতে পারে পাঁচ-সাতজন মরিয়া মানুষ, কটা গাঁয়ের চাষিদের প্রতিনিধি হয়ে কি ধান লুঠ করতে যাওয়া চলে ওভাবে ? চাষিরাই তো সায় দেবে না !

রামপুরে দিনের বেলা পাঁচ-সাতশো মানুষের চোখের সামনে খামারের ধান বার করে ওজন করে ন্যায্য দরে বিলি করা হয়েছিল। সে আলাদা কথা।

কৈলাসের দিকে চেয়ে লক্ষ্মী বলে, এ কেমনধারা কথাবার্তা ? ধরণীর ঠেঁয়ে অপমান হয়ে রাজেন খুড়োর নয় গায়ে জ্বালা ধরেছে—

কৈলাস তাড়াতাড়ি বলে, আহা, জ্বালা যে জন্যই ধরুক না, কথা তো তা নয়। জ্বালা না থাকলে দশজনের সাথে হাত মেলাতে আসবে কেন ? তবে ধান লুঠের কথাটা কোনো কাজের কথা নয়।

শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। স্বস্তি বোধ করে।

কৈলাস বলে, রামপুরের দিকে গেছলাম ও বেলা, শুনে এলাম খুঁটিনাটি। দিনের বেলা পাঁচ-সাতশো লোক গিয়ে ধান বার করে বিক্রি করেছে সবার সামনে ওজন করে, টাকা দিয়েছে বড়োকর্তার লোকের হাতে। পয়সা যে নগদ দিতে পারেনি সে খত লিখে দিয়েছে,—ফসল উঠলে ধান দেবে, সুদ দেবে। কোনো হাঙ্গামা হয়নি। তবু তাণ্ডব চলছে রামপুরে ক-দিন ধরে। ধান বার করেছিল শ-দুই মন, দোষী নির্দোষীর ঘর থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে চারশো-পাঁচশো মন ধান খামারে তুলেছে। কয়েদ হয়েছে সত্তর-আশিজন। কত জনার হাড় ভেঙেছে মাথা ফেটেছে বুঝতেই পার, বলে আর কাজ কী ?

পিনাক বলে, সবাই এক হয়েও বুখতে পারলে না ?

কৈলাস হাঁটুতে চাপড় মেরে বলে, ঠিক এই কথাটা বুঝতে হবে মোদের আজ। একটা গাঁ এক হয়ে জমিদারের লোক বুখতে পারে বটে কিন্তু সৈন্য পুলিশ বুখতে পারে ? ধরণী বলো, বড়োকর্তা বলো, চোখের সামনে ওদের দেখছ। ওদের কে বসিয়েছে ওখানে, কার জোরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে, সেটা না দেখলে হয় ? দেখতে গেলে সরকার থেকে পৌঁছবে গিয়ে সেই ইংরেজ মার্কিন কর্তা তক। এমনি মোদের স্বাধীন দেশ।

না খেয়ে মরব তবে ?

ধরণীর ধান লুঠে তো পেঠ ভরবে না। হাঙ্গামাই সার। পেট ভরবে না, পিঠে লাঠি মারার সুযোগ দেয় শুধু। সবাই যাতে সায় দেবে না সে পথে কিছু হবার নয়।

লক্ষ্মী নিজে যতটা পারে উসকে দিয়েছে প্রদীপের সলতেটা। ভালো ঠাহর না করলেও বুঝতে পারে ভেতরে ঝড় উঠেছে, থমথম করছে কৈলাসের মুখ। লক্ষ্মীর ভেতরেও মোচড় দেয়। কৈলাস কী ভাবছে সে জানে।

কীসে হবে না তা তো বলে দিল। কীসে হবে ?—এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে !

সবাই এক হলে হয়—এ জবাব শুনেছে সবাই। ওটা আর প্রশ্ন নেই। কীসে সবাই এক হবে, এক হবার উপায়টা কী, এই হল জিজ্ঞাসা।

কৈলাস বলে, একটা জমায়েত করা যাক। মিছিল করে সদরে যাব।

একজন রোগী বিগড়ে যেতে বসায়, নন্দ আটকে গিয়েছিল, সবে মাত্র এসে বসেছে। সে বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

কৈলাস জানে, শুধু ভুখা মিছিল হবে না। দুমুঠো ধান পেয়ে, একটু ফাঁকির রিলিফ পেয়ে, খিদে মিটবে না তাদের। কিন্তু আর কী করার আছে কৈলাস তো জানে না !

১০

কৈলাসের ভিতরের অস্থিরতা বেড়ে চলেছে টের পাওয়া যায়।

টের পায় অবশ্য বিশেষভাবে শুধু লক্ষ্মী এবং খানিক খানিক দু-চারজন অন্তরঙ্গ মানুষ। ভিতরে একটা গভীর ব্যাকুলতা এসেছে বলেই এমনভাবে ছটফট করে বেড়ানোর মানুষ কৈলাস নয় যে সকলেই টের পেয়ে যাবে।

এটুকু সংযম না থাকলে কী আর সামান্য একজন কম্পোজিটর হয়েও এত বড়ো একটা এলাকার ভদ্রসমাজ থেকে চাষি কারিগর হাড়ি-বাগ্‌দির স্তরে সাফ-মাথা নির্ভরযোগ্য কাজের মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হত!

খাতিরটা তার তথাকথিত নেতা হিসাবে মোটেই নয়। ধাতটাই সে রকম নয় কৈলাসের। নইলে এ এলাকার মানুষগুলির অংশ বিশেষের বেশ জোরদার মার্কামারা নেতা সে অনায়াসেই হতে পারত। ও সব শখ তার নেই।

দশজনের সব ব্যাপারেই সে প্রায় কমবেশি জড়িয়ে থাকে অথচ কোনো ব্যাপারেই এগিয়ে গিয়ে দায়িত্ব নিয়ে কর্তালি করার কিছুমাত্র তাগিদ তার আছে মনে হয় না। দশজনের একজন হয়ে সে দশজনের সঙ্গে আছে—এইটাই অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় তার কথাবার্তা চালচলনে। বিনয়ের তার কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি আছে মনে হয় না, কিন্তু নিজের মতটা বা কথাটা দশজনকে মানাবার জন্য এতটুকু জিদও কেউ কোনোদিন দ্যাখেনি। সকলে দরকার মনে করলে সে কথাও বলে, পরামর্শ দেয়, দায়িত্বও নেয়—কিন্তু বেশ বোঝা যায়, গরজটা তার নিজের নয়।

মোটেই এটা নিরহংকার ভাব নয়। তার কথার কতখানি দাম পাঁচজনের কাছে সেটা জেনেও গর্ব পরিহার করার মহাত্মাজনোচিত নম্রতা নয়। ও সব বৈষ্ণবীয় দীনতার ধার সে ধারে না। অথচ প্রায় নেতার মতোই বিশ্বাস ও স্বীকৃতি পেলেও একেবারেই নেতার মতো ব্যবহার না করাটা তার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হয় এই জন্য যে সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই সে দশজনের একজন হয়ে দশজনের সঙ্গে চলতে পারে। নিজেকে জাহির না করা আলাদা জিনিস। সেটা সচেতনভাবে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখা, গুটিয়ে রাখা—সংযম বলেই সেটা চেষ্টা করে করতে হয়।

এই বিশেষ সংযমের প্রয়োজন কৈলাসের হয় না। অনায়াসে বিনা চেষ্টায় নিজেকে জাহির না করাটাই তার প্রকৃতি।

বখাউল্লা নামে একজন পুরুষ আমিনা নামে একটি নারীকে তালাক দিয়েছিল। তার নিকা হল নাজেরের সঙ্গে।

কৈলাস যে প্রেসে কম্পোজিটারি করে নাজের সেখানে মাইনে করা দপ্তুরি। কলকাতার মুসলমান দপ্তুরিদের আস্তানাগুলি প্রায় শূন্য হয়ে গেছে বাংলা ভাগ হবার পর, চাকরি বলেই নাজের টিকে আছে। সাধক ত্রিভুবন দত্তের ছেলে কৈলাস ওই নিকা উপলক্ষে নাজেরের বাড়ি ভোজ খেয়ে যেন প্রথম জানতে পারল যে মুসলিম সমাজে তালাক এবং নিকা আছে !

জানা কথা ঘনিষ্ঠভাবে জানল বলেই বোধ হয় তার আপশোশের ধরনটা বিচলিত করে দিল লক্ষ্মীকে।

কীভাবে মিছিমিছি আমাদের দিনগুলি নষ্ট হচ্ছে বলো তো ? তুমি রাজি হবে না তাই, নইলে—

তুমি পারবে ? ধর্মেব সুযোগ নিতে ?

কেন পারব না ? সব ধর্মই ধর্ম।

লক্ষ্মী হেসে বলে, বেশ। আমি রাজি আছি। ব্যবস্থা করে ফেলো।

শহর থেকে আনা দোক্তা দিতে গিয়ে কৈলাস বলে এসেছিল, কথা আছে, শুনে যেয়ো।

শনিবার শহর থেকে ফিরতে কৈলাসের সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর দোক্তা দিতে গিয়ে বিশেষ কথা আছে জানিয়ে এলে কাক-ডাকা ভোরে লক্ষ্মী জলার দিকে যায় কথা শুনতে।

সেদিন লক্ষ্মী ভোর পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারেনি। কৈলাসের অতিরিক্ত শান্ত ভাবটা তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। ঘণ্টাখানেক নিজের মনে টালবাহানা করে সন্ধ্যারাত্রে নিজেই এসে হাজির হয়েছিল কৈলাসের বাড়ি।

পুরানো লণ্ঠনের আলোয় কৈলাস সংসারের হিসাবপত্র দেখছিল। বাড়তি লণ্ঠন এই একটি। রান্নাঘরে ডিবরি জ্বলছে। বাড়তি অন্যঘর দু-খানা অন্ধকার। পাড়াগাঁয়ে অন্ধকার অভ্যাস হয়ে যায় মানুষেব কিন্তু আলোর টান যাবে কোথা ? কৈলাসের মা রান্নাঘরে রাঁধছে, বাড়ির বাকি মানুষেরা এসে জমেছে লণ্ঠনের আলোয়।

তাতে অসুবিধা হয়নি। ঘরের বাইরে দাওয়ার একপাশে মুখোমুখি উবু হয়ে তারা কথা কয়। সকলের পছন্দ নাহলেও এ অধিকার তাদের স্বীকৃত। নানা আন্দোলনে থাকবে, পরামর্শ না করলে তাদের চলবে কেন ? ঘরের চালায় অর্ধেকটা আকাশ আড়াল হয়েছে, কৃষ্ণপক্ষের উজ্জ্বল তারায় ভরে আছে আকাশ। ঝিঁঝি পোকার অবিরাম গুঞ্জনে আরও নিবিড় হয়েছে স্তব্ধতা, রাত্রিচর পশুপাখির চিৎকারে যা ক্রমাগতই ভেঙে যায়।

কৈলাস বলে, দ্যাখো, আমি ও সব ভেবেছি। লোকের চোখে হীন হয়ে যাব, এ অঞ্চলে আর বাস করা যাবে না। কিন্তু কী আর এমন আসবে যাবে তাতে ? আমরা যদি খাঁটি থাকি, লড়াই যদি টিকিয়ে রাখি—ফের দশজনের আদর পাব। হেথা যা ভেঙে পড়বে, ফের তা গড়ে তুলব। ধর্ম নিয়ে মোদের কী এল গেল ? একটা উপায় যখন আছে, ছাড়ি কেন ?

এ তো ঢের পুরানো উপায়। অ্যাদ্দিন তোমার খেয়াল হল ?

উপায়-টুপায়ের কথা তো অ্যাদ্দিন ভাবিনি।

কেন ভাবিনি ? এখন ভাবছ কেন ?

কিছু ভালো লাগছে না। এত সইছে মানুষ, এত রাগ সবার, কিন্তু সব কেমন ছাড়া ছাড়া এলোমেলো হয়ে থমকে আছে। এ অবস্থায় সব ওলট-পালট হয়ে যাওয়া উচিত। সব ভোঁতা মেরে আছে। ব্যাপারটা কী ? একটা মানুষ নেই যে বুঝিয়ে দেয়। ভারী খারাপ লাগছে।

তাই বলো ! আর কিছু হচ্ছে না, তাই মোকে নিকা করবে ?

কৈলাস গোসা করে বলে, তোমার কাছে সব কিছু তামাশা। এখন কিছু হচ্ছে না, দু-দিন বাদে হবে তো ? সে জন্য নয়। আমরা কেন এ ভাবে দিন কাটাব ?

লক্ষ্মী বলে, আহা, চটছ কেন ? বললাম তো আমি রাজি আছি। তুমি নিজেই পারবে না ! মা বোনকে ছাড়বে ? ভাইটাকে মানুষ করবে না ?

বাবা আছেন। যা পারি টাকা পাঠাব।

ম্লেচ্ছের টাকা কে নেবে ? এখন বাপ রোজগার ছোঁয় না, তখন মাও ছোঁবে না। সম্পর্ক আর থাকবে না, একেবারে সবাইকে ছাড়তে হবে জন্মের মতো।

ছাড়ব। ভাসিয়ে দিচ্ছি না তো। বাবা মরতে মরতে অবিনাশটা যা হোক কিছু করবে। তাছাড়া—

তাছাড়া—?

তদ্দিনে দেশের অবস্থা পালটে যাবে। এ দুরবস্থা আর বেশি দিন থাকবে না।

শুনে লক্ষ্মী ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে, তাই যদি আশা কর তবে খারাপ লাগছে কেন ?

কৈলাস সোজাসুজি বলে, তোমার জন্যে। দিনরাত মনটা হুহু করছে আমার।

লক্ষ্মী একটু ভেবে বলে, বেশ, তবে ব্যবস্থা করো। কিন্তু মোর মন বলছে কী, সুখ পাবে না। ঘরের লোককে তো ছাড়া নয় শুধু, সারা জেলার লোককে আপন করেছ। জীবনবাবুই বলো আর নন্দ ডাক্তারই বলো, তোমার কথার দাম বেশি লোকের কাছে। বিষ্টুবাবু বলতেন কি জানো ? একটু পড়াশোনা করলে আর বক্তৃতা দিতে শিখলে আমরা কি পাত্তা পেতাম কৈলাসের কাছে ? হেসে হেসেই বলতেন। কিন্তু কথাটা সত্যি। এ তল্লাটে আর একটা মানুষ নেই তোমায় ডিঙিয়ে যায়। যে যত বড়ো বড়ো কথা বলুক, তুমি কী বলছ শুনে তবে লোকে মতি স্থির করে। আমারই বুকটা অহংকারে ফুলে ওঠে। এত লোকে তোমায় চায়, পালিয়ে গিয়ে আমায় নিয়ে সুখী হতে পারবে ভেবেছ ?

ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লে তো ? সব হিসেব কষেছি গো, মনটা এমনি ঠিক করিনি। পালাতে যাব কেন আমি ? আমি হিন্দু বলে তো দশজনে আমায় চায় না? পাপ তো করব না কিছু ? মানুষটা আমি যেমন আছি তেমনি থাকব। আমার খুশি আমি ধর্ম পালটাব, যাকে খুশি ঘরে আনব। তাতে বিগড়ে গিয়ে লোকে যদি আমাকে না চায়, আমার কী দোষ ?

দশজনের খাতির পেতে হলে—

দশজনের মন যুগিয়ে চলি না আমি।

কৈলাসের এ ভাব লক্ষ্মী কখনও দ্যাখেনি। সে বুঝতে পারে গভীর একটা আলোড়নের ভিতর দিয়ে বিশেষ একটা অবস্থায় পৌঁচেছে তার মন, নতুন রকম একটা বিদ্রোহ মাথা তুলেছে তার মধ্যে। এতদিনের গড়া জীবন নষ্ট করে দিয়ে নতুন করে অন্যভাবে গড়বার পণ জেগেছে, আর দ্বিধা নেই তার।

লক্ষ্মী ভয় পেয়ে বলে, দশজনকে যদি কেয়ার নাই কর, এত ভজঘটে কাজ কী তবে ? সোজাসুজির ঘর বেঁধে একসাথে থাকি এসো ?

কৈলাস একটা বিড়ি ধরায়। দেশলাইয়ের আলোতে লক্ষ্মী যে কীরকম ব্যাকুলভাবে তার মুখের ভাব দেখছে সেটা তার চোখে পড়ে।

ধীরে ধীরে কৈলাস বলে, তাই কী হয় ? মন যুগিয়ে চলি না মানে দশজনের ভয়ে উচিত কাজ করতে ডরাই না। তাই বলে কী ডোন্ট কেয়ার করব বলছি সমাজকে ? অ্যাদ্দিনে তাহলে কোনো ওজর শুনতাম না তোমার।

মনের কথাটা বুঝিয়ে বলে কৈলাস। দশজনে যে নিয়মনীতি আইনকানুন মানে একা সে সব ভাঙা অপরাধ, ভালোই হোক আর মন্দই হোক সে সব নিয়মনীতি আইনকানুন। কিন্তু তারা তো দশজনের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না। ধর্ম পালটাবার অধিকার সমাজ তাদের দিয়েছে, এ কাজকে বেআইনি

বা সমাজবিরোধী বলবার জো নেই। লক্ষ্মীব স্বামী না থেকেও আছে, উচিত না হলেও এটাই যখন দশজনে নিয়ম বলে মেনে নিচ্ছে এখন পর্যন্ত, তারাও এ নিয়মটা নিশ্চয় মানবে। এতদিন মেনেও এসেছে। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় ধর্ম পালটালে লক্ষ্মীর বিয়েটা ভেস্তে যাবে, এটাও সমাজের স্বীকৃত নিয়ম। এ নিয়ম অনুসারে চললে তাদের দোষ হবে কেন ? কিছু মানুষ তাদের দোষ দেবে, গালাগালি করবে—তার মধ্যে আজকেব আত্মীয়বন্ধুও থাকবে অনেক— কিন্তু তার আর করা কী। যে অধিকার তাদের দেওযা হয়েছে কিছু মানুষকে অসন্তুষ্ট করাব ভয়ে সেটা না খাটানো মানেই ওই মানুষগুলির মন জুগিয়ে চলা। বুঝলে কথাটা ?

বু-ঝ-লা-ম।

অমন টেনে বলছ বু-ঝ-লাম ?

মোর বাবু মেয়েলোকের মন। বুঝেও মন খুঁতখুঁত কবলে করব কি বলো ?

কিন্তু লক্ষ্মী বুক বাঁধে, অনেক মনকে শক্ত করে। শুধু ভাতকাপড়ের অভাবে কত জীবন নষ্ট হয়ে যেতে দেখেছে চারিপাশে। আবার দারিদ্র্যের মধ্যে, স্বচ্ছলতার মধ্যে কত জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে শুধু কতকগুলি নিয়ম কানুন আচার বিচারের জন্য।

এদের পাশাপাশি আবার তাদের কথাও ভাবে লক্ষ্মী, শত দুঃখের মধ্যেও যারা স্বামীপুত্র নিয়ে সুখী হযে আছে। কৈলাস একদিন তাকে বলেছিল, অবস্থা পালটে না গেলে এ দেশে ষোলো আনা সুখ পাওয়া, জীবনটা সার্থক করা শুধু গরিব কেন, ছোটোখাটো বড়োলোক কেন, কোটিপতিরও সাধ্য নেই। একেবারে ওপরতলায় মানুষেরও নাকি আজ সব হারাবাব আতঙ্কের কণ্টকশয্যা। জীবনটা সার্থক করা সব চেয়ে বেশি সম্ভব হয়েছে জগতে সোভিয়েট আর চীনে।

তবু, যেটুকু সুখ সার্থকতা এ দেশে পাওয়া সম্ভব, সে কেন তা থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবন কাটাবে ? তাব কৈশোবটুকু লুটতে লুটতে স্বামী বিগড়ে গিয়েছিল বিক্রির জন্য বাজারে সাজানো নারীর যৌবন আব নেশায়। সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছে আজ এক যুগেরও বেশি। তবু সেই সম্পর্কেব দায় টেনে নগদ সুখ বাতিল করে কেন সে দুঃখী হয়ে থাকবে ?

হোক নুন ভাত। উপোসি মানুষ সে। একজন নুনভাতের কলাপাতা সামনে ধরে দিয়ে খেতে ডাকলে কেন সে প্রত্যাখ্যান করবে এটা উচিত কী ওটা অনুচিতের চিন্তায় ? স্বর্গে গিয়ে সর্বসুখ পাবার ভাঁওতা সে জেনে গিয়েছে অনেককাল। তার শুধু এখন এই পৃথিবীর জীবনে ভালোমন্দ উচিত অনুচিতের বিচার।

এ বিচার কৈলাস নিশ্চয় ভালো বোঝে তার চেয়েই? নিজের মেয়েলি ভয়ডর ভাবনা চিন্তার জন্য কেন সে বারবার ঠেকিয়ে চলবে কৈলাসকে, বাতিল করে দেবে তার বিচার ও সিদ্ধান্ত ?

লক্ষ্মী তাই জোর দিয়ে বলে, শোনো বলি, মোকে অত ঠান্ডা ভেবো নাকো। ভুল করে নয় ভেস্তেই দেব জীবনটা, অত ডরাইনে আমি। মোব ভাবনা যত তোমার জন্যে। তুমি যদি মন ঠিক কবে থাকো, আমিও ঠিক করলাম। কী করতে হবে জানিয়ে দিয়ো, ব্যাস।

উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলে বাঁধা পান-দোক্তা মুখে পুরে দিয়ে মোলায়েম মিষ্টি সুরে বলে, সত্যি সত্যি মোকে সঁপে দিলাম আজ থেকে। বিশ্বাস না হয়, থানার ঘড়িতে এগারোটা বাজতে শুনে এসো। জেগে রইব।

সত্যিই আসব লক্ষ্মী ?

খুশি হলে নিশ্চয় আসবে। আমি কি ডরাই তোমাকে ? কপালে বন্দুক ঠুকে ও সব ন্যাকামি চেঁছেপুছে সাফ করে দিয়েছে জান না ?

কৈলাস উদ্‌বেগের সঙ্গে বলে, জ্বরটর হয়নি তো তোমার ? তোমার সেই মাথার বেদনাটা বাড়েনি তো ?

লক্ষ্মী বলে, বটে ? লক্ষ্মীর মন সায় দেয়নি, তোমার খাতিরে রাজি হল, এ সব ভেবে দরদ জাগল বুঝি ? পিছিয়ে যেতে চাও ?

কৈলাস বলে, খালি নিজের কথাই বলে গেলাম। পুরুষ মানুষ, বাপ শাস্তর জানে, নিজে খানিক ইংরেজি শিখেছি। একটু ভালোবাসি বলে ধরে নিয়েছি, একেবারে পোষ মানিয়ে ফেলেছি তোমাকে।

লক্ষ্মী একটু হাসে। আবার আঁচল খুলে একটি পান কৈলাসের হাতে দিয়ে বলে, ভাত খেয়ে খেয়ো। জর্দা দিয়ে সাজা—শুভবাবুর বোন এক কৌটা জর্দা উপহার দিয়েছে। আমাকে নিয়ে শুভবাবু আর মায়ার চটাচটির ব্যাপারটা ভালো করে শুনতে এসেছিল। ওরা কী বলো তো ? নিজেদের মধ্যে এত অবিশ্বাস ? মায়ার কাছে শুনেছে, নিজের ভায়ের কাছে শুনেছে,—তবু এসে বলে কী, ওরা নিশ্চয় আসল কথা চেপে গেছে !

মন ঠিক করে ফেলেছে। মনটা কিন্তু নিরুদ্‌বেগ করতে পারে না লক্ষ্মী। তার কেবলই মনে হয়, হিসাবে মস্ত একটা গলদ রয়ে গেছে তাদের, বিশ্রী একটা ভুল তারা করতে চলেছে, একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে তাদের। জীবনে আর মাথা তুলতে পারবে না কৈলাস। মানুষটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

না, বুদ্ধি ঠিক নেই কৈলাসের। তার আশঙ্কাই সত্য হয়েছে, মন বিগড়ে গেছে কৈলাসের। তার জন্য পাগল হয়েছে কৈলাস ? হয়তো হয়েছে—কিন্তু যে কৈলাসকে সে চিরকাল জানে সুস্থ স্বাভাবিক সে মানুষটা পাগল হয়নি। একটা মেয়েমানুষের জন্য, পিরিতের জন্য, নাটুকেপনা করার ধাত কৈলাসের ছিল না কোনোদিন।

মাথা বিগড়ে গেছে কৈলাসের।

দুর্ভিক্ষ মহামারী দমন নির্যাতন চরমে উঠেছে, কিন্তু প্রতিরোধ আর লড়াই ছিল বলে মাথা ঠান্ডা থেকেছে কৈলাসের। কোনো বিপদ বা সমস্যা নিয়ে তাকে কখনও বিচলিত হতে দ্যাখেনি লক্ষ্মী। অথচ আজকের অচল অবস্থাটা অসহ্য হয়ে উঠেছে তার, তাকে একেবারে কাবু করে দিযেছে। অবস্থার অবনতি হচ্ছে দিন দিন, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা চুরমার হয়ে গেছে মানুষের, অথচ সব যেন থমকে থেমে আছে। কেমন একটা দিশেহারা উদাসীন ভাব মানুষের। অথচ, প্রাণের তো অভাব নেই এদিকে। এলোমেলো ছাড়াছাড়া ভাবে অজস্র সাড়া মিলছে প্রাণের !

কৈলাস নিজেই বলেছে এ সব। কিন্তু এই অবস্থা যে তাকে অস্থির করে তুলতে তুলতে কীভাবে বিকৃত করে দিয়েছে তার বুদ্ধি বিবেচনা, এটা সে ধরতে পারেনি।

বোধ হয় ধরাও যায় না নিজের বিকার।

কিন্তু তাকে নিয়ে এভাবে পালিয়ে গেলে কী উপায় হবে কৈলাসের ? এতকাল যাদের সঙ্গে মিলেমিশে যেখানে থেকে দুঃখী মানুষের অবস্থা পালটাবার জন্য এত ভাবে লড়াই করে এসেছে, আজ সেই সব সাথিদের ছেড়ে সেখান থেকে চলে গেলে কী নিয়ে দিন কাটবে তার ? অস্থিরতা আর এই ঝোঁক তার কেটে যাবে—নিজের ফেলে যাওয়া আসল জীবনটার জন্য তখন যে হাহাকার করতে হবে তাকে ?

থানার ঘড়িতে দশটা বাজার পর লক্ষ্মীর খানিকক্ষণ রীতিমতো আতঙ্ক জেগেছিল, যে রকম মনের অবস্থা কৈলাসের সত্যই হয়তো সে তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে হাজির হবে !

সাড়ে এগারোটার ঘণ্টা বাজতে শুনে এ আতঙ্ক তার কেটে যায়। কিন্তু স্বস্তি জোটে না। অন্য আতঙ্কে প্রাণটা ভরাট হয়ে থাকে।

গাঁদা বলে, ছটফট করছে যে ?

লক্ষ্মী বলে, গাঁদা, তোর যখন খুব কষ্ট হয় মানুষটার জন্য, মনে হয় না পাগল হয়ে যাবি ? তখন তোর পাগল হতে ইচ্ছা হয় না ?

গাঁদা বলে, কেন ? ছাড়া পেয়ে আসবে তো ছ-মাস একবছর বাদে ?

আশায় শান্ত হয়েছে গাঁদার মন ! কৈলাসও বিশ্বাস করে এ রকম খাপছাড়াভাবে থেমে থাকবে না সব, খেই ফিরে পাবে মানুষ, সুনির্দিষ্ট আদর্শ আর উদ্দেশ্য নিয়ে এগোবার জন্য সক্রিয় হবে— কিন্তু আশায় স্বস্তি পায় না কৈলাস !

গাঁদা আর কৈলাসের মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অবশ্য তুলনা চলে না।

গভীর জ্বালা আর আপশোশের সঙ্গে ভাবে, তার যদি যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি থাকত ! একটা দেশের মানুষ কেন আর কীসে এ রকম অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলায় স্তরে এসে ঠেকে থাকে কিছুদিনের জন্য আবার এগিয়ে যায়, এ সব বুঝিয়ে দিয়ে সে যদি শান্তি এনে দিতে পারত কৈলাসের মনে।

কৈলাসও রাতটা ছটফট করে কাটায়।

নিজের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যে থিয়োরি সে দাঁড় করিয়েছে তার মধ্যে সে কোনো ভুল খুঁজে পায় না অথচ তার সহজ বাস্তববোধ তাকে পীড়ন করে। কেবলই মনে হয়, কোথায় যেন একটা মস্ত গলদ থেকে যাচ্ছে !

ধর্ম নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। লোকে তাকে হিন্দু বলেই জানুক আর মুসলমান বলেই জানুক, নিজেকে সে নিছক মানুষ বলেই জানবে। ভালো কথা। কিন্তু সেটা যেন এ ব্যাপারের আসল কথা নয়।

আত্মীয়বন্ধু দেশ গাঁ ছেড়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করলে মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করার সৈনিক হিসাবে তাকে বরখাস্ত হতে হবে না। শুধু তার সংকীর্ণ এলাকাটুকুতে সে লড়াই সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু এই বিশেষ ব্যাপারে সেটাও যেন আসল কথা নয় !

হলে এ রকম আতঙ্ক জাগবে কেন ? কেন অনুভব করবে যে কাজটা ঠিক হবে না, নিজেকেও সে ফাঁকি দেবে মানুষকেও ফাঁকি দেবে ? এমন একটা মারাত্মক ভুল করে বসবে যার সংশোধন নেই ?

একী শুধু সংস্কার ? যাই সে ভাবুক নিজের সম্পর্কে, তার মধ্যে গোঁড়ামি রয়ে গেছে ?

সকালে আবার যখন দেখা হয় দুজনের, পবস্পরের মুখে রাতজাগা ক্লিষ্টতার ছাপ যেন অপমানের মতো মনে হয় পরস্পরের।

জোর করে মুখে হাসি এসে কৈলাস বলে, সেই কথাই ঠিক রইল তো ?

লক্ষ্মীও হাসবার চেষ্টা করে বলে, নিশ্চয় !

কৈলাস বলে, রাতে তাই আর গেলাম না। আর কটা দিনের তো ব্যাপার ?

১১

শুভ জীবনকে নবশিল্প মন্দিরে কাজ দিয়েছে।

জীবন এখন বারতলাতেই সপরিবারে বাস করে। মানুষটার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে যেন রাতারাতি। কংগ্রেসি কর্তাদের বিরুদ্ধে তার জন্মেছিল দারুণ বিক্ষোভ, তারা তার জন্য কিছু না করে থাকলেও শুভর কারখানায় চাকরি পেয়েই তার যেন সমস্ত ক্ষোভ উপে গেছে।

শান্ত প্রসন্ন হয়ে উঠেছে মানুষটা।

সেই সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে ত্রিভুবন দত্তের সঙ্গে এবং গলায় তার উঠেছে একটি স্ফটিকের মালা।

কপালে ও বাহুতে আজকাল রক্তচন্দনের তিনটি রেখাও দেখা যায়। তবে খুবই অস্পষ্ট দাগ—সংকোচটা ঠিক যেন কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

রাজনীতিতে ধর্মগত গোঁড়ামি আমদানি করার তীব্র বিরোধিতা কবে এসেছে আজীবন। বোধ হয় সেই জন্যই সংকোচ।

নিজে থেকে এর কাছে ওর কাছে কৈফিয়তও বোধ হয় সেই জন্যই দেয় যে বয়স হল, এখন একটু পরকালের চিন্তা করা তো দরকার ?

গোঁড়ামির ধার ধারি না। মুক্তি-টুক্তিও চাই না। মনটা একটু শান্ত রাখা, এই আর কী ! মরার পরে ওতেই আত্মার শান্তি হবে।

এলোমেলো যেটুকু আন্দোলন এদিক-ওদিক হচ্ছিল, জীবন তাতে অংশ নিত, সভায় যেত। আজকাল নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ডেকেও তাকে পাওয়া যায় না।

কৈলাস একটু ভড়কে যায়। জীবনের অশান্তির কাবণ সে জেনে রেখেছিল অভাব এবং সারা জীবন যে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে এসেছে সেটা পাওয়া গেছে জানার পর ভুল ভাঙার প্রতিক্রিয়া। শুভ নিদারুণ অনটন থেকে মোটামুটি রেহাই দিতেই সব অশান্তি কেটে গেল ' আজ শুধু তার দরকার আধ্যাত্মিক শান্তি !

মত ও বিশ্বাস যাই হোক, কিছুটা ভেজালও থাক, মোটামুটি মানুষটার দেশপ্রেমেব আন্তবিকতায় কৈলাসের সন্দেহ ছিল না। ধর্মকর্ম ও পরকালের চিন্তা করা প্রয়োজন মনে হয়েছে, তার মানে বোঝা যায়। তাতে কারও আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু দেশের এই ভয়ানক দুর্দিন তার মধ্যে যে ক্ষোভ জাগিয়ে রাখবে সেটা মিটে গেল কী করে ?

দেশের জন্য তার দরদ কি সবটাই ছিল ফাঁকি ? কিন্তু তার দীর্ঘকালেব দেশসেবার আন্তরিকতায় আজও তো অবিশ্বাস করতে মন চায় না !

কৈলাস তাকে প্রশ্ন করে, সব ছেড়ে দিলেন যে ? শনিবার অত বড়ো সভা হল, যাবেন বলে গেলেন না ?

জীবন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছে বোঝা যায়। বয়সের দোহাই দিয়ে সে বলবার চেষ্টা করে, বুড়ো হয়ে পড়লাম—

কৈলাস বলে, এটা কাজের কথা নয় জীবনবাবু। আপনাকে আমি ভালো করে জানি। বয়স হয়েছে বলে আপনি কি দেশকে ছাড়তে পারেন ?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জীবন বলে, কী জান বাবা, আসলে একটা মুশকিলে পড়েছি। শুভও আছে তোমাদের সঙ্গে, আমায় চাকরি দিয়েছে। সভায় গেলে কংগ্রেসের নিন্দা না করে উপায় নেই। তাতে আপত্তি ছিল না, চাকরিটার জন্য হয়েছে বিপদ। সারা জীবন কংগ্রেসের গুণ গেয়েছি, আজ শুভর কাছে চাকরি নিয়ে উল্টো সুর গাইলে লোকে কী বলবে বলো ?

এই জন্য ?

কী করি ? নইলে প্রাণটা কি ব্যাকুল হয় না ? চাকরিটা নিয়ে হয়েছে সংকট। ও পক্ষের লোকেরা ভাববে, নিজেকে তোমাদের কাছে বেচে দিয়েছি। যাদের পক্ষ নিয়ে বলতে যাব, তারাও কি খেলো ভাববে না আমাকে ? এ কথা মনে আসবেই যে লোকটা কী সুবিধাবাদী—একটা চাকরির জন্য ডিগবাজি খেয়ে আমাদের দিকে ভিড়েছে !

ক্লিষ্ট বিষণ্ণ দৃষ্টি জীবনের। বোঝা যায়, ত্রিভুবনের কাছে কালী-সাধনায় শান্তি খুঁজতে গেলেও প্রাণটা তার অশান্তিতে ভরে আছে।

তার শান্ত প্রসন্ন ভাবটা শুধু বাইরের।

কৈলাস যেন নতুন আলোকের সন্ধান পায়।

এ কথার সবটা হয়তো সত্য নয় যে নিছক আদর্শেব খাতিরে কংগ্রেসের ভুল সংশোধন করা কর্তব্য মনে করে জীবন নতুন পথ নিয়েছে। সারা জীবনের ত্যাগ ও দেশ সেবার পুরস্কার বাগিয়ে নেবার সুযোগ এলে সে কিছুই করতে পারেনি, মানুষটা যে সে ধাঁচের নয়। তাই বলে সে কি আর আশা করেনি কিছুই ? তার ধারণা ছিল, দীর্ঘকালের ত্যাগস্বীকার জেল খাটার পুরস্কার স্বাভাবিক নিয়মে এবার আপনা থেকেই তার জুটে যাবে !

জুটে যদি যেত পুবস্কার তবে হয়তো সাধারণ মানুষ আর পাত্তা পেত না তার কাছে। দেশের অবস্থা দেখে হয়তো কান্না পেত জীবনেব, মনে মনে সে কামনা করত প্রতিকার হোক—কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সে আর ভিড়ত না।

লোকে কী বলবে ভেবে আজ যেমন ছুটি নিয়েছে, এমনি ভাবে গা বাঁচিয়ে ডুব দিয়ে রেহাই খুঁজে নিত।

আবার দেশেব মানুষের জন্য প্রাণটা তার কাঁদলেও একেবারে কোনো আশা না নিয়েই কি আর সে তাদের পক্ষে ভিড়ে পড়েছিল ! শুভরা এ পক্ষে না থাকলে হয়তো সে মন স্থির কবে উঠতেই পারত না।

তবে মঙ্গল সে চায় বইকী দেশের লোকের। এ চাওয়াব মধ্যে ভেজাল নেই। অন্য অনেক কিছু চাওয়ার মতো এ চাওয়াটাকেই তাকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নইলে উপায় কী ?

প্রকাশ্যভাবে শুভর কাছে চাকরি করতে না হলে, অন্যভাবে তার প্রাণান্তকর অভাব ঘুচাবার ব্যবস্থা হলে নিজেকে সে গুটিয়ে নিত না, সভায় দাঁড়িযে জোর গলায় ঘোষণা করত সাধারণ মানুষকে ভালোবাসে বলেই কেন সে তার মত ও পথ পালটে দিয়েছে বুড়ো বয়সে।

নন্দ সায় দেয়। তা বইকী।

শুভও সায় দেয়। কিন্তু মুখ গোমড়া করে বলে, দু-চাবমাস দেখব, তারপর খেদিয়ে দেব। স্ফটিকের মালা ঝুলিয়ে কৈলাসের বাবার শিষ্য হবার জন্য আমি যেন ওকে দুশো টাকা মাইনে দিয়ে রেখেছি। ও কাজেব জন্য ষাট সত্তর টাকার লোক পেতাম।

কৈলাস আর নন্দ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

নতুন আলোটা আরও স্বচ্ছ হয় কৈলাসের কাছে। বাস্তবের যে হিসাব কষেছে জীবন সেটা তার মনগড়া নয়। শুভ তার অতীত জীবনকে খাতির করে তাকে চাকরি দেয়নি, তাব অনুষ্ঠিত কংগ্রেস-বিরোধী সভায় সে তার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করবে—তার মতকে সমর্থন করে বক্তৃতা করবে—শুভও এই প্রতিদান আশা করছে জীবনেব কাছে।

শ-তিনেক উদ্‌বাস্তু সেদিন ট্রেন থেকে বারতলা স্টেশনে নেমে স্টেশন আর শুভর কারখানার আনাচে-কানাচে মাথা গুঁজেছে খবর পেয়ে কৈলাস কোথায় ছুটে যাবে স্টেশনে, তার বদলে সে গজেনের বাড়ি গিয়ে রান্নাঘরের চালায় সুরু দাওয়ায় পিঁড়ে টেনে নিয়ে জমিয়ে বসে আবদার জানায়, এক কাপ চা খাওয়াবে লক্ষ্মী।

গাঁদা বলে, লক্ষ্মীদি তরকারি কুটছে। আমি চা করে খাওয়াই ?

হাঁ হাঁ। তোর চা তো চিনি ছাড়াই মিষ্টি হয় !

তরকারি কোটার সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে রোয়াকে তার সামনে এসে বসে লক্ষ্মী গভীর উদ্‌বেগের সঙ্গে বলে, আবার কী হল ?

মোদের মতলবটা ফেঁসে গেল।

আস্তে কথা কও। কেন ?

নিজের সুবিধার জন্য ধর্ম পালটানো যায় না। ধর্মটাও দশজনের জিনিস।

লক্ষ্মী মুখ তোলে না, বঁটির ফলাটার দিকে তাকিয়ে থেকেই সে বলে, তা হবে না, আমি মন ঠিক করে ফেলেছি।

কৈলাস মাথা নাড়ে, সে হয় না। হিসেবে মস্ত ফাঁকি রয়ে গেছে। আমি চালাক বাবুদের মতো হিসেব কষে বসেছি। থিয়োরিটা খাড়া করেছি ভিন্ন করে, অবস্থাটা যাচাই করেছি ভিন্ন করে, দুটো মেলাইনি। মেলাতে গিয়ে দেখছি, বাবা, এ যে বিষম ফাঁদ। ধর্ম শিকড় গেড়ে জাঁকিয়ে রয়েছে দেশে, তুমি আমি বললেই তো বাতিল হবে না। ধর্ম পালটালে নতুন ধর্মকে তুলে ধরতে হবে, গুণগান করতে হবে। মেরা সত্যিসত্যি নিজেদের সুবিধার জন্য ধর্ম পালটাব লোকে যাতে সেটা না ভাবে সে জন্য আরও বেশি করে গলা চড়িয়ে গুণগান করতে হবে। নইলে খেলো হয়ে যাব লোকেব কাছে। ধর্মটর্ম যদি নাই মানি মোরা, ধর্মকে কাজে লাগাতে যাব কোন মুখে ? লোকে ছি ছি করবেই।

ধারালো বঁটিতে ভাড়ালি কুটে যায় লক্ষ্মী।

কৈলাস বলে, জীবনবাবুর মতোই দশা হবে মোর। শুভর চাকরিটা নিয়ে বেচারাকে মুখ বন্ধ করতে হয়েছে। ধর্ম পালটে তোমায় পেলে মোকে হতে হবে সাম্প্রদায়িক। নাহলে, লোকে জানবে, এ মানুষটা সস্তা সুবিধাবাদী।

লক্ষ্মী বলে, তবে থাক।

লক্ষ্মী একদিকে পরম স্বস্তি বোধ করে, আবার প্রাণটা তার জ্বলেও যায় কৈলাসের আচবণে। কৈলাস নিজেই বুঝেছে যে, যেভাবেই হোক নিজের সুখটা বাগিয়ে নেবার উপায তার নেই। তাতে নিজেরই খাঁটি সুখে বাদ সাধা হবে—এতে স্বস্তি লক্ষ্মীর। আবার তাকে এমন রুবে নাচিয়ে এমন আচমকা কৈলাস পিছিয়ে গেল—এতে তার জ্বালা। মেয়েমানুষ সে রাজি হল, কৈলাসের এত হিসাব কেন, এত ভয় কেন, এত স্পর্ধা কেন ?

লক্ষ্মী নিজেই আবার নিজেকে বলে, ধিক মোকে। আমি দেখছি মধুর মারও বাড়া, মরতে বসেও বসেও গেঁয়োমি যায় না।

মধুর মা মারা গেল। এক রকম না খেয়েই—যদিও একটা রোগ হয়ে। খাদ্য পেলে অখাদ্য খেয়ে এ রোগটা মানুষের বরণ করতে হয় না। কিন্তু মরতে মরতে রসিকের মা বলে, কপাল গো, কপাল ! কত জম্মো পাপ করেছি তাই পেটের ছেলে খেতে দেয় না—বউ নিয়ে থাকে।

তার জ্বালাটা একটু কমাবার জন্যই লক্ষ্মী বলেছিল, তোমার ছেলেও খেতে পাচ্ছে না গো। বউটাকে হাসপাতালে ঢুকিয়েছে অনেক কষ্টে, বাঁচবে কিনা ঠিক নেই।

মধুর মা ক্ষীণস্বরে বলে, হবে না ? হবে না ? ভগোমান নেই ? মাকে না দেখলে বউ মরবে না হাসপাতালে ? মরুক ! মরুক !

বলতে বলতে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার। মরবার আগে ভগবানের নাম তবু উচ্চারণ করা হয়ে গিয়েছিল ছেলের উপর ঝাল ঝাড়বার ছলে—কেউ কেউ তাতেই তুষ্ট হয়েছিল।

যেভাবে হোক নাম করলেই হল।

তার নয় মনের আগুন ও সব বালাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, সবার তো যায়নি। সবার সাথে থাকতে গেলে গোঁয়ারতুমিও চলে না একেবারে কিছুই না মানার। পোড়া সংস্কারের ছাইগাদাতেও তাই চারা গজায়, বিশ্বাসের পোড়া ডালে গজায় নতুন পাতা !

বিচার বিবেচনা করেই কৈলাস তার ঢালাও নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রিয়ার ডাকে পুরুষ সাড়া না দিলে দশজন বলবে ভালোবাসার অভাব।

কিন্তু লক্ষ্মী জানে এটা ভালোবাসারই প্রমাণ কৈলাসের। তারই ইচ্ছাকে তারই বিচার বিবেচনাকে সে সম্মান করেছে।

তবু, জেনেও তার ভালো লাগে না। মনে হয়, ভালোবাসা ঝিমিয়ে গেছে কৈলাসের—নইলে দিনের পর দিন এ ভাবে কৈলাস কাটায় কী করে ?

প্রত্যাখ্যান পাওয়া উপযাচিকার মতোই জ্বালা বোধ করে লক্ষ্মী ! যার ফলে প্রায় অকারণেই কৈলাসের সঙ্গে সে ঝগড়া করে বসে। অন্তত তাদের কাছে যেটা অকারণ হওয়াই উচিত ছিল। কৈলাস গঙ্গা সেবার একসঙ্গে কলকাতা গিয়েছিল। গঙ্গা একাই যেত। মাঝে মাঝে তাকে যেতে হয়। দু-তিন সপ্তাহ সে জামা সেলাই করে, উলের জিনিস বোনে। কলকাতায় তার এক জা-এর বাসায় দু-একদিন থেকে সেগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করে আসে।

এবার কৈলাস আর সে একদিনে এক গাড়িতে একসঙ্গে কলকাতা গিয়েছিল নিছক ঘটনাচক্রে।

তাই নিয়ে কী রাগ লক্ষ্মীব !

তোমার কী বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পাচ্ছে দিন দিন ? মাথা বিগড়ে যাচ্ছে ? এটুকু খেয়াল থাকে না তোমার এটা কলকাতা নয়, পাঁড়াগাঁয় লোকে শহুরে বাবু বিবি বনে যায়নি ?

কী কবলাম আমি ?

ওই সোমত্থ মাগি, সোয়ামির ঘর করবে না, কী বলে ওকে তুমি একলাটি সঙ্গে নিয়ে গেলে ?

আমি নিয়ে গেলাম ?

গেলে না ? হাসি গল্প করতে করতে গেলে না সবার চোখের সামনে দিয়ে ? ওর পুঁটলিটা বয়ে নিয়ে গেলে না ? তাও যদি ইস্টিশানে বুদ্ধি করে মেয়ে গাড়িতে তুলে দিতে—

আমি মেয়ে গাড়িতে তুলে দেব কী রকম ? উনি একলা গেলেও পুরুষের গাড়িতেই যান।

লক্ষ্মীর ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে কৈলাস বুঝবার চেষ্টা করে হঠাৎ তার মাথা খারাপ হবার কারণ কী। তার ধীব শান্তভাব আরও রাগিয়ে দেয় লক্ষ্মীকে।

সে বলে, উনি একলাই যদি যান, ওনার সঙ্গে এঁটে রইলে কেন সারাক্ষণ ? হাসিগল্পে গদগদ হয়ে রইলে কেন ? সবাই তো দেখল কী ভাব তোমাদের—তোমাব সঙ্গে একলাটি গাঁ থেকে বেরিয়ে দু-রাত্তির বাইরে কাটিয়ে মাগি ফিরল—দেখল তো সবাই ?

কৈলাস প্রায় স্তম্ভিত হয়ে শোনে ! এ যেন তার এতদিনের চেনা লক্ষ্মী নয়, গাঁয়ের অন্য এক কুঁদুলে মেয়ে কথা কইছে !

লক্ষ্মী বলে যায়, অন্যে যা করে করুক, তোমার কত সাবধানে গা বাঁচিয়ে চলতে হবে খেয়াল নেই ? সত্যি হোক মিথ্যে হোক, লোকে যাতে মিথ্যে বদনাম দেবার সুযোগ না পায় দেখতে হবে না তোমার ?

এবার কৈলাস একটু চটে বলে, কেন ? কী দোষটা করেছি যে মিথ্যে বদনামের ভয়ে চোর বনে থাকব ? খাপছাড়া ব্যাপার কিছু করতাম তা হলে বরং কথা ছিল।

তোমার কাছে না হোক, গাঁয়ের দশজনের কাছে খাপছাড়া। তাই তো বলছি, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে দিন দিন। গাঁয়ের মানুষের মতিগতি ভুলে যাচ্ছ। গাঁয়ের দশজনকে নিয়ে তোমার কারবার, দশজনের মন বুঝে চলতে হবে না ?

দশজনের খাতিরে চোর বনে থেকে ? অমন খাতিরে কাজ নেই আমার।

বদনাম কিনবে ?

কিনব। দুজনেই কলকাতা যাচ্ছি, একসঙ্গে কথা বলতে বলতে গিয়েছি বলে যদি বদনাম হয়, হবে।

লক্ষ্মী ফুঁসে ওঠে, তাই নাকি ! আমার জন্যে বদনাম কিনবার বেলা দেখি কেঁচোটি বনে যাও ?

বলে সে দাঁড়ায় না, গটগট করে চলে যায়।

তাই বটে, তাই বটে। মাথা বেঠিক হয়ে গেছে লক্ষ্মীর। কৈলাসেরই বেঠিক হয়ে যায় মাঝে মাঝে !

পুরুষ মানুষ, শহরে খাটে, গ্রামে শহরে মানুষের নানা লড়ায়ে যোগ দেয়, তবু !

বিস্বাদ নয়, ক্ষোভ আর জ্বালায় মাঝে মাঝে এমন বিষাক্ত মনে হয় জীবনটা যে মুক্তির জন্য দিশেহারা দুর্দান্ত ঝোঁক চেপে যায় ! হয় বৈরাগ্যে, নয় স্বার্থপর আত্মসুখের চরম ব্যভিচারে—যে ভাবেই হোক এ পীড়ন থেকে মুক্তি চাই। হয় সমান হয়ে যাক শূন্যতা আর জীবন। নয় পরিণত হোক পশুর জীবনে। কী অভিশাপই সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য যুগযুগান্ত ধরে ! জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়েও প্রভাব কাটিয়ে ওঠা যায় না একেবারে।

নন্দর সঙ্গে কথা বলে কৈলাস। নন্দ তাকে আশ্বাস দেয়।

শুধু এই একটা কেন আরও শত শত দুর্বলতাও তাদের অপরাধ নয়। জীবনকে শুষে পিষে শুষ্ক জীর্ণ ব্যর্থ করে রাখার সঙ্গে শূন্যতার মোহ আর পশুত্বের লোভ অবলম্বন দেওয়া হয়। ফাঁকা মোহ ফাঁকা লোভ নয়। আধ্যাত্মিক সুখ আর পাশবিক সুখের বাস্তব ব্যবস্থা সমেত।

মানুষের বাস্তব জীবনের বাস্তব সুখ তো তাদের জন্য নয় ! তারা মানুষ বলেই না এত ঝঞ্ঝাট !

আধ্যাত্মিক অমানুষ আর পাশবিক অমানুষ বানিয়ে রাখার এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও নিজেদের মনুষ্যত্ব নিয়ে তাদের এত বিভ্রাট !

শুধু নিজেদের জীবন তো নয়, সমস্ত বঞ্চিত জীবনও তাদের পীড়ন করে, আত্মীয় মানুষের ছিবড়ে বানানো জীবন।

এ সব যারা মোটেই বোঝে না ? কৈলাস জিজ্ঞাসা কবে নন্দকে।

নন্দ বলে, তাদেরও করে। সব জীবন জড়ানো—সমগ্র জীবনে রোগ থাকলে নিজেব জ্বালা যন্ত্রণা ছাড়াও সেটা প্রত্যেককে পীড়ন করবে—বোকা হোক বুদ্ধিমান হোক, কিছু বুঝুক আর না বুঝুক। দুর্ভিক্ষ এলে অচেতন মূর্খ বলেই কারও শুধু নিজের পেটটাই কী জ্বলে ? দশজনের খিদের জ্বালা তার প্রাণটাকেও জ্বালায়।

কৈলাস যে লক্ষ্মীর ও তার সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করতে এসেছে তার সঙ্গে নন্দ তাতে আশ্চর্য হয়নি। পরস্পরকে তারা বন্ধু ভাবে না—তারা জানেও না তাদের মধ্যে কী ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এবং দিন দিন ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। না জানার কারণ এই যে বন্ধু বলতে দুজনেই ধারণা পুষে রেখেছে, নিঃসংকোচে যার সঙ্গে ইয়ার্কি ফাজলামি করা চলে—যে শুধু ইয়ার !

ছেলেবেলাও তারা প্রাণ খুলে মিশত কিন্তু হাল্‌কা ইয়ার্কি নিষিদ্ধ বদকথা নিয়ে গোপন আলাপ তাদের মধ্যে চলত না—সে জন্য দুজনেরই ভিন্ন ইয়ার ছিল, পরস্পরকে বন্ধু না ভেবে যাতের তারা বন্ধু বলে জানত।

কামারের ছেলে নন্দ আর তান্ত্রিকসাধন ত্রিভুবন দত্তের ছেলের মধ্যে যতই ঘনিষ্ঠতা হোক একটু গাম্ভীর্য বজায় থেকে যেত তাদের সম্পর্কে। অল্পশিক্ষিত কম্পোজিটার কৈলাস আর বিদ্বান

ডাক্তার নন্দ যতই একাত্ম হোক, সেই গাম্ভীর্যটুকু বজায় থেকে গেছে। এবং সেই জন্যই তারা যেন বন্ধু নয় !

নন্দ আবার বলে, একটা কথা সবাই বলে, এ দেশটা খুব পিছিয়ে আছে। পিছিয়ে আছে সত্যি কিন্তু এমনভাবে বলা হয় কথাটা যেন পিছিয়ে আছে মানেই অমানুষ হয়ে আছে দেশের লোক। শুনলে এমন গা জ্বালা করে আমার ! পিছিয়ে থাকলে, কুসংস্কারে বদ্ধ হলে, দারিদ্র্যে পিষে গেলেই যেন মনুষ্যত্বেও ঘাটতি পড়ে মানুষের। জানো কৈলাসদা, এ দেশে আজ পর্যন্ত এমন একজন নেতা জন্মালেন না যিনি দেশের পিছিয়ে থাকা মানুষগুলিকে ষোলো আনা মানুষ বলে শ্রদ্ধা করতে পারলেন। এটাও এ দেশের বাস্তবতার একটা ফল। নেতা হবার মতো শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে গড়ে উঠতে গেলেই গরিব মূর্খ সেকেলে মানুষগুলির জন্য শ্রদ্ধা কমে যায়। নেতাবা ভাবেন, বুক ভরা দরদ থাকলেই হল, এদের জন্য জীবন পণ করতে পারলেই হল—শ্রদ্ধার অভাবটা পর্যন্ত টের পান না। ভেবো না আমি খাঁটি নেতাদের খাটো করছি। ভালোবাসায় ভেজাল নেই, দেশের লোকের ভালো করা ছাড়া অন্য চিন্তা নেই, কাজ নেই—এমন নেতাও ছিলেন, আজও আছেন। কিন্তু এ সব তো যথেষ্ট নয়—শ্রদ্ধা চাই। এ যেন শিশুর জন্য পীড়িতের জন্য সমবেদনা, তাদের জন্য প্রাণপাত করা। শুধু স্নেহ নিয়ে আর প্রাণপণে চেষ্টা করে বাপ ছেলেকে মানুষ করতে পারে না, ভবিষ্যৎ মানুষ বলে ছেলেকে শ্রদ্ধাও করতে হয়।

কৈলাস বলে, আজকাল কিন্তু নতুন নেতা উঠছেন, মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করতে পারছেন মুখ্যু গরিবদের। পুরানো নেতারাও কেউ কেউ শিখেছেন শ্রদ্ধাটা—

নইলে যে আর নেতা হবার উপায় নেই ! পিছিয়ে থাকলেও দেশের মানুষরাই তো নেতা গড়ে নেয। আজ তাদেব শুধু ভালোবাসা নয় শ্রদ্ধাওয়ালা নেতা দরকার হয়েছে।

লক্ষ্মী ও কৈলাসের সমস্যায় ফিরে এসে নন্দ বলে, তোমাদের মুশকিলটা নৈতিক নয়। শাস্ত্রে নিষেধ আছে বলে দশজনের নীতিবোধে ঘা লাগবে বলে তোমরা একসঙ্গে থাকলে দশজনে ঘেন্না করবে—এটা স্রেফ বাজে কথা। তোমাদেব মিলনটা হবে বেআইনি, এই হল আসল মুশকিল। রাতারাতি সবার নীতিবোধ তো পালটায় না ? আজ একটা আইন পাশ হোক, কাল তোমরা আইনিভাবে একসঙ্গে থাকো—কিছু গুজগাজ ফিসফাস চলবে, দু-চারজন চটবে, কিন্তু সাধারণভাবে লোকে তোমাদের অশ্রদ্ধা করবে না। সংস্কারেব ভিত আলগা হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের। জোর করে পুরানো পচা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা হয়েছে তাই। ব্যবস্থা পালটে দিলেই যে কত কুসংস্কার শুকিয়ে যাবে ! চাষিরা জমির মালিক হোক, কত প্রথা কত বিশ্বাস নিজে থেকে খারিজ হয়ে যাবে। ভাতকাপড়ের সমস্যা-টমস্যাগুলি মেটার আগে তোমাদেব সমস্যা মেটার ভরসা নেই ভাই। মানুষের স্বাধীনতা নেই, প্রেমের কী স্বাধীনতা থাকে ?

কৈলাস সায় দিয়ে বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম। ওকে কীভাবে বুঝিয়ে বলব ঠাহর পাচ্ছিলাম না। অত তলিয়ে তো বুঝিনি ব্যাপারটা ! মিথ্যে উপায় খুঁজছিলাম।

কৈলাস ভাবে, লক্ষ্মী শুনলে থ বনে যাবে, চটেও যাবে নিশ্চয়। কৈলাস ধৈর্যহীনা ভেবেছে তাকে ! কৈলাসের অস্থিরতায় উতলা হয়ে তবেই না সে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়েছিল এবং রাজি হয়েছিল বলেই না কৈলাসের অবহেলায় আহত হয়ে একদিন শুধু একটু ঝগড়া করেছে গায়ে পড়ে।

তবু কৈলাস তাকে সব শোনায়।

তাদের গোপন প্রেমের সমস্যা নিয়ে নন্দর সঙ্গে পরামর্শ করেছে শুনে কিন্তু রাগ হয় না লক্ষ্মীর, লজ্জায় গায়ে কাঁটাও দেয় না।

বরং তাদের কী কথা হয়েছে শুনতে শুনতে স্বস্তি বোধ করে লক্ষ্মী। স্বস্তি বোধ করে এই জন্য যে দেশের কোটি কোটি মানুষের বেঁচে থাকার সমস্যাগুলি বজায় থাকতে তাদের সমস্যার কোনো সমাধান সম্ভব নয়—এটা কৈলাস এবার স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে বুঝেছে।

একটা বিশেষ কথা কৈলাস বুঝেছে কিনা সে বিষয়ে তার একটু খটকা থেকে যায়। কৈলাস নিজেই কথাটা তুলে তাকে নিশ্চিন্ত করে।

বলে, দ্যাখো, থানার ঘড়িতে দশটা-এগারোটা বাজিয়ে তোমার কাছে আসতে পারি। আমরা তাতে মন্দ হয়ে যাব না।

হৃদয়ে তোলপাড় ওঠে লক্ষ্মীর। টের পায় সর্বাঙ্গ তার ঘামতে আরম্ভ করেছে।

কৈলাস বলে, লুকিয়ে এলাম, শ্যাল কুকুরও টের পেল না। ভগবান যদি থাকেনও তবু তার দুটি চোখ কানা ! কিন্তু একটা দিন দুটো দিন এলেই কি মোরা ধন্যি হয়ে যাব, সাধ মিটে যাবে ? মদের স্বাদ পেলে নেশা চড়তে থাকে, মোদের হবে আরও বিষম নেশা। জানাজানি হয়ে যাবেই।

লক্ষ্মীর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

কৈলাস বলে, সবাইকে ভোল্ট কেয়ার করে তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধা আর রাতের বেলা লুকিয়ে আসা এককথা। তার চেয়ে তুমি আমি বুক বাঁধি এসো। মহিমটা জেলে পচছে, গাঁদাকে তাই বুক বাঁধতে হয়েছে। সারা দেশের লোকের সঙ্গে আমি জেলের চেয়ে বড়ো ফাঁদে আটক পড়েছি ভেবে তুমি বুক বাঁধবে।

কপালের ক্ষতচিহ্নটা আঙুলে টিপে লক্ষ্মী বলে, আর তুমি ?

কৈলাস বলে, আমি ? আমার বুক বাঁধাই আছে !

পুরুষ মানুষ, তাই তার কথা আলাদা। কৈলাসকে যদি কেউ বলে দিত এ দেশে বুদ্ধদেব থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত শুধু পুরুষরাই আদর্শের জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করার অধিকার পেয়ে এসেছে,—এ ব্যাপারটার সঙ্গে তার বুক বাঁধাই আছে বলার ধরনের বড্ড বেশি মিল—তার ফুলে ওঠা বুকটা নিশ্চয় চুপসে যেত খানিকটা !

গাঁদাকে পাশে নিয়ে লক্ষ্মী রাতে শান্ত হয়ে ঘুমায়, ছেলেমানুষ গাঁদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুমায়। সে যেন প্রমাণ দেয় যে সংযম না ছাই, সংযম মানেই বঞ্চিত বিকারগ্রস্ত মানুষের অসংযমের তাড়নার সঙ্গে লড়াই করে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া—সুস্থ স্বাভাবিক জীবন হলে মানুষের কাছে সংযম কথাটার মানেই দাঁড়িয়ে যেত অন্যরকম। ওই রকম জীবনের জন্য মানুষের বড়ো লড়াইকে শুধু ঠিকমতো খাতির করেই নিজের জ্বালায় ছটফটানোর বদলে মানুষ দিব্যি অচেতন হয়ে ঘুমোতে পারে !

মন শান্ত হয় না কৈলাসের। লণ্ঠনের আলোয় তার চোখে পড়ে বেড়ায় টাঙানো বাংলা ক্যালেন্ডারের রঙিন ছবিটার দিকে—বটতলার একটি জনপ্রিয় ছবি ছাপানো হয়েছে—ঘুমন্ত বউকে ছেড়ে রাত্রে নিমাইয়ের গৃহত্যাগ। খাটে ঘুমন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া। এ ছবি দেখে কৈলাসের শুধু মনে হত, পাঁচ ছ-শো বছর আগে একালের তাঁতের শাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহে কী করে উঠল, একালের ঢং-এ শাড়ি পরাই বা তাকে কে শেখাল, এ রকম সাজসজ্জা করে তখনকার বউদের বিছানায় শুয়ে ঘুমানো রীতি ছিল কিনা।

ছবিটা আজ তাকে মনে পড়িয়ে দেয় অন্য কথা।

চৈতন্যদেবের আদর্শ কী ছিল আর কেমন ছিল সে কথা নয়, প্রায় তারই মতো বউ না হলেও বউয়ের বাড়া লক্ষ্মীকে সে যে আজ আদর্শের জন্য ত্যাগ করেছে, এ কথাও নয়।

সন্ন্যাসী হওয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল চৈতন্যের। দেশ প্রস্তুত ছিল, সময় ছিল উপযুক্ত, তার শিক্ষায় বন্যার মতো ভেসে গিয়েছিল দেশ। আজ এত প্রয়োজন তবু নতুন ভাবের বন্যা আসে না কেন দেশে ?

প্রয়োজন চরমে উঠেছে কিন্তু দেশ কী ? প্রস্তুত নয় ? বন্যা এনে দেবার মানুষ নেই ?

একদিন থেকে স্টেশনে নামে নেংটি পরা ছাই-মাখা সন্ন্যাসী। বেশি দিনের সন্ন্যাসী নয় বোঝা যায়, চুল সবে জটা পাকাতে আরম্ভ করেছে। মুখভরা আধইঞ্চি গোঁফদাঁড়ি।

ছাই ভেদ করে চোখে পড়ে তার দেহের মলিন গৌরবর্ণ।

হাতে একটা ভাঙা কাঁসার থালা, এক টুকরো পোড়াকাঠ দিয়ে সেটা পিটিয়ে লোক জড়ো করে চেঁচিয়ে বলে, আমি কলির অবতার, তোমাগো মুক্তি দিতে আইছি। স্বর্গে ভগবানরে বিনাশ কইরা মর্তে নামছি, আমি তোমাগো অধর্ম শিখামু, মুক্তি দিমু। ডর নাই, কোনো ডর নাই। আমি তোমাগো বাঁচামু।

হেলে দুলে মাথা নেড়ে পাক খেয়ে অঙ্গভঙ্গি করে। কাঁসার ভাঙা থালাটা ঠং ঠং করে পিটিয়ে দেয়।

বলে, কলিকালে সব উলটা। আমি উলটা অবতার হইছি, তোমাগো শিখাইতে আইছি। তোমাগো বুঝাইতে আইছি। তোমরা আমারে পূজা করবা, অধর্ম করবা। ভুইলো না, যত পাপ করবা তত সুখ পাইবা।

কেউ খেতে দিলে খায়, না দিলে চায় না। প্রশ্ন করে জবাব মেলে না। এ গাঁ ও গাঁ ঘুরে বেড়ায় আর থালা পিটিয়ে লোক জড়ো করে নিজের কথা বলে যায়। ওই এককথা, ভগবানকে সে বিনাশ করেছে, ভগবানের সে বিপরীত অবতার, এবার থেকে সকলে তাকে পূজা কর, অধর্ম কর, পাপ কর। সুখ পাবে, মুক্তি পাবে।

খবর শুনে ত্রিভুবন বারতলায় গিয়ে তাকে পাকড়াও করে। তাকে কথা বলাবার জন্য, প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য তিন-চারঘণ্টা চেষ্টা করে গলদঘর্ম হয়ে যায়। পাগল সন্ন্যাসী তাকে পাত্তাও দেয় না।

ত্রিভুবন শেষে ভয় দেখিয়ে বলে, তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দেব।

এবার সে বলে, দাও ! বলেই থালা পিটিয়ে চেঁচাতে শুরু করে।

ত্রিভুবন বলে, ভাত খাবে ?

নীরবে মাথা হেলিয়ে সে সম্মতি জানায়।

ত্রিভুবন বলে, আমার বাড়ি এসো।

সে নিজের মনে মাথা দুলিয়ে যায়।

একজন বলে, কারও বাড়ি যাবে না দত্তমশাই। অনেকে চেষ্টা করেছে, পারেনি।

বাজারের কাছে গাছতলায় বসেছিল। বারতলায় বাজার বসে এক বেলা—সকালে। বেলা বেড়েছে, বাজারের কেনাবেচা শেষ হয়েছে, অন্যদিন এতক্ষণে স্থানটি ফাঁকা হয়ে আসত। আজ অনেক লোক গাছতলায় ভিড় করে আছে।

শুধু পাগলটার জন্য নয়। ত্রিভুবন এসেছে পাগলের কাছে, কী ঘটে দেখবার জন্য।

হরেন দাসের বাড়ি কাছেই। সে ত্রিভুবনকে জিজ্ঞাসা করে, মোদের ঘরের ভাত দিলে পাপ হবে না তো দত্ত মশায় ?

ত্রিভুবন হেসে বলে, পাপ করতেই তো বলছে।

হরেন বলেন, পাগল হোক, সন্ন্যাসী তো। আপনি অনুমতি করলে ভাত এনে দিই। এক ঘরের ভাতে হবে না, এত বেলায় কার ঘরে ভাত আছে কে জানে। কয়েক ঘর থেকে জুটিয়ে এনে দিতে হবে।

তোমাদের খুশি হলে দাও।

কোনো মতে পাগল সন্ন্যাসীকে বাগাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ত্রিভুবন বাড়ি ফিরে যায়।

ভাত তরকারি ডাল আর পুঁটিমাছের ঝোল আসে পাগল সন্ন্যাসীর জন্য। কয়েক বাড়িতে এ বেলা আধপেটা ভাতেও কম পড়বে।

ভাতের থালার দিকে খানিকক্ষণ কটমটিয়ে চেয়ে থেকে সন্ন্যাসী বলে, অন্নগত প্রাণ ? অন্নগত প্রাণ ? কলিতে অন্নগত প্রাণ ? যা, খামুনা তর ছালির অন্ন। ঘাস খামু।

বলে মাটি থেকে ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে থালায় ছড়িয়ে দিয়ে ঘাস মেশানো ভাতে ডাল তরকারি ঝোল একসাথে মেখে ফেলে ছড়িয়ে খেতে আরম্ভ করে।

নানাগল্প, নানাগুজব ছড়ায় চারিদিকে। পাগল সন্ন্যাসীর অদ্ভুত আচরণ অদ্ভুত ক্ষমতা আর অত্যাশ্চর্য কাণ্ডকারখানার গল্প।

সব আবার শোনা কথা হয় না। প্রত্যক্ষদর্শীও পাওয়া যায়।

একজন চোখের সামনে সন্ন্যাসীকে শূন্যে মিলিয়ে যেতে দেখেছে। গভীব রাত্রে সন্ন্যাসীর চারিদিকে কিম্ভূতকিমাকার আবছা আবছা সব জীবকে ঘিরে থাকতে দেখে আরেকজনের মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়েছিল। বারতলার সাত মাইল উত্তরে মাঝেরপাড়া গ্রামে যে রাতে যাত্রা হয়েছিল এবং সমস্ত রাত সন্ন্যাসী যাত্রার আসর ছেড়ে এক পা নড়েনি, সেই রাতে রসিক ছিল শহরে তার কুটুম বাড়ি।

রসিক কুটুমের সঙ্গে সন্ন্যাসীর গল্প করছে, হঠাৎ সশরীরে সন্ন্যাসী তাদের সামনে উপস্থিত !

যাত্রা শুনছিলাম একটু, স্মরণ করেছিস কেন ?

লক্ষ্মী বলে, ও যেমন পাগল, তুমিও তেমনি পাগল। বানিয়ে বানিয়ে এ সব গপ্পো ছড়িয়ে কী সুখটা হয় বলো তো ?

সারদা বলে, যেমন তেমন পাগল নয় গো, এ অন্য পাগল। মহাপুরুষদের শুনেছি এমনি অবস্থা হয়।

তোমার মুন্ডু হয়।

কয়েকদিন পরে জানা যায় পাগল সন্ন্যাসীর পরিচয়। আকুলিযার উদ্‌বাস্তু শিবিরে বাস করত। বউ ছেলে মেয়ে মরে যাবার পর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

আরও দিন কয়েক পরে দেখা যায় অন্য এক গ্রামের গাছতলায় পাগল সন্ন্যাসী মরে পড়ে আছে।

১২

জগদীশের কাছে কিছু টাকা পাবার আশায় এই তো সেদিন জীবন নেমেছিল বারতলা স্টেশনে। পরিবার নিয়ে বিব্রত জীবন। তারপর কত মানুষ এল গেল পাগল সন্ন্যাসী পর্যন্ত। সকলেই যেন এল বহুরূপী ব্যাপক সংঘাতের বিচিত্র সূত্র ধরে, ঘরোয়া জীবনের নোঙর যেন কারও নেই। বাইরে থেকে তফাত থেকে বড়ো জোর একটু উঁকি দেওয়া হল দু-একটা পরিবারে—পারিবারিক জীবন বলে যেন কিছুই এদের নেই। বারতলায় দেশি খাবার তেলেভাজার দোকানি সনাতন ঘর বেঁধেছে সুরমাকে নিয়ে, দোকানের পিছনের অংশটুকুতে, সুরমার বাচ্চা হবে—কিন্তু বিয়ে করা বউ তো সুরমা নয় ! তা হোক। তবু ওদের এইটুকু কাঁচাঘরের ঘরোয়া জীবন যেটুকু বর্ণনা পেল, আর কারও ভাগ্যে তার সিকিটুকুও জুটল না !

একেবারে আড়ালেই রয়ে গেল প্রথম পুরুষ জীবনের পরিবার। পা মচকে লোচনের বাড়িতে উঠল জীবন, মহিম ছাড়া প্রায় সমস্ত পরিবারটিকে দেখা গেল লোচনের, নিরুদ্দেশ মহিমেরও পরে আর্বিভাব ঘটল তার জেলে যাবার কাহিনি জানা যাওয়ায়, লক্ষ্মী গাঁদা গজেনেরা কতবার এল গেল—কিন্তু এ বাড়ির মানুষগুলিরও পরস্পরকে নিয়ে দিনযাপনের ছবি পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

মহিম বাড়ি নেই জেলে পচছে, তাই কি গাঁদাকে নিয়ে এত কথা ? ঘনরাম ঘরে আছে বলে দয়া একবার উঁকি দিয়েই হারিয়ে গেল ? আনন্দ বেদনা হাসি কান্নার তরঙ্গ কি ওঠে না তাদের জীবনে ?

সেই কাহিনিই বলে আসছি এতক্ষণ। এবার অল্পে অল্পে কাহিনি গুটিয়ে আনবার পালা, তাই সোজাসুজি বলে নিলাম। ঘরেবাইরে জীবনের গতি আজ একমুখী। সমস্ত সংঘাতের সেটা মোট ফল। কোনো জীবনে গতিটা স্পষ্ট, কোনো জীবনে ইঙ্গিতমাত্র। কিন্তু সেই ইঙ্গিতটুকুতে নিহিত আছে ভবিষ্যৎ। কচুবনে মাথা তুললেও মহীরুহের চারাটিতে তার আগামী বিরাটত্বই আসল কথা।

গাঁয়ের কোণে বেড়ার আড়ালে যার জীবন কাটল তার জীবনেও সমগ্র জীবনের একমুখী গতির সঞ্চারটুকু বড়ো কথা।

দয়াকে ধরেই দেখা যাক। অনেক শতাব্দীর জমাট অন্ধকারের জীব দয়া।

গাঁদার বয়সি একটি সতীন হয়েছিল দয়ার। তার ডাক নাম ছিল বেঙি। যে কটা বাস্তব কারণে চাষির ছেলে একটা বউ থাকতেও আবার বিয়ে করে তার মধ্যে খুব জোরালো কারণটাই ছিল ঘনরামের স্বপক্ষে।

দয়ার ছেলেমেয়ে হয়ে বাঁচত না। এমনি দয়াকে পছন্দই করত ঘনরাম কিন্তু ছেলেমেয়েকে জন্ম দিয়ে বাঁচাতে না পারায় ঘনরাম বড়োই অসুখী হয়েছিল, বড়োই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল দয়ার ওপর।

গর্ভে সন্তান এসেও জন্মলাভের পর যার সন্তান বাঁচে না তার চেয়ে অভিশপ্ত স্ত্রীলোক জগতে আছে কী ?

সে যদি পুরুষত্ব হারাত, সন্তানের জন্ম দেবার ক্ষমতা হারাত তাহলে অন্যকথা ছিল। এ তো দেখাই যাচ্ছে যে সে ঠিক আছে—গর্ভসঞ্চার করতে পারছে দয়ার। দয়ার দোষেই নিশ্চয় বাঁচে না ছেলেমেয়ে।

সুখদা ছিল একটু তেজি ধরনের মেয়ে। লক্ষ্মী বা গাঁদার মতো না হলেও তার তেজ ছিল। এই তেজটুকু না থাকলে হয়তো সে নির্জন পুকুরঘাটে হাতমুখ নেড়ে কথা কইতে যেত না একটা ব্যাটাছেলের সঙ্গে—হোক সে ব্যাটাছেলেটা তার ছেলেবেলা থেকে জানাশোনা মানুষ।

আসলে সুখদার ওই তেজটুকুই পছন্দ হচ্ছিল না ঘনরামের। সে গিয়েছিল কৃষ্ণের মতো প্রেম করতে তার রাধিকার সঙ্গে, সুখদা কোথায় জগৎটা দেখবে ঘনবামময়, কেঁদে গলে গিয়ে বলবে দিনরাত তোমার সঙ্গে থাকতে না পেয়ে মরে যাচ্ছি গো, তুমি আমার বাঁচন-মরণ সর্বস্ব—তার বদলে সে করত হাসি-তামাশা ছল-চাতুরী।

ছুতো পেয়েই সে তেজি মেয়েটাকে বাতিল করেছিল। ঝাল ঝেড়েছিল তার নামে মিথ্যা বদনাম রটিয়ে। যার ফলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধার মতো শত্রুতা বেধেছিল লোচন আর রাজেনের পরিবারের মধ্যে। ভীরু নিরীহ সরলা অবলা অর্থাৎ বোকা নম্র দয়াকে ভালো লেগে গিয়েছিল ঘনরামের। এতটুকু তেজ নেই। আমি তোমারই দাসী। তুমি যা বলবে তাই সই। মারলে কাটলে অনাদর করলে কাঁদব—আর কী করব বলো ? কাঁদা ছাড়া আমার গতি কী আছে ? তুমি আমার দেবতা।

দয়া নিজেই বলত, আবার বিয়ে করো।

সাধ করে কী আর কেউ সতীন বরণ করে ? দয়া আতঙ্কের চাপে বলত। এমনিভাবে ছেলেপিলে হয়ে মরতে মরতে চললে কোথায় গিয়ে চড়বে ঘনরামের বিরক্তি আর আক্রোশ তার ঠিক কী ?

তবু অনেক বিষয়ে তার মান রেখে চলত ঘনরাম, তার সঙ্গে পরামর্শ করত সংসারের সমস্যা নিয়ে, এখনও করে। তাকে যে খুশি রাখতে চায়, তার জন্য সে দরদ আছে লোকটার তার ঢের-ঢের প্রমাণ মেলে, কষ্টকর জীবন যাপনের দিনেরাত্রে। কিন্তু এক একটা সন্তান মরেছে আর বৈরাগ্যে

স্বামীর মন যে কত দূরে সরে গেছে তা কি আর টের পায়নি দয়া। কবে শুরু হয়েছিল তাদের একত্র জীবনযাত্রা ? মনে করতে পারে না দয়া। এত বছরের হিসাব কেউ রাখতে পারে। সন্তানের বয়স দিয়ে যে ধারণা করবে তাও তার হবার নয়, বিয়ের চার-পাঁচবছর পরে মানতের সন্তান এসেছিল, বাঁচেনি। আরেকটা এসেছিল কতদিন পরে ? কে জানে, সে ব্যবধান স্রেফ ভুলে গেছে দয়া। সেটাও বাঁচেনি। আর মানত করেনি দয়া।

গান্ধী মহারাজা তখন ডাক দিয়েছেন খাজনা দিয়ো না পাপী ইংরেজ রাজাকে, ভগবানের বিধান হয়েছে স্বরাজ হবে। ঘনরাম বড়ো উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। জেলে যাবার আগে বলেছিল একদিন, দেবতার কাছে আর মানত কোরো না বউ। দেবতা দেয় দিক, না দেয় না দিক, দিয়ে দিয়ে কেড়ে নিক, যা করবার করুক দেবতা মানত ছাড়াই।

বলেছিল, ছেলে হয়ে বাঁচে না বলে ফের বিয়ে করব ? মাইরি না !

বলে জেলে গিয়েছিল দু-মাসের জন্য।

বিরূপ দেবতাটার কাছে আর মানত করেনি দয়া। দু-দুটো শোকার্ত বীভৎস ফাঁকিতে তার ভক্তি শ্রদ্ধা টুটে গিয়েছিল সেই দেবতার ওপর। তবে একেবারে মানত না করে সে পারেনি। সাতনালির বড়ো শাসমলদের ছোটো মন্দিরের মেয়ে দেবতার নামে মানত করেছিল—দুটো সন্তান মরে যাওয়ায় কী ভয়ংকর বিদ্রোহ দয়ার !—মানত করেছিল একদলা মাটি, একশো তেঁতুলবীচি, দশটি কলকে ফুল আর ছেলে যদি বেঁচে-বর্তে থাকে তবে তার পাঁচ বছর বয়সে একটি কাঁচা-কুমড়ো। এখন মাটি খাও বীচি খাও ফেল্‌না ফুল খাও দেবী, যদি খাবার সাধ থাকে তবে তার কোলে ছেলে দিয়ে পাঁচ বছর বাঁচিয়ে রাখো, কুমড়ো মিলবে ! দেবী হও আর যাই হও, ফাঁকি দিলে চলবে না দয়াকে।

জেল থেকে বেরিয়ে স্বরাজ ফসকে যাবার হতাশার প্রতিক্রিয়ায় কিনা বলা যায় না, আরেকটা বিয়ে করার মতলব ঘনরাম স্থির করে ফেলেছিল।

দয়ার অনুমতি নিয়ে তো বটেই, অনেকটা তার তাগিদেই ঘনরাম বিয়ে করেছিল রামপুরের কার্তিকের মেয়ে বেঙিকে। বড়ো মধুর ক্ষমাশীল প্রকৃতি দয়ার। কিন্তু সতীন আসবার সব ঠিকঠাক হবার পর হঠাৎ কেমন বিগড়ে গিয়েছিল দয়া, থেকে থেকে গালাগালি করেছিল ঘনরামকে, স্পষ্ট ঘোষণা করেছিল সে যে ভাবে হোক মারবে সতীনকে, মারবেই। কেঁদেছিল, অভিশাপ দিয়েছিল অদৃষ্টকে।

ঘনরাম বলেছিল, তবে নয় থাক !

থাক ! ভেঙিয়ে বলেছিল দয়া।—বিয়ে যেন ঠেকে থাকবে ! মাঝ থেকে মরণ হবে মোর। মোকে মেরে ড্যাংডেঙিয়ে বউ আনবে তুমি।

তার সম্বন্ধে দুর্ভাবনা ছিল সকলের কিন্তু বউ নিয়ে ঘনরাম ফিরে আসতে দেখা গেল তার এতটুকু রাগ নেই, ঝাঁঝ নেই। তারপর একদিনও আর সে হিংসায় পাগলের মতো ছটফট করেনি ওই কয়েকটা দিনের মতো। বেঙিকে সে কাছে ডেকে বসাত, তাকে দিয়ে উকুন বাছাত, তেলের অভাবে শুধু জল দিয়ে চুল বেঁধে দিত। কোনো রাতে শোয়ার আগে ঘনরাম বসে তার সঙ্গে দু-দণ্ড কথা কইত সংসারের নানাবিষয়ে, ভাব দেখাত যে বেঙির দিকে নজরও নেই খেয়ালও নেই বেঙির কথা। দয়া হাই তুলত, ঘুম পেয়েছে জানিয়ে শাশুড়ির বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ত। বেঙিকে বলে যেত, যা যা, শো গে যা কালামুখী। বছর ঘুরতে যদি কোল খালি রয়, তোর মাথা ছেঁচে দেব।

তিন বছর পরে দশ মাসে ছেলে হতে গিয়ে বেঙি মরে গিয়েছিল। তখন মানতে হয়েছিল ঘনরামকে যে ছেলে হয়ে না বাঁচাটা দয়ার দোষ নয়। তারই ছেলেপিলে বাঁচবে না এটাই অদৃষ্টের বিধান।

ঘনরাম প্রাণপ্রণে চাষ করে, উদয়াস্ত সংসারে কাজ করে দয়া। ভারী ভারী সব কাজ। ম্যালেরিয়া কাবু করেছে লোচনের বউকে—সে বেশি খাটতে পারে না। তবু মনে হয় গাঁদাকে সামলে চলা ভুলিয়ে রাখা চোখে চোখে রাখাই যেন দয়ার আসল কাজ। গাঁদাকে দিয়ে সে হাল্‌কা কাজ করায়, তার সঙ্গে ঘাটে যায়, এক সাথে খায়, তার চুল বেঁধে দেয়—আর বুঝিয়ে সুঝিয়ে বকুনি দিয়ে শাসিয়ে তাকে আয়ত্তে রাখতে চায়।

জ্বালার তার শেষ নেই ছোটো জা-টিকে নিয়ে। তার অবাধ্যতা আর ধিঙ্গিপনা গায়ে তার জ্বালা দেয় রোজই।

ভাসুরের সঙ্গে সে কথা বলবে যে বলবেই ! ঘোমটা টেনেই কথা বলে বটে কিন্তু কী দরকার তার সোজাসুজি ঘনরামের সঙ্গে কথা বলার ? কিছু বলার থাকলে দয়ার মারফতে বললেই হয় !

একলা এ বাড়ি ও বাড়ি যাবেই—নন্দ ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত যাবে ! দয়াকে কিছু না বলে এক ফাঁকে চলে যাবে। তোর ভয়ডর নেই পোড়ামুখী ? একলাটি পেয়ে একদিন তোর দফা যে নিকেশ কববে কেউ।

অত বুকের পাটা নেই কারও। ছিঁড়ে টুকরো টুকবো করে ফেলবে না গাঁয়ের মানুষ ?

শ্বশুর শাশুড়ি কিছু বলে না। শাসন করতে বললে বলে, না বাছা, শাসন-টাসনে কাজ নেই। দিনের বেলা একটু ইদিক-উদিক যায় যদি তো যাক। লক্ষ্মী টো টো করে বেড়াবে, দিন নেই রাত নেই, এইটুকুর জন্যে ওকে কী বলে শাসন করবে গো ?

ওমা ! লক্ষ্মীর সঙ্গে ওর তুলনা ?

লোচন বলে, তুমিই শুধু অবুঝ রইলে বাছা। ঘনরাম বলছিল এবার ধান কেড়ে নিতে এলে হাঙ্গামা হবে দর নিয়ে। ছুঁড়ি যদি বেঁকে বসে, যদি বলে ধান পাহারা দেব, সোয়ামিব কাছে জেলে যাব ? কী বলে তুমি ঠেকাবে ওকে ? বেঁধে রেখে ঠেকাতে পারবে ?

ঘনরামকে বলতে গেলে সে খানিকক্ষণ নিজেব মনে হুঁকোই টেনে যায়।

হুঁকো নামিয়ে বলে, নাঃ, কিছু বলতে হবে না। নিজের মনে আছে থাক, নজর তো রাখাই হচ্ছে।

দয়া রেগে বলে, আমি পারব না নজর রাখতে। তুমি সামলাবে তোমার ভায়ের বউকে।

তাই সামলাব নে, তোর অত মাথাব্যথায় কাজ নেই।

খুব মজা লাগবে না ?

এক থাব্‌ড়া মারব কিন্তু দয়া। যার বউ সেই নিজে বলে পাঠিয়েছে, মোদের অত বাহাদুরি কীসের ?

শুনে সব ভুলে যায় দয়া।

বলে, বলে পাঠিয়েছে ? ছোটোকত্তা নিজে ? কবে গো বলে পাঠাল ?

ঘনরাম ধীরে ধীরে বলে, ধান নিয়ে বিষম হাঙ্গামা হতে পারে। বাবা বললে কী, নিজেও ভাবলাম কী, বাপের বাড়ি নয়তো অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেব নাকি জিজ্ঞেস করলে হত মহিমকে। পাগলাটা জানিয়েছে কি জানো ? ওর বউ যদি পালায়, জীবনে আর মুখ দেখবে না বউয়ের।

দয়া ধাঁধায় পড়ে বলে, কী করে খবর দিলে ? মোদের না খবর দেয়া নেয়া বারণ ? জেলে গেছে মোরা জানি টের পেতে দেওয়া চলবে না ঠাকুরপোকে ?

কৈলাস কীভাবে যেন চিরকুট পাঠিয়েছে, জবাব আনিয়েছে। মোরা যেন জানতে চাইনি, কৈলাস নিজে শুধিয়ে পাঠিয়েছিল।

দয়া মুখ বাঁকিয়ে বলে, কী যে কাণ্ড তোমাদের বুঝিনে বাবা। বাপ রয়েছে, বড়োভাই রয়েছে—বউকে বাপের বাড়ি পাঠাবো কিনা হুকুম চাইতে হয় !

তা শুধোতে হবে না ? মনের খেদে ছোঁড়া রোজগার করতে ঘর ছেড়েছিল, সেটি ভুললে চলবে নাকি ? বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেব—ছোঁড়া ভাববে এই অজুহাতে ভাতকাপড় দেবার দায় কাটিয়েছি।

দীপের আলোয় তারা কথা কয়। ঘনরাম ভাবে কে জানে কীভাবে বাপের ঘরের মায়া একেবারে কেটে গেছে দয়ার ! আগে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য সে যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত, এই নিয়েই তাদের ঝগড়া হত সবচেয়ে জোরালো। আজ কতকাল সেই দয়া বাপের বাড়ির নামও করে না ! এ মাসেই তার নিজের বোনের বিয়ে, ঠিক ধানকাটার সময়। বোনের বিয়ে সোজা ব্যাপার ! আগে হলে দয়া কমপক্ষে এক মাস আগে বাপের বাড়ি যাবার জন্য পাগল হয়ে উঠত।

এবার সে নিজেই ঠিক করেছে ঘনরামের সঙ্গে ঠিক বিয়ের সময় দু-চারদিনের জন্য যাবে, তার সঙ্গেই ফিরে আসবে। যদি অবশ্য যাওয়া হয় ঘনরামের। জোর করে ধান কেনা নিয়ে ও সময়টা হাঙ্গামা হলে হয়তো তার যাওয়াই হবে না শালির বিয়েতে।

দয়াও যাবে না তাহলে !

গাঁদার জন্য খুঁতখুঁতানি হয়তো একটু আছে তার মনে। ঘনরাম যে সে রকম মানুষ নয় একেবারে, গাঁদাকে নিয়ে কোনো রকম কুচিন্তা মনে আসা দূরে থাক এ রকম বীভৎস চিন্তার ছায়াটুকু মনে এলে গা যে ঘিনঘিন করবে—এটা দয়ার ভালো করে জানা আছে, তবু। পুরুষ সম্পর্কে ওই যে একটা কথা বলা হয় যে মুনিরও মতিভ্রম ঘটে, পুরাণে যার অনেক কাহিনি আছে, সে কথাটা বেচারা একেবারে বাতিল করে দিতে পারে না। আগে থেকে কিছু ভেবেচিন্তে নয়, তিলমাত্র কামনা কখনও স্বপ্নেও জেগেছে বলে নয়, কোনো এক অলক্ষুণে মুহূর্তে ঘটনাচক্রে হঠাৎ যদি অঘটন ঘটে যায়।

হ্যাঁ, ও রকম ঘটতে পারে। শুদ্ধ পবিত্র ব্রাহ্মণ গুরুঠাকুর, বিয়ের আগে সেদিন পর্যন্ত যার মনে কোনো রকম মন্দ ভাব আসা সত্যসত্যই অসম্ভব ছিল—পুকুরঘাটে তাকে নাইতে দেখে সেই দেবতা মানুষটার মাথাও হঠাৎ বিগড়ে গেল।

দয়া নিজেই ঘনরামকে বলেছে যে, নাঃ, এটা দোষ নয় পুরুষ মানুষের। ভগবান এমনই ধারা বিধান করেছেন, যত পুরুষ আছে সবার জন্য করেছেন, পুরুষেরা করবে কী ?

কিন্তু এই খুঁতখুঁতানিটাই সব নয়, আসল কারণ নয়। লক্ষ্মী আছে শাশুড়ি আছে, গাঁদা নিজে শক্ত তেজি মেয়ে, ঘটনাচক্রে যদি কিছু ঘটে শুধু সেই সুদূর সম্ভাবনাকে খাতির করে দয়া বাপের বাড়ি যাওয়া খারিজ করত না। একটু খুঁতখুঁতানি নিয়েই কবে সটান রওনা দিত।

ঘটনার পর ঘটনা ঘটেছে। শুধু গাঁয়ে নয়, আশেপাশে নয়। শুধু গজেনের পা খোঁড়া হওয়া নয়, লক্ষ্মীর গায়ে কাঁটা দেবার ব্যাপার নয়, মহিমের ঘর ছাড়া নয় ! একেবারে বাদ যাক না এই বড়ো বড়ো বিশেষ ঘটনাগুলি—ধরা যাক এ সবের একটাও ঘটেনি কোনোদিন।

সেদিন রাতে হঠাৎ জীবন এলে যা কিছু ঘটেছিল, জীবনের পায়ের জন্য চুন হলুদ গরম করে গরম ভাত আর মাছের ঝোল রেঁধে খাওয়াতে হয়েছিল—তাও নয় বাতিল হোক।

আজ রাতের মতোই সাধারণ ঘটনা কত রকমভাবে যে ঘটে আসছে কতকাল ধরে।

ঘনরাম কী ভালোবাসে দয়াকে। জোয়ান চাষার জবর ভালোবাসা বুঝি সময় সময় জমির জন্যে নিরেট ভালোবাসাকেও ছাড়িয়ে যায়। কথা কইতে কইতে কলকের তামাকটুকু পুড়ে গেলে ধীরে ধীরে সে আরেক চিলুম তামাক সাজে, চোখ তুলে তুলে দীপের আলোয় সে দয়ার দিকে চায়। কলকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে তাকায়। আগুনের মৃদু রাঙা আলোয় এবার যেন ছবির রাজার মুখের মতো তেজবীর্যে ভরা মনে হয় শ্রান্ত স্বামীর মুখখানা দয়ার কাছে—চাউনি দেখে তার রোমাঞ্চ হয়।

কিছু বলে দিতে হয় না দয়াকে। তারই নিয়ম রীতি ব্রত উপোসেব খাতিরে খাতিরে সাতদিন সাতরাত ঘনরাম তাকে আঙুল দিয়ে ছোঁয়নি। শান্ত চোখে চেয়েছে, অক্লেশে শ্রান্তি নিয়ে ঘুমিয়েছে, তার মধ্যে তিনরাত্রি চোর ধরা পড়াব হাঙ্গামায় কলেরা রোগে একজন মারা যাওয়ার হাঙ্গামায় আর পল্লি সহায়ক সংঘের বাঁদর কটার হাঙ্গামা বাঁধানোর হাঙ্গামায় উঠে গিয়ে দু-চারঘণ্টা বাইরেও কাটিয়ে এসেছে।

বাঁচবে না জানা কথা, তবু কোলে নিতে হয় মাই দিতে হয় মানুষ করতে হয় পেটের নতুন বাচ্চাটাকে। কোলের ঘুমন্ত ছেলেটাকে শুইয়ে দেবার ছলেই যেন আলুথালু হয়ে যায় দয়ার পরনের ছেঁড়া কাপড়খানা। কতকাল ঘনরাম তাকে নতুন একটা কাপড় দেয়নি ভেবে হঠাৎ রাগ করতে গিয়ে সে থেমে যায়।

নিজের কাপড়ের কথা ভাবতে গিয়ে এতক্ষণে তার চোখে পড়েছে যে অঘ্রান মাসে ঘনরামের পরনে শুধু একখানি গামছা।

দুধ খায় না, মাছ খায় না, দু-বেলা পেট ভরে ভাত খায় না, গায়ে একটু তেল মাখে না—হাড় বেরিয়ে আছে কণ্ঠার—তবু রোগা শিবের মতো কী জমকালো চেহারা মানুষটার !

ঘনরাম বলে, জানো, কাগজে নাকি এক খবর বেরিয়েছে মজাদার। কেউ কেউ ফের বলছে ভীষণ খবর। দুপুরবেলা রসিক খুড়োর দাওয়ায় খুব জটল্লা হয়েছে।

কী খবর ?

ছেলেপিলে হওযা বন্ধ না করলে নাকি মোদের দুর্দশা ঘুচবে না। বড্ড বেশি লোক বেড়ে গেছে দেশে—এত লোকের খাবার নেই। তাই দুর্ভিক্ষে লোক মবে। এটা শুধু খবর এসেছে—এবার নাকি হুকুম হবে আইন হবে—ছেলেমেয়ে হতে পারবে না কারও, কন্ট্রোল ব্যবস্থা হবে।

হঠাৎ হা হা করে গলা ছেড়ে হাসে ঘনরাম। হুঁকোটা রেখে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে উবু হয়ে বসে দয়াব পা ধরতে যায়।

পায়ে হাত দিয়ো না !

পরে মোকে দশবার প্রণাম করিস। হাজাটা দেখি।

দয়া আর কথা কয় না। স্বামীকে পায়ে হাত দেবাব অবাধ অধিকার দেয়। পায়ের পাতা দুটো তার হাজায় পচে যেতে বসেছে। বর্ষাকালে তো মনে হয়েছিল হাজায় পচা পা দুটো কেটে বাদ দিলেই বুঝি বাঁচা যায়।

প্রদীপ থেকে তেল নিয়ে পায়ে মাখিয়ে দিতে দিতে বলে, এ রোগের চিকিচ্ছে নেই।

জল না লাগালেই সেরে যায়—হয় না।

তাই তো বলছি চিকিচ্ছে নেই।

তা যদি বল তবে কোন রোগটার চিকিচ্ছে আছে গবিবের ? হাজায় পা শুধু একটু পচে—বনমালীর বউটা ?

স্মরণ করেই চোখ বুজে শিউরে ওঠে দয়া—ঘনরামেব ভালোবাসার চাউনি দেখে যে রোমাঞ্চ হয়েছিল ঠিক তার বিপরীত শিহরন। আঁতুড়ে পচে যাচ্ছে বনমালীর বউ,—পচতে পচতে মরে যাবে। আজ দুপুরে দেখতে গিয়েছিল দয়া। পচনধরা দেহটার সে কী দুর্গন্ধ—নিশ্বাস আটকে যায়।

এক রকম ওষুধ আছে—গা ফুঁড়ে দিতে হয়। পুজোর আগে তার দু-পা ভীষণ দুনিয়ে উঠলে নন্দ ডাক্তার তাকে দিয়েছিল। রবারের মোটকা আটা সুন্দর ছোট্ট শিশির ওষুধ। খালি শিশির একটাতে গজেন নস্যি রাখে।

দু-এক টাকায় হবে না—কয়েকটা দিতে হবে—বনমালীর সে সাধ্য নেই। বউটা মরবে ? উপায় কী !

ঘরে ঘরে অমন কত মরছে।

যা কিছু বেচবার ছিল বনমালী বেচে দিয়েছে। অঘোরের সোমত্থ মেয়েটা মরল কেন অবিরাম জ্বরে ? অব্যর্থ ওষুধ আছে, জ্বর সারিয়ে দেয়। কিন্তু ওষুধ থাকলে হবে কী ? একটার দামই তিরিশ টাকার মতো।

দয়া কিন্তু একটা খুঁত বার করে। বলে, তা কতকটা বটে, কিন্তু মেয়ে বলেই পারল না অঘোর। ছেলের হলে গয়না বেচে ওই ওষুধটাই দিত।

গয়না বেচতে হয়েছে। এমনি চিকিচ্ছের কম খরচ ?

বউয়ের হাতে বালা আছে। ছেলের হলে ওটাও বেচে দিত।

এ কথায় সায় দেয় ঘনবাম। দয়া তার আসল কথা প্রতিবাদ করেনি, সে বলছে অন্য কথা, সংসারে ছেলে আর মেয়ের জীবনের দামের তফাতের কথা। রোগের অব্যর্থ ওষুধ থাকলেও, আপনজনের প্রাণ বাঁচানোর সুনিশ্চিত উপায় আছে জানলেও অঘোরের মতো সাধাবণ অবস্থার মানুষ পর্যন্ত সে সুযোগ নিতে পারে না। দশ দিকের টান সামলে চলতে হয় তাকে, পঞ্চাশ ষাট টাকা চালের দরের মতো সব মারাত্মক টান। গরিবের আর কথা কী।

এ নিয়ে তার সঙ্গে মতভেদ নেই দয়ার।

কাল পরশুই যে খেতের ধান কাটা শুরু করতে হবে এ বিষযেও নয়। তাই, ধান আর ধান সিজ করা নিয়ে গোলমালের সম্ভাবনার কথা বলতে বলতে তারা ঘুমিয়ে পড়ে।

দুজনেই ভালোবাসা ভুলে গেছে !

কত স্থূল নীরস জীবন দয়ার !

জাঁকালো প্রতিবাদ সভা হবে ও বেলা, গাঁদাব প্রাণে পর্যন্ত উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে টের পাওয়া যায়, দযাব মধ্যে যেন কোনো সাড়া নেই। পা টেনে টেনে সে সংসারের কাজ করে যায়, মাঝে মাঝে চিন্তিতভাবে গাঁদার দিকে তাকায়।

বলে, তোর সভায় গিয়ে কাজ নেই আজ, বুঝলি ? হাঙ্গামা হবে। অত মদ্দানি দরকার নেই।

গাঁদা কথা কয় না।

দয়া তার মানে জানে। ফাঁক পেলেই তার চোখ এড়িয়ে গাঁদা সভায় পালাবে, মেয়েদের মধ্যে যতদূর সম্ভব সামনে এগিয়ে বসবে, মন দিয়ে বক্তৃতা শুনবে যাত্রা শোনার মতো ! ক্ষমতা থাকলে চ্যালাকাঠ দিয়ে গাঁদার পিঠের চামড়া দয়া তুলে নিত।

লক্ষ্মীর পাত্তা পেযেই সে ঝেঁঝে ওঠে, কী যে আরম্ভ করেছিস তোরা, মেয়ে বউ ঘবে থাকতে দিবি না।

লক্ষ্মী বলে, তোমাকে আবার কে ফুসলাবার ফিকিরে আছে গো ?

গাঁদাকে চোখে চোখে রাখে, দুপুরে পাশে নিয়ে একটু শোয়।

গাঁদা বলে, এই মুখপুড়িটার জন্যে তোমার এত দরদ কেন দিদি ?

দরদ না তোর মাথা। বিগড়ে না যাস দেখতে হবে তো। যার জিনিস সে এসে অনুযোগ দিলে কী বলব ?

ঘাট থেকে আসি বলে গাঁদা যথাসময়ে গিয়ে লক্ষ্মীর আঁচল ধরে। লোচন যাবে না বলেছিল, তার শীত করে জ্বর এসেছে। শেষ মুহূর্তে সেও গুটিগুটি সভার দিকে রওনা দেয়। জ্বর তো লেগেই আছে, ঘরেও শুয়ে বসে থাকতে হবে, তার চেয়ে ভালো করে কাপড় গায়ে জড়িয়ে সভার একধারে গিয়ে বসলেই বা ক্ষতি কী ! বাড়িটা যেন খাঁখাঁ করে সভার সময় ঘনিয়ে এলে।

দয়া হাই তোলে। পচাটে পা দুটোর দিকে তাকিয়ে সুর করে একটা ছড়া বলার ছলে একটু চোখের জল ফেলে নেয়। খানিকটা পাট টেনে নিয়ে পায়ে জড়িয়ে বাঁধতে আরম্ভ করে।

পায়ে পাট বেঁধে বাচ্চাটাকে কাঁখে তুলে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দয়া সভার দিকে রওনা দেয়। হাঁটতে কষ্ট হয় কিন্তু কষ্ট ঘরের কাজের জন্য হাঁটতেও যথেষ্ট হয়।

সভায় পা টেনে টেনে হেঁটে যেতে আর কতই বা কষ্ট হবে !

কৈলাস আর লক্ষ্মীর মাঝখানে দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের মনের যুগ যুগান্তরের সংস্কার আর কুসংস্কারের স্তূপ, জনতাকে না ডিঙিয়ে তাদের মিলনের উপায় নেই।

কিন্তু শুভর হল কী ? মায়াকে নিয়ে ঘর বাঁধার এত সাধ বুকে নিয়ে তার ঠেকেছে কীসে ? বাপের আছে জমিদারি, ব্যাংকে আছে টাকা, নিজের আছে দামি ডিগ্রি আর মায়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে রাতজাগা প্রেম।

মায়াও যে দিন গুনছে, তার টালবাহানায় তার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এটাও তো স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

রাত্রে একা ঘরে এক-একদিন মায়ার জন্য শুভর ব্যাকুলতা এমন গভীর হয়, বহু রাত্রি পর্যন্ত নিদারুণ আতুরতার পর এমন একটা কষ্টকর হতাশা আর অবসাদ নেমে আসে যে বৈজ্ঞানিক মানুষটা বাইরে গিয়ে আকাশের সবচেয়ে দূরের তারাটির, শেষ তারাটির ওপারে যে মহাশূন্যতা আছে তার মানে এবং সচেতন মানুষের জীবনের মানে একসঙ্গে ভাববার চেষ্টা করে।

পরদিন শরীরটা রীতিমতো অসুস্থ মনে হয়।

অথচ মায়ার কাছে গিয়ে একবার মুখ খুললেই হয়। একটা দিন ঠিক করে বিয়েটা চুকিয়ে দিলেই হয়।

কিন্তু শুভর ভরসা হয় না হঠাৎ কিছু করতে। নিজে কী করবে জীবনে ঠিক করতে পারেনি। তার মানে তার জীবনের কোনো ভিত্তিই এখনও নেই। কোন সাহসে সে আরেকটা জীবনকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াবে ? তার যদি এই অনিশ্চয়তা, জীবনে কী করবে মায়া সেটা তো জানাই সম্ভব নয়।

দুজনের ভিত্তিহীন জীবনের এই অনিশ্চয়তা কী অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে কে জানে !

বাসনের কারখানার ঝোঁক তার কেটে গিয়েছে। ওটা এখন দাঁড়িয়ে গিয়েছে একটা ফাঁদে।

মনটা তার বিগড়ে গেছে, পালটে গেছে। কেন যে কাঁসার বাসনের কারখানার খোলার ঝোঁক চেপেছিল এখন সে নিজেই বুঝতে পারে না !

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কুড়িয়ে নিয়ে এসে অন্তত প্ল্যাসটিক্‌সের বদলে কাঁসার বাসনের কারখানা খোলা ! যে কাজ অনেক গেঁয়ো মূর্খ মানুষও পারত !

মনে মনে সে ভাবে, একেই বলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অভিশাপ ! চোখ-কান বুঁজে দেশকে ভালোবাসার কুসংস্কার। ভেবে নিজেকে ধিক্কার দেয় যে ছি, আমিও এ কুসংস্কার থেকে মুক্ত নই !

মনে হবে এ তো সত্যই তাজ্জব ব্যাপার ! স্বাধীন দেশের ছেলেদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক পরীক্ষার কম্পিটিশনে এত বড়ো ডিগ্রি ছিনিয়ে নিয়ে এল, অথচ তার একবার খেয়াল হল না যে দোষটা জাতীয়তাবাদেরও নয়, দেশকে ভালোবাসার কুসংস্কারেরও নয়, কোনোদিকে তার কোনো সুযোগ না থাকাটাই আসল কথা ? তার এত দামি বিদ্যাকে সত্যিকারের কাজে লাগাবার কোনো সুযোগ সুবিধার

ব্যবস্থা থাকলে তো বলাই যেত যে অন্তত সামনে দোয়ানো খাঁটি দুধের মতো খাঁটি স্বাধীনতা পাওয়া গেছে !

গোরুকে মুখ দিয়ে বিশেষ বিশেষ খাদ্য খাইয়ে আইনসঙ্গত উপায়ে দুধটা জোলো করে বাড়িয়ে নেবার প্রক্রিয়াটা না হয় মার্জনীয় হত।

বাসনের কারখানা সম্পর্কে শুভর বিরাগ টের পেলেও তার মনের কথাটা কেউ জানতে পারেনি। শুভ মুখ ফুটে কিছুই বলেনি কাউকে। কোন মুখে বলবে ? কী ভাববে সকলে ?

লোকসান দিয়ে চালাতে হলেও বাসনের কারখানা বন্ধ করে সকলের কাছে সে খামখেয়ালি বনতে পারে না, হার মানতে পারে না। এটা থাকবে, একটা আনুষঙ্গিক প্রচেষ্টা হিসাবে, সাইড লাইন হিসাবে থাকবে। এবার ভেবেচিন্তে সে এমন কিছুতে হাত দেবে যা তার জীবন ও প্রতিভা দুয়ের সঙ্গেই খাপ খায়। সেটা কী সে জানে না। কবে জানবে তাও জানে না। এই শেষের অনিশ্চয়তাই তাকে পীড়ন করছে সবচেয়ে বেশি।

আজকাল সে ঘন ঘন কলকাতায় যায়। কোনোদিন ফিরতে রাত্রি গভীর হয়, কোনোদিন রাত্রে ফেরে না। আত্মীয়বন্ধুর বাড়িতে অথবা হোটেলে রাত কাটিয়ে দেয়।

তবে পরদিন কাজ আরম্ভ হওয়ার আগেই নব-শিল্প মন্দিরে হাজির হয়। বেশি ক্ষণ থাক বা না থাক কারখানায় সে প্রতিদিন একবার যায়।

কৈলাসের বেলা বলা যায় যে সে শহরে থাকে বেশি, গাঁয়ে থাকে কম। কিন্তু প্রাণেব টানটা তার গাঁয়ের দিকেই বেশি এবং সেটা কেবল লক্ষ্মীর টান নয়।

শুভও উভচরে পরিণত হয়েছে শহর-গাঁয়ের। তার বেলাতেও বলা যায় যে নব-শিল্প মন্দিরেব ফাঁদে আটকে গাঁয়ে থাকতে হলেও প্রাণের টানটা তার শহবের দিকে এবং সেটা কেবল মায়ার টান নয়।

গাড়ি নিয়ে প্রায় রোজ কলকাতায় যায় কিন্তু মায়াব সঙ্গে তার দেখা হয় মাঝে মাঝে। তাও অল্প সময়ের জন্য।

শহরে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজের জীবন ও প্রতিভা সার্থক কবাব সঠিক পথ। তাকে ঘুরতে হয়, নানা লোকেব সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা করতে হয়, নানা সম্ভাবনার বিষয় যতটা পারে যাচাই ও বিবেচনা করতে হয়—নিজের মনে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়। সে যে খুব ব্যস্ত তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তাই বলে মায়ার জন্য আরও বেশি সময় যে সে খরচ করতে পারে না তা নয়। জোরালো ইচ্ছা যে জাগে না তাও নয়। আসলে, মায়ার সঙ্গে বেশি ক্ষণ কাটালে তার ব্যাকুলতা বেড়ে যায়। ভিতরের অস্থিরতা বেশি রকম কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

মায়া কাছে থাকলে প্রতিটি মুহূর্তে সে অনুভব করে যে মায়া আশা করছে, একটু অধীরভাবেই আশা করছে যে এবার সে কিছু করবে। সেটা বড়োই পীড়াদায়ক হয় তার পক্ষে।

সাতদিন দেখা হয়নি দুজনের। রাত্রে হোটেল থেকে সে মায়াকে ফোন করে দেয় যে পরদিন সকালে সে তাদের বাড়িতে চা খেতে যাবে।

কোথা থেকে কথা বলছ ? হোটেল ? হোটেল কেন ?

সকালে কাজ আছে তাই ফিরে গেলাম না।

বেশ তো, কিন্তু হোটেল কেন ? এখানে আসতে পারলে না ? চলে এসো, রাত বেশি হয়নি।

শুভ বিব্রত হয়ে বলে, সকালে এখানে একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

বেশ তো, এখানে খেয়ে তুমি তোমার হোটেলেই ফিরে যেয়ো। খানিকক্ষণ গল্প করা যাবে।

সারাদিন ঘুরেছি, বড়ো টায়ারড্ ফিল করছি মায়া।

টায়ারড্ ফিল করছ নাকি ! আচ্ছা আমিই আসছি গল্প করতে।

ক্রোধে যে ব্যঙ্গের জন্ম তার সুরটা মায়ার গলায় এত স্পষ্ট হয় যে তার বেয়ে এসে শুভর কানে বাজে।

গল্প হয় না। মায়া এক রকম এসে পৌঁছেই জিজ্ঞাসা করে, এত ঘুরছ কেন ? ফ্যাক্টরির কাজে ?

না। বড়ো একটা প্ল্যান করছি।

মায়া আশ্চর্য হয়ে বলে, ওটা চালাবে না ?

চালাব বইকী। এটা তো একটা ছোটোখাটো সামান্য ব্যাপার, একটা একস্‌পেরিমেন্টের মতো। আমি আসল যেটা ধরব সেটা হবে আরও বড়ো সায়ান্টিফিক ব্যাপার। তোমরা বুঝি ভেবেছিলে, আমি সারা জীবন বাসন নিয়ে মেতে থাকব ?

মায়া ঠোঁট কামড়ায়। বেশ জোরের সঙ্গেই কামড়ায়।

এমন কিছু করব যা দেশটাকে এগিয়ে দেবে।

কী করবে ? এমন কিছুটা কী ?

মেজাজ সত্যি ভালো নেই মায়ার। নইলে এমন সুরে কথা কয়। বাসনের কারখানায় সেদিন লক্ষ্মীকে নিয়ে মায়ার মেজাজের কথা শুভর মনে পড়ে যায়।

শুভরও মেজাজ একটু চড়ে যায়।

এখনও ঠিক করিনি কিছু।

কবে ঠিক করবে ?

জানি না। তুমি এ ভাবে কথা বলছ কেন মায়া ? আমার প্রবলেমটা বুঝবার চেষ্টা না করেই রাগ করছ। কিছু ঠিক কবতে পাবছি না কেন তুমি হয়তো আমায় বলে দিতে পারবে !

মায়া স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, আমি ? আমি বুঝিয়ে দিলে তুমি বুঝবে তো, মানবে তো ? তোমাব আসল প্রবলেম কি জানো ? গেঁয়ো জমিদারের ছেলে, বেশি বিদ্যা শিখে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। কাল সকালেই একজন ব্রেন স্পেশালিস্টের কাছে যেয়ো, তিনি হয়তো তোমার প্রবলেম সল্‌ভ্ করে দিতে পারবেন।

বলে সেদিনকার মতো আজও মায়া গটগট করে তাকে যেন চিরতরে ত্যাগ করেই চলে যায়।

কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থেকে শুভ ভাবে, তবে আর কী, হাঙ্গামা তো চুকেই গেল। এবার একটু ড্রিঙ্ক করা যাক।

বয়কে ডেকে সে পেগ আনতে হুকুম দেয়, একটা পর আরেকটা। এবং অনভ্যস্ত দ্রব্যটার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তার মগজে ঘনিয়ে আসে একটা অদ্ভুত রকম মরিয়া ভাব। আরেকটা পেগ গিলে টলতে টলতে হোটেল থেকে বেরিয়ে সে গাড়ি হাঁকিয়ে দেয় ভূদেবের বাড়ির দিকে।

মায়াকে শাসন করতে হবে। বড়ো বেড়ে গিয়েছে মায়া। জীবনে সে যে বড়ো কিছু করতে চায় সেটা বুঝবে না, বুঝবে না যে তার মতো মানুষ আর দশটা বাজে ছেলের মতো শুধু মায়ার জন্যই যাহোক একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে পারে না—বিয়েটা কোনো রকমে হলেই যেন সব হয়ে গেল।

ভূদেব মুখ থেকে সিগার নামিয়ে বলে, ও ! এই ব্যাপার ! এসো এসো।

জিজ্ঞাসা করতে হয় না। শুভকে দেখেই সে ব্যাপার টের পায়।

শুভ জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, মায়ার সঙ্গে কথা আছে।

ভূদেব সায় দিয়ে বলে, হবেখন, হবেখন। খবর পাঠাচ্ছি। ঘরে এসে বোসো।

টেবিলেই দামি বিলাতি বোতল ছিল কিন্তু গেলাস ছিল মোটে একটা ! খুব ছোটো একটা গেলাস—যাতে ফোঁটা গুনে গুনে ঢেলে ঢেলে ভূদেব ধীরে সুস্থ বোতলের জিনিসটা খায়। না খেয়ে যে উপায় নেই তারই বিরুদ্ধে যেন তার এই সংগ্রাম।

নাঃ খাব না—আচ্ছা, অগত্যা খাচ্ছি—কিন্তু কয়েক ফোঁটার বেশি নয় !

যতক্ষণ না ঘুম আসে। যতক্ষণ না মুক্তি পাই।

এ জন্য বয় তাকে বোতল গেলাস আর সোডা সাইফনটি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পালিয়ে যায়। সাব আর তাকে ডাকবে না।

ভূদেব তা জানে। তাই নিজেই সে একটা গ্লাস এনে তাতে কয়েক ফোঁটা বোতলের জিনিসটা ঢেলে অনেকটা সোডা মিশিয়ে ভাবী জামাইয়ের দিকে এগিয়ে দেয়। বলে, তোমার গুরুজন প্রেজুডিস নেই আশা করি !

শুভ বলে, আমি কি কচি খোকা ? এতটা সোডা ঢেলে দিলেন ?

সরি। ভূদেব বোতল কাত করে শুভর গ্লাসের জলীয় পানীয়ে খানিকটা রং এনে দেয়।

আর দেব ?

সেই ঘরে একটি শয্যা প্রস্তুত থাকে। ফোঁটা ফোঁটা করে খেলেও যেদিন ভূদেব বিগড়ে গিয়ে বোতলটা গলায় কাত করতে আরম্ভ করে সে রাত্রে হঠাৎ কোনো এক সময়ে শয্যাশায়ী হয়ে ঘুমোবাব জন্য।

সেই শয্যায় রাতটা কাটে শুভর। মায়ার সঙ্গে ঝগড়া না করেই। নেশা চড়িয়ে তার মরিযা ভাবটা ঝিমিয়ে দিয়ে ভূদেব যে তাকে কত বড়ো লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে শুভব সেটা খেয়াল হয় পরদিন সকালে।

বেলায় দেখা হয় মায়ার সঙ্গে।

মায়া বলে, থাক, কৈফিয়ত দিতে হবে না। নতুন কিছুই কবনি, এর মানে সবাই বোঝে। এক হিসাবে অবশ্য আমার খুশি হওয়াই উচিত কিন্তু ভালোবাসার এ সব সেকেলে পচা প্রমাণ সত্যি আমার ভালো লাগে না। খিদে পেয়েছে, খাবার রেডি, তুমি উপোস করছ কেন সেটা বরং বুঝিয়ে বলো। আমিও খিদে নিয়ে উপোস করে চলেছি মনে রেখো কিন্তু।

শুভ জোর দিয়ে বলে, সে জন্য নয়। অত সহজ ব্যাপার হলে আমিই টের পেতাম। তুমি তো জানই আমি কেন ইতস্তত করছি। কী করব ঠিক করিনি, এমন কিছু যদি আমাকে ধরতে হয—

যদি !

শুভর হাসিটা বড়োই ম্লান দেখিয়েছিল।

যদির জন্য ভাবনা ছিল না। কয়েক রকম করার আছে তার মধ্যে কোনটা বেছে নেব ঠিক করতে পারছি না—মুশকিলটা তা নয়। ক্রমে ক্রমে আমার কি মনে হচ্ছে জানো ? পলিটিক্স ছাড়া আমার বোধ হয় অন্য গতি নেই—কিছুই করার নেই।

মায়া প্রায় চমকে গিয়ে বলেছিল, কেন ?

আর কিছুই করার নেই বলে।

বুকটা সত্যিই ধড়াস করে ওঠে মায়ার !

শুভ পলিটিক্স করবে শুনে নয়। করুক না যত খুশি পলিটিক্স, সে তো ভালো কথাই। কিন্তু পলিটিক্স ছাড়া আর কিছুই তার করার নেই, এ ঘোষণা শুনে মায়ার শক লাগে।

আবার কীসের ঝোঁক চাপল তোমার ? কোন পলিটিক্স করবে ভাবছ ? যাতে হয় গুলি খেয়ে নয় ফাঁসি গিয়ে মরতে হয় ?

তার মুখ তুলোট কাগজের মতো পাংশু দেখায়। দেখে শুভর হয় অন্য প্রতিক্রিয়া। হঠাৎ যেন রসাবেশের জোয়ার আসে তার চিন্তাক্লিষ্ট প্রাণে, খুশির সীমা থাকে না। লক্ষ্মীদের সঙ্গে মায়ার সে মস্ত এক মিল খুঁজে পেয়েছে। হঠাৎ আবিষ্কার করেছে এক আশ্চর্য বাস্তব সত্য ! বুদ্ধিসর্বস্ব পরিবারে ও পরিবেশে মানুষ হয়ে থাকলেও মায়া নিজে বুদ্ধিজীবিনী নয়—তারও জীবনের কারবার দেহগত আর হৃদয়গত।

বাপের পয়সা আছে, চাইল কালকেই সে ভালো চাকরি পাবে—তবু শুভকে অবলম্বন করা ছাড়া তার সত্যিকারের জীবন নেই।

সে হাসিমুখে বলে, ও সব নয়। তুমি তো জানো আমি কী চাই। এমন কিছু ধরব যাতে দেশও এগিয়ে যাবে, আমার কোয়ালিফিকেশনও সার্থক হবে। এ দেশে এ রকম কোনো পথ বোধ হয় খোলাই নেই আমার জন্য। সেই জন্যই খুঁজে পাচ্ছি না, বোধ হয় পাবও না।

তাই বলো ! তাতে এত বিচলিত হবার কী আছে ? আর কিছু না পাও, পলিটিক্স্ করবে ! বড়ো নেতা হয়ে দেশকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নেবে—

শুভর হাসিটা বড়ো ম্লান দেখায়।

কিন্তু ওটা যে অগত্যার পথ হচ্ছে মায়া। আমার জীবনের ফার্স্ট চয়েস তো ওটা নয়। মানুষ হয়েছি এক ভাবে, নিজেকে তৈরি করলাম এক ভাবে—আজ আবার একেবারে অন্য পথ ধরা কি সহজ কথা ? আমার কি করতে হবে পলিটিক্স ধরতে হলে জানো ? যে ভাবে বিজ্ঞান শিখেছি তেমনি ভাবে মেতে যেতে হবে, মনপ্রাণ দিয়ে যাতে ভালোবাসতে পারি পলিটিক্স, ওটাই যাতে জীবনে সবচেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। যে ধাত আমার নয়, সে ধাত গড়ে তুলতে হবে। এ বড়ো কঠিন কাজ।

অর্থাৎ যদি তোমাকে পলিটিক্স করতে হয়, জীবনে অন্য কিছুই থাকবে না ?

কী করে থাকবে বলো ? সে তো শখের ব্যাপার হবে না, ছেলেখেলা হবে না ? মনের মতো কাজ পেলেও কিছু কিছু পলিটিক্যাল ওয়ার্ক করতাম, কিন্তু সেটা হত আলাদা ব্যাপার। শুধু পলিটিক্স সম্বল করলে বিজ্ঞান শেখার মতো শিখতে হবে, নিজেকে বদলে নিতে হবে।

কথাটা বলা কঠিন নয়। সজ্ঞানে নিজেকে ফাঁকি দেবার মানুষ সে নয়। বিজ্ঞান সে শিখেছে সাধনার মতোই, রাজনীতি করতে নামলে সেটাও সাধনা করে তুলতে হবে বইকী। ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে জীবনটা সহজ করে মেনে নিতে পারলে তার আর সমস্যা কী থাকত !

বাসনের কারখানা করেছে, আরও কতদিকে কত কিছু করার আছে—কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হবে না এমন কিছু খুঁজছে বলেই তো মুশকিল !

মায়ার মুখও তাই ম্লান হয়ে যায়।

মায়া অবশ্য হাল ছাড়ে না। দুদিন পরেই শুভকে বাড়িতে ডেকে বলে, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করো।

তাতে লাভ কী হবে ?

পরামর্শ করলে কখনও ক্ষতি হয় না।

পরামর্শ যে তর্ক হয়ে দাঁড়ায় এবং তর্ক থেকে কলহ আর মনান্তর ঘটে থাকে, এটা মায়া ভুলে যায় একেবারেই। কথা শুরু হতে না হতে ভূদেব গভীর আপশোশের সঙ্গে বলে, এই একটা সাধারণ লক্ষণ দাঁড়িয়েছে তোমাদের মতো ছেলেদের। ছাঁকা পলিটিক্স ছাড়া জীবনে করার আর কিছুই খুঁজে পাও না। তার মানে কী শুনবে ? সমাজে নিজেদের পজিশন তোমরা জানো না। নিজেদের কর্তব্য আর দায়িত্ব ভুলে তোমরা জীবনে রোমান্স আর রোমাঞ্চ আনতে ব্যাকুল।

কথাটা তো বুঝতে পারছি না। রোমান্স আর রোমাঞ্চের জন্যে আমরা পলিটিক্স করি ?

মায়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। ব্যঙ্গের সুরটা তার কানে বাজে।

ভূদেব চশমাটা খুলে রুমালে মুছে নেয়।

শান্তভাবেই বলে, দ্যাখো, অ্যাজ এ ক্লাস আমরা উচ্চশিক্ষিত মানুষেরাই হলাম দেশের সমাজের সেরা মানুষ। আমরাই গোড়া থেকে এ দেশে নতুন চিন্তা নতুন কালচার নতুন সভ্যতা গড়ার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছি। পলিটিক্স বাদ দিলে আমাদের চলে না—আমাদের মধ্যে কেউ যদি পলিটিক্স করে সেটাও দোষের কিছু নয় ! কিন্তু অন্যান্য দিকেও তো আমাদের নেতৃত্ব দিতে হবে, পথ দেখাতে হবে। আমরাই সেটা পারি। কারণ একমাত্র আমাদের সে চেতনা আছে, সেই সঙ্গে দরকারি ইকনমিক ফ্রিডমও আছে।

ইকনমিক ফ্রিডম ? আমাদের ? আমরা বুদ্ধি বেচে ক্যাপিটালিস্টদের মুনাফার একটু অংশ ভিক্ষা পাই, স্রেফ পয়সার জন্য আমরা দর্শন বিজ্ঞানে পণ্ডিত হই—

ছি ছি শুভ, তোমার মধ্যে এমন গোঁড়ামি ? পয়সা ? দুশো বছর ধরে আমরা কি নতুন কালচার সৃষ্টি করে এসেছি পয়সার জন্য ? পয়সার জন্য শিল্প সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞান আর রাজনীতি সব দিকে নেতৃত্ব দিয়েছি, নতুন সভ্যতা গড়েছি ? পয়সা আমাদের কাছে বড়ো ছিল না শুভ, আজও নেই। আমরা পয়সা চাই মানুষের মতো বাঁচার জন্য। নেতৃত্ব দিতে হলে মাথা ঠিক থাকা চাই, সুস্থ জীবন চাই। জীবনে যদি আনন্দ না থাকে, অবসর না থাকে, পেটের চিন্তাতেই দিন কেটে যায়—নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে মানুষ ?

নতুন সৃষ্টি পেটের দরকার থেকেই আসে।

পেটের দরকার থেকে আসে—পেটের চিন্তায় মেতে থাকলে আসে না। শিক্ষার সঙ্গে ওই স্বচ্ছলতাটুকু পেয়েছি বলেই আমরা সব বিষয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছি।

দেশকে পিছনে রেখে ও রকম এগোনোর কতটুকু দাম ? আরামে থাকব, জীবনটা ভোগ করব—এটাই আমাদের কাছে প্রধান কথা। অন্য সব আনুষঙ্গিক।

ভূদেব একটু চটে বলে, শুভ, দেশে স্বাধীনতার কামনা আর চেতনাও আমরা সৃষ্টি করেছি, স্বাধীনতার আন্দোলন গড়েছি। মিছেই তুমি দেশ বিদেশে জ্ঞান কুড়িয়েছ, সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারনি। দেশটা গরিব কিনা তোমার কাছে তাই গরিব না হওয়াটা অপরাধ ! কত আর পয়সার মালিক আমরা ! মনে রেখো, রাজা মহারাজা কোটিপতি মাড়োয়ারির জীবন দেখে আমরাই কেবল নাক সিটকোতে পারি।

সে তো ওদেরই দয়ায় !

মায়া বিরক্ত হয়ে বলে, কী বলছ তুমি শুভ ?

শুভ বলে, আমরা যা করেছি সব আপসে—সুবিধা পেয়েছি বলে। তার দাম থাকতে পারে কিন্তু সে জন্য অ্যাজ এ ক্লাস নিজেদের সেরা মানুষ ভাববার ক্ষমতা আমার নেই।

তুমি নিজেও তো আপসের পথেই কিছু করতে চাইছ ?

চাইছি বইকী ! আমি ভালো রোজগার চাই, জীবনে হাসি আনন্দ সুখ চাই, সেই সঙ্গে দেশকে এগিয়েও নিয়ে যেতে চাই। নিজেকে আমি তাই মানুষ ভাবি—মহাপুরুষ ভাবার ধাপ্পাবাজি আমার নেই।

শুভ ! বাবাকে তুমি ধাপ্পাবাজ বলতে পারলে ?

না, তা বলিনি।—শুভ জোর দিয়ে বলে—উনি ধাপ্পা দেননি, নিজের বিশ্বাস মতো কথা বলেছেন। আমি বলছি আমার কথা।

পাইপটা সামনেই ছিল, ধরিয়ে নিয়ে ভূদেব বলে, কিছুই বোঝা গেল না তোমার বিশ্বাসের ব্যাপারটা ! তুমি নিজের জীবনেও ওলট-পালট চাও না, দেশেও ওলট-পালট ঘটাতে চাও না—অথচ

যা করা যায় তাও তোমার পছন্দ নয়। এক হিসাবে তোমাকে বয়াটে বলাই উচিত—তুমি সিরিয়াস বয়াটে।

মায়া ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি শুভকে মিনতি জানায়, শুভ ! তুমি মুখ খুলো না। আর আলোচনায় কাজ নেই।

শুভ বলে, বেশ। আমি চুপ করলাম।

মায়া ভাবে, আলোচনায় কথা কাটাকাটিই সাব হল। শুভকে না ডাকলেই ভালো হত !

শুভও তাই ভেবেছিল। বারতলা ফিরতে ফিরতে মনের জ্বালা জুড়িয়ে এলে তার খেয়াল হয় যে ভূদেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি নিছক লোকসান দাঁড়ায়নি। একটা লাভ হয়েছে। একটা দামি কথা বেরিয়ে এসেছে এই আলোচনা থেকে।

সে তার বক্তব্য ভূদেবকে বুঝিয়ে দিতে পারেনি। ভূদেবের কথাও তার কাঁছে ঠেকেছে যুক্তিহীন, অর্থহীন ! কী অদ্ভুত ব্যাপার এটা ? শিক্ষাদীক্ষা রুচি রীতিনীতি আর জীবনের মূল্যবোধ ইত্যাদির হিসাবে নিজের শিক্ষিত জমিদার বাপের চেয়ে ভূদেব বরং তার ঢের বেশি নিকট মানুষ, আপন মানুষ। বিলাতে ভূদেবের চেয়ে সে বিজ্ঞান খানিকটা বেশি শিখেছে আব ফিরবার পথে বিজ্ঞানের উন্নতি দেখে আসবার জন্য মাসখানেক সোভিয়েট দেশটা বেড়িয়ে এসেছে। এ ছাড়া এমন কী দুস্তর ব্যবধান আছে তাদের মধ্যে ? দুদিন আগেও ঝোঁকের মাথায় ড্রিঙ্ক করে হঠাৎ গিয়ে হাজির হওয়ার পর প্রমাণ হয়ে গিয়েছে তারা আত্মার আত্মীয়, পিতাপুত্রের মতো আপন।

তাদের আসল পার্থক্য শুধু এইটুকু যে তারা এক পুরুষ আগের আর এক পুরুষ পরের মানুষ।

কিন্তু আজ তো জীবনের অতীত ভবিষ্যৎ আদর্শ আর উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রায় স্পষ্টই দেখা গেল তারা দু-জগতের মানুষ ! নিদারুণ অমিল তাদের চেতনায়। বাস্তব জীবন নিয়ে পরস্পরের কথা তাবা বুঝতে পারে না।

শুভর মনে হয সে সূত্র পেয়ে গেছে—তার সব সমস্যার সমাধানের সূত্র। গাছের ফলটা উপরে না উঠে মাটিতে পড়ল কেন প্রশ্ন জাগার মধ্যে যেমন একজনের জুটেছিল বিরাট এক সমাধানের সূত্র, ভূদেব আর তার বোঝাপড়ার খেই কেন হারিয়ে গেছে এই প্রশ্নের মধ্যে সে খুঁজে পাবে তার সমস্যা বুঝতে পারার সূত্র।

মীমাংসা খুঁজে পাবে কিনা এখন তার জানা নেই। তা হোক, ব্যাপারটা বুঝতে পারলে এই অনিশ্চয়তা আর ব্যাকুলতা থেকে সে তো রেহাই পাবে। জীবনের বিরাট সমারোহ চারিদিকে তার মধ্যে কেন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না, যা চায় তা অসাধারণ কিছু না হলেও বাস্তবে কেন তার হদিস পাচ্ছে না, এটা না বোঝা পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

আর একটা লাভ হয়েছে আজ এবং সেটা তুচ্ছ হওয়া উচিত নয় কোনো কারণেই। অথচ হিসাবটা মনেও আসে না শুভর ! মায়ার হৃদয় মনের অজানা পরিচয় জেনে ফেলে আজই সে অপূর্ব রসালো পুলক বোধ করেছিল কয়েক ঘণ্টা আগে, মায়াকে নতুন করে ভালোবাসার মতো। মায়ার জন্য টানটা কেমন শুকিয়ে হয়ে উঠেছিল দড়ির বাঁধনের মতো, ছাতি-ফাটা তৃষ্ণার সময় হঠাৎ এক গেলাস জল খেতে পেলে যেমন লাগে তেমনই সুখ আর আরাম সে পেয়েছিল নিবিড় মমতার অনুভূতিতে মনটা সরস হয়ে ওঠায়।

এই রসটুকু প্রেমের আসল বস্তু, জীবনে বাস্তব কাব্যের মূল উৎপাদন। এটা সত্যই অমূল্য লাভ, কিন্তু এ রসের স্বাদটা কখন যে মন থেকে চলে গেছে !

শুভ সোজা বাড়ির দিকে রওনা হয়। টানটা বাড়ির নয়, কয়েকখানা বইয়ের। দশ-বারোদিন বই ক-খানা কিনেছিল, নানা ঝঞ্ঝাটে পড়া হয়নি। বিশেষভাবে দুখানা বই পড়ার জোরালো তাগিদ

সে বোধ করছে। ভূদেব আর তার মত ও চেতনার অমিলটা কী আর কেন বুঝতে হয়তো সাহায্য হবে।

বইয়ের টান, নিজের ঘরে একান্তে মন দিয়ে বই পড়ার তাগিদ, মায়ার জন্য নাড়ির টান ভুলিয়ে দিয়েছে।

বারতলা লেভেল ক্রসিংয়ে সে যখন পৌঁছল, তখনও খানিকটা বেলা অবশিষ্ট আছে। ট্রেন আসবে বলে লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ ছিল। শেষবেলার সোনালি আলোয় স্টেশনের কাছে মাঠে বড়ো জমায়েত দেখে সেইখানে গাড়ি রেখে শুভ পায়ে হেঁটে এগিয়ে যায়।

সে আশ্চর্য হয়ে গেছে। এ এলাকায় এত বড়ো মিটিং হচ্ছে অথচ তাকে খবরটাও জানানো হয়নি ! বেলা একটা পর্যন্ত সে কারখানায় হাজির ছিল, তারপরে কী বিশেষ কিছু ঘটেছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে এত লোকের জমায়েত সম্ভব হয়েছে ?

সভায় বক্তৃতা সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল, জমায়েতের কলবব কানে আসছিল। কয়েক পা এগোতে এগোতে বক্তৃতা শুরু হয়, মাইকের আওয়াজে বক্তৃতা কানে ভেসে আসে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সদর থেকে মাইক আনিয়ে সভা করা সহজ ব্যাপার নয়, তবু শুভ ভাবে যে বিশেষ চেষ্টায় এই কঠিন কাজটাই সম্ভব করা হয়েছে। অসম্ভব সম্ভব হতে পারে কিন্তু তাকে না জানিয়ে আগে থেকে সভার আয়োজন করা হয়েছে এটা ভাবতে পারে না শুভ।

বক্তৃতার কথাগুলি স্পষ্ট হয়, বক্তাকেও চেনা যায়। নরেন সাঁতরা বক্তৃতা দিচ্ছে—এই সেদিন যার বিয়ে হল।

জগদীশের নাম আর প্রায় কুৎসিত গালাগালির মতো একটা মন্তব্য কানে আসায় শুভ থমকে দাঁড়ায়।

এই কি তবে তাকে না জানিয়ে সভা ডাকার কারণ ? এ সভায় তার বাপের মুণ্ডপাত করা হবে ?

কিন্তু ইতিমধ্যে কী অপরাধ করেছে জগদীশ যে সভা ডেকে তাকে গাল দেওয়া দরকার হল ?

বেআইনি অত্যাচার করে না বলেই তার বাবাকে লোকে ভালো বলবে এ আশা শুভ করে না। জমিদারের অত্যন্ত আইনসঙ্গত কাজকর্ম আদায়পত্রটাই প্রজাদের উপর অত্যাচার—এই প্রথাটাই অতি মন্দ। কিন্তু এতদিন দরকার হয়নি, আজ কেন সভা ডেকে জগদীশকে গাল দেওয়ার দরকার পড়ল ? ইতিমধ্যে বিশেষ কোনো অন্যায় সে করছে বলে তো শুভ জানে না।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে শুভ। এ সভায় যাওয়া কি গোঁয়ারতুমি হবে না তার পক্ষে ?

মন স্থির করে দৃঢ়পদে সে এগিয়ে যায়। হোক গোঁয়ারতুমি, কাছে গিয়ে সে স্পষ্টভাবে শুনবে কী বলা হয় জগদীশের নামে। নন্দ বা অন্যের কাছে সভার বিবরণ সে জানতে পারবে—কিন্তু ঠিক কী ভাষায় কী ভাবে লোকে জগদীশের সমালোচনা করছে সেটা তাকে কেউ জানাবে না।

এগিয়ে গিয়ে সভার প্রান্তে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বক্তৃতার কথা থেকে সে টের পায় সে সভাটা জগদীশের বিরুদ্ধে নয়। জোর করে কম দামে ধান সিজ করার প্রতিবাদে সভা ডাকা হয়েছে।

শুভকে চিনতে পারায় সভার প্রান্তে একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। একটু পরেই মঞ্চ থেকে নন্দ তার কাছে এগিয়ে আসে, বলে, তুমি এ সভায় থেকো না শুভ।

শুভ বলে, সে তো বুঝলাম। কিন্তু ধান সিজের ব্যাপারে বাবাকে জড়ানো হচ্ছে কেন ? তিনি তো এর মধ্যে নেই !

নন্দ বলে, ওদের সুযোগ সুবিধা করে দিচ্ছেন, চাষির স্বার্থ দেখছেন না। গোপালের ধান হয় বিশ মন, ত্রিশ মন ধরা হল। বলা হল, দশ মন লুকিয়ে ফেলেছে। ভূতনাথ জেনেশুনে তাতে সায় দিলে—গোপালের কথা টিকল না।

বাবা হয়তো এর কিছুই জানেন না।

তুমি বুঝতে পারছ না। নায়েব গোমস্তা কর্মচারী—তারা যাই করুক সে জন্য লোকে জগদীশবাবুকেই দায়ি করবে। এ রকম অবশ্য ঘটেছে দু-একবার—আসল যা করার ওরাই করছে, কিন্তু তোমাদের লোক সঙ্গে থাকে এটা তো দেখছে সবাই। বলতে বলতে হয়তো জগদীশবাবুর নামে কিছু বলে বসবে। তোমার না থাকাই ভালো।

শুভ গম্ভীর মুখে বলে, আমি বলব—নরেনের পরেই বলব।

সেটা কি ভালো হবে ?

নিশ্চয় ভালো হবে !

শুভকে মঞ্চে উঠতে দেখে সভায় সাড়া পড়ে যায়, একটা কলরব সৃষ্টি হয়। সে বলার জন্য উঠে দাঁড়ালে কিন্তু একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায় চারিদিক। এ সভায় তার উপস্থিতি খাপছাড়া বলেই সে কী বলে শোনার জন্য সকলের বিশেষ আগ্রহ হওয়া অবশ্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

শুভ বলে যে সে বক্তৃতা করতে দাঁড়ায়নি, তার শুধু একটি ঘোষণা আছে। তার বাবার বিরুদ্ধে নালিশ তার কানে গিয়েছে। তার বিশ্বাস, তার বাবার কোনো কর্মচারী যদি অন্যায় করে থাকে সেটা তার বাবার অজান্তেই ঘটেছে, সভায় গাল না দিয়ে তার বাবাকে জানালেই বোধ হয় প্রতিকার হত। যাই হোক, চাষিদের স্বার্থ দেখা হবে এ ব্যবস্থা করার ক্ষমতা তার নেই কিন্তু সে কথা দিচ্ছে তাদের লোকেরা যাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে সে তার ব্যবস্থা করবে।

শুভ আশা করেছিল, তার ঘোষণা শুনে সভায় অন্তত একটু সাড়া পড়বে। কিন্তু যেমন চুপ করে সবাই তার কথা শোনে, তার বলা শেষ হবার পরেও তেমনি চুপ করেই থাকে।

জমিদার অন্যায় করবে না, এ ঘোষণার কোনো মূল্যই যেন তাদের কাছে নেই।

শুভ নীরবে সভা-মঞ্চ ছেড়ে যায়। সে স্পষ্টই অনুভব করে যে হাজার আবেগ আর আন্তরিকতা নিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলেও অন্তত আজ এখন এই মানুষগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা জমাতে পারবে না। জগদীশ মাঝখানে এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে।

বাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঢাকঢোল কাঁসর ঘণ্টা প্রচণ্ড শব্দে বাজছিল। শুভর মনে হয় এ শব্দ উন্মাদনা সৃষ্টিব জন্য তোলা হয় না। দুঃখী কাতর মানুষের নিশ্বাস আর কাতরানিতে অপবিত্র পৃথিবীর বায়ু শুদ্ধ করে নেবার জন্য এত আওয়াজ দরকার হয়।

জগদীশ মন্দিরে ছিল। শুভ বাড়ি ফিরতেই তার কাছে খবব পৌঁছয়। তার হুকুম জারি করা আছে শুভ বাড়ি ফিরলেই তাকে জানাতে হবে। যেখান থেকে যখন বাড়ি ফিরুক।

কোষ্ঠী বলে, এ বছর বড়ো রকম একটা ফাঁড়া আছে শুভর। ফাঁড়া ঠেকাবার জন্যে যা কিছু করা দরকার সবই অবশ্য করা হয়েছে। ফাঁড়া একেবারে বাতিল করার কোনো প্রক্রিয়া জগদীশ করতে দেয়নি—তার বিশ্বাস, দৈব একেবারে খারিজ করা যায় না। বিপদ একটা শুভর ঘটবেই। মানুষের সাধ্য নেই ঠেকায়। তবে, বিপদের রকমটা মানুষ বদলে দিতে পারে। ছোটোখাটো অসুখ বিসুখ হোঁচট খাওয়া আঙুল কাটার উপর দিয়ে কঠিন ফাঁড়া উতরে যাওয়া যায়। তবু একটা স্থায়ী আতঙ্ক আছে জগদীশের। বলা তো যায় না ! যা কিছু করার করিয়েছে সে নিজে, শুভকে দিয়ে কিছুই করানো যায়নি।

ছেলেবেলা করানো গিয়েছিল বছর বছর। কলেজে পড়তে শুরু করার পর কী তাড়াতাড়িই যে অবিশ্বাসী নাস্তিক বনে গেছে ছেলেটা !

বাইরে বেরিয়ে সুস্থ দেহে শুভ বাড়ি ফিরেছে, এইটুকুই জগদীশ শুনতে চায়।

দৈবের অবশ্য ঘরে বাইরে নেই। লোহার ঘরেও দৈব সাপ হয়ে এসে মানুষকে কামড়ায়। তবে, বাইরে চোখের আড়ালে কিছু ঘটেনি এইটুকু জানার জন্য জগদীশের ব্যাকুলতা।

সন্ধ্যাপূজার পর জগদীশ নিজের ঘরে স্তব্ধ হয়ে পবিত্র সোমরসের পাত্রটি নিয়ে বসে। জিনিসটা বিলাতি বটে কিন্তু ঢাকা দেওয়া পাথরের পাত্রে ঢেলে রেখে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়। যৌবনের উদ্দাম ভোগের এটা জের। কয়েকবার আনুষঙ্গিক অসুখে ভুগেছে। শরীরে আর সাধ্য নেই। সন্ধ্যার পর ঘরে বসেই পান করতে করতে একটু সতেজ বোধ করা, একটু আবেশ উদ্দীপনা লাভ করা, এর বেশি আর কিছু চায় না জগদীশ। সাধারণভাবে খারাপ শরীরটা আজ একটু বেশি খারাপ ছিল জগদীশের। শ্বেতপাথরের গেলাসে তাই একটু ঘন ঘন ঢেলে বেশি পান করা হয়ে যায় কম সময়ের মধ্যে।

এ সময় জীবন দেখা করতে চাওয়ায় সে বড়োই বিরক্তি বোধ করে।

দেবেনও প্রার্থনা নিয়েই আসে। কিন্তু একটা পাত্রে একটু সোমরস ঢেলে এগিয়ে দিলে সে কৃতার্থ হয়ে পান করে। তাকে সহ্য করা যায়। জীবন এমন ভাব করে যে খাওয়া দূরে থাক জিনিসটার গন্ধ নাকে যাওয়ায় যেন শুধু তার বমি আসছে না, সারা জীবন অহিংস দেশ সেবার পুণ্যটা পর্যন্ত যেন পচে যাচ্ছে !

জীবনের এলোমেলো বেশ শুকনো শীর্ণ মুখ দেখে জগদীশের আরও খারাপ লাগে। মনে হয় একটা ভিখারি যেন তার উদারতা আর আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে তার বিশেষ বিশ্রামের ঘরের মধ্যে ঢুকেছে।

জীবন ভূমিকা পর্যন্ত না করে বলে, আমায় কিছু টাকা দিতে হবে জগদীশ। আমার বড়ো বিপদ।

তোমার বিপদ তো লেগেই আছে !

তার কথা শুনে জীবন সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ধাতস্থ হবার চেষ্টা করে বলে, আমি তোমাকে কম পাইয়ে দিইনি জগদীশ। আমি জেলে গিয়েছি। আমার নামে তুমি এটায় ওটায় অনেক টাকা করেছ। আজ দুদিনের জন্য একটু বেতাল হয়েছি বলে তোমার কি এ রকম ব্যবহার করা উচিত ?

তুমি যখন যেটুকু করেছ তার দামের চেয়ে বেশি দিয়েছি তোমায়।

তুমি দশ হাজার মেরেছ, আমায় দিয়েছ দুশো টাকা।

অন্যলোক পঞ্চাশ কী বড়োজোর একশো পেত।

জগদীশ শ্বেতপাথরের সুন্দর গ্লাসটি মুখে তোলে। গড়গড়ার নলটা ফেলে দিয়ে সারাদিন পরে এবার একটা সিগারেট ধরায়। জীবন পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করে। বিড়ি বার করে ধরাতে দেরি করছে দেখে জগদীশ সিগারেটের কেসটা তার দিকে এগিয়ে দেয়।

সিগারেট ধরিয়ে জীবন বলে, দ্যাখো, আমাদের অনেককে ফাঁকি দিয়ে ক-জন দাঁড়িয়ে গেছে। দুদিনের জন্য একটু বেতাল হয়েছি, আমিও আবার উঠব জগদীশ। আমাদের বাদ দিয়ে এরা ক-দিন চালাতে পারবে ?—দেশের লোক কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি ঠিক উঠব দেখো, আমাকে আবার তোমার দরকার হবে। এ ভাবে আমাকে তাচ্ছিল্য করো না !

জগদীশ বলে, তাচ্ছিল্য নয় হে, তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার দাঁড়াবার জন্য দরকার হলে হাজার দু-হাজার দিতে পারি, সে দেওয়াটা সার্থক হবে। আজ তোমার ছেলের জ্বর, কাল মেয়ের বিয়ে এ সব ব্যাপারে আমি আর একটি পয়সাও দিতে পারব না।

জীবন আবার সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বিড়ির বদলে জগদীশের সিগারেট টানতে থাকায় দীর্ঘনিশ্বাসটা বড়োই ধোঁয়াটে মনে হয় তার।

জগদীশ আবার বলে, আমার কথাও তুমি বুঝবে না। আমারও সেদিন নেই। ছেলেটাকে নিয়ে পড়েছি মহা ফ্যাসাদে। কত আশা করেছিলাম কিন্তু ওর পেছনে এখনও কেবল টাকাই ঢালতে হচ্ছে। বেশি বিদ্যা শিখে ছেলেই বোধ হয় ডোবাবে আমাকে এবার !

মনে জ্বালা ধরেছিল। জীবন তাই বলে বসে, তোমার ছেলের কথা আর বোলো না। ছেলেকে তুমি মানুষ করনি। সভায় দাঁড়িয়ে তোমায় গালাগালি দিয়ে বক্তৃতা করে।

বলেই জীবন অবশ্য অনুতাপ করে মনে মনে। যার কাছে চাকরি করে দু-পয়সা কামাচ্ছে, জগদীশকে একটু আঘাত দেবার জন্য তার নামে এ ভাবে বলা উচিত হয়নি। বাপে ব্যাটায় ঝগড়া হলে শুভ নিশ্চয় জানবে কার কাছে সে কথাটা শুনেছে এবং অবশ্যই তাকে কারখানা থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে !

মেঘ-ঢাকা আকাশের মতো থমথমে মুখে জগদীশ পাথরের পাত্র থেকে পাথরের গেলাসে অনেকটা রস ঢেলে গিলে ফেলে—এবাব শুদ্ধ করা জল না মিশিয়েই।

কী বলছ তুমি পাগলের মতো ? সভায় দাঁড়িয়ে শুভ আমায় গালাগালি করে ?

যাক গে যাক গে। যেতে দাও। ছেলেমানুষ তো !

জগদীশ চোখ পাকিয়ে বলে, জীবন, আমার সঙ্গে ছেলেখেলা কোরো না। একটু কাবু হয়েছি, কিন্তু আমি এখনও মরিনি। কবে কোথায় কোন সভায় শুভ আমাকে গাল দিয়েছে তোমায় বলতে হবে। যদি সত্যি হয় তোমার কোনো ভয় নেই। সত্যি না হলে—

জীবন পড়ে যায় মহা বিপদে। কিন্তু মিছেই তো সে সারাজীবন ত্যাগের রাজনীতি করেনি ! ভেবেচিন্তে বলে, দ্যাখো, গালাগালি করেছে মানে কী আর তোমাকে বজ্জাত হারামজাদা বলেছে ? এমনভাবে বলেছে যাতে দশজনের কাছে তুমি হীন হয়ে যাও—

কোন সভায় বলেছে ?

জীবন মরিয়া হয়ে বলে, আজকেও বলেছে। স্টেশনের কাছে যে সভা ছিল সেখানে। অন্যেরা সোজাসুজি তোমায় গাল দিয়েছে, শুভ একটু ঘুবিয়ে বলেছে।

জগদীশ হাঁকে, গদা !

গদা নীরবে এসে দাঁড়ায়।

ভূতনাথ ফিরেছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ি গেছেন।

ডেকে আন তো।

ভূতনাথ সভায় গিয়েছিল। জরুরি না হলে সন্ধ্যার পর জগদীশকে কাজেব কথা বলে বিরক্ত করা বারণ। সকালে সভার রিপোর্ট দিলেই চলবে জেনে সে বাড়ি চলে গিয়েছিল। তৃতীয়বার একটি বয়স্থা মানে প্রায় পনেরো বছর বয়সেব একটি মেয়েকে সে বিয়ে করেছে মাস খানেক আগে। মেয়েটি একটু কালো হলেও ভূতনাথের জমাট নেশা।

ভূতনাথের আসতে প্রায় মিনিট কুড়ি সময় লাগে।

ইতিমধ্যে জীবন বলতে গিয়েছিল, অত খেয়ো না। বলছিলাম কী, আজ রাতে মাথা গরম না করে—

তুমি চুপ করো। আমি কি মাতাল ? আমি সাধক, আমার মাথা অত সহজে গরম হয় না।

তারপর জীবন আর মুখ খোলেনি।

ভূতনাথ হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে, আজ্ঞে ডেকেছেন ?

মিটিংয়ে গিয়েছিলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শুভ মিটিংয়ে বক্তৃতা দিয়েছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারে না। প্রৌঢ় ভূতনাথের বুকটা নানা আশঙ্কায় ধড়ফড় করে।

জগদীশ হাতের সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে নামিয়ে রেখে পাথরের গেলাসটা আর একবার মুখে ঠেকিয়ে কেস থেকে নতুন একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বলে, ইনি বলছেন শুভ নাকি মিটিংয়ে আমার নামে যা তা বলেছে।

ভূতনাথ কথা কয় না। সে পাকা লোক, সে জানে শুভর মতো ছেলের সম্পর্কে জগদীশের মতো বাপেব এ রকম প্রশ্নের জবাব চট করে দিতে নেই। জগদীশ অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কী হল, চুপ করে রইল যে ?

আজ্ঞে—

জগদীশ বোমার গর্জনে ফেটে পড়ে, ইয়ার্কি দিয়ো না ভূতনাথ, কী বলেছে শুভ ?

ভূতনাথ ধীরে ধীরে হাত জোড় করে বলে, ছোটোবাবুর নামে কিছু বলা উচিত নয়, আপনি হুকুম দিলেন তাই না বলেও উপায় নেই। ছোটোবাবু বললেন, আপনি যদি অন্যায় কবেই থাকেন, আপনাকে শাসন করে দেবেন, ভবিষ্যতে আপনি যাতে কিছু না করেন তার ব্যবস্থা করবেন। বলব কী বাবু, ছোটোবাবু ওভাবে সভায় দাঁড়িয়ে বলতে পারেন আপনার নামে—

পাথরের গেলাসে আরও খানিকটা রস ঢেলেছিল জগদীশ, গেলাস মুখে না তুলে সে মাথা হেঁট করে।

বলে, আচ্ছা, তুমি যাও ভূতনাথ।

ভূতনাথ চলে যাবার পর জগদীশ শোবার ঘরে সিন্দুক খোলে।

সাবিত্রী বলে, কাকে দেবে গো টাকা ?

করুণভাবে মৃদু প্রশ্নের সুরে বলে। জগদীশ পাছে চটে যায়।

জীবনকে কয়েকটা টাকা দেব।

তুমি খালি ওকেই টাকা দাও !

ক্ষীণ অভিমান জমতে জমতে মিলিয়ে যায় শুভর মার। জগদীশ কথাও বলে না।

জীবনের হাতে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে জগদীশ বলে, আচ্ছা তুমি যাও।

নির্জন ঘরে কয়েক মিনিট জগদীশ চুপচাপ বসে থাকে। রসভরা পাথরের গেলাস মুখের কাছাকাছি নিয়েও নামিযে রাখে। নাঃ, আগে কর্তব্য পালন করতে হবে।

গটগট করে সে শুভর ঘরে যায়। শুভ মশগুল হয়ে বই পড়ছে দেখে মাথায় যেন তার আগুন ধরে যায়।

বলে, শুভ, এই মুহূর্তে তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি আমার খাবে পরবে আর সভায় দাঁড়িয়ে আমায় গালাগালি দেবে ! এত বড়ো নচ্ছার হারামজাদা ছেলে দিয়ে আমার দরকার নেই !

কী বলছেন আপনি ? কাল সকালে বরং এ বিষয়ে—

এক ঘণ্টার মধ্যে যদি তুমি বেরিয়ে না যাও এ বাড়ি থেকে, চাকর-দরোয়ান দিয়ে জুতো মেরে তোমায় আমি খেদিয়ে দেব।

১৩

কলকাতায় হোটেলে নিজের ঘরখানায় বসে শুভ ভাবে. দু-তিনদিন পরেই হোটেলের পাওনা দিতে হবে। জগদীশ তাড়িয়ে দেওয়ায় এগারো হাজার টাকা দামের গাড়ি চেপে সে হোটেলের ঘরে এসে উঠেছে বটে কিন্তু তার পকেটে নগদ আছে মোট সাত টাকা ছ-আনা পয়সা।

তাই বটে। এত পয়সা খরচ করে এত শিক্ষা পেয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজে সে একটি পয়সা রোজগার করেনি। এইবার সত্যিসত্যি যাচাই হবে তাব শিক্ষার মূল্য।

ওদিকে অনেক বেলায় ঘুম ভেঙে জগদীশের মনে হয়, হায় ! তাকে দিয়েই শেষ পর্যন্ত তবে ফাঁড়াটা ঘটানো হল শুভর।

দৈব সত্যই সর্বশক্তিমান !

হোটেলে কয়েকটা দিন কাটে শুভর।

তাব মধ্যেই জীবনে এবার সে প্রথম ভালোভাবে উপলব্ধি করে যে জগতে তার আত্মীয়বন্ধু কত আছে।

একেবারে তাক লেগে যাবাব মতোই চমকপ্রদ মনে হয় ব্যাপারটা তার কাছে।

তার হোটেলের ঘরে দু-একজনের পদার্পণ থেকে শুবু হয় আর কয়েক দিনের মধ্যে ঘরখানায় যেন বন্যা বয়ে যায় আত্মীয়কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবের—পিতৃপক্ষীয়, মাতৃপক্ষীয় এবং বর্তমানে একটু অনিশ্চিত হয়ে গেলেও অনেকদিনের সুনিশ্চিত হবু শ্বশুরপক্ষীয় !

ছোটোবড়ো ডাক্তার ব্যাবিস্টার ডিরেক্টর অফিসার অধ্যাপক রাজা ও জমিদার !

তার নিজের চেনা মানুষ তো আছেই।

তার বাপ তাকে দূর দূব করে তাড়িয়ে দিয়েছে, এ একটা অতি আকস্মিক ও অভাবনীয় ঘটনা তার জীবনে। নিকট ও দূরের মানুষের আত্মীয়তারও তেমনি আকস্মিক ও অভাবনীয় বন্যা এসে যেন তার জীবন থেকে ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে ওই ঘটনা এবং সেই সঙ্গে একেবারে মোড় ঘুরিয়ে দেবে তার জীবনের।

দিন দুই সে হোটেলের ঘর ছেড়ে বেরোযনি। অনেক কথা নতুন করে ভাবা দরকার তাই সারাদিন শুধু ভেবেছে। সারাদিন বসে বসে একভাবে ভেবেছে, সন্ধ্যার পর মদ খেয়ে ভেবেছে তার একেবারে বিপরীতভাবে !

তৃতীয় দিন সকালে সর্বপ্রথম পদার্পণ ঘটে ভূদেবের। বেলা দশটা নাগাদ।

খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে শুভ তখন কী ভাববে আর কী ভাবে ভাববে সেই ভাবনায় ছটফট করেছিল।

ভূদেব বলে, বাঁচা গেল, তোমাকে এখানেই পেলাম। মায়াও তাই বলছিল, তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও যে অভিমান করে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে !

অভিমান করে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ? ভূদেব তবে ব্যাপার জেনেই এসেছে ! সুতরাং শুভ চুপ করে থাকে।

ভূদেব বলে, জগদীশের সঙ্গে কী একটা গোলমাল হয়েছে শুনলাম ? কী যে বললে জগদীশ ভালো করে বুঝতেই পারলাম না ব্যাপারটা। নেশার ঝোঁকে একটা কাণ্ড করে বসে এখন ভয়ে ভাবনায় এমন নার্ভাস হয়ে পড়েছে বেচারা !

শুভ সিধে কথায় নেমে আসে। বলে, বাবার কথা বাদ দিন। ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় ঠিক এমনিভাবে একবার আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ বুঝতে পারছি সেবার বাবাকে ক্ষমা করে কী বোকামি করেছিলাম। সেবার বাবা পিছন থেকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন মাকে। এবার আপনাকে পাঠিয়েছে।

ভূদেব সঙ্গে সঙ্গে বলে, শুভ তোমাদের বিজ্ঞানের শিক্ষায় কি বাপ-মা বাতিল ? বাপ-মা ছাড়াই ছেলেমেয়ে গজায় ?

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

তুমি জান না, তোমায় কোনোদিন বলিনি, বলা যেতও না। মায়াকে লাথি মেরে তাড়াবার ইচ্ছা হয়নি কখনও, কিন্তু এই সেদিনও তার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেবার সাধ হয়েছিল। মনে করে

অতি চালাক আমি—আসলে ন্যাকা হাঁদা মেয়ে। খালি সমস্যা জানে তর্ক জানে আর অঙ্ক কষে কী করে সেটা সমাধান করা যায় তার থিয়োরি জানে। অথচ পাঁচ-সাতবছর ধরে ভূমিকা ফেঁদেও জীবনটা শুরু করে দিতে পারে না। ভাবটা কী জান, জগৎ-সংসার যেন ওরই মুখ চেয়ে আছে, ওব হিসাবে যদি ভুল হয়ে যায় যাক, জগৎ-সংসার উলটে যাবে !

ভূদেব একটা সিগাবেট ধরায়।

কী জান, মেয়েটাকে বড়ো ভালোবাসি। এ জগতে আর তো কেউ নেই আমাব ! সারা জীবন কষ্ট করে যা কিছু সঞ্চয় করেছি সব মেয়েকেই দিয়ে যাব। অথচ মেয়ের কাছে আমার দাম কতটুকু ? মায়া স্পষ্টই বলে, আমার মেয়ে না হয়ে, আমার হাতে মানুষ না হয়ে—

ভূদেব হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, বাপকে বাতিল করা যায় না শুভ। নিজের বাপকে মেনেই যৌবনে একজন বাপ হবে, নিজের বুড়ো বাপকে সে সম্মান দিয়েছিল নিজের ছেলের কাছে বুড়ো বয়সে আশা করবে সেই সম্মান। নইলে বাপ হবার দায় কে নেবে বলো ? ছেলে এগিয়ে যাবে তাই তো বাপ চায়, সেটাই তো সুখ আর সার্থকতা বাপের—বাপকে কি বাতিল করতে পাবে ছেলে ?

হাতের কাছেই গেলাস ছিল, শুভ ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে বলে, আজ বুঝতে পারছি মায়া কেন আশা করেছিল আপনি আমার মনের গতি ঘুরিয়ে দিতে পারবেন। আর্গুমেন্টের ভিতটা আপনি গাঁথতে জানেন।

ভূদেব সায় দিয়ে বলে, এটা কিন্তু চালাকি বিদ্যা নয়। ধাবালো বুদ্ধি থাকলেই এটা হয় না। যতটা পারি সহজ বাস্তব হিসাব দিয়ে একটা বিষয় বিচার করি—এই হল আমাব প্রিন্সিপ্‌ল। প্রত্যেক মানুষের একটা সহজ বাস্তববোধ থাকে। তোমার আছে, আমারও আছে। একটা মুখ্যু গেঁয়ো চাষারও আছে। একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটলে মুখ্যু চাষাও সেটা অ্যাকসিডেন্ট বলে মানবে, আমবাও অ্যাকসিডেন্ট বলেই মানব। ঘটে গেছে উপায় কী ! অ্যাকসিডেন্টকে তার চেয়ে বড়ো করে দেখা বোকামি।

একটু থেমে বলে, এ ব্যাপারটাকেও তোমার অ্যাকসিডেন্ট ভাবতে হবে শুভ।

শুভ সঙ্গে সঙ্গে বলে আমি তাই ভাবছি। ঘটে গেছে উপায় কী ! সম্পর্ক ঘুচে গেছে যাক। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যা ভাঙে তা তো আর জোড়া লাগবে না, যে মরে সেও বাঁচবে না। সেটা মানতেই হবে।

ভূদেব কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, জগদীশ সবাইকে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে চলে এসেছে। কীরকম দেখলাম জান ? একটা যেন খুন করেছে, এবার ফাঁসি যেতে হবে। আমিও জানি ওর অনেক ভালো সেন্টিমেন্ট মরে গেছে। সে জন্য কাকে দায়ি করব জানি না। তোমার ঠাকুর্দাকে ভুলো না—জগদীশ তার বাড়ির আঁতুড়ে অসহায় শিশু হয়েই জন্মেছিল, তার হাতে মানুষ হয়েছিল, আকাশ থেকে পড়েনি। অন্য দোষগুণ জানি না, কিন্তু ওর পুত্রস্নেহ নেই, এ কথা তুমিও বলতে পারবে না। আমাদের দশজনের বরং এমন স্নেহ দেখা যায় না। লোকে ভগবানের জন্য পাগল হয়। জগদীশ তোমার জন্য পাগল। তোমার মন ভেজাতে বাড়িয়ে বলছি না, একটা মিটমাট না হলে মানুষটা সত্যি পাগল হয়ে যাবে। ভাবের পাগল নয়—যাদের দড়ি দিয়ে বাঁধবারও দরকার হয়।

শুভ পাংশু মুখে বলে, তাই কখনও হতে পারে ?

হতে পারে না ? ছেলের জন্য মানুষ পাগল হয়ে যায় না ? সারা জীবন ধরে এই জন্যেই তো প্রস্তুত হয়ে এসেছে জগদীশ—তেমন একটা শক লাগলে ব্রেনটা বিগড়ে যাবে। তবে অন্যভাবে ও রকম শক লাগবার চান্স নেই—শুধু তোমার দিক থেকে লাগতে পারে।

শুভ অসহায়ের মতো চেয়ে থাকে। স্নেহাতুর পিতারূপী জগদীশকে সে যেন ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু মনে পড়লে তো আর অস্বীকার করা যায় না এই অতি বাস্তব সত্যটাকে। কত অসংখ্য প্রমাণ

আর পরিচয় স্মৃতিতে জমা হয়ে আছে জগদীশের এই অন্ধ উন্মাদ স্নেহের। আজও সে একটু বেড়াতে বার হলে জগদীশ কীরকম উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে, বাড়ি ফেরামাত্র খবর পৌঁছলে তবে স্বস্তি পায়, এ সব তো তার অজানা নয়।

এই স্নেহের লাগামেই তো এতদিন জগদীশের একেবারে জন্মগত প্রকৃতিগত জমিদারি দাপট একটু সংযত রাখতে পেরেছে।

সহজ কিন্তু ভর্ৎসনার সুরে ভূদেব এবাব বলে, নিজের বাপের জীবনের ট্র্যাজেডিটা পর্যন্ত কখনও চিন্তা করে দ্যাখো না। দুটো জীবনে পা দিয়ে চলতে হয়েছে বেচারাকে। সেকেলে জমিদারও রইল আবার আমাদের দলেও ভিড়ল। দুটো জীবন টেনে আসছে বরাবর। আর সব তাই দাঁড়িয়ে গেছে ফাঁকি—একমাত্র সম্বল তুমি। তুমি ছাড়া খাঁটি কিছুই নেই ওর জীবনে—সব মেশাল আর ভেজাল।

শুভ ধীরে ধীরে বলে, জানি। ওটা আমার ট্র্যাজেডি। আহ্লাদি ছেলে হয়েছি—বৈজ্ঞানিক হয়েও জের কাটে না।

সবটা নাই বা কাটল ? যতটা কেটেছে ভালো—আরও কাটবে। দুদিনে কি সব কিছুর সব জের কাটে ? ওই তো শরীর জগদীশের, ও আর কদ্দিন বাঁচবে বলো? তুমি আর এ ব্যাপারটার জের টেনো না শুভ ! বেচারিকে শান্তিতে মরতে দাও।

একটু হাসে ভূদেব, রামচন্দ্রের চেয়ে পিতৃভক্তির পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়েছ, এ সুযোগ ছেড়ো না। পিতাব চেয়ে পিতৃসত্য বড়ো হয়, শোকে বাপ মরবে জেনেও গোঁয়ারের মতো বনে যায়—

শুভ মাথা নাড়ে, দশরথ বারণ করেনি। দশরথ নিজেই সত্য চেয়েছিল, নইলে স্বর্গ ফসকে যাবে।

যাই হোক, ব্যাপারটা মিটিয়ে দাও। হঠাৎ মদের ঝোঁকে—

মদের ঝোঁকে নয়। আমি কী ছেলেমানুষ যে নেশা করে বেরিয়ে যাও বললেই বেরিয়ে আসব ?

ভূদেব আশ্চর্য হয়ে বলে, সে কী কথা শুভ ? শুধু জগদীশ নিজে নয়, অন্যের কাছেও শুনেছি ঝোঁকের মাথায় বেশি গিলে ফেলেছিল। জীবন টাকা চাইতে গিয়েছিল, তার সামনে খেয়েছে—জীবন নাকি বারণও করেছিল। মাতাল হয়ে কাণ্ডজ্ঞান না হারালে তোমায কখনও ও ভাবে তাড়াতে পারে জগদীশ ?

শুভ জোর দিয়ে বলে, না, মাতাল হননি। বেশি নেশা টের পাওয়া যায় না ? তার লক্ষণ আলাদা। নেশা বরং একটুও ছিল না। একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, পরিষ্কার স্পষ্ট কথা। রাগটা মাথায় চড়েছিল, স্রেফ রাগ। নেশার জন্য এ রকম রাগ হওয়াই অসম্ভব। নেশা মাথায় চড়লেই বরং রাগটা এলোমেলো উলটোপালটা হয়ে যেত—অন্যভাবে চেঁচামেচি হইচই করতেন।

নিজেই সেদিন নেশা চড়িয়ে শুভকে ঝিমিয়ে দিয়েছিল সে কথা বোধ হয় মনে পড়ে যায় ভূদেবের। বেশি দিনের কথা নয়। একটা আপশোশের আওয়াজ করে বলে, তাহলে জগদীশ পাগল হয়েই গেছে। যাকগে, একটা মীমাংসা তো করতে হয় ? জগদীশ বলেছে, জমিদারির কোনো ব্যাপারে সে কথা কইবে না, হস্তক্ষেপ করবে না। তোমার যেমন ইচ্ছা ব্যবস্থা করবে, সব নষ্ট করতে চাও তাই করবে। তুমি যদি চাও, জগদীশ সব ছেড়ে দিয়ে বরাবর কলকাতায় থাকতে রাজি আছে।

বাবা বলেছেন এ কথা ?

বলেছে বইকী ! তুমি যা চাও, যেভাবে চাও, তাই সই। তুমি শুধু একটি কথা দেবে, জগদীশ যত দিন বেঁচে আছে বাপের সম্মানটুকু বাঁচিয়ে চলবে, বাইরে ওর নিন্দা করবে না, অন্যে নিন্দা করলেও সইবে না !

ভূদেব গম্ভীর হয়ে যায়, জোর দিয়ে বলে, এ তো ঠিক কথাই শুভ। আমি এতক্ষণ এ কথা তুলিনি, কিন্তু প্রজাদের প্রকাশ্য সভায় নিজের বাপকে গালাগালি করা কি তোমার উচিত হয়েছিল ? একেবারে অকারণে মাথা গরম হয়নি জগদীশের ! তোমারও লজ্জিত হওয়া উচিত !

হায়, ভূদেবের এতক্ষণ ধরে বাস্তব বিচার বিবেচনার গাঁথা ভিত আসল কথার গাঁথনি শুরু হতেই ভাবের চোরাবালিতে তলিয়ে যায়।

শুভ বলে, গালাগালি করে থাকলে নিশ্চয়ই লজ্জিত হতাম!

ভূদেব ভড়কে গিয়ে বলে, সে কী ? এ যে উদ্ভট ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল ! যে জন্যে এত ফ্যাসাদ তুমি বলছ সেটাই মিছে ! তুমি সভায় যাওনি, কিছু বলনি জগদীশের নামে ?

সভায় বাবার নামে বলা হচ্ছিল, আমি সেটা বন্ধ করতেই গিয়েছিলাম। ধান সিজের ব্যাপারে আমাদের লোকেরা দু-চারটে অন্যায় করেছিল, আমি সভায় শুধু বলেছি, অন্যায় যদি হয়ে থাকে বাবার অজান্তে হয়েছে, ভবিষ্যতে আর হবে না।

ভূদেব বলে, ও ! বলে ঠিক যেন রোগী দেখার অভ্যস্ত দৃষ্টিতে শুভর দিকে চেয়ে থাকে।

শুভ চটছিল। এ কী ছেলেমানুষের মতো জেরা করা ! কঠিন থেকে কঠিনতব হয়ে ওঠে তাব মুখের ভাব। ডাক্তার হয়েও যেন রোগ ধরতে পারেনি এমনি চিন্তিত ও বিব্রতভাবে ভূদেব কথা বলে তাই রক্ষা !

রাগ করো না শুভ, সেদিন তোমার কথাবার্তা বুঝতে পাবিনি, আজও বুঝতে পারছি না। প্রজারা সভা ডেকে তোমার বাপকে গালমন্দ কবছে, তুমি সে সভায় গিয়ে ও কথা বললে তার একটাই তো মানে হয় ! সংসারে সবাই সেই মানেটাই করবে। তোমার মনে কী ছিল, তুমি কী ভেবেছিলে, তাতে কী এসে যায় ?

হাত তুলে যেন মুখে হাত চাপা দিয়েই শুভকে ভূদেব চুপ করিয়ে বাখে। বলে, না শুভ, আমি তর্ক করতে আসিনি। তর্কাতর্কি বোঝাপড়াব ঢের সময় পাব—আজ রাগারাগি হয়ে যাবে ! আমি তোমায় রাগাতে আসিনি, রাগ ভাঙাতেই এসেছি !

শুভও সায় দিয়ে বলে, সেই ভালো, মিছিমিছি কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। আমি ঠিক করেছি না করেছি ও সব ঝঞ্ঝাটে আর যাব না, দুরকম জীবন টেনে চলা আমার সইবে না। বাবাকে বলবেন, আমি রাগ করিনি, সম্পর্কও তুলে দিচ্ছি না। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা করে আসব !

ভূদেব ভাবে, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা কবে আসব ! তার মানেই যেন সম্পর্ক তুলে দেওয়া হল না !

দুপুরে আসে তার মা।

সাবিত্রীকে মোটেই উতলা মনে হয় না। বাপ ছেলেতে বিবাদ হয়েছে, মিটে যাবে। বিশেষত জগদীশ নিজেই যখন উঠে পড়ে লেগেছে মিটমাটের জন্য।

বলে, ওঁকে জানাসনি যেন আমি এসেছি। আসতে বারণ করে দিয়েছে আমায়। আমি এলে নাকি তুই চটে যাবি ! কী যে বুদ্ধি হয়েছে মানুষটার !

সাবিত্রীর কপালে তেল-সিঁদুরের ফোঁটা, পরনে গরদ, পায়ে চটি আছে।

কালীঘাটে যাব বলে বেরোলাম তোকে দেখতে। মিছে কথা বলব কেন মিছিমিছি ? কালীঘাট ঘুরেই এলাম একেবারে। তোকে যে কাহিল দেখাচ্ছে বড়ো ?

ও কিছু নয়।

মার সঙ্গে শুভর সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে প্রায় নীরবে তার কথা শোনা, যা বলে তাই মেনে নেওয়া, মাঝে মাঝে মুখে হাসি ফুটিয়ে তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাওয়া যে ছেলে তার মস্ত কেউকেটা হয়ে যায়নি, তার ছেলেই আছে।

বাপ যেমন মন দিয়ে ছোটো মেয়েটির আবোল-তাবোল কথা শোনে, তার দিকে হাসি মুখে আদর ভরা চোখে চায়, অবিকল সেই রকম !

সাবিত্রী ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, আমি বেশি ক্ষণ বসতে পারব না শুভ।

শুভ বলে, বেশি ক্ষণ বসে কাজ নেই। বাবা টের পেলে বকাবকি করবে।

সাবিত্রীর মুখে অনাবিল হাসি ফোটে। বাপ মার আড়াল করা আদুরে ছোটো মেয়ের মুখ অথবা জীবন আর জগতের সঙ্গে যার সব দ্বন্দ্ব মিটে গেছে তার মুখে ছাড়া এ রকম হাসি ফোটা সম্ভব নয়।

বকাবকি করবে তো বয়ে যাবে। বকাবকি তো চব্বিশ ঘণ্টা করছেই ! আমি গায়ে মাখি নাকি ? এক কান দিয়ে শুনি আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। ওঁর নেই মাথার ঠিক, কী বলে কী করে তারও নেই ঠিকঠিকানা। জানিস শুভ, কালীসাধক হলেই মাথাটা কেমন একটু বিগড়ে যায়। কে জানে মার কী লীলা, ভক্তের মাথা একটু বিগড়ে দেন !.... সিগারেট খাচ্ছিস না যে ? তুই আবার কবে আমায় খাতির করে আমার সামনে সিগারেট খাসনি ?

শুভ হেসে বলে, খাব খাব, ইচ্ছে হলেই খাব। সকাল থেকে অনেকগুলি খেয়েছি কিনা—

সাবিত্রী খুশি হয়ে বলে, সেই ভালো—সিগারেটটা একটু কমা দেখি তুই ! দেখবি শুধু সিগারেট কমিয়ে শরীর কত ভালো থাকে, মাথা কত সাফ থাকে। তোর মেজোমামা টিন টিন সিগারেট উজাড় করত—

নগদ গয়না এবং সম্পত্তিতে প্রায় দেড়লাখ টাকার মতো একটি প্রস্তাব বাতিল করে জগদীশ নাকি অতি ছোটো জমিদার ও শহরের মাঝারি ব্যবসায়ী শিক্ষিত পরিবারের এই মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল গায়ের জোরে—বাপের অমতে।

সাবিত্রী স্কুলে পড়ত ! উঁচু ক্লাসে।

দ্বিতীয়বারের বিয়ে। নইলে বাপের সঙ্গে লড়াই করার সাহস যে জগদীশের হত না তাতে সন্দেহ নেই। প্রথমবার বিয়ে করেছিল প্রায় এক রাজকন্যাকে—মেয়েটির বাপ জমিদার হলেও ছিল রাজার ক্লাসের জমিদার।

কিছু একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল তাকে নিয়ে। কেউ বলে খুন হয়েছে, কেউ বলে পাগল হয়ে কোথায় চলে গেছে, কেউ বলে বাপ মেয়েকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে।

ছেলেবেলা শুভকে বোঝানো হয়েছিল, জমিদার বাড়ি নিয়ে লোকে নানা কথা রটায় ! ও সবে কান দিতে নেই।

কৈশোরে একবার অদম্য হয়ে উঠেছিল কৌতূহল। শুভ গিয়েছিল তার অজানা অচেনা সৎদাদুর বাড়ি।

বিরাট বাড়ি। ফরসা মোটা গম্ভীর মানুষ। পরিচয় শুনে জিজ্ঞেসা করেছিল, কী চাও ?

ছোটোমা কী সত্যি মারা গেছেন ?

সত্যি মারা গেছেন মানে ? তুমি ছোকরা বুঝি আজকাল উপন্যাস পড়ছ ?

বসতেও বলেনি, আর কথাও বলেনি ! তার এই অস্বাভাবিক বিরাগ থেকে শুভ বুঝতে পেরেছিল সত্যই স্বাভাবিক মরণ হয়নি তার মেয়ের।

তার স্থানে এসেছিল সাবিত্রী। আজও সে বেঁচে আছে—কিন্তু নিজেকে সে সুখী ভাবে না দুঃখিনী ভাবে শুভ জানে না। বহুবার তার মনে হয়েছে দুখ-দুঃখের কথা যেন ভাবেই না সাবিত্রী। তার কাছে হাসিকান্না নিছক জীবনধারণের নিয়ম পালন !

সাবিত্রী ঘণ্টাখানেক নিজের মনে বকে যায়। এলোমেলো কথাগুলিকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। শুভ আনমনে শোনে আর মার জীবনের কথা ভাবে। করতে পারে অনেক কিছুই, মাকে মুক্তি দিতে পারে, আড়াল করে দাঁড়াতে পারে—যেখানে খুশি যেভাবে খুশি বাকি জীবনটা কাটাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

কিন্তু মা চাইলে তবেই তো সে কিছু করবে তার জন্যে ? মুক্তি দূরে থাক, কিছুই সে চায় না ছেলের কাছে। আগেও কোনোদিন চায়নি, আজও চায় না !

ঘণ্টাখানেক পরে কী কারণে যেন কথার খেই হারিয়ে ফেলে খানিক চুপ করে থেকে সাবিত্রী বলে, এবার যাই শুভ, কেমন ?

শুভই যেন তাকে ডেকে এনেছে আর এতক্ষণ আটকে রেখেছে।

শুভর খেয়াল হয়, মেজোমামার সিগারেট ছেড়ে স্বাস্থ্য ও সুখসম্পদ লাভের কাহিনি থেকে শুরু করে আবোল-তাবোল হাজার রকম কথা সে টেনে এনেছে কিন্তু বাপের সঙ্গে তার বিবাদের কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেনি !

মাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসতে শুভ নীচে নামে না। কথাটা মনেও পড়ে না তার। শুধু জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার অপর দিকে দাঁড় করানো গাড়িতে তাকে উঠতে দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়।

সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে তার খেয়াল হয় আরেকটা কথা। সাবিত্রীব ঘণ্টাখানেক ধবে এলোমেলো বকে যাওয়ার একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব।

কেবল তার মেজোমামার গল্প নয়, সাবিত্রী তাকে আজ আরও অনেকগুলি পুরুষমানুষেব কথাই শুধু শুনিয়ে গেছে। আত্মীয়বন্ধু ধনী দরিদ্র জানাশোনা পুরুষ থেকে পুরাণেব গল্পের পুরুষ পর্যন্ত অনেকের কথা। অনেক লড়াযের পর জীবনে নানা ধরনের জয়লাভ করে যারা সবাই স্বাস্থ্য আর সুখসম্পদ আয়ত্ত করেছে !

শুভ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

বইয়ে হোক তর্কে হোক বক্তৃতায় হোক যেভাবে বক্তব্য তুলে ধরার সঙ্গে তার পরিচয় মা সেভাবে বলতে পারেনি বলে, ওইভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রাণের কথাটা বিজ্ঞান বা আর্টের ভাষায় তুলে ধরতে পারেনি বলে নিজের মায়ের এত সহজ আর মোটা প্রাণের কথাটা এমন মোটা ভাবে বলা হলেও সে এতক্ষণ ধরতে পারেনি !

ভেবেছে, তার মা নয়, জমিদার জগদীশেব বউ বুঝি একঘণ্টা আবোল-তাবোল বকেছে।

অথচ মা তাকে প্রাণপণে একটা কথাই বুঝিয়ে গেছে যে ব্যাটাছেলে মানেই বীর। ব্যাটাছেলে মানে জীবন আর জগতের রাজা। যেমন জগদীশ তেমনি আর সকলেই, তার ছেলেও ! কখনও কোনো অবস্থাতে ব্যাটাছেলে ভয় পায় না, ভড়কে যায় না, হতাশ হয় না। রাজ্য আর রাজকন্যা সে জয় করে নেবেই জগতে। ব্যাটাছেলে বলেই শুভ যেন কিছু না ভাবে—সব ঠিক হয়ে যাবে। বাপ কেন স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে লড়াই করে ব্যাটাছেলে জিতে যায় !

তাই বটে। সেই জন্য দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করে হরিশচন্দ্রের জয়লাভের কথাটা সংক্ষেপে বলেই তাদের গোমস্তা হরিশরণের কথাটা মা তুলেছিল।

ঘুমন্ত হরিশরণের গলায় কাটারি দিয়ে কোপ বসিয়েছিল তার বউ। যত বজ্জাত হোক বউ তো, কাটারি দিয়ে গলা কাটতে শেখেনি, কেঁপে গিয়ে বুঝি অবশ হয়ে গিয়েছিল তার হাত, পাপের নেশায় উন্মাদিনীর হাত। তাদের তদানীন্তন নায়েব ভবতারণ নিজে অনায়াসে ধারালো কাটারির এক কোপে কেটে ফেলতে পারত হরিশরণের গলাটা। বেশি চালাক বলে আর মহাপাপী মাত্রেই বেশি চালাক হয়ে

বলে যে চেয়েছিল বউটাই নিজের হাতে গলা কাটুক স্বামীর, বিপদ হলে সে অন্তত বলতে পারবে আমি খুন করিনি। বলে ফাঁসির দায় থেকে রেহাই পাবে। গলা দু ফাঁক হয়নি। বেশ খানিকটা কেটে গিয়েছিল। রক্তে ভেসে গিয়েছিল বিছানা।

তবু সে লাফিয়ে উঠে বউয়ের হাত থেকে সেই কাটারি কেড়ে নিয়ে এক কোপে ফাঁক করে দিয়েছিল ভবতারণের গলা।

তাবপর এসে জগদীশের পা জড়িয়ে ধরেছিল। সব শুনে জগদীশ বলেছিল, বেশ করেছিস।

জগদীশের তখন বয়স ছিল তেজ ছিল উৎসাহ ছিল। জগদীশ নিজে গিয়েছিল নিজের চোখে ব্যাপার দেখতে।

ব্যাপার দেখে হুকুম দিয়েছিল, যা, হারামজাদাটাকে শ্মশানে ফেলে দিয়ে আয় গে। শকুনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে--

আইন-ভীরু কে যেন কেঁউ করে উঠেছিল, আজ্ঞে ?

জগদীশ বলেছিল, তোদের ভয় কী ? ওকে তো খুন করেছি আমি। ফাঁসি হয় আমার ফাঁসি হবে, তোদের কী ?

বলে কাটারিটা তুলে নিয়ে ভবতারণের রক্ত হাতে মেখে বলেছিল, যা, নচ্ছারকে ফেলে দিয়ে আয় শ্মশানে। আর শোনো হরিপ্রসন্ন, তুমি আমার এক নতুন কাজে বাহাল হলে। নতুন যে নায়েব হবে তুমি তার কাজকম্মো হালচাল দেখে আমাব কাছে রিপোর্ট করবে। দুজনে তোমরা মাইনে পাবে সমান।

জানিস শুভ ? বউ কোনো প্রায়শ্চিত্ত করেনি, কোনো ঠাকুর দেবতার পুজো করেনি। সকালে বিকেলে শুধু স্বামীর চবণামৃত খায়। যা রাঁধে নিজের জন্য কিছু রাখে না। হরিপ্রসন্ন হুকুম দেয় তবে মাছভাত খায়। হরিপ্রসন্ন দোতলা বাড়ি করেছিল তুই তো দেখেছিস।

এমনিভাবে পুরুষাকারের কাহিনি শুনিয়ে গেছে সাবিত্রী। সেজোমামার সিগারেট ছাড়ার বীরত্বের সঙ্গে হরিশচন্দ্রের সর্বস্ব দান করা থেকে তাদের গোমস্তা হরিপ্রসন্নের আততায়ীর গলায় কাটারি মারা—এমনি সব এলোমেলো বাস্তব অবাস্তব কাহিনি।

মোট কথাটা বুঝে শুভ যাতে বুকে বল পায় যে ব্যাটাছেলের কখন কী অবস্থা হবে শুধু দৈবই জানে, ব্যাটাছেলে কিন্তু সব অবস্থাতেই শক্ত থাকে।

আরেকটু মনোযোগ দিয়ে যদি মার কথাগুলি শুনত ! জীবনের কত শত শত ঘণ্টা সময় নিষ্ফল বাজে চিন্তায় নষ্ট করেছে, একটি ঘণ্টা ধৈর্য ধরে যদি ভোঁতা সাধারণ সেকেলে মার কথাগুলি বুঝবার চেষ্টা করত ! কে জানে মা তাকে নিজেব ভঙ্গিতে আরও কত দামি দামি কথা বলে গেছে ?

তারপর আরম্ভ হয় আত্মীয়বন্ধুর অভিযান ! তারা আসে বসে কথা বলে চলে যায়—কেউ করে চায়ের নিমন্ত্রণ, কেউবা ভোজের। সাবিত্রীর মতোই জগদীশের সঙ্গে তার বিবাদের প্রসঙ্গ কেউ তোলে না। একটু সাবধানে সংযতভাবে কথা বলে সকলেই। অনুমান করা যায়, জগদীশ সকলকে শিখিয়ে পড়িয়ে সতর্ক করেই পাঠিয়েছে !

এদের ভিড় করে আসা যাওয়ার মধ্যে নতুন এক আশ্বাস খুঁজে পায় শুভ। তার বড়ো প্রয়োজন ছিল এ আশ্বাসের।

জগদীশ পাঠিয়েছে বলেই কয়েকটা দিনের মধ্যে এমন ভিড় করে সকলে আসতে শুরু করে, থাক, এরা তার আপনজন সন্দেহ নেই।

এবং এদের কাছে তার সবটুকু মূল্য কেবল এই নয় যে সে জগদীশের ছেলে।

গরিবের ঘরে জন্মেও সে যদি নিজেকে এতখানি গুণবান করতে পারত, গোড়ায় এতগুলি আপনজন তার থাকত না বটে কিন্তু এদেরই দু-একজন তাকে তুলে নিত নিজেদের স্তরে, এদের সঙ্গেই গড়ে উঠত অনেকটা এই ধরনেরই আত্মীয়তা।

জগদীশ আর তার টাকা জীবন থেকে একেবারে ছাঁটাই করে দিলেও তার পড়বার ভয় নেই। নিজেদের প্রয়োজনেই শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমাজ তাকে নিজেদের স্তরে প্রতিষ্ঠিত করবে, তার মতো প্রতিভাবান শিক্ষিত কর্মঠ মানুষকে বাদ দিলে এদের চলবে না।

সে বিশেষভাবে শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানকে ভাড়া খাটিয়েই ধনোৎপাদন হয়। বৈজ্ঞানিকের মূল্য আছে।

শুভর কোষ্ঠী যে তৈরি করেছিল তার নাম প্রণবেশ্বর—বিখ্যাত পণ্ডিত আর জ্যোতিষী। তার ভক্ত ও গ্রাহকদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো রাজা মহারাজা ও ধনী ব্যবসায়ী আছে। সত্তর বছর বয়সে আজও তার স্বাস্থ্য দেখলে সত্যই অবাক হয়ে যেতে হয়। মাথার চুল এখনও পাকেনি। কোনোদিন নাকি পাকবেও না ! কারণটা তার কালো রং করা চুলের দিকে চেয়ে খুব কম লোকেই ধরতে পারে। তার বেশ ও চেহারায় শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবটা অতিশয় প্রকট।

প্রণবেশ্বর পর্যন্ত পায়ের ধুলো দেয় শুভর হোটেলের ঘরে।

অন্যেরা সযত্নে যে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছিল, প্রণবেশ্বর তাই নিয়েই কথা শুরু করে !

বলে, জগদীশের কাছে সব শুনলাম। তোমরা পিতাপুত্র কেউ দোষী নও, কেউ দায়ি নও এ ঘটনার জন্য। তোমাদের সাধ্য ছিল না ঠেকাও ! এ বছর তোমার যে ফাঁড়ার কথা লিখে দিয়েছিলাম, এটা হল সেই ফাঁড়া।

বলে, ফাঁড়াটা ছিল গুরুতর। জগদীশ অনেক চেষ্টায় গুরুত্ব কমিয়ে সামান্য ব্যাপাবে দাঁড় করিয়েছে। তোমার বিশ্বাস নেই, থাকলে হয়তো একেবারে এড়ানো যেত।

শুভ প্রশ্ন করে, আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, ফাঁড়া তো ছিল আমার, বাবার ক্ষতি হল কেন ?

প্রণবেশ্বর আশ্চর্য হয়ে বলে, জগদীশের ক্ষতি কীসের ? ত্যাজ্যপুত্র করে দিলে তুমি কোথায় দাঁড়াবে ভাব দেখি ?

শুভ বলে, ও।

সকলেই আসে, আসে না শুধু মায়া।

শুভ তাকে টেলিফোন করে। বলে, তুমি বাদ গেলে যে ? এসে কিছু সদুপদেশ দিয়ে যাও।

মায়া বলে, কেন যাইনি শুনবে ? তোমায় সামনে দেখে গায়ের জ্বালা বেড়ে যাবে বলে !

শুভ বলে, ও !

জানাচেনা যে যেখানে ছিল সকলকে জগদীশ ছেলের কাছে পাঠায় এক ভেবে, ফল হয় তার বিপরীত।

সমবেতভাবে ওদেরই অনুচ্চারিত আশ্বাসে শুভর যেটুকু দ্বিধা ছিল তাও কেটে যায়।

সকালে সে দেখা করতে যায় জগদীশের সঙ্গে।

শুভ এসেছে শুনে মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায় জগদীশের, মুখে প্রশান্ত হাসি ফোটে। কত যুগের কত রাজা বাদশার দম্ভ যে লুকানো থাকে সেই হাসির আড়ালে।

সেদিন রাত্রে বাড়াবাড়ি করে ফেলার জন্য অনুশোচনার অন্ত ছিল না, এখন মনে হয়, হয়তো বাড়াবাড়ি হয়নি মোটেই ! বড়ো বেড়ে যাচ্ছিল শুভ. ও রকম একটু কড়া তাগড়ানিই হয়তো তার দরকার ছিল।

এবার থেকে শুভ একটু সামলে সুমলে চলবে।

ছেলের সামনে মুখোমুখি বসে কিন্তু জগদীশের উল্লাস ঝিমিয়ে আসে।

শুভর শান্ত মুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। জগদীশ টের পায় সেদিনেব ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতেই শুভ এসেছে কিন্তু তার সঙ্গে মিটমাট করতে আসেনি। তাই বটে অত সহজে নত হবার ছেলে তো তার নয় !

জগদীশ নিজেই কথা শুরু করে। বলে, তুমি এসে ভালো করেছ, তোমার আমার দুজনেরই মান রেখেছ। এটুকু আশা করছিলাম তোমার কাছে। বুড়ো বাপকে দিয়ে মাপ চাওয়ালে ছেলেব মান বাড়ে না।

শুভ বলে, আমার রাগ বা অভিমান নেই, সেদিনেব ব্যাপার তুচ্ছ করে দিয়েছি। কিন্তু—

তার 'কিন্তু' শুনেই মনের আকাশ আঁধার হয়ে যায় জগদীশের।

আমার কথাগুলি বুঝবার চেষ্টা করবেন। আমি যা ঠিক করেছি তার সঙ্গে সেদিনের ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই।

শুভ বলে, জগদীশ শোনে। কারও দোষে নয়, স্বাভাবিক নিয়মেই তারা দুজনে দু-জগতের মানুষ হয়ে গেছে—ছেলের মুখে এ কথা শুনবার অনেক আগে থেকেই জগদীশ অনুভব করে তারা শুধু দু-জগতের মানুষ নয়, দুটি অনেক দূরের জগতেব মানুষ

শুভর কথা শেষ হলে জগদীশ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

তোমার কথার মানে বুঝলাম না। তুমি ভিন্ন থাকবে, আমাব কাছে পয়সাকড়ি নেবে না, তবু সম্পর্ক থাকবে কী করে ? সে সম্পর্কের মানে কী ?

কী বলবে ভেবে পায় না শুভ। জমিদারির সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়েও সম্পর্ক বজায় রাখার মানে সত্যিই জগদীশ বুঝবে না।

সে ভেবেচিন্তে বলে, আসল কথা, আমাদের কোনো মনোমালিন্য নেই, পরেও থাকবে না।

মনোমালিন্য নেই ? তুমি আমার ছেলে, আমি চোখ বুজলে সব ধনসম্পত্তি তোমার হবে—তবু তুমি আমার পয়সা ছোঁবে না বলছ। এ তো মনোমালিন্যেরও বাড়া ! সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া। ভিন্ন থাকতে চাও সে আলাদা কথা, তোমার খুশির কথা। তুমি এ বাড়িতে থাকতে পার, নতুন বাড়ি কিনতে পার—

প্রশ্নটা তা নয়। আপনার টাকা নিলে আমাকে খানিকটা জমিদারেব ছেলে হতেই হবে। আপনি অনেক স্বাধীনতা দিয়েছেন, আরও হয়তো দিতে বাজি হবেন. কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমি পাব না।

স্থির দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে থেকে শুভকে জগদীশ জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমায় ঘৃণা কর ?

না। আপনি যে ফাঁদে জড়িয়ে আছেন সেটাকে ঘৃণা করি।

কয়েক মুহূর্তে মাথা নিচু করে থেকে শুভ মুখ তুলে বলে, একটা সহজ মীমাংসা আছে বাবা।

বাবা ! এখনও শুভ তাকে এমন সহজভাবে বাবা বলে ডাকে ! দেহে রোমাঞ্চ হয় জগদীশের। সাগ্রহে সে বলে, কী মীমাংসা ?

জমিদারি বিক্রি করে দিন। আমি আপনার টাকাও নেব, আপনার সঙ্গেও থাকব।

তোমার অনেক অনুগ্রহ। জমিদারি বিক্রি করে তোমায় নগদ টাকা দেব, তুমি শিল্পোন্নতির নামে টাকাগুলি উড়িয়ে দেবে। এই কি তোমার শেষ কথা ?

শুভ চুপ করে থাকে। জগদীশ নীরবে উঠে যায়।

শুভ ভাবে, এখন অন্য কারও সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিতে গেলে হয়তো সেটা চিরবিদায় নেওয়ার অভিনয়ে দাঁড়িয়ে যাবে ! তার চেয়ে নিঃশব্দে সরে পড়াই ভালো। দেখা সকলের সঙ্গে হবে বইকী।

জগদীশ দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ি বারান্দার নীচে। শুভ গাড়িতে উঠতে যাবে, সে বলে, এ গাড়িটা আমার টাকায় কেনা শুভ।

গাড়ির দরজাটা কেবল খুলেছিল, সেটা আবার বন্ধ করে দিয়ে শুভ নীরবে গেটের দিকে হাঁটতে থাকে।

একবার সাধ হয় যে বলে তার হাতের ঘড়ি থেকে পরনের জুতো পোশাক সবই জগদীশের পয়সায় কেনা, এ সবও কি খুলে রেখে যাবে ?

হীন হবার লোভটা শুভ প্রাণপণে জয় করে।

জগদীশ সেই দিনই সপরিবারে বারতলায় ফিরে যায়। কয়েক দিন পরে শুভ খবর পায়, জগদীশ নব-শিল্প মন্দির বন্ধ করে তালা এঁটে নিয়েছে।

আরও খবর পায়, হঠাৎ যেন পাগলের মতো শুরু করে দিয়েছে অত্যাচার। কারণে অকারণে যাকে তাকে ধরে মারছে, ঘরের চালায় আগুন লাগাচ্ছে, হাঙ্গামা বাধিয়ে ডেকে আনছে পুলিশ।

নন্দ এসেছিল। সে বলে, সামলাবার চেষ্টা করবি না ? নিজেই তো মারা পড়বেন ?

শুভ ম্লানমুখে বলে, উপায় কী !

বারতলার গেঁয়ো মানুষগুলির জন্য শুভর মন কেমন করে। বিশেষভাবে লক্ষ্মীর জন্য।

ছেলেবেলা থেকে তার জীবন কেটেছে শহর আর ওই গ্রামে। কিন্তু গেঁয়ো মানুষগুলির কাছাকাছি থেকেও সে তো কোনোদিন এক হয়ে যেতে পারেনি ওদের সঙ্গে, কোনোদিন তলিয়ে জানতে পারেনি ওদের জীবন। আধখানা জানা-চেনা মানুষগুলি তাকে টানে ওদের আরও আপন করার জন্য তারই কামনা দিয়ে। ওদের চালচলন ধরনধারণ আর জীবনযাপনের রকমটা জানাই শুধু নয়, ওদের চেতনার অলিগলির সন্ধান জানার আগ্রহ তার চিরদিনই ছিল, এবার সেটা আরও জোরালো হয়েছে।

চাষি মেয়ে তার কাছে ছিল পাপড়ি বোজা ফুলের মতো। তার কাছেও কোনো ফুল কখনও দল মেলবে দু-একটি করে, এ আশা শুভর ছিল না। লজ্জা আর ভীরুতার দুর্ভেদ্য আবরণে কিনা অনেক ফাটল ধরেছে লক্ষ্মীর, তাব সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়ে ওই চিররহস্যময়ী ফুলটির দুটি একটি পাপড়ি খুলে যেতে শুরু করেছে, লক্ষ্মীর টানটা তাই সে অনুভব করে সব চেয়ে বেশি।

জগদীশ যেন পিতৃত্বের অধিকার খাটিয়ে এ টানটা দমিয়ে রেখেছিল, বাপের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতেই জোরালো এবং বাস্তব হয়ে উঠেছে। আরেকটা আতঙ্কও ঘুচে গেছে তার। এই টান যেন বংশগত সেই রোগটাও তার সারিয়ে দিয়েছে—লক্ষ্মীর মতো চাষির ঘরের মেয়ে বউকে গায়ের জোরে ভোগ করার হঠাৎ জাগা দুর্দান্ত কামনা।

গাঁয়ের এই টান, লক্ষ্মীর এই টান, ভারী খুশি করে শুভকে। সে তবে সত্যিই দেশকে ভালোবাসে !

কর্তব্য হিসাবে ভালোবাসা নয়, সত্যই তার তবে প্রাণের টান আছে !

পৃথিবীতে সব চেয়ে অগ্রসর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েও বৈজ্ঞানিক হিসাবে পৃথিবীর সব চেয়ে অগ্রসর মানুষগুলির একজন হয়েও, সত্য সুন্দর মার্জিত জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েও সে দেশের শিক্ষাদীক্ষা-হীন গরিব নোংরা অসভ্য মানুষগুলির জন্য দরদ ভুলে যায়নি !

এ কী সহজ আত্মপ্রসাদের কথা একজন মানুষের পক্ষে !

চারিদিকে তোলপাড় চলেছে বাপের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ নিয়ে, জগদীশ নতুন করে তাণ্ডব জুড়েছে অত্যাচারের, এ সময় কিছুদিন তার পক্ষে বারতলায় যাওয়াটা সঙ্গত হবে না। গেলে

সোজাসুজি শত্রুতায় নামতে হবে জগদীশের সঙ্গে—প্রজাদের পক্ষ নিয়ে তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

জেনেও শুভ সাতদিনের বেশি ধৈর্য ধরতে পারে না।

মায়া শুনে আশ্চর্য হয়ে বলে, সে কী ! তোমার যাওয়া কি ঠিক হবে ?

একটু ঘুরে চলে আসব।

লোকে কী ভাববে ? তোমার বাবা শুনে কী ভাববেন ? মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলেও শুভ কথাটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেয়।

মায়া কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করে, কেন ? বারতলা যাবার এত তাগিদ কেন তোমার ?

শুভ গর্বের সঙ্গে হেসে বলে, আসল কথা কী জানো, গাঁয়ের জন্য আমার মন কেমন করছে।

তাই নাকি।

শুভ ভেবেছিল, যাদের জন্য সে নিজের বাপকে ছেড়েছে, একটা জমিদারি ছেড়েছে, বারতলা স্টেশনে পা দেওয়া মাত্র তাদের মধ্যে নিশ্চয় সাড়া পড়ে যাবে। লোকে বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকাবে আর নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস আলোচনা চালাবে।

সে তো আর জমিদারের ছেলে নয়, এবার তাকে আত্মীয় ভাবতে কারও অসুবিধা হবে না। স্টেশন থেকে নন্দর বাড়ি পর্যন্ত সে হেঁটে যাবে, পথে চেনা-অচেনা সকলের সঙ্গে কথা বলবে, আরও অবাক হয়ে যাবে সকলে। জগদীশের বিলাতফেরত ছেলে এতখানি নিরহংকার ! এমন সহজ সাদাসিদে ভাবে সে তাদের আপন হতে চায় ! আগে সে যে তাদের আত্মীয় হতে চেয়েছিল তার মধ্যে তবে সত্যই কিছুমাত্র ফাঁকি ছিল না।

এ তো একটা খাঁটি মানুষ ! তাদের আপন মানুষ !

কিন্তু এই গাঁয়েও যেন এত ব্যতিব্যস্ত মানুষ যার যার নিজের জীবনযাত্রা নিয়ে যে স্টেশনে গাড়ি থেকে নেমে পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেও কয়েকটির বেশি কৌতূহলী চোখ তার দিকে পড়ে না, দু-একজন চেনা মানুষ ছাড়া বেশি লোকের সঙ্গে হাসিমুখে সহজভাবে কথা বলার সুযোগ জোটে না।

জগদীশের সঙ্গে তার যে এত কাণ্ড হয়ে গেল সে জন্য উত্তেজিত হয়ে মাথা ঘামাবার সময় যেন গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকের নেই। কেবল তার নিজের প্রয়োজনে কেবল তার নিজের জীবনে যে যেন ওই নাটকটা ঘটিয়েছে—তার সঙ্গে গাঁয়ের লোকের সম্পর্ক নেই।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সনাতন আর গজেন কথা বলছিল। তাকে দেখেই ওরা সাগ্রহে এগিয়ে আসে।

শুভ খুশি হয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ তোমরা ?

গজেন গোমড়া মুখে বলে, রাখছেন কই যে থাকব ? আপনি কারখানাটা সায়েব আর মাড়োয়ারিকে বেচে দেবেন, মোদের উচ্ছেদ করবেন, এ তো ভাবতে পারিনি ছোটোবাবু !

সনাতন বলে, আপনে না মোদের ভালো চাইছিলেন ? মাগিটার আঁতুড়ে যেতে লাগবে আরও কটা দিন, বলছেন কিনা তিনদিনের মধ্যে উঠে না গেলে ঘরটা ভেঙে দেবেন, মেরে খেদিয়ে দেবেন ! এ কেমন কথা ছোটোবাবু ?

দেশে ফিরে বিমানঘাঁটি থেকে জগদীশের সঙ্গে গাঁয়ে ফেরার দিনটির কথা শুভর মনে পড়ে। ছেলের জন্য অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা আশা করে হতাশ হয়েছিল জগদীশ। জনা লেভেল ক্রসিংয়ে ভিড় দেখে উৎফুল্ল হয়েছিল জগদীশ। কিন্তু ভিড়টা জমেছিল ভুলা বাগ্দির ছেলে বলাই ট্রেনে কাটা পড়েছিল বলে ! মনটা বিগড়ে যায় কিন্তু হাসিও পায় শুভর।

আমায় দোষী করছ ? তোমরা জান না বাবা আমায় ত্যাগ করেছেন, খেদিয়ে দিয়েছেন ?

কথাটা বলেই শুভর খেয়াল হয় ইচ্ছে করে না হলেও সে মিথ্যা কথা বলেছে। জগদীশ তো তাকে ত্যাগ করেনি, তাড়িয়ে দেয়নি। সে-ই ত্যাগ করেছে জগদীশকে, সেই তাড়িয়ে দিয়েছে জগদীশকে, তার স্বাধীন স্বতন্ত্র আগামী জীবনের বর্তমান সীমানারও বাইরে।

গজেন ধীরভাবে বলে, বিবাদ হয়েছে শুনছিলাম। তাড়িয়ে দিয়েছেন ? তাই বটে, আপনি কী এ কাজ পারতেন !

সনাতন কিছুই বলে না। তাদের নিস্পৃহ ভাব এবার দমিয়ে দেয় না শুভকে, ব্যাপারটা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হওয়ায় বরং সে স্বস্তি বোধ করে। তাকে পুরোপুরি আপন ভাবতে এখন অনেক সময় লাগবে এদের—চিরদিনের জন্যই কার যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে বাপের সঙ্গে অনেকদিন ধরে তার অনেক প্রমাণ দরকার হবে। বিবাদ হয়েছে ? কিন্তু বিবাদ তো বাপ-ব্যাটাতে—বিবাদ হলেই তো এ সম্পর্ক ঘুচে যায় না !

ঝগড়া মিটে গিয়ে একদিন তাদের আবার মিল হবে না কে বলতে পারে ? সংসারে অমন কত হচ্ছে ! ভদ্রঘরের অহেতুক ফাঁকা অভিমান শুভর অনেকখানি কেটে এসেছিল। এদের মনোভাব টের পেয়ে আহত হবার বদলে সে বরং খুশিই হয়।

শুধু সাময়িক ত্যাগ দিয়ে এদের কেনা যায় না, হাজার পিছিয়ে থাকলেও এরা শিশু নয়, এদের সাংসারিক সহজ বাস্তববোধ আছে—এটুকু না জানলে সে কোনোদিন এদের আপন হতে পারত না।

সে প্রশ্ন করে, তোমরা কী করবে ঠিক করেছে ?

মোরা উঠব না।

ঠিক। ন্যায্য অধিকার ছাড়বে কেন ? দেখি, আমি কতটুকু কী করতে পারি।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে শুভ এগিয়ে যায়। দুপুর রোদে হাঁটতে তার ভালো লাগে। মনটা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেছে। যত ভাবে ততই সে আশ্চর্য হয়ে যায় যে কত সহজ একটা কথা সে ধরতে পারেনি এতদিন ! সংসারে বাপ ছেলেতে বিবাদ হয়, বাপ ছেলেকে ত্যাগও করে—যে কারণেই হোক, একটা আদর্শের জন্য বাপের সঙ্গে তার লড়াই হয়েছে, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, তাতে এদের কী আসে যায় ? তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শের লড়াই সম্পূর্ণরূপে তারই নিজস্ব ব্যাপার। এদের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক কীসের ? কত কী ত্যাগ করে সে কতখানি মহৎ হয়েছে এদের লাভ-লোকসানের হিসেবে সে প্রশ্নটাই অবাস্তব !

এদের লড়াইকে সে যতটুকু এগিয়ে দেবে এদের কাছে তার মূল্য শুধু সেইটুকুর।

সে জন্য তার নিজের প্রয়োজন থাকতে পারে আদর্শের এবং ত্যাগ স্বীকারের—সেটা একেবারেই আলাদা কথা !

নন্দর বাড়ি যাবে ভেবেছিল, তালতলার মোড়ে এসে সে বাঁদিকে পাক নেয় লক্ষ্মীর বাড়ির দিকে।

লক্ষ্মী খুশি হয়ে সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানায়, দাওয়ায় পাটি বিছিয়ে বসতে দেয়।

বলে, আমি জানতাম আপনাদের বনবে না। মানুষের দোটানা সয়, তেটানা মানুষ সইতে পারে ?

তেটানা ?

জ্ঞানী মানুষ, জ্ঞানচর্চার একটা টান। দেশের সব মুখ্যু মানুষের জন্য একটা টান। ঘরের টানটা খাপ খেল না কোনোটার সঙ্গে। এ রকম অবস্থায় পড়লে মানুষকে ঘর ছাড়তেই হয়। মানুষ সন্ন্যাসী হয়েই যাক আর অন্য যা করতেই যাক।

কত সোজা ব্যাখ্যা !

লক্ষ্মী এবার যেন আরও সহজ আর খোলাখুলিভাবে আলাপ করে। গজেন আর সনাতনেরা না করুক, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করাব জন্য লক্ষ্মী তাকে আরও একটু আপন করে নিয়েছে সন্দেহ নেই।

জগদীশের কথাও বলে লক্ষ্মী। বলে, যাদের সঙ্গে ভাব করেছিলেন, বেছে বেছে তাদের উপরেই ঝাল ঝাড়ছেন বেশি করে। আমাদের ডাক্তারের বাড়ি দুবার চুরি, একবার আগুন দেবার চেষ্টা হয়েছে। তারপর দুটো মিথ্যে মামলা জুড়েছেন।

নন্দ তো সেদিন বললে না কিছু ?

তখনও বোঝা যায়নি। এমনি চোর এসেছে, কেউ হিংসে করে চলায় আগুন দেবার চেষ্টা করেছে। ডাক্তার মানুষের তো শত্তুরের অভাব নেই। চিকিৎসা করে কাউকে বাঁচানো গেল না, দোষ হল ডাক্তারের। কেউ মিথ্যে সার্টিফিকেট চেয়ে পায়নি, তার হল গায়ের জ্বালা। মামলা দুটো শুরু করাতে বোঝা গেল গায়ের জ্বালাটা কার। একদল ছেলে আব চাষিরা মিলে পাহারা দেবার জন্যে দল বেঁধেছে, সারারাত ডাক্তারের বাড়ি পাহারা দেয়। ওদিক দিয়ে সুবিধে হল না, মামলা জুড়ে হয়রান করো !

লক্ষ্মী হঠাৎ সুর পালটে বলে, কিছু মনে করছেন না তো ? যতই হোক বাবা তো আপনার !

শুভ গম্ভীর হয়ে বলে, গাল দিলে নিশ্চয় রাগ করতাম।

তা হলে আপনাকে বলেই রাখি। চারদিকে সবাই কিন্তু গাল দিচ্ছে, যাচ্ছেতাই বলে গালাগাল করছে।

তা করুক। আমার সামনে আমাকে শুনিয়ে না করলেই হল।

তবেই দেখুন সম্পর্ক তুলে দিলাম বললেই সম্পর্ক ঘুচে যায় না।

শুভ মাথা নেড়ে বলে, আমার কথার অন্যমানে। সম্পর্ক আছে কী নেই সে আলাদা কথা, আমার সামনে কেউ যদি বাবাটাকে গাল দেয় সে আমাকেই অপমান করার জন্য দেবে।

লক্ষ্মী ফস করে বলে বসে, তবে তো মুশকিল ! আজ না দিই, দুদিন বাদে দেখা হলে হয়তো আপনার সামনেই গাল দিয়ে বসব !

শুভ আপশোশেব সুবে বলে, বাড়াবাড়ি সইছে না, না ?

লক্ষ্মী বলে, এমনি নয সয়ে গেলাম, আমায় বেইজ্জত করার চেষ্টা হচ্ছে যে। শহর থেকে কতগুলি গুন্ডা এনে ছেড়ে দিয়েছেন, ওরাই সব তছনছ করে বেড়াচ্ছে। আমি তো একলাই এখানে ওখানে যাই, পরশু সন্ধ্যেবেলা পাকা রাস্তায় দুজন ধরবাব চেষ্টা কবেছিল। দুজন বলে বাগাতে পারেনি, দলে ভারী হলে কি রেহাই পেতাম ? তাহলে আপনার সামনেই গাল না দিয়ে কি থাকতে পারতাম আজ ?

শুভ নিশ্বাস ফেলে বলে, না, তুমি প্রাণভরে গাল দাও, আমি রাগ করব না। সাবধান হয়েছ তো ?

হয়েছি বইকী।

ঘণ্টাখানেক বসে শুভ। লক্ষ্মী আর কী দিয়ে আতিথ্য করবে, শুভকে সে এক গ্লাস ডাবের জল খাওয়ায়। গাঁদা ডাবের জলটা এনে দিয়ে আবার তফাতে সরে যায়। লক্ষ্মী ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ যে তার সঙ্গে কথা কইতে আসে না সেটা মোটেই খাপছাড়া মনে হয় না শুভর। লক্ষ্মীর কাছে সে খবরাখবর জানছে, লক্ষ্মীর সঙ্গে পরামর্শ করছে, না ডাকলে যেচে এসে কেউ তাদের আলাপে ব্যাঘাত করবে না।

আজ শুধু লক্ষ্মীর সঙ্গেই আলাপ করে উঠবে অথবা পাড়ার লোকজনকে ডেকে কিছুক্ষণ কথা বলবে ভাবছে, স্বয়ং মায়াকে এগিয়ে আসতে দেখে শুভর বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

কাছে এসে লক্ষ্মীকে চিনতে পেরে মায়াও যেন অবাক হয়েই চেয়ে থাকে।

কী ব্যাপার মায়া ?

ব্যাপার ? ব্যাপার আবার কী, আমারও মন কেমন কবতে লাগল, তাই দেখতে এলাম তুমি কী কাণ্ড করছ !

গাড়ি নিয়ে এসেছ ? একটা গাড়ি থামার আওয়াজ যেন পেয়েছিলাম।

পেয়েছিলে ? আশ্চর্য তো ! গল্প করতে করতে গাড়ি থামার আওয়াজ পর্যন্ত কানে গেছে।

মায়া একটু বাঁকা হাসি হাসে। শুভর মুখে বিরক্তি ফোটে। লক্ষ্মী হাসিমুখে সরলভাবেই বলে, এত কাণ্ডের পর উনি হঠাৎ গাঁয়ে এলেন আপনার ভাবনা হবে বইকী ! আসুন, বসুন।

মনে হয় দুজনেই যেন অপমান করছে মায়াকে—শুভ তার বিরক্তির ভাব দিয়ে আর লক্ষ্মী কিছু গ্রাহ্য না করে। কী কঠিন যে দেখায় মায়ার মুখ। বরফ জমানো সুরে বলে, না, বসব না। সেবারও হঠাৎ কারখানায় ঢুকে তোমাদেব আলাপে ব্যাঘাত করেছিলাম। তোমরা কথা কও, আমি বিদায় হচ্ছি।

শুভ গম্ভীর আওয়াজে কড়া শাসনের ভঙ্গিতে বলে, তোমার কি এ ছেলেমানুষি মানায় মায়া ? এ সব কি তোমার শোভা পায় ?

কিন্তু মায়ার কাছে তো অস্তিত্বই নেই বিস্তীর্ণ গ্রাম বা বিবাট গ্রাম্য জীবনের। দুবার হানা দিয়ে দুবারই সে শুভকে মশগুল হয়ে থাকতে দেখেছে এই গেঁয়ো মেয়েটাকে নিয়ে।

শুধু তাই নয়। কয়েকটা সিনেমায় সে তো দেখেছে কী ভাবে আজকের গরিব গেঁযো চাযিব মেয়ে শহরের বড়োলোকেব ছেলেদের বশ করে ! এ নিয়ে শুভর সঙ্গে তর্কেব নামে ঝগড়াও কী কম হয়েছে ! আর শুভকে সে স্পষ্ট বলেছে যে তার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান আর সংস্কৃতি নিয়ে, আদর্শ নিয়ে, বড়াই করাটাই ভন্ডামি। আসল কথায় তাদের আক্কেল গুড়ুম হযে গেছে। স্বাধীন সমান আধুনিক বউ সে চায় না, সে চায ভীরু নিরীহ সরল সুমিষ্ট চিরন্তন ভারতীয কাব্যের প্রতীকের মতো একটা বউ— যে একাধারে প্রিয়া এবং দাসী। শুভর জবাবগুলি হত খাঁটি। বউ আর প্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামাবাব সময় আর নেই এ দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকের।

মায়ার কান্না পায়। সে বুঝতে পারে যে হঠাৎ সে যদি সমস্ত হিসাব নিকাশ চিন্তা ভাবনা বিসর্জন দিয়ে শুধু নিরুপায় অসহায়ের মতো—ভিখারিনির মতো—এখন মূর্চ্ছিতা হযে পড়ে শুভর পায়ের কাছে—সমস্ত হিসাব সাময়িকভাবে বদলে যাবে। জগৎ সংসার ভুলে গিয়ে এই শুভ তাকে সুস্থ সচেতন করে তোলার জন্য পাগল হয়ে উঠবে।

কিন্তু তাকে সুস্থ আর সচেতন করেই আবার শুভ ফিরে আসবে। এই সরলা অবলা গেঁযো মেয়েটার টানে।

প্রেমের টানে নয়। সেটুক বুঝবার মতো বুদ্ধি মায়ার আছে। সব দিক থেকে বঞ্চিতা ধর্ষিতা দুঃখিনী মেয়েটাকে শুধু জানিয়ে দিতে যে সেও তার সঙ্গে আছে। বিদ্রোহ কবতে চেযে বিপদে পড়েছে। তাই তার সঙ্গে আছে।

শুভ আর লক্ষ্মী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মোটর চেপে গাঁয়ে এসে তেতুঁলগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কী ভাবছে মায়া ?

লক্ষ্মী আবার বলে, একটু বসে যান না ? হলই বা ছেঁড়া পাটি। ছেঁড়া পাটিতে কি বসতে নেই ?

মায়া যেন ঘুম ভেঙে বলে, কী বলছ ?

বসতে বলছি।

না, বসব না। আমি যাই।

শুভ বলে, ফিরে যাচ্ছ ? একটা কাজ করবে ? কাউকে দিয়ে আমার সুটকেসটা পাঠিয়ে দেবে ?

তুমি থাকবে নাকি ?

হ্যাঁ, ক-দিন থাকব ভাবছি।

মায়ার চোখে আগুনের ঝিলিক মেরে যায়।

সুটকেসটা পাঠাব কোথায় ? তোমার এই লক্ষ্মীর এখানে এনে দিয়ে যাব ?

শুভ বলে, আমি কোথায় থাকব ঠিক নেই। গজেনের দোকানে হোক, এখানে হোক, নন্দর বাড়িতে হোক—যেখানে পার পৌঁছে দিয়ো। আমি ঠিক পেয়ে যাব।

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলে, সোজা কথা সহজ ভাষায় বোঝাতে পারেন না, কী লেখাপড়া শিখেছেন ?

মায়াকে বলে, লোক দিয়ে যদি পাঠান সুটকেসটা, তাকে বলবেন যেখানে হোক দিয়ে গেলেই হবে, ওঁকে খুঁজতে হবে না। আপনি নিজে যদি নিয়ে আসেন যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলে দেবে উনি কোথায় আছেন।

মায়া শুভর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, তোমাদের দুজনের কথাই বুঝেছি। আমি কিন্তু সোজা ফিরব না, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা করে যাব।

শুভ হেসে বলে, বেশ, বেশ, তাই যাও। বাবা খুব খুশি হবেন।

খুশি হোন বা না হোন..

খুব খুশি হবেন। হয়তো জমিদারিটাই তোমার নামে লিখে দেবেন।

তুমি ছোটোলোক হয়ে গেছ শুভ।

ভাগ্যে হয়েছি !

মায়া আর দাঁড়ায় না। গটগট করে এগিয়ে যায়। লক্ষ্মী প্রায় ধমক দিয়ে শুভকে বলে, আপনি মিছেই লেখাপড়া শিখেছেন ! আপনারও মেয়েছেলের মতো অভিমান, একটা কথার ঘা সইতে পারেন না ? এখন কী করি আমি ?

দুহাতে দুটো ডাব ঝুলিয়ে ডোবার পাশ ঘুরে কচু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গাঁদা সামনে দাঁড়ায় মায়ার।

বলে, চলে যাচ্ছেন যে ? আপনার জন্যে ডাব নিয়ে এলাম, জল খেয়ে যান ?

তুমি গাঁদা না ?

গাঁদা খুশি হয়ে বলে, একদিন এক মিনিট দেখে আমাকে আপনার মনে আছে !

একদিন দেখে নয়। তোমার কথা অনেকবার শুনেছি।

মায়া খানিকক্ষণ একদৃষ্টে গাঁদার মুখের দিকে চেয়ে থাকে.

গাঁদা, মহিম আসেনি ?

নাঃ।

ছাড়া পাবে শুনেছিলাম ?

হ্যাঁ, ছাড়া পাচ্ছে। জেল থেকে অত সস্তায় ছাড়া পায় না।

মায়া ভেবেচিন্তে বলে, তুমি তো মুশকিল করলে।

কেন ?

ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যাচ্ছি। তুমি বলছ ডাবের জল খেতে। আমি এখন কোনদিক রাখি !

গাঁদা সঙ্গে সঙ্গে বলে, সব দিক রাখুন। ওদের সঙ্গে ভাব করুন, আমার ডাবের জল খান।

মায়া রুমাল দিয়ে মুখ মোছে।

এক্ষুনি ঝগড়া করলাম, এক্ষুনি যেচে গিয়ে ভাব করব ?

যেচে ভাব করাই তো ভালো। আপনিই জিতে যাবেন। সত্যিকারের ঝগড়া তো আর হয়নি সত্যিসত্যি !

মায়া পায়ে পায়ে ফিরে যায়। ধীরে ধীরে পাটিতে বসে। কেউ কথা কইতে সাহস পায় না—লক্ষ্মী পর্যন্ত নয়। গাঁদা ঠিক কথাই বলেছে, যেখানে সত্যিকারের ঝগড়া নেই সেখানে যে যেতে ভাব করে সে-ই জিতে যায়। তাকে আবার চটিয়ে দেবার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না !

গাঁদা অজস্র কথা বলে। নিজেই ডাব কেটে গেলাসে জল ঢেলে মায়ার হাতে তুলে দেয়।

এক নিশ্বাসে গেলাসের জলটা খেয়ে মায়া একটা নিশ্বাস ফেলে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে যেন একটা বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত করেছে এমনিভাবে সে বলে, তোমার যেখানে সেখানে থেকে কাজ নেই। অসুখ-বিসুখ হয়ে যাবে। যতক্ষণ দরকার থাকো, আমিও থাকছি, আমার সঙ্গে ফিরে যাবে।

শুভ ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে, যেখানে সেখানে মানে ?

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলে, আহা, কথাটা বুঝলেন না ? উনি কী সেভাবে বলেছেন কথাটা ? উনি বলছেন, আপনার অভ্যাস নেই। মশার কামড় খাওয়া, ডোবা পুকুরের জল খাওয়া, এ সব অভ্যাস নেই, হঠাৎ সইবে না। উনি ঠিক বলেছেন, আমিও তাই বলি। হঠাৎ বাড়াবাড়ি করে অসুখ বাধিয়ে লাভ কী ?

লক্ষ্মী একগাল হাসে, না বোন, ভাবনা নেই। তোমার উনি তোমার সঙ্গেই ফিরে যাবেন।

শুভ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, তোমরা দুজনে মিলে আমায় যেন খোকা বানিয়ে দিলে।

বাতাসে ঝিরঝির শব্দ হয় তেঁতুলগাছের পাতায়। ঘন ছায়ার এখানে ওখানে অবিরাম ঝিকমিক করে আলোর রেখাগুলি কাঁপে।

পাশাপাশি



পাশাপাশি প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

১

লোকে বলে, বসকষ নেই, ভোঁতা মানুষ।

বাড়ির লোক আরও বাড়িয়ে বলে, দয়ামায়া নেই, হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মানুষ।

কেনই বা বলবে না লোকে, ঘরের এবং বাহিরের।

বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে, স্বাস্থ্য ভালো, চেহারা ভালো, চাকরি করে ছাঁকা তিনশো টাকা মোটা বেতনের। ঘরে ঘরে যখন বেকার, তখন তার এমন চাকরি ! এ রকম একটা চাকরি বাগিয়ে কত কিছু করার প্ল্যান আঁটে জোয়ান ছেলেবা, স্বপ্ন আর কল্পনা দিয়ে ! চাকরি বাগিয়েও সে কিছুই চায় না। অথচ একটা অদ্ভুত নিরুত্তেজ যান্ত্রিক জীবনযাপন করে চলেছে। তার যেন কোনো শখ নেই আবেগ নেই উত্তাপ নেই।

বউ চায় না, নেশা করে না, সিনেমা দেখে না, জুয়া খেলে না। মেয়েদের সাথে মেলামেশা, বন্ধুর সাথে মজার কথা রসের কথা কেচ্ছার কথা, কোনো কিছুতে রুচি নেই। কাউকে স্নেহমায়া দেয়ও না, নিজের জন্য চায়ও না।

অথচ গোমড়া মুখেও দিন কাটায় না, ব্যথাবেদনা বিষণ্ণতার আমেজ মেলে না তার কাছে। তাহলেও অন্তত অনুমান করা যেত সকলের অজ্ঞাতে হয়তো জীবনে তার কিছু একটা ঘটেছে, মনটা কোনো কাবণে বিগড়ে গেছে অথবা হয়তো ভেঙেই গেছে।

ও বকম মানুষ কি আর সংসারে নেই ?

জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেছে, বিষিয়ে তেতো হয়ে গেছে কামনা বাসনা, গভীর হতাশা নিয়ে জীবনেব হইহুল্লোড় এড়িয়ে হাঙ্গামা থেকে গা বাঁচিয়ে কোনো বকমে দিন গুজরান করা, দাঁড়িয়ে গেছে তার কাছে জীবনের মানে—এ রকম বৈরাগ্যের একটা মানে বোঝা যায়।

এ মানুষটা একেবারেই ও রকম নয়।

বৈবাগ্যেব ধার ধারে না।

সাধারণভাবে লোকের সঙ্গে মেলামেশা হাসিগল্প বজায় আছে ঠিকই। রোয়াকের বৈঠকে নগদ নগদ উত্তেজক সংবাদ ও সমস্যা নিয়ে গলাবাজির সময় হাজির থাকলে তার গলা না চড়লেও সে চুপ করে থাকে না।

রাত্রে দিব্যি ঘুমায়। পেট ভরে খায়। সংসারের খুঁটিনাটি সব বিষয়ে নজব রাখে।

কঠোর নিয়মে সংসার চালায়।

বাপ-মা ভাইবোনের সংসার।

নিয়মমতো আপিস করে, সন্ধ্যার পর বাড়তি খেটে বাড়তি রোজগার করে, বই পড়ে, কাগজ পড়ে।

কিন্তু জীবনটা রসালো করার জন্য, জীবনে রং ও বৈচিত্র্য আনার জন্য কিছুই করে না।

নির্দোষ তাসপাশা খেলায় পর্যন্ত তার মন বসে না।

বিয়ের কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেয়।

হাসে সত্যই কিন্তু এমন এক কঠোর দৃঢ়তার সঙ্গে কথাটা উড়িয়ে দেয় যে পীড়াপীড়ি করার সাহস হয় না বাড়ির লোকের।

কল্পনা মুখ বাঁকিয়ে বলে, বিয়ে করবে কী ! বউ তো আর পুতুলটির মতো উঠবে বসবে না, আমরা যেমন করি। বউয়ের চেয়ে কর্তালি ভালো লাগে দাদার।

আলপনা বলে, ভালো লাগে না ছাই ! দাদার ভালো লাগালাগিই নেই। কর্তালি করতে হবে তাই কলের মতো করে ! দাদার বুকটা পাথর দিয়ে গড়া।

পিঠোপিঠি দুটি বোন। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে দুজনেরই। আজকালকার বিয়ের বয়স। দাদার সম্পর্কে তাদের সমালোচনার মূল কথাটি সম্পর্কে সকলেই একমত। সুনীল যে বিয়ে করে না তার অন্য কোনো কারণ নেই, তার ধাতটাই একমাত্র কারণ।

মানুষটাই সে ওই রকম !

স্নেহমায়া প্রেমভালোবাসা তেতো নয় তার কাছে, সে কোনো স্বাদই পায় না ও সব ঘরোয়া হৃদয়গত ভাবের কারবারে, আদানপ্রদান দেনাপাওনায়। ঘরসংসারে তার বিতৃষ্ণা নেই, রোগশোক দুঃখযাতনা-ভরা জীবনের উপর মনটাও তার বিষিয়ে যায়নি—তাহলে তো বৈরাগ্য আসত !

ওর হৃদয়টাই ভোঁতা, অনুভূতির বালাই নেই। অনুরাগের তাপেও গলে না, বিরাগের হিমেও জমে না।

সংসার চলে সুনীলের আয়ে।

ভূপেশ পেনশন পায় মোটে পঞ্চান্ন টাকা।

সংসারে তাই সুনীলের কথার ওপরে আর কথা নেই। কিন্তু সে হম্বিতম্বি করে না বা কড়া শাসনে সকলকে দাবিয়েও রাখে না। ভূপেশ বরং দিনে দশবার রাগে আর চেঁচামেচি করে।

তবু সকলে নিষ্ঠুর ভাবে সুনীলকেই !

তার সংসার চালাবার হৃদয়বর্জিত নীতিটার জন্য। এ নীতিতে প্রয়োজনের আপেক্ষিক ওজন ছাড়া কোনো হিসাব নেই, কারও এতটুকু আলগা শখ বা আবদার প্রশ্রয় পায় না।

প্রাণপণে লাগাম টেনে খরচ করার প্রয়োজনটা সবাই বোঝে বইকী। দুটি বোন একটি ভাই কলেজে, আর দুটি ভাই একটি বোন স্কুলে পড়ে—কঠোর হিসাব ছাড়া এত বড়ো সংসার কি এই আয়ে চলে ? কিন্তু এ কেমন হিসাব সুনীলের ! সব রকম বিলাসিতা নয় বাদ গেল, একদিন পরে একবেলা এক টুকরো মাছ খাওয়া থেকে রোজের এক সের দুধ মেপে মেপে কে কতটুকু খাবে, আর কে এক ফোঁটাও খাবে না সে নিয়ম পর্যন্ত সব কিছু মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু সামান্য পয়সায় মেটানো যায়, এমন দুটো-একটা তুচ্ছ সাধও কেন বাতিল হয়ে যাবে ? সুনীল কেন ভুলেও একদিন অল্প দামের একটি উপহার এনে কারও মুখে হাসি ফোটাবে না ? ছোটো বোনটিকে দুটো পুতুল কিনে দিলেই কি অচল হয়ে যাবে সংসার ? ভূপেশ তো সামান্য হাতখরচের টাকা থেকে মেয়েকে পুতুল কিনে না দিয়ে পারে না !

এবং তাতে সংসারের অনটন বেড়েও যায় না।

তবু হয়তো একটু কম হৃদয়হীন ভাবা যেত তাকে, বুড়ো মা-বাবা আর ভাইবোনদের তুচ্ছতম সাধ-আহ্লাদও মেটাতে পারে না বলে একটু যদি ম্লান দেখাত তার মুখ, একটু যদি সে আপশোশ করত। সে যেন গ্রাহ্যও করে না !

বাধ্য হয়ে কঠোর হওয়ার জন্য এতটুকু মন খারাপ করার বালাই তার নেই !

কল্পনার একটি শাড়ি না হলেই নয়।

কলেজে পরে যাবার কাপড় নেই। ও বাড়ির মায়ার পরনের শাড়িখানা দেখে হঠাৎ কী অদম্য সাধই যে জাগল কল্পনার—যে, সেও ওই রকম শাড়ি পরবে।

না পেলে বুক ফেটে মরে যাবে।

ওখানার দাম ষোলো টাকা। সুনীল তাকে তেরো টাকার একখানা কাপড় কিনে দেবে।

মা বলে, তিনটে টাকার মামলা তো, দে কিনে !

সুনীল মাথা নাড়ে।

এ মাথা নাড়ার মানে জানে কল্পনা। অনেকদিন পরে দাদার কাছে সে কেঁদে ফেলে বলে, তেরো টাকা ষোলো টাকা এত তফাত তোমার কাছে ?

অনেক তফাত।

তবে আরও কম দামের কিনে দাও।

ঘরে পরবার হলে তাই দিতাম। কলেজ যাবি না এ কাপড় পরে ? এর চেয়ে কম দামের কাপড় পরিয়ে তোমায় কলেজে পাঠিয়ে লাভ নেই, অন্য মেয়েদের দিকে তাকাবে আর পড়াশোনা মাটি করবে।

তাই যদি বলো তবে আর তিনটে টাকা দিয়ে ওটা কিনে দাও—খুশি মনে ভালো করে পড়াশোনা করব।

না। তোমার এ দুর্বলতাকেও প্রশ্রয় দিতে পারব না।

মালতী বোনের পক্ষ নিয়ে বলে, কী বলছ তুমি ? তেরো টাকারটা পরলে দুর্বলতা হবে না, ষোলো টাকারটা পরলেই হবে ?

সুনীল বলে, হবে না ? তেরো টাকারটা কিনে দিচ্ছি বাধ্য হয়ে, কলেজে পড়াতে হলে না দিয়ে উপায় নেই। অন্য মেয়েরা ভালো শাড়ি পরে আসবে, সে জন্য ওকে দায়ি করা যাবে না। সস্তা শাড়ি পরে যাবার মতো মনের জোর ওর নেই—কিন্তু সেটা দুর্বলতা নয়। তেরো টাকায় যেখানে চলে সেখানে শখের জন্য ষোলো টাকা লাগানোটা দুর্বলতা।

বাবা তোমার কী হিসেব !

হিসেব করি বলেই কলেজে পড়তে পাবছ। মিছে আবদার করিসনে কল্পনা—ষোলো টাকা কেন সাড়ে তেরো টাকা হলেও আমি ও কাপড়টা তোমায় কিনে দিতাম না।

কিন্তু এবার ছাড়ে না কল্পনা। সেও তো সুনীলেরই বোন। না খেয়ে শুয়ে থেকে ভূপেশের কাছে তিনটি টাকা আদায় করে সুনীলের কেনা কাপড় বদলে সাধের কাপড়টি কিনে আনে।

সুনীল রাগে না, কিছু বলে না। ফিরেও তাকায় না।

মা তবু মিনতি করে বলে, যেতে দে, কিছু বলিস না ওকে। ছেলেমানুষ তো !

সুনীল গম্ভীর হয়ে বলে, আমার কী বলার আছে ? নিজে চেষ্টা করে টাকা জোগাড় করেছে, আমি তো বাড়তি টাকা দিইনি।

সামান্য ব্যাপারে বাপের উপরেও চটতে নেই কিন্তু।

চটব কেন ? মেয়েকে তিনটে টাকা দেবার স্বাধীনতা বাবার নেই ?

কল্পনা কান পেতে শোনে।

শখের শাড়িটা বাগানোর আনন্দ যেন বড়ো তাড়াতাড়ি উপে যাচ্ছিল। উদাসীন নির্বিকার হয়ে না থেকে একটু যদি রাগ করত দাদা, একটু যদি দেখাত যে ছোটো বোন কথা না শোনায় তার মনে আঘাত লেগেছে !

শাড়িটা কিনে অপরাধ করেছে এই অনুভূতিটাই জোরালো হচ্ছিল কল্পনার।

মা আর দাদার আলাপ শুনে তখনও যেটুকু আনন্দ অবশিষ্ট ছিল তাও উপে যায় কল্পনার।

সুনীল আপিস থেকে ফিরলে ম্লান মুখে কাছে গিয়ে বলে, দাদা, রাগ কোরো না, এবারের মতো মাপ করো।

সুনীল বলে, রাগ করব কেন ? নিজের চেষ্টায় নিজের সাধ মিটিয়েছিস, আমার রাগ করার কী আছে ? আমাকে জ্বালাতন করলে রাগ করতাম।

কল্পনা তার মুখের দিকে চেয়ে ভাবে, দাদার বুকটা কি পাথর দিয়ে গড়া ?

সন্ধ্যার পর মায়াদের বাড়ির স্কুলে শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শেখাতে গেলে বলে, কল্পনার কাছে শাড়ির ব্যাপার শুনলাম। সত্যি, কী করে পারেন আপনি ?

না পেরে উপায় নেই তাই পারি।

মায়া একটু সংশয়ভরে তাকায়। বলে, তিনটে টাকায় কী আসত যেত ? আপনি নাকি খুকুকে পুতুল পর্যন্ত কিনে দেন না ! ছোট্ট বোনটিকে পুতুল দিলে ফতুর হবেন ?

মায়া কখনও এভাবে তার সঙ্গে কথা বলে না, তার কাজের মানে বোঝার চেষ্টা করার বদলে এ যেন একেবারে সমালোচনা করে বসা !

সুনীল তাই একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। মায়া সাধারণত মোটামুটি বুঝতে পারে তাব কাজের মানে।

সুনীল বলে, অনেকদিন ধরে কল্পনা অনেক রকম আবদার কবেছিল। চাকরি পাওয়ার গোড়ার দিকে প্রত্যেক দিন অন্তত দশটা আবদার করত। আজকাল আর বড়ো একটা কেউ চায় না আমার কাছে। খুকুকে পুতুল দিলে কী হত জানেন ? কল্পনাকে তেরোর বদলে যোলো টাকার কাপড় দিলে ? আবার সবাই এটা দাও ওটা দাও শুরু করে দিত। একটা মেটালে দশটা মেটাতে পারব না, সে আশা জাগিয়ে লাভ কী।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু পারেন কী করে তাই ভাবি !

আপনি পারছেন কী করে ? আপনার মা তো আজও কাঁদাকাটা করেন !

এটা অন্য জিনিস। বিয়ে করব না নিয়ে একটা বড়ো লড়াই হয়ে গেছে, মা-বাবা মেনে নিয়েছে, চুকে গেছে। মা মাঝে মাঝে একটু শখের কান্না কাঁদে। কিন্তু এ সব টুকিটাকি ব্যাপাবে শক্ত থাকা— আচ্ছা, আদুরে বোনটি পুতুল চাইলে না দিয়ে আপনার কষ্ট হয় না?

সুনীল ধীরভাবে বলে, কী জানি, টের পাই না। বোনটি সবার আদুরে কিন্তু আমার আদুরে নয় বলে বোধ হয়। আদর করতে ইচ্ছা হয় না।

মায়া চেয়ে থাকে।

সুনীল একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, কী ভাবছেন ? আমি কী ভীষণ মানুষ ?

মায়া সায় দিয়ে বলে, সত্যি তাই ভাবছি। আপনি সত্যি ভীষণ মানুষ, না আপনার মনের জোরটা ভীষণ ?

মনের জোরে নিজেকে কনট্রোল করতে হয় না। বাড়ির লোকের ন্যাকামি ভালো লাগে না, করব কী !

তবে ওদের জন্য এত খাটছেন কেন ? সারাদিন আপিস করে ফের এখানে খাটতে আসেন, সে তো ওদেরই জন্য ?

সুনীল একটু হাসে।

এ কথা আমিও ভেবেছি। নিজেই জানি না, আপনাকে কী জবাব দেব বলুন? তবে আমার মনে হয়, একটা কিছু তো করতে হবে মানুষকে, তাই ওদের জন্য খাটছি। আপনি যেমন বিয়ে না করে পাঁচটা কাজ নিয়ে আছেন।

মায়া বলে, ঠিক হল না। আমি স্বাধীন জীবন ভালোবাসি তাই বিয়ে করতে চাই না—এটা আমার নিজের রুচি, নিজের সুখশান্তির হিসাব। আপনার সব হিসাব তো শুধু বাড়ির লোকের সুখের জন্য !

সুনীল বলে, তাহলে আপনি যেমন স্বাধীন জীবন ভালোবাসেন, আমিও তেমনই বাড়িতে কর্তালি করতে ভালোবাসি। ওরাও তাই বলে। বউ কর্তালি মানবে না বলেই নাকি আমি বিয়ে করি না।

তারা দুজনেই ভাবে, সত্যই কী তাই ? না আর কোনো মানে আছে তাদের এ রকম জীবন-যাপনের ?

মায়া ভাবে, বিয়ের নামে না হয় তার বিতৃষ্ণা কিন্তু এমন একটা পুরুষ কি জগতে নেই যার জন্য প্রাণটা তার একটু উতলা হয় ? চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হল, আজও হৃদয়টা যেন ঠান্ডা বরফ হয়ে আছে ! অন্যদিকে না হোক, বাড়ির মানুষ বাইরের মানুষের হাসিকান্নায় তার হাসি পাক কান্না আসুক, শাড়ি পরতে সিনেমা দেখতে বেড়াতে ভালোবাসুক, আরাম-বিলাস পছন্দ করুক—ওই দিক দিয়ে তার হৃদয়টাও কি সুনীলের মতো ভোঁতা ?

সুনীলের সঙ্গেই তো কতকালের পরিচয়, সকলের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা। এমন সহজভাবে প্রাণ খুলে কথা তো আর কারও সঙ্গে বলতে পারে না। অথচ এই সুনীলকে পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বেশি আর কিছু ভাববার চেষ্টা করলে মোটেই জমে না ভাবনাটা, একটু রোমাঞ্চও হয় না !

একটা আতঙ্ক বোধ করে মায়া। একটা দুর্বোধ্য কষ্ট অনুভব করে।

সুনীল নিজের ঘরে বসে ভাবে। রাত্রের খাওয়া শেষ হয়নি, সংসারের কলরব কানে ভেসে আসে। সত্যি, এটা কার সংসার ? কেন সে এই সংসার নিয়ে মেতে আছে, আয় বাড়াবার জন্য সকালে আরেকটা টিউশনি খুঁজছে ?

অথচ ভালোবাসা তো টের পায় না বাড়ির মানুষগুলির জন্য। সে কি সত্যই সৃষ্টিছাড়া মানুষ, রক্তমাংসের তৈরি নিছক একটা যন্ত্র ?

এমনি একটা বাঁকা যন্ত্র যে তার দেহটার নিয়মমতো শুধু ভাতের খিদে পায় অন্য কোনো খিদে পায় না ?

একমাত্র মায়া ছাড়া কোনো মেয়ের সঙ্গে মিলতে মিশতে পর্যন্ত ভালো লাগে না। কল্পনা আলপনার বন্ধুরা আসে, চেনা পরিবারের মেয়েরা আসে, কেউ কেউ ভাব করার চেষ্টাও করে তার সঙ্গে। ভাব কিন্তু হয় না কারও সঙ্গেই। বিবাহিতা বয়স্কা মেয়েদের সঙ্গ তবু দুদণ্ড সহ্য হয়, কমবয়সি মেয়েদের সম্পর্কে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা বোধ করে।

মায়ার সঙ্গে পর্যন্ত তার শুষ্ক নীরস বন্ধুত্বের সম্পর্ক—বোধ হয় ওই জন্যই সম্পর্ক। মায়ার মেয়েলি ভাব এত কম না হলে, ন্যাকামি আর আবেগরহিত না হলে, মেলামেশায় ভাবুকতা আমদানি করতে চাইলে, ওকেও হয়তো সে সইতে পারত না !

এ কি বিকার ? কোনো মানসিক রোগ ?

প্রশ্ন জাগে।

মায়ার মতো অজানা আতঙ্ক কিন্তু বোধ করে না সুনীল।

দরজায় দাঁড়িয়ে রেবা বলে, আসব ?

পাড়ায় মাস তিনেক হয় বসাকদের বাড়ির একতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছে সুধীরবাবু, রেবা তার মেয়ে। তিন মাসেই কল্পনাদের সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেলেছে, সুনীলের সঙ্গেও ভাব করার তার প্রবল ইচ্ছা। অন্য সকলের চেয়ে এ বিষয়ে তার অনেক বেশি অধ্যবসায় দেখা যায়। সুনীল আমল না দিলেও সে দমতে রাজি নয়।

সে যেন গায়েই মাখে না সুনীলের অবহেলা।

বোধ হয় খেলা করছে তাকে নিয়ে। ইয়ার্কি জুড়েছে ! কতবার তাকে যেতে বলেছে তাদের বাড়ি, সুধীর চার-পাঁচবার যেচে এসে তার সঙ্গে আলাপ করে গেছে, সে একবারও যায়নি।

তবু রাত নটার সময় আবার একলা এসে ঘরেব দুয়ারে দাঁড়িয়ে রেবা হাসিমুখে বলছে, আসব ?

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সুনীল গম্ভীর মুখে বলে, কী খবব ?

রেবা তার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে সানন্দে বলে, ভারী আনন্দের খবর। বাবাকে রাজি করিয়েছি। কাল টাইপরাইটিং শিখতে আপনার স্কুলে ভর্তি হয়ে যাব।

সুনীল উদাসভাবে বলে, বেশ তো !

গলা চড়িয়ে বলে, আলপনা, আমি এখন খাব, জায়গা কর।

রেবার সুন্দর চোখ দুটি প্রথমে রাগে ঝলসে উঠে পরক্ষণে আবার সজল হয়ে আসে।

আজ সত্যি অপমান হলাম। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো ? ঠিক যেন শত্রু এসেছি এ রকম করেন কেন আমার সঙ্গে ? আমি তো কিছুই করিনি আপনার ?

কী জানেন—

কিন্তু কে তখন তার কথা শোনে। রেবা উঠে দাঁড়িয়েছে, জল শুকিয়ে আবার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে তার চোখে।

তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে সে বলে, কতবার বলেছি, আপনি আমার দাদার মতো, আমায় আপনি বলবেন না। তুমি আর মুখে এল না আপনার ! বেশ তো, সেটা বুঝলাম। আপনি ঘনিষ্ঠ হতে চান না, আমায় পছন্দ করেন না। সেটা একশোবাব হতে পারে। কিন্তু কী অপবাধটা আমি করেছি যে সাধারণ ভদ্রতাটুকুও বজায় রাখতে পারেন না ? ভদ্রলোকে তাই করে থাকে। যাকে ভালো লাগে না তার সঙ্গে ওই ভদ্রতার সম্পর্কটুকুই বজায় রাখা হয়।

কল্পনা এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু তার সঙ্গে রেবা কথা বলে না। চলে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে রেবা আরেকটু ঝাল ঝেড়ে যায়। বলে, আগেও এ রকম অভদ্রতা করেছেন, আমি গায়ে মাখিনি। ভেবেছি, অন্য কারণ আছে, আপনার হয়তো মন খারাপ, বিনা কারণে কেউ এ রকম অসভ্যতা করে ? আপনি কি পাগল ?

মা জিজ্ঞাসা করে, রেবা অত চটল কেন রে ?

সুনীল বলে, খালি ঘরে বসতে বলিনি, তাই অপমান হয়েছে। মেয়েটার কী বুদ্ধি! এত রাতে ফাঁকা ঘরে গল্প করতে গিয়েছে।

মা বলে, তাতে কী হয়েছে ? সন্ধে রাত, আশপাশে আমরা এতগুলি লোক রয়েছি, দুদণ্ড কথা বলতে গেলে কী হয় ? ও সে রকম মেয়ে নয়, ওটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। ভদ্রলোকের মেয়ে কথা কইতে ঘরে গেছে বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিলি !

মার ভর্ৎসনাতেও বড়ো ঝাঁঝ ফোটে আজ !

অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেদিন ঘুম আসে না। মেয়েদের সম্পর্কে সত্যই কি তার বিকারের আতঙ্ক আছে ? এই দুর্বোধ্য আতঙ্কের চাপটা বেড়ে গিয়ে তাকে সাধারণ ভদ্রতা পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয় ?

কোনো সংগত যুক্তি সত্যই খাড়া করা যায় না রেবাকে অপমান করার পক্ষে। স্বেচ্ছায় বিচার-বিবেচনা করে যদি সে এটা করত, নারীকে নরকের দ্বার ভেবে করত, তাহলেও একটা মানে থাকত তার কাজের। এমন কিছু রেবা সত্যই করেনি যাতে তার রাগ বা বিতৃষ্ণা জাগা উচিত ছিল। তার গায়ে ঢলেও পড়েনি, তার সঙ্গে ছ্যাবলামিও জুড়ে দেয়নি। আর পাঁচজনের সঙ্গে যেভাবে মেলামেশা করে, তার সেকেলে মা পর্যন্ত আজকাল যে রকম মেলামেশায় কোনো দোষ খুঁজে পান না, তার সঙ্গেও সেইভাবেই মিলতে মিশতে চেয়েছে রেবা, ভদ্রভাবে স্বাভাবিকভাবে।

এতই খারাপ লাগল সেটা তার যে ওকে অভদ্রের মতো, অসভ্যের মতো, অপমান না করে পারল না ? এ তো তারই অসংযম !

পাগল না হোক, সে নিশ্চয় ভয়ানকভাবে বিকারগ্রস্ত। সে নিশ্চয় কঠিন মানসিক রোগে ভুগছে।

জীবন সম্পর্কে তার সব ধারণা ভুল। হিসাবনিকাশ ভুল। লোকে ঠিক কথাই বলে, সকলের হৃদয় আছে, শুধু তার হৃদয় নেই, সে অস্বাভাবিক।

অত্যন্ত ভীরু ক্ষীণ একটা আওয়াজ যেন কানে আসে। প্রথমটা ধরতেই পারে না সুনীল। তারপর সচেতন হয়ে টের পায় খোলা জানালায় বাইবে দাঁড়িয়ে কল্পনা মৃদুস্বরে ডাকছে, দাদা !

সুনীল দরজা খোলে। বলে, কী হল ?

কল্পনা বলে, কেন মিছে ভাবছ ? অপমান করেছ বেশ কবেছ। তুমি তো ডেকে আনোনি, ও যেচে যেচে আসে কেন তোমার কাছে ?

তার ইচ্ছা অগ্রাহ্য করে কেঁদেকেটে ভূপেশেব কাছে বাড়তি টাকা নিয়ে কল্পনা নিজের পছন্দসই কাপড়খানা কিনেছিল। রোজ যে দাদা রাত দশটা না বাজতে আলো নিবিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, সেই দাদা আজ আলো নিবিয়ে শুতে পাবছে না দেখে সেই কল্পনাই মরিয়া হয়ে উঠে এসেছে দাদাকে একটু স্নেহ জানাতে। হয়তো বা স্নেহ জানিয়ে ঘুম পাড়াবার আশা নিয়েও !

সুনীল তাকে স্নেহ জানাবার সুযোগ দেয না, সে জানিয়ে দেয় তার অনিদ্রার কারণ রেবা-সংক্রান্ত ঘটনা নয়, সংসারের চিন্তা।

আমি খরচেব হিসেব করছিলাম। খরচ বেড়ে যাচ্ছে। সামনের অঘ্রানে তোর যে বিয়ে দেব, টাকার ব্যবস্থা কী হবে ?

কল্পনা স্তব্ধ হয়ে থাকে। মুখ কালো করে থাকে।

খরচ তোরা কমাতে দিবি না। আর বোধ হয় কমানোও যায় না খরচ। তাহলে অন্যভাবে বস্তিতে গিয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হয়। তার চেয়ে আমি ভাবছি কাল থেকে সকালে একটা টিউশনি করব। দুটো অফার পেয়েছি, কোনটা নেব ভাবছিলাম।

কল্পনার মুখ একটু হাঁ হয়ে গেছে দেখা যায়।

সুনীল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, আমার শরীরটা খারাপ হয়েছে নাকি রে ? ঠিক মতো খাচ্ছি তো ?

কল্পনা হঠাৎ যেন তার কথাব জবাবেই কেঁদে ফেলে। কিন্তু এ তো তারও জানা কথাই যে সুনীলের কাছে এ সব কান্নার মানে আছে, কিন্তু বিশেষ কোনো দাম নেই।

তাই প্রাণপণে কান্না চেপে, দু-একবার গলা ঝেড়ে সে স্পষ্ট ভাষায় বলে, দাদা, কাল থেকে তুমি যদি আমায় জুতো মারো লাথি মাবো, আমি জানব আমার কোনো রোগ সারাতে জুতো মেরেছ লাথি মেরেছ। তুমি আমার ভার বইছ, আমি তোমার ঘাড়ে চেপে রয়েছি, এটুকুও খেয়াল হয়নি অ্যাদ্দিন !

কল্পনা চলে গেলে রেবার চিন্তাকে সে আর প্রশ্রয় দেয় না।

কদিন আগে আপিসের চেনা লোকের কাছ থেকে যৌন বিষয়ে সাধারণের জন্য লেখা একখানা বই এনেছিল—বড়ো একজন বৈজ্ঞানিকের লেখা বই। কদিন পড়বার সময় হয়নি। বিজ্ঞানের কথা, পড়তে ভালোই লাগে। অনেক অজানা কথা, আশ্চর্য অদ্ভুত কথা জানতে পারে, কিন্তু তার নিজের সমস্যার কোনো হদিস পায় না।

তবে পড়তে পড়তে এক সময় ঘুম এসে যায়।

সকালে সুনীল টিউশনির সন্ধানে যায়।

দুজায়গায় যাবে। প্রথম বাড়িটি বেশি দূরে নয়, মিনিট পাঁচেকের পথ। চেনা লোকের মুখে জেনেছিল ওদের মাস্টার চাই। দ্বিতীয় বাড়িটি কিছু দূরে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ঝেড়েছিল।

তারা দেখা করতে লিখেছে।

উচ্চ না হলেও যাদব পদস্থ চাকুরে। পরিচয় না থাকলেও পথে-বাজারে-বাসে অনেকবার দেখা হয়েছে, মুখচেনা দুজনেরই।

সুনীল বলে, বিপিনবাবুর কাছে শুনছিলাম আপনাদের একজন মাস্টার দরকার।

প্রৌঢ় যাদব অমায়িকভাবে বলে, হ্যাঁ, বিপিনবাবু তোমার কথা বলেছেন। এসো বোসো। উমা, এক কাপ চা এনো তো।

আমি চা খাই না।

বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে পড়ছিল, পড়ার টেবিলের অন্যপাশে বসেছিল রেবার বয়সি উমা। রেবার চেয়েও সুশ্রী আর একটু ঢ্যাঙা। সুনীলের সঙ্গে চমৎকার মানায় !

উমা খুশি হয়ে বলে, চা খান না তো ? বেশ করেন। দেখলে তো বাবা, ওঁর কাছে শেখো, ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খাওয়া কমাও, পেট ভালো থাকবে।

যাদব হাসে।—বেশ তো, শেখা যাবে। এখন কাজের কথা বলি। আমার মেয়েই ওকে অ্যাদ্দিন পড়াচ্ছিল, নিজে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে। এখন আর পেরে উঠছে না, তাই একজন লোক রাখব। এই বাজারে আরেকটা খরচ বাড়ল—কী আর করা যায় ! সকালে এক ঘণ্টা পড়াবে, আমি—সুনীলের মুখের দিকে চেয়ে খানিক ইতস্তত করে হঠাৎ যেন মরিয়া হয়েই বলে ফেলে,—আমি ত্রিশ টাকাই দেব।

উমা সাগ্রহে বলে, কাল-পরশুই আরম্ভ করুন। বেচারার বড়ো অসুবিধা হচ্ছে।

দ্বিতীয়টি বাগানওলা বাড়ি। দেখেই বোঝা যায় মালিক পয়সাওলা লোক। গেটে দারোয়ান ছিল, খবর পাঠিয়ে হুকুম আনিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়।

মোটাসোটা ফরসা সুন্দরী এবং সুসজ্জিতা একটি মেয়ে বলে, বসুন। এত সকালেই আপনারা আসতে আরম্ভ করলেন !

আপিস যেতে হবে।

সুনীলের নাম শুনে এক বান্ডিল দরখাস্ত থেকে তারটি বেছে নিয়ে সে বলে, আমিই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, আমার নাম নন্দা দেবী। এই যে আপনি লিখেছেন, আপনি আনম্যারেড কিন্তু বড়ো একটা ফ্যামিলি চালান, এটা আরেকটু খুলে বলুন তো ?

সব শুনে নন্দা বলে, এক ঘণ্টা পড়াবেন, আমরা পঁচিশ টাকা দেব। এক কাপ চা আর বিস্কুট বা টোস্ট—

আমি চা খাই না।

নন্দা আশ্চর্য হয়ে বলে, সে কী ? সবাই চা খায়, আপনি খান না কী রকম ?

এক কাপ দুধ পাই না, চা খাব কেন ? একটু দুধ যে পায় না তার চা খাওয়া উচিত নয়। বড়ো খারাপ নেশা দাঁড়ায়। ভাতের খিদে চা খেয়ে মেটানো যায়, তাই না এত আদর।

নন্দা একটু ভেবে প্রশ্ন করে, আপনি কি তাহলে আসবেন কাল থেকে ?

অর্থাৎ তাকে পছন্দ হয়েছে। সুনীলকে একটু ভাবতে হয়।

যাদবের বাড়ি কাছে, বেতন পাঁচ টাকা বেশি। এখানে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হবে, নয় বাসের পয়সা যাবে। তবু ভেতর থেকে জোরালো তাগিদ আসে, এই কাজটাই ভালো, এটা নিয়ে নাও !

সুনীল বলে, তাই আসব। মাইনেটা ত্রিশ কবতে পারেন না ?

এখন পারছি না। পড়ান, পরে বিবেচনা করব।

সুনীল ভাবে, পরে মানে তো আট-ন মাস পরে, তার ছাত্র পরীক্ষায় কেমন ফল করে তাই দেখে !

সুনীল জিজ্ঞাসা করে, বিজ্ঞাপনে ছিল ম্যাট্রিক স্ট্যান্ডার্ডের ইংরেজি পড়াতে হবে, ছেলেটি অ্যাকচুয়েলি কোন ক্লাসে পড়ে ?

ছেলে নয়, মেয়ে। স্কুলে পড়ে না।

তা হলে ছাত্রীটিকে একটু দেখতে হবে। আপনাকে খোলাখুলি বলি, পড়ানোব খাটুনি অনেকটা ছাত্রছাত্রীব উপর নির্ভর করে। একজনকে সহজে পড়ানো যায়, আরেকজনের পিছনে গাধার মতো খাটতে হয়। সেটা না জেনে পঁচিশ টাকায়—কথাটা বুঝেছেন আমাব ?

বুঝেছি বইকী। ছাত্রী আপনাব সামনেই বসে আছে।

সুনীল কিছুমাত্র আশ্চর্য হয় না দেখেই যেন নন্দা একটু আশ্চর্য হয়ে যায়।

সুনীল বলে, আপনি পড়বেন ? প্রাইভেট পরীক্ষা কোন বছর দিতে চান ?

নন্দা বলে, পরীক্ষা আমি দিতে চাই না—আমি শুধু ইংরেজি শিখতে চাই। আপনাকে খুলেই বলি, আমার বাবার একটি ইংরেজি কাগজ আছে—দি পিপলস্ ভয়েস।

সুনীল বলে, আপনি শচীনবাবুর মেয়ে ?

বাবাকে আপনি চেনেন ?

চিনি না, নাম শুনেছি।

নন্দা বলে, আমি ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছিলাম, তারপর নানাকারণে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। আমি এখন ভালো করে ইংরেজি শিখে আমাদেব কাগজে নিজে কাজ করতে চাই। আমি নিজে প্রাণপণ খাটব, আপনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি পারেন এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

নন্দা একটু থেমে বলে, আমি যেমন এগিয়ে যাব আপনার মাইনেও তেমনি বেড়ে যাবে। পঁচিশ টাকায় অবশ্য আমি বি এ স্ট্যান্ডার্ডের বই পড়াতে বলব না।

সুনীল খানিক চুপ কবে থেকে বলে, পড়াতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে রাখা উচিত। শুধু ইংবেজি সাহিত্য শিখলে ভালো শেখা হবে না।

কেন ?

কারণটা হল এই যে, প্রত্যেক ভাষায শব্দ পদ এ সবেব নিহিত মানে থাকে, বিশেষ প্রয়োগ থাকে, শুধু ইংরেজি গ্রামার আব সাহিত্য পড়ে আপনি সেগুলি ধরতে পারবেন না। কলেজে ইংরেজিতে আরও কয়েকটা বিষয়ে পড়ানো হয বলে এদিক দিযে অনেক সাহায্য হয়। এখনও সাধারণ বি এ পাস ছেলে যতটা ইংরেজি জানছে, অন্য সাবজেক্টগুলি বাংলায শেখানো শুরু হলে সেটুকুও জানবে না। কোনো ভাষা ভালো করে শিখতে হলে শুধু সাহিত্য পড়াই যথেষ্ট নয়। ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন বিজ্ঞান এ সব বইও পড়তে হয়।

বেশ বোঝা যায় তার কথা শুনে দমে যাবাব বদলে নন্দা খুশিই হয়েছে। কারণটা সুনীল সহজেই অনুমান করতে পারে। বিদেশি ভাষা শেখার কাজটা সে খুব কঠিন প্রতিপন্ন করে দিয়েছে বটে কিন্তু নন্দা বুঝতে পেরেছে যে, সে গৃহশিক্ষকটি পেয়েছে ভালোই। লোকটা বোঝে শোনে, এবং শেখাবার কাজে ফাঁকি দেবে না।

নন্দা বলে, যেসব বই পড়া দরকার আমিও তা পড়ব। এক বিষয়ে আপনাকে নিশ্চিন্ত করছি—ইচ্ছা করলে আমি দিনরাত পড়াশোনা নিয়েই থাকতে পারব। আমার অন্য কোনো দায়িত্ব বা বিশেষ কাজ নেই। স্কুলে কলেজে পড়তে চাই না এই জন্য যে বড়ো বেশি সময় লেগে যাবে। বি এ পাস করতেই পাঁচ বছর ! আমি দুবছরে সব শিখে ফেলতে চাই।

সুনীল হাসিমুখে বলে, সব ?

নন্দাও হাসে, সব মানে কাগজে কাজ করার জন্য যতটা শেখা দরকার। পারব না ?

কেন পারবেন না ? তার আগেও কিছু কিছু সহজ কাজ আরম্ভ করে দিয়ে শিখে যাবেন। শেখার তো শেষ নেই।

নন্দা আচমকা একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা আপনি বিশেষভাবে ইংরেজির দিকে ঝুঁকলেন কেন ? আপনি অবশ্য যে ইয়ারে পাস করেছেন দেশটা তখনও স্বাধীন হয়নি, তবু—

সুনীল বলে, দেশটা এখনও সত্যি স্বাধীন হয়নি। আমি বিশেষভাবে বিদেশি সাহিত্য পড়বার জন্য ইংরেজি নিয়েছিলাম।

চাকরি করে টিউশানি করে পড়ার সময় পান ?

বেশি সময় আর কোথায় পাই ?

সুনীল বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালে নন্দা আবার জিজ্ঞাসা করে, কাল থেকে আসছেন তো ?

আসব।

কিন্তু কেন ?

কেন যাদবের বদলে নন্দাদের বাড়ির কম মাইনের বেশি অসুবিধার কাজটা নেওয়া ?

নিজেকে এই প্রশ্ন করে সুনীল। প্রশ্ন করতেই হবে, সোজা বাস্তব একটা হিসাব নাকচ করে দিলে তার মানে খুঁজতেই হবে।

মায়াও প্রশ্ন করে, কেন ? ওরা বড়োলোক, হয়তো কোনো সুবিধা করে দেবে, এই প্রত্যাশা করছেন ?

সুনীল বলে, বড়োলোক বলেই প্রত্যাশা কম করছি। কৃপণ মেয়ের বাবাকে চোখেও দেখলাম না, মেয়েই সব। হিসেবি পাকা মেয়ে।

মায়া একটু হাসে।—মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে বলে ?

সুনীলও হাসে।—ওরে বাবা ! ওই মেয়ে আমায় পাত্তা দেবে ? আপিসের বড়োবাবুর মতো পঁচিশ টাকার মেহনত আদায় করে ছাড়বে।

মায়া খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে।

তাহলে ওই জন্যই এ কাজটা নিয়েছেন। ওদিক দিয়ে কোনো ভয় নেই, আপনাকে পাত্তাও দেবে না !

সুনীল নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে।

মায়া আবার বলে, যাদববাবুর মেয়েব বেলা ভয় আছে, তার ওপর আবার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, বয়সে চেহারায় আপনার সঙ্গে খাসা মানায় !

সুনীল নির্বোধের মতো চেয়েই থাকে।

মায়া হাসে না। তাকেও খুব বিচলিত মনে হয়। মৃদুস্বরে সে যেন নিজের মনেই বলে, এবার বুঝেছি আপনার ব্যাপারটা। আপনার হল ফাঁদের ভয়, আপনি ফাঁদ এড়িয়ে চলেন।

সুনীল এবার বলে, কিন্তু কেন ? এটা কী রোগ না বিকার ?

মায়া বলে, রোগবিকার কেন হবে ? আপনার ধাতটাই এ রকম।

তখনকার মতো মায়ার কথাটা খুব মনে লাগে! তার ধাতটাই এ রকম, সে অস্বাভাবিক নয়, বিকারগ্রস্ত নয়।

কিন্তু জিজ্ঞাসার জের কী এত সহজে মেটে এ জগতে ! ধীরে ধীরে আবার প্রশ্ন জাগে। কেন তার ধাত এ রকম কেন ?

ছেলে খোঁজা হচ্ছিল কল্পনাব জন্য, লাগসই ছেলে জুটে গেলে তাকে সুনীল পার করে দেবে।

ভূপেশ বলে, টাকা ?

জোগাড় করব। .

জোগাড় মানে ধার ?

টাকার ভরসা দিয়েছে মায়া। বলেছে, আমার বিযেব জন্য জমা ছিল। আপনার বোনের বিয়েতেই লাগুক। ব্যাংকে পড়ে থাকাও যা, আপনার কাছে থাকাও তাই। আপনি ব্যাংকের রেটেই সুদ দেবেন।

একটি বয়স্কা বোন বিদায় হবে, কলেজগামিনী বোন, কিন্তু ঘাড়ের বোঝা হালকা হবে না সুনীলের। শুধু আশা এই যে পরে একদিন বোঝা হালকা হবে, ধারটা যেদিন শোধ হয়ে যাবে। যতদূর সম্ভব চুলচেরা হিসেব কষে সুনীল বার করে কল্পনার জন্য সব মিলিয়ে মাসে কত খরচ হয় এবং সেই পরিমাণ টাকা ঋণশোধের জন্য কেটে নিলে কী দাঁড়ায়। যেমন চলছিল, তেমনি কি চলবে সংসার ?

মায়া হিসাব শুনে বলে, এত ব্যস্ত কেন ? আরও কম করে দিলেও চলবে। আমার তো তাগিদ নেই।

সুনীল বলে, না, ঢিলে দিয়ে লাভ নেই। বোন যেটুকু রেহাই দেবে অন্যেরা শুষে নেবে। তার চেয়ে ধাব শোধ হোক। এতেও কম দিন লাগবে না।

কল্পনা খুশি না অখুশি বোঝা যায় না। মুখ দেখলে মনে হয় সে মস্ত ধাঁধায় পড়ে গেছে।

সম্বন্ধ পাকা হবার দুদিন আগে সে বলে, জুতো মারলেও সইব বলেছিলাম—তার বদলে পড়াশোনা ছাড়িয়ে খেদিয়ে দিচ্ছ আমাকে ?

সুনীল বলে, এ রকম বাঁকাভাবে বিচাব করিস কেন ? পড়া বন্ধ করে কত মেয়ের বিয়ে হচ্ছে,—তাদের কি খেদিয়ে দেওয়া হয় ? কোনো মেয়ে একেবারে পড়া ছেড়ে দেয়, কোনো মেয়ে বিয়ের পরেও পড়ে। লেখাপড়ার দিকে তোর খুব বেশি ঝোঁক নেই—তুই ঘরসংসার করা ভালোবাসিস। তোর প্রকৃতি ওই রকম। ভালো বিয়ে হবে, এই জন্যই বাবা তোকে পড়াচ্ছিলেন। তোকে বেশি পড়িয়ে আমাদের কী লাভ, তোরই বা কী লাভ ? শেষ পর্যন্ত তুই ওই ঘরসংসার নিয়েই সুখী হতে চাইবি। আলপনার বরং ঝোঁক আছে লেখাপড়া করে নিজে একদিন বড়ো হবে, কিছু করবে। নিজের মন হাতড়ে দ্যাখ—ও রকম সাধ কি তোর আছে ?

কিন্তু সুখী হতে পারব কি ?

সেটা কেউ বলতে পারে ? আমি সেই জন্যই এমন ঘর এমন ছেলে খুঁজছিলাম বিয়ের পরেও পড়া চালিয়ে যেতে ইচ্ছে হলে তুই যাতে সে সুযোগ পাস।

ও !

বিয়ে হচ্ছে বলে তোকে কলেজ ছাড়ানো হবে না। কিছুদিন পরে তুই নিজেই পড়া ছাড়বি—তোর ভালো লাগবে না।

২

যথারীতি কল্পনার বিয়ে হল। বাড়িতে একজন অস্থায়ী লোক বাড়ল—জামাই প্রণব।

মোটামুটি ভালোই চাকরি করে, শান্ত লাজুক প্রকৃতি। কিছুক্ষণ আলাপ কবাব পরেই টের পাওয়া যায় সে একটু কল্পনাবিলাসী এবং ভাবপ্রবণও বটে।

সুনীলের মতো নীরস কাঠখোট্টা মোটেই নয়।

সকলে তাই আশ্চর্য হয়ে যায় যে বোনের জন্য সুনীল এমন ছেলে পছন্দ করেছে যার মধ্যে আছে এ রকম গুণ, সে যা অত্যন্ত অপছন্দ করে।

মায়া জিজ্ঞাসা করে, এটা কীরকম ব্যাপার হল ? আপনি যেটা ন্যাকামি বলেন ওর মধ্যে সেটা তো বেশ খানিকটা আছে। তবু ওকে পছন্দ করলেন ?

সুনীল বলে, আমার বোনের মধ্যে ওই ন্যাকামি নেই ?

ও ! তাই বলুন।

অনেকে এটা হিসাব পর্যন্ত করে না। দুজনের প্রকৃতিতে খাপ খাবে কিনা এটা না দেখেই অন্য বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিবেচনা করে বিয়ে দিয়ে দেয়। ছেলেটি মেয়েটি দুজনেই সব দিক দিয়ে ভালো—কিন্তু দুজনের ধাত হয় দুরকম, মিশ খায় না, একজন অন্যজনকে সইতে পারে না।

তা ঠিক ! এটা দেখা উচিত।

এটাও সুনীল হিসাবে ধরতে ভোলেনি যে বিয়ে দিলেই বোন একেবারে ঘাড় থেকে নামে না এবং জামাইয়ের পিছনেও খরচপত্র করতে হয়।

কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকায় সঠিক হিসাবটা ধরা যায়নি—আন্দাজে করতে হয়েছিল।

দেখা যায় বাড়ির মানুষ সত্যই বেশ কিছুটা আরাম আশা করছিল। ছোটোভাই অনিলের বিদ্রোহে সেটার চরম প্রমাণ মেলে। ভূপেশের সঙ্গে একদিন অনিলের লড়াই বেধে যায় হাতখরচের টাকার জন্য। সকালবেলা সুনীল তখন সবে নন্দাকে পড়িয়ে বাড়ি ফিরেছে।

ভূপেশের তিরস্কারের জবাবে অনিল গলা ফাটিযে চেঁচায়, বেশ কবি সিগারেট খাই, সিনেমা দেখি। সবাই করে, আমি কেন করব না ? দাদা সেকেলে একটা মেশিন বলে আমিও মেশিন হব ! বড়ো হয়েছি আমাব হাতখরচ দেবে না তোমরা, এ কী আবদার নাকি !

ভূপেশ তর্জনগর্জন করে।

সুনীল শুধু বলে, তোমায় তো হাতখরচ দেওয়া হয়।

ওতে হয় না।

তোমায় সঙ্গে নিয়ে বসে, তোমাকে জিজ্ঞেস করে খরচের হিসেব করেছিলাম।

অনিল গোমড়া মুখে বলে, তখন ছোটো ছিলাম।

সুনীল উদাসভাবে বলে, এক বছর আগে ছোটো ছিলে, এক বছরে বড়ো হয়ে গেছ ? বেশ, হাতখরচ বাড়াতে না বলেই চেঁচামেচি জুড়েছ কেন ?

চাইলে তো পাই না।

মিছে কথা বোলো না। আমার কাছে চাওনি। যা সত্যি দরকার, যা তোমার পাওয়া উচিত, খরচে কুলোলে পাবে না কেন ?

অনিল মরিয়া হয়ে বলে, আমার আজকেই তিনটে টাকা চাই।

সুনীল শান্তভাবে বলে, চাই বললেই হয় না জানো। কেন চাই বলতে হবে। সত্যি দরকার থাকলে দেব।

একজন বন্ধুকে সিনেমা দেখাব, নেমন্তন্ন করেছি।

সুনীল মাথা নাড়ে, তাতে তিন টাকা লাগে না।

আমার একজন মেয়ে-বন্ধু।

মেয়েটির বাড়িতে জানে ?

জানে।

সুনীল তাকে তিনটি টাকা দেয়। ভূপেশ ক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে থাকে। সুনীলের কাছে কোন খরচটা জরুরি, কোনটা নয়, মাথামুন্ডু বোঝা দায়।

অনিল চলে যেতেই ভূপেশ বলে এটা তোমাব উচিত হল না। সংসারে কত কী হচ্ছে না, ওকে তুমি মেযে-বন্ধু নিয়ে সিনেমা দেখার জন্য টাকা দিলে !

সুনীল বলে, উপায় কী ? সে শিক্ষা তো দ্যাননি, আমাকেও দিতে দেবেন না। নিয়ে যাবে বলেছে, এখন না নিয়ে গেলে বিশ্রীরকম লজ্জা পাবে। মনটা বিগড়ে যাবে। বাধ্য হয়েই দিতে হল।

মুখে যাই বলুক, মনে কিন্তু দ্বিধা থেকে যায়। হিসেব কি ঠিক হয়েছে ? ধমকে দেওয়াই কি উচিত ছিল ? কিন্তু তার ও সব বালাই নেই বলেই সে তো মেয়ে-বন্ধু থাকার আনন্দ, তাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ার আনন্দের প্রয়োজন, বাতিল গণ্য করতে পারে না অন্যের জীবনে !

বাঁচা তো যায় জীবন থেকে অনেক কিছুই ছাঁটাই করে। বেকারদের কথা বাদ যাক, আশেপাশে কত চাকুরেরই সব রকম বাহুল্যবর্জিত রুক্ষ সাদামাঠা জীবন, কষ্টকর জীবন। অলিতেগলিতে বস্তি-কলোনিতে কত অসংখ্য মানুষ প্রাণপণে কোনো রকমে শুধু বেঁচেই আছে।

কিন্তু তার তো সে অজুহাত নেই। সামান্য হলেও মানুষের মতো বাঁচার জন্য দরকারি কিছু কিছু বাহুল্য বজায় রাখতেই তো সে সকালবেলা টিউশনি নিয়েছে। অনিলের একটু আনন্দ পাওয়ার দাবি সে অগ্রাহ্য কববে কোন যুক্তিতে ?

মায়া সব শুনে বলে, সত্যি। আমি অবশ্য অন্যদিক দিয়ে ভাবছিলাম। কিন্তু মোটামুটি আমাদের হিসাবটা দাঁড়াচ্ছে এক। অনিলের মেয়ে-বন্ধুটি কে জানেন ? আমাদের ছাযা।

তাই নাকি !

মা আজ আগে থেকেই মেজাজ কড়া করে এসে আমায় বললে, শোন, অনিল ছায়াকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়, আমরা অনুমতি দিয়েছি। তুই যেন আবার বারণ করিসনে। তোর তো সব বিষয়েই কড়াকড়ি আর বাড়াবাড়ি।

সুনীলের মনে পড়ে, রাত নটায় খালি ঘরে তার সঙ্গে রেবার গল্প করতে যাওয়া মা সমর্থন করেছিল।

মায়া চিন্তিতভাবে তাকায়।—অথচ সত্যি আমি কড়াকড়ি করি না। বাড়াবাড়ি করলে কে শুনছে আমার কথা ? আপনার তবু জোর আছে, আপনার রোজগারে সংসার চলে। আমি তো সত্যি স্বাধীন নই, বাবার ছেলে নেই বলেই যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করছি।

আমার স্বাধীনতা মানেই শেষ পর্যন্ত বাবার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা। আমি আজ ভাবছিলাম, এ স্বাধীনতা হারাতে আমার তবে এত ভয় কেন ? বাপের চেয়ে বরং স্বামীর ওপরেই বেশি জোর খাটানো চলে।

জোর থাকলে চলে বইকী।

আমিও ঠিক তাই ভেবেছি। জোর খাটবে না এটাই আমার আসল ভয় নয়। আমার স্নেহ-মমতা আছে কী নেই, বাবা তা দেখতে আসবে না। কিন্তু স্বামী তো আর ছেড়ে কথা কইবে না। তার পাওনা

দিতেই হবে। আমি জানি আমার সে সাধ্য নেই। বাবার সঙ্গে মানিয়ে চলছি কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনবে না। আমার ভয়ের কারণ হল এই। কেমন, ঠিক না ?

এতদিনে নিজের হৃদয়-মনের গভীর রহস্য ভেদ করতে পেরেছে বলে মায়াকে বেশ খুশি মনে হয়।

কিন্তু সে একেবারে ভড়কে যায় সুনীলের প্রশ্নে !

বনবে না ধরে নিচ্ছেন কেন ? বাবার যা কিছু আছে অর্ধেক পাবেন, বাবাকে যেটুকু মানেন সেটুকু মেনে চললেই অনেক স্বামী কৃতার্থ হয়ে যাবে।

মায়া মাথা নাড়ে।—সে তো অন্যভাবে মানিয়ে চলা। আমি জানি আমি কিছুতেই পারব না। ভাবলেও বিশ্রী লাগে। গা ঘিনঘিন করে। আমার মধ্যে রসকষ নেই।

কেন নেই ?

মায়া বিব্রতভাবে হেসে বলে, যাঃ, আপনি সব গুলিয়ে দিলেন। ভাবছিলাম আসল ব্যাপারটা বুঝি স্পষ্ট বুঝে গিয়েছি। তা তো নয়, রসকষ নেই কেন, এটাই আসল প্রশ্ন। সবার আছে আমার নেই কেন ?

আমারও কিন্তু নেই।

সেদিন ছিল ছুটি।

এক রকম কিছু না ভেবেই সুনীল প্রস্তাব করে, বহুদিন সিনেমা দেখি না। যাবেন ?

বেশ তো চলুন না।

ওরা কোনটাতে গেছে জানেন ? সেখানে গেলে জানা যেত ওদের কী রকম ছবি পছন্দ। ছবিগুলি শুনছি নাকি যাচ্ছেতাই হচ্ছে আজকাল,—দু-একটা ছাড়া।

মায়া বলে, ছায়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওর কোনো চেনা মেয়ে দেখেছে, সে নাকি বলেছে, ছবি ভালো নয় কিন্তু বেশ মজার ছবি।

তাহলে হাসির ছবি হবে। হালকা ভাঁড়ামির ছবি। তবু চলুন দেখে আসি।

অনিল আর ছায়া দেখতে গিয়েছিল বিকালের শোতে। চৈত্রের মাঝামাঝি, বেলা খানিকটা বড়ো হয়েছে। ভিড়ের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে অনিল ক্রুদ্ধস্বরে বলে, এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে। কবে পাস করব, চাকরি করব, তবে দুটো টাকা পাব। এমন রাগ হয় ভাবলে !

ছায়া হাতের একগাছি চুড়ি খুলে তার হাতে তুলে দেয়, কথা বলতে গিয়ে চাপা উত্তেজনা আর আবেগে গলা তার কেঁপে যায়।

মরে গেলেও বাড়ি যাব না এখন। এটা বিক্রি করো।

বাড়িতে কী বলবে ?

বলব হারিয়ে গেছে।

অনিলের বিবেক নয়, পৌরুষে একটু বাধে। ইতস্তত করে বলে, তোমার চুড়ি বিক্রি করে—

ছায়া ফুঁসে বলে, তোমার টাকা আমার চুড়িতে তফাত আছে নাকি ? ছবিতে দেখলে না মেয়েটা কী ভাবে—

এ যুক্তির পরে আর কথা কী !

সন্ধ্যাবেলা সেই ছবি দেখতে যায় সুনীল আর মায়া। শো ভাঙবার পর ভিড়ের সঙ্গে রাস্তায় নেমে এসে তারা দুজনেই যেন হাঁফ ছাড়বার জন্য খানিকক্ষণ বাক্যহারা হয়ে থাকে।

শেষে মায়া বলে, গা ঘিনঘিন করছে। বাড়ি গিয়ে হাজার নাইলেও তো কাটবে না। ঠিক যেন দেশের বাড়ির খাটা পায়খানার তলায় গিয়ে দুঘণ্টা সময় কাটিয়ে এলাম।

সুনীল বলে, সে গা ঘিনঘিন দু-একবার সাবান ঘষে নাইলেই কেটে যায় ! এরা যে চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, মনেপ্রাণে ইনজেকশন করে দিয়েছে, ঘেন্নার জিনিস। বাড়ি যেতে পারব না। চলুন একটু ফাঁকা জায়গায় বেড়িয়ে আসি।

লেকে যাবেন ?

নাঃ।

নদীর ধারে যাই চলুন।

চলুন।

সুনীল বলে, ট্রামেবাসে যেতে হবে কিন্তু, ট্যাক্সির টাকা নেই।

মায়া বলে, ট্রামেবাসে যাওয়াই ভালো। দশটা ভালোমানুষের ভিড়ে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে একটু স্বস্তি পাব। সত্যি বলছি আপনাকে সিনেমায় ভিড় যদি না হত, রাগের মাথায় জ্ঞান হারিয়ে আমি একটা কেলেঙ্কারি করে বসতাম।

সুনীল বাসের ডান্ডা ধরে ঝুলছিল। শহরতলিতে বাস একটু হালকা হলে সে লেডিজ সিটেই মায়ার পাশে বসবার সুযোগ পায়।

সুনীল খেয়াল করিয়ে দেয়ার জন্য বলে, ফিরতে কিন্তু অনেক রাত হয়ে যাবে।

মায়া বলে, ছেলেমানুষি করবেন না। রাত হলে হবে।

ছেলেমানুষি ! সুনীল করবে ছেলেমানুষি !

মায়া সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে, দেখলেন তো ? নোংরা সিনেমা দেখবার ফল ? আপনি শুধু আমায় মনে করিয়ে দিলেন রাত হয়ে যাবে, আমি বিদ্রোহিণীর মতো ঝেঁঝে উঠলাম।

সুনীল বলে, আমি কিন্তু এতটা বিচলিত হইনি। কিছু কিছু নমুনা দেখা আছে। কিছুকাল আগে মাসখানেকের মধ্যে দশ-বারোটা সিনেমা দেখেছি বললে বিশ্বাস করবেন ?

কবব।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে কয়েকটা শনি-ববিবার আপনার কাছে ছুটি নিয়েছিলাম মনে আছে ?

এবার আমি রাগ করব। আমাব কাছে নয়, বাবার কাছে ছুটি নিয়েছিলেন। বাবা বিছানায় পড়ে আছেন বলে আমি বাবার হয়ে স্কুলটা চালাই ভুলবেন না।

বেশ তো তাই হল। ছুটি নিতাম সিনেমা দেখার জন্য। একদিনে দুটো ছবি দেখতাম—একটা হলিউডের ছবি একটা দেশি ছবি। আর ছবি দেখার আগের মাঝের পবের সময়টা কী করতাম জানেন ? মার্কিন থেকে আমদানি নোংরা বই পড়তাম। বাজার ছেয়ে গেছে।

পবীক্ষার ফলটা কী হয়েছিল ? কী বুঝেছিলেন ?

বুঝেছিলাম এও একটা মস্ত বিপদ দাঁড়িয়েছে ছেলে-মেয়ে-ভাইবোন নিয়ে ঘরসংসার করার। আজ প্রমাণ দেখলেন তো ? আপনার বোন আমার ভাই এই ছবি দেখার জন্য পাগল। আমাকে তর্কে হারিয়ে আমার কাছে পয়সা নিয়ে অনিল আজ ছাযার সঙ্গে এই ছবিটা দেখেছে। আমি না বলতে পারিনি। এ রকম ছবি দেখানো বন্ধ করতে পারি না। আর দশটা ছেলে, মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে এ সব ছবি দেখছে তাও ঠেকাতে পারি না—আমার ভাই বলেই কী করে জবরদস্তি করব যে তুমি সন্ন্যাসী হও ?

শহরতলি দিয়ে বাস চলেছে। গঙ্গার কাছাকাছি পাশাপাশি রাস্তায়। গঙ্গার ধারে শুধু কারখানা আর কারখানা। বাংলার এটা সেরা শিল্পাঞ্চল। তাই মনে হয় কলকাতা শহরটাই বুঝি নিজেকে এদিকে এগিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনেক দূর অবধি।

মায়া বলে, আমিও ঠিক এই জন্যই ছায়াকে যেতে দিলাম। না যেতে দেওয়াও বিপদ। সবাই যাচ্ছে আমি কেন যেতে পাব না ভেবে মুষড়ে যাবে। এই হয়েছে মুশকিল। ছেলেমানুষ তো, বুঝবে না।

গঙ্গার তীরবর্তী দুটি প্রধান স্থান ও স্টেশন পার হয়ে বাস চলেছে, ঠিক ঠিক জায়গায় বসানো সিনেমা চোখে পড়েছে। এতক্ষণে হালকা হয়ে এসেছে বাস, বাদুরঝোলারা নেমে গিয়ে বাসে এখন কেবলমাত্র ঠেসাঠেসি গাদাগাদি করে সিটে বসা যাত্রীরা আছে।

মায়া একটা কঠিন প্রশ্ন করে সুনীলকে।

দশ-বারোটা ছবি দেখে ওই সব বই পড়ে আপনার একটুও মজা লাগেনি ? আমি খুব সিরিয়াসলি জিজ্ঞাসা করছি কিন্তু। আজকের ছবিটা বড়ো বেশি নোংরা—একেবারে বীভৎস। দু-একটা কম নোংরা ছবি দেখে আমি কিন্তু কিছুটা মজা পেয়েছি। আপনি একটুও পাননি ? কিছুক্ষণের জন্য ?

সুনীল বলে, মজা ? আমার কেবলই মনে হয়েছে এত সস্তা মজা দিয়ে এরা লোক ভুলায় কী করে ! ব্যাপারটা কী তা অবশ্য জানি, খেতে না পেলে মানুষ ডাস্টবিন ঘেঁটেও খিদে মেটায়—তবু অবাক লেগেছে। এখানে নামা যাক। সুন্দর একটি বাঁধানো ঘাট আছে।

চেনা জায়গা ?

ছেলেবেলা বছর দুই এখানে ছিলাম।

তারা ঘাটে গিয়ে বসে। সুনীল জিজ্ঞাসা করে, গা ঘিনঘিন করা কমেছে ?

মায়া হেসে বলে, হ্যাঁ, ও আর কতক্ষণ থাকে ?

শীতের শেষের স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে। এপারে ওপারে কলকারখানার ঘন বস্তির আলোকমালা। কথা তাদের আপনা থেকেই কমে আসে। কথা বলার অবকাশ পাবে অনেক, নদীর ধারে এভাবে বসে বিশ্রামের অবকাশ পেয়েছে অনেকদিন পরে।

বড়ো বেশি খাটতে হয় দুজনকেই।

৩

আপিসে তাকে এদিক থেকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মানুষ মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ভোঁতা হৃদয় কি গোপন থাকে ?

শীত শেষ হয়ে এসেছে।

একটানা উত্তুরে হাওয়া আর বয় না। মাঝে মাঝে এলোমেলোভাবে দিক পরিবর্তন করে। আমেজ পাওয়া যায় আগামী বসন্তকালের।

শহরের বুকেও টের পাওয়া যায়। আপিসে কাজ করতে করতে।

টিফিনের সময় সুনীল বলে, গরমকাল আসছে। শীতকালটা যেন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়।

দীনেশ বলে, তুমি যে বসন্তকালটাকে একেবারে পাত্তাই দিলে না হে ! ঋতুর রাজা—শীত কেটে এলে আগে বসন্তের জয়গান করতে হয়।

করবে। রোজ শয়ে শয়ে করবে। এখন থেকেই শুরু করেছে।

দীনেশ একটু হাসে।

তুমি বড়ো বেশি বস্তুবাদী হয়ে উঠেছ সুনীল।

বস্তুবাদী ? মোটেই না। বরং সত্যবাদী বলতে পার। এ দেশে আবার বসন্তকাল !

ভূপেন বলে, কথাটা কীসের হিসাবে বললে ? দেশের এমন দুরবস্থা, বসন্তকাল দিয়ে লোক কী করবে ?

সুনীল মাথা নাড়ে। পেপার ওয়েটটা দুবার টেবিলে ঠুকে সহজভাবেই বলে, মোটেই নয়। দেশের লোকের দুরবস্থা বলে ঋতু পরিবর্তন হবে না ? বসন্তকাল আসবার হলে লোকে না খেয়ে

মবলেও ঠিক এসে হাজির হবে। আমি বলছি এ দেশে বসন্ত বলে কোনো ঋতুই নেই। শীতের পরেই গরমকাল। মাঝখানে চারটে দিন একটু একটু গা জুড়ানো হাওয়া বয়—বাস্।

নবীন বলে, বেশ তো বললেন ? নিজেই বাতিল করে দিলেন নিজের কথা !

কী রকম ?

দু-চারদিনের জন্য বলেই তো বসন্তকালের এত মান ! সারা বছর বসন্তকাল চললে কে কেয়ার করত ? বসন্ত নিয়ে দখিনা নিয়ে এত যে কাব্য হয়েছে, আপনি সেটার মানেই বোঝেননি সুনীলবাবু।

নবীনের বয়স কম। বছরখানেক আপিসে ঢুকেছে। ঢুকেছে খিড়কির দরজা দিয়ে। পরীক্ষা পাসের গুণ বা কোয়ালিফিকেশনের জোরে তার চাকরি নয়। অঘোরের মেয়ে তাকে স্নেহ করে।

শরৎ তাড়াতাড়ি বলে, কী বাজে বকছ নবীন ? রবীন্দ্রকাব্যের ওপর ওনার একটা ইংরাজি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে খবর রাখো ?

নবীন বলে, আমি কি সুনীলবাবুকে মূর্খ বলেছি ? ওনার কাছে আমি গোমুখ্যু তা জানি না ? আমি বলছিলাম—

হরেন বলে, তোমার আর বলে কাজ নেই।

রমেশ বলে, আহা, বলতে দিন না ওকে।

সুতরাং সকলে চুপ করে যায়। একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই চুপ করে।

এই ঘবেই তাদের ক-জনেব সঙ্গে প্রায় সমান আসনে বসেই কাল পর্যন্ত চাকরি করেছে রমেশ, পদটা ঠিক তাদের সমান না হলেও এমন কিছু উঁচু ছিল না সম্মান বা মাইনের দিক দিয়ে, যে তাকে সম্মান করে কথা বলার দরকার হবে।

আজকেই প্রথম সে তাদের মধ্য থেকে একটু তফাতে সরে গিয়ে আপিসের এই ঘরটার একমাত্র বিচ্ছিন্ন বড়ো এবং বিশিষ্ট টেবিলটাতে গিয়ে বসেছে।

ও টেবিলে বসত বুড়ো রতনবাবু। দিন তিনেক আগে বুড়ো মানুষটা হঠাৎ বিনা নোটিশে আপিসের চাকবিতে ইস্তফা দিয়েছে, একেবারে চিবদিনের জন্য। ইহলোক ছেড়ে যাওযার প্রয়োজনে।

অঘোব নিজে রমেশকে রতনবাবুর কাজটা সাময়িকভাবে কিছুদিন চালিয়ে দেবার দায়িত্ব দিয়েছে। যতদিন না ওই পদে নতুন একজন বহাল হয়।

তাকে ওই টেবিলে গিয়ে বসবার কথাও অঘোর বলে গিয়েছে নিজে থেকে।

রমেশ ওই শূন্য চেয়ারে স্থাযীভাবে বসতেও পারে এ বকম একটা কানাঘুষা চলছে। অঘোরবাবুর একটি মেয়ে আছে। মেযেটিব বযস কম করে ধরলেও পঁচিশের নীচে নয়।

গতবার বি এ পাস করেছে। তিনবারের চেষ্টায়। রং একটু কালো, পা খোঁড়া। লাবণ্যে ঢলঢল মুখ। কিন্তু মুখে ঘন রোমের বাড়াবাড়ি।

সামনের রবিবার দুপুরে খাওয়ার জন্য অঘোর রমেশকে তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে !

আপিসের সকলেই জানে যে অঘোরের পিসি রেঁধে দিলেও রমেশকে সব কিছু তার মেয়ে বিভার একার রান্না বলে খাওয়াবে।

বিভার গান শোনাবে।

এমন মেয়ে আর হয় না। এদিকে বি এ পাস ওদিকে রান্নায়, ঘরকন্নায়, গানে, অদ্ভুত প্রতিভাবতী।

এ সব খবর সকলের জানা হয়ে গেছে এই জন্য যে রমেশ অঘোরের প্রথম চয়েস নয়। কিছুকাল আগে ভূপেনকেও সে কয়েকবার বাড়িতে কারণে অকারণে নেমন্তন্ন খাইয়েছিল। গান শুনিয়েছিল।

বিভার রান্না, বিভার গান !

আচমকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ভূপেনকে নেমন্তন্ন খাওয়ানো। ভূপেন বন্ধুদের কাছে কৈফিয়ত দিয়েছিল, অঘোরবাবু টের পেয়ে গেছে আমার কাছে আশা নেই। হলাম বা দ্বিতীয় পক্ষ ? ছেলেপিলে

নেই, কী আর এমন বয়স হয়েছে আমার ? কালো খোঁড়া বুড়ি মাগিকে বিয়ে করতে গরজ পড়েছে আমার !

বন্ধুরা বলেছিল, কদিন তো বেশ মজা লুটে নিলে।

তারপর ভূপেনের বিয়ে হয়েছে অন্য মেয়ের সঙ্গে। পাস করা গান জানা না হোক বউ পেয়েছে সুন্দরী।

ভূপেনের মামা এই কারবারের অংশীদার।

বোধ হয় সেই জন্যই অঘোর প্রতিশোধ নিতে, তাব কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

মৃত রতনবাবুর চেয়াব-টেবিলে অস্থায়ী অনিশ্চিত দখলিসত্ব পেয়েই রাতারাতি সহকর্মীদের উপব হুকুমের সুরে কথা বলার কেরামতি রপ্ত করতে দেখে নবীনও বোধ হয় দমে গিয়েছিল।

রমেশের সায় পেয়েও সে আর এ দেশের অস্থায়ী বসন্ত দখিনা কাব্য ইত্যাদির পক্ষ নিয়ে মুখ খুলতে পারে না।

সুনীলের সঙ্গে তর্ক করা এককথা।

রমেশের হুকুমে সুনীলের বিরোধিতা করা অন্য ব্যাপার।

টিফিনের সংক্ষিপ্ত সময়টা শেষ হতে সে যেন হাঁফ ছেড়ে কাজে মনোযোগ দেয়।

গরম জলে ভেজাল দেওয়া এক রকম গাছের শুকনো পাতা ভেজানো খানিকটা নির্যাস এক চামচ দুধ দিয়ে খেযে টিফিন করা।

টিফিনটা জমে গল্পগুজব তর্কবিতর্কেই।

এতদিন রমেশও টিফিনের টাইমটুকু ওইভাবেই তাদের সঙ্গে জমিয়েছে।

আজ সদ্যোমৃত রতনবাবুব চেয়ারে বসে তিরিশ বছরের অধিকার কবা টেবিলে সে টোস্ট আব ডিমের কারি নিয়ে তাদের সামনেই টিফিন শুরু করেছে টাইম পেরিয়ে যাবার পব।

নির্ভয় নিশ্চিতভাবে !

রমেশ টোস্ট আর ডিম চিবোতে চিবোতে বলে, কী হল নবীন ? থেমে গেলে যে ?

নবীন ভারী চালাক ছেলে।

টাইপ করার যন্ত্রে হাত দুটিকে ব্রেক কষিয়ে থামিযে সে বলে, অঘোরবাবু তিনটেব মধ্যে এ রিপোর্টটা চেয়েছেন।

নিজেই তাই টাইপ করছ ?

কী করি বলুন ?

এ ঘরে সুনীলেরও টেবিল-চেয়ার, সেও ঠিক ডেস্কে বসা কেরানি নয়। কিন্তু রমেশের দখল-করা কেবিনেট টেবিল আর কুশন-দেওয়া চেয়ারের সঙ্গে তার সাদামাঠা কাঠের চেয়ার-টেবিলের তুলনাই হয় না।

ঠিক ইংরেজি সাহিত্যের বিদ্যা নিয়ে সুনীলের কাজটা করা যায় না। ভাগ্যে শুধু ইংরেজি সাহিত্যে পাস করাটাই সে ছাত্রজীবনের একমাত্র ব্রত করেনি, টেকনিক্যাল বিদ্যায় পাস করার জন্যও নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

নইলে অঘোরবাবুর দেওয়া এই চাকরি করা অসাধ্য হত তার পক্ষে।

আজ রতনবাবুর আসনে রমেশকে বসতে দেখে তার মনে হয়, সত্যিই অসাধ্য হত কী ?

বিদ্যাও কাজে লাগবে না রমেশের, রতনবাবুর অভিজ্ঞতাও তার নেই। তবু সে যদি ও কাজ চালাতে পারে টেকনিক্যাল বিদ্যা ছাড়াই সেও বা পারত না কেন তার এই কাজ চালিয়ে নিতে !

এ রকম কত আনাড়িই তো কত বকম দাযিত্বপূর্ণ পদ জুড়ে বসে আছে—বিদ্যা আর অভিজ্ঞতায় পাকাপোক্ত না হলে সে কাজ করা মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার !

মনে মনে সুনীলকে সকলেই কমবেশি সমীহ করে। নবীনও করে—যতই সে সতেজ তর্ক করুক তার সঙ্গে। নবীনের কাছে সমীহ করা আর ভয় করা অবশ্য এক জিনিস নয়।

ঘা সহ্য শক্ত লড়াইয়ে ছেলে। শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয়ের ভেজাল থাকতেই হবে এ নিয়ম সে মানে না।

সুনীল হিসাবি ধীর শান্ত মানুষ—নবীনের ধারণা সুনীলের চরিত্রের এ দিকটা সে বিশেষ পছন্দ কবে না। ধীর শান্ত হিসেবি হওয়ার মধ্যেই কেমন একটা সেকেলে হওয়ার ইঙ্গিত আছে।

সে শ্রদ্ধা করে সুনীলের দৃঢ়তাকে—হিসাব করে হলেও কোনো বিষয়ে দ্বিধা সংশয় না করেই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাকে।

সুনীলকে সকলের এই সমীহ করার মনোভাব রমেশকে বরাবর খানিকটা ঈর্ষাতুর করে রেখেছে।

বতনবাবু তোষামোদ ভালোবাসত। তাকে সব চেয়ে বেশি তোষামোদ করত শরৎ। সুনীলকে কেউ তোষামোদ করে না—শরৎও নয়। সহজ স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

নবীনের তার ভুল ধরা আর সতেজ তর্ক কবা দেখে তো প্রায় মনেই হয় না যে সে তাকে এতটুকু কেয়ার করে !

তবু টের পাওয়া যায় সকলের মনের শ্রদ্ধার ভাবটা।

আজ যেন টেব পাওয়া গেল স্পষ্টভাবেই।

ওরাই নবীনকে থামিযে দিচ্ছিল, একটু কর্তালি করে সে যে নবীনকে তর্ক চালিয়ে যেতে বলেছে, এটা কেউ পছন্দ করেনি।

নবীন পর্যন্ত নয় !

এভাবে তার সমর্থন পেয়ে তর্ক করে গেলে সুনীলকে তাতে অপমান করা হবে ।

সুনীল নিজের মনে কাজ করে চলেছে। পিয়োন নিতাই তাব টেবিলে দুটো ফাইল রেখে যায়। শরৎ একটা মোটা খাতা তুলে নিয়ে এসে খুব খুশির সঙ্গে তাকে কী যেন দেখায়—একটা বড়োরকম ভুলের গোড়াটা সে খুঁজে পেয়েছে।

হাত গুটিয়ে বসে রমেশ চেয়ে দ্যাখে !

তার দিকে ফিরে তাকিয়ে সুনীলকে এমন আনন্দের সঙ্গে ভুল খুঁজে পাবার খবরটা জানালো। এই শরৎ কী তোষামোদটাই করত রতনবাবুকে যার চেয়ার টেবিলে সে আজ বসেছে ! ওর কি খেয়াল নেই যে এখানে যে বসে তার মধ্যে রতনবাবুর ক্ষমতা বর্তায় ?

রতনবাবুর ফাইলপত্র সে নাড়াচাড়া করে দেখতে পারে। চাবি লাগানো ড্রয়ার খুলে দেখতে পারে কী কী মূল্যবান দলিল আর চিঠিপত্র সেখানে আছে।

কিন্তু রমেশের কেমন যেন বিতৃষ্ণা বোধ হয়।

মোটে তিনদিন আগে মানুষটা মরেছে।

সে পর্যন্ত তার দখল-করা চেয়ারে বসতেই কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে এখন। পদোন্নতির উল্লাস আর গর্ববোধে এতক্ষণ এটা যেন চাপা ছিল—তার অতি মৃদু প্রথম হুকুমটি অগ্রাহ্য করে সকলে কাজ নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে পড়ার পর এখন কেবলি তার সরু সরু পা-ওলা প্যান্ট আর গলা পর্যন্ত বোতাম-আঁটা-কোটপরা, টাক, পাকা চুল, বাঁধানো দাঁত সমেত ফরসা মোটা বুড়ো মানুষটাকে কেবলি মনে পড়ছে।

এখনও শ্রাদ্ধশান্তি হয়নি মানুষটার।

ফাইল খুললেই তো চোখে পড়বে তার পরিচিত সই ! ড্রয়ার খুলে তার নস্যের শিশি কিংবা পানের ডিবাটা চোখে পড়বে না তাই বা কে বলতে পারে।

কেমন একটা জ্বালা বোধ করে রমেশ।

অঘোরবাবুই চাকরি করে দিয়েছে সুনীলকে। অঘোরবাবুই তাকে বসিয়েছে রতনবাবুর আসনে।

ওরা কিন্তু সমীহ করে সুনীলকে। ঘরে যেন সে উপস্থিত নেই এমনিভাবে তার দিকে একবার না তাকিয়েই নিজের মনে অথবা পরস্পরে জিজ্ঞাসা ও পরামর্শ করে কাজ চলেছে।

রমেশ যেন মরিয়া হয়ে হঠাৎ একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে।

এই আপিসে এই ঘরে চাকরি করতে করতে তার এই প্রথম সিগারেট ধরানো।

আজ এই স্বাধীনতা সে পেয়েছে—আপিস টাইমে আপিসের মধ্যে সিগারেট ধরিয়ে টানা।

কারও কিছু বলার নেই করার নেই।

তার সিগারেট ধরানো সিগারেট টানার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে আপিসের মধ্যে সিগারেট টানার প্রথম স্বাধীনতা-ভোগকে কেউ গ্রাহ্যও করছে না !

রাগ চড়তে থাকে রমেশের মগজে।

সিগারেটটা শেষ করে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে প্রায় রতনবাবুর সুর নকল করেই সে বলে, স্টেটমেন্টটা আমায় দেখিয়ে নেবেন সুনীলবাবু।

সুনীল ধীর গলায় বলে, অঘোরবাবু একটা এস্টিমেট চেয়েছেন, আমি সেটা তৈরি করছি। অঘোরবাবু এটা নিজে দেখবেন।

রমেশ ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আহা, অঘোরবাবুই তো দেখবেন। ওঁকে দেখাবার আগে আমায় একবার দেখিয়ে নেবেন।

সকলে এবার মুখ ফিরিয়ে তাকায় তার দিকে।

কোম্পানি তিরিশ বছরের, কিন্তু মাত্র গত যুদ্ধের টাইমে কোম্পানিটা বড়ো হওয়ায় এবং বড়ো আপিস সৃষ্টি করতে বাধ্য হওয়ায় এই ঘরটায় আপিসের ঐতিহ্য মোটে পাঁচ-ছবছরের।

তবু, গত পাঁচ বছরের মধ্যে আজই যেন নাটক শুরু হল এমনি নাটকীয়ভাবে থমথম করে ঘরটা।

মিনিট দুই চুপচাপ।

রমেশের হুকুম শুনেও সুনীল যেন কিছুই বলবে না। তাকে কেয়ার করবে না।

এই দুমিনিটেই রমেশ ভয়ে ঝিমিয়ে যায়। অঘোরবাবুর বিশেষ কাজের, হয়তো বা গোপনীয় কাজের কাগজপত্রে নাক গলাতে চেয়ে সে বোকামি করে ফেলেছে। শুনে যদি অঘোরবাবুর রাগ হয় !

রমেশ বলে, যাকগে। ভালো করে তৈরি করুন এস্টিমেটটা। ভুলটুল না করে বসেন এই জন্য দেখতে চেয়েছি।

এবার সুনীল পেন রেখে একটা সিগারেট ধরায় !

এই আপিসঘরে আপিস টাইমে তারও এই প্রথম সিগারেট ধরানো।

বলে, এস্টিমেটটা অঘোরবাবু সোজা ওঁকেই দিতে বলেছেন। স্পষ্ট বলেছেন, আর কাউকে যেন না দেখাই। আপনি দেখতে চাইলে দেখাতে পারি। তবে আমাকে বলতে হবে যে আপনি নিজে দেখে ভুল-টুল ঠিক করে দিয়েছেন।

যাকগে।

দেখবেন না এস্টিমেটটা ?

অঘোরবাবুকেই দেখাবেন।

কাগজপত্র নাড়াচাড়া ছাড়া ঘরে অনেকক্ষণ ধরে আর টুঁ শব্দটি শোনা যায় না।

কেবল নবীন নয়, সকলেই মাঝে মাঝে কর্মরত সুনীলের দিকে তাকায় এবং নবীনের মতো অতটা স্পষ্টভাবে না হলেও সকলেরই মনে হয় মানুষটা সুনীল শুধু শক্ত নয়, মানুষটা সে বেশ একটু নিষ্ঠুর।

রমেশের জন্য তাদের কোনো সহানুভূতি নেই, তাকে অপদস্থ করে উচিত কাজই সুনীল করেছে। কিন্তু মানুষটা নিষ্ঠুর না হলে কী এমনভাবে অপদস্থ করতে পারত, অঘোরবাবুই হুকুম দিয়েছেন এস্টিমেটটা অন্য কাউকে দেখানো বারণ—এ কথাটা গোড়ার দিকে চেপে রেখে ?

গোড়ায় বললেও রমেশ অপদস্থ হত। কিন্তু এতটা হত না।

সন্ধ্যার পর মায়াদের বাইরের ঘরটি মুখর হয়ে ওঠে কয়েকটি টাইপরাইটিং মেশিনের শব্দে। তিন মাসেব মধ্যে শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং আরও কমিয়ে দেবার শর্ত—তবে অনেক ছাত্রছাত্রীই আরও দু-একমাস স্বেচ্ছায় টেনে যায়।

এখন ছাত্রী আছে দুটি। মায়ার বাবা দীনেশ যখন চালাত তখন ছাত্রী হত না। সে স্থায়ীভাবে বিছানা নিলে মায়া স্কুলটা চালাবার দায়িত্ব নেবার পর দু-তিনটি ছাত্রী শিখতে আসে।

সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত ক্লাস। সুনীল আটটা পর্যন্ত মায়ার সঙ্গে এক ঘণ্টা শেখায়। বাকি এক ঘণ্টা ছাত্রছাত্রীরা নিজেবাই প্র্যাকটিস করে। মায়া একাই তখন ক্লাসটা সামলাতে পারে।

দুপুরে নবীনের সঙ্গে একচোট তর্ক হয়েছে, ক্লাস নিয়ে বাড়ি ফিরে নবীনকে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে দেখে সুনীল ভাবে, ছেলেটা আবার তর্কের জের টানতে হাজির হল নাকি ?

বাড়িতে ঘরের টানাটানি। বৈঠকখানা নিয়ে তিনখানা ঘরে এতগুলি লোকের কুলোতে চায় না। বিয়ে না করলেও ছোটো ঘরখানা দখল করেছে সুনীল একা।

সুনীল পবিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে সারাদিন তার খাটুনি, বাড়িতেও তাকে পড়াশোনা করতে হয়, নিজস্ব একখানা ঘর না হলে তার চলবে না।

হেসে বলেছে, ধরে নাও বিয়ে করেছি। তখন তো একটা ঘর ছেড়ে দিতেই হত আমাকে !

কিছু না বলে সে ঘরটা দখল করে থাকলে কেউ কিছু ভাবত না। সাংসারিক নিয়মেই একটা ঘর দখল করার পুরো অধিকার তার আছে—অনাদের যতই অসুবিধা হোক।

কিন্তু অধিকার খাটাবার বদলে এভাবে যুক্তি দিয়ে নিজের স্বার্থপরতাকে সমর্থন করতে চাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছে সকলেই।

কিন্তু সেই সঙ্গে সুনীল এ কথাও বলে দিয়েছে যে সে যতক্ষণ বাড়ি থাকবে না, তার ঘরটা সকলে ব্যবহার করতে পারবে।

আগে সকালে নিজের ঘরে লেখাপড়া করত সুনীল, তাই তার নির্দেশ ছিল যে সন্ধ্যার পর অনিল আর আলপনা তার ঘরে পড়বে, পুলিন আর কল্পনা পড়বে বৈঠকখানায়।

কল্পনা আর আলপনা এক ঘরে পড়তে বসলে শুধু বকবক আর ঝগড়া করে পরস্পরের সঙ্গে—লেখাপড়া হয় না।

অনিল আর কল্পনা এক ঘরে পড়তে বসলে কল্পনা বারবার তাকে পড়ার মানে জিজ্ঞাসা করে, অনিল চটে গিয়ে তাকে ধমকায়। দুজনের মধ্যে প্রায় কথা বলাবলি বন্ধ হয়ে যায় দু-একদিনের জন্য !

পুলিন একটু হাবাগোবা। সে দাদা-দিদিদের যেমন রকম-সকম, তেমনিভাবে চলে। চারটে দাদা-দিদি হোক আর একটাই হোক—পড়তে বসে তারা মন দিয়ে পড়লে সেও পড়ে, তারা হাসাহাসি গল্পগুজব করলে সে চুপচাপ শোনে, ঝগড়াঝাঁটি করলে সেও আবোল-তাবোল চেঁচামেচি করে।

জটিল সমস্যা !

এ সমস্যা সমাধানের জন্যই সন্ধ্যায় লেখাপড়া কে তার ঘরে কে বৈঠকখানায় আর কে ভূপেশের ঘরে করবে সুনীল নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল।

সকালে এতদিন সবাই পড়ত বৈঠকখানায়।

সুনীল নিজের ঘরে বসে তার নতুন প্রবন্ধটা লিখতে লিখতে শুনতে পেত বৈঠকখানা থেকে কলেজ-স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যেন পাঠশালায় স্বরে অ স্বরে আ পড়ার আওয়াজ তুলে পাঠাভ্যাস করছে।

সকালে টিউশনি নেবার পর সে পড়ুয়া ভাইবোনদের হিসাব করে বৈঠকখানা আর নিজের ঘরে লেখাপড়া করার জন্য ভাগ করে দিয়েছে।

বাজে শিক্ষা। অর্থহীন ফাঁকিবাজি শিক্ষা। তবু শিক্ষা দিতেই হবে !

পাসফেলের ডান্ডায় মাপতেই হবে ওদের বেশির ভাগকে ফেলের ডান্ডাব ঘায়ে কাত করে।

পুলিন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ছেলেটা অস্বাভাবিকরকম দুরন্ত।

চেষ্টা করেও তাকে জাগিয়ে খাওয়ানো যায়নি রাত্রের রুটি-তরকারি।

দুধ খাবি ?—বললে হয়তো তাকে একেবারে জাগানো যেত না, কিন্তু ঘুম-জড়িত স্বরে সে নিশ্চয় বলত, দাও।

ছিঁটেফোঁটা দুধ দিলেও চুমুক দিয়ে খেয়ে নেতিয়ে পড়ত।

রুটি সে খেতে পারে না। এই জলকাদার দেশের বাচ্চা। চোদ্দোশো পুরুষ ধরে যাবা ভেতো তাদের বাচ্চা।

তার মা ঝংকার দিতে ভুলে গেছে যে, মাছভাত মানায় বলে কী মাছরুটি মানায় ! এস্কিমোরা সিল মাছ পচিয়ে খায়, তাদের দেশে গেলে বরং ভালো করতাম। একরকম খাবার জুটত—চোদ্দোশো পুরুষ যা খেয়েছে।

অনিলের মাথা ধরেছে।

সে শুয়ে পড়েছে সকাল সকাল।

আলপনা একা বৈঠকখানায় ভদ্রতা রক্ষা করছে নবীনের সঙ্গে।

কী ব্যাপার নবীন ?

বলছি।

এতক্ষণ বসে না থেকে আমাকে একটা খবর পাঠালেই হত ?

দরকার হলেই বলে পাঠাতাম। অনেকদিন পরে এসেছি, এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম—ভাবলাম যে আপনি এলেই আপনাকে বলা যাবে আসল কথা। মুখহাত ধুয়ে আসুন ?

নবীনের কথাবার্তা একটু রহস্যময় মনে হয় সুনীলের।

ব্যাপার কী বলো না ?

বিভাদি আপনাকে একবার যেতে বলেছেন—জরুরি দরকার।

আজ এখন ? এখন আমি কোথাও যেতে পারব না।

বিভাদি বলতে বলেছে যে ওর খুব বিপদ—আপনাকে যেতেই হবে।

সুনীল এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার বসে। বলে, কী বিপদ নবীন ? কী হয়েছে ?

নবীন বলে, আমি তো জানি না।

তুমি ওর কাছ থেকে আসছ, তুমি জান না কী হয়েছে ? সে আবার কী রকম বিপদ ?

আমি কী করে বলব ? আমায় কিছুই বলেনি।

জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

নিশ্চয়। আমি জানতে চাইলাম কী বিপদ, কিছু বললে না। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম আপনি যদি জানতে চান কী বিপদ তাহলে কী বলব, তখনও কিছু বললে না।

আলপনা চুপ করে শুনছিল। এবার সে থাকতে না পেরে বলে ওঠে, দাদা তুমি একবার যাও। কিছু নিশ্চয় হয়েছে। বেচারি খোঁড়া নইলে নিজেই হয়তো আসত !

সুনীল বলে, তুই চুপ কর। বিভা কী করছিল নবীন ?

নবীন বলে, চুপচাপ শুয়েছিল, আবার কী করবে ? আমায় অঘোরবাবু ডেকেছিলেন একটা জরুরি চিঠি টাইপ করার জন্য—শ্যামলদের নাকি কী কাজে পাঠিয়েছেন। বিভাদি আমায় ডেকে একটা দুটো কথা বলেই হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, সুনীলবাবুকে একবার ডেকে আনবে ভাই ? বোলো যে আমার বড়ো বিপদ।

আলপনা বলে,.ইস্ ! নিজের বাপ-মাকে না বলে তোমায় ডেকেছে, নিশ্চয় ভীষণ কিছু হয়েছে। তুমি এক্ষুনি একবার যাও দাদা।

সুনীল তার দিকে শুধু একবার তাকায়। আলপনার সমস্ত উত্তেজনা নেতিয়ে যায়।

বলো গে আমি এখন যেতে পারব না। কাল-পরশু সময় পেলে যাব।

নবীন আর আলপনা দুজনেই যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়। একটা খোঁড়া দুখিনি মেয়ে, আপিসের খোদ কর্তার মেয়ে, সে বিষম বিপদের কথা জানিয়ে একবার যেতে বলেছে—ছুটে যাবার বদলে সুনীল কিনা বলছে কাল-পরশু সময় পেলে যাবে !

দয়ামায়া না থাক, তার কী কৃতজ্ঞতা বলেও কিছু নেই ? চাকরি তো তার করে দিয়েছে একরকম বিভাই।

ইচ্ছা করলে বিভা কি চাকরির দফা শেষ করতে পারে না ?

সুনীল হাই তুলে নবীনকে বলে, তুমি দেখছি বড়োই আশ্চর্য হয়ে গেলে ? তুমিও তো বিভার বিপদটাকে সিরিয়াস ভাবতে পারনি !

নবীন বলে, কী রকম ? বিপদটা কী জানি না, কিন্তু ছুটে এসেছি তো আপনাকে ডাকতে ?

ছুটে এসে এখানে গল্পে মেতে গেছ। দুপা গিয়ে মায়াদের বাড়িতে আমায় খবর দেওয়া দরকার মনে করনি।

নবীন অপ্রতিভ হয়, তর্ক কখনও হার মানে না। বলে, আলপনা বললে, বসুন না, দাদা এক্ষুনি আসবে। আমিও ভাবলাম আপনি ক্লাস নিচ্ছেন—

সেই জন্য তো বলছি তুমিও বিভার বিপদটা সিরিয়াস ভাবতে পারনি।

বিপদটা কী তা তো আমায় বলেনি।

আমি তো তাই বলছি। সত্যিসত্যি গুরুতর ব্যাপার কিছু হলে তোমার হাতে দুলাইন চিঠি লিখে দিতে পারত না ? তোমায় না জানাতে চায়, খামে ভরে দিলেই হত !

কল্পনার আজ বড়ো খিদে পেয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য অসহ্য খিদে।

বিয়ের পর বাপের বাড়ি এলেই তার এ রকম খিদে পায় !

সকলের আগে খেতে বসে এদের কথার আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে—শুকনো রুটিগুলি তাড়াতাড়ি চিবিয়ে খাওয়া যে কী কষ্ট, ভাত হলে কোঁত কোঁত করে গেরাসে গেরাসে পেটে চলে যায়—এঁটো হাতেই সে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এঁটো হাতটা উঁচু করে রেখে সে বলে, মুখ খুললেই তো ধমক খাব।

সুনীল বলে, কেন মিছে কথা বলছিস ? ন্যাকামি না করলে আমি কাউকে ধমকাই না।

তাহলে মনের কথাটা খুলেই বলি ! তুমি কিছু বোঝ না মেয়েদের ব্যাপার, কানাকড়িও নয়। মেয়েদের কত রকমের বিপদ হতে পারে তোমার কোনো ধারণাই নেই। এমন বিপদও হয় যা

বাপ-মাকে জানানো যায় না, কাউকে লিখেও জানানো যায় না। বিভাদি নিশ্চয় ভীষণ বিপদে পড়েছে। নইলে এমনভাবে অসময়ে তোমায় ডাকতে পারত না। তোমায় ভালোবাসে বলেই—

এই তো ন্যাকামি শুরু করলি।

বেশ। তোমায় ভক্তি করে বিশ্বাস করে বলেই তোমায ডেকেছে। তোমাকে ছাড়া কাউকে বলতে পারবে না বিপদের কথা।

সুনীল নির্বিকারভাবে বলে, কোনো মেয়ের ও রকম বিপদের কথা আমি শুনতে চাই না। কেন জানিস ? শুনেও তার বিপদ নিবারণ করার জন্য আধমিনিট সময়ও আমি নষ্ট করতে পারব না।

এক মুহূর্ত থেমে বলে, আমার অনেক কাজ।

নবীন একটু কাঁচুমাচু করে বলে, কিন্তু—মানে সুনীলদা, বিভাদি কিন্তু ভীষণ ঝোঁকের মাথায় চলে। রেগে গেলে যা খুশি করতে পারে। কোনো দিন তো ডাকে না, আজ এমনিভাবে ডাকল, না গেলে ভীষণ রেগে যাবে। বিভাদি পণ ধরলে অঘোরবাবু হয়তো ইয়ে না করে পাববেন না, মানে—

সুনীল শান্তভাবে হেসে বলে, বাপকে বলে বিভা আমায় চাকরি দিয়েছে, বাপকে বলে সে আমার চাকরিটা খসিয়ে দেবে। তুমি আসল কথাটাই ভুল করছ নবীন। অঘোরবাবু বিভার খাতিরে আমাকে চাকরি দেননি—বিভাকে অবশ্য বুঝিয়েছেন তাই, স্বাভাবিক মেয়ের চেয়ে খোঁড়া মেয়ে হাজারগুণ বেশি আদর চায়। চাকরি আমি নিজের গুণেই পেয়েছি। বিভা যদি আবদার ধরে যে আমাকে ছাঁটাই করতেই হবে—অঘোরবাবু বলবেন, বেশ বেশ তাই হবে। কাজে কিছুই করবেন না।

আপনি বুঝি অঘোরবাবুর পেয়ারের লোক ?

কল্পনা আলপনা দুজনেই কমবেশি শিউরে ওঠে। নবীনেব কি মাথা খারাপ ?

সুনীল কিন্তু রাগ করে না।

বলে, না পেয়ারের লোক নই। দরকারি লোক। পেযাব চাই না, কখনও চাইব না বলেই আমার চাকরি। এমন অনেক কাজ আছে পেয়ারের লোককে দিয়ে যা করানো যায না। অথচ যে কাজ না করালেই নয়।

নবীন কয়েক মুহূর্ত কল্পনার পায়ের ফুলতোলা কার্পেটেব চটিটার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মুখ তুলে বলে, আপনাকে তা হলে অঘোরবাবু খাতির করেন।

সুনীল মৃদু হেসে বলে, মোটেই না। আমাকে খুব দরকারি কাজে খাটান—আমাকে দিয়ে ছাড়া সে কাজ অন্যকে দিয়ে করাতে পারবেন না। আমি তাই কাজটাকে খাতির করি, অঘোরবাবুকে খাতির করি না। উনিও কাজ করার জন্যই আমাকে খাতির করেন।

সুনীল ভিতরে গেলে কল্পনা নবীনকে বলে, নিজের দাদা তবু বলছি, এ রকম পাথর দিয়ে গড়া মানুষ আর দেখেছেন ?

আলপনা বলে, পাথর বলছ কী ? পাথর শক্ত হয়, নিষ্ঠুর হয় না।

নবীন যেন আনমনেই ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

মাথা নাড়ছেন যে ?

নিষ্ঠুর ? না, সুনীলদা নিষ্ঠুর নয়। নিষ্ঠুর হলে নিষ্ঠুরতায় লোকে আনন্দ পায়। সুনীলদা কিছুই বোধ করে না। নিষ্ঠুর নয় তবে মায়ামমতা বলে কিছু নেই।

হৃদয়হীন ?

হৃদয় আছে। হৃদয়টা ভোঁতা। না, এবার পালাই। বিভাদিকে আবার খবর দিতে হবে। কী বলব তাই ভাবছি।

রাত প্রায় দশটার সময় সুনীল খেতে বসেছে, অঘোরের দামি গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়।

ডেকে পাঠালেও সুনীল যায়নি। বিভা নিজেই তাব কাছে এসেছে। তার দুটি পায়ের পাতাই মোচড়ানো। ফরমাশ দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি জুতো পরে লাঠি ধরে সে হাঁটে।

বছর চব্বিশেক বয়স হয়েছে কিন্তু একটা করুণ লাবণ্যে মুখখানা কচি দেখায় বলে বয়স আরও কম মনে হয়। মুখের রোমের জন্য যদিও লাবণ্য চোখে পড়ে না।

বাইরের ঘরে চৌকিতে বসে বলে, সুনীলবাবু খাচ্ছেন ? আচ্ছা আমি বসছি।

সুনীল সবে খেতে আরম্ভ করেছিল। বিভা এসেছে শুনে সে উঠে মুখহাত ধুয়ে বাইরের ঘরে আসে।

খাওয়া ফেলে উঠে এলেন ?

খাওয়া পালাবে না।

আমিও কী পালাতাম নাকি ? একটু নয় বসতাম !

চৌকিতে বিভার কাছে বসে সুনীল সকলকে ভিতরে যেতে বলে।

তোমার নাকি গুরুতর বিপদ ?

শুনেও তো গেলেন না ?

আমি ভাবলাম এমনি খেয়ালের বশে ডেকেছ। তেমন কিছু হলে মুখে বলে না পাঠিয়ে চিঠি লিখে দিতে।

বিপদে পড়েছি শুনেও যাবেন না, এটা ভাবতে পারিনি।

প্রচণ্ড রাগ আর অভিমান হয়েছে টের পাওয়া যায় কিন্তু প্রকাশটা হয় খুব মৃদু। সেও তো জানে সুনীলকে ভালোভাবেই। একটানা চার বছর সে তাকে ইংরেজি পড়িয়েছে। নিছক হৃদয়াবেগের কী আর কোনো মূল্য আছে সুনীলের কাছে।

সুনীল মৃদুস্বরে বলে, তোমার কী বিপদ হতে পাবে আর আমি তোমার কী কাজে লাগতে পারি ভেবে পাচ্ছি না। এক বমেশবাবুর ব্যাপারটা হতে পারে—

বিভা চোখ বড়ো করে বলে, নিজেই বুঝতে পেরেছেন তাহলে ? আপনি এত বোঝেন অথচ—

কিন্তু এ ব্যাপারে আমায় টানবে কেন সেটাই যে বুঝতে পারছি না।

বিভা ব্যাকুলভাবে বলে, কী যে ঢুকেছে বাবাব মাথায়, আমার বিয়ে দেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে তাও আবাব আপিসের কারও সঙ্গে দেওযা চাই !

তার অবশ্য মানে আছে। আপিসের লোক বশে থাকবে, তোমাকে অবহেলা করতে সাহস পাবে না।

আপিসের লোক হোক বাইরের লোক হোক টাকার লোভে তো বিয়ে করবে।

টাকার লোভে খাতিরও করবে বিয়ের পর।

কিন্তু ও খাতির দিয়ে আমি করব কী ? ভাবলেও আমার গা ঘিনঘিন করে। কচিখুকি তো নই, ঢের বয়স হয়েছে। ক-বছর আগে হলে বরং কথা ছিল, তখন আমিই কত স্বপ্ন দেখতাম—বাবা রাজপুত্র বর কিনে এনে দেবে, আমায় কত ভালো বলবে, খোঁড়া বলে আরও মায়া হবে বেশি। বুড়ো বয়সে এখন বুঝি তো সব ! এতটুকু ভক্তি করতে পারব ও রকম পয়সার কাঙালি ওঁচা একটা মানুষকে ? বাবাকে বোঝালেও বোঝে না। বাবার সেই এককথা, পয়সার কাঙালি সবাই। জামাই যে হবে সে আমায় মাথায় করে রাখবে, আবার কী চাই ?

বিভা করুণ চোখে চেয়ে থাকে। চোখ নামিয়ে একবার নিজের কুৎসিত পা দুটির দিকে তাকিয়ে নেয়।

সুনীল নীরবে তার বাকি কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করে।

বিভা একবার কেশে বলে, ভূপেনবাবুর তবু একটু মনুষ্যত্ব ছিল। বাবাকে কিছু বলার আগে আমায় একবার জিজ্ঞেস করেছিল। আমিও সোজা জানিয়ে দিয়েছিলাম বাবার টাকার লোভে আমায় বিয়ে করলে রোজ দুবেলা খোঁড়া পায়ের লাথি ঝাড়ব, স্বামী বলে কেয়ার করব না। তারপর থেকে ভূপেনবাবু আর যায়নি। কিন্তু রমেশবাবু দুদিন গিয়েই বাবাকে মত জানিয়ে বসেছে। আমি এখন কী করি। বাবা বিয়ে দেবেই আমার।

বিভা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়।

কেন দেবে জানেন ? মানুষকে বলতেও আমার মাথা কাটা যায়। বাবা আমাকে অবিশ্বাস করছে। কবে কী কাণ্ড করে বসি বলা তো যায় না, তাই একটা স্বামী জুটিয়ে দিচ্ছে। তারপর যা খুশি করি আসবে যাবে না।

বিয়ে কবে ? কাল পরশু ?

তার প্রশ্ন শুনে বিভার কাঁদো কাঁদো ভাব কেটে যায়।

দিন ঠিক হয়নি, কিন্তু বাবা যত তাড়াতাড়ি পারে চুকিয়ে দেবে।

সুনীল শান্তভাবেই বলে, তাহলে এমন অস্থির হয়ে পড়লে কেন ? ভয়ানক বিপদ বলে নবীনকে পাঠিয়ে দিলে, এতরাত্রে নিজে ছুটে এলে। আমি কাল-পবশু যাব ভেবেছিলাম, তখনও তো এ সব বলতে পারতে।

বিভা ব্যাকুলভাবে বলে, আপনি বুঝবেন না। আমার কী রকম অস্থির অস্থিব কবছে, দম আটকে আসছে। কী মনে হচ্ছিল জানেন ? আজ রাত্রেই বোধ হয় পাগল হয়ে যাব, একটা ভযানক কিছু করে বসব। আপনি আজকেই কিছু না করুন, আমায় একটু আশা দিন যে বাবাকে বুঝিযে বলবেন।

এত খারাপ লাগছে তোমার ?

বলে বোঝাতে পারব না কত খারাপ লাগছে।

সুনীল একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, এই তো দোষ তোমাদের, একটা ঝঞ্ঝাট হলেই মাথা খারাপ করে বসবে। অঘোরবাবুকে বুঝিয়ে বলতে বলছ। আমি বললে তিনি বুঝবেন কেন একবার ভেবে দেখলে না ? তাঁর ঘরোয়া ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে তিনি শুধু চটে যাবেন, আর কোনো লাভ হবে না।

বিভা হতাশভাবে বলে, বাবা কিন্তু আপনার কথার দাম দেন।

সে আপিসের কাজের কথায়। আমি অবশ্য যদি রমেশবাবুর নামে বানিয়ে বলি যে রমেশবাবু বদলোক, স্বভাব চরিত্র ভালো নয়, তা হলে বিশ্বাস করবেন।

তাই বলুন বাবাকে, আমায় বাঁচান। এ তো আর মিথ্যে নয়, বদলোক না হলে টাকার জন্য নিজেকে বিক্রি করতে চায় ?

ও রকম বদলোক বললে তোমার বাবার কিছু আসবে যাবে না। তোমাকেই তো বলেছেন, সবাই টাকার কাঙাল। অঘোরবাবুর কাছে টাকার জন্য নিজেকে বিক্রি করতে চাওয়াটা দোষ নয়। একজনের নামে বানিয়ে কিছু বলতে পারব না আমি। কাজেই বুঝতে পারছ আমার গিয়ে বলায় বিশেষ কোনো লাভ হবে না।

আমি স্যুইসাইড করব।

তোমার লজ্জা করল না এ কথা বলতে ? স্যুইসাইড করতে পারবে আর বিয়েটা ঠেকানোর জন্য একটু শক্ত হতে পারবে না ! উপায় তোমার নিজের হাতেই আছে।

কী উপায় ?

অঘোরবাবুকে পরিষ্কার জানিয়ে দাও এভাবে বিয়ে দেবার চেষ্টা করলে তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। কাঁদাকাটা করলে কিংবা বিয়ে করতে তোমার অসুবিধা কী বুঝিয়ে বলতে গেলে অঘোরবাবু বুঝবেন না। ভাববেন তুমি ঢং করছ, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিভা কাতরভাবে বলে, শুধু বললে বাবা বিশ্বাস করবে না। ভাববে ঢং করছি। আমাকে সত্যিসত্যি বাড়ি ছেড়ে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে বাজে কথা বলছি না।

সুনীল সহজভাবে বলে, প্রমাণ করবে। স্যুইসাইড করার চেয়ে কয়েকদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে যাওয়া অনেক সোজা।

কিন্তু কোথায় যাব ?

আত্মীয়ের বাড়ি, বন্ধুর বাড়ি, হোটেল—যাওয়ার জায়গার অভাব আছে নাকি ?

বিভা স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, আপনার এখানে এসে যদি উঠি ক-দিনের জন্য ?

সুনীল হেসে বলে, সাধে কী বলি তোমাদের কেবল বয়সটাই বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে না। যাওয়ার এত জায়গা থাকতে বাড়ি ছেড়ে আমার এখানে আসবার কথা ভাবছ। ফলটা কী হবে ? চাকরিটা যাবে আমার।

বিভা সঙ্গে সঙ্গে বলে তা বটে, ঠিক বলেছেন। বাবা ভাববে আপনিই বুঝি আমাকে বিগড়ে দিয়েছেন। কথাটা সত্যি হলেও বাবাকে টের পেতে দেওয়া উচিত হবে না।

কী রকম ?

আপনার সংস্পর্শে এসেই তো আমার মন-টন ভোঁতা হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে অ্যাদ্দিন মেলামেশা না করলে আজকে হয়তো আমি খুশিই হতাম—ভাবতাম হোক, রমেশবাবুই ভালো।

সুনীল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

তুমি আমায় ভড়কে দিয়েছিলে।

কেন ?

আমি ভাবলাম তুমি বুঝি নালিশ করছ আমার নামে। আমি তোমার মন-টন হরণ করেছি তাই তোমার অন্য কাউকে বিয়ে করতে আপত্তি।

বিভা প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে যায়, তারপর ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, সত্যিই কি আপনার দয়ামায়া নেই ? একটা খোঁড়া মেয়েকে এ কথাটা না বললে চলত না আপনার ? আমি অন্যভাবে বলেছি কিন্তু ও রকমটাও তো সত্যি হতে পারে !

সুনীল বলে, না। সত্যি হতে পারে না। সত্যি হলে সত্যিই আমি খোঁড়া মেয়েকে কথাটা বলতাম না।

সত্যি হতে পারে না কেন ?

কী করে হবে ? আমি তোমার হৃদয়মন দখল করলাম আর আমিই কিছু টের পেলাম না !

বিভা তার বেশি বয়সের কচি মুখখানা যতদূর সম্ভব গম্ভীর করে বলে, এমন তো হতে পারে আপনি দখল করেননি, আমি নিজেই সঁপে দিয়েছি ?

সুনীল হেসে বলে, ওটা কথার মারপ্যাঁচ। তুমি যে আমার অজান্তে আমাকে হৃদয়মন সঁপে দেবে—কোথায় দেবে ? আমার জামার পকেটে ? আমি হৃদয়মন দিয়ে না নিলে তোমার হৃদয়মন সঁপে দেবার সাধ্যই হবে না।—

কেন, একপক্ষে ভালোবাসা হয় না ? কত গল্প উপন্যাসে পড়েছি। আমার কথাই ধরুন ! আমি তুচ্ছ একটা খোঁড়া মেয়ে, আমি জানি আপনার ভালোবাসা আমি পাব না। আমি তাই আমার ভালোবাসা গোপন করে রাখি, আপনাকে জানতে দিই না।

তুমি যে সব গল্প উপন্যাস পড়ো তাতে এটা সম্ভব, জগতে কোথাও খুঁজে পাবে না। মানুষের ভালোবাসা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার; একপেশে হয়ে সেটা গজাতে পারে না। প্রথম দর্শনেই আমায় তোমার ভারী পছন্দ হয়ে গেল, এমনকী সাতরাত ঘুমোতে পারলে না, আমাকে ভেবে ছটফট করে কাটালে। এ পর্যন্ত সম্ভব হয়। কিন্তু তারপর তোমার ওই প্রথম দর্শনের ভালোবাসা জিইয়ে রাখা গড়ে তোলা আমাকে বাদ দিয়ে তোমার একার পক্ষে অসম্ভব। তোমার মন আমি টের পাব, আমার মন তুমি টের পাবে—আমার প্রশ্রয়ে তোমার ভালোবাসা তোমার প্রশ্রয়ে আমার ভালোবাসা দিন দিন বাড়বে। এভাবে ছাড়া মেয়েপুরুষে ভালোবাসা হয় না।

ভিতরে দরজার পিছনে সন্তর্পণে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি কল্পনা আলপনা দুজনের কথা শুনছিল। খুকু আর পুলিনও এসে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্রণার একশেষ। তোরা বুঝবি এ সব কথা ?

অথচ ধমক দিয়ে ওদেব তাড়ানোও যায় না, সুনীল টের পেয়ে যাবে তাব দুবোন চোরের মতো তাদের দুজনের কথা শুনছে।

বিভা বলে, পাত ছেড়ে উঠে এসেছেন, আপনাকে আর বকাব না। এত কথাই যখন বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করে যাই। সত্যি জবাব দেবেন কিন্তু। আপনি কাউকে ভালোবেসেছেন ?

সুনীল মাথা নাড়ে।

তবে যে এত বড়ো বড়ো কথা বলে গেলেন ভালোবাসা নিয়ে ?

সুনীল হেসে বলে, ভালো না বেসে বুঝি ভালোবাসার নিয়মকানুন জানা যায় না ?

থিয়োরি আছে ?

বিভা ভেবেছিল এ প্রশ্নে জব্দ হয়ে যাবে সুনীল। সুনীল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, আছে।

কী থিয়োরি ?

ভালোবাসাটা ঠিক কী জিনিস অথবা অ-জিনিস, তার স্বরূপটা কী, সে বিষয়ে কোনো থিযোরি নেই। আজ কেউ বলতে পারে না। বৈজ্ঞানিকরা তো পারেনই না, কবি লেখকরা তবু খানিকটা আভাস দিতে পারেন। কিন্তু ভালোবাসা যাই হোক যেমন হোক, ভালোবাসাব ব্যাপারেও সংসাবের কতগুলি সাধারণ মূল নিয়ম খাটে। ভালোবাসা হবে দুটো জীবন্ত মানুষের মধ্যে—তারা মেয়েপুরুষ নাও হতে পারে ! কিন্তু মানুষ দুটো হওয়া চাই।

বিভা যেন কাঠ হয়ে যায়। খোঁড়া পায়ের পাতা দুটো আরও ঠেলে দেয় চৌকিটার ভিতরের দিকে।

সুনীল বলে, ভালোবাসা যখন দুজনের ব্যাপার, একজন একা নিজের মনে ভালোবাসা তৈরি করবে, এটা সম্ভব নয়। দুজনে মিলে ভালোবাসবে। তুমি গল্প উপন্যাসে একজনের যে গোপনে নীরব ভালোবাসার কথা পড়, তার মানেটা কি জানো ? মানেটা হল দেবতা-ভক্তি, দেবতা-উন্মাদনা। দেবতা সাড়াও দেয় না কিছু গ্রহণও করে না। ভক্ত নিজের ভাবে হাসে কাঁদে পাগল হয়—পাগল হবার আর কোনো রাস্তা নেই, উপায় কী ! ওই অশরীরী দেবতাকে নিয়ে পাগল হওয়ার আরেক নাম একটা জ্যান্ত মানুষকে কিছু জানতে না দিয়ে নিজের মনে গোপনে ভালোবাসা। দেবতাদের ভুলে যাও। দেখবে এ ভালোবাসা ন্যাকামির মতো লাগছে।

বিভা চুপ করে থাকে।

কল্পনা অধীর হয়ে ভাবে, বিভাদি কী বোকা ! এমন সুযোগ পেয়েছে কিন্তু সুনীলকে বুঝিয়ে দেয় না যে তোমার নিয়ম খাটে না আমাদের বেলা। কোনো মানেই নেই তোমার নিয়মকানুনের। আমরা অত সব ভেবে কাজ করি না, করতে পারবও না !

অথচ পাঁচ মিনিট পরে কল্পনাই নিয়ম খাটায় নিজের তেরো মাসের ছোটো বোন আলপনার উপর।

লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গিয়ে বিভা গাড়িতে ওঠে। সুনীল রান্নাঘরে গিয়ে তার ফেলে-যাওয়া আটার পাতে বসে।

রাত বেজেছে এগারোটা।

আলপনা চট করে পরনের শাড়িটাই একটু ঘুরিয়ে পরে মুখে একটু পাউডার দিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে স্যান্ডেলটা পায়ে ঢুকিয়ে বাইরে যাচ্ছিল, কল্পনা তার হাত চেপে ধরে হুকুমের সুরে বলে, না।

কেন মিছে গোলমাল করবি দিদি ? আমি যাবই। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।

কল্পনা প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করে তার হাত চেপে ধরে রেখে বলে, তোকে ঠেকাচ্ছি না তো ? তোর ইচ্ছে হলে তুই যাবি বইকী। যেখানে খুশি যাবি। এতরাত্রে হঠাৎ এভাবে গেলে নবীন চটে যাবে, ওর বাপ-মা সুবিধে পেয়ে যাবে বলে নবীনের মন ভেঙে দেবে। কাল সকালে ঠান্ডা মাথায় যাস। রাত কাটা মোটে কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার।

আলপনা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে, হাতে লাগছে দিদি। তোর তো ভীষণ জোর !

কল্পনা তার হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, বাঃ, মায়ের পেটের বোনটি যাবে মরতে ? হাতে জোর হবে না ? হাতটা আমার কেলিয়ে গেছে আলপনা। টনটন করছে।

ছাই করছে। দাদার মতো চলতে ফিরতে কথা কইতে শিখেছ তুমি।

কল্পনা মিষ্টি সুরে বলে, কত খেটে দাদা আমাদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে বলো। নতুন টিউশনি নিয়েছে আমাদের খরচ চালাতে না পেরে। দাদা অবশ্য পাগলাটে কিন্তু সারাদিন খেটে যা পায় সব আমাদের পিছনে ঢালে তো ? বিয়ে করলে কী হত ভাব দিকি !

দাদা আবার বিয়ে করবে।

কল্পনা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ায়। উনানের ছাই দিয়ে ঘষা চকচকে দাঁত। তাদের বিয়ের জন্য দাদা তোড়জোড় করেছে অথচ নিজে সে কেন বিয়ে করতে চায় না তার কোনো মানেই বোঝে না কল্পনা।

বিয়ে হয় একটা ছেলে আর একটা মেয়ের।

সুনীল মহাপুরুষ নয়, একটা রোজগেরে ছেলে। নিজে সে বিয়ে করবে না, বোনটাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেবে।

পাশাপাশি ডাল আর ছেঁচকি দিয়ে রুটি খেতে খেতে কল্পনা বলে, পেট ভরে খা। মাথা ঠান্ডা থাকবে।

দুটি ভাত দাও।

মা ঝংকার দিয়ে বলে, ভাত ? জন্মিয়ে আনগে যা চাল, ভাত রেঁধে খাওয়াবো।

৪

সেদিন পড়াতে যাওয়া মাত্র নন্দা বলে, রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে আপনার প্রবন্ধটা পড়লাম। সুন্দর লিখেছেন—সবাই খুব প্রশংসা করছে।

আবার নিন্দেও করছে।

সেটা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কতগুলি আপত্তিকর কথা বলেছেন বলে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপত্তিকর কথা ? রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমি একটি কথাও বলিনি, তাঁর কাব্যের সমালোচনা করেছি।

শচীন, তার কাগজের সম্পাদক নিখিল আর নন্দার ভাই প্রদ্যোত বসে গল্প করছিল। প্রদ্যোত নন্দার চেয়ে দু-একবছরের বড়ো।

সে বলে, রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর কাব্য লোকের কাছে একাকার হয়ে গেছে।

সুনীল বলে, তা হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলেছি বললে মানে দাঁড়ায় কবিকে অপমান করেছি। সমালোচনার মতামত নিয়ে লোকের আপত্তি থাকতে পারে, সে আলাদা কথা। রবীন্দ্রকাব্যের নিন্দাও আমি করিনি। বস্তুবাদের সঙ্গে সংঘাতটা রবীন্দ্রকাব্যে কী রূপ নিয়েছে সেটা দেখাবাব চেষ্টা করেছি।

প্রদ্যোত বলে, ওটাই অনেকে নিন্দা বলে ধরে নিয়েছে। বস্তুবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের সংঘাত ছিল বলাতেই তাদের আপত্তি। কবিকে নাকি ছোটো করা হয়। তিনি বাদ সংঘাত এ সবের ঊর্ধ্বে ছিলেন।

সুনীল একটু হাসে, আর কিছুই বলে না।

শচীনের বয়স ষাটের কাছে গিয়েছে। কিন্তু অতটা বয়স অনুমান করা যায় না। সাধারণ হিসাবে এই বয়সের মতো চুলও পাকেনি শরীরও ভাঙেনি।

সে বলে, আমাদের কাগজে একটা লেখা দাও না ?

সুনীল বলে, আমার লেখা কি চলবে আপনাদের কাগজে ? আমি গা বাঁচিয়ে লিখতে পারব না।

শচীনের চেয়ে বয়সে ছোটো হলেও নিখিলকে বুড়ো দেখায়। তার চুল প্রায় সব পেকে গেছে, কতগুলি দাঁত পড়ে গেছে, মুখে শরীরের কোনো স্থায়ী অসুখের ছাপ।

কথাগুলি তার কিন্তু স্পষ্ট। বোধ হয় বহুকাল সম্পাদকের কাজ করার ফলে।

সে বলে, তুমি আমাদের কাগজ পড় না বোঝা যাচ্ছে।

সুনীল সরলভাবে কথাটা স্বীকার করে বলে, কাগজটা পাই না। বাড়িতে একটা বাংলা কাগজ রাখি, দু-তিনটে কাগজ কেনার ক্ষমতা নেই।

নিখিল বলে, কাগজে যখন লেখা দিচ্ছ। এবার থেকে কমপ্লিমেন্টারি কপি পাবে। কাগজ পড়লে বুঝতে পারবে, আমরাও গা বাঁচিয়ে কথা বলি না। কোনো বাদ বুঝি না, সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত বুঝি। সত্য কথা খাঁটি কথা বলতে ভগবানকেও কেয়ার করি না।

তাহলে বাদও মানেন। বাদ না মেনে সত্যবাদী হবেন কী করে ?

নন্দ ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে, নাও, এবার তোমরা ও ঘরে যাও। উনি আবার ঠিক ঘড়ি ধরে বিদায় নেবেন।

প্রদ্যোত ঘর ছেড়ে যেতে যেতে সুনীলের পক্ষ নিয়ে কৈফিয়ত দেয়। বলে, ঘড়িধরা দশটা কাজ থাকলে মানুষ করবে কী ?

নন্দা বলে, কাজ বোলো না—বেশির ভাগ পেটের ধান্দায় অকাজ।

সুনীল বলে, পেটেব ধান্দায় হলে সেটা অকাজ হয় বুঝি ?

হয় না ? আপনি কোথায় বই ঘাঁটবার সময় পাবেন, প্রবন্ধ লিখবেন, একটা কাজে আপিসে কেরানিগিরি করছেন, আমায় পড়াচ্ছেন...

তাই বলুন। পেটের ধান্দায় সবাই খাটবে। তবে বেখাপ্পা নিষ্ফল খাটুনি হলে সত্যি আপশোশের কথা। যে দেশে মানুষ পেটের ধান্দায় খাটতে চেয়ে কাজ পায় না সে দেশে এ রকম হবেই।

নন্দা আচমকা অন্য কথা বলে, ছাত্রীকে কিছুতেই তুমি বলতে পারলেন না।

সুনীল বলে, আপনিটাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

নন্দা দু-তিনবার তাকে তুমি বলার জন্য সুনীলকে অনুরোধ জানিয়েছিল কিন্তু সুনীল তাকে আপনি বলে এসেছে।

ডাকটা যে গোড়ায় নন্দার কানে বাজত বা এখন বাজে এমন নয়, তুমি বলার অনুরোধটা সে জানিয়েছিল সচেতনভাবে ওটাই উচিত মনে করে।

এদিক দিয়ে সুনীলের হৃদয়হীনতা সে ক্রমে ক্রমে টের পেয়েছে।

সহজ সরল ব্যবহার, মন দিয়ে শুধু পড়ায় না যে বিষয়েই কথা উঠুক খোলাখুলি আলগা আলোচনা করে, হাসির কথায় হাসে, সে নিজের কথা বললে মনোযোগ দিয়ে—মনে হয় যেন সহানুভূতির সঙ্গেই—শোনে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে হৃদয়গত ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক মোটামুটি একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্পর্কে তার নিদারুণ অবহেলা, উদাসীনতা !

নন্দার প্রকৃতি হালকা নয়, তার ছেলেমি ন্যাকামি আসে না। কিন্তু জানাচেনা হলেই মানুষের সঙ্গে কমবেশি হৃদয়গত সম্পর্ক গড়ে উঠবে, এতেই সে অভ্যস্ত।

সেটা যে প্রেমাত্মক সম্পর্কই হবে এমন কোনো কথা নেই।

বাপ-ভাই আত্মীয়-অনাত্মীয় শত্রুমিত্রের সঙ্গে হৃদয়গত একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্পর্ক থাকে না মানুষেব ?

সুনীল যেন ও রকম কোনো সম্পর্কই গড়ে উঠতে দিতে নারাজ।

নন্দা ফ্রয়েডের নামটাই শুনেছে। আর শুনেছে যে ওই ভদ্রলোকের থিয়োরি অনুসারে মানুষের হৃদয়মন নাকি কামময়—স্নেহ-মায়া-প্রেম-ভালোবাসা থেকে বিরাগ-বিতৃষ্ণা-নিষ্ঠুরতা-হিস্টিরিয়া সব কিছুর পিছনে ওই কামের শক্তি।

কে জানে এ সব থিয়োরির কী মানে। একটু মাথা ঘামাবার তাগিদও সে বোধ করে না। যদিও তার বন্ধু লীলা কয়েক বছব ধরে ফ্রয়েডকে নিয়ে মেতে আছে এবং তাব ধারণা জন্মে গেছে যে মানুষের সব কাজ আর অকাজেব মানে সে বুঝে গিয়েছে। বিদ্যাটা প্রয়োগ করে তার চলাফেরা ওঠা বসার ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা তাকে বুঝিয়ে না দিতে পারলে যেন লীলার শান্তি নেই।

লীলা এক ধরনের বিকাবগ্রস্ত মানুষেব কথা বলে, মেয়ে হলে পুরুষ আর পুরুষ হলে মেয়েদের সম্পর্কে হৃদয়টা ভোঁতা করে রাখাই নাকি তাদের বিকারের প্রধান কথা।

সুনীল কি ওই রকম বিকৃত মানুষ ?

কিন্তু একটা বিকারগ্রস্ত মানুষ এ রকম ধীর স্থিব সংযমী বিবেচক হয় কী করে, এত কাজ আর দায়িত্ব পালন করে কী করে ? জীবনের নীতিতে এমন কঠোর নিষ্ঠা, মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা সম্পর্কে এমন উদারতা, এত দায় ও হাঙ্গামা সত্ত্বেও দুঃখ-দুঃশ্চিন্তা বিষণ্ণতার ধার না ধারা কী করে সম্ভব হয় ?

অথচ চাকরিও করে কালোবাজারি অঘোরের আপিসে।

তিন মাস শুধু ঘড়ি ধরে একঘন্টা পড়াতে এসে সুনীল দলিত মথিত করে দিয়েছে নন্দার হৃদয়-মন।

প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল এটা বুঝি সুনীলের বাঁকা কাযদা, এইভাবে তাকে বুঝি অগ্রাহ্য করে অবহেলা দেখিয়ে—ইংরাজি বিদ্যা আয়ত্ত করতে ছাত্রী হিসাবে তার কাছে পড়লেও তার যে একটা হৃদয় আছে সে বিষয়ে উদাসীন থেকে অবজ্ঞা জানিয়ে—তাকে কায়দা করতে চায সুনীল।

অনেকে অনেকরকমভাবেই তো কায়দা করতে চায় তাকে।

সেও কয়েকদিন খুব গম্ভীর হয়েছিল, অবজ্ঞা আর উদাসীনতা দেখিয়েছিল।

সুনীল এতটুকু ভাবান্তর দেখায়নি, শুধু প্রশ্ন করেছিল, পড়তে মন বসছে না ? শরীর খারাপ ? এ সময় একদিন দুদিন পড়াশুনা কাজকর্ম বন্ধ রাখাই ভালো।

নন্দার সাধ হয়েছিল একটা চাপড় কষিয়ে দেয় সুনীলের গালে !

পুরুষের হৃদয়ে সাড়া জাগাবার জন্য মেয়েদের জানা-বোঝা পুরানো-নতুন কোনো আঘাত তার মর্মের বাইরের দুয়ারেও পৌঁছায় না।

মেয়েরা যেন মানুষ হিসাবেই তার কাছে গ্রাহ্য। মেয়ে হিসাবে সে গ্রাহ্যই করে না তাদের।

তার পরেই মনে হত, ঠিক তা তো নয় ব্যাপার।

মেয়ে বলে তাকে গ্রাহ্য করে বলেই তো তার কোনো রকম মেয়েলিপনাকে প্রশ্রয় দেয় না সুনীল।

জব্দ হয়ে যাওয়ার মতো একটা বিশ্রী মনোভাব নিয়ে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল, দিনরাত খেটেখুটে পড়ছি, আপনিও এত কষ্ট করে পড়াচ্ছেন, ইংরাজিতে পাণ্ডিত্য দেখিয়ে আমার লাভ কী হবে ?

সুনীল বলেছিল, এই তো সেদিন আপনি ইংরাজিতে পাণ্ডিত্য চেয়ে আমায় মাস্টার রাখলেন। তিন মাস আগে। আপনার বাবার কাগজে চাকরি করবেন বললেন। তিন মাসে উদ্দেশ্য হারিয়ে গেল আপনার ? একেবারে ভুলে গেলেন কী জন্য আমার কাছে ইংরাজি জার্নালিজম শিখছেন ?

চমকিত হয়ে গিয়েছিল নন্দা।

জার্নালিজম শিখছি ?

তাছাড়া কী ? আপনাব বাবার কাগজ হোক বা অন্যের কাগজ হোক, আপনি কাগজে কাজ করার জন্য ইংরাজি শিখছেন। আমিও আপনাকে সেইভাবেই শেখাচ্ছি।

নন্দা প্রায় খেপে গিয়ে বলেছিল, আমি দুজন সাব-এডিটরকে যেচে কাজ দিয়েছি জানেন ? তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমার কাছে অনেকে কাজের জন্য আসে, তাদের আমি পাত্তা দিই নাকি ? ওরা অসহায় হয়ে পড়েছে কিন্তু আমার কাছেও আসেনি। এই জন্য ডেকে এনে আমি ওদের কাজ দিয়েছি।

সুনীল ব্যঙ্গের সুরে—হ্যাঁ ব্যঙ্গের সুরেই—বলেছিল, আমিও তো মাসে পঁচিশটা টাকার কাজের জন্য যেচে তোমার কাছে এসেছিলাম।

নন্দার খেয়ালও হয়নি যে সুনীল তাকে তুমি বলেছে। অনেকবার অনুরোধ করেও যাকে আপনি থেকে তুমিতে নামাতে পারেনি, সে নিজে থেকেই তাকে তুমি বলেছে।

খেয়াল সে অবশ্য করতেই পারে না। যদি পারত তবে সুনীলকে তুমি বলাবাব জন্য দু-তিনবার যেতে যেচে অনুরোধ জানাত না।

সুনীল ভাবে, ভাগ্যে সকালবেলা একঘণ্টা একে পড়ানোর কাজ নিয়েছি। রাত্রে দু-একঘণ্টা নিশ্চয় ঘুমায়। নইলে আমায় নাজেহাল করে ফেলত।

নন্দা ভাবে, কী দুর্ভাগ্য, এই নারী-বিদ্বেষী লোকটাকেই মাস্টার রাখলাম। এমনভাবে ইংরাজি শেখায় যেন মেয়েদের শিক্ষিত করাটা দয়াদাক্ষিণ্য দিয়ে করার কাজ।

পরদিন থেকে সুনীল আবার তাকে আপনি বলা শুরু করে। স্বেচ্ছায় নয়, আগের দিন যেমন আপনা থেকে তুমি বেরিয়ে এসেছিল আজ তেমনি আপনা থেকেই আপনি বেরিয়ে আসে।

নন্দার জীবনকাহিনি জানবার জন্য সুনীল বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখায়নি।

তবে, নন্দা নিজে থেকে যা জানিয়েছে সে মন দিয়ে শুনেছে।

কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য করেনি।

নন্দা ভেবেছিল, বয়স বেশি হলেও বেশভূষা থেকে সুনীল তাকে কুমারী বলেই জানে।

তার বিয়ে হয়েছিল, সে পাঁচ-ছবছর স্বামীর ঘর করেছে। তার স্বামী যুদ্ধে সৈনিক হলেও যুদ্ধের সংবাদ সরবরাহ করার কাজে গিয়ে মারা পড়েছিল। বোমা বা গুলিগোলা খাওয়ার বদলে বুনো একটা মেয়ের সঙ্গে পিরিত করতে গিয়ে, তার জঙ্গুলে অসভ্য স্বামীর সেকেলে ভুজলির ঘায়ে, মারাত্মক রকম আহত হয়ে সে মারা গিয়েছিল।

নন্দার ধারণা ছিল এ সব কাহিনি শুনে সুনীল চমকে যাবে।

সুনীল শান্তভাবে শুধু বলেছিল, এ রকম কত ব্যাপার যে ঘটেছে ! অন্য অনেক রকম হিসাব তো আছেই, যুদ্ধের জন্য কত লাখ মেয়ে যে স্বামী হারিয়েছে।

গা জ্বলে গিয়েছিল নন্দাব।

ছেলে হারায়নি ?

হারিয়েছে বইকী। ছেলে হারানো মেয়েদের সয়। ছেলেমেয়ে বাইপ্রোডাক্ট তো। স্বামী হারালেই সর্বনাশ।

নন্দা খানিকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। তার বিয়ে হয়েছিল, সে স্বামীর সংসার করেছে, এ সব শুনে না হয় চমক নাই লাগল সুনীলের, মৃত স্বামীর বুনো মেয়ের সঙ্গে পিরিত করতে গিয়ে প্রাণ হারানোর কাহিনি যে সে এমন অনায়াসে শুনিয়ে দিল, এতে একটু আশ্চর্য হওয়া তো উচিত ছিল তার !

গলার সুব পালটে সে বলেছিল, মানুষটা খারাপ ছিল ভাববেন না কিন্তু।

না। যুদ্ধের ব্যাপারে জড়িয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পাহাড়ে জঙ্গালে গিয়ে একজন একদিন একটা অনাচার করেছিল, এ থেকে কী বিচার করা যায় মানুষটা ভালো না খারাপ ছিল ? তাছাড়া আপনিও হয়তো জানেন না ঠিক কী ঘটেছিল। এমনও তো হতে পারে যে আপনার স্বামী বুনো মেয়েটাকে মজাতে যাননি, বাঁচাতে গিয়েছিলেন।

নন্দা স্তম্ভিতা হয়ে গিয়েছিল সত্যিই। বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়েছিল।

তার ভাব লক্ষ করে নিজের বক্তব্য আরেকটু স্পষ্ট করা উচিত মনে করেছিল সুনীল।

মানুষ হঠাৎ একটা অপকর্ম করে বলতে পারে না তা নয়। কিন্তু এটা স্রেফ একটা আলগা থিয়োরি। কী ঘটনা সঠিক না জেনে, অকাট্য প্রমাণ না পেয়ে, কোনো মানুষ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা চলে না যে সত্যই সে অন্যায কাজটা কবেছে। ও রকম আন্দাজি বিচার মানুষ নিজের সুবিধার জন্য করে। বিনা বিচারে আটক আইনটা যেমন দেশের ভালোর নামে শাসকদলের সুবিধার জন্য, আন্দাজে একটা মানুষকে খারাপ ভাবাও তেমনি নিজের সুবিধার জন্য।

নন্দা উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, দেখুন, এমন আশ্চর্য ব্যাপার আমিও মনে মনে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমিও তো ভালো কবেই জানতাম মানুষটাকে। পাঁচ বছর একসাথে ঘর করেছি ! হঠাৎ ও রকম তার মতি হয় কী করে ? আপনি যে আমার কী উপকারটা করলেন আজ !

পরদিন দেখা গিয়েছিল থান পরে নন্দা বিধবার বেশ ধাবণ করেছে।

কেমন দেখাচ্ছে ?

সুনীল প্রশান্ত মুখে তাকিয়েছিল, কিছু বলেনি।

ছেলেমানুষি ভাবছেন তো ?

কেন তা ভাবব ? আপনার কাছে এটা কত গুরুতর ব্যাপার জানি না আমি ?

কয়েকদিন বাদেই আবার সে আগের মতো কুমারী বেশ ধারণ করেছে।

পড়ার তাগিদে সকলকে অন্যঘরে পাঠিয়ে দিলেও নন্দা পড়ায় মন দিতে পারে না।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার জন্য সে যে খুব খাটছে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। তিন মাস আগেও মুখে তার কমনীয়তা ভেসে থাকত। সেটা প্রায় উপে গেছে। এসেছে একটু শুকনো ভাব—দৃঢ়তাব্যঞ্জক রুক্ষতা।

বড়ো বড়ো পরীক্ষার আগে ছেলেমেয়েদের কাঁচা মুখে যে ভাবটা আসে।

নিজে থেকে কোনোদিন তার কোনো ব্যক্তিগত বিষয়ে সুনীল কৌতূহল প্রকাশ করে না। বোধ হয় পড়াসংক্রান্ত ব্যাপার বলেই সে আজ জিজ্ঞাসা করে, কী অসুবিধা হচ্ছে ?

অসুবিধা ? এখন তো অসুবিধা নেই। ক-দিন ভারী অস্বস্তি বোধ করছিলাম, তাই আবার আগের মতো বেশ করেছি।

আমি পড়ার কথা বলছিলাম। মন বসছে না কেন ?

নন্দা আনমনে একটু ভাবে।

মন বসছে না কেন শুনবেন ? খবরের কাগজটা আসলে আমার—আমি কাগজটার মালিক।

শচীনবাবুর নয় ?

না। আমাব স্বামী কাগজটা বার করেছিলেন।

নন্দা যেন খানিকটা আনমনা অবস্থায় ধীরে ধীবে 'দি পিপলস ভয়েস' কাগজটি বার করার কাহিনি বলে যায়। তার কাছে এ ভার মন থেকে না নামালে পড়ায় তার মন বসবে না জেনে, সুনীলও নীরবে শুনে যায়।

দেশ ভাগ হয়ে স্বাধীনতা আসবার সময় প্রমোদের খববের কাগজ বার করার ঝোঁক চাপে। এই তো উপযুক্ত সময়। যে বিরাট পরিবর্তন ঘটতে চলছে চারিদিকে, ভবিষ্যতের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা যেন কোনো দলের স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থে ব্যাহত না হয়, ক্ষুণ্ণ না হয়।

আজকের দিনেই সবচেয়ে বড়ো দরকার একটি নির্ভীক নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের, দেশের মানুষেব স্বার্থ ছাড়া, যে কাগজ আর কিছুই বড়ো করে দেখবে না।

যে কাগজ সহজ স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষায় দেশের লোকের কাছে খুলে ধরবে সমস্ত দল আর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির স্বরূপ, তাদের প্রত্যেকটি কার্যকলাপের আসল উদ্দেশ্য, চিনিয়ে দেবে কে দেশের শত্রু কে মিত্র, তীব্র তীক্ষ্ণ আঘাতে নস্যাৎ করে দেবে মতলববাজ সুবিধাবাদী মানুষদের।

কিন্তু কোন ভাষার কাগজ ? বাংলা না ইংরাজি ?

দুরকম হলেই ভালো। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব নয়, ইংরাজিতে কাগজ বার করতে হবে প্রথমে। এ কাগজ তো কেবল বাংলা দেশের স্বার্থ দেখবে না—সারা ভারতের জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাই হবে এ কাগজের ব্রত।

এই কাগজ বার করা নিয়ে সংঘাত লাগে বড়ো ভাই বিনোদের সঙ্গে। ভাগাভাগি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় দুজনের—সর্বস্ব পণ করে প্রমোদ এই কাগজ বার করে।

সঙ্গে ছিল আরেকজন বন্ধু। তারা টাকা ঢালেনি, কিন্তু অন্যভাবে সাহায্য করেছিল।

আবার বন্ধুভাবে শত্রুতা করেছিল অনেকে।

নন্দা চুপ করলে সুনীল বলে, কাগজটা বার হবার সময় একটা হইচই হয়েছিল মনে আছে। তারপর আর বিশেষ কিছু শুনিনি।

নন্দা সায় দিয়ে বলে, লোকে তেমনভাবে নিল না কাগজটা। উনি ভেবেছিলেন প্রত্যেকটা কাগজ একটা দলের হয়ে একপেশে কথা বলে, লোকের মাথা গুলিয়ে দেয়, এ রকম একটা অদলীয় স্পষ্টবাদী কাগজ লোকে হইচই করে নেবে। কিন্তু তা হল না। এখনও ওই টেনে টেনে কোনোরকমে চলছে। আমিও ঠিক বুঝিনে ব্যাপারটা।

সুনীল ধীরে ধীরে বলে, অদলীয় মানুষ হয় না, অদলীয় কাগজও হয় না। মানুষ হোক কাগজ হোক, একটা পক্ষ নিতেই হবে।

কেন ? আমি তো রাজনীতি নিয়ে মাথাই ঘামাই না, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আছি। অবশ্য আমায় যদি মানুষ বলে গণ্য না করেন—

সুনীল শান্তভাবে হাসে।

নিজেকে আপনি নিরপেক্ষ মনে করেন। কিন্তু মনে করলেই তো সেটা সত্যি বা সম্ভব হয় না। রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামালেও রাজনীতি বাদ দিয়ে আপনার চলতেই পারে না, আপনার জীবনে রাজনীতি এঁটে থাকবেই। আপনি একটা কাগজের মালিক কিন্তু ধরে নেওয়া যাক আপনি কাগজ পর্যন্ত পড়েন না। কিন্তু শোনেন তো চালের দর কোথায় উঠেছে ? লোকে না খেয়ে মরছে ? উদ্‌বাস্তুরা কী রকম কষ্ট পাচ্ছে ? কত মানুষ বেকার বসে আছে ? সব কিছু কালোবাজারের গ্রাসে গেছে ? দেশের লোকের সভায়, শোভাযাত্রায়, লাঠিগুলি চলছে ? শুনে নিশ্চয় গা জ্বালা করে আপনার। তার মানেই পক্ষ নিলেন।

গা জ্বালা করলেই পক্ষ নেওয়া হল ?

হল বইকী। আপনার ঠেকছে কোথায় জানেন ? দলের পক্ষ নেওয়া মানে আপনি ধরে রেখেছেন আন্দোলন করা, সোজাসুজি আন্দোলনে যোগ দেওয়া। কোনো দল সাধারণ লোকের জন্য ন্যায্য দাবি তুললে, ঘরের কোণে বসে মনে মনে সায় দিলেও আপনি পক্ষ নিলেন। মনে মনে সায় দেওয়াটা কাজে প্রকাশ পাবে—যত সামান্য হোক তুচ্ছ হোক কাজটা। ঘরের কোনায় থেকে নিজের ভাইবোনকে কথায় কথায় মনের কথাটা জানালেন—তার মানে দাঁড়াল কী ? ওই দলের হয়ে আপনি প্রচার করলেন।

সুনীল ঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর তাকায় নন্দার মুখের দিকে।

বলে, আজ ইংরাজি পড়া থাক, যা বলছি সেটাই পড়াই। বেশ একটু ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছি মনে হচ্ছে, কথাটা স্পষ্ট করা উচিত। পক্ষ যে মানুষকে নিতেই হবে তার আসল মানে হল এই যে, সমস্ত মানুষ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে আছে—শোষক আর শোষিত। এর একটা ভাগে মানুষকে পড়তেই হবে। রাজনৈতিক দলও আসলে আছে দুটোই—শোষকের দল আর শোষিতের দল।

কিন্তু দল তো অনেকগুলি।

দুটো ছাড়া বাকি সব উপদল, সুবিধাবাদী দল। যতই বড়ো বড়ো বুলি কপচাক আর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখাবাব চেষ্টা করুক, হয় এ-পক্ষ, নয় ও-পক্ষের স্বার্থে চলতেই হবে। একটা শ্রেণি উপরে চেপে আছে, আরেকটা শ্রেণি উঠছে, আসল সংগ্রাম এই দুটো শ্রেণির মধ্যে। যেখানে যেমন রূপ হোক সংঘাতের, স্পষ্ট হোক, আড়াল করা হোক, সব সংঘাতের পিছনে এই দুই শ্রেণির নেতৃত্ব।

চাষিতে জমিদারে যেখানে মারামারি ?

জমিদার মালিক শ্রেণির ঘাঁটি। চাষি যখন জমিদারের সঙ্গে লড়ে আসছে সে তখন শ্রমিক শ্রেণির পক্ষ নিয়ে মালিক শ্রেণির সঙ্গে লড়ছে।

নন্দা একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই বলতে যায়, আপনি তো রাজনীতির ধার ধারেন না।

সে কী ? এতক্ষণ তাহলে কী বোঝালাম আপনাকে ? রাজনীতির ধার প্রত্যেককে ধারতেই হবে। রাজনীতি মানেই তাই।

নন্দা একটু বিরক্ত হয়ে বলে, আহা, আমি বলছি সোজাসুজি রাজনীতি করার কথা। তা তো আপনি করেন না ? আপনি আছেন চাকরি আর দেশ-বিদেশের সাহিত্যচর্চা নিয়ে। এ সব রাজনীতির কথা জানলেন কী করে ?

সুনীল হাসিমুখেই বলে, এ সব আজকাল সব কিছুর অ, আ, ক, খ হয়ে গেছে। সাহিত্যচর্চা বিজ্ঞানচর্চা যাই চর্চা করুন, একটু সাধারণ জ্ঞান জন্মে যাবেই।

আমার তো জন্মায়নি ?

আপনাকে চেষ্টা করে উলটো জ্ঞানটা শেখানো হয়েছে বলে। এটাই কিন্তু প্রমাণ যে শ্রেণিযুদ্ধের মোট কথাটা সাধারণ জ্ঞান দাঁড়িয়ে গেছে। আপনি পাছে সে জ্ঞানটুকু পেয়ে যান সে জন্য আপনাকে বিভ্রান্ত করতে রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচানো যায়, নিরপেক্ষ থাকা যায়, এ সব আপনাকে শেখাতে হয়।

ঘড়ি ধরে বিদায় নেবার জন্য সুনীল উঠে দাঁড়ালে নন্দা তাকে আবেকটা মনের কথা জানিয়ে বসে।

বলে, আমি এমন তাড়াহুড়ো করে ইংরাজি শিখছি কেন জানেন ? আমার কথাটা বলি আপনাকে। কাগজটা ভালো চলছে না, বাবা মাঝে মাঝে তুলে দেবার কথা বলেন। কে জানে, কিছুদিন পরে বাবা হয়তো একেবারে বেঁকে বসলে তুলেই দেবেন কাগজটা। আমি তাহলে নিজে কাগজটা চালাবার চেষ্টা করে দেখব।

সুনীল সহজভাবে বলে, কাল থেকে আমি তোমাকে লিখতে শেখানোর দিকে জোর দেব। ছোটো ছোটো ঘটনা খবরের মতো লিখবে, ছোটো ছোটো প্রবন্ধ লিখবে, বাংলা কাগজ থেকে অনুবাদ করবে।

নন্দা আশ্চর্য হয়ে বলে, এই তো অনায়াসে তুমি বেরিয়ে এলো ?

সুনীল বলে, অনায়াসে বলেই বেরিয়ে এল। আমি চেষ্টা করে কাউকে তুমি বলি না।

রেবার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো নন্দা। রেবাকে তুমি না বলার জন্য সে আঘাত পেয়েছে, অপমান বোধ করেছে—কিন্তু তাকে আপনি না বলে কথা বলতে পারে না সুনীল।

বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সুনীল ভাবে, অনুমান তার মিথ্যা হয়নি। যাদবের মেয়েকে পড়ানোর বদলে পাঁচ টাকা কম বেতনে বেশি পথ হেঁটে নন্দাকে পড়াবার কাজ সে বেছে নিয়েছিল সেটা নিছক অকারণ নয়।

নন্দার গম্ভীর ভাব ও ভারিক্কি চালচলন দেখেই এটুকু সে অনুমান করে নিয়েছিল যে সে খেয়ালি নয়, জীবনকে সে গুরুত্ব দেয়, হালকা হওয়া তার পোষাবে না।

শ্রদ্ধাভক্তি ভয়ের সঙ্গে প্রেমকে গুলিয়ে ফেলার মতো ভাবপ্রবণ সে কখনও হবে না।

রেবা যেমন অনায়াসে গুলিয়ে দিয়েছে।

এবং তাকে জ্বালাতন করে মারছে, তার মন জয় করার অভিযান শুরু করে।

আঘাত দিয়ে পর্যন্ত তার ভুল ভাঙা যায় না। বরং আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় মন আরও বেশি করে তাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে।

সে নিষ্ঠুর। কাজেই তাকেই সে ভালোবাসে। এ নিষ্ঠুর হৃদয় জয় না করতে পারলে বেঁচে থেকে কী হবে ?

এ রকম মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়াও এক বিপদের কথা।

নন্দার সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে মেলামেশা করা চলে।

আজ তার কথা শুনে সে আরও নিশ্চিন্ত বোধ করছে। নন্দার স্বামী একটা ইংরাজি কাগজের মালিকানার দায় চাপিয়ে রেখে গেছে তার ঘাড়ে। এ দায় তুচ্ছ করার সাধ্য তার নেই।

প্রমোদ বেঁচে থাকতে কাগজটার পিছনে যথাসর্বস্ব ঢালা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে এদিকটা নিয়েই তো যেটুকু সে মাথা ঘামাত, কাগজটার জন্য বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না।

প্রমোদ মারা যাবার পর বাপের উপর কাগজটা চালাবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সে খুব বেশি দায়িত্ব বোধ করেনি।

সে মেয়েমানুষ, খবরের কাগজ চালাবার ব্যাপারে তার কী করার আছে ?

কিন্তু কাগজ ভালো না চলায় বাপ যেই কাগজটা বন্ধ করে দেবার কথা বলেছে তখনি টনক নড়ে গেছে নন্দার। সর্বস্ব দিয়ে স্বামী তার কাগজটি ধার করেছিল, যে কাগজটি চালাবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করেছিল, আজ সে কাগজ তুলে দেবার কথা ভাবছে তার বাবা ?

এ কী সর্বনাশের কথা !

কাগজটা বন্ধ করা তার কাছে সর্বনাশের শামিল বলেই এবার সে নিজে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। হোক সে মেয়েমানুষ, সে ছাড়া আর কে আছে যে দরদ দিয়ে কাগজটা চালু রাখার চেষ্টা করবে ?

নিজেকে তৈরি করতে তাই সে উঠে পড়ে লেগেছে। শচীন যদি শেষ পর্যন্ত কাগজ চালাবার ভার বইতে অস্বীকার করে নিজেই সে দায় ঘাড়ে নেবে। প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখবে কাগজটা বাঁচিয়ে রাখতে পারে কি না।

এমন যার দায়িত্ববোধ সে কখনও দৃঢ়চেতা শক্ত সমর্থ একটা পুরুষের সংস্পর্শে এলেই প্রেমে পড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে না।

কিন্তু প্রেম সম্পর্কে তার নিজের এমন বিতৃষ্ণা কেন ?

অনেকদিন পরে আজ আবার প্রশ্নটা তার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। নন্দা সহজে তার প্রেমে পড়বে না এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে সে যে বিশেষভাবে স্বস্তি বোধ করছে—এটাই তুলে বড়ো করে ধরেছে প্রশ্নটাকে।

নারীপুরুষের পরস্পরের আকর্ষণ মোটেই তুচ্ছ বাজে ব্যাপার নয় তার কাছে, নারীদেহ বর্জন করেই পুরুষের শুদ্ধ পবিত্র উচ্চতর জীবন সম্ভব, এই ধাপ্পাবাজিতেও সে বিশ্বাস করে না। নারীপুরুষের মিলন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনেরই একটা অঙ্গ। বৃহত্তর জীবনের জন্য বড়ো দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই কেবল সংযমের মানে হয়, নিজের আর আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের ফাঁকির খাতিরে সংযমের নামে আত্মপীড়নকে সে অসুস্থতা, বিকারগ্রস্ততা বলেই জানে।

নৈতিক কোনো কুসংস্কারের ধার সে ধারে না।

অথচ প্রেমের নামেই বিমুখ হয়ে ওঠে তার হৃদয়-মন। টিউশনি খুঁজতে গিয়ে পর্যন্ত সে এমন ছাত্রী বেছে নেয়, যে তার প্রেমে পড়ে যাবে এ আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম।

আরও একটা কথা আজ খেয়াল হয় সুনীলের। খেয়াল হয় যে ঘটনাচক্রে যে দুটি টিউশনির খোঁজ পেয়েছিল, দুটিতেই ছিল মেয়েকে পড়াবার প্রয়োজন। তার মধ্যে একজনকে সে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু এদের দুজনকেই বাতিল করে কোনো ছেলেকে পড়াবার টিউশনি খুঁজে নেবার কথা তো তার মনেও আসেনি ?

তার বিতৃষ্ণা কি তবে প্রেম সম্পর্কে নয় ? রেবার মতো উমার মতো মেয়েরা যেটাকে প্রেম মনে করে সেটাই তার অপছন্দ ?

কিন্তু মেয়ে তো এরা বদ নয়, পাকা ঝানু নয়। প্রেম তো তামাশা নয় এদের কাছে। ভুল বুঝে থাকতে পারে রেবা, কিছুদিন বাদে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে তার প্রেম, কিন্তু এই প্রেমকে আশ্রয় করে তুবড়ির মতোই তো প্রচণ্ড শক্তিতে উৎসারিত হয়ে উঠেছে সরল ছেলেমানুষ মেয়েটার আবেগ, কল্পনা, স্বপ্ন, অনুভূতি, সব কিছু।

হয়তো এই উন্মাদনাই প্রেম—প্রেম ব্যাপারটাই এ রকম, সে পছন্দ করুক আর না করুক। এই রকমই রীতিপ্রকৃতি প্রেমের।

সে যে গুরুগম্ভীর ভারিক্কি প্রেমের কথা ভাবে সেটাই একটা অসম্ভব অবাস্তব কল্পনামাত্র।

প্রতিদিনের মতো আজও রেবা দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনের চার-পাঁচহাত লম্বা-চওড়া বাগানটুকুতে।

আজকাল রেবা শান্ত সংযতভাবে কথা বলে, একটু উদাসীনভাবে। মুখে থমথমে ভাবটুকু বজায় থাকে কিন্তু সেটা ক্ষোভ বা অভিমানের জন্য মনে হয় না, এটা যেন তার নীরব ভর্ৎসনার প্রতীক।

আমার বইটা এনে রেখেছেন ?

ওদিকে যাবার সময় পাইনি।

রেবা অভিমান করে না।

বলে, সত্যি, সারাদিন যা খাটুনিটা খাটেন। আবার টিউশনিটা কেন নিতে গেলেন বলুন তো ? বাড়ির লোকেরাই নয় একটু কষ্ট করত।

সুনীল বলে, কষ্ট কী আর ওরা করছে না। কষ্ট করাটা নিষ্ফল হচ্ছে এই যা আপশোশ। তুমি এক কাজ করো না কেন ? লাইব্রেরি থেকে নিজে বই এনে তো পড়তে পার।

তার মুখে হঠাৎ আজ তুমি শুনে রেবা যেন চমকে ওঠে।

বোঝা যায় ভেতরে তার তোলপাড় করে উঠেছে।

কোনোমতে বলে, ও সব বই কি সাধারণ লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় ?

তা বলতে পারব না। বইটা আমি আনব, কবে আনব বলতে পারছি না। আনলে তোমায় পড়তে দেব।

যেখানটা বুঝব না বুঝিয়েও দিতে হবে কিন্তু।

৫

বাড়ির মানুষের কাছে রহস্যময় হয়ে উঠেছে অনিলের চালচলন।

দিন দিন কেমন রোগা আর মনমরা হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। সর্বদা অন্যমনস্ক ভাব, মুখে একটা চিন্তাক্লিষ্ট রুক্ষতার ছাপ।

সর্বদা বিরক্ত হয়ে আছে, যখন তখন কারণে-অকারণে ভয়ানক চটে যায়। পড়াশোনা করে না, কোনোদিন বাইরে বাইরে কাটায়, কোনোদিন গোমড়া মুখে ঘরেব কোনায় মুখ গুঁজে থাকে।

জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলে না।

দরদ দেখিয়ে দুবারের বেশি তিনবার কিছু জিজ্ঞাসা করলে একেবারে খেঁকিয়ে ওঠে।

এ সমস্তের সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে তার টাকার চাহিদা।

হঠাৎ মাকে বলে, আমায় দশটা টাকা দাও।

দশ টাকা ? দশ টাকা কোথা পাব ?

আমার ভীষণ দরকার। বাবার কাছে নয় দাদার কাছ থেকে চেয়ে দাও।

দাদা দেবে না। ওঁর কাছে আমি চাইতে পারব না, তুমি চাওগে।

আমার ভীষণ বিপদ।

বিপদ ?

মা চমকে গিয়েও ধৈর্য ধরে বলে, কী বিপদ বলো ! সত্যিসত্যি বিপদ হলে কী দশটা টাকার জন্য আটকাবে ? তোর দাদাই ব্যবস্থা করে দেবে।

আমি বলতে পারব না। দিলে দেবে, না দিলে দিয়ো না।

গৌরী অনেক ভেবেচিন্তে নিশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা বেশ দিচ্ছি এবারের মতো। তুই আমাকে শেষ করবি অনিল !

কার কাছে চাইবে ? বাবার কাছে ?

চেয়ে এনে দিতে পারব না। লুকিয়ে দশটা টাকা নিয়ে আসছি—হিসেবে কম পড়লে যখন জিজ্ঞেস করবে বলব আমার দরকার ছিল, নিয়েছি।

অনিল সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বলে, না না, ছি ! আমার জন্যে চুরি করবে ? টাকা চাই না আমার।

গৌরী ব্যাকুলভাবে বলে, বিপদের কথাটা বলো না গিয়ে সুনীলকে ? তোরা যত ওকে কঠিন ভাবিস, ও তত কঠিন নয় ! সত্যি মুশকিলে পড়েছিস বুঝলে ব্যবস্থা করে দেবে।

দাদাকে সে কথা বলা যায় না।

একটা কিছু বানিয়ে-টানিয়ে বল না গিয়ে।

মিছে কথা বলতে পারব না।

মিছে কথা বলতে পারবে না অনিল !

মার্কিনি সিনেমা দেখে মাথায় রক্ত চড়ে যাওয়ায়—ছায়া, সন্ধ্যারাতে বাড়ি ফিরতে চায়নি, কানেব দুল খুলে দিয়ে অনিলকে বলেছিল, টাকা জোগাড় করো।

পৌরুষে একটু বেঁধেছিল অনিলের কিন্তু নীতিবোধে বাধেনি।

দুল বিক্রির টাকায় উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত মানসিক বোগের দুঃখ তারা মন্থন করেছিল হোটেল আর ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করা দুঘণ্টার বাসরঘরে।

কিন্তু কত দুল বিক্রি করার জন্য অনিলের হাতে তুলে দেবে ছায়া ? একটা দুল কোথায় পড়ে গেছে—একবার প্রথমবার এ কৈফিয়ত বাড়ির মানুষ মেনে নেয়।

আরেকটা দুল হারালেই তাদের সন্দেহ জাগবে।

তার সঙ্গে ফুর্তি করতে চায় অথচ ব্যাটাছেলে টাকার ব্যবস্থা করতে পারে না, ছি !

কিছুদিন অনিল পারে বইকী ব্যবস্থা করতে। আংটি বেচে কলেজের মোটা মোটা দামি বইগুলি অর্ধেক দামে সেকেন্ডহ্যান্ড বুকশপে বেচে কলেজে মাইনে না দিয়ে, মান্থলি টিকিট না কেটে টাকার ব্যবস্থা কবেছে।

সে কি পুরুষ মানুষ নয় ?

কিন্তু তারপর ?

তারপর সে হয়ে গেছে নিরুপায়।

গিয়ে বলেছে ছায়াকে—দ্যাখো, হোটেলে হইচই করা, ভাড়াঘরে চোরের মতো যাওয়া বিশ্রী ব্যাপার লাগছে। তার চেয়ে চলো তুমি আমি গিয়ে দাদার পায়ে একসঙ্গে প্রণাম করি। দাদাকে বলি যে আমাদের এই অবস্থা, একটা ব্যবস্থা করে দাও, দাদা সব ঠিক করে দেবে।

ছায়া চুপ করে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ত্যরপরে গম্ভীর মুখে রুক্ষ গলায় বলে. আচ্ছা সে হবেখন। আজ আমি একটু ব্যস্ত আছি। তুমি কাল এসো।

অনিল রাস্তায় নেমে গিয়ে মোড়ের পানবিড়ির দোকান থেকে একটা আনি ভাঙিয়ে দুপয়সা দিয়ে একটা সিগাবেট কিনে ছোবড়ার দড়িব আগুনে সেটা ধরিয়ে ভাবছিল, আরেকবার গিয়ে কি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবে ছায়াকে ?

তার চোখের সামনে দিয়ে মোটরগাড়িতে সেনদের ললিতের পাশে বসে ছায়া বেরিয়ে গিয়েছিল !

পরদিন কলহ।

ছায়া বলে, কেন ? কী দোষ করেছি ?

অনিল বলে, ছিছি, তুমি এত নীচ ? আমার পয়সা ফুরিয়েছে বলে আমায় ছেড়ে ললিতকে ধরলে—এত কিছুর পর !

ছায়া ঝেঁঝে ওঠে, তোমার পয়সা ফুরিয়েছে বলে ? তুমি অপদার্থ অমানুষ বলে ! একটা মেয়ের সঙ্গে খেলা করতে পার, দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা নেই।

দায়িত্ব নেব না কে বলেছে ?

তোমার লজ্জা করে না ? কোন মুখে বললে চলো তুমি আমি দুজনে একসঙ্গে দাদার পায়ে ধরি, দাদা ব্যবস্থা করে দেবে ? আমি যেতে পারি ওভাবে ? নিজে ব্যবস্থা করতে পার না ? ললিত আমার কাছে প্যানপ্যান করবে না, যা করার নিজেই সব করবে, আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে।

বিপদ ? ছায়ার বিপদ ? অনিল অবাক হয়ে যায় !

ছায়া বলে, বোকাসোকা পেয়ে মজা করলে আমাকে নিয়ে। বিপাকে পড়ে গিয়েছি মনে হচ্ছে। ও মাসে ভাবনা হয়েছিল, এ মাসে ভড়কে গিয়েছি। আমার কাছে ন্যাকামি না করে, পুরুষ মানুষ একটা ব্যবস্থা করো—আমি তো তোমারই। তুমি না পারলে অগত্যা আমাকে ললিতের ভরসা করতে হবে।

মা মরিয়া হয়ে বলে, অনিলের কী হল তুই তাকিয়েও দেখবি না ?

সুনীল বেগুন ভাজা দিয়ে ডালমাখা ভাত চিবুতে চিবুতে বলে, আমি দেখতে গেলেই তো তোমরা চটে যাও। তোমরা ওকে তোমাদের আদরের ছোটো ছেলে করে রাখতে চাও। আমি কী করব বলো ?

কল্পনা বলে, মেজদার যা রকমসকম ব্যাপারস্যাপার দেখছি, বোধ হয় এবার স্যুইসাইড করে বসবে একদিন।

সকালে খবরের কাগজ পড়ার সময় হয়নি। সারাদিন খাটুনির পরে রাত্রে খেতে বসবার আগে কাগজে একটা খবর পড়েছিল—স্ত্রীপুত্রকে খেতে দিতে না পেরে জোয়ানমদ্দ একটা পুরুষ অশথ গাছের ডালে দড়ি বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

খাওয়া ফেলে ওঠে না সুনীল।

বলে, অনিলকে ডেকে নিয়ে এসো।

ডাকামাত্র অনিল আসে। এই মতলব নিয়ে আসে যে একটা চড়া কথা বলামাত্র পায়ের চটি খুলে সে সুনীলকে মারবে।

সুনীল খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করে, তুমি খাওনি ?

পরে খাব।

খিদে পায়নি ? খেলে এখুনি খাও। এখন খিদের সময়ে না খেলে আজ রাতে উপোস দেওয়াই ভালো।

অনিল চুপ করে থাকে।

খেতে ইচ্ছে করে না কেন তোর ? নেশা ধরেছিস ?

ভূপেশ আর গৌরী, দুজনেই যেন একসঙ্গে নিশ্বাস টানে। ঠিক কথা। অনিলের নেপথ্য জীবন নিয়ে এমনই তারা বিব্রত হয়ে পড়েছে যে ছেলেটা খেয়েছে কি না খেয়েছে তাও খেয়াল হয়নি।

সুনীল নিজেই কল্পনার আলপনা আঁকা পিঁড়িটা টেনে নিয়ে পেতে দিয়ে বলে, বসে পেট ভরে খা দিকি। তারপর অন্য ব্যাপার বিবেচনা করা যাবে। তোর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হয়নি তো ?

অনিল কথা বলে না। পিঁড়িতে বসে নীরবে ডাল আর পুঁইশাকের ঘণ্ট দিয়ে সাতখানা সেঁকা রুটি পেটে চালান করে দেয়।

জল খেয়ে কুলকুচো করে উঠেই বলে, আমি এখন ঘুমোব। বিছানা হয়নি ?

জবাব শুনবার অপেক্ষা না রেখেই সে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে।

নন্দার কাগজের জন্য প্রবন্ধটা শেষ করা দরকার ছিল কিন্তু ঘরে গিয়ে কাজে সুনীল মন দিতে পারে না।

মাঝে মাঝে যে চিন্তা মনে আসত আলগাভাবে আজ সেই চিন্তারই আবির্ভাব ঘটেছে গম্ভীর কালো মূর্তি নিয়ে। অগ্রাহ্য করার উপায় নেই।

সে যে এত করছে এদের জন্য, প্রাণপণে কর্তব্য পালন করে চলেছে, সত্যই তার কোনো মানে আছে কী ?

পথ কেবল দেখিয়ে দেওয়া নয়, পথ সে কি ধরিয়ে দিতে পারবে ভাইবোনদের ? ওদের জীবনের গতি ঘুরিয়ে দিতে পারবে ভবিষ্যতের দিকে ?

অথবা তার কিছু করা না করার প্রশ্নই আসে না ? যে ভাঙনের খাতে হিসাব লেখা হচ্ছে ওদের বাঁচন-মরণের তারই মধ্যে ব্যবস্থা আছে ভাঙার প্রতিক্রিয়ার পর গড়ে উঠবার—নতুন দিকে নতুনভাবে ?

ভাইয়ের কাছে সে বিশেষ কিছু আশা করেনি—নিজের দিক থেকে তার যদি কোনো প্রত্যাশা থেকে থাকে তা শুধু এই যে, জীবনের অপরিহার্য নিয়মনীতি মোটামুটি হৃদয়ঙ্গম করে জীবনের গতির দিকে চলার কায়দাটা একটু আয়ত্ত করে নিক।

অনিলের ঝোঁক অনিয়মের দিকে, উলটো দিকে।

জীবন যেদিকে এগোয় না। যেদিকে ব্যর্থতা ওত পেতে থাকে।

অনিয়মকে বেছে নেয় অথচ সে অনিয়মে বিদ্রোহ থাকে না। নিজেকে ভেঙে চুরমার করে ক্ষয়িষ্ণুকে দ্রুত শেষ করে ফেলার মধ্যেও একটা ব্যতিক্রমের নিয়ম আছে। সেটা পছন্দ নয় অনিলের। ভীরুতায় হতাশায় কাবু হয়ে সে শুধু নিজেকে কষ্ট দেবে, কষ্ট পাবে আর ভাববে জগৎ-সংসার তার উপরে বিরূপ।

অসময়ে মায়া আসায় সুনীল আশ্চর্য হয় না। মায়া আসবে সে জানত আজ রাত্রে না এলেও কাল সকালে নিশ্চয় আসত।

নিজেও সে যেতে পারত অনায়াসেই। কিন্তু বোনের ব্যাপারে মায়াকে একটু হাল ধরতে দেওয়া সে উচিত বিবেচনা করেছে।

অন্তত তার ঘর পর্যন্ত এগিয়ে আসুক।

মায়া বসে বলে, চুপচাপ যে ?

নানাকথা ভাবছি।

কাজের কথা নিশ্চয়। নইলে আপনার ভাববার গরজ পড়ে না। আমি কেন এসেছি জানেন ?

জানি।

অনিল আপনাকে বলেছে বুঝি ?

সুনীল মাথা নাড়ে।

মায়া আশ্চর্য হয়ে বলে, তবে কী করে জানলেন ?

সুনীলের মুখের ভাব এতটুকু বদলায় না, শান্তভাবে বলে, আপনার বোনকে সিনেমা দেখাতে, হাতখরচের টাকার জন্য ভাইটি আমার সাথে ঝগড়া করেছিল। তারপর কটা টাকার জন্য সব সময় খাঁ খাঁ করছে। আংটি কলেজের বই হাতঘড়ি সব বিক্রি করে দিয়েছে শুনলাম। ক-দিন থেকে দেখছি ভাইটি পাগলের মতো করছে। ব্যাপারটা অনুমান করা কি কঠিন এ অবস্থায় ?

মায়া রুষ্টস্বরে বলে, আমার বোনের জন্য আপনার ভাই পাগল হলে তো কথাই ছিল না—সাদাসিধে ব্যাপার হত। আপনার কাছে ছুটে না এসে আমি সংসারের হিসেবপত্র দেখতে বসে যেতাম।

সুনীল সোজা হয়ে বসে বলে, বটে ? শুনি তো ব্যাপারটা তবে ?

মায়া বলে শুনে আপনি অবশ্য এতটুকু বিচলিত হবেন না। বলতে আমার কান্না পাচ্ছে। ছায়া ক-দিন ধরে ছটফট করছিল। আমি টের পেয়েও কিছু জিজ্ঞেস করিনি—জানি তো, আমাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করাবার জন্যই ছটফট করছে। জিজ্ঞেস করলেই পেয়ে বসবে। আমি এমন ভাব দেখাচ্ছিলাম যেন কিছুই আমার চোখে পড়েনি। আজ মেয়ে নিজে থেকে আমায় সব বললেন।

একটু থেমে মায়া আবার শুরু করে, গোড়ার দিকে অনিল ছায়াকে সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিল কয়েকবার—এদিক-ওদিক হইচই করেও বেড়িয়েছে। একদিন পয়সা ছিল না, ছায়া হাতের চুড়ি পর্যন্ত খুলে দিয়েছে। কিন্তু পরে ছায়াকে ছেড়ে অনিল নাকি রেবাকে ধরেছে। ছায়ার বদলে রেবাকে নিয়ে সিনেমায় যায়, এখানে ওখানে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোকে ছাড়ল কেন অনিল ? ও অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যে কারণ বলল তার সোজা মানে দাঁড়ায় এই—অনিলের কাছে সব সময় পয়সা থাকে না, উনি তাই আরেকজনের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিলেন। সেনদের ললিতের সঙ্গে। সে জন্য রাগ করে পাল্লা দিয়ে অনিল রেবাকে নিয়ে যায়—ছায়ার সঙ্গে কথা কয় না।

কথা কয় না ?

কথা কয় না মানে মেশে না। রোজগার না থাকলে কী হবে, মেয়েরা যে সম্পত্তি, এ জ্ঞানটি আপনার ভাইয়ের বেশ টনটনে হয়ে উঠেছে। আরেকজনের সঙ্গে সিনেমা গেলেই মেজাজ বিগড়ে যায়।

সুনীল গম্ভীর মুখে বলে, তাহলে অনিলের সঙ্গে শুধু সিনেমায় যেত না, হইচই করত না। আরও কিছু নিশ্চয় ছিল।

তাই তো মনে হচ্ছে মেয়েটার রকম দেখে। একেবারে এলিয়ে পড়েছে। কী করা যায় বলুন দিকি ?

সুনীল ভাবতে ভাবতে বলে, বলছি। ছায়াকে আপনি বলবেন না আমি বলব ভেবে একটু ঠিক করে নিই, তারপর বলছি।

মায়া জোর দিয়ে বলে, কী বলবেন কথাটাই আগে বলুন না, তারপর ঠিক করা যাবে ছায়াকে কে বলবে।

সুনীল তবু একটু সময় গভীরভাবে চিন্তা করে নিয়ে বলে, বলবেন, রেবার দিক থেকে ছায়ার কোনো ভয় নেই। সিনেমায় নিয়ে যাক আর যেখানেই নিয়ে যাক, অনিলকে রেবা দেওরের মতোই আপন করবে। তার বেশি এতটুকু নয়।

তাই নাকি !

আমার সঙ্গে ভাব করতে চেয়ে অপমান হয়েছিল, সেটা চেপে রেখে আবার ভাব করার চেষ্টা করছিল। অপমান হয়ে, হয়তো গায়ের জ্বালায় শোধ নেবার জন্য বাইরে একটু বাড়াবাড়ি দেখাতে পারে, সেটা স্রেফ লোকদেখানো অর্থাৎ আমাকে দেখানো ব্যাপার হবে।

মায়া খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলে, মেয়েদের সম্পর্কে আপনার তো ভারী বিশ্বাস !

সুনীল হেসে বলে, মেয়েদের অবিশ্বাস করার চেয়ে বিশ্বাস করে মার খাওয়া ঢের ভালো।

মায়াও হাসে।—অভিজ্ঞতা আছে নাকি ?

না, সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

তারপর মায়া বেশ খানিকক্ষণ অত্যন্ত চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তার দিকে তাকায়। মায়া চিন্তা শেষ করে মুখ খুলতে অনেক সময় নেবে টের পেয়ে সুনীল নিজে থেকে বলে, না, তা হয় না। আমি রাজি হব না।

মায়া তাজ্জব বনে বলে, মানুষের মনের কথাও টের পান নাকি ?

সুনীল সহজভাবেই বলে, সময় অবস্থা যোগসূত্র অনেক কিছু ধরে বিচার করলে পাওয়া যায় বইকী। এতক্ষণ ওদের কথা বলার পর ওদের বিয়ে দিয়ে সব হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার কথাটা আপনার মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। আমাকেও কথাটা ভাবতে হয়েছে।

উচিত হবে না, না ?

নিশ্চয় না। তার চেয়ে ওরা বখাটে হয়ে যায় তাও অনেক ভালো। বখাটে হলে শোধরাবার আশা আছে, বিয়ে দিলে আর কোনো আশা নেই।

মায়া নিশ্বাস ফেলে বলে, কিন্তু ছায়ার কী উপায় হবে ?

সুনীল বলে, কী আশ্চর্য, এই বিজ্ঞানের যুগে ওই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার এত দুর্ভাবনা ! ডাক্তাররা আছে কী জন্য ? ভয় পাবেন না, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

মায়া বিদায় না নিয়েই নীরবে উঠে চলে যায়। এটা আজ নতুন নয়—একবাড়িতে দিনে যাদের দশবার দেখা হয়, কথা হয়, তাদের মতোই কথার শেষে কখনও শুধু যাই বলে, কখনও কিছু না বলে চলে যাওয়া তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে।

তাদের এই স্বভাবের জন্য আজ অসুবিধা হয় কল্পনার।

সে খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে ভিতরে তাদের কথা শুনছিল !

মায়া হাত বাড়িয়ে কান ধরতে তার মুখখানা রাঙা হয়ে যায় বটে কিন্তু মায়ার হাত চেপে ধরে টানতে টানতে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে সে চাপা গলায় বলে, বেশ করেছি শুনেছি। নইলে কি তোমাদের এ রহস্য কোনোদিন ভেদ করতে পারতাম মায়াদি !

মায়া আশ্চর্য হয়ে বলে, আমাদের রহস্য ?

কল্পনা বলে, রহস্য বইকী ! তাইতো বলি তোমরা দুজনে মিলেমিশে ঘরকন্না করছ, শুধু লীলাখেলাটুকু বাদ দিয়ে ! আচ্ছা, মায়াদি—মায়াদি তো নয়, বউদি—তোমাদের আইনমতে বিয়ে হয়েছে না তোমরা ওটা একদম বাদ দিয়েছ ?

তোদের মতো বিয়ের জন্য পাগল নই আমরা।

প্রেমের জন্য পাগল তো। তাই তো বলি, দাদার বুকটা বিয়ে না করেই এমন পাথর হল কীসে ? অন্য সংসারে আগে বউ আসে তারপর ভাই দাপট চালায় বাপ-মা ভাইবোনদের ওপর। কে জানত দাদা আমাদের বউ না এনেই সংসারী।

মায়া বলে, বিয়ের পর যেন মাথাটা বিগড়ে গেছে মনে হচ্ছে তোর ? আমি অন্য বিষয়ে পরামর্শ করতে এসেছিলাম।

কল্পনা নির্ভয়ে বলে, আমি সব শুনেছি। ছোড়দার সঙ্গে ছায়ার বিয়ে তো তোমরা বাতিল করবেই, নইলে যে তোমাদের বেলা অসুবিধা হয়।

মায়া এবার রাগ করে বলে, আবোল-তাবোল কী বলছ তুমি কল্পনা ? আমাদের তো অসুবিধা হবেই। যে দিনকাল, অনিল রোজগার না করলে, ঠিক পথে চলে মানুষ হবে কিনা না জানলে আমিই বা ওর হাতে কী করে বোনকে দেব ?

একটু থেমে শান্ত গলায় মায়া আবার বলে, সুনীলবাবু ঠিক কথাই বলেছেন। এ রকম হালকা প্রকৃতির ছ্যাবলা ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়াটাই মস্ত ভুল হবে। আমাদের জিজ্ঞাসা করে কি ওরা বিগড়ে গিয়েছে ? গোল্লায় গিয়েছে নিজেরাই। মানুষ যদি হয়, নিজেরাই চেষ্টা করে ব্যবস্থা করুক—

তখন আমাদের যতটা করা দরকার করব ? আমরা ওদের ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয় দিলে ওদের দুজনেরই সর্বনাশ করা হবে।

কল্পনা বলে, তোমাদের দুজনেরই সত্যি কঠিন প্রাণ মায়াদি !

৬

সুনীলের ইংরাজি প্রবন্ধটা নিয়ে চারিদিকে হইচই না হলেও লেখাটার বেশ নাম হয়েছে। এ ধরনের গুরুতর প্রবন্ধ নিয়ে বোধ হয় সে রকম হইচই হয় না, এমনিভাবেই ধীরে ধীরে গুণগ্রাহীদের মধ্যে নাম ছড়ায়।

হইচই করার মানুষেরা বোধ হয় মেতে উঠবার কিছু খুঁজে পায় না এ সব লেখায়।

আগে কথা হয়ে না থাকলেও সম্পাদক হিসাবে নিখিল তাকে লেখাটার জন্য কয়েকটা টাকা দিয়েছে।

অন্য কাগজ থেকে ফরমাশ এসেছে লেখার।

নবীন খুশি হয়ে বলে, এদিকে আপনার ভবিষ্যৎ আছে সুনীলদা।

কীসের ভবিষ্যৎ ? নাম না টাকার ?

দুটোরই।

সে ভবিষ্যৎ দিয়ে কী করব ? তোমার থাকলে বরং কাজে লাগত।

নবীন একটু হেসে বলে, নিজেকে যত উদার নির্বিকার ভাবছেন আসলে আপনি কিন্তু অতটা নন সুনীলদা। আলপনা আর কল্পনার কথা সবটা না হলেও খানিকটা ঠিক। আপনি কর্তালি করতে ভালোবাসেন।

সুনীল বলে, তা হয়তো বাসি। মানুষের কতরকম স্বভাব থাকে। কিন্তু নিজেকে আমি উদার নির্বিকার ভাবি এটা তুমি কী থেকে আবিষ্কার করলে ?

অনিলকে আপনার শাসন করে দেওয়া উচিত ছিল।

সুনীল একটু সময় তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কল্পনা তার আর মায়ার কথা লুকিয়ে শুনে মায়াকে খোঁচা দিয়ে মন্তব্য করেই ক্ষান্ত থাকেনি, অন্তরঙ্গ সকলের কাছে নিজের ভাষ্যসমেত সেই কথাগুলি বলে বেড়িয়েছে বোকার মতো।

কিন্তু কল্পনার নয় বিয়ে হয়ে গেছে, সে এখন পরের বাড়ির মেয়ে, সুনীলকে সে আর এতটুকু ভয় করতে রাজি নয়। বরং গায়ে পড়ে দেখাতে চায় যে আমি তোমায় একটুও ভয় করি না।

কিন্তু নবীনের এ দুঃসাহস কোথা থেকে এল ? কল্পনার কাছে সব শুনে তার ভয় উপে গেছে ?

সুনীল ধীরে ধীরে বলে, অনিলকে শাসন করলে সেটা কর্তালি হত না তোমাদের হিসাবে ?

নিশ্চয় না। ওটা হত শাসন। কিন্তু যেখানে শাসন করতে সাহস হয় না সেখানে তো উদার নির্বিকারতা দিয়ে কর্তালি করা সুবিধা। অনিলের সম্পর্কে আপনার ভাবটা এই যে, তোমার ও সব ছেলেমানুষি ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই।

সুনীল আর কিছু বলে না।

আপিস ছুটির পর সুনীল টাইপরাইটারে গিয়ে বসে।

পকেট থেকে হাতে লেখা কাগজ বার করতে দেখে নবীন জিজ্ঞাসা করে আরেকটা প্রবন্ধ লিখেছেন ? কী বিষয়ে ?

তোমাদের বিষয়ে। আধুনিক কবিতা নিয়ে।

আপনি আধুনিক বাংলা কবিতা পড়েছেন ?

পড়েছি বইকী। বেশি গদ্য পড়ার সময় পাই না। ট্রামে-বাসেও কয়েকটা কবিতা পড়ে নেওয়া যায়।

ঝুলতে ঝুলতে ?

আমি হেঁটে গিয়ে ডিপো থেকে ট্রামে উঠি।

নবীন ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, তবু, ট্রামে কবিতা পড়ে সমালোচনা লিখেছেন ! ট্রাম-বাসে লোকে ডিটেকটিভ বই পড়ে। খুব নিন্দা করেছেন তো ?

নিন্দাও করেছি, প্রশংসাও করেছি। ট্রামে ডিটেকটিভ বই পড়া যায়, কবিতা পড়লে দোষটা কী ?

ডিটেকটিভ বই যেমন-তেমনভাবে পড়া যায়। কিন্তু কবিতা একটু বিশেষভাবে না পড়লে—

চান করে গরদ পরে ফোঁটাচন্দন কেটে যোগাসনে বসে ? না, পরীক্ষা পাস করার মতো সিরিয়াস হয়ে ?

নবীন রেগে বলে, শেলি কিট্‌স কখনও পড়েছেন ট্রামে বসে ?

সুনীল গম্ভীর হয়ে বলে, না, পড়িনি। তাতে কী প্রমাণ হয় ?

কী প্রমাণ হয় ? প্রমাণ হয় যে শেলি কিট্‌সরাই আপনার কাছে আসল কবি। খুব মনোযোগ দিয়ে সিরিয়াস হয়ে ওদের কবিতা পড়তে হবে। দেশের চ্যাংড়া ছোকরারা যে সব কবিতা লিখছে সেগুলো ফাঁকতালে একটু চোখ বুলিয়ে পড়াই যথেষ্ট।

সুনীলের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে যায়।

বলে, ট্রামে, রেশনের দোকানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি রবিবাবুর কবিতাও পড়েছি, আরও অনেক জাঁদরেল পুরানো কবির কবিতাও পড়েছি। আমার তো পড়তে বা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। শেলি কিট্‌স শেকস্‌পিয়র বিদেশি কবি—বুঝে পড়তে বেশ খানিকটা কসরত করতে হয়। আমার মাতৃভাষায় লেখা কবিতা বুঝতে আমাকে কষ্ট করতে হবে কেন ? লেখাপড়া না জানতাম তা হলেও বরং কথা ছিল। ছেলেবেলা থেকে বাংলা ছড়া, বাংলা কবিতা পড়তে পড়তে ত্রিশ বছর বয়স হল, প্রায় সমস্ত বাংলা কথার তাৎপর্য জানি, রাস্তায় ঘাটে পড়লেও বাংলা কবিতা বুঝব না কেন ? যে কবিতা বুঝব না সেটা নিশ্চয় না বুঝবার জন্যেই কায়দা করে লেখা। সে কবিতা বুঝবার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই।

কেন নেই ? একটা ইংরাজি কবিতা বুঝবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোমর বেঁধে চেষ্টা করবেন, বাংলা কবিতায় চোখ বুলিয়ে বুঝতে না পারলেই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন ?

দেব।

কেন দেবেন ? কোন অধিকারে ?

এই অধিকারে দেব যে বাংলা কবিতাটা পরীক্ষা পাসের জন্য পড়ছি না। এই তো সেদিন চাকরিতে ঢুকলে, এর মধ্যে ভুলে গেছ পরীক্ষা পাসের জন্য ইংরাজি বাংলা সব কবিতাই কেটে ছিঁড়ে নোট মিলিয়ে পড়তে হত ?

নবীন আহত হয়ে চুপ করে থাকে।

তবু সুনীল তাকে আঘাত দিয়ে বলে, বেশি কথা বলা দোষ নয়, একটা দোষের লক্ষণ। চিন্তা হালকা হলে বেশি কথা বলিয়ে ছাড়ে। বিবেচনা করে কথা বলার দরকার হয় না কিনা।

নবীনের ফরসা মুখ তামাটে হয়ে যায়।

ব্যঙ্গের সুরে সে বলে, সেকেলে ভারী চিন্তার চেয়ে হালকা চিন্তাও ভালো। নিজের ভাবে গ্যাঁট হয়ে না থেকে হালকা চিন্তা তবু এদিক ওদিক নড়ে-চড়ে এগোয় পিছোয়।

এত চটে গিয়েছে নবীন কিন্তু সুনীল যেন গ্রাহ্যও করে না!

নিজেকে না শুধরে নিলে তুমি কোনোদিন বড়ো কবি হতে পারবে না। কথায় কথায় হৃদয় যার ফোঁস করে ওঠে, তার আর এ দেশেও বড়ো কবি হবার চান্স নেই দশ-পনেরো বছর আগেও খানিকটা ছিল।

রাগে নবীনের হাত-পা কাঁপছিল। একটা চেয়ার টেনে ঘুরিয়ে নিয়ে ধপাস করে বসে সে প্রশ্ন করে, কবি কি হৃদয়হীন ?

না। কিন্তু এ যুগে হৃদয়সর্বস্ব কবির দিন ফুরিয়েছে।

আমার কবিতা পড়েছেন আপনি ?

কবিতার বই বেরিয়েছে তোমার ?

এখনও বই বেরোয়নি। মাসিকে কয়েকটা ছাপা হয়েছে।

তা হলে এমন গোঁয়ারের মতো জিজ্ঞেস করছ কেন তোমার কবিতা পড়েছি নাকি ? হয়তো কোনো মাসিকে পড়েছি তোমার দু-একটা কবিতা, মনে নেই।

নবীন যেন খুশি হয় তার জবাব শুনে। সে যেন এবার বাগে পেয়েছে সুনীলকে।

তার তামাটে মুখ সাদাটে হতে থাকে। মুখে একটু বিদ্রুপাত্মক হাসিও ফোটে।

এই বিচারবুদ্ধি নিয়ে আপনার এত বড়াই ? আমার কবিতা না পড়েই রায় দিলেন সেগুলি হৃদয়সর্বস্ব কবিতা ?

বিদ্রুপাত্মক হাসিটা আরও স্পষ্ট হয় নবীনের। সুনীলের কথাই ব্যঙ্গের সুরে ঢেলে সেজে সে বলে, নিজেকে শুধরে না নিলে আপনি কোনোদিন বড়ো কাব্য-সমালোচক হতে পারবেন না। কবিতা না পড়েই যে কবির ওপর ফোঁস করে ওঠে, এ দেশেও তার বড়ো কাব্য-সমালোচক হবার চান্স নেই। দশ-পনেরো বছর আগে হয়তো খানিকটা ছিল।

সুনীল যেন একটা নিশ্বাস ফেলেই পকেট থেকে সস্তা সিগারেটের একটা প্যাকেট বার করে। নিজে একটা নিয়ে নবীনকে একটা বাড়িয়ে দেয়! তার সামনে নবীন সিগারেট খায়নি আজ পর্যন্ত।

নবীন বলে, না।

তুমি তো সিগারেট খাও ?

খাই। কিন্তু সিগারেট দিয়ে ভোলাবেন না আমায়।

ভোলানোর কথা নয়। তুমি সিগারেট খাও কিন্তু আমার সামনে খাও না। সিগারেট আমি খুব কম খাই— রোজ পাঁচ-সাতটার বেশি পয়সায় কুলোয় না। আমার বাবা গড়গড়ার তামাক টানেন, ইচ্ছা হলে তাঁর সামনেও আমি সিগারেট ধরিয়ে টানি। আমার সামনে সিগারেট খেতে তোমার লজ্জা হচ্ছে কেন ?

লজ্জা ? মোটেই নয়। আপনার সামনে সিগারেট টেনে চাকরি খোয়াব এই ভয়েই খাই না। এখন খাচ্ছি না এই জন্য যে আপনি আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে ভোলাতে চাচ্ছেন, আসল কথাটা চাপা দিচ্ছেন। আমি সিগারেট খাওয়ার অনুমতি চাই না, কবিতা না পড়েও আমার কবিতা নিয়ে ও রকম কেন করলেন জানতে চাই। কবিতা না পড়েই মন্তব্য!

সুনীল হাসে। সে হাসি শূলের মতো বেঁধে নবীনের বুকে।

সুনীল সিগারেটটা ধরিয়ে বলে, প্রায় বছরখানেক উদীয়মান কবিটিকে দেখলাম শুনলাম জানলাম বুঝলাম। কবিকে জানলে বুঝলে বলা যায় না সে কী রকম কবিতা লেখে ? ধানগাছটাকে জানলাম বুঝলাম। অনায়াসে ধরে নিতে পারব না এ গাছে ধান ছাড়া কিছুই ফলবে না ?

নবীন যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

আপনি তামাশা করছেন!

তোমার তাই মনে হবে।

কিন্তু এ কী রকম অদ্ভুত কথা বলছেন ! কবির সঙ্গে জানাশোনা থাকলে সে কেমন কবিতা লেখে বলা যায়, কবিতা পড়বারও দরকার হয় না ? এ কী ম্যাজিক নাকি ?

তোমার তাই মনে হবে। তোমার কাছে কবি আর কবিতা ভিন্ন। কবি একরকম হলেও কবিতা অন্যরকম হতে পারে, স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির মিল থাকবে এমন কোনো কথা নেই।

আমাকে নিয়ে আপনি আবোল-তাবোল বকছেন। কে আপনাকে বললে যে, আমি মনে করি কবি আর কবিতায় সম্পর্ক নেই ? আমি মোটেই তা মনে করি না।

তুমি নিজেই বললে, কবির বিচাব করা গেলেও কবিতার কোনোরকম বিচার করা যায় না। কবিকে জেনেও জানা যায় না তার কবিতা কোন ধরনের।

নবীন যেন হঠাৎ স্বস্তি বোধ করে। তার মুখে মৃদু একটু হাসিও দেখা যায়।

তাই বলুন। আপনি আমার কথাটাই বুঝতে পারেননি। আপনি যদি বলতেন কবিকে কবি হিসাবে জানতে চিনতে পারলে সে কী ধরনের কবিতা লেখে আন্দাজ করা যায়, আমি কথাটা না কয়ে আপনার কথা মেনে নিতাম। আপনি বলছেন, এমনি চেনাপরিচয় থাকাটাই যথেষ্ট। বছরখানেক এক আপিসে কাজ করছি বলেই আপনি যেন আমার সব কিছুই জেনে গেছেন। জন্ম থেকে কীভাবে মানুষ হয়েছি আপিসের বাইরে কীভাবে চলি ফিরি কিছু জানেন আপনি ? কী খেতে ভালোবাসি জানেন ? আপিসের বাইরেও কার কাছে কী ধরনের দাসত্ব করি খবর রাখেন ?

সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা সুনীল পকেটে পোরেনি। নবীন এবার প্রায় সুনীলের মতোই ধীর শান্তভাবে একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়।

সে যেন সমবয়সি অন্তরঙ্গ বন্ধু এমনি অমায়িকভাবে বলে, আপনার কী ব্যারাম হয়েছে জানেন ? আপনার হয়েছে গুরুজন কম্‌প্লেক্স। গুরুজন হতে চান। অবতারেরা যেভাবে জগতের গুরু হয়েছিলেন, আপনার সেভাবে গুরুজন হবার সাধ্য নেই। আপনি তাই চাকরি করতে করতে যতখানি গুরুজন হওয়া যায় সেই চেষ্টা করছেন।

সুনীল নিশ্বাস ফেলে বলে, নবীন, তোমাকে শুধু একটা প্রশ্ন করব। সোজা স্পষ্ট জবাব দিয়ো। তুমি তো বললে আপিসে ঘরে বাইরে তোমার অনেক গুরুজন। আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বল তর্ক কর আর কোনো গুরুজনের সঙ্গে সেটা তোমার চলে কী ?

নবীন চুপ করে থাকে।

সুনীল বলে, এখনও পাকা হওনি। আমি ইচ্ছা করলে তোমায় বিদায় দিতে পারি, অঘোরবাবু ইচ্ছা করলেই পারেন। এক বছর চাকরি করছ। আমার সঙ্গে প্রায় রোজ তর্ক কর। অঘোরবাবুর সঙ্গে সামনাসামনি মুখোমুখি জোর গলায় তুমি ক-দিন কথা বলেছ নবীন ? আমি রিপোর্ট দিয়েছি তুমি খুব ভালো কাজ করছ, তোমাকে এবার পারমানেন্ট করা উচিত। অঘোরবাবু কাউকে পার্মানেন্ট করছেন না—আটজনকে বিদায় দিয়েছেন। আমিও তোমার গুরুজন, অঘোরবাবুও তোমার গুরুজন। আমার সঙ্গে রোজ তর্ক কর, আমাকে রোজ নস্যাৎ করে দিতে চাও —অঘোরবাবুর সঙ্গে একদিন তর্ক করার সাহস হয় না কেন তোমার ? অঘোরবাবু ভালো গুরুজনই থাকেন তোমার কাছে—যা খুশি বলে তর্ক করতে দিয়ে আমি গুরুজনটাই হয়ে যাই বাজে গুরুজন !

নবীন চুপ করে থাকে। মাথা হেঁট করে না, শুধু চুপ করে থাকে।

টাইপ করার যন্ত্রে কাগজ ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে তার ইংরাজিতে লেখা বাংলা কাব্য সম্পর্কে প্রবন্ধটা টাইপ করতে আরম্ভ করার আগে সুনীল বলে, নবীন, কাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আপিসের কাজের জন্য দরকারি কথা ছাড়া একটিও বাড়তি কথা বলবে না। এটা গুরুজনের হুকুম নয়—অনুরোধ।

সুনীল দ্রুতগতিতে টাইপ করে যায়।

তার আঙুলগুলির দ্রুত স্বচ্ছন্দ গতির দিকে চেয়ে নবীন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে, হঠাৎ বলে, কী দোষ করলাম ?

সুনীল যেন শুনতেও পায় না।

নবীন রেগে বলে, বেশ। তাই হোক। আমি কিন্তু এ জীবনে আপনার সঙ্গে আর কথা কইব না। আজ কত বড়ো অন্যায় করলেন একদিন নিশ্চয় বুঝবেন। সেদিন ক্ষমা চাইলেও কথা কইব না।

সুনীল ফিরেও তাকায় না। রাগে নবীন থরথর করে কাঁপছিল। তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের সুরে বলে, আচ্ছা, নমস্কার ! গুড ইভনিং ! রাম রাম !

টাইপ করা বন্ধ রেখে সুনীল একটু ভাবে। নবীনের বেয়াদপি তাকে মোটেই বিচলিত করেনি। গায়ের জ্বালায় তার ও রকম ঝাঁঝালো কিন্তু সস্তা বিদ্রুপ করাটাই প্রমাণ করেছে যে নবীন এখনও ছেলেমানুষ।

এটা সে কি হিসাবে ধরেনি ? এটা বিবেচনা না করেই তার অন্ধ আত্মপ্রীতি আর একগুঁয়েমির জন্য কথা বন্ধ করার সাজা দিয়েছে ?

তা হোক। এখন ছেলেমানুষি কাটিয়ে ওঠাব সময় হয়েছে নবীনের। ভাবপ্রবণতা কাটিয়ে ওঠাই তার উচিত।

অঘোর নীচে নামবার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, এখনও কাজ করছ ?

আমার একটা প্রবন্ধ টাইপ করছি।

ও, হ্যাঁ। বিভা বলেছিল, রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে তোমার একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। খুব নাকি তর্কাতর্কিও চলেছে প্রবন্ধটা নিয়ে।

নতুন কথা বললে তর্ক উঠবেই।

এ প্রবন্ধটা কী নিয়ে লিখছ ?

আধুনিক কবিতা সম্পর্কে।

আধুনিক কবিতাও পড় নাকি তুমি ? যাক, তোমায় ডিস্টার্ব করব না। সময় পেলে একদিন যেয়ো।

যাব।

অঘোর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। চুলে কিছুটা পাক ধরেছে। মানুষটার ধীর শান্ত এবং প্রায় নির্বিকার ভাব দেখে কল্পনা করাও কঠিন যে কতখানি কঠোর আর নিষ্ঠুব সে হতে পারে দরকার পড়লেই। শাস্তি পাওয়ার যোগ্য অপরাধ করে এ আপিসের কেউ ক্ষমা বা অল্পে রেহাই পেয়েছে এ রকম একটি দৃষ্টান্তও কেউ স্মরণ করতে পারে না।

অপরাধ কেন, তার কাছে অনিচ্ছাকৃত ভুলেরও ক্ষমা নেই, ভুলের ফলটা অবশ্য যদি তার পক্ষে কোনোদিক দিয়ে ক্ষতিকর হয়।

মানুষের ভুল করার অধিকার সে স্বীকার করে না। তার মতে, ভুল হয় অবহেলার জন্য। যে ভুলের জন্য বিশেষ কিছু আসে যায় না, শুধরে নিলেই চলে, সে ভুল সে উদারভাবে ক্ষমা করে।

সুনীল ছাড়া কেউ জানে না যে তার বিদ্যাবুদ্ধিকে কিংবা মেয়ের অনুরোধকে খাতির করে অঘোর তাকে চাকরি দেয়নি, কঠোর সততা বলে জিনিসটা তার চরিত্রের স্বাভাবিক গুণ এটা টের পেয়ে তাকে চাকরি দিয়েছে।

অঘোরের সৎ-অসতের বিচারের মাপকাঠি, লাভ আর লোকসান। তার তাই এ রকম দু-একজন লোকের প্রয়োজন আছে যাদের সম্পর্কে এক বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে যে তার নিজেরও সাধ্য হবে না ওদের দিয়ে মিথ্যা বলায়, চুরিচামারি ছলনা করায় বা কারও বিশ্বাস ভাঙায়।

সুনীলকে কাজ দিয়ে শুধু একবার বলে দিলেই হল এটা গোপনীয়। গুরুতর বিষয়টা যে গোপনই থাকবে সে বিষয়ে তারপর আর মনের মধ্যে এতটুকু খুঁতখুঁতানি রাখবারও দরকার হয় না।

সুনীলের মতো লোক না রাখলে কাজটা তার নিজের করা ছাড়া উপায় থাকে না।

অবশ্য মূল্য দিতে হয়। সুনীল তাকে খাতির করে না, ভয়ও করে না। সে যে তার চাকরি রাখার, চাকরি খাবার মালিক এটা যেন গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না সুনীল।

তাছাড়াও আরেকটা অসুবিধা আছে। ব্যাবসার নীতিতে না হলেও সাধারণ নীতির বিচারে যেটা দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে, সুনীলকে দিয়ে সে কাজ করানো যায় না। অথচ ব্যাবসা করতে গেলে ও রকম বিচারও চলে না।

এ দোষটা যদি না থাকত সুনীলের, তার ব্যাবসাগত স্বার্থের বেলাতে নীতিবোধটা ঢিল দিতে দিতে পারত, আরও কত উঁচু আসনে অঘোর তাকে নিজেই তুলে বসাত !

কিন্তু অঘোর জানে তা হয় না। যে তাকে খাতির করবে ভয় করবে, পয়সার জন্য নিজের ন্যায়অন্যায়ের বিচার শিকেয় তুলতে পারবে, তার সততা কিছুতেই টেঁকসই হবে না সুনীলের মতো।

তার বিশ্বাস রাখার বেলা লোহার মতো শক্ত হবে আর অন্যদিকে হবে তার মনের মতো— এ রকম মানুষ সে পাচ্ছে কোথায় ?

অগত্যা সুনীলকেই রাখতে হয় তার নম্রতার অভাবটা মেনে নিয়ে।

সুনীল বাড়ি ফিরলে আলপনা মুখ ভার করে বলে, তুমি নাকি বিনা দোষে নবীনের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছ ?

বিনা দোষে দিইনি, দোষ ছিল বলেই দিয়েছি।

কী দোষ করেছে ? তোমার কথা মানেনি, এই তো ?

ও নিজের দোষ দেখতে পায় না, অন্যকে দোষ দেয়, এটাও একটা মস্ত দোষ। একগুঁয়ের মতো নিজের মত আঁকড়ে থাকে, অন্যের মত উড়িয়ে দেবার জন্য তর্ক করে, আবার ছ্যাবলার মতো রেগেও যায়। এই জন্য কথা বন্ধ করেছি।

আলপনার মুখ ভার কমে না।

সে বলে, নিজের মত, নিজের ধারণা জোরের সঙ্গে বলা কি দোষ ? নিজে যেমন জানবে, বুঝবে তাই তো মানবে মানুষ।

তা মানবে, সেটা দোষ নয়। কিন্তু অন্যের কথা কিছুতেই জানব না বুঝব না মানব না—এই একগুঁয়েমিটা মস্ত দোষ।

আলপনা তবু হার না মেনে বলে, তুমি বুঝিয়ে দিতে পার না তাই বোঝে না, এটাও তো হতে পারে ?

সুনীল বলে, হতে পারে বইকী। সেটা আলাদা কথা। আমার কথা বুঝতে পারে না বলে তো আমি কথা বন্ধ করিনি। ওর বুঝবার ইচ্ছা নেই চেষ্টা নেই—গায়ের জোরে সব কথা উড়িয়ে দেবে। এ ঝোঁকটা খুব খারাপ।

নবীনের পক্ষ নিয়ে এবার আর আলপনা কোনো যুক্তিতর্ক খাড়া করতে পারে না, সে শুধু বলে, ওর মনে ভয়ানক আঘাত লেগেছে।

সুনীল বলে, তাতে ক্ষতি নেই। ছেলেমানুষি ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করবে।

৭

নন্দার খবরের কাগজের বেশ খানিকটা দায় যে শেষ পর্যন্ত সুনীলের ঘাড়ে চাপবে কে তা ভাবতে পেরেছিল।

তার দায় ছিল কেবল নন্দাকে মোটামুটি ইংরাজি শেখানো—এমন পাণ্ডিত্য দান করা নয় যাতে দরকার হলে খসখস করে যে কোনো বিষয়ে একটা লাগসই সম্পাদকীয় লিখে ফেলতে পারবে।

অন্যের লেখা পড়ে মোটামুটি মানে বুঝতে পারবে, একটা ইংরাজি কাগজ চালাবার আনুষঙ্গিক ব্যাপার ও কাগজপত্রগুলি নিজে ঘেঁটে আয়ত্ত করতে পারবে, এইটুকু ছিল নন্দাব দাবি।

নন্দাকে পড়াতে পড়াতে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে তাব কাগজে একটা গুরুগম্ভীর সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখে ফেলা থেকে, ক্রমে ক্রমে ছোটোবড়ো আরও লেখা দেওয়া এবং সেই সূত্রে কাগজটার আপিসে যাতায়াত ক্রমে ক্রমে বেড়ে যাওয়া, সংবাদ ও মন্তব্যের এটা-ওটাতে মাঝে মাঝে চোখ বুলানো—এ সব কিছুই অসাধারণ ঘটনা ছিল না।

কেউ আশ্চর্যও হয়নি।

পেটে বিদ্যা আছে, ভালো ইংরাজি লিখতে পারে—অন্য একটা আপিসে চাকরি করতে করতেও সে একটা ইংরাজি সংবাদপত্রে লিখবে এবং পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে এ পর্যন্ত সকলে হজম করেছিল অনায়াসেই। কিন্তু একটা আপিসে চাকরি কবতে করতে সে যে কাগজটাব সম্পাদকীয় দায়িত্বই এক রকম গ্রহণ করে বসবে এটা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

একটা বিশেষ ঘটনার পর এটা ঘটে।

কাগজটার সম্পাদনা করে নিখিল, কিন্তু সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হয প্রদ্যোতের।

একটা উদ্ভট সম্পাদকীয় ছাপা হবার দায়ে প্রদ্যোতকে কিছুদিনেব জন্য জেলে যেতে হয়।

সে এক অদ্ভুত খাপছাড়া ঘটনা।

যে সম্পাদকীয় ছাপানোর জন্য প্রদ্যোতের জেল হল, সেদিন সকালে কাগজটি বাব হলে সম্পাদকীয় পড়ে সকলেই প্রায় চমকে গিয়েছিল!

সুনীল ভেবেছিল, মাথা কী খারাপ হয়ে গিয়েছে নিখিলের? এ তো জার্নালিজম নয়—এ তো স্রেফ উন্মত্ততা! খুব কড়া, খুব গরম সম্পাদকীয় লেখারও একটা কায়দা আছে, এ লেখায় সমস্ত কায়দা গিয়েছে বাদ, উন্মাদের প্রলাপ দিয়ে প্রাণপণে শুধু চেষ্টা করা হয়েছে লেখাটাকে ভয়ানক রকম বেআইনি করে তোলা।

নন্দাকে পড়াতে গিয়ে দ্যাখে, সমস্ত বাড়িটা যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। সুনীলের বাড়ির ভেতরে যাবার আহ্বান আসে। ভেতরের একটা ঘরে নন্দা, শচীন, প্রদ্যোত আর অনুকূল বসে জটলা চালাচ্ছেন।

অনুকূল ব্যারিস্টার।

শচীন জিজ্ঞাসা করে, কাগজ পড়েছ আজকের? এডিটোরিয়াল?

পড়লাম বইকী! এটা কী ব্যাপার হল হঠাৎ?

আমরাও তাই বুঝবার চেষ্টা করছি।

অর্থাৎ ওটা প্রদ্যোতের লেখা নয়?

নন্দা বলে, এতকাল পরে আপনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। দাদার নামটাই শুধু সম্পাদক হিসেবে ছাপা আছে জানেন না ? দাদা কখনও সম্পাদকীয় লেখে নাকি !

এই সব রিস্কের জন্যই মাইনে করা সম্পাদকেব নাম ছাপা রীতি।

নন্দা হেসে বলে, দেখুন না দাদাব পাগলামি। নিখিলবাবুকে মাইনে দিয়ে রেখেছি, ওর নামটা কোথায় ছাপা থাকবে, এ সব ঝঞ্ঝাট ওঁর উপর দিয়ে যাবে—দাদার শখ হল, না, সম্পাদক হিসাবে ওর খ্যাতি চাই।

প্রদ্যোত মৃদু হেসে বলে, খ্যাতি না ছাই। তোমরা তো নুলো হয়ে থাক, নিখিলবাবুটি কী চিজ খবর রাখ না। কবে কর্তাভজা সস্তা কিছু ছেপে দেবেন এই ভয়ে আমি সম্পাদক হয়েছি।

সুনীল জিজ্ঞাসা করে, নিখিলবাবু আসেননি ?

নিখিলবাবু পরশু বাইরে গেছন—পুরীতে। কাল-পরশুই ফিরে আসবেন।

সুনীল বলে, বেশ ব্যাপার তো ! নিখিলবাবু দুদিনের জন্য বাইরে গেছেন অমনি এ রকম একটা লেখা ছাপা হয়ে গেল ! কাগজ দেখবার—অন্তত এডিটোরিয়ালটা দেখবার কেউ ছিল না ? এটা লিখল কে ?

সেটাই সমস্যা দাঁড়িয়েছে। কেউ দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে না। শিশিরবাবু চার্জে ছিলেন, তিনি বলছেন, এটা নিখিলবাবুর লেখা হিসাবেই তিনি ছাপিয়ে দিয়েছেন। টাইপ করা লেখা আজকের তারিখ-টারিখ দিয়ে রেডি করা ছিল।

টাইপ কপিটা পাওয়া গেছে ?

প্রদ্যোত মাথা নাড়ে!

শিশিরবাবু বলছেন তিনি প্রুফেব সঙ্গো প্রেসে ফেরত পাঠিয়েছেন, প্রেস বলছে, কপি প্রুফের সঙ্গো শিশিরবাবুর কাছে পাঠানো হয়েছিল, প্রুফ ফেরত গেছে, কপি ফেরত যায়নি।

তারপব সুনীল কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ওদের পরামর্শ শুনতে শুনতে এখন সমস্যাটা কী দাঁড়িয়েছে সহজেই ধরতে পারে।

সম্পাদকীয়টি প্রত্যাহার করা হবে কি না এই হল সমস্যা।

অনুকূল আগেও বলেছিল, এখন আরেকবার বলে যে কালকের কাগজে যদি পাইকা হরফে বর্ডার দিয়ে স্পষ্ট পরিষ্কার করে ছাপিয়ে দেওয়া যায় যে এই লেখাটি ভুল করে ছাপা হয়েছে, এটি প্রত্যাহার কবা হল—সমস্ত হাঙ্গামা মিটে যাবে। গবম হলেও, এতদিন কাগজটিতে যে সুর অনুসরণ কবা হয়েছে সে জন্য কর্তাদের বিরক্তি থাকলেও বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। আচমকা একদিন শুধু অবিশ্বাস্যরকম বেখাপ্পা, উদ্ভট নয় একেবারে মারাত্মকরকম গরম একটা সম্পাদকীয় বেরিয়ে গেছে বলেই হাঙ্গামা করার সুযোগ নেওয়া হবে না।

কিন্তু ত্রুটি স্বীকাব করা চাই—বলা চাই যে ভুল হযেছে। পবিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় সেটা ছাপতে হবে। লেখাটি প্রত্যাহার করা চাই।

প্রদ্যোত সোজাসুজি বলে, তা হয় না। অন্যসময় হলে করা যেত, এখন করা যায় না।

সুনীল বলে, লেখাটা তো ভুল করে ছাপা হয়েছে। হয়তো কারও ষড়যন্ত্রের ফলে ছাপা হয়েছে।

ষড়যন্ত্র ?

তাই তো মনে হচ্ছে আমার ! নইলে ঠিক এ রকম যোগাযোগের সময় লেখাটা বাপ-মা হীন অবস্থায় এভাবে ছাপা হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে ? ভুল স্বীকার করতে তো কোনো লজ্জা নেই !

প্রদ্যোত বলে, লজ্জার কথা নয়। লোকে ধরে নেবে যে এটা আমাদের ভয়—যেমন আমরা কাছাখোলা তেমনি আমরা ভীবু। আমাদের কাগজে, আমাদের অজান্তে এডিটোরিয়াল পর্যন্ত বেরিয়ে যায়, আবার কড়া কথা লেখার জন্য আমরা হাত জোড় করে কর্তাদের কাছে ক্ষমাও চাই। এর একটা

হতে পারে—দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না। হয় আমাদের অব্যবস্থা হয়েছে—নয় আমরা ভুল করে গাল দিয়েছি। গাল আমরা দিয়েছি ঠিকই, আরও খানিক দিলে হত। ওটাই বজায় থাক—আমাদের অব্যবস্থাটা সংশোধন হোক।

সকলে চুপ করে আছে দেখে প্রদ্যোত নন্দার দিকে চেয়ে আবার বলে. একজন সর্বস্ব দিয়ে জীবনপণ করে একটা কাগজ চালিয়ে গিয়েছিল—আমবা সেটা শুধু চালাচ্ছি, আমাদের সম্পত্তি হিসাবে।

শচীনের দিকে চেয়ে বলে, নন্দা তোমার মেয়ে না হলে, আমার বোন না হলে, সব কিছু দিয়ে এই কাগজটা করে সে বেচারা মরে না গেলে, আমরা কোনো দাম দিতাম এই কাগজটার ? কিন্তু সত্যিসত্যি একটা কাগজ কী কম দামি জিনিস ! কত লোকের পয়সা চিন্তা খাটুনি আশাআকাঙ্ক্ষা দিয়ে একটা খবরের কাগজ চলে, দেশের মানুষের ভালোমন্দের কত বড়ো দায়িত্ব থাকে কাগজের। খবরের কাগজ মানেই সকলের কাগজ। কোনো দেশে খবরের কাগজ কোনো একজনের সম্পত্তি হলেই সে দেশের সর্বনাশ।

একটু থেমে বলে, সর্বনাশ আগে থেকে থাকলে সেটা ঠেকাতেই হবে, দূর করতেই হবে।

শচীন বলে, তুমি কি এতদিন ঘুমোচ্ছিলে ?

প্রদ্যোত নির্বিকারভাবে বলে, ঘুমোচ্ছিলাম বইকী। ঘুমটা সবে ভাঙছে, হাইমুড়ি তুলছি। নইলে কর্তাভজামি ঠেকাতে সম্পাদক হিসেবে নামটা ছাপাবার তোড়জোড় করলাম—কী ছাপা হচ্ছে সেদিকে তাকাবার অবসর পাই না !

চা এসে গিয়েছিল।

অনুকূলের স্পেশাল চায়ের সঙ্গে সাতান্ন বছর বয়সে সে যা চায় তাই তাকে দেওয়া হয়েছে। অনুকূলকে তারা ঘনিষ্ঠভাবেই জানে।

অনুকূলও যে তাদের ঘনিষ্ঠভাবে জানে তার পরিচয় পাওয়া যায় কয়েক মিনিট পরেই।

চা-টা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে অনুকূল বলে, যাকগে, যাকগে।

কী যাকগে ?

একটা কাগজের একটা দিনের একটা এডিটোরিয়াল ! তাতেই যেন জগৎ উলটে-পালটে যাবে। তোমরা যদি এক কাজ করো প্রদ্যোত, এটা আপনা থেকে চাপা পড়ে যাবে।

প্রদ্যোত স্নিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করে, কী কাজ ?

কাগজটা বার করে এ পর্যন্ত তোমাদের কত লাভ হয়েছে তার একটা হিসেব কাগজে ছাপিয়ে দাও।

নন্দা উৎফুল্ল হয়ে বলে, দেব, কালকের কাগজেই দেব। এ তো সোজা কাজ।

ফাঁকি থাকলে কিন্তু ধরে ফেলবে।....

বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে অনুকূল বলে।

আমাদের হিসেবে ফাঁকি থাকে না। ঘরের পয়সা ঢেলে কাগজ চালাই, হিসেবে ফাঁকি থাকবে কী রকম ? যারা কাগজ থেকে মোটা লাভ করছে, তারা হিসেবে ফাঁকি দেবে।

তবু সেই একটি এডিটোরিয়াল ছাপা হবার দায়ে প্রদ্যোত জেলে গেল। তাকে অনেক সুযোগ দেওয়া হল ওই লেখাটার নিন্দা করে জেলে যাওয়া ঠেকাবার—সে বলল কী যে, তা হয় না, আমি ব্যাপার

বুঝেছি, আমার জেলে যাওয়া ঠেকানোর জন্য তোমরা দাঁড়াওনি—আমাকে দিয়ে কর্তাদের জয়গান করিয়ে আমাকে ছেড়ে দেবার ফিকিরে দাঁড়িয়েছ।

সুনীলকে সে বলে, একটা দায়িত্ব নিতে পারবেন ? খুব গুরুতর ব্যাপার।

ভূমিকা শুনেই অনুমান করছি।

আচমকা লেখাটা ছাপা হবার পিছনে ব্যাপারটা কী একটু খোঁজ নেবেন ?

সুনীল ধীরভাবে বলে, আগে ওই রহস্যটাই ভেদ করার চেষ্টা করছি। বেশি কঠিন হবে মনে হচ্ছে না। খানিকটা ইতিমধ্যেই অনুমান করা সম্ভব। স্বার্থঘটিত ব্যাপার তো, সুতো টানলেই সব বেরিয়ে আসে।

দায়িত্ব নিলেন ?

নিলাম।

প্রদ্যোত বলে, যাক, খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে জেলে যেতে পারব। ওই একটা ভাবনা ছিল আমার—আসল মতলবটা যার, সে না বাজি মেরে বসে।

নন্দা উপস্থিত ছিল। কিন্তু দুজনের কথা হেঁয়ালির মতো মনে হয় তার।

পরে সে সুনীলকে হেঁয়ালির মানে জিজ্ঞাসা করে।

সুনীল বলে, হেঁয়ালি কিছুই নয়—হঠাৎ যে এডিটোরিয়েলটা ছাপা হয়ে গেল, তার একটা কারণ তো থাকবে ? কেউ কোনো একটা মতলব নিয়েই ওটা ছাপিয়েছে।

নিশ্চয়। সে মতলবটা কী, কে সেটা খাটাবার চেষ্টা করছে—এদিকে একটু নজর রাখতে বলছিল আপনার দাদা।

নন্দা বলে, মতলব ? কীসের মতলব ? দাদাকে জেলে পাঠানো ?

সুনীল বলে, না, ওকে জেলে পাঠানো আসল উদ্দেশ্য মনে হয় না। উনি সম্পাদক থাকবেন না, এটাই ভদ্রলোক চাইছেন মনে হচ্ছে। উনি সম্পাদক থাকায় ভদ্রলোকের অসুবিধে হচ্ছিল।

নন্দা মুখ কালো করে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে।

নিখিলবাবু ?

আমি তাই সন্দেহ করছি।

না না, নিখিলবাবু সে রকম লোক নন। এ রকম লেখা কখনও ওঁর হাত দিয়ে বেরোতে পারে না।

অন্যের নামে ছাপা হবে জেনেও নয় ?

নন্দা চুপ করে থাকে।

সুনীল আপিস থেকে সোজা প্রেসে চলে যায়।

কাগজের নিজস্ব প্রেস নয়, সুধীন সরকার নামে আবগারি বিভাগের একজন পদস্থ, পেনশনপ্রাপ্ত ভদ্রলোক, প্রেসটার মালিক। প্রেসটা আরম্ভ করেছিল আরেকজন ভদ্রলোক, যার ছিল সাংঘাতিক রকম নেশার বাতিক। নেশার খাতিরেই প্রেসটা তাকে বেচে দিতে হয়, একেবারে জলের দামে।

সুধীন এমনি কোনো নেশা করে না, কিন্তু দাঁও মারার নেশাটা তার চিরদিন প্রবল। কোথায় বিপদে পড়ে কার কী সম্পত্তি নীলাম হচ্ছে কম দামে, কোথায় কোন জিনিসটা সস্তায় বিকিয়ে যাচ্ছে, শকুনের শব খোঁজার মতোই তার চোখ সর্বদা দাঁও খোঁজে।

দাঁওটা শেষ পর্যন্ত লাভজনক হবে না বোঝা হয়ে উঠবে, এ সব হিসাব সে করে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে দামি কিছু সস্তায় পাওয়া মানেই কিস্তিমাত করে দেওয়া।

নন্দার কাগজটা ছাপা না হলে প্রেসটা তার চালু রাখা সম্ভব হত না, অনেকদিন আগেই তুলে দিতে হত।

তাই সুধীন সরকার মালিক হলেও কাগজটা চালাবার দায়িত্ব যাদের, তাদেরই প্রেসের লোক মালিক মনে করে।

আগেকার ব্যবস্থাই সব বজায় আছে, সম্পাদক হিসেবে নামটাও ছাপা হচ্ছে প্রদ্যোতের—সবাই কেবল টের পেয়েছে যে, কাগজসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে কর্তালি পেয়েছে সুনীল।

সে যা বলবে তাই হবে। তার কথার উপরে আর কোনো কথাও নেই, কারও কাছে নালিশও নেই।

নিখিল দেশ থেকে ফিরেছিল যথাসময়েই। বদখত এডিটোরিয়েলটা ছাপানো নিয়ে সেও হইচই কম করেনি। কিন্তু সুনীলকে কর্তৃত্ব নিতে দেখে সে অত্যন্ত আহত হয়।

শচীনকে সে ক্ষুব্ধভাবে বলে, এই ছেলেমানুষেরা কতটুকু জানে কাগজ চালানোর ব্যাপারে ? কোনোদিন কাজ করেছে কোনো কাগজে ?

শচীন বিব্রতভাবে বলে, ও খুব কাজের মানুষ, পাকা লোক।

নিখিল বলে, ওকেই সব করে দিচ্ছেন নাকি—ম্যানেজাব, এডিটর ?

শচীন বলে, আপনি ভুলে যাচ্ছেন কাগজটা আমাব মেয়ের, আমি কাগজের মালিক নই।

শচীনের কাছে নিখিলের কথা শুনে নন্দা গম্ভীরমুখে বলে, ওঁর গা জ্বালা কবছে কেন ? সুনীলবাবু তো ওঁর কোনো ক্ষতি করেননি, ওঁর কাজেও ব্যাঘাত জন্মাননি।

শচীন বলে, অনেকদিন থেকে ভদ্রলোকের সম্পাদক হবার আশা।

তুমিও সে খবর রাখ ?

এ আর খবর রাখারাখি কী ? এখন নামেই সম্পাদক—কাগজে নামটা ছাপা হলে বাজারে দাম বাড়বে। দরকার হলে অন্য কাগজেও যেতে পারবেন।

নন্দা বলে, এবার বুঝেছি ব্যাপারটা। ভদ্রলোক টের পেয়েছিলেন কাগজটা তোমারও বোঝা হয়ে উঠেছে—তুমিও দায় এড়াতে চাও। একটা গোলমাল হলে সব জেনে বুঝেও তুমি চুপ কবে থাকবে—কাগজটা উঠে যায় তো যাক। তাই এমন সস্তা চাল চালতে সাহস হয়েছে নিখিলবাবুর।

শচীন আহত হয়ে বলে, বুড়ো হলাম, আমার কি এত ঝঞ্ঝাট পোষায় ?

তবে দায়িত্ব নাও কেন ?

সুনীল নিখিলকে বলে, আজ একটা কড়া লেখা চাই নিখিলবাবু।

কী রকম কড়া ?

বেশ খানিকটা কড়া। কালোবাজার কিংবা সরকারি দুর্নীতি—দুটোর কোনো একটা সাবজেক্ট নিতে পারেন।

নিখিল একটু ভেবে বলে, গাল দেব ?

পারলে দেবেন, আইন বাঁচিয়ে। মোটকথা আমার খুব কড়া লেখা চাই।

একঘন্টার মধ্যে পিয়োন নিখিলের লেখাটা সুনীলের কাছে পৌঁছে দেয়। স্লিপ ক-খানায় চোখ বুলোতে বুলোতে সুনীলের মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, কিন্তু পড়া শেষ করে সে প্রায় মিনিট দশেক গুম খেয়ে বসে থাকে।

তারপর নিজেই নিখিলের বসবার ঘরে যায়।

ধরতে গেলে নিখিলও কার্যত সাব-এডিটার। কিন্তু অল্পবয়সি সাব-এডিটরদের মধ্যে এতদিন সে সম্মান পেয়ে এসেছে এডিটরের।

সুনীল বলে, নিখিলবাবু, এই নাকি আপনার গরম লেখা ? কড়া লেখা আপনার বোধ হয় আসে না, না ?

এর চেয়েও কড়া ?

নিখিল যেন আশ্চর্য হয়ে যায়।

সুনীল বলে, এ লেখা কি কড়া হয়েছে ? ভূপেনবাবু, দেখুন তো পড়ে। আপনার মতটা শুনি।

ভূপেন তাড়াতাড়ি স্লিপ ক-খানা পড়ে বলে, পয়েন্ট মোটামুটি সব আছে, তবে ভাষাটা নরম হয়ে গেছে।

সুনীল বলে, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আগে মোটে একটা-দুটো কাগজ পড়তাম, বুঝতাম না। আজকাল অনেকগুলি কাগজে চোখ বুলিয়ে দেখছি—ভাষার কায়দাটাই যেন আসল ব্যাপার। কী বলা হচ্ছে তার চেয়ে বলার ভঙ্গিটা দিয়েই যেন কাগজের পলিসি বজায় রাখার চেষ্টা হচ্ছে। আপনি ঠিক বলেছেন। নিখিলবাবুর এ লেখাটায় সব কথাই আছে—ভাষার জন্য আসল কথা ছোটো হয়ে ছোটো কথা গুরুত্ব পেয়েছে।

ভূপেন খুশি হয়ে হাসে।

সুনীল বলে, আপনি একবার চেষ্টা করে দেখবেন, গরম করতে পারেন নাকি ? আমি খুব গরম লেখা চাইছি। আপনি যত পারেন কড়া করে দিন, আমি দরকার মতো ঘষেমেজে নেব।

সুনীল চলে গেলে ভূপেন ও নিখিল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

শৈলেশ নতুন এসেছে, সে জিজ্ঞাসা করে, হাতবদল করে কি লেখা ভালো হয় ?

খবরের কাগজে আবার ভালো লেখা !

রাত দশটায় ভূপেন লেখা নিয়ে সুনীলের ঘরে গেলে সুনীল তাকে বসতে বলে।

একটা সিগারেট দেয়।

ধীরে ধীরে তার লেখাটা পড়ে মুখ তুলে বলে, ভূপেনবাবু, নিখিলবাবুকে আমি বিদায় দিচ্ছি। ওঁকে দিয়ে আর দরকার নেই।

ভূপেনের মুখ একটু পাংশু হয়ে যায়।

সে আমতা আমতা করে বলে, কড়া লেখা অবশ্য ওনার ভালো আসে না কিন্তু—

সুনীল বলে, কড়া লেখা আসে না বলে নয়। উনি সেই লেখাটা ছাপিয়ে দেবার চক্রান্ত করেছিলেন বলে। আপনার সম্পর্কে কী করা যায় ভাবছি।

ভূপেন চুপ করে থাকে।

সুনীল বলে, আপনি ওর কথায় রাজি হলেন কেন ? আমায় সব খুলে বলুন, এবারের মতো আপনার ফাঁড়া কাটিয়ে দিচ্ছি—পরে যেন আর কখনও এ রকম করবেন না। এভাবে মানুষের উন্নতি হয় না।

ভূপেন ধীরে ধীরে বলে, আমাকে নিখিলবাবু যা ছাপতে বলবেন, আমি তাই ছাপতে বাধ্য।

সেটা গোপন করতেও কি বাধ্য ?

উনি বললে খানিকটা বাধ্যতা এসে যায়।

সুনীল মুখের ভাব কঠিন করে বলে, শুধু ওঁর বলার জন্য ? আর কিছু কারণ ছিল না ?

ভূপেন একটু ভেবে বলে, ছিল। আমি—আমি ওঁর ভাগনিকে বিয়ে করেছি। উনি বলেছিলেন এডিটর হলে আমায় সুবিধা করে দেবেন।

ভূপেন ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকায়।

আপনাকে একটা কথা বলি। প্রদ্যোতবাবুর জেল হবে এ সব উনি ভাবেননি। উনি আমায় বলেছিলেন যে এ রকম একটা লেখা বেরিয়ে গেলে হইচই হবে, তাতেই ভয় পেয়ে প্রদ্যোতবাবুর নাম সরিয়ে নিয়ে ওঁর নাম এডিটর হিসাবে বসানো হবে। একদিন একটা খারাপ লেখা বার হলে সামলানো কঠিন নয়।

প্রেস্টিজ নষ্ট হয়।

প্রদ্যোতবাবু কী প্রেস্টিজের জন্য জেলে গেলেন ?

তা বইকী। তার নিজের প্রেস্টিজ, কাগজের প্রেস্টিজ। আইনে বাধুক, কথাগুলি তো মিথ্যা লেখা হয়নি। না লিখলে আলাদা কথা ছিল কিন্তু একবার ছেপে বেরিয়ে যাবার পর কথাগুলি আর ফেরত নেওয়া যায় না।

দশ মিনিটের মধ্যে সুনীল দুমাসের বেতন এবং বরখাস্ত পত্রখানা নিখিলের হাতে দেয়।

নিখিল বলে, তুমি আমাকে তাড়াতে পার না।

সুনীল বলে, নিশ্চয় পারি। আমাকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে—লিখেই দেওয়া হয়েছে।

ফেরার পথে নন্দাকে সব জানিয়ে সুনীল বাড়ি ফেরে।

নন্দা বলে, সকালবেলা নিখিলবাবু একবার দরবার করতে আসবেন। দয়া হলে দয়া দেখাব ?

সুনীল বলে, দয়া নয়। জগাই-মাধাই ছাড়া দয়ায় কেউ উদ্ধার পায় না। হিসাব করে দেখবে ওঁকে আর রাখা চলে কি না। যদি মনে করো যে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর এ সব চালাকিবাজির দিকে ঝুঁকবেন না—তাহলে এবারের মতো ক্ষমা করতে পার।

নন্দা মাথা নাড়ে।

আমি ক্ষমা করতে পারি না। আমি আপনাকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করতে পারি।

এই তো শিখে গিয়েছ কায়দাকানুন !

শিখে গিয়েছি বলে সরে যাবেন না যেন। এটাও শিখেছি যে আমার এখনও অনেক শেখা বাকি। যে দায় নিয়েছেন সেটা আর ফেলতে পারবেন না কিন্তু—অন্তত যদ্দিন আমি সব শিখে পড়ে না নিচ্ছি।

সুনীলের বাড়ি ফিরতে রাত বারোটা বেজে যায়।

মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসেছে, মায়া এসে কড়া নাড়ে। দরজা খুললে ভেতরে এসে পাতের কাছেই মেঝেতে উবু হয়ে বসে বলে, তোমার খবর নিতে এলাম। আমার চাকরিটা সত্যি ছাড়লে তা হলে ?

কী করি ? কটা চাকরি করব ?

নবীনকে রাখব তোমার জায়গায় ?

ও যদি পারে কেন রাখবে না ? আমার সঙ্গে কিন্তু নবীনের কথা বন্ধ !

সেটা শুনেই তো জিজ্ঞাসা করতে এলাম কী করব। নবীন নিজেই আমাকে বললে তুমি নাকি হঠাৎ কথা বন্ধ করে দিয়েছ।

আলপনা বলে, আপনাকেও বলেছে ? নবীন তর্ক করতে করতে দাদার হল রাগ—বাস, কথা বন্ধ ! আমি যত বলি, দাদা ও রকম নয়, দাদা কখনও অন্যায় করে না—কে কার কথা শোনে। ওর ওই এককথা—তর্ক চলছিল, তর্ক চালাতে চালাতে হঠাৎ রাগ করে দাদা কথা বন্ধ করে দিয়েছে।

মায়া একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই আলপনার দিকে তাকায়। সুনীলের সামনে এই ভঙ্গিতে এ রকম সুরে কথা বলা আলপনার পক্ষে নতুন বটে।

গৌরী মেয়ের কথাগুলি শোনেনি কিন্তু কথার সুরটা কানে গিয়েছিল। ছেলের জন্য তরকারি এনে সে বলে, আমিই তো ওকে দিচ্ছিলাম, তুই জেগে বসে রয়েছিস কেন ?

মায়াদি এসেছে তাই।

সুনীল মায়াব মুখেব দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলে, শুনলে ? নবীন যেমন মিথ্যা বলে, আলপনারও তেমনি মিথ্যা আটকায় না।

মিথ্যা বলি।

আলপনা ফোঁস করে ওঠে।

এখুনি বললি। মায়া এসেছে বলে তুই জেগে বসে আছিস, এটা মিথ্যা কথা নয় ?

আলপনা জোর দিয়ে বলে, না। ওটা কথার কথা, মার কথার একটা ভাসাভাসা জবাব। আমি কেন জেগে আছি সেটা বলতে পারব না কিন্তু মার কথার জবাবে কিছু বলতে হবে তো ? আমি তাই বললাম মায়াদি এসেছে বলে জেগে আছি। এটা শুধু মার মান রাখা, মিছে কথা বলা নয়। চুপ করে থাকা আর এ কথা বলার মধ্যে আর কোনো তফাত নেই। তোমার হিসেব যদি সংসারে চলত দাদা—

সুনীল বাধা দিয়ে বলে, তুই শুবি যা তো। মায়ার সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে।

এই তো তুমিও একটা মিছে কথা বললে। মায়াদিব সঙ্গে দরকারি কথা হয়ে গেল, আর কোনো দরকারি কথা নেই জানো। তবু বলছ দরকারি কথা আছে।

সুনীল তার দিকে না তাকিয়েই মায়াকে জিজ্ঞাসা করে, অনিল আর ছায়ার ঝগড়া মিটেছে ?

কই আর মিটল? অনিল ওর সঙ্গে মিশবে না বলেছে।

আলপনা বলতে যায়, বলেছে বটে, কিন্তু—

নিজেই সে থেমে যায় হঠাৎ।

কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে থেকে ধীরে ধীরে উঠে চলে যায়।

মায়া জিজ্ঞাসা করে, ওর কী হল ?

অভিমান ! নবীনের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছি বলে।

বেশ আছে ওরা, মান-অভিমান ছেলেমানুষি নিয়ে।

বেশ আছে ? বেশ থাকলে তো ভাবনাই ছিল না। ছেলেমানুষিতে পর্যন্ত ঘুণ ধরে গেছে। আড়াল-করা ছেলেমেয়েদের মানুষ কবা কঠিন দাঁড়িয়ে গেছে। একটা লড়াই অবলম্বন চাই মানুষ হতে হলে।

মায়া উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, নবীনের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছ কেন ? কারণটা ভালো বুঝলাম না।

সুনীল একটু হাসে।

কারণ ? কারণ ওর একগুঁয়েমি, সংকীর্ণতা। আসলে কথা বন্ধ করেছে নবীন নিজে। বড়ো বেশি তর্ক করত, আমি সেদিন আপিসে তাই অনুযোগ দিয়ে বলেছিলাম যে অন্যের সঙ্গে তর্ক করে আমায় কিছুদিন রেহাই দিক—কাজের কথা, দরকারি কথা ছাড়া আমাব সঙ্গে যেন অন্য কথা না বলে। তাইতে চটে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে জীবনে কোনোদিন আমার সঙ্গে কথা বলবে না। কিন্তু বদনামটা হয়েছে আমার। আমিই নাকি কথা বন্ধ করেছি।

মায়া বলে, এ সব ছেলেমানুষদের সঙ্গে সত্যি পারা মুশকিল। ছায়া আমার সঙ্গে কী আরম্ভ করেছে জানো ? কথা কয় কিন্তু সেটা প্রায় না বলারই শামিল—নেহাত দরকার হলে মুখ ভার করে সংক্ষেপে বিরক্তির সঙ্গে বলে। আমি যে অনিলকে শাসন করে দিইনি।

মায়া আর দাঁড়ায় না।

মায়া চলে যেতেই আলপনা যেচে সুনীলের বিছানা ঝেড়ে দিতে, তার ঘরে গিয়ে প্রথমে চুপচাপ হাতের কাজটা সারে। তারপর বলে, তুমি যদি কথা না বন্ধ করে থাক, কথা বললেই পার নবীনের সঙ্গে ?

আমাকেই যেচে যেচে কথা বলতে হবে ?

তাতে দোষ কী ? তোমাব তো বাধা নেই—ও বেচারি একবাব প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে, ওব পক্ষে তো আর নিজে থেকে কথা বলা সম্ভব নয়।

আপিসে কাজের কথা বলি।

অন্যকথা দু-একটা বললেও হয়।

সুনীল হেসে বলে, হ্যাঁ, আমি যেচে অন্যকথা বলি আর ও জবাব না দিয়ে আমাকে অপমান করুক। নিজের দাদার মান-অপমানের বুঝি দাম নেই তোর কাছে ?

আলপনা মুখ তুলে বলে, নবীন তোমায় অপমান কববে ? একবার করেই দেখুক। সেদিন থেকে আমি ওর মুখ দেখব ভেবেছ ?

৮

ক-দিন অঘোরের মুখ দেখলেই বোঝা যায় খোঁড়া মেয়ে তার সচল বাপকে কাবু করেছে।

রমেশের ব্যাপারের পর থেকে সে সন্দেহ করেছে যে মেয়ের এই বিদ্রোহাত্মক দুর্বুদ্ধির পিছনে আছে সুনীল। ড্রাইভারেব কাছে অবশ্যই সে খবর পেয়েছিল যে রাত করে বিভা সুনীলের বাড়ি গিয়েছিল। তারপরেই পঙ্গু বিভা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, সে বিয়ে করবে না।

শিক্ষিত বুদ্ধিমান সুদর্শন যুবক রমেশ, কত সাধারণ বাপের কত সাধারণ মেয়ে, আজকালকার দিনে এক রকম একটা স্বামী জুটিয়ে দেবার জন্য, বাপের ভালোবাসার পরিচয় পেয়ে কেঁদে ফেলে যে কেমন করে সে বাপকে ছেড়ে যাবে স্বামীর ভালোবাসা ভোগ করতে—বিভা স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে এ রকম বাজে লোকের বউ হওয়ার চেয়ে কুমারী হয়ে থেকে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া সে অনেক ভালো মনে করে। কী ফাঁদেই যে পড়েছে অঘোর !

খোঁড়া মেয়ে, বিকাবগ্রস্তা মেয়ে। খোঁড়া হবার জন্যই সে বিশেষ অধিকার খাটাতে চায় তার বাপের উপর।

মেয়ের নীতির হিসাব বাপকে মানতেই হবে। অন্তত তার বিয়ের ব্যাপারে।

রমেশ মেয়ের কাছে বাজে লোক কেন অঘোর বুঝতে পারে না। মেয়ে বুঝিয়ে দেবার পরেও নয়।

বিভার জন্য তার একবিন্দু মায়া-মমতা নেই তবু তার বাপের টাকার লোভে সে তাকে বিয়ে করতে রাজি—সারাজীবন তাকে তোষামোদ করে চলতেও রাজি। এই জন্য সে নাকি বদলোক।

তাতে দোষটা কী ? টাকার জন্য কী লোকে বিয়ে করে না ?

দোষটা বিভার মতে এই যে, টাকার কোনো দরকার নেই লোকটার, লোকটা খোঁড়া বউ নিয়ে জীবন কাটাতে একেবারেই অনিচ্ছুক তবু টাকার লোভ সামলাতে না পেরে বিভাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। সে যদি গরিব হত, আপনজনদের ভালোর জন্য নিজেকে বিক্রি করা যদি তার দরকার হত, সে যদি কোনো বিপদে পড়ত,—টাকার জন্য তাকে বিয়ে করতে চাইলে কিছুই মনে করত না বিভা।

কিন্তু শুধু টাকার লোভটাই যার বড়ো সে কি মানুষ ?

তুমি পারতে বাবা ?—তবে !

মেয়ের যুক্তি অনুসারে না হলেও রমেশ লোকটা যে সত্যই বাজে লোক এটা বুঝতে বাকি থাকেনি অঘোরের।

বাজে লোক না হলে এমন সুন্দর চেহারা নিয়েও একটা খোঁড়া দুঃখী মেয়ের মন ভুলাতে পারে না ? সে নিজে রাজি হলেও, মেয়েটাই তাকে বিয়ে করার নামে বেঁকে বসে !

রমেশকে অঘোর তার ব্রাঞ্চ আপিসে বদলি করে দিয়েছে। নিচু পোস্টে নামিয়ে দিয়েছে।

তার মতলব যে হাসিল হয়নি রমেশকে দিয়ে, এটাই রমেশের মারাত্মক অপরাধ। আপিসের কাজের দিক থেকেও সে সুনীলের মতো অপরিহার্য নয়—সুনীলের বিপরীত হিসাবেও অপরিহার্য নয়।

তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না অঘোর—ভালো কাজেও নয়, চোরা কাজেও নয়।

সে ব্যাপারের জের হয়তো আজও মেটেনি। এখনও হয়তো অঘোর বুঝবার চেষ্টা করছে তার মেয়ের বিদ্রোহের জন্য সুনীলের দায়িত্ব কতখানি, সুনীলকে শাস্তি দেওয়া কর্তব্য কিনা অথবা সুনীল ভালোই করেছে তার !

খোঁড়া যুবতি মেয়ে।

বাপের এত টাকা।

এরই প্রতিক্রিয়ায় কী হয়ে যেতে পারত সে হিসাব কী আর অঘোর করে না, এত বড়ো সে হিসাবি মানুষ ! মেয়েকে নিয়ে হয়তো নাকের জলে চোখের জলে একাকার হতে হত তার।

হয়তো সুনীলের জন্যই তার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া গ্রাস করা দূরে থাক, বিভার চরিত্রটি হয়েছে শক্ত, নিজের মনকে সে বশে রাখতে পারে।

কিন্তু ক-দিন ধরে নতুন করে আবার মেঘ ঘনিয়েছে অঘোরের মুখে।

বিভার জন্যই মেঘের সঞ্চার সেটা অনুমান করা যায়, কারণ মেয়ের জন্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে তার মুখে এ রকম মেঘ সঞ্চারিত হয় না।

মেজাজ বিগড়ে গেলে অঘোর আপিসে কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণত খুব ভালো ব্যবহার করে। ব্যতিক্রমও অবশ্য ঘটে থাকে কিন্তু এটাই তার সাধারণ নিয়ম।

সে জানে, রাগ দিয়ে কোনো কাজ হয় না সংসারে। রাগ বরং কাজ নষ্টই করে দেয়, লোকসান ঘটায়। অন্য সময় তো টনটনেই থাকে সাধারণ বিচারবুদ্ধি, রাগের সময়টাই বরং সাবধান থাকা বিশেষভাবে দরকার।

রোজ একটা দুটো জরুরি কাজ সুনীলের থাকেই। হয় সে কাজ অন্য কেউ করতে পারবে না অথবা অন্যকে দিয়ে করাতে অঘোরের বিশ্বাস বা সাহস হবে না।

কাজ বুঝিয়ে দিয়ে অঘোর বলে, তোমার হাতে উন্নতি হচ্ছে কাগজটার। কিন্তু এত খাটুনি কি পেরে উঠবে ?

অঘোরকে বলে সুনীল নন্দার কাগজের জন্য একটা স্থায়ী বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেছে। সেই সূত্রে অঘোর নিয়মিত কাগজ পায়।

কাগজে খাটুনি বিশেষ নেই। ঘরেও লেখাপড়ার কাজ করি, ওখানেও সেই একই কাজ। এ আনন্দের কাজে কষ্ট হয় না।

আমার এখানের কাজটা হল কষ্টের, কেমন ?

কাজ কষ্টের নয়। তবে একটা বাধ্য হয়ে করা, একটা কাজ নিজের খুশিতে করা। আপনার কাজে আমি ফাঁকি দেব না। যদি দেখি দুদিক সামলাতে পারছি না, একটা ছেড়ে দেব।

কোনটা ? আমার কাজ ?

সুনীলের মুখে একটু হাসি ফোটে।

আপনার কাজ ছাড়বার কী উপায় আছে ? কাগজ চলছে লোকসান দিয়ে। আমাকে এত বেতন দিয়ে ওরা কি রাখতে পারে ?

অঘোর আচমকা বলে, তুমি যাবার পর কাগজটায় বড়ো কড়া কড়া কথা লেখা হচ্ছে। এতটা কি ভালো ?

সুনীল বলে, অন্যায়-অনাচারের সমালোচনা আর কত নরম হতে পারে বলুন—সে রকম সমালোচনায় লাভ কী ? আগে বরং এলোমেলো গালাগালি থাকত, আমি সেটা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি। যুক্তি দিয়ে সিরিয়াসলি সমালোচনা হয় বলেই আজকাল লেখাগুলি কড়া মনে হয়। আগে ঢের বেশি কড়া কথা লেখা হলেও সস্তা গালাগালির জন্য সমস্ত লেখাটাই হালকা হয়ে যেত, তেমন কড়া মনে হত না।

বটেই তো, বটেই তো !

একটু চিন্তিত মুখেই সুনীল ফাইল হাতে নিজের জায়গায় ফিরে যায়। সে টের পেয়েছে, কোনো একটা মতলব ভাঁজছে অঘোর, তারই সম্পর্কে ভাঁজছে !

রবিবার ভোরে অঘোরের গাড়ি এসে দাঁড়ায় সুনীলদের বাড়ির সামনে।

লাঠিতে ভর দিয়ে নেমে আসে বিভা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেদিনের মতো ভিতরে যায়।

বলে, বড়োই নাকি ব্যস্ত শুনলাম ? না শুনলেও বুঝতে পারছি। নইলে অতবড়ো একটা ব্যাপার পরামর্শ নিতে এলাম—আর তারপর খোঁজখবব নেওয়া নেই।

সুনীল বলে, খোঁজখবর নেওয়া নেই ? রোজ তোমার খবর পাই। তোমার বাবার আপিসে চাকরি করি ভুলে গেছ নাকি ?

আমি ভুলিনি, ভুলেছ তুমি। চাকরিটা খসিয়ে মনে পড়িয়ে দিতে হবে মনে হচ্ছে। মনিবের মেয়ে, এত অবহেলা সইব না আপিসের একটা কেরানির।

অবহেলা ? রোজ তোমার খবর নিই বলে ?

মাসে একবারটি গিয়ে চোখে দেখে খবর আনো না বলে।

বিভা হাসে।

জানি জানি, তুমি খবরের কাগজ বার করেছ, তোমার চাদ্দিকে নাম, কাজের তোমার অন্ত নেই। মনিবের মেয়ে হয়েও তাই তো নিজে নিচু হয়ে এলাম।

বিভা আবার একটু হেসে গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, তামাশা নয়, কী ব্যাপার বলো তো সুনীলদা ? কাল বাবা প্রায় একঘণ্টা তোমার সম্বন্ধে আমাকে জেরা করল। তোমার আদর্শ কী, জীবনে তুমি পলিটিক্স করতে চাও নাকি, খবরের কাগজে ভিড়েছ কেন—এমনি সব কত যে আবোল-তাবোল প্রশ্ন। আমি সত্যি ভাবনায় পড়ে গেলাম। জগতে একটা মানুষ একটু নিঃস্বার্থভাবে স্নেহ করে, বিপদে-আপদে পরামর্শ দেয়, কী বলতে কী বলে ফেলে শেষকালে তার দফাটি রফা করব ! হঠাৎ তোমার সম্পর্কে বাবার এত কৌতূহল চড়ে গেল কেন ?

সুনীল বলে, হঠাৎ যে খবরের কাগজে ভিড়ে গেলাম—কড়া কাগজ হল। তোমার বাবাই শুধু নন, আরও অনেকের কৌতূহল হঠাৎ চড়ে গেছে।

তোমার কোনো বিপদের ভয় নেই তো ?

কাতব মুখে কবুণ প্রশ্ন। সুনীলেব কাছে বিভা আজ একেবারে সংযম হারিয়ে ফেলেছে। অথচ সুনীলের কাছেই প্রাণপণে সে নিজেকে বিচলিত বিগলিত হতে দেয় না, সুনীল পাছে মনে করে যে সে তাব কাছে স্নেহ আব বন্ধুত্বের বেশি আর কোনো আশা রাখে।

সুনীল নীরবে একটা সিগারেট ধরাতে বিভা সচেতন হয়। মুখখানা তার রাঙা হয়ে ওঠে।

সুনীল বলে, তবে তো আর জবাব দেবার দরকার নেই। তুমি নিজেই বুঝতে পেরেছ পুরুষ মানুষের বিপদের ভয়ে কেঁচো বনে থাকলে চলে না।

বিভা বলে, পুরুষমানুষ ! পুরুষমানুষ ! বড়ো অহংকার পুরুষমানুষের। মেয়েমানুষ যেন মানুষ নয় ! ছেলেবেলা থেকে এ অবস্থা না হলে একবার দেখিয়ে দিতাম মেয়েমানুষ ভেসে আসেনি। নিজে বাবার আপিসের ভার নিয়ে তোমাকে হুকুম দিয়ে খাটাতাম।

সুনীল বলে, এই তো ধাতে ফিরেছ !

তারপর হেসে বলে, বাবার আপিসেব ভার নিয়ে ? তোমার বাবা বুঝি পুরুষমানুষ নন?

বিভা তর্জনী তুলে বলে, ছি ! পৌরুষের অহংকারে শেষে এই বুদ্ধি হল ! মেয়ের কাছে শেষে বাপকেও পুরুষ বানাবার চেষ্টা ? বাপের সম্পত্তি ছেলে পায়। আমি মেয়েছেলে হলেও বাপের সম্পত্তি পাব, পুরুষকে টেক্কা দেব। বাবা পুরুষ না স্ত্রীলোক সে খবরে আমার কাজ কী ?

সুনীল বলে, তুমি সত্যি আজ আমাকে লজ্জা দিলে।

খবব আসে, লোক এসেছে। একজন, দুজন নয়, পাঁচজন বিশিষ্ট বেশধারী ভদ্রলোক।

সুনীল বলে, দেখলে ? রবিবার সকালটাও একটু বেহাই দেয় না। আবছা ভোরে বেরিয়েছিলে তাই সুনীলবাবুর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলাব ভাগ্য হল। নইলে—

সুনীল শুধু গেঞ্জিটা গায়ে চড়িয়ে বাইরে যাওয়ার উপক্রম করে।

বিভা বলে, গেঞ্জি নয়, পাঞ্জাবিটা গাযে দিয়ে যাও।

সুনীল খানিকক্ষণ যেন অবাক হযে চেয়ে থাকে। তারপর সোৎসাহে বলে, ঠিক বলেছ !

শচীন বাঁধানো দাঁত খুলে রেখে দুধে ভেজানো পাউবুটি মাড়ি দিয়ে পিষে খেতে খেতে মেয়েকে বলে, খেয়াল হল তাই সাবধান করে দিচ্ছি, পবে যেন আমায় দোষ দিয়ো না। আমি সেকেলে মানুষ।

সেকেলে মানুষ।

নিশ্চয়। একেলে তোদের দিকে খানিক সহানুভূতি না দিয়ে উপায় নেই—কিন্তু মানুষটা আমি পুরোমাত্রায় সেকেলে। বাপ ছেলেমেয়ের জন্য যতটুকু একেলে হতে পারে, আমি তা হব, তার চেয়ে বেশি যেন টেনো না আমায়। তোরা বড়ো বেহিসাবি।

আমরা বেহিসাবি ? আমরা নিজেদের হিসাব কষছি, তোমাদের ভুল হিসাবকে সামলে নিচ্ছি।

তোরাই শেষ হিসাব করবি ? তোদেব পবে আর হিসাব থাকবে না ? এইখানে শেষ জগৎ জীবন সভ্যতা সব কিছুর ?

নন্দা হাসে। এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না।

শচীন বলে, আমার কাছে চুপ করে থাকার সুবিধে আছে—অন্যেরা কিন্তু রেহাই দেবে না।

অন্যেরা মানে কাদের কথা বলছ ? কাগজে যাদের সমালোচনা করছি ? না, যারা টাকা পাবে ? অথবা যারা কাগজের জন্য খাটছে ?

সকলের কথাই বলছি। এভাবে বেশিদিন কাগজ চালানো যাবে না। তোমরা ক্রমে ক্রমে বাঁদিকে মোড় নিচ্ছ। কাগজের লাভ কিছুই নেই, বামপন্থী যাদের কাগজ নেই, তারা মাঝখান থেকে সুবিধা ভোগ করে নিচ্ছে।

তুমি সত্যি সেকেলে বাবা, অ্যাদ্দিনে ভালো করে বুঝলাম। এতদিন কাগজটার কোনো নীতি না থাকার নীতি ছিল—সব খিচুড়ি পাকিয়ে একটা নিরপেক্ষ মত প্রকাশের চেষ্টা চলত। অ্যাদ্দিনে দস্তুরমতো একটা নীতি ঠিক হচ্ছে, কতকটা সত্যিকারের খবরের কাগজ হতে চলেছে কাগজটা—তাতেই তুমি ভয় পেয়ে গেলে !

দূরদৃষ্টি থাকলে তোরও ভয় হত। সার্কুলেশন বাড়ার সঙ্গে লোকসান বেড়ে যাচ্ছে খেয়াল করেছিস ?

করেছি বইকী। তাই বলে সার্কুলেশন না বাড়া ভালো নাকি ? কাগজ বার না করলে কিছুই লোকসান যায় না !

শচীন নীরবে খেয়ে ওঠে। হরতকির টুকরো মুখে দিয়ে ধীরে ধীরে বলে, একে একে বাইরের লোক এসে জুড়ে বসছে। হয়তো এমন দাঁড়াবে, তুই একটা কথা বললে কেউ দাম দেবে না।

নন্দা নিশ্চিন্তভাবেই বলে, ও রকম খাপছাড়া কথা আমি বলব কেন ? পাঁচজনের চেষ্টাতেই একটা খবরের কাগজ চলতে পারে, যে খাটবে তারও কাগজটাকে আপন ভাবা চাই। নইলে মালিকের একার সাধ্য আছে কাগজ চালায় ? পাঁচটা পাঁচ রকমের লোক নিয়ে সাধারণ একটা আপিস চালানো যায়, যে যার নিজের মনে নিজের কাজ করে যাবে। কিন্তু খবরের কাগজে পাঁচজনের খাটুনিতে সামঞ্জস্য থাকা চাই, তাদের খাটুনি মিলেমিশে কাগজটাকে রূপ দেবে।

শচীন বলে, এগুলি তোর কথা নয়, তুই এগুলি সুনীলের শেখানো কথা বলছিস।

নন্দা বলে, তা বলছি। কিন্তু কথাগুলি ঠিক তো ? আমি মনে মনে যা ভাবছি জানলে তুমি চমকে যাবে বাবা।

বুড়ো বাপকে বেশি চমকে দিয়ো না।

তবে মনের কথা মনেই থাক। একদিন অবশ্য জানতে পারবে।

সন্ধ্যার দিকে কাগজটার আপিসে গেলে মনে হবে এতদিনে বুঝি স্বপ্ন সফল হয়েছে মৃত প্রমোদের, এতদিনে জেঁকে উঠেছে তার স্থাপিত সংবাদপত্রটি। নানাকাজে লোকজন তো সর্বদা যাতায়াত করছেই, বিনা কাজেও যে কত লোক আজকাল আসা-যাওয়া করে তার হিসাব রাখা দায়।

কেবল সাধারণ বাজে লোক নয়, খ্যাতিমান অর্থবান মানুষেরও পদার্পণ ঘটে পত্রিকার আপিসে—অনেক নামকরা নেতা লেখক সাংবাদিক শিক্ষাব্রতী সন্ধ্যার দিকে এসে আড্ডা জমায়।

নন্দা সুনীলকে বলে, আপনার আমার মধ্যে একটা পরিষ্কার লেখাপড়া হওয়া উচিত। কবে কী নিয়ে আপনাতে আমাতে ঝগড়া লাগবে—মাঝখান থেকে সর্বনাশ হয়ে যাবে কাগজটার।

কী লেখাপড়া হবে ?

আপনাকে কাগজটার আংশিক মালিকানা দিয়ে দেব। আমার সঙ্গে ঝগড়া হলেও তাহলে কাগজটার ক্ষতি করতে পারবেন না।

আমি তো মাইনে নিচ্ছি।

ভারী মাইনে নিচ্ছেন এত খেটে ! তাও তো গত মাসে পুরো টাকা পাননি। কাগজটাকে যে তুলছেন এত চেষ্টা করে, শুধু মাইনে নেবার স্বার্থ হলে জোর পাবেন কেন ?

সুনীল একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, শুধু মাইনের স্বার্থ নয়—কাগজে লিখছি। কাগজে আমার মতামত প্রকাশ পাচ্ছে, অনেক গায়ের জ্বালা কাগজটার মারফত ঝাড়তে পারছি, দেশের লোকের অনেক দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই করছি। কাজ করে এত আনন্দ জীবনে কখনও পাইনি। কেবলি কী মনে হয় জানো ? বদ্ধ একটা জলার মতো এতদিন যেন জীবনটা শুধু পচছিল—এতদিনে সত্যি একটা

গতিলাভ করেছে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। কাগজ তোমারই থাক, আমাকে কাগজটা চালিয়ে যেতে দিয়ো, তাহলেই হবে।

নন্দা বলে, ধরুন দুদিন বাদে আমার মন বিগড়ে গেল, আপনাকে কাগজ চালাতে দিলাম না, তাড়িয়ে দিলাম। জগতে কতরকম কী হতে পারে, তখন কী করবেন ?

অন্য একটা কাগজে ঢুকে পড়ব।

নন্দা জোর দিয়ে বলে, এ হিসাবটা ভুল হল আপনার। এ কাগজটার জন্য যেভাবে খাটছেন অন্য কাগজে ঢুকে সে সুযোগ পাবেন না। এ কাগজটাকে নিজের ভাবতে পারছেন, অন্য কাগজে গিয়ে তা পারবেন ? তার চেয়ে আমি যাতে আপনার অধিকারে কোনোদিন কোনো কারণে হস্তক্ষেপ করতে না পারি, সে রকম একটা ব্যবস্থা করে নেওয়াই তো ভালো। আপনাকে সে দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত নিতেই হবে—আমার রসদ ফুরিয়ে এসেছে। নিখিলবাবু নানাভাবে শুষতেন, এখন বুঝতে পারছি।

সুনীল নীরবে ভাবে।

নন্দা বলে, আমি নিঃস্বার্থভাবে আপনার উপকার করছি ভাববেন না। কাগজের ভাগিদার হলে কাগজ থেকে লাভ করতে পারলে নেবেন, নইলে নেবেন না, আপনার সম্পর্কে আমার কোনো দায় থাকবে না। লাভ দিয়ে হোক, লোকসান দিয়ে হোক, নিজের কাগজ আপনি নিজে চালিয়ে যাবেন।

সুনীল চিন্তিতভাবে বলে, হিসেবটা করেছ বুদ্ধিমতীর মতোই। এখন মাইনে বলে তবু কিছু নিচ্ছি, সেটা বন্ধ করতে চাও। এ কাগজ থেকে লাভ হতে দেরি আছে।

নন্দা হাসিমুখে বলে, এত খেটে, এত সময় দিয়ে, সামান্য যা আপনি নিচ্ছেন সেটা না পেলে আপনার চলবে কেন ? ভাগিদার করে আপনাকে হাতখরচের টাকা কটা থেকে বঞ্চিত করব, আমি মোটেই সেটা হিসাবে ধরিনি। নিজে দোকান দিলে, লোকে আয় থেকে নিজের খরচের টাকাও নেয়। না নিলে চলবে কেন ? যে নামেই নিন—এত সময় দিয়ে খাটলে খুটলে, কিছু টাকা আপনাকে নিতেই হবে।

সুনীল ভেবে বলে, তোমার বাবা ? প্রদ্যোতবাবু ? ওরা কী বলবেন ?

বুঝলে কিছুই বলবেন না, খুশিই হবেন। না বুঝলে যা খুশি হয় বলবেন। এতদিনে কাগজটা তুলবার একটা সুযোগ পেয়েছি, বাপ-দাদার খাতিরে সে সুযোগটা নষ্ট করব নাকি ? আগেও একবার একজন পার্টনার জোটাবার কথা হয়েছিল, পয়সাওয়ালা পার্টনার। সুবিধামতো লোক না পাওয়ায় হয়নি। ঠিক লোকটিকে পেয়ে গেছি, আমি ছাড়ছি না কিছুতেই।

আচ্ছা, একদিন দুজনে বসা যাবে। খরচ আরও বাড়বে মনে হচ্ছে। প্রেসটার পিছনে কিছু পয়সা ঢালা দরকার।

সেই জন্যই তো তাগিদ দিচ্ছি—ভাগ নিন। নিয়ে যা দরকার-টরকার সব ব্যবস্থা করুন।

আনন্দ আর উৎসাহ যেন উৎসারিত হয় নন্দার মুখ থেকে। সে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সুনীলের মনে পড়ে যায়, এই সেদিন নন্দাকে পড়ানোর কাজটা সে বেছে নিয়েছিল যে এ মেয়ে তাকে বিশেষ পাত্তা দেবে না, এর কাছ থেকে কোনোরকম ন্যাকামির ঝঞ্ঝাট পোয়াবার আশঙ্কা নেই।

হিসাব তার ভুল হয়নি। কিন্তু এতখানি প্রাণশক্তি যে নন্দার আছে এটা সে ধরতে পারেনি আগে। নন্দার মধ্যেও কি রসকষ নেই মায়ার মতো, তার মতো ? কাজ আর দায়িত্বের মধ্যেই তারও জীবনের আনন্দ-বেদনার হিসাবনিকাশ ? অথবা মৃত স্বামী মনটা দখল করে আছে বলে ওদিক দিয়ে তার আর কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন নেই ?

কিন্তু স্বামীর জন্য শোক নেই বলেই তো এদিকে আবার কুমারীও সেজে থাকে।

৯

নবীনের একখানা কবিতার বই বেরিয়েছে।

চটি বই। ছোটো আর মাঝারি আকারের গোটা বাইশ কবিতা।

আলপনা সগর্বে বইখানা দাদার হাতে তুলে দেয়। বলে, কবিতা না পড়েই সমালোচনা করে একদিন ওকে চটিয়েছিলে, কবিতাগুলি পড়ে একটা সমালোচনা লেখো দিকি ভালো করে।

আমায় লিখতে বলেছে ?

আমি বলছি, তুমি লেখ না।

কল্পনা দিন দুই আগে প্রণবের সঙ্গে বাপের বাড়ি এসেছিল। প্রণব একদিন থেকেই চলে গিয়েছে। কল্পনার চেহারা দেখে তার শ্বশুরবাড়ির উপর এ বাড়ির লোকেরা খুশি হতে পারেনি।

কল্পনা বলে, এত বিদ্যে হয়েছে তোমার ? যার বই সে আসতে পারল না বলতে পারল না, তুমি দাদাকে হুকুম দিচ্ছ সমালোচনা লিখতে !

আলপনা বলে, দাদার সঙ্গে নবীনের যে কথা বন্ধ।

কল্পনা বলে, তাহলে দাদাকে দিয়ে সমালোচনা লেখানোও বন্ধ।

এই সুরটাই এবার স্পষ্ট হয়েছে কল্পনার কথায় ব্যবহারে—দাদার উপব দরদ। এ বাড়িতে আসবার আগে থেকেই বোধ হয় মতলব এঁটে এসেছে যে এবার যতদিন বাপের বাড়ি থাকবে স্পষ্টভাবে গায়ে পড়ে দাদাকে দরদ দেখাবে।

দাদা পছন্দ করুক বা না করুক !

প্রণব শ দুই টাকার একটা চাকবি করে। এবার কথায় কথায় সে সুনীলকে সলজ্জভাবে জানিয়ে গেছে যে সে-ও একবার রাজনীতির ধার ঘেঁষে কিছুদিনের জন্য জেলে গিয়েছিল– -ছাত্র বযসে।

সুনীলের কাগজটা পড়তে পড়তে নাকি মনটা আবার নাড়া খাচ্ছে তার।

সুনীল বলেছিল, ঠিক দলগত পলিটিক্‌স নেই কাগজটাব পিছনে। ওটা কোনো দলের কাগজ নয়।

প্রণব বলেছিল, তা হোক না। যারা দশজন সাধারণ লোকের পক্ষে থেকে তাদের স্বার্থে কথা বলছে, আপনারা তাদের কথাই তো বলছেন। ও মিলে যাবেই কমনম্যানের ইন্টারেস্ট যেই দেখুক—একাই দেখুক আর দল বেঁধেই দেখুক, বলতে হবে সেই এক কথাই।

সুনীল বলেছিল, তুমি ঠিক বলেছ। আমি দলীয় কাগজ উড়িয়ে দিচ্ছি না, বলছি না ও সব কাগজ দরকার নেই। রাজনৈতিক দল হলে তার একটা কাগজও চাই। সে কাগজে দলের কথা বেশি থাকবে, দলের স্বার্থ বড়ো হবে, সেটাও দোষেব কিছু নয় বরং উচিত কথাই। তবে এ বকম একটা কাগজেরও দরকার এ দেশে—অনেক দল কিনা।

সুনীল বলেছিল, কাগজ যারা পড়ে তারাও একটা দল কিন্তু। সংগঠিত নয়, কিন্তু দল।

প্রণব চলে গেলে কল্পনা সুনীলকে জানিয়েছিল, তোমার খুব ভক্ত হয়ে পড়েছে আজকাল।

তাই নাকি ! তা ভক্ত হয়েও আমার বোনটিকে এমন কাহিল করে ফেলেছে কেন ?

সেটা তোমার বোনের দোষ হতে পারে।

সত্যি কী তাই ? কেন রোগা হয়েছিস ?

এমনি। রোগা কি মানুষ ইচ্ছে করে হয় ?

কল্পনার শরীর খারাপ হবার ব্যাপারটা একটু ভালো করে খোঁজ করবে ভেবে রাখে, কিন্তু সময় আর হয় না সুনীলের। আগে ছিল বাঁধাধরা সময়ের কাজ, যতই খাটতে হোক অবসরের সময়টুকু

ছিল তারই হাতের মুঠোয়—বিশ্রাম করার বদলে সে সময়টাও অন্য কাজে মাথা ঘামালে কারও কিছু আসত যেত না। এখন তার সবচেয়ে বেশি টানাটানি পড়েছে সময়েব।

তাই আলপনাকে মুখখানা যথাসম্ভব ভারিক্কি করে আসতে দেখে সে বিরক্ত হয়ে বলে, সামান্য কথা হলে এখন থাক। আমার সময় নেই।

আলপনা বলে, দিদির কথা বলব।

কী কথা ?

দিদি কেন রোগা হয়ে যাচ্ছে জানো ?

অগত্যা কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে বোনের দিকে সুনীলকে তাকাতে হয়।

আলপনা ভূমিকা না করেই বলে, জামাইবাবুকে দিদিব পছন্দ হয়নি।

তুই কী করে জানলি ?

রকম-সকম দেখেই টের পেয়েছি। প্রণববাবুকে একেবারে আমল দেয় না। কেমন যেন একটা অবজ্ঞার ভাব। কথা কইলে গায়ে মাখতে চায় না।

সুনীল বলবার চেষ্টা করে, নতুন নতুন বিয়ে হলে—

আলপনা মাথা নাড়ে।—হালকা হাসিঠাট্টার কথা বলছ ? আমি সেটা চিনি না ? প্রণববাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি দিলে তো কথাই ছিল না। ও রকম অনেকেই দেয়, দেখায় যেন সব কিছু হাসিতামাশার ব্যাপার। দিদি সামান্য ব্যাপারে মুখ বাঁকায়, কথায় কথায় বিরক্ত হয়—অনেক সময় কথাই বলে না ভালো করে, প্রণববাবুও কেমন একটু দূরত্ব রেখে চলেন।

খেতে বসে সুনীল গৌরীকে জিজ্ঞাসা করে, প্রণব একদিন থেকেই চলে গেল কেন ? দু-একদিন থেকে যেতে বলনি ?

বলিনি ? কতবার বলেছি। থাকতে না চাইলে করব কী ! আপিস তো এখান থেকেই করতে পারে।

একটা চিঠি লিখে দিই, রবিবার দুপুরে এখানে খাবে, কী বলো ?

গৌরী কিছু বলাব আগেই কল্পনা বলে বসে, থাকগে না, অত খাতির না করলেও চলবে।

সুনীল বলে, তাব মানে ? নতুন জামাইকে খাতির না কবলেও চলবে কী বকম ?

কল্পনা বলে, ভারী তো একটা মানুষ। লেজ গুটিয়ে গুটিয়ে নিজেই ছুটে ছুটে আসবে দেখ তোমার কাছে।

বোনের মুখের ভাব লক্ষ করে সুনীল চিন্তিতভাবে খেয়ে যায়।

মুখেব কথায় শুধু নয়, কল্পনার মুখের ভাবেও প্রণব সম্পর্কে দারুণ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পেয়েছে !

গভীরভাবে তালিয়ে না বুঝুক, নব বিবাহিতা বোনটিব জীবনের কঠিন সমস্যাটা আলপনা ধরতে পেরেছে ঠিকই। প্রণবের সঙ্গে সাধারণভাবে কল্পনার কথা ও ব্যবহার লক্ষ করে, স্বামীর উপর তার শ্রদ্ধার অভাবটা ধরা আরও সহজ হয়ে গেছে তার পক্ষে।

কিন্তু এই অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের কারণ কী কল্পনার ? নিজে সে প্রণবের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে, তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেছে বিয়ের আগে। তাকে তো হালকা ফাজিল ছোঁড়া মনে হয়নি, যে বিয়ের পর তাকে কল্পনার পক্ষে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করা সম্ভব হয় না।

এবং স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে না পারাটাও তো অতি মারাত্মক কথা ! প্রেম ছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর চলে যায় কিন্তু এই সহজ শ্রদ্ধাটুকুর অভাব ঘটলে তো তাদের পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব হয় না কোনোমতেই !

খেয়ে উঠে সে একটু পরামর্শ করতে যায় মায়ার সঙ্গে।

মায়া সব শুনে বলে, আমিও তোমাকে বলব কি না ভাবছিলাম। যা ব্যস্ত দেখি তোমায়, এ সব ঘরোয়া সমস্যা ঘাড়ে চাপাতে আবার মায়াও হয়। ছায়াও বলছিল আমাকে, কল্পনা নাকি প্রণবকে কেয়ার করে না, কেমন একটা অবজ্ঞার ভাব আছে। আমি প্রথমটা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু গতবার যখন ওরা এসেছিল, তখন লক্ষ করে দেখেছি যে সত্যিই তাই। তোমার বোনেব কাছে স্বামীটি হয়েছে নেহাত বাজে লোক।

সুনীল বলে, এ তো ভারী মুশকিল হল।

মায়া বলে, মুশকিল বইকী। আমি আস্তে আস্তে ওর পেটের কথা টেনে বার করার চেষ্টা করেছি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে কল্পনাকে জেরা করেছি। আমার কী মনে হয়েছে জানো ? দুটি কারণে কল্পনার মন বিগড়ে গেছে।

মায়া একটু থামে।

না, বিগড়ে গিয়েছে বলব না, মন উঠছে না বলি। প্রণব শুধু চাকরি আর বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলে আড্ডা দিয়ে দিন কাটায়, সিরিয়াস কাজ কিছু করে না, এই হল একটা কারণ। আরেকটা কারণ আমার মনে হয়, প্রণব একটু বাড়াবাড়ি কাব্যি করতে গিয়েছিল মেয়ের সঙ্গে। অন্য মেয়ে খুশি হত, উনি তোমার বোন তো। বউয়ের সঙ্গে ন্যাকামি করাই ভদ্রঘরের রীতি, প্রণবের বিশেষ দোষ নেই। অনেকে আবার নিজে থেকে করে না, বন্ধুরা যেমন শিখিয়ে দেয় সেই রকম করে। কিন্তু কল্পনা ধবে নিয়েছে যে, ওর স্বামী জুটেছে ছ্যাবলা।

সুনীল ধীরে ধীরে বলে, কী করা যায় বলো তো ?

মায়া বলে, কিছুই কবা যায় না। ওদের নিজেদের মধ্যেই সামঞ্জস্য হয়ে যাওযাই ভালো। তুমি শুধু প্রণবের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, দেখাবে যে প্রণবকে তুমি তুচ্ছ মনে কর না।

বড়ো ঝঞ্ঝাট সংসারে !

ঝঞ্ঝাট বইকী ! কিন্তু তুমি আমি সংসার না করেই ঝঞ্ঝাট পোয়াচ্ছি এই হল আসল মজা।

মাঝে মাঝে সুনীলের মনে হয় সে যেন নিজের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নয়, নিতান্তই ঘটনাচক্রে নন্দার কাগজটার সঙ্গে গভীরতরভাবে জড়িয়ে পড়েছে। একটা অদৃশ্য শক্তি তার খেয়ালখুশিব তোয়াক্কা না রেখেই তাকে ক্রমে ক্রমে আরও বেশি করে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধছে কাগজটার সঙ্গে।

এ চিন্তা মনে মনে এলে অবশ্য সে সঙ্গে সঙ্গেই ঝেড়ে ফেলে।

অদৃশ্য শক্তিতে তার বিশ্বাস নেই বহুকাল।

তার সব কাজের, সহজ হোক কিংবা একটু জটিল হোক, সাধারণ বাস্তব ব্যাখ্যা যতক্ষণ সে খুঁজে পাচ্ছে, অদৃশ্য কোনো শক্তির উপর দায় চাপিয়ে বেহাই খুঁজবার সাধ সত্যই তার নেই।

নন্দা তাকে কাগজটার ভাগ্যের মালিক করে ছেড়েছে।

সেটা তার সমস্যা নয়। মালিক হবার আগেই যেচে যেচে যে দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিল, মালিক হবার পর এমনি দায়িত্ব হয়তো বেড়েছে, কাজ বাড়েনি। মালিকানার ভাগ না পেলেও এ খাটুনি তাকে খাটতে হত। সেটা পালন করতে গিয়ে অঘোরের আপিসে চাকরি বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার পক্ষে।

কাগজটা যদি দাঁড়ায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে যাবে—নইলে একেবারেই দাঁড়াবে না।

সমস্ত কিছু নির্ভর করছে তার উপরে। নন্দা থেকে আরম্ভ করে কাগজটার সাব-এডিটররা পর্যন্ত যেন তার উপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে, তার কথায় উঠবার বসবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করে।

দায়িত্ব তোমার। কী করতে হবে বলো. আমরা করব।

নন্দা বলে, সাধে কী ভাগিদার করেছি ? আমি ভারী চালাক মেয়ে। এই সুযোগে তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে না পারলে যে আর হবে না আমি সেটা টের পাইনি ভাবছ ? টের পেয়েই দায় চাপিয়েছি।

সুনীল বলে, সে তো বুঝলাম। আমি এখন কোন দিক সামলাই ?

নন্দা সঙ্গে সঙ্গে অম্লান বদনে বলে, কাগজটার দিক। অন্যদিক অন্য লোকেরা ঢের ঢের সামলাচ্ছে, একটা খবরের কাগজের দিক কী সবাই সামলাতে পারে, না চেষ্টা করার সুযোগ পায় ?

ভেবেচিন্তে সুনীল অঘোরের কাছে তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত দাখিল করে।

দরখাস্তে লেখে যে ছুটিটা তার পাওনা আছে, ব্যক্তিগত কারণে ছুটিটা এখন দরকার হয়েছে। মুখে কাগজের কথা সব জানায়।

অঘোর বলে, চাকরি না ছেড়ে ছুটি নিচ্ছ এই জন্য যে কাগজ যদি নেহাত না দাঁড়ায়, চাকরিতে ফিরে আসবে। কাগজ একটু দাঁড়ালেই আর তোমায় আমি এ আপিসে দেখতে পাব না।

সুনীল বলে, সেটা তো বুঝতেই পারছেন। মাইনে পাব দুমাসের। তারপর যে আমার কী অবস্থা হবে ভাবতে পারছি না। বাড়িতে সকলকে আধপেটা খেতে হবে।

অঘোরের আজ নতুন ভাব। হাসিমুখে সে বলে, আরে বোসো না। এই তো দোষ তোমাদের, একা একাই তোমাদের বীরত্ব, কারও সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটু কম বীর হতে তোমাদের মন চায় না।

সুনীল মনে মনে বলে, সেরেছে !

কিন্তু ক্লান্ত মুখে হাসি নিয়েই সে বসে। বাইরের ক্ষমতাশালী বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই শুধু অঘোরের মুখোমুখি যে চেয়ারে বসার অধিকার, আজ নিয়ে দ্বিতীয়বার সে সেই চেয়ারে বসতে পায়।

অঘোর বলে, আমি তোমায় বিশ্বাস করি. এতদিনে নিশ্চয় সেটা জেনেছ। তোমায় বিশ্বাস করা যায়—এটাই আমার কাছে তোমার একমাত্র গুণ। শুনে রাগ হচ্ছে না তো ?

সুনীল বলে, রাগ ? এত বড়ো প্রশংসা করলেন, রাগ হবে কেন ?

অঘোর বলে, বিশ্বাস করলে সকলে খুশি হয় না। মনে করে যে বোকা পেয়ে বাগাচ্ছি। তোমায় আমি সত্যি বিশ্বাস করি। আমি জানি তোমার কয়েকটা আদর্শ আছে নিয়মনীতি আছে, মরলেও তুমি তা ছাড়বে না। আমি তাই ভাবছিলাম কী. তুমি যখন এভাবে কাগজটার দিকে ঝুঁকেছ, নিশ্চয় ওর মধ্যে সাবস্টানস্য়াল কিছু আছে।

অঘোর একটা সিগার ধরায়। সিগার ধরানোটা তার চাল মাত্র, ধোঁয়া খেতে সে ভালোবাসে না। এই সিগারটাই তার চার-পাঁচদিন চলবে।

খানিক সুনীলের মুখের ভাব লক্ষ করে অঘোর বলে, আমি যদি তোমার ওই কাগজটার পিছনে দাঁড়াই ? আমি যদি কাগজটা দাঁড় করাতে যত টাকা দরকার ঢালতে রাজি হই ? তুমি এমনভাবে মেতেছ বলেই আমি কিন্তু মোটা টাকা এভাবে রিস্ক করতে রাজি হচ্ছি সুনীল।

সুনীল খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলে, আপনি এ কাগজের পিছনে টাকা ঢালবেন ? এটা তো মুনাফার কাগজ নয়।

মুনাফা ? তুমি এটা অন্যায় বললে সুনীল। মুনাফা তো চাদ্দিক থেকে পাচ্ছিই—আমি কি মানুষ নই ? বিভার পেছনে যে এত টাকা ঢালি, সেটা কি মুনাফার জন্য ?

কী শর্তে আপনি টাকা দেবেন ? হাজার চল্লিশ টাকা পেলেই আমি কাগজটাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারব।

অঘোর বোধ হয় এতটুকুও আশা করেনি। সে খুশি হয়ে বলে, তুমি সিগারেট ধরাও না, সিগারেট খাও। ও সব প্রেজুডিস আমার নেই। আমি খুব সোজাসুজি শর্তে তোমায় টাকা দিতে রাজি

আছি। তোমায় আমি বিশ্বাস করি তো। আমার শর্ত খুব সোজা। যতই হোক তোমরা জোয়ান ছেলেমেয়ে তো, রক্ত তোমাদের গরম। ওর একটা সেফগার্ড রাখব যে কোনো লেখা আমি বাতিল করলে সেটা ছাপা হবে না। আরেকটা শর্ত খুব বাজে ঠেকবে—নেতিবাচক। কাগজে আমেরিকাকে গাল দেওয়া চলবে না।

সুনীল বলে, কাগজের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে আপনাকে জানাব।

কাগজের মালিক কে ?

একটা ফাজিল মেয়ে। কাগজটা ওর স্বামীর। ওকে না জিজ্ঞাসা করে কিছু বলতে পারছি না আপনাকে।

সুনীল উঠে যাবার পর অঘোর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় শেষবার সম্পাদকীয় প্রবন্ধটার প্রুফ দেখে দিয়ে সুনীল ভাবছে যে এখন বাড়ি ফেরার চেষ্টা করাই শক্তির অপচয়, দুঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে অভ্যস্ত বিছানায় শুয়ে হয়তো ঘুম আসবে না।

তার চেয়ে এখানে কিছু আনিয়ে খেয়ে, এখানেই রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করলে বাড়ি ফিরবার শক্তিক্ষয়টা বেঁচে যায়।

নন্দা তখন আসে।

লুচি আর মাংস নিয়ে আসে।

বলে, বোকা হলে বাড়িতে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতাম। কিন্তু দেখছ তো, মানুষকে খাটিয়ে নেবার কায়দা জানি।

কী রকম খিদে পেয়েছিল এতক্ষণে যেন টের পাওয়া যায়, হাত ধুয়েই সুনীল তাড়াতাড়ি খেতে আরম্ভ করে।

তাকিয়ে দেখে নন্দা বলে, যতই হিসেবি হোক, নিজের পেটের হিসাবটা পুরুষের খেয়াল থাকে না। আর সব কিছু ভাবতে পারলে, রাত্রে খিদে পাবে এটা মনে পড়ল না কেন ?

সুনীল বলে, মেয়েরাই চিরকাল খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছে বলে আমিও ওই নিয়মের মধ্যেই মানুষ হয়েছি। বাড়িতে ওদিকে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছে।

নন্দা বলে, আজ্ঞে না। এদিকে লুচি-মাংস খাবে, ওদিকে খাবার ঢাকা থাকবে—এই রেশন আর চোরাবাজারে অত নবাবি করে না। বিকালে গিয়ে বারণ করে দিয়ে এসেছি যে আজ থেকে রাত্রে তোমার রান্না হবে না, আমার কাছে খাবে।

শুনে কী বলল বাড়িতে ?

খুশি হল না তেমন। পুরুষমানুষ রাত্রে বাড়ি না ফিরলেই মেয়েদের খারাপ লাগে—যে জন্যেই ফেরা না হোক।

সে একটু থামে।

তোমার মা বলেছিলেন, অনিলও নাকি খুব রাত করে ফেরে।

খেয়ে উঠে সিগারেট ধরিয়ে সুনীল অঘোরের প্রস্তাবটা নন্দাকে শুনিয়ে দেয়।

নন্দা আশ্চর্য হয় না। বলে, এ রকম কত প্রস্তাব আসবে। একটা কিছু গড়তে গেলেই টাকাওলা লোক সেটা বেদখল করতে চায়।

সুনীল বলে, টাকার কিন্তু খুব দরকার ছিল। কিছু টাকা জোগাড় করতেই হবে।

নন্দা সায় দিয়ে বলে, কিন্তু এঁর কাছে টাকা নিলেই তো ইনি কাগজটা কনট্রোল করবেন ?

তা খানিকটা করবেন।

তবে ? এমনি দিতে যদি রাজি হন, শুধু লাভের ভাগ পাবেন কিন্তু কাগজ চালানো সম্পর্কে একটি কথাও বলতে পাবেন না—তা হলে নেবেন।

সুনীলের বিছানার চাদরটা ঝেড়ে পেতে দিয়ে নন্দা বলে, এখানে ঘুমোবেন তো ?

হ্যাঁ। বাড়ি যেতে কুড়ি মিনিট সময়ও যদি লাগে, ঘুমোলে কাজ দেবে।

ঘুমোন, আমি পালাই।

সকালে একেবারে বাজার করে নিয়ে বাড়ি ফিরে সুনীল খবর পায়, অনিল তখনও পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি।

গৌরী আপশোশ করে বলে, কী যে মতিগতি হল ছেলেটার !

কল্পনা বলে, আমার মনে হয় কোনো বদখেয়াল ধরেনি ছোড়দাকে, পয়সা রোজগারের চেষ্টা করছে।

তোর এ কথা মনে হয় কেন ?

মেয়েবন্ধু পুষতে পয়সা লাগে তো।

আধঘণ্টা পরে অনিল ফিরে এলে তার চেহারা দেখে মনে হয় কল্পনার অনুমানই সত্য, বদখেয়ালে বাইরে রাত কাটাবার মতো কোনোরকম ছাপ তার মুখে নেই। বেশ তাজাই দেখাচ্ছে তাকে।

কল্পনাই তাকে জিজ্ঞাসা করে, বাড়িতে কিছু না জানিয়ে কোথায় রাত কাটানো হল বাবুর ?

বন্ধুর বাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কেন ? ঘুম কি আজকাল বেশি হচ্ছে ?

বিয়ে হয়ে তোর মাতব্বরি তো বেশি হয়েছে !

ওটা মেয়েদের হয়ে থাকে। বেশ তো, আমার মাতব্বরি পছন্দ না হয়, দাদার কাছে ব্যাপার-ট্যাপার সব খুলে বলবে যাও। কলেজের ছাত্র যদি পড়াশোনা বাতিল করে দিনরাত আড্ডা মেরে বেড়ায়, বাড়ির লোকের একটু ভাবনায় পড়তে হয় কিন্তু ছোড়দা। তোমার উচিত নিজে থেকে সব খুলে বলা। দাদা কিছু বলতে গেলে তো আবার অপমান হবে।

অনিল চা খেতে খেতে গোমড়া মুখে ভাবে। কল্পনার কথাগুলি হেসে উড়িয়ে দেবার সাধ্য তার নেই। উচিত-অনুচিতে একটা সহজ বাস্তব বিচার সুনীল যেন গায়ের জোরে তার অভ্যাস করিয়ে দিয়েছে।

সুনীল শেখাতে সময় পায় না কিন্তু মায়ার স্কুলের হিসাবনিকাশ তাকেই দেখে দিতে হয়।

মায়া কাগজপত্র এনে সবে তাকে হিসাবটা বুঝিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে, অনিল ঘরে এসে বলে, তুমি নাকি আমায় ডেকেছ দাদা ?

সুনীল বলে, ডেকেছিলাম। বাবা নালিশ করেছিলেন তোমার নামে। তুমি ঘর থেকে টাকা নিচ্ছ, বাইরে রোজগার করছ—অথচ তোমার নিজের খরচের দায়িত্বটা তুমি নিতে পারছ না।

অনিল চুপ করে থাকে।

সুনীল আবার বলে, আমরা টাকা ঢালব, তুমি পড়বে—তার একটা সার্থকতা আছে। আমরা পড়ার খরচও দেব, তুমি আবার নিজেও ওদিকে রোজগারের জন্য টাইম আর এনার্জি নষ্ট করবে, আমি এর মানে বুঝি না।

অনিল ধীরে ধীরে বলে, মানুষ বিশেষ অবস্থায় পড়লে—

বিশেষ অবস্থায় পড়বার অধিকার তো তোমার নেই।

মায়া অস্বস্তি বোধ করে বলে, আমি চলে যাব ? তোমাদের কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে হয়তো।

সুনীল বলে, অসুবিধা কেন হবে ? গোপন কথা তো কিছু হচ্ছে না আমাদের। অবশ্য অনিল যদি কিছু বলতে চায়—

আমার কিছুই বলার নেই।

আমার কথার একটা জবাব তো দেবে ? আমরা পড়ার খরচ দিলে তোমাকে পয়সা রোজগারের চেষ্টা বাদ দিতে হবে। ছাত্রজীবনে যা দরকার সব আমরাই জোগাব।

অনিল গোমড়া মুখে বলে, পয়সা রোজগাবেব চেষ্টা কি খারাপ ?

সুনীল বলে, নিজের কাজ ফাঁকি দিযে করা খারাপ বইকী। রোজগার ছাড়া তোমার যদি না চলে, পড়া ছেড়ে দিয়ে ভিড়ে পড়ো। ভুল করে কোনো দায়িত্ব যদি নিয়ে ফেলে থাকো, টাকাব জরুরি দরকার হয়ে থাকে, আমাকে জানালে নিশ্চয় বিবেচনা করে দেখব। তোমাব ভুল করার অধিকার তো আমি কেড়ে নিইনি।

অনিল চুপ করে থেকে বলে, কাল বলব।

সে চলে গেলে মায়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, রেবার এবার ও বেচারাকে রেহাই দেওয়া উচিত।

সুনীল বলে, গায়ের জ্বালা মিটছে না যে। আমার অপমানের শোধ নিচ্ছে। আমার কাছে পাত্তা পায়নি, গায়ে জ্বালা ধরেছিল। তার শোধ নিচ্ছে।

মায়া ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, এ কী রকম শোধ নেওয়া ? নিজের ঘাড়েও তো পড়ছে ! যখন সামলাবার দরকার হবে তখন কী করবে ?

সে বিবেচনা যার থাকে তার কি মিছিমিছি গায়ে জ্বালা ধরে ?

ও বেচারাদের দোষ নেই। ঘরেবাইরে সিনেমায় খালি ভাবুকতাই তো শেখানো হয়। মেয়েরা আরও বেশি টসটস করে ভাবে।

তুমিও তো মেয়ে ?

মায়া একটু হাসে।

আমিও মাঝে মাঝে গদগদ হই বইকী।

পড়াশোনা নিয়ে থাকবে অথবা রোজগার করতে নামবে এ বিষয়ে অনিল তার সিদ্ধান্ত পবেব দিন জানাবে বলেছিল। কে জানে সে মনস্থির করতে পাবে না, অথবা সুনীলকে সিদ্ধান্ত জানিযে দিতে ভুলে যায়।

দিন তিনেক পরে কল্পনাকে প্রণব নিতে আসে।

কল্পনা সোজাসুজি জানিয়ে দেয়, আমি ক-দিন বাদে যাব।

ওদিকে অসুবিধা হচ্ছে।

হোক না একটু অসুবিধা।

দুজনের কথা কাটাকাটি বাইরে থেকে শোনা যায়। প্রণব যে রাগ করেছে, টের পেতে বাকি থাকে না বাড়ির লোকেব ! তা, একদিনের জন্য বাপেব বাড়ি বেড়াতে এসে তিন দিন কাটিয়েও ফিরে যেতে না চাইলে অপর পক্ষের রাগ করার অধিকার আছে বইকী !

কল্পনা গ্রাহ্য করে না।

বলে, করুকগে রাগ—ঘরের ভাত বেশি করে খাবে।

গৌরী চিন্তিতভাবে বলে, এ কী স্বভাব হল তোর বিয়ের পর ? একেবারে যেন মহারানি বনে গিয়েছিস ! এ রকম ব্যবহার করলে তোকে তো দুচোখে দেখতে পারবে না কেউ ? মেয়েমানুষ, পরের ঘরের বউ, এটুকু ভুলে গেলে তো তোমার চলবে না বাছা !

ভুলিনি গো, ভুলিনি। পরশু যাব বললাম তো।

প্রণব যে পরশু আসতে পারবে না বললে ?

খুব আসতে পারবে। নিজের গরজেই আসতে পারবে।

অনিল প্রণবের পক্ষ নিয়ে রেগে বলে, এ সব ফাজিল মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি।

দেখা যাবে তোমার কত ভালো বউ আসে।

খুব সকালেই প্রণব এসেছিল। চা জলখাবার খেয়ে সে চলে যাবে, আপিস আছে। রাত্রে সুনীল কাগজের আপিসেই ঘুমিয়েছিল, প্রণব বিদায় নেবার কয়েক মিনিট আগে সে বাড়ি ফেরে।

প্রণবের মুখ দেখে সে বলে, এখানে খেয়ে আপিস চলে যেয়ো ?

না। আমার কাজ আছে।

সুনীল আর কিছু বলে না।

অনিল ক্রুদ্ধ মুখে বলে, কল্পনাকে তোমার শাসন করে দেওয়া উচিত।

সুনীল শান্তভাবেই বলে, শাসন করা দরকার হলে এবার প্রণব করবে। আমি কী আর শাসন করতে পারি ?

প্রণব গম্ভীর মুখেই বলে, শাসন করে কী আর স্বভাব বদলানো যায় ? আপনার বোনের প্রকৃতিটাই হালকা।

সুনীল বলে, না হালকা মেয়ে ও নয়। একটা কিছু গোলমাল হচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার কথা রাখতে আজকের মতো তুমি ওকে ক্ষমা করো প্রণব। ও কেন এ রকম করছে একটু বুঝবার চেষ্টা করে দেখি।

প্রণব চলে যেতেই অনিল হঠাৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে বসে, এ সমস্ত কিছুর জন্য দায়ি তুমিই। তুমিই সকলের মন বিগড়ে দিয়েছ। কারও স্বাভাবিক চালচলন আসে না।

সুনীল আশ্চর্য হয় না, রাগও করে না। গম্ভীর শান্ত মুখে বলে, কথাটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারলে সত্যি খুব উপকার হয়। আমার সম্পর্কে এ রকম একটা কথা যখন তোমার মনে এসেছে, খোলসা করে বলাই ভালো। আমি যে দাদা, গুরুজন এটা ভুলে গিয়ে তুমি খোলাখুলি কথা বলতে পারো। তোমার নালিশ যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, আমি নিশ্চয় প্রতিকারের ব্যবস্থা করব।

অনিল চুপ করে থাকে।

সুনীল আবার বলে, কেন কথাটা মনে হয়েছে বলতে পারছ না ?

অনিল বলে, আমার কথা কি তুমি মানবে ? তুমি মানুষটাই ভয়ানক নিষ্ঠুর। তোমার কাছে মোটা হিসাব ছাড়া কোনো কিছুর দাম নেই। স্নেহ মায়া এ সব তুমি ন্যাকামি মনে কর। তোমার কাছে কল্পনা ওই নিষ্ঠুরতা শিখেছে—প্রণবের ভালোবাসা ওর ন্যাকামি মনে হয়। শক্ত পাথরের মতো মানুষ না হলে তাকে মানুষ বলেই গণ্য করতে পারে না।

এত বড়ো নিষ্ঠুর অভিযোগ ! সুনীল একবার ভাবে খানিকক্ষণ সময় নিয়ে ছোটো ভাইটিকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, নিষ্ঠুর তার দাদা নয় ভাবাবেগের স্বার্থপরতায় সেই বরং নিষ্ঠুরতার চরমে উঠতে পারে, নিজেকে হীন পর্যন্ত করতে পারে।

কিন্তু বুঝিয়ে দিলেও বুঝবে কী ?

সুনীল তাই শান্তভাবেই প্রশ্ন করে, তোমার নিজের দিক থেকে ধরলে ?

আমারও তাই। তোমার কাছে উলটো নিয়ম শিখেছি। সংসারে হৃদয় নিয়ে কারবার যদি না চলত, তাহলে আলাদা কথা ছিল। আর সকলে হৃদয়টা মানছে, স্নেহ মায়া দুর্বলতা এ সব হিসাব ধরছে। তুমি আমাকে খানিকটা যন্ত্রের মতো বানিয়ে দিয়েছ, মানুষের সঙ্গে খাপ খেতে পারি না। কিন্তু ভালো লাগে না আমার, সব সময় কেমন একটা অস্থিরতা জেগে থাকে। মনে হয়, আমি একেবারে অপদার্থ। এ কাজটা বুঝি অন্যায় করলাম, ও কাজটা বুঝি উচিত হবে না—

আমার জন্য এটা হয়েছে ?

তোমার জন্য। তুমি সব নিয়মে বেঁধে দিতে চাও। জীবনে হাসি আনন্দ ফুর্তির এতটুকু দাম নেই তোমার কাছে। সবসময় সব ব্যাপারে মানুষকে সিরিয়াস হয়ে থাকতে হবে। এদিকে তোমার আবার খুব জোরালো পার্সোন্যালিটি—তাব চাপে আমবা কুঁকড়ে গেছি। ভাইবোনেদের তুমি স্বাভাবিকভাবে মানুষ কবতে পারনি।

সুনীল একটু সময় চুপ করে ভাবে।

শান্তভাবেই বলে, আচ্ছা, কথাটা একটু অন্যভাবে বিচার করা যাক। আমাদের মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজে চরম ভাঙন ধরেছে, জীবনে বিকাব আর অস্বাভাবিকতা এমনিতেই খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। আমি তোমাদের ভাবপ্রবণতার পথে সহজে ভেসে যেতে না দিয়ে খানিকটা বাস্তববুদ্ধি, বাস্তববিচার এনে দিয়েছি—হৃদযমন একটু শক্ত করে দিয়েছি। স্রোতে ভেসে যেতে দিলে তুমি হয়তো এই সংঘাতটা টের পেতে না—ভেসেই যেতে। তুমি যদি বুঝতে চাও আমি তোমায় অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিতে পারি—আমি একটু শক্ত না হলে সংসাবটাই ভেসে যেত। এখনও তুমি যেটুকু ভদ্রভাবে চলতে ফিরতে পারছ, কলেজ যাচ্ছ, এ সব কিছুই পারতে না। তোমার যে কিছু ভালো লাগে না, সেটা অবস্থার দোষ, আমার শিক্ষার দোষ নয়। ভাঙনের অবস্থাটা ভালো লাগা কাবও পক্ষেই সম্ভব নয়, কেউ কেউ ফাঁকি দিয়ে এটা ওটা দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে, এই পর্যন্ত। এ অবস্থাটা ভালো লাগছে না, তুমি একটা পরিবর্তন চাইছ, জীবনটা তোমার কাছে সস্তা নয়—এটাই তোমার ভিতরেব অস্থিরতার কারণ হতে পারে না ?

অনিল ম্লানভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করে।

তোমাব সঙ্গে কথায় পারব না। তুমি আসলে আমার মধ্যে ইনফিরিওবিটি কমপ্লেক্স জন্মে দিয়েছ। নিজেকে ছোটো মনে হয়, অপদার্থ মনে হয়।

সুনীল এবার গম্ভীব হয়। তার মুখ দেখে অনিলের মনে হয়, এতদিন জন্মেনি, এখন এই মুহূর্তে বুঝি তার ইনফিবিওরিটি কমপ্লেক্স জন্মাল !

ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ? সেটা কোত্থেকে আসবে, কেন আসবে ? ইনফিবিওবিটি কমপ্লেক্সেব থিয়োরি তুমি জানো, এ বিষয়ে পড়াশোনা করেছ ? না শুধু কথাটাই শিখেছ বন্ধুদের কাছে ? তোমার কথাই ধরি, আমার জোরালো পার্সোনালিটি আছে—কিন্তু একটা চরিত্রেব প্রভাবে অন্যের চরিত্রে তো ওই কমপ্লেক্স জন্মায় না ? তোমায় অসহায় পেয়ে যদি অন্যায় অত্যাচার করতাম, তোমার কাছ থেকে জোর করে সেবা ভক্তি আদায় করতাম, তাহলে তোমার আত্মগ্লানি আসতে পারত। নিরুপায় হয়ে অত্যাচার সইতে হলেই কেবল ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স জন্মাতে পারে—জোরালো চরিত্রের প্রভাবে চরিত্রই গড়ে উঠতে পারে।

একটু থেমে সুনীল বলে, তুমি যেটা নিজের কমপ্লেক্স ভাবছ, আসলে ওটা তোমার আত্মবিচার। অত অন্যায় অবিচার মেনে নিয়ে একটা বিশ্রী ভাঙন ধরা অবস্থায় আমরা বেঁচে আছি। তুমি ছাত্র—তুমি জান শিক্ষার নামে কী রকম ফাঁকি চলছে। এ অবস্থাটা মেনে নিতে হচ্ছে বলে নিজেকে ছোটো মনে হয়—মনে হয় এভাবে লেখাপড়া শেখাটাই বুঝি অন্যায় কাজ, অপরাধ। এই থেকেই অবশ্য অনেক ছেলে বিগড়ে যায়—ছটফটানি থেকে রেহাই পাবার জন্য হালকা ফুর্তি খোঁজে। যারা ভাঙন ধরা অবস্থাটা টিকিয়ে রাখতে চায়, ও রকম ফুর্তির ব্যবস্থাও তারাই করে দেয়।

অনিল চুপ করে থাকে।

সুনীল বলে, কল্পনার ব্যাপারটা আমার কী মনে হয় জানো ? বোকামি খানিকটা হচ্ছে প্রণবের দিক থেকেই। মেয়েদের সম্বন্ধে একালের ছেলেদের কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে যায়—ওর এতটুকু অভিজ্ঞতা নেই। শুধু বই পড়ে সিনেমা দেখে আর বন্ধুদের কাছে শুনে যেটুকু শেখা ! ওর ভাবটা তাই

খাপছাড়া লাগছে কল্পনার—এ রকম বউ-পাগলা গদগদ ভাব কি আজকালকার মেয়েদের কাছে রুচিকর হয় ?

কল্পনাকে বুঝিয়ে বলবে ?

বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। নিজেই বুঝবে। প্রণব টের পাবে ওভাবে আজকালকাব বউয়ের মন পাওয়া যায় না, বুঝে নিজেই সামলে নেবে।

সুনীল মাথা তুলে বলে, আমি একটু শক্ত না হলে, এ প্রশ্নগুলি কি তোমার মনে জাগত অনিল ?

অনিল চুপ করে থাকে।

সুনীল বলে, একটু বুঝে দেখবার চেষ্টা করো। সংসারটা বজায় রাখার ব্যাপারে ছাড়া কোনো বিষয়ে আমি তোমার ওপরে কর্তালি কবিনি। অবস্থা খুব খারাপ। সকলকে ত্যাগ করতে হবে, কষ্ট করতে হবে। সবারই যে দাবি আছে সেটা ভুলে গিয়ে, তুমি কেবল নিজের কথা ভেবেছ। ধরো, তুমি একটা জামা চাইলে, আলপনা একটা ব্লাউজ চাইল, মা চাইল বিশ বছরের পুরানো পোকায় কাটা শাড়ির বদলে একটা নতুন গরদের শাড়ি। তুমি টাকার হিসাব কষে দেখছ—এদের দাবি মেটানো যায় না। এদের আবদার রাখলে রেশন আনা যাবে না—এরাই খিদেয় কাতরাবে। তখন তুমি কী করবে ? তোমাকে দেখতেই হবে কোনটা আবদার, কোনটা দরকার। তুমি সেই বুঝে ব্যবস্থা করবে। সেটা কি নিষ্ঠুরতা ? গরদের শাড়ি কিনে দিয়ে মাকে দয়া দেখিয়ে, মাকে খেতে না দেওয়াটা কি নিষ্ঠুরতা নয় ?

অনিল গুম খেয়ে থাকে।

আগেও তো এ সব সোজা কথা বুঝিয়ে বলতে পারতে ?

আগেও বলেছি, অন্যভাবে বলেছি, তুমি বুঝতে পাবনি।

অনিল বলে, অমনভাবে বলবার কী দরকার ছিল, ঠিকভাবে বললে হত !

ঠিকভাবেই বলেছি। তবে আমার ভাই, তোমাকেই তো একা বলতে হয়নি, অনেককে বলতে হয়েছে। তুমি তাই মানেই বোঝনি কী বললাম। এখন দায়ে পড়ে বুঝছ।

অনিলেব মুখভাব দেখে সুনীল আবার বলে, দায়ে পড়ে বোঝাটা কিন্তু কোনো দোষের কথা নয়। মানুষ চিরকাল দায়ে পড়েই বুঝে এসেছে, মানুষেব জীবনের ব্যাপারটা।

অনিল অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে।

তাবপব হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবে, তুমি বলছ আমরা পুরুষেরাই, আমাদের চালচলন দিয়ে, মেয়েদের চালচলন শিখিয়েছি—তৈরি করেছি ? ওরা যাই কবুক সে জন্য আমরা দায়ি ? ওদের কোনো দোষ নেই ?

সুনীল শুধু বলে, ছায়া তোমার চেয়ে অনেক বেশি ছেলেমানুষ।

মায়ার কাছে সুনীল খবর পায় যে অনিল হঠাৎ গিয়ে গায়ে পড়ে ছায়ার সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নিয়েছে।

বাঁচা গেল। মেয়েটার জন্য সত্যি ভাবনা হচ্ছিল। আমার বসকষ নেই বলে আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনটা রসালো করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। আমি একটা যন্ত্র—ওকে মানুষ হতেই হবে। যন্ত্র না হওয়ার উপায় কী ? প্রেম করে করে জীবনটা রসালো করে তোলা !

মায়া হাসে, আবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

এত বাজে বই পড়ে, বাজে সিনেমা দেখেও ভাগ্যে ছেলেমেয়েগুলি মানুষ আছে ! একটা মেয়ে এমনি করে এগিয়ে গেলেও ভাগ্যে ছেলেগুলি মাথা ঠিক রাখতে পারে ! ললিত বেচারার সঙ্গে যা আরম্ভ করেছিল, কী বলব তোমায়। ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতাম, কবে বোনটি এসে কেঁদে বলে আবার মুশকিলে পড়ে গেছি। ললিতকে এতটুকু দোষ দিতে পারতাম না। চুড়ি বিক্রি করে যে মেয়ে অনিলকে নিয়ে—

সুনীল সিগারেট ধরিয়ে বলে, তুমি যে তাজ্জব কথা বলছ।

মায়া বলে, আমিও তাজ্জব বনেই গেছিলাম। কিছু ঘটেনি, নীতির ওপর দিয়ে গেছে তাই রক্ষা। অনিলকে কিন্তু আমি বাহাদুর ছেলে বলব। সিনেমা দেখে বেরিয়ে, মেয়ে চুড়ি বেচে টেনে নিয়ে গেল, সেদিনটা বেচারা সামলাতে পারেনি। তা পারেও না। কিন্তু নিজেকে ও রকম সস্তা করার জন্য যে ধাতানি অনিল দিয়েছে, একেবারে হাড়ে হাড়ে ব্যাপার টের পেয়ে গিয়েছে মেয়ে। অনিল কী বলেছিল জানো ? আজ আমার সঙ্গে খারাপ হবে, তোমাদের মতো মেয়েকে বিশ্বাস করা যায় না। অনিল যদি শক্ত না হত, দুমাস যদি তুচ্ছ করে না রাখত, ও হারামজাদি কি বুঝতে পারত, কত ধানে কত চাল ?

সুনীল বলে, ললিতের সঙ্গে সিনেমায় যায় বলে নাকি অনিল রাগ করেছিল ?

মায়া বলে, ললিতকে ধরেছিল পরে—অনিলকে একটু কাবু করার আশায় বাড়িতে বলে যেত সিনেমায় যাচ্ছি—অনিল যাতে খবর পায়। আসলে ললিতের সঙ্গে মেয়ে যেতেন মিটিংয়ে। ললিতের সিনেমা দেখার রোগ নেই।

সুনীল আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, এ সব কথা অ্যাদ্দিন আমায় বলনি যে ?

মায়া বলে, ভয় হত। তুমি তলিয়ে বুঝবে কি না কে জানে ? তোমার ভাই আমার ছেলেমানুষ বোনকে নষ্ট করেছে—তুমি হয়তো ধরে নেবে এটাই। খুন করেই হয়তো ফেলবে ভাইকে। আমি তো জানি ছায়াই আসলে দোষী।

সুনীল আরেকটা সিগারেট ধরায়।

তুমিও আমার সম্বন্ধে এ রকম ধারণা করে রেখেছ ? বিচার-বিবেচনা না করেই ভাইকে খুন করে ফেলতে পারি ? আমার মায়া-দয়ার বালাই নেই ?

মায়া বলে, আগে তাই ভাবতাম।

বলে গা ঘেঁষে এসে সুনীলের গলার কাছে ছোটো যে ফোড়াটা উঠছে, সেটাকে সন্তর্পণে আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করে আবার বলে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তোমার মায়া-দয়াটা বেশি। একজন দুজনকে নিয়ে মায়া-দয়া পোষায় না তোমার—মায়া-দয়ার কারবারটা তোমার দশজনকে নিয়ে বড়ো স্কেলে। আমরা ছোটো স্বার্থ নিয়ে কারবার করি তো—তোমায় ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। নন্দা খবরের কাগজের অফিসে গভীর রাত্রে গিয়ে, তোমায় খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আসে শুনে ভেবেছিলাম—বাইরের মেয়েই তোমার ভালো লাগে, যে মেয়ের কোনোরকম দায় ঘাড়ে চাপার ভাবনা থাকে না। কিন্তু বুঝতে পারছি আমার ভুল হয়েছিল। কোনো মেয়ের কোনোরকম দুঃখকষ্টের দায়িক হতেই তোমার দারুণ অনিচ্ছা। নিজের হাঙ্গামা এড়ানো নয়, তুমি কষ্ট দিতে চাও না।

১০

নবীন উদ্যোগী হয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে একটি মাসিকপত্র বার করেছে—নাম দিয়েছে 'নব-আলপনা'। প্রথম পাতাতেই একটি কবিতা ছাপিয়েছে আলপনার,—কাঁচা মেয়েলি কবিতা।

আলপনা একটু ভয়ে ভয়েই কাগজটা সুনীলকে দেখায়। নাম সম্পর্কে সে আপত্তি করেছিল, নবীন কানে তোলেনি।

নামটা নিয়ে জানাশোনা ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশ খানিকটা কানাকানি হাসাহাসি শুরু হয়েছে। কেউ কেউ বলেছে যে, সংকোচটুকু বাদ দিয়ে 'নব' কথাটার বদলে 'নবীন' বসিয়ে দিলেই চুকে যেত।

সুনীলও সেটা খেয়াল করে জিজ্ঞাসা করে, এটা নবীনের ইয়ার্কি হল, না ছেলেমানুষি ? এ বুদ্ধিটুকু নিশ্চয় আছে ? নবীন নামে একটা ছেলের, চেনা আছে আলপনা নামে একটা মেয়ের সঙ্গে ; সে যদি হঠাৎ এ রকম নাম দিয়ে একটা কাগজ বার করে, লোকে হাসাহাসি করবে না ?

আলপনা মাথা হেঁট করে থাকে।

সুনীল বিরক্ত হয়ে বলে, কী ব্যাপার ? নাচতে নেমে ঘোমটা টেনো না, খোলাখুলি কথা বলো।

আলপনা মৃদুস্বরে বলে, নবীন বলছিল, হাসাহাসি বন্ধ করার সহজ উপায় আছে, আমাদের এনগেজমেন্ট ঘোষণা করে দেওয়া।

তোমাদের এনগেজমেন্ট ?

নবীন প্রোপোজ করেছিল, আমি রাজি হয়েছি।

আমাদের জানাওনি কেন ?

নবীন বাবাকে জানাবে বলেছিল।

বাবাকে জানিয়েছে ?

না, জানাতে আসবে।

সুনীল গম্ভীর মুখে বলে, নবীন তাহলে জেনেশুনে ইচ্ছে করেই এই নাম দিয়ে কাগজটা বার করেছে ? ওর ভয় ছিল আমি পাছে অন্য কোথাও তোর বিয়ে ঠিক করি, ওর সম্পর্কে আপত্তি করি, তাই আঁটঘাঁট বেঁধে নেমেছে ? ওর মাথায় এত চালাকি বুদ্ধি খেলে, তা তো জানতাম না !

আলপনা চুপ করে থাকে।

তোর সঙ্গেও পরামর্শ করেছে নিশ্চয় ?

আমি বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম তুমি যদি অমত কর, এভাবে কাগজ বার করবার পরেও করবে।

সুনীল বলে, আমার অমত নেই। চাকরি করছে, তোর পছন্দ হয়েছে, আমি অমত করব কেন ? আমার বরং অনেক ঝঞ্ঝাট বেঁচে গেল। কিন্তু নবীন যে এদিকে প্রতিজ্ঞা করেছে, আমার সঙ্গে জীবনে কথা বলবে না ?

আলপনার মুখ কঠিন দেখায়।

এ প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে। আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি, নিজে এসে তোমার সঙ্গে যেচে কথা না কইলে, আমার সঙ্গেও কথা কয়ে কাজ নেই। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে তুমি কী মনে করবে, এটাই হয়েছে ওর আসল মুশকিল। নিজের প্রতিজ্ঞা ভাঙতে নিজেই লজ্জা পাচ্ছে।

সে তো পাওয়াই উচিত।

মোটেই উচিত নয়। মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে গেছে বলেই সেটা সারা জীবন সত্য করে আঁকড়ে থাকতে হবে, এটা একগুঁয়েমি, বোকামি। অন্য লোকের ভালোমন্দ সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা হয়, প্রতিজ্ঞা পালন না করলে অন্যের ক্ষতি হয়, সে আলাদা ব্যাপার।

সুনীল একটু আশ্চর্য হয়েই শোনে।

তোর আবার এ সব বিবেচনা হল কোথা থেকে ?

আলপনা সোজাসুজি বলে, তুমিই শিখিয়েছ। তুমি নিজের কত কথা পালটে নাও।

আগে ভাবতাম এটা বুঝি তোমার দুর্বলতা। তারপর দেখলাম যে না, দরকার হলে, অবস্থা পালটে গেলে, হিসাব পালটে গেলে, কথাও পালটাতে হয় মানুষকে।

আলপনা চলে যাবার পর সুনীল অনেকক্ষণ 'নব-আলপনা'র পাতা উলটোতে উলটোতে চুপচাপ ভাবে।

কাগজ বার করার যে উদ্দেশ্যই থাক নবীনের, পক্ষপাতিত্ব করে আলপনার যত কাঁচা কবিতাকেই একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় সে স্থান দিক, ভিতরে কয়েকটি লেখার হেডিং পড়েই টের পাওয়া যায়, এ কাগজেও বর্তমান সমাজের তাজা তাজা সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়েছে।

এই সমস্ত সমস্যার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হওয়ায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে আপনা থেকে যে বাস্তববোধ জন্ম নেয়, নতুন যে আত্মবিশ্বাসের সূচনা সে দেখতে পাচ্ছে ওদের মধ্যে, তারও জন্ম কি ওইখান থেকে ?

প্রেমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা নেই নবীন বা আলপনার। তারা ধরেই নিয়েছে যে তারা যখন ব্যাপারটা ঠিক করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে, মিলন তাদের হবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

প্রথমটা সুনীল ধরতে পারেনি, তার সঙ্গে নবীনের কথাবন্ধের প্রতিজ্ঞাটা তার খেয়াল ছিল না। তাই প্রথমে তার মনে হয়েছিল, নবীন বুঝি আলপনার নাম জড়িয়ে কাগজ বার করে সম্ভবপর বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে আটঘাঁট বেঁধেছে, আলপনাকে তার হাতে দিতে তাদের বাধ্য করার জন্য এই চাল চেলেছে।

কিন্তু তারপরেই সে টের পেয়েছে যে তার ওই ধারণাটাই ভুল।

নবীন ও সব হিসাব করেনি। আলপনাকে পাওয়া সম্পর্কে সে এতখানি সুনিশ্চিত যে, সেই আত্মবিশ্বাস থেকে তার শখ হয়েছে কাগজটার ওই নাম দেওয়ার এবং ওই নামকরণের মধ্যে দোষের বা অসুবিধার কিছুই সে খুঁজে পায়নি।

দরকার হলে সবাইকে জানিয়ে দিলেই হল যে, এর মধ্যে লুকোচুরির ব্যাপার কিছু নেই, তারা সত্যই 'এনগেজড্' !

এত বাজে বই পড়ে আর সিনেমা দেখেও ছেলেমেয়েরা ভাবালুতা বর্জন করার এত ক্ষমতা কোথা থেকে পায়, ভেবে মায়া আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

আজ সুনীলও আশ্চর্য হয়ে যায়।

একটা কথা মনে পড়ায় আলপনাকে ডেকে পাঠিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, তুই কি পড়া ছেড়ে দিবি ভাবছিস ?

বাঃ রে, পড়া ছাড়ব কেন ? চাকরি করছে, আমার পড়ার খরচটা জোগাতে পারবে না ?

এ সব পরামর্শও হয়ে গেছে বুঝি ? তাহলে আর দেরি করে লাভ কী ? নবীনকে বলিস তো আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।

বোনের বিয়ের মতো এত বড়ো একটা ব্যাপার নিয়ে মায়ার সঙ্গে কথা না বলে, অন্য কাজে মন দিতে মনটা খুঁতখুঁত করে সুনীলের।

মায়া সব শুনে খুশি হয়ে বলে, এই তো চাই। একালের ছেলেমেয়েরা অত প্রেমপ্রেম করে পাগল হয় না—প্রেম ছাড়াও যে অনেক কিছু আছে জীবনে এটা বেশ বোঝে। প্রেমকে হাজার ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুললে কী হবে, ওরা ভুলছে না। নইলে ছায়ার মতো আহ্লাদি মেয়ে পর্যন্ত এত শক্ত হতে পারে ?

সুনীল বলে, দুজনে খুব মিল হবে না বুঝতে পারছি। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকবে। কিন্তু তার আর কী করা যাবে ?

মায়া বলে, বটেই তো। মেয়ের বুদ্ধি আছে—বিয়ে যখন করবেই একজনকে, তার ঘাড়ে গিয়েই পড়ার খরচটা চাপাই, বাপ-ভাইকে রেহাই দিই।

সুনীল একটু হাসে।

তুমি আমিই বাদ পড়লাম দেখছি।

সত্যি।

কাজে এগোই না এগোই, কারও সঙ্গে একটু পরামর্শ করতেও ইচ্ছা হয় না আমাদের ?

মায়া বলে, ইচ্ছা আমার হয়, পরামর্শ করাটাই হয়ে ওঠে না শেষ পর্যন্ত।

আমার কী ইচ্ছা হয় না ? আমারও বোধ হয় ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে, পরে চাপা পড়ে যায়। এসো না দুজনে বসে পবামর্শ করি একদিন।

মায়া চোখ তুলে তাকায়।

ভাইবোনদের ভালোবাসার ব্যাপার দেখে হিংসা হচ্ছে নাকি ?

সুনীল হাসিমুখে বলে, ছেলেমানুষ নাকি যে হিংসা হবে ? আমি ভাবছিলাম কী, সমস্ত ছোটো বড়ো ব্যাপারে আমরা প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মতো পরামর্শ করি। এটা খেয়াল করেছ নিশ্চয় ? প্রেম বোধ হয় আমাদের আসবে না, ও জিনিসটা বোধ হয় আমাদের ধাতেই নেই। কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে যখন আমাদেব এত মিল, স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেলেই বা দোষটা কী ? অন্তত দুজনে বসে আমরা একটা প্ল্যান তো করতে পারি—স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাকি জীবনটা আমরা কাটাতে পারি কি না ?

মায়া মুখ বাঁকিয়ে বলে, পরামর্শ করার প্ল্যান করার কী আছে ? আমি যে তোমার স্ত্রী হতে পারব না এটা তো জানা কথাই। তোমাব বাড়িতে গিয়ে তো বাস করতে পারব না আমি। আমাকে স্কুলটা চালাতে হবে, বাবার অসুখের চিকিৎসা থেকে ঘরসংসারের সব ব্যবস্থা করতে হবে।

সুনীল বলে, তাতে কী আসবে যাবে ? আমার বাড়ি গিয়ে বাস করতে না পার বাস করবে না ! এখনকার মতোই যে যখন সময় পাই অন্যের বাড়ি আসব যাব, যে বাড়িতে সুবিধে হয় একটা ঘবে দুজনে একসঙ্গে রাত কাটাব। দুজনের যেমন সুবিধা হয় সে রকম বন্দোবস্ত করে নেব।

বলে সুনীল একটু হাসে।—আমাদের তো আর ভালোবাসার বিয়ে হবে না। সুবিধার বিয়ে হবে। পরস্পরকে আমরা জানি বুঝি বিশ্বাস করি পছন্দ করি, দুজনে পরামর্শ করে কাজ পর্যন্ত করি। সেই জন্য একটা সম্পর্ক গড়ে নেওয়া। আমাদের বোধ হয় ভালোই লাগবে মায়া।

মায়া চিন্তিত মুখে বলে, সে তো বুঝলাম। তোমার আমার মধ্যে নয় একটা বোঝাপড়া হল—লোকে কী ভাববে ? তোমার বাড়িতে কী বলবে, আমার বাড়িতে কী বলবে ? মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না বলে মা এখনও দাপড়ায়। মেয়ের বিয়ে হয়েছে অথচ স্বামীর ঘর করে না বলে, মা তখন আরও দাপড়াবে !

সুনীল বলে, অন্যের হিসাব ধরলে আমাদের চলবে না। আমরা আমাদের সুবিধা-অসুবিধা হিসাব করব—অন্যদের সেটা মানতে হবে। প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগবে সকলের, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাযা বলতে যায়, তা ছাড়া—

তা ছাড়া ?

সুনীলকে ছেলেপিলের কথা বলতে মায়াব লজ্জা করে ! সুনীল বুঝতে পেবে একটু তাজ্জব হয়ে যায় বইকী !

ছেলেপিলের কথা বলছ ? ছেলেপিলে অবশ্য আমাদের দু-তিনটের বেশি হবে না, আমরা হতে দেব না। ছেলেপিলের জন্য আমাদের অসুবিধা হবার তো কোনো কারণ আছে মনে হয় না !

মায়া মৃদু হেসে বলে, তোমার না হোক আমার অসুবিধা আছে। আমি যদি ছেলে বিয়োই, ছেলে মানুষ করতে ব্যস্ত থাকি, আমার স্কুল কে চালাবে ?

দু-চারমাস দরকার হলে আমি চালিয়ে দেব।

তুমি সময় পাবে ? কাগজ চালাবার দায় কেমন টের পাচ্ছ তো ?

সময় না পাই আমাদের ছেলেমেয়ে হবে না। সে তো আমাদেরই হাত।

সেটা ভালো লাগবে আমাদের ?

পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কী ? ভালো না লাগে, শেষ পর্যন্ত সুবিধে না হয়—বিয়েটা আমরা বাতিল বলে ধরে নিয়ে এখন যেমন আছি তেমনি থাকব।

মায়া হাসিমুখে মাথা নাড়ে।

তা আব হয় না। এখন যেমন আছি তেমন থাকা যায়, কিছুদিন স্বামী-স্ত্রীর মতো কাটিয়ে আর এ অবস্থায় ফেরা যায় না। সেই জন্য খুব ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখা দরকার।

ভাবতে ভাবতে তুমি আমি বুড়ো হয়ে যাব।

মায়া তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, ভেবেচিন্তে দেখা উচিত, মানে কী আমি আবও দু-চারবছব ভাবতে বলছি। আজকেই একটা কিছু ঠিক করে না ফেলে, কযেকটা দিন ভাবি এসো। আজকে কথাটা উঠল, আজকেই হেস্তনেস্ত করা ঠিক হবে না।

১১

একেবারে সাদামাঠাভাবে মুখে মুখে মোটামুটি একটু বিচার-বিবেচনা করা যে, তাদের নিজেব নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যেতে যেতে, তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা স্থাপন করা সম্ভব এবং সুবিধাজনক কি না ! সুনীল ভালোবাসা জানায়নি বরং এই কথাটার উপরেই জোর দিয়েছে যে, তার ধাতে বোধ হয় ও সব আসে না।

মায়ার জন্য এতটুকু ব্যাকুলতা প্রকাশ করেনি, একটিও সরস কথা বলেনি। অত্যন্ত নীরসভাবে মোটা কথায় শুধু বিচার করেছে বাস্তব সুবিধা-অসুবিধা এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে তাদের বিয়ে হলে নেহাত মন্দ হয় না !

যেমন আছে সেভাবে দিন কাটাতে তার খুব বেশি কষ্ট নেই। তবে বুড়ো হতে চলেছে, কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হওয়া দূরে থাক, তার গোড়াপত্তনটুকুও আজ পর্যন্ত ঘটেনি। একমাত্র মায়াব সঙ্গে তার যা একটু সহজ বোঝাপড়া আছে।

বিবাহিত জীবনটা কেমন হয় একটু চেখে দেখলে দোষ কী ?

অন্য মেয়ে হলে, সুনীলের প্রস্তাবে রীতিমতো অপমান বোধ করত। কোনো পুরুষের কাছ থেকে এ রকম হৃদয়হীন বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার চেয়ে বড়ো অপমান অনেক মেয়ে কল্পনা করতে পাবে না।

কিন্তু সুনীলের সঙ্গে তার কিনা বিশেষ একটা সহজ বোঝাপড়া হয়ে আছে বহুদিন থেকে, সে নিজেও কিনা সুনীলকে অনায়াসে জানিয়ে দিতে পারে যে তার কাছেও ভালোবাসা আশা করা মিছে ; সুনীলের বন্ধুভাবে ও রকম স্থূল বাস্তব প্রস্তাব তোলায় অপমান বোধ করার কথাটা তার খেয়ালেও আসে না।

বরং তার সমস্ত বিশেষ দাবিদাওয়া, অধিকার মেনে নিয়ে, সুনীল তাকে বিয়ে কবতে চায় ভেবে জীবনটা হঠাৎ যেন বড়োই রসালো হয়ে ওঠে মায়ার।

তার এতটুকু অসুবিধা না ঘটিয়েই সুনীল তাকে চায়। দরকার হলে তার মুখ চেয়ে তার গর্ভে সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষাও সুনীল ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

প্রাণটা যেন গান গেয়ে ওঠে মায়ার।

সে ভাবে, রাজি হলেই চুকে যেত। কী দরকার ছিল ভেবে দেখবার জন্য আবার কিছুদিন সিদ্ধান্তটা পিছিয়ে দেবার ?

আর কোনো পুরুষমানুষের সঙ্গে ও রকম সম্পর্ক সে তো কল্পনাও করতে পারে না, ভাবতে গেলেও ঘৃণায় সর্বাঙ্গ যেন কুঁকড়ে যেতে চায়।

এক বিছানায় সুনীলের পাশে শুয়ে রাত কাটাবার কল্পনা সে রকম রোমাঞ্চকর না ঠেকলেও খারাপ লাগে না। ভালোবাসা হলে হয়তো কল্পনা করেই রোমাঞ্চ শিহরন ইত্যাদি অনুভব করত, কিন্তু ভালোবাসা যখন নেই তখন আর সে জন্য মাথা ঘামিয়ে লাভ কী ?

ভালোবাসা ছাড়াই যখন সুনীলের স্ত্রী হবার কল্পনা, তার সন্তানের মা হবার কল্পনা মন্দ লাগে না, বরং আশা জাগে যে জীবনটা আনন্দময় হবে, সার্থক হবে—কী আসত যেত সেদিন সুনীলের কথায় সায় দিয়ে সব ঠিকঠাক করে ফেললে ?

মায়া স্পষ্ট অনুভব করে, নিজে থেকে সে কথাটা কোনোদিন তুলতে পারবে না সুনীলের কাছে।

সুনীল আবার কবে কথা তোলে, সে জন্যই ধৈর্য ধরে তাকে প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে।

কথাটা যদি মনের তলায় চাপা পড়ে যায় সুনীলের ? খবরের কাগজটা নিয়ে সে যেভাবে দিনরাত মেতে আছে, তাতে সে যদি ভুলে যায় যে মায়ার কাছে সে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করেছিল এবং কয়েকদিন পরে আবার ও বিষয়ে মায়ার সঙ্গে তার আলোচনা ও পরামর্শ করার কথা আছে ?

এমনও তো হতে পারে যে তার সেদিনের কথাবার্তা থেকে সুনীল ধরে নিয়েছে যে তার তেমন ইচ্ছা নেই নেহাত সুনীলের খাতিরে কথাটা সে বিবেচনা করে দেখতে রাজি হয়েছে ? ধরে নিয়ে সুনীল যদি তার উপর কোনোরকম চাপ না দেওয়া ঠিক করে ?

তাকে রেহাই দেবার জন্যই কথাটা আর না তোলে ?

ছায়া বলে, তোমার কী হয়েছে দিদি ? শরীর ভালো নেই ?

কেন ?

ঠিকমতো খাচ্ছ-দাচ্ছ না, কী যেন ভাবছ সারাদিন। আমার জন্যে ? আমি তো বলেছি আমার জন্যে আর ভাবতে হবে না তোমাকে। এবার থেকে আমি নিজেই সব দিক সামলে চলব।

মায়া হেসে বলে, সে তো চলবিই। মেয়েরা কি একেবারে বেশি ভুল করে, না ভুল করলে পোষায় ? কিন্তু তোরা খালি নিজের কথা ভাবিস। আমি যে বুড়ি হয়ে গেলাম ? আমার আর বিয়ে-টিয়ে দরকার নেই, না ?

ছায়া গদগদ হয়ে বলে, সত্যি বিয়ের কথা ভাবছ ?

তারপরেই তার মুখে ছায়া ঘনিয়ে আসে।

ছিছি, ভারী বিশ্রী হবে কিন্তু। তোমার বিয়ে হবে বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে, আমার বিয়ে হবে ছোটোভাইয়ের সঙ্গে—

মায়া একেবারে চমকে যায়।

বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে মানে ?

আহা, আমরা যেন জানিনে কেউ।

তোরা কী জানিস বল না শুনি ?

সুনীলদার সঙ্গে তোমার ভালোবাসা আছে সবাই জানে।

জানে নাকি ?

জানবে না ? তোমাদের ভাব দেখলেই টের পাওয়া যায়। ঘরসংসারের দায়ের জন্য তোমরা বিয়ে পিছিয়ে রেখেছ, তাও সবাই জানে। তাই তো সবাই এত প্রশংসা করে তোমাদের।

প্রশংসাও করে নাকি !

করবে না ? বুড়ো মা-বাপ-ভাইবোনেদের কথা কোন ছেলেমেয়ে ভাবে আজকাল ? নিজের নিজেরটা গুছিয়ে নিতে পারলেই হল। তোমাদের ভালোবাসা হয়েছে, বাড়ির লোকের জন্য বিয়ে পিছিয়ে রেখেছ—প্রশংসা করবে না ?

মায়া খানিকক্ষণ বোনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর মায়া ভাবে, এই সুযোগটা কাজে লাগানো যেতে পারে।

ছায়ার সঙ্গে তার কী কথা হয়েছে, সে গল্প করার ছলে সুনীলের কাছে সে-ই তুলতে পারে কথাটা।

কিন্তু—

কথা তুললে যদি বিব্রত হয় সুনীল ? বড়ো কাজে মেতে গেছে, তার কথা ভাববার সময় পাবে না, জোর করে এখন সুনীলকে তার কথা ভাবতে বাধ্য করলে কাজের যদি ক্ষতি হয় তার ?

তার চেয়ে কিছুদিন চুপচাপ থাকাই ভালো !

সুনীল একটু সামলে নিক !

প্রাণটা ছটফট করে মায়ার। সুনীলকে জানিয়ে দিতে বড়োই সাধ জাগে যে তারা যাই ভাবুক আর যেমন হিসাবই করুক, জগৎ-সংসারে সকলে জেনে গিয়েছে যে তাদের ভালোবাসা হয়েছে।

তারা ধরে নিয়েছে যে ভালোবাসা তাদের জন্য নয়, সংসারে ভালোবাসা বলতে আর দশটা মেয়েপুরুষ যা বোঝে সেটা ধাতেই আসে না তাদের।

অথচ সংসারের ওই দশজনেই জেনে গিয়েছে যে তাদের মধ্যেই জন্মেছে খাঁটি ভালোবাসা, আসল ভালোবাসা !

সেদিন সুনীল ওইভাবে বিয়ের প্রস্তাবটা না করলে মায়া হয়তো সব কাজ ফেলে ছুটে গিয়ে সুনীলকে কথাটা শুনিয়ে দিত। এক মুহূর্তের জন্য তার দ্বিধা বা সংকোচ জাগত না।

সেদিন বিয়ে করতে চেয়ে কী ফাঁদেই তাকে ফেলেছে সুনীল। এত বড়ো একটা গুরুতর কথা শোনাবার জন্য প্রাণটা ছটফট করে তবু মায়া ছুটে যেতে পারে না। কীসে যেন তাকে আটকে রাখে !

মনে হয়, যতই সহজ আর অকপট হোক তাদের সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো খোলাখুলিভাবেই তারা আলোচনা করতে পারুক নিজেদের বিয়ের সুবিধা-অসুবিধার কথা—আত্মসম্মান বজায় রেখে যেচে গিয়ে সুনীলকে এ কথাটা সে শোনাতে পারে না।

সুনীলকে কোনো কথা বলতে সংকোচ বোধ করবে এটা এতদিন অভাবনীয় ছিল, প্রথমে ব্যাপারটা ভারী বিস্ময়কর মনে হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে সে টের পায়, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, এটাই স্বাভাবিক এবং সংগত।

এবার মুখ খোলার পালা সুনীলের।

সুনীল মুখ না খুললে, আত্মসম্মান বজায় রেখে এ বিষয়ে তার পক্ষে একটু ইঙ্গিত করাও সম্ভব নয়। সেটা হবে নিজেকে অপমান করা, ছোটো করা।

১২

অন্যায় আর অবিচারের সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করা। জনসাধারণের স্বার্থটা সমস্ত কিছুর চেয়ে বড়ো করে তুলে ধরা। নন্দার মৃত স্বামী প্রমোদের নির্ধারিত এই মূল নীতিটাই অনুসরণ করা হয় তার প্রবর্তিত কাগজে।

শুধু এই নীতিটুকুর জন্যই কত মানুষের সমর্থন আর সহানুভূতি যে ভিড় করে এসে জমা হতে থাকে কাগজটার পিছনে !

লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, টাকা ধার দিয়ে লোকে সাহায্য করতে চায়, চালু রাখতে চায় কাগজটা।

বিভূতি একটা নাম-করা বড়ো কাগজে চাকরি কবত। লেখক হিসাবেও তার খানিকটা নাম হয়েছে। সে যেচে এসে প্রস্তাব করে যে ওই কাগজটা ছেড়ে এসে কম মাইনেতে সে নন্দার কাগজে আরও বেশি খাটতে রাজি আছে।

কারণ, এ কাগজের সুরে সুর মিলিয়ে সে কাজ কবতে আনন্দ পাবে, মাছভাতের বদলে শাক-ভাত খেতে হলেও দেহমনে সে বাঁচার আনন্দ ভোগ করতে পারবে।

সুনীল প্রশ্ন করে, বিয়ে করেছেন ?

করেছি। নইলে চাকরির ধান্ধায় ঘুরি ? ঘরে বসে লিখতাম, আপনারা গিয়ে ধন্না দিতেন একটা লেখার জন্য।

ছেলেমেয়ে ?

দুটি ছেলেমেয়ে। বিয়ে করলে দুটো-একটা ছেলেমেয়ে হওয়া উচিত।

সুনীল হেসে বলে, উচিত কী অনুচিত তা জিজ্ঞাসা করিনি, এমনি জানতে চাইছিলাম।

বিভূতি বলে, আপনি জিজ্ঞাসা না করলেও অল্প আয়ে ছেলেমেয়ে হওয়া অনেকে অন্যায় মনে করে। ছেলেমেয়ে একেবারে বাদ দিলে বিয়ে করার কোনো মানে আছে ? মেয়েদের তো মোটেই নেই।

সুনীল তাকে সংবাদ-বিভাগের সম্পাদক করে দিয়েছে—মাইনে কমায়নি। ঠিক এই রকম একজন লোকেব তার বড়োই প্রয়োজন ছিল। কেবল যোগ্যতা নয়, নিজের কাজের জন্য যার দরদও থাকবে।

বলেছে, অন্যেরা ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে টাকায় ওকে কিনেছে, সে টাকাটা ওকে দিতেই হবে।

বিভূতির মতোই আরও একজন এসে জুটেছে তাদের কাগজে।

এ কাগজে কাজ করতে তারা উৎসুক, উদ্‌গ্রীব। ভবিষ্যৎ অজানা কাগজটার, কবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক নেই, সময়মতো নিয়মিত বেতনের পুরো টাকাটা পাবে কিনা সন্দেহ আছে, তবু তারা মহোৎসাহে এই কাগজে যেচে এসে খাটতে চায় !

এবং সুযোগ দিলেই প্রমাণ দেয় যে তারা শুধু কথার মানুষ নয়, কাজের মানুষও বটে।

সুনীলের তাই মনে হয়, সকলকে নিয়ে ঘরোয়াভাবে তাব একদিন বসা উচিত, কাগজের অবস্থাটা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

কাগজের নীতিটা পছন্দ হয়েছে বলেই সকলে কাগজটার জন্য প্রাণপাত করতে চাইবে এবং সেও কাগজের বাস্তব অবস্থা গোপন করে রেখে তাদের সহযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করবে—এটা উচিত নয়। সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে দু-তিনমাস পরে কাগজটা একেবারে বন্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

এ রকম কাগজের ভবিষ্যৎ আছে ভেবেই হয়তো ওরা এ কাগজে এত আগ্রহ নিয়ে কাজ করতে এসেছে—কাগজের অবস্থা যে অত্যন্ত কাহিল সেটা ওদের জানিয়ে না দিলে ওদের ঘাড় ভাঙার দায়ে সে দায়িক হবে।

বিভূতিকে সে বলে, কাগজটা ঠিকমতো চালাতে পারছি না। সকলকে ডেকে নিয়ে একদিন বসলে হত।

বিভূতি সংবাদের প্রুফ থেকে চোখ তুলে বলে, তাতে কী লাভ হবে ? সকলে বলবে যে আমাদের মাইনে আরও দশ-পনেরো টাকা কমিয়ে দিতে চান কমিয়ে দিন—আমরা কাজ করে যাব। এর বেশি আর কিছুই জানতে পারবেন না।

তবু সুনীল একদিন সকলকে ডেকে বৈঠক বসায়। দপ্তরি ইয়াকুবও বাদ যায় না।

সুনীল বলে, খোলাখুলি একটা আলোচনার জন্য আপনাদের ডেকেছি। আপনারা জানেন তো যে কাগজের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ?

সকলেই সায় দেয়।

সাব-এডিটর অল্পবয়সি শিশির বলে, এ সব কাগজের আর্থিক অবস্থা খারাপ হবেই।

নরেশ বলে, আমরা সেটা জেনেই এসেছি।

সুনীল বলে, আপনাদের জানানো উচিত মনে করি, কাগজের আর্থিক অবস্থা শুধু খারাপ নয়—খুবই খারাপ। আমরা নানাভাবে চেষ্টা করছি, দু-তিনমাসের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা না হলে হয়তো কাগজ বন্ধ করে দিতে হবে। আমি অবশ্য যদির কথা বলছি, কাগজ যে বন্ধ হবেই এমন কোনো কথা নেই—তবে সম্ভাবনার কথাটা মনে রাখবেন।

বিভূতি বলে, এ কাগজ বন্ধ হবে না। আপনারা না চালান, অন্যেরা চালাবে।

কাগজটা চালাতেই হবে, কেমন ?

নিশ্চয় !

প্রত্যেক মাসে লোকসান দিয়েও চালাতে হবে ?

বিভূতি তাড়াতাড়ি নিজেদের মধ্যে কথা চালিয়ে নেয়। নিচু গলায় নয়, কারণ সুনীলের কাছে গোপন করার কিছু ছিল না। একটা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পরস্পরের মতামত জেনে নেয়।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে যেন সভায় বক্তৃতা দিচ্ছে এমনিভাবে বিভূতি তার বক্তব্য জানায়। এভাবে বলার মানে সুনীল অবশ্য বুঝতে পারে। বিভূতি তার বক্তব্য কেবল তাকেই শোনাচ্ছে না, সকলের কাছে পেশ করছে। কারও যদি কিছু বলবার থাকে বলবে। বিভূতি বলে, লোকসানটা তারা সবাই ভাগাভাগি করে নিতে রাজি আছে। মাসিক খরচের একটা হিসাব যদি তাদের দেওয়া হয়, এলোমেলো মাথাভারী বেহিসাবি খরচ যদি না হয়, সহকারী সম্পাদক থেকে পিয়োন পর্যন্ত তারা সকলে মাইনের অনুপাতে মাসিক লোকসানটা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে।

বিভূতি এই বলে তার বক্তব্য শেষ করে : আপনারা বোধ হয় বুঝতে পারছেন অন্য কাগজে ভালো চাকরি পাব জেনেও কেন আমরা এ কাগজে লেগে থাকতে চাই ? আজ এই যে বৈঠক ডাকলেন, খোলাখুলিভাবে জানালেন কাগজ চালাতে লোকসান দিতে হচ্ছে, অন্য কাগজে এটা করত না, সে কাগজে ভাঁওতা দেওয়া হত যে কাগজের অবস্থা খুব ভালো, তবে বাবু বাইরে যাবার আগে চেক সই করে যাননি, তাই এ মাসের মাইনেটা সময়মতো পাচ্ছ না। বাবুর সই-করা চেকটা ডাকে আসছে, এলেই তোমরা মাইনে পাবে।

সুনীল বলে, কাগজটা আপনারা যে নিজের ভাবেন আপনাবা তারই আরেকটা পরিচয় দিলেন। লোকসান ভাগ করে দিলে খানিকটা সুবিধা হতে পারে কিন্তু কত আর লোকসান ভাগ করে নেবেন নিজেরা ? বিনা মাইনেতে খাটলেও সামাল দেওয়া যাবে না, আয় বাড়াতেই হবে।

সকলে চুপ করে থাকে।

সুনীল বলে, আরেকটা কথা বলি। কিছুটা লোকসান আপনারা আজ ভাগাভাগি করে নিলে, কোনোদিন লাভ হলে তার ভাগও আপনারা পাবেন।

অঘোরের চাকরিটা হাতে রেখে আর লাভ নেই। কাগজের সঙ্গে যেভাবে জড়িয়ে গেছে সুনীল, তাতে আর রেহাই পাবার কথা সে ভাবতেও পারে না। রেহাই পাওয়াটাই এখন দাঁড়িয়ে গেছে পরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

কাগজ আর বন্ধ করা যাবে না।

কাগজটা যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেই চেষ্টাতেই এবার তার জীবনপাত করতে হবে।

এদিকে রয়েছে সংসার চালাবার দায়।

কাগজ থেকে সে যত টাকা নেয় তাতে সংসার খরচ চালানো সম্ভব নয়। অঘোরের আপিসে সে যত টাকা বেতন পেত কাগজ থেকে তার অবশ্য তত টাকাই নেওয়ার কথা কিন্তু এখন সে তো আর চাকরি করে না কাগজে—সে এখন কাগজের লাভ-লোকসানের ভাগীদার।

বেতন নিয়ে যারা খাটছে তারা পর্যন্ত যখন কম টাকায় কাজ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত, বাড়ির জন্য প্রয়োজন বলেই কোন মুখে সে বেশি করে টাকা নেবে ?

অনিলকে সে বলে, তোমার তো পড়ায় মন নেই, গায়ের জোরে টেনে টেনে পড়ছ।

অনিল স্বীকার করে।—উৎসাহ পাই না। পড়ে কী লাভ হবে তাই ভাবি। চাকরির যা বাজার !

তাহলে কাগজেই কাজে লেগে যাও।

নন্দা শুনে হেসে বলে, স্বজন-শোষণ নীতি গ্রহণ করলেন নাকি ?

সুনীল বলে, উপায় কী ? নিজের ভাইকে যত কম টাকায় খাটাতে পারব অন্যকে তো তা পারব না।

নন্দা বলে, আমিও তাই বলছি। অন্য লোকে দেশেব লোকের টাকায় করে স্বজনপোষণ, আপনি নিজের কাগজে আরম্ভ করলেন ভাইকে শোষণ করা।

সনীল বলে, তাও নয়। ও অনর্থক আমাকে শোষণ করছিল, পড়ায় মন নেই, পড়াবার খরচটা যাচ্ছিল লোকসান। এখানে কাজও শিখবে, কিছু উপার্জনও করবে।

দেখা যায় সত্যই তাই। পড়াশোনা ভালো লাগছিল না কিন্তু কাগজে অনিল মহোৎসাহে কাজ আরম্ভ করে। মনে হয় কলেজে পড়া ছেড়ে দিয়ে সে যেন মুক্তি পেয়েছে। পরীক্ষা পাসের দুশ্চিন্তা যেন সত্যই একটা স্থায়ী কালো আবরণের মতো তার মুখে আঁটা হয়ে ছিল, কাগজে বেশি খাটুনি আরম্ভ করলেও কয়েক দিনের মধ্যে তার মুখ থেকে কালো পর্দাটা সরে যেতে দেখা যায়।

ভূপেশ কিন্তু রাগারাগি করে।

বলে, নিজে তুমি অনিশ্চিতের আশায় ভালো চাকরি ছেড়ে দিলে, বাড়ির লোকের কথা একবার খেয়ালও করলে না। ভাইটিকেও কলেজ ছাড়িয়ে তোমার কাগজে ঢোকাচ্ছ। কাগজ যদি তোমার না চলে তখন ও বেচারার কী উপায় হবে ? তুমি নিজে ডুববে, ওকেও ডুবিয়ে ছাড়বে।

সুনীল বলে, ভবিষ্যতের জন্য সে রিস্ক নিতেই হবে। পড়া ছেড়ে বসে থাকলে আলাদা কথা ছিল।

কিন্তু তোমার কাগজ যে চলবে তার ভরসা কী ? কত টাকা আছে তোমাদের ? কদ্দিন লোকসান টানবে ?

এ কাগজ বন্ধ হবে না। কাগজ থেকে একদিন শুধু লাভ করাটাই যদি উদ্দেশ্য হত তাহলে সে ভয় ছিল। সাধারণ লোকের স্বার্থের জন্য লড়াই করা এ কাগজের মূলনীতি, এ নীতির বদল হতে আমি দেব না। আমরা চালাতে না পারি, অন্যেরা এ কাগজ চালিয়ে যাবে।

তাতে তোমাদের কী লাভ ?

কাগজটা চলবে এটাই সবচেয়ে বড়ো লাভ। তাছাড়া, কাগজ যদি এখনকার নীতি বজায় রেখে চালানো হয়, আমাদের দুভাইকে নিশ্চয় তাড়িয়ে দেবে না। টাকার অভাবে কষ্ট হয়তো পেতে হবে কিন্তু সেই ভয়ে তো হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না !

এ সব কথা পছন্দ হয় না ভূপেশের, তার হিসাবে কোনো মানেই হয় না এ সব যুক্তিতর্কের তর্ক বন্ধ করে সে গজরগজর করতে থাকে।

অঘোরের আপিসে চাকরি করার সময়ও নানাদিক টানাটানি ছিল কিন্তু সেই আয়টা বন্ধ হবার পর এখন ভালো করেই টের পাওয়া যাচ্ছে অনটন কাকে বলে।

ছেলের খামখেয়ালে এই বয়সে এমন কঠিন অবস্থায় পড়ায় গা জ্বালা করে ভূপেশ এবং গৌরীর। গৌরী উঠতে বসতে নিজের পোড়া অদৃষ্টকে অভিশাপ দেয়।

আলপনা মাঝে মাঝে বুঝিয়ে তার গায়ের জ্বালা কমাবার চেষ্টা করে। অভাবের জ্বালা তার নিজের যদিও মোটেই কম নয়। বলে, তুমি এই সোজা কথাটা বুঝতে পার না মা ? পরে অনেক উন্নতি করবে বলেই তো দুভাই দুদিন একটু কষ্ট করছে। একটা ইংরাজি খবরের কাগজ ভালো করে চললে কত লাভ হয় হিসেব আছে তোমার ?

সাময়িকভাবে কথাটা মনে লাগে না গৌরীর এমন নয়, কিন্তু বেশিক্ষণ কথাটা তার মনে থাকে না।

আবার সে অদৃষ্টকে অভিশাপ দিতে শুরু করে। বলে, কপাল পোড়া না হলে কারও গর্ভে এমন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ছেলে জন্ম নেয় ! খেয়ালের বশে ছেলে চাকরি ছাড়ে, বাড়িতে মাছটুকু-দুধটুকু আসা বন্ধ হয়, ছেঁড়া কাপড় পরে দিন কাটাতে হয় মা-বোনকে !

কল্পনা মাঝখানে আরেকদিন এসেছিল। সেও সংসারের অবস্থা দেখে সুনীলকে অনেক অনুযোগ দিয়ে গেছে।

সুনীল বলেছে, তুই নিজেকে সামলা তো, আমাদের জন্য তোর মাথা ঘামাতে হবে না। প্রণবের সঙ্গে ঝগড়া কমিয়েছিস তো ?

তোমার ওই এককথা !

বেশির ভাগ দিন, রাত্রে সুনীলের বাড়ি ফেরা হয় না, সকালে বাড়ি আসে। অনিলও সপ্তাহে তিন-চাররাত্রি ডিউটি করে। মুখে শ্রান্তি উদ্‌বেগের ছাপ না পড়ুক দেখে বুঝা যায় দুজনে তারা রোগা হয়ে গেছে।

মায়া বলে, নিজেদেব আপিসের এই এক জ্বালা—অতিরিক্ত খাটতে হয।

সুনীল বলে, টাকা থাকলে লোক রেখে খাটানো যায়।

মায়া জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, কদ্দিন লাগবে কাগজটাব দাঁড়াতে ?

সার্কুলেশন বাড়ছে হু হু করে। সে জন্য আবার টাকার দরকাব। টাকা থাকলে এক বছরেই দাঁড় করিয়ে দিতে পারতাম। কিছু টাকা ধার করার ফিকিরে আছি।

কত ?

হাজার কয়েক।

ও বাবা ! তুমি এখন কাগজের মালিক, হাজার ছাড়া কথা কও না।

১৩

জরিমানার মোটা টাকা দিতে নন্দা প্রায় ফতুর হয়ে গিয়েছিল। প্রদ্যোত জেল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তার টাকা শেষ হয়ে যায়।

অথচ এদিকে কাগজটার চাহিদা বেড়েছে প্রচুর, বেরোনো মাত্র হু হু করে বিক্রি হয়ে যায়। বেশি সংখ্যায় কাগজ ছাপাবার জন্য আবার বেশি করে টাকা ঢালা দরকার।

সুনীল অনেক চেষ্টা করে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে হাজার আষ্টেক টাকা ধার সংগ্রহ করেছে। বাঁধা রাখতে হয়েছে কাগজটিরই গুডউইল।

ভদ্রলোকের নাম হেমন্তবাবু। পয়সাওলা লোক, একটি বড়ো প্রেস এবং একটি সাপ্তাহিক কাগজ আছে। তার একটি চালু দৈনিক কাগজের মালিক হবার সাধ। ওই আশা মনে রেখেই সে ঋণের টাকাটা জুগিয়েছে।

টাকা ফেরত পাওয়ার বদলে সুনীলরা কাগজটা তার হাতে তুলে দিক, এটাই হেমন্ত আশা করে।

বিভূতি যে জোর গলায় বলে কাগজটা কখনও বন্ধ হবে না, তারা না চালালে অন্যেবা কাগজ চালাবে, সেটা মিথ্যা নয়। সুনীলের পবিচালনাধীনে আসবার পর অল্পদিনের মধ্যে যে রকম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কাগজটা তাতে অনেকেরই টনক নড়েছে।

ভবিষ্যৎ আছে কাগজটার।

বেশি দূর-ভবিষ্যৎও নয়। যথেষ্ট টাকা নেই বলেই কাগজটার উন্নতি ঠেকে আছে—টাকা থাকলে অবিলম্বে সার্কুলেশন দ্বিগুণ করে দেওয়া যেত।

লোকে টাকা দিতে চায়। অঘোরের মতো আরও অনেকেই কাগজটার পিছনে টাকা ঢালতে উৎসুক।

প্রস্তাবও পাঠিয়েছে কয়েকজন।

কিন্তু মুশকিল এই, প্রতিদানে তারা মালিকানার বড়ো অংশ চায়, কাগজটার উপর সম্পূর্ণ কনট্রোল চায়।

নন্দা বলে, না। আপনাকে অংশ দিয়েছি কাগজটা চালাবাব জন্য। কাগজ আমি মরে গেলেও অন্য লোককে বিক্রি করতে পাবব না।

সুনী৹' বলে, কিন্তু সামনে যে বিপদ দেখতে পাচ্ছি ? হেমন্তবাবুর টাকা শোধ দেবার সময় এগিয়ে আসতে আসতে আরও কিছু টাকা ঢালার দরকার হবে—ওদিকে হেমন্তবাবুর টাকাও শোধ করে ফেলতে হবে।

নন্দা নির্বিকারভাবে বলে, সে ব্যবস্থা আপনি কববেন। এমনিই আপনাকে মালিকানা দিয়েছি নাকি কাগজটার ?

সুনীল শান্তভাবেই বলে, সহজে ছাড়ব ভাববেন না। সর্বদা ওই চিন্তাই করছি। লম্বা মেয়াদে মোটা একটা টাকা জোগাড় করতে পাবলে আব ভাবনা থাকে না। সে কথা ভেবেই হেমন্তবাবুর কাছে এত অল্প মেয়াদে টাকাটা নিয়েছি—ঠেকনো দেওযার জন্য। লম্বা মেয়াদে টাকা পেলেই ওই টাকাটা ফেলে দেব। লম্বা মেয়াদে টাকাটা পাওয়াই এখন সমস্যা।

প্রদ্যোত বলে, পাওয়া যাবে মনে হয। খুব নাম হয়েছে কাগজটার।

সুনীল বলে, ওটাই তো আমাদের আসল মূলধন। এতদিন ওটাই বাড়াবাব চেষ্টা কবেছি। আমি জানতাম ওই মূলধনটি আগে বাড়িয়ে না নিলে টাকাব মূলধনও জোগাড় করা কঠিন কাজ হবে।

মায়া একদিন সন্ধ্যার পর একটু রাত করেই কাগজের আপিস ঘুরে দেখে যায়।

কর্মব্যস্ত মানুষগুলির মধ্যে সুনীলের কর্মব্যস্ততা লক্ষ করে সে আজ অনুভব করে, সুনীল কেন সেদিন অত বড়ো একটা গুরুতর কথা তুলেও একেবারে চুপ হয়ে গেছে।

অন্য সকলে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সুনীল যেন একেবারে মশগুল হয় ডুবে গিয়েছে তাব কাজের মধ্যে। তার কাছে যেন ছোটো কাজ বড়ো কাজ নেই, সাধারণ সংবাদ ও বিশেষ সংবাদ বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পার্থক্য নেই গুরুত্বের হিসাবে, তার কাগজে যা ছাপা হবে তার প্রতিটি লাইন তার কাছে মহামূল্যবান।

ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দ সব কিছু তার আশ্রয় করেছে কাগজটিকে। কাগজের চিন্তার তলে তার মধ্যে চাপা পড়ে গেছে মায়ার চিন্তা।

বিভূতি শিশির আর প্রদ্যোতের সঙ্গে সুনীল পরদিনের সম্পাদকীয় নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা করে আর মায়া তাদের কথা শুনতে শুনতে সুনীলের মুখের দিকে চেয়ে ভাবে, সত্যই কি মানুষটার হৃদয় নেই ?

কিন্তু যার হৃদয় নেই একটা কাগজকে সে এমনভাবে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে কী করে ?

আলোচনা শেষ করে বিভূতিরা নিজের আসনে ফিরে চলে গেলে মায়া বলে, এলাম যখন, আপনাদের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে যাই।

সুনীল বলে, পয়সা লাগবে কিন্তু।

মায়া বলে, তা জানি। তুমি কি আর আমাকে রেয়াত করবে !

সুনীল বলে, রেয়াত করতে পারি। একটা কাজ করবে ?

কী কাজ ?

তোমার স্কুলের বিষয়ে সংক্ষেপে একটা আর্টিকেল লিখে দাও—রবিবারের কাগজে ছাপব। কী ভাবে স্কুলটা আরম্ভ হল, কী ধরনের ছেলেমেয়ে শর্টহ্যান্ড, টাইপরাইটিং শেখে—ইংরাজিতে লিখতে পারবে তো ?

মায়া হেসে বলে, তা কলম-টলম ভেঙে চেষ্টা করলে পারব বইকী।

এমনি বিজ্ঞাপনের চেয়ে এই আর্টিকেলটা ঢের বেশি এফেকটিভ বিজ্ঞাপন হবে। আর্টিকেলটার পারিশ্রমিক বাবদ তোমার স্কুলের বিজ্ঞাপন আমরা এক হপ্তা বিনা পয়সায় ছেপে দেব। খুব ছোটো বিজ্ঞাপন কিন্তু, দু-ইঞ্চির বেশি নয়।

মায়ার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না।

মানুষ ও জীবনের কী বিচিত্র সমাবেশ ঘটে একটা খবরের কাগজের আপিসে !

সুনীলের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা হয় না তার, কথা বলার সময়ও নেই সুনীলের। কিন্তু নানা শ্রেণির নানাপ্রকৃতির নানাঅবস্থার মানুষেরা যে ভিড় করে আসছে সুনীলের কাছে, কেউ দাপটে কথা কইছে, কারও কথা বিনয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে এবং সুনীল সকলকেই সামলে চলছে—জীবনের এক বিস্ময়কর নতুন নাটকের মতো মনে হয় মায়ার কাছে ব্যাপারটা।

রাত নটার সময় মায়া উঠবে উঠবে ভাবছে অঘোর পর্যন্ত হাজির হয় কাগজটার আপিসে, সুনীলের সম্পাদনা-পরিচালনার ছোটোখাটো আপিসঘরে গিয়ে বসে। দেখেই টের পাওয়া যায় মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে অঘোরের। সুনীল তার আপিসের সাড়ে তিনশো টাকার চাকরি ছেড়েছে, তার কাছে আর্থিক সাহায্য পাবার আশা ছেড়েছে, নিজে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করার বদলে তাকে তার আপিসে আসতে বাধ্য করেছে। এ কী সোজা অপমান অঘোরের ? মুশকিল এই যে, সময়-সময় মান-অপমানের হিসাব রাখলে তার চলে না।

কারবারটা তো চালিয়ে যেতে হবে তাকে।

এ বাজারে কারবারে লাভ তুলতে হলে মান-অপমানের হিসাব ভুলে যেতেই হয়।

ভাবের আবেগে একজন জুতো মারবে। জুতো খেয়ে তাকে দিয়ে যদি হাজার খানেক মুনাফার ব্যবস্থা সম্ভব হয়, জুতো না খেয়ে অঘোরের উপায় কী ?

অঘোর জাঁকিয়ে বসে। সুনীল বর্মা চুরুট এগিয়ে দিলে সেই চুরুট একটা ধরিয়ে কয়েকবার কেশে সে জিজ্ঞাসা করে, কাগজ তো ভালোই চলছে শুনলাম ?

সুনীল বলে, সুনাম আর সার্কুলেশনের হিসাবে খুব ভালোই চলছে।

অঘোর বলে, প্রতিভা নিজের রাস্তা খুঁজে নেবেই। প্রতিভাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। কিন্তু আবার সস্তা কাজেও লাগানো হয় কিনা, সেই জন্য আমার গা জ্বালা করে।

সুনীল জিজ্ঞাসা করে, সস্তা কাজে ? কী রকম সস্তা কাজ ?

অঘোর বলে, ব্যাবসাতেই দেশের সম্পদ বাড়ে, তুমি দেশের ব্যাবসাবাণিজ্য ঘায়েল করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ। আমি তোমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপি, আজকের কাগজে আমার ব্যাবসাকে গাল দিয়েছ।

সুনীল এই প্রথমবার সকাল থেকে সেজে-রাখা পান থেকে একটু মুখে দিয়ে, সিগারেটের একটা প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে হাতে নিয়ে শান্তভাবে বলে, আপনি এটা গায়ের জোরে বানিয়ে কথা বললেন। আপনাকে সেদিনও স্পষ্ট বলেছি, গাল দেওয়াটাই আমাদের কাগজের নীতিবিরুদ্ধ। গাল দিয়ে সমাজের রাষ্ট্রের রোগ সারানো যায় না, ববং নিজেদের খেলো হতে হয়। আমরা সমালোচনা করি। তাছাড়া, বিশেষভাবে আপনার ব্যাবসার বিরুদ্ধে তো কোনো কথা লেখা হয়নি ? আপনার ব্যক্তিগত ব্যাবসার সঙ্গে নয়, আপনাদের ব্যাবসা করার সিস্টেমটার সঙ্গেই আমাদের বিবাদ বেধেছে। আমরা সিস্টেমটার সমালোচনা করেছি, আপনার মনে হয়েছে আপনাকে বেছে নিয়ে গাল দিয়েছে।

বটে নাকি ?

নিশ্চয়। আপনি তো শুনবেন না, বুঝবেন না।

তোমাব মুখে একটু শুনি, বুঝবার চেষ্টা করি, কাল হয়তো কাগজে আমার নামে যাচ্ছেতাই গালাগালি ছাপিয়ে দেবে।

সুনীল ফস করে সিগারেটটা এবার ধরিয়ে ফেলে।

বলে, অত সস্তা কাগজ নয় আমাদের। ধরুন, আপনার সঙ্গে বিজনেস প্রতিযোগিতায় নেমেছে আরেকজন, তাকে গাল দিয়ে আপনার কাছে কিছু টাকা-পয়সার আশা আমরা করব না।

সিগারেটে জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সুনীল বলে, দরকার হলে আমরা আপনার সমালোচনাও করব। কাগজে চোরাবাজারের বিবরণ দেব তিন কলম, চারের কলমে দেখিয়ে দেব আপনি কেমন ধরনের চোরাকারবার করেন।

সুনীল আবার জোরে সিগারেট টেনে বলে, আমি জেনে গেছি, এ কাগজটা বন্ধ করার জন্য আপনি কোথায় কোথায় কাব কার কাছে ছুটোছুটি করেছেন। আমার কিছুই জানতে বাকি নেই। টাকা দিয়ে কাগজটা কিনতে না পারার রাগে আপনি আমাদেব সঙ্গে শত্রুতা করছেন। শত্রুতা আমিও কবতে পারি, কিন্তু আপনার আপিসে কাজ করে যে সব সিক্রেট জেনেছি, সে সব কাজে লাগানো হীনতা হবে, তাই চুপ করে আছি। ক্ষতি আমাদের বিশেষ কিছু করতে পারবেন না। গায়ের জ্বালায় আপনি বাঁদর নাচছেন খেলোয়াড়দেব হাতে।

বাঁদর নাচছে ! অঘোর বাঁদর নাচছে ! এই সেদিন পর্যন্ত অঘোরের নীতিবর্জিত মুনাফা নীতির চোরা প্রক্রিয়াব ব্যাবসায়ে সক্রিয় অংশ নেবার জন্য মাসিক সাড়ে তিনশো টাকা পেয়ে এসেছে সুনীল, আজ সে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাঁকা দেড় কলম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখছে।

টেবিলের এক কোণে পিছনে বসে মায়ার কিন্তু মনে হয় একটু বোকামি করছে সুনীল, সস্তা বাহাদুরি করার ঝোঁকে অঘোরের মধ্যে অকারণে শত্রুতা সৃষ্টি করছে। অঘোরের মতো খেলোয়াড় খেলোয়াড়দের হাতে বাঁদর নাচছে, এ কথাও মুখের উপর বলছে জোর গলায়।

আরও বেশি ব্যক্তিগত আক্রোশ জাগবে অঘোরের।

অঘোরের কথাবার্তা শুনলেই বুঝতে পাবা যায় যে সে খবরের কাগজটা সম্পর্কে দাঁও মারার ফিকিরে এসেছে। আজ কাজ হাসিল না হলেও কিছু আসে যায় না। নিজের আপিসের বেতনভোগী কর্মচারী সুনীলের কাছে এভাবে তার নত হয়ে আসার মানেই হল এই যে সে জানে সুনীলের ব্যাবসা-বুদ্ধির মধ্যে ছেলেমানুষির ভেজাল আছে অনেকখানি।

নীতির জন্য আদর্শের জন্য সে অনেক কিছু বাস্তব সুবিধা বলি দিয়ে মনে করতে পারে যে খুব লাভ করলাম, জিতে গেলাম।

ছেলেমানুষ আদর্শবাদীদের ঘাড় ভাঙবার জন্য অনেক পাকা পাকা লোক যে চারিদিকে ওত পেতে থাকে, তাও অঘোরের অজানা নেই। এইটাই তার আসল ভয় সুনীল সম্পর্কে। তার আপিসে

চাকরি না করুক, দেনাপাওনার সম্পর্ক তাদের মধ্যে স্থগিত হয়ে গিয়ে থাক, একটা ঘনিষ্ঠতা তো সুনীলের সঙ্গে তার সৃষ্টি হয়ে আছে। অনেক কাল ধরে অনেক ধৈর্য আর ক্ষমা দিয়ে তাকেই তো গড়ে তুলতে হয়েছে এই ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক।

আজ তাকে ডিঙিয়ে যদি অন্য কেউ সুনীলের আদর্শবাদিতার সুযোগ নিয়ে তাকে বাগিয়ে বসে, নিজেকে অঘোর কোনোদিন ক্ষমা করতে পাববে না।

সুনীল কাত হবেই। শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যাবেই তার আদর্শবাদিতার এই চবম প্রচেষ্টা। কাগজটা তার বাগিয়ে নেবেই কোনো একজন পয়সাওলা বাস্তববাদী ব্যবসায়ী মানুষ।

একটু নত হয়ে নিজেই সুনীলের আপিসে এসে তার সঙ্গে আগেকার গড়ে তোলা আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে কাগজটা বাগাবার পথ সাফ করে বাখলে দোষটা কী ?

সুনীল নিজেই তো জানে না কীভাবে কোন ফাঁদে সে ধরা দেবে। কোন মুখোশ পরে কে আসবে তার কাছে, কীভাবে তার বিশ্বাস জন্মাবে যে ইনি একজন খাঁটি মানুষ, নিরুপায় হয়ে অগত্যা এর কাছে আত্মসমর্পণ করাই ভালো।

না। তা হতে পারে না। অঘোর তা হতে দিতে পারে না। সুনীলের আদর্শবাদী প্রতিভাও তারই সম্পত্তি ! নিজের আপিসে দায়িত্বপূর্ণ চাকরি দিয়ে সেই সাহায্য করেছে বাঁচিযে রেখেছে তার এই প্রতিভাকে।

একমাত্র তারই অধিকার আছে তার প্রতিভার বিকশিত ফুলটিকে ফলটিকে গ্রাস কবার।

সুনীলের মন্তব্যে অঘোর রাগে না দেখে মায়া তাই অবাক হয়ে যায়।

অঘোর মুখ গম্ভীর করে বলে, এটা তুমি অত্যন্ত অন্যায় কথা বললে, আমাকে অপমান কবার জন্য বললে। আমি কি কাগজটা বন্ধ কবতে চাই ? না, এমনি বোকাহাবা মানুষ আমি যে সে চেষ্টা করতে গিয়ে অন্যের হাতে বাঁদর নাচব ?

সুনীল বলে, কাগজটা আপনি কিনে নিয়ে কনট্রোল কবতে চান। আপনি অন্যভাবে সে চেষ্টা করছেন—আমাদের কাবু করে বাগে আনতে চাইছেন।

অঘোর টেবিলে চাপড় মেরে বলে, তবেই দ্যাখো তোমাদের আদর্শের মধ্যে কত গলদ। দবকার হলে তোমরা আমাকে খোঁচা দেবে, আমি টাকা দিতে চাইলেও আমাকে ডিঙিয়ে হেমন্তের কাছে টাকা ধার করবে, আর আমি ব্যাবসাযী মানুষ, আমার মেথডে কাগজটা কিনবার চেষ্টা কবলে তোমবা বলবে সেটা আমার অন্যায় ' তোমরা আমায় কাগজটা বেচবে না, আমি কাগজটা কিনবার জন্য ফন্দি ফিকির খাটাব, এ তো ক্লিন কম্পিটিশন ! কেউ যাতে তোমাদের টাকা ধার না দেয়, হেমন্ত যাতে টাকার জন্য চাপ দেয়—সে চেষ্টা করাব মরাল রাইট আমাব পুরোমাত্রায় আছে !

এবার সুনীল একটু হাসে। আর তর্ক করে না।

মায়া এবার মুখ খোলে, বলে, আমাব একটা নালিশ আছে অঘোরবাবু !

নালিশ ?

মায়া বলে, একটা স্কুল চালিয়ে সংসার চালাচ্ছি, সেটাও কী চালাতে দেবেন না আমাকে ?

অঘোর চমকে ওঠে।

অঘোরের হৃৎপিণ্ডের পুরানো রোগটা যেন সুযোগ পেয়ে তাকে অবশ করে রাখে কয়েক মুহূর্তের জন্য।

মায়া বলে, স্কুলের কজন ছেলে নালিশ করেছে, আপনার আপিসে নাকি চাকরি করা দায়—আপনি ছ-মাস অ্যাপ্রেন্টিস খাটিয়ে ওদের বিদায় করে দিচ্ছেন। স্কুলটা তাহলে বন্ধ করে দি ?

অঘোর বিব্রতভাবে বলে, কাজ করতে পারলে আমি কি সহজে কাউকে ছাঁটাই করি ?

মায়া বলে, আপনি কী করেন না করেন আমি কী করে জানব বলুন ? ছোটোখাটো স্কুল—বছরে মোটে কয়েকজন ছেলেকে সার্টিফিকেট দিতে পারি যে হ্যাঁ, তুমি যে কোনো আপিসে কাজকর্ম করতে পারবে। আপনি আমার স্কুলের পাঁচ-ছটি ছাত্রকে ছ-মাস ধরে অ্যাপ্রেন্টিস খাটিয়ে বিদায় করেছেন। ছ-মাস অ্যাপ্রেন্টিস খাটার জন্য কে কার গরজে আমার স্কুলে শিখতে আসবে বলুন ?

সুনীল ডাকে, অভয়।

অভয় দরজার কাছেই ছিল, ভিতরে এসে সে বলে, কী বলছেন ?

সুনীল বলে, বিভূতি-শিশির-প্রদ্যোতবাবুদের আসতে বলো। আজ এডিটোরিয়েলটা বদলে যাবে।

অঘোর নিশ্বাস ফেলে বলে, শেষ পর্যন্ত আমাকে গাল দেওয়াই ঠিক করলে ? সুনীল আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, আপনাকে গাল দেব ? কেন ? আপনাকে গাল দিয়ে লাভ কী হবে ? আপনি বরং খানিকটা পাবলিসিটি পেয়ে যাবেন। আমরা আজ আবোল-তাবোল ছাঁটাই করার প্রতিবাদ করব। যে কোনো ইয়ংম্যানকে ছ-মাস অ্যাপ্রেন্টিস খাটিয়ে আপনারা তাড়িয়ে দিতে পারেন, পুরানো পাকা লোককে যখন খুশি যে কোনো অজুহাতে তাড়াতে পারেন, শক্ত আইন করে আপনাদের এ অধিকার কেড়ে নিতে হবে। অন্য আপিসে অন্যায় ছাঁটাইয়ের আরও কয়েকটা উদাহরণ জানি, সেই সঙ্গে আপনার আপিসের ছাঁটাইটারও উল্লেখ করব।

অঘোর রেগে বেরিয়ে যায়।

অঘোর চলে যাবার পর সুনীলকে প্রথমবার একা পেয়ে প্রায় মায়া ধমকের সুরে বলে, এখনও তোমার ছেলেমানুষি গেল না ? ছি !

মায়ার গলায় এমন কড়া আওয়াজ সুনীল অনেকদিন শোনেনি। সে আশ্চর্য হয়ে বলে, কী বলছ ?

বলছি লোকের সঙ্গে এত বাহাদুরি করা কেন ? নিজের রীতিনীতি, কাগজটার রীতিনীতি, সব ফাঁস করে দেওয়া হল মানুষটার কাছে। অত কথা বলার কী দরকার ছিল তোমার ? তোমার কথার আসল মানে বুঝবে ও মানুষটা ? ভদ্রলোক যেচে তোমার কাছে এসেছে নিজের স্বার্থে, তোমার অবস্থাটা নিজে যাচাই করাই ওর উদ্দেশ্য। কী দরকার ছিল তোমার অত বড়ো বড়ো কথা বলে বড়াই করার, নিজেকে জাহির করার ? ঠিক যেন কচি খোকার মতো করলে, ঘরের কথা শত্রুর কাছে ফাঁস করে দিলে। ভদ্রলোক তোমাকে এতটুকু বাহাদুর ভাববে মনে করেছ ?

সুনীল মন দিয়ে তার কথাগুলি শোনে। তার তিরস্কার যেন মাথা পেতে নিয়েছে এমনিভাবে বলে, উনি আমার কী করবেন ?

মায়া বলে, এটাই তোমার ছেলেমানুষি। কিছু করতে পারুন না পারুন, শত্রু বাড়াবে কেন তুমি মিছিমিছি ? উনি কিছু করতে পারবেন না, তাই বা কী করে জানলে তুমি ? আমার তো মনে হয় উনি আজকালের মধ্যেই উঠে-পড়ে শত্রুতা আরম্ভ করবেন, দু-চারদিনের মধ্যে দেখতে পাবে কাগজ চালাতে যাদের সঙ্গে কারবার করতে হয় তাদের ব্যবহার কেমন বদলে যাচ্ছে ! চাপ দেবার ব্যবস্থা করবেন। আমি বলে রাখছি, কাগজওলা, ছাপাখানার মালিক, যারা বিজ্ঞাপন দেয়, পাওনাদার সবাই হঠাৎ অভদ্রতা আরম্ভ করে দেবে। তুমি যখন চোখে সর্ষেফুল দেখতে আরম্ভ করবে, উনি এসে কাগজটা কিনে নিয়ে তোমায় বাঁচিয়ে দিতে চাইবেন !

সুনীল বলে, সে তো বুঝলাম, ওটা উনি অনেকদিন থেকেই চাইছেন। কিন্তু আমি তো আজ নতুন কথা কিছুই বলিনি ? কয়েকদিন আমাদের কাগজ পড়লেই বোঝা যায় আমরা কী নীতি ধরেছি। সেটাই আমি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলেছি অঘোরবাবুকে।

মায়া বলে, কাগজ পড়ে জানা আর তোমার মুখে শোনার মধ্যে অনেক তফাত। কাগজে তুমি কী উদ্দেশ্যে কী নীতি খাটাচ্ছ তা তো সব লোকে জানবে না ? অঘোরবাবুর মতো লোকেরা ধরেই নেবে একটা কোনো মতলব হাসিল করার জন্য তুমি একটা নীতি ধরেছ, দরকার হলে অদলবদল করবে। কিন্তু তোমার মুখ থেকে শোনা মানেই উনি জেনে গেলেন ওই নীতিটা আঁকড়ে থাকাই তোমার উদ্দেশ্য।

সুনীল ভুরু কুঁচকে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মায়া আবার বলে, এই নীতি তুমি কিছুতে ছাড়বে না, ওঁর সঙ্গে কোনোমতেই আপস করবে না, এটা আজ উনি পরিষ্কার স্পষ্টভাবে জেনে গেলেন। তুমি কতটা শক্ত হবে এটা ওর ধারণা ছিল না। তুমি আজ ভেতরের কথা ওর কাছে ফাঁস করে দিলে।

সুনীল বলে, তোমার কথাটা মানতে হচ্ছে।

কাজেই ছেলেমানুষি করলে না ? ওর নানারকম খটকা ছিল, কতটা চাপ দিতে হবে জানতেন না, আজ জেনে গেলেন আপসে কিছু হবে না, তোমাকে ভাঙতেই হবে।

তোমার তো খুব ধারালো বুদ্ধি !

ধারালো বুদ্ধি নয়। এ সব সাধারণ সাংসারিক জ্ঞান ছাড়া মেয়েমানুষের চলে না। বাড়ি ফিরবে না আজ ?

ফিরব। চলো তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি। আজ বাড়ি গিয়ে একচোট ঘুমোব। টাকার চিন্তাটাকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছি।

ট্রামে-বাসে তখন ভিড় কমেছে। মায়ার পাশে বসে সুনীল বলে, ছ-মাসের মধ্যে মোটর গাড়িতে বাড়ি ফিরব।

তাই নাকি !

নিশ্চয়। তার মানে কিন্তু ধরে নিয়ো না যে খুব বড়োলোক হয়ে যাব বলছি। কাগজ চালাবার জন্যই গাড়ি দরকার হবে। হবে কেন—হয়েছে। সময়ের দাম সম্পর্কে আমার নতুন জ্ঞান জন্মে গেছে।

সময়ের দাম সম্পর্কে নতুন জ্ঞান ?

আগে ধারণা ছিল, যে খুব কাজ করে, প্রাণপাত করে খাটে, তার কাছেই সময় হয় দামি। এখন দেখছি ও ধারণাটা ভুল। সময়ের দামটাও কাজের দামের ওপর নির্ভর করে। খাটুনিটা আসল নয়, কাজের কোয়ালিটিটাই আসল কথা। যার দায়িত্ব যত বেশি, যার কাজের ওপর যত বেশি লোকের কাজ নির্ভর করে, তার সময়ের দাম তত বেশি।

মায়া একটু হেসে বলে, এতদিনে জানলে এটা ? কাজ তো ছোটোবড়ো, উঁচুনিচু হয় না—একমাত্র দায়িত্ব দিয়েই কাজের বিচার চলে।

মায়া কি আশা করছিল, বাস থেকে নেমে বাড়ির পথটুকু একসঙ্গে হেঁটে যাবার সময়, তাদের নিজেদের কথাটা খেয়াল হবে সুনীলের ?

কিন্তু আশা করে সে এমন অস্বস্তি বোধ করে কেন ! কেন তার মনে হয় যে এই সুযোগে আজ সুনীল কথাটা পাকাপাকিভাবে ঠিক করে ফেলতে চাইলে সে মুশকিলে পড়ে যাবে ?

এখনও সে সব দ্বিধা কাটিয়ে অতখানি মনস্থির করে ফেলতে পারেনি।

সেদিনের আলোচনার পর সে ভেবেচিন্তে দেখেছে বিয়ের পর যতই তারা চেষ্টা করুক—যে যেমন আছে তেমনি থাকতে, সেটা সম্ভব নয়।

১৪

বাড়ি গিয়ে এতরাত্রে নবীনকে দেখে সুনীল একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। আলপনার সঙ্গে সেদিন নবীনকে নিয়ে তার কথা হবাব পর কেটে গেছে অনেকগুলি দিন, নবীন তার সঙ্গে কথা বলতে আসেনি।

ক্রমে ক্রমে ক্রুদ্ধ ও গম্ভীর হয়ে উঠছিল আলপনার মুখ।

সুনীলের সামনে মাঝে মাঝে তার মুখ লাল হয়ে যায়। দাদার কাছে লজ্জা আর অপমানেই নিশ্চয় ! সেদিন সে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিয়েছিল নবীনের প্রতিজ্ঞা, বড়াই করে বলেছিল, নবীনকে দিয়ে সে দাদাব সঙ্গে কথা বলাবে।

এবং সুনীল অনুমান করছিল শীঘ্রই নবীনের একদিন তার কাছে আবির্ভাব ঘটবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য। কিন্তু রাত্রে সে আজকাল সব দিন বাড়ি ফেরে না জেনেও এতরাত্রে নবীন এসে তার জন্য অপেক্ষা করবে এটা সে ভাবতে পারেনি।

কথা সে নিজেই আরম্ভ করে।

কী খবর নবীন ?

বিভাদি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। কখন বাড়ি থাকেন জানতে এসেছিলাম। কাল সকালে আসতে বলব ?

নবীন সহজভাবেই কথা বলে। জীবনে কোনোদিন কথা বলবে না ঘোষণা করে কয়েক মাস সত্যই সে যে বাক্যালাপ বন্ধ রেখেছিল সুনীলের সঙ্গে, সেটা টেরও পাওয়া যায় না। আজ প্রথম নতুন করে কথা আরম্ভ করবার সময় একটু সংকোচ বোধ করা তার পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হয় কথা বলাটা সুনীলের উপর যেন তার অনুগ্রহ !

সুনীল বলে, বিভার আসতে হবে না। কাল আমি ওদের বাড়ি যাব।

নবীন বলে, বিভাদি আপনাকে জানাতে বলেছে যে আপনি যদি যান এগারোটার পরে যাবেন। --অঘোববাবু আপিস চলে যাবার পর।

কেন ?

তা কিছু বলেনি।

আলপনার সঙ্গে দেখা না করেই নবীন বিদায় নেয়।

ভেতরে গিয়ে আলপনা শুয়ে পড়েছে শুনে সুনীল ব্যাপারটা বুঝতে না পেবে আরও আশ্চর্য হয়ে যায়।

তার খাতিরে নবীন আজ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কবতে এসেছে, তাকে বাইরে বসিয়ে রেখে আলপনা শুয়ে পড়েছে।

আলপনা বোধ হয় জানে না নবীন আজ তার মান রাখার জন্য এসেছে, তার কাছে বোধ হয় নবীন প্রতিজ্ঞা ভাঙতে রাজি হয়নি, পরে ভেবেচিন্তে মত পরিবর্তন করেছে।

রাগে অভিমানে আলপনা হয়তো নবীনের সঙ্গে দেখাও করেনি, নবীন তার মান রাখতে এসেছে না জানায়, কথাও বলেনি।

সে খেতে বসলে আলপনা উঠে আসে।

নবীন নিজে থেকে কথা বলেছে নাকি তোমার সঙ্গে ?

বলেছে। নিজে থেকে নয়, আমিই আগে বলেছি। সেটা কিন্তু ওর দোষ নয়, আগে কথা বলার সুযোগটাই বেচারা পায়নি। তোদের কী হল ? ঝগড়া হয়েছে নাকি ?

আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে।

কেন ?

তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে জোর করেছি যে।

বাঃ ! চমৎকার ব্যাপার তো তোদের !

আলপনা মুখ বাঁকায়।

সুনীল হেসে বলে, দাদার বদলে বোনের সঙ্গে কথা বন্ধ করে ও নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে চায় নাকি? প্রতিজ্ঞার ব্যাপারেও প্রকসি চলে ?

আলপনা বলে, কথা আমাদের বন্ধ হতই।

কেন ?

তোমার সঙ্গে কথা না বললে আমি ওর সঙ্গে কথা বন্ধ করতাম—করতাম কী, করেছিলাম।

পরদিন বারোটা নাগাদ অঘোরের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে সুনীল ভাবে, কাল অঘোরের সঙ্গে সংঘর্ষের পর আজ বোধ হয় তার বাড়িতে তার না যাওয়াই উচিত ছিল। অঘোরের বাঁকা মন কী ভেবে বসবে কে জানে !

বিভা তার বাড়িতে গেলেও অঘোর অবশ্য খবর পেত কিন্তু সেটা হত আলাদা ব্যাপার। তার সঙ্গে বিভার তো বিবাদ হয়নি !

বিভার মুখখানা এত বেশি ম্লান দেখায় যে সুনীলের মনে হয় তার বুঝি জ্বর এসেছে।

জ্বর গায়ে বসে আছ কেন ?

জ্বর কে বললে ?

মুখ দেখে মনে হচ্ছে।

বিভা মাথা নেড়ে বলে, জ্বর-টর হয়নি। খুব জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে।

সুনীল সিগারেট ধরিয়ে নীরবে প্রতীক্ষা করে।

বিভা বলে, তোমাকে নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেল।

ব্যাপার কী ?

কাল বাবা বাড়ি এসে যা-তা বলতে লাগলেন তোমার নামে। তোমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তুমি নাকি উচ্ছন্নে যেতে বসেছ, কাগজটা খুব ভালো দাঁড় করানো যেত কিন্তু তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেছে বলে তুমি কাগজটার ভবিষ্যৎও নষ্ট করছ, নিজেরও সর্বনাশ ডেকে আনছ। শুনতে শুনতে এমন রাগ হয়ে গেল আমার। আমি তোমার দিকে টেনে বলতে গেলাম যে, টাকা টাকা করে পাগল হওয়ার চেয়ে তোমার মতো মাথা খারাপ হওয়া ঢের ভালো। বাবা চটে লাল হয়ে চলে গেলেন। তোমার সঙ্গে বুঝি একচোট বেধেছিল কাল ?

বেশি বাধেনি, উনি কাগজটার জন্য টাকা দিতে চান আমি টাকা নেব না, এই হল ওঁর আক্রোশের কারণ। উনি আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। আমি কাগজটার আসল মালিক নই, অংশীদার। কাগজটার যিনি মালিক তিনি মালিকানা বিক্রি করবেন না—কাগজ বরং বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু অন্যের হাতে যাবে না। কাগজটা আরম্ভ করে তার স্বামী মারা যান। অঘোরবাবু ধরে নিয়েছেন আমি নিজের স্বার্থে ওর সাধে বাদ সাধছি।

বিভা বলে, বাদ সাধলেই বা ? তোমার কাগজের জন্য বাবা লোভ করবে কেন ? শখ হয়ে থাকলে একটা কাগজ বার করলেই হয়, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে কী করবে এদিকে তো ভেবে পায় না।

তুমি ভারী চটেছ দেখছি।

চটব না ? নিজের বাপ এ রকম ছোটোলোক হলে কেমন লাগে তুমি কী বুঝবে !

রাঁধুনি প্লেটে খাবার দিয়ে যায়।

বিভা বলে, আমি তৈরি করেছি, যেমন হয়ে থাক, খেতে হবে। বসে বসে একটু একটু রাঁধাবাড়া খাবার করা এ সব কাজ করছি আজকাল। ভাত খেয়ে বেরিয়েছি বললে শুনব না।

আমি তা বলবও না। তোমার বাড়ি এলে পেটে জায়গা নিয়েই আসি। না খেলে যে ছাড়বে না এটা আমার জানাই আছে।

বিভা খুশি হয়। তার ম্লান মুখে সানন্দ হাসির আভাস পর্যন্ত দেখা যায়।

কিন্তু অল্পক্ষণেই মিলিয়ে যায় তার হাসিখুশি ভাব। বলে, তোমায় সাবধান করে দিতে ডেকেছি। বাবা তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।

মায়ার ভবিষ্যদ্বাণী সুনীলের মনে পড়ে যায়। মায়া ঠিকই ধরেছিল যে তার সঙ্গে কথা বলে অঘোর যেহেতু টের পয়েছে যে, এ কাগজে মাথা গলাবার সুযোগ সে পাবে না, সেই হেতু এবার থেকে অঘোর তাকে মুশকিলে ফেলবার চেষ্টা বিশেষভাবে আরম্ভ করবে।

বিভা বলে, টাকা টাকা করে নাকি পাগল হয়েছ অথচ বাবা টাকা দিলে নেবে না, এইভাবে তুমি শত্রুতা করছ বাবার সঙ্গে। বাবাও তাই শত্রুতা করবে।

পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাবার খেতে খেতে সুনীল নিশ্চিতভাবেই বলে, বুঝতে পারছি। কী আর করা যাবে !

তোমার সত্যি খুব টাকার দরকার ?

টাকার চিন্তায় পাগল হতে বসেছি। টাকা জোগাড় করতে না পারলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। টাকার চেষ্টা করতে নেমে সব জায়গায় ওই এক রকম ব্যাপার দেখছি। টাকা দিয়ে কাগজটা বাগানোর উদ্দেশ্যে ছাড়া কেউ টাকা দিতে রাজি নয়।

সুনীল ক্ষোভের হাসি হাসে।

সমস্যাটা দাঁড়িয়ে গেছে খুব সোজা। কাগজটার জন্য যাদের দরদ আছে, তাদের নেই টাকা, আর যাদের টাকা আছে কাগজটার নীতির জন্য তাদের নেই মাথাব্যথা।

বিভা বলে, তোমায় বলতে সাহস হয় না—আমি লুকিয়ে হাজার পঁচিশেক টাকা দিলে নেবে ?

অত টাকা কোথায় পাবে ?

টাকা আমার নামে জমা আছে।

অঘোরবাবু টের পেয়ে যাবেন।

পরে টের পেলে আর কী হবে ? একটু রাগারাগি করবে—বাস্। মেরে তো আর ফেলতে পারবে না নিজের একটা মেয়েকে।

সুনীল স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

বিভা প্রশ্ন করে, কী ভাবছ ?

ভাবছি তোমার টাকা আর তোমার বাবার টাকায় তফাত কী ?

তফাত নেই ? এটা আমার নিজের টাকা।

তোমার বাবাই তো তোমাকে দিয়েছেন।

দিয়েছেন বলেই তো ওটা আমার টাকা। নইলে দেওয়ার কী মানে হয় ? এ টাকায় কেবল আমার অধিকার।

সুনীল একটু হেসে বলে, সে তো বুঝলাম, মেয়ে বলেই তোমার অধিকার। আমি কোন অধিকারে তোমার টাকা নেব ?

বিভা সঙ্গে সঙ্গে বলে, তুমি তো নিচ্ছ না ! আমি তোমাকে টাকা দেব বলছি নাকি ? তোমায় কেন টাকা দিতে চাইব ! তোমার সংসারে কত টানাটানি, কোনোদিন বলেছি পাঁচটা টাকা নাও ?

সুনীল বলে, বললে আমাকে অপমান করা হবে তাই বলনি, নইলে মনে মনে ইচ্ছা কী আর হত না। বড়োলোকের মেয়ে হবার জ্বালা আমিও খানিক বুঝি। কোনোদিন সাহস করে একটা জিনিস কখনও আমার ভাইবোনকে প্রেজেন্ট দিতে পারনি।

বিভাও হাসে, অনেককে প্রেজেন্ট দিই—টাকাও দিই। নিজে না দিলে চেয়ে নেয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তুমি সংকোচ বোধ করছ কেন ? টাকাটা সত্যিই তো আমি তোমায় দিচ্ছি না ! আদর্শের জন্য জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কাগজটা চালাচ্ছ—এ একটা খুব বড়ো কাজ, ভালো কাজ। কাগজটার জন্য আমি টাকা দিচ্ছি, কোনো লোককে নয়।

সুনীল বলে, ভালো কাজের জন্যও সব অবস্থায় সকলের টাকা নেওয়া যায় না—বিপরীত ফল হয়।

বিভা বলে, আহা, টাকাটা তো আমি দান করছি না, তোমরাও একেবারে নিয়ে নিচ্ছ না। অন্য লোকের কাছে ঋণ নিতে, আমার কাছ থেকেও ঋণ হিসাবেই টাকা নেবে। কাগজ দাঁড়ালে, লাভ হলে টাকা ফিরিয়ে দিয়ো—মিটে গেল।

সুনীল একটু ভেবে বলে, এ যুক্তিটা তুমি ভালো দিয়েছ। টাকার এমন দরকার যে ভেতর থেকে তাগিদ আসছে তোমার যুক্তিটা চোখ-কান বুজে মেনে নিই।

মেনে নাও না ?

সুনীল এবার গম্ভীর হয়ে যায়।

কিন্তু ভাববার কথাও আছে ! অনেক গুরুতর দিক ভাববার আছে। অন্যেরা যে টাকা ধার দেবে, তারা দেবে লাভের আশায়, অনেক কঠোর শর্ত থাকবে। কাগজের নীতিনিয়ম কনট্রোল না করুক, কাগজ চালানোর ব্যাবসার দিকটা খানিক কনট্রোল করবে—আমাদের দোষে তার টাকা না মারা যায়। আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা লোকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু তোমাব কাছে টাকা নিলে--

সুনীল থেমে যায়।

বিভা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সুনীল বলে, বুঝতে পারছ না ? খবরটা অজানা থাকবে না, একটা খবরের কাগজের ব্যাপার। আমি নিজে নিলে হয়তো গোপন রাখা যেত। লোকে শুনেই জিজ্ঞাসা করবে বিভা কেন এতগুলি টাকা দেয় ? চেনা তো এক সুনীলবাবুর সঙ্গে, তার কাগজটার জন্য ওর অত মাথাব্যথা কেন ? দরদটা কাগজের জন্য না লোকটার জন্য ? কিছু নিশ্চয় তাহলে আছে দুজনের মধ্যে !

বিভা খানিকক্ষণ ঠোঁট কামড়ে থাকে।

তাই বটে ! কেবল আমার নয়, তোমারও বদনাম হবে।

সুনীল হাসিমুখে বলে, তোমার একার হলে বুঝি উড়িয়ে দেওয়া যেত ? টাকা দিয়ে তুমি বদনাম কিনবে সেটা তুচ্ছ কথা নাকি ?

যাওয়ার আগে সুনীল বলে, টাকাটা নেব না বলিনি কিন্তু। ভাববার জন্য সময় নিচ্ছি। কেবল বদনামেব দিকটা নয়। আরও ভাববার দিক আছে। যেমন ধরো, ঠিক এই সময় কাগজটা বাঁচাতে তুমি টাকা দিলে অঘোরবাবু খেপে যাবেন। মেয়েকে মেরে ফেলতে না পারলেও অশান্তির সীমা রাখবেন না মেয়ের জীবনে। শুধু এটাও নয়—আরও ভাববার কথা আছে ! ক-দিন ভেবে দেখা যাক।

সব কিছুই যেন দাঁড়িয়ে যেতে চায় জটিল সমস্যায় ! অনিল আর ছায়ার সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এটাই তাদের ধারণা ছিল। দুজনে যোগ্যতার পরিচয় দিলে ভবিষ্যতে বিয়ের কথা ভাবা যাবে, এখন ও বিষয়ে চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু দেখা যায় এত সহজে সমস্যা এড়ানো যায় না।

মায়া বলে, এ তো আরেক বিপদ হল !

কী বিপদ ?

ছায়াকে সব বুঝিয়ে বললাম। ওর বিষয়ে ব্যবস্থার কথাও বললাম। মেয়ে বলছে তা হবে না।

সুনীল আশ্চর্য হয়ে বলে, বিয়ে হবে না জেনেও বলছে ?

মায়া বিব্রতভাবে বলে, বলছে বইকী ! সোজা স্পষ্ট—না। বলছে, ও ভুল করেছে, বোকামি করেছে, কিন্তু এমন কোনো পাপ করেনি যে, সে জন্য আরেকটা অন্যায় করতে হবে। মেয়ে আমাকে পটপট করে কত কথা শুনিয়ে দিলে ! কোন মুখে আমরা বলছি এটা বিজ্ঞানের যুগ—আবার আমরাই সেকেলে অসভ্য ব্যবস্থা ধরছি। বিজ্ঞানের যুগে বুঝি অকারণে ভবিষ্যৎ একটা মানুষকে খুন করা হয় ! আমরা সেকেলে তাই আমরা কথাটা ভাবতে পেরেছি। অনায়াসে বলেছে, খুশি হলে ওকে তাড়িয়ে দিতে পারি, ও নিজের ব্যবস্থা করে নেবে।

বটে !

কী বললে শুনবে ? বললে, মরব তো আর না, কত নিরাশ্রয় উদ্‌বাস্তু মেয়ে চাল বেচে গতর খাটিয়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

সুনীল বলে, এ সব অনিলের শেখানো কথা। আমাদের ওপরে চাপ দিচ্ছে।

মায়া বলে, নরম হতে হবে নাকি আমাদের ? মেয়ে কিন্তু গোঁ ছাড়বে না মনে হচ্ছে !

ভালোই তো। দুজনে পরামর্শ করে যদি এটা ঠিক করে থাকে, শুধু আমাদের চাপ দিয়ে কাবু করার জন্য না করে থাকে, তার চেয়ে আনন্দের কথা কী হতে পারে বলো ? যারা বিগড়ে গেল বলে আপশোশ করছিলাম, যাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম, তারা প্রমাণ দিচ্ছে মনুষ্যত্বের। কোনো অন্যায় তারা করেনি, কোনো জোড়াতালি ব্যবস্থা মানবে না। এতটা মনের জোর যদি ওরা দেখাতে পারে তবে তো কোনো ভাবনাই থাকে না ওদের সম্পর্কে।

একটু থেমে বলে, আমরা নরম হব না। ওদের দায়—আমরা উদ্ধার করে দেব না। তা হলেই সব কেঁচে যাবে। আমরা সাহায্য করব, যত রকমে পারি করব—কিন্তু লড়াই করে উঠতে হবে ওদের। সে জন্য দু-তিনবছর সময়ও যদি লাগে, কী এসে যায় ?

মায়া নিশ্বাস ফেলে বলে, মা-বাবাকে নিয়েই সমস্যা ! ওরা না হার্টফেল করে !

সুনীল বলে, আজ আশা হচ্ছে অত দূর গড়াবে না। অনিল যা হোক কিছু রোজগার করছে। আমি ওকে জানিয়ে দেব যে ওই টাকায় ছায়াকে নিয়ে বস্তির ঘরে যদি চালাতে পারে, আমি সংসারের জন্য কিছু চাইব না।

কল্পনার সমস্যা সহজ মনে হলেও মোটেই সেটা সহজ নয়।

এমন কোনো জটিল মানসিক বিকার প্রণবের সঙ্গে তার বনিবনা না হবার কারণ নয় যে, সেটা বুঝবার জন্য সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ঘাঁটা দরকার হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে রুচির পরিবর্তনটাই তার অসুখী হওয়ার জন্য দায়ি।

সিধা পথে বাঁধা নিয়মে তো ঘটে না পরিবর্তন—না বাস্তবতার না মানুষের রুচি প্রকৃতির।

ভাসাভাসা বিচার করলে মনে হবে বুঝি একটা বিরাট এলোমেলো বিশৃঙ্খল ব্যাপার—কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলেই ধরা পড়ে যায় মোট গতিটা সামনের দিকেই।

কিন্তু পরিবর্তনের খানিকটা এলোমেলো এগোনো পিছানো প্রকৃতির দরুন সমস্যা ও সংঘাত সৃষ্টি হবেই। শেষ পর্যন্ত ক্ষতি অবশ্য তাতে নেই—সংঘাতেই সৃষ্টি হয় জীবনের গতি।

কয়েকটা দিকে কল্পনার রুচি গেছে বদলে, হয়তো সুনীলের জন্যই গেছে, ন্যাকামি ভাবালুতা তার পছন্দ হয় না। সে ভুলে গেছে যে তার ভাবপ্রবণতা নিয়ে সুনীলকে সে বিব্রত করে তুলেছিল বিয়ের আগে, এখনও করছে।

ভাবালুতা সে নিজেই কাটিয়ে উঠতে পারেনি, শুধু কয়েকটা দিকে কয়েকটা বিষয়ে বিশেষ ধরনের ভাবালুতা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

প্রণব বরং তার চেয়ে অনেক বেশি কম-ন্যাকা, কম-ভাবালু। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই, ঠিক যে বিশেষ ধরনের ন্যাকামি কল্পনার অত্যন্ত অপছন্দ সেই ন্যাকামির হিসাবেই প্রণব রয়ে গেছে পিছিয়ে !

তার জানাই ছিল না কল্পনাকে কীভাবে ভালোবাসা উচিত। তার ধাবণা, ভাবোচ্ছল গদগদ প্রেম, দেহি পদপল্লব মার্কা প্রেমই সব যুগে, সব মেয়ের কাম্য। ওইভাবে ভালোবাসতে গিয়ে একেবারে সে বিগড়ে দিয়েছে কল্পনার মন।

উপদেশ দিয়ে লাভ নেই। তবে কয়েকটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো, পবে হয়তো কাজে লাগবে।

কল্পনাকে সে বলে, একেবারে বাজে বখাটে ছেলেমেয়েদেব কথা বাদ, ওদের সংখ্যাটাও সব ছেলেমেয়েদের হিসাবে নগণ্য। যেসব ছেলেমেয়ে খুব তেজি সাহসী আর অনেকদূর এগিয়ে গেছে তাদেরও আমি হিসাবে ধরছি না। সাধারণ সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে কী রকম একটা নতুন তেজ আর আত্মবিশ্বাস এসেছে, নানাব্যাপারে জড়িয়ে থেকে নিজে না দেখলে আমি ধারণাও করতে পারতাম না। একটি ছেলের মধ্যে হয়তো অনেক দুর্বলতা আছে, সেকেলে ভাব আছে, কিন্তু সেও যে কীভাবে নিজেকে নতুন দিনের নতুন জীবনের জন্য তৈরি করছে সে এক আশ্চর্য ব্যাপাব ! সব চেয়ে আশ্চর্য এই, সে এটা পেরেছে অবস্থার জন্য, অনেকদিকে পিছিয়ে থেকে অনেক দুর্বলতা বজায় রেখেও। আমি আজকাল আর নেগেটিভ দিক ধরে কোনো ছেলেমেয়েদের বিচার করি না। সব সময পজিটিভ দিকটা দেখি।

কল্পনা মন দিয়ে শোনে। বলে, আরেক হাতা ডাল দেব ? ডাল কমিয়ে তুমি বরং দু-একটা ডিম আর খানিকটা দুধ বাড়িয়ে দাও। আমরা ডাল ভাত চচ্চড়ি খাব—তুমি বুঝি তাই লজ্জা পাও ডিম-দুধ খেতে ? কিন্তু লজ্জা তুমি আমাদেবই দাও। আমরা যেন সেকেলে ভূত, আমবা যেন জানিনে এত খেটে শরীরটা বিগড়ে গেলে তুমি আর খাটতে পারবে না, আমরাই পড়ব বিপাকে। দুধ আর ডিম খেতে যা লাগে তার পঞ্চাশ গুণ তুমি তখন ডাক্তাব আর ওষুধে ঢালবে, আমরা কথাটি কইতে পাবব না।

দুর্গন্ধ ভাত, সুনীল কষ্টে গ্রাসটা গিলে বলে, এ সংসাবে তোর তো কথা কওয়ার কথা নয় ।

এ সংসাবেই থাকব ভাবছি।

সুনীল আর ভাতের থালায় হাত দেয় না।

বলে, কাল পরশু প্রণব নিতে আসবে। এবাব যদি না যাও আব কোনোদিন সে আসবে না। তাবপর নিজেকে মাথা নিচু করে যেতে হবে।

সুরমা বলে, তোমার বোনের মাথা অত সহজে নিচু হয় না।

সুনীল ভাত ফেলে উঠে যায়।

পরের শনিবার প্রণব আসে। মুখখানা তার গম্ভীর নয়, একটা কঠিন প্রতিজ্ঞার চাপে কঠিন, অস্বাভাবিক।

কারও সঙ্গে ভালোভাবে কথা কয় না, শ্বশুরবাড়ির আদরআপ্যায়ন সম্পর্কে তার গভীর বিতৃষ্ণা দেখা যায়, খাবার ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শুধু চা-টুকু গিলে সে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে চেয়ারে পা তুলে বসে একমনে কাগজ পড়তে শুরু করে।

আলপনা বলে, দাদা এই চিঠিটা রেখে গেছে আপনার জন্য।

প্রণব চিঠি লিখেই এসেছিল। শনিবার বিকালে এসে বিকালেই কল্পনাকে নিয়ে সে ফিরে যাবে।

সুনীল তাকে চিঠিতে জানিয়েছে যে—সময়-অসময় বিবেচনা না করে এমন আচমকা বাঙালি ঘরের মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো যায় ? মেয়ের বাপ-মা-ভাই-বোনরা নিশ্চয় এত তুচ্ছ নয় তার কাছে যে, রাতটা এখানে কাটিয়ে সকালবেলা কল্পনাকে নিয়ে গেলে তার চলবে না।

চিঠি পড়ে প্রণব বলে, সুনীলদা যখন বলছেন, থাকতেই হবে।

আলপনা বলে, সুনীলদা বলছেন বলেই ?

প্রণব বলে, না, সুনীলদা ঠিক কথা বলেছেন বলে ! এ রকম হইচই করে এসে সন্ধ্যাবেলা তোমার বোনকে নিয়ে যাওয়া সত্যি ঠিক নয়।

আধঘণ্টার মধ্যে কল্পনার সঙ্গে তার কথা বলার সুযোগটা সৃষ্টি করে দেয় বাড়ির লোকেই।

কল্পনা বলে, আমি এখন যেতে পারব না। দু-একমাস পরে যাব।

প্রণব বলে, তাহলে তোমার আর গিয়ে কাজ নেই। বাপের বাড়িতেই থাকো। কই, বাপের বাড়িতে থেকেও তো চেহারা ফেরেনি ? বরং আরও যেন কাক-ঠুকরোনো লাগছে !

তুমি শান্তিতে থাকতে দেবে না, কী করব !

প্রণব খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থাকে। তারপর বলে, আচ্ছা বেশ, আমি আর তোমার অশান্তি করব না, চেহারাটি ভালো করে প্রমাণ দিয়ো যে আমার জন্যেই তোমার শরীরের এই অবস্থা। প্রমাণ দিলে আমি কান ধরে তোমার পায়ে নাকেখত দেব।

কল্পনা একটু আশ্চর্য হয়েই তার দিকে চেয়ে থাকে। তার সঙ্গে এ রকম তেজের সঙ্গে কথা বলা নতুন বটে প্রণবের।

প্রণব বলে, আমি এখুনি চলে যেতাম, তোমার অশান্তি করতাম না। কিন্তু সুনীলদা থাকতে বলেছেন, চলে যাওয়াটা উচিত হবে না। আমাদের একসঙ্গে শুয়ে আর কাজ নেই, অশান্তিই বাড়বে তো। আমি খেয়ে-দেয়ে অনিলের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ব, তুমি সকলকে বলে দিয়ো, ঘুম থেকে ডাকলে আমার শরীর ভীষণ খারাপ হয়, আমাকে ডেকে কাজ নেই।

কল্পনা একটু বিহ্বলভাবেই তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

বাড়ির সকলের অনেক অসুবিধা ঘটিয়ে চিরদিনের মতো অর্থাৎ তাদের বিয়ের এই দশ মাসের মধ্যে অনেকবার ছোটো ঘরখানা থেকে জিনিস আর মানুষ সরিয়ে তাদের দুজনের শয্যা পাতা হয়।

দশটা বাজতে না বাজতে বাইরের ঘরে অনিলের বিছানায় শুয়ে প্রণব ঘুমিয়ে পড়ে।

কল্পনা বলে, কেউ ডেকো না কিন্তু। ঘুমিয়েছে ঘুমোক—ঘুম ভাঙলে বিষম ব্যাপার হবে।

আলপনা হেসে ফেলে।

এতকাল তো কিছুই হত না ঘুম ভাঙালে ? এ একটা নতুন রোগ হল নাকি ?

আলপনা হাসতে পারে, সে ছেলেমানুষ। অন্য সকলের মনে নানা আশঙ্কা উঁকি মেরে যায়। এ সব কী ব্যাপার ? সন্ধ্যাবেলাই কল্পনাকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল, নেহাত সুনীলের খাতিরে রাতটা এখানে থাকতে রাজি হয়েছে। শ্রান্ত হয়েছিল বলে নয় অসময়ে অস্থানে শুয়ে সে ঘুমিয়েই পড়েছে, কল্পনা এভাবে তাকে ডাকতে বারণ করে কেন ?

কী বিষম ব্যাপার হবে ডেকে তুলে ছোটো ঘরে গিয়ে শুতে বললে ?

কল্পনা বলে, ঘুম ভাঙলে ঘুম আসে না, শরীর খারাপ হয়—রেগে যায়।

তবে কাজ নেই তাকে ডেকে। এ ঘরটাই আজ ওদের ছেড়ে দেওয়া যাক। অনিলের বিছানাটা এতটুকু, ভূপেশ ও খোকার মেঝের বিছানাতেই কল্পনা শোবে।

কল্পনা রেগে বলে, তোমাদের যত উদ্ভট কাণ্ড। খোকা ঘুমিয়ে গেছে, আবার ওকে টানাটানি কর ! যেমন আছে থাকো। ছোড়দা ছোটো ঘরে শোবে, আমার একটা ব্যবস্থা করে নেব।

মা ধমক দিয়ে বলে, আবোল-তাবোল বকিস না তো তুই। দিন দিন মাথা খারাপ হচ্ছে মেয়ের।

কল্পনা ভাবে যাকগে, ভিন্ন বিছানায় তো শোব, তাতে আমার অপমান নেই।

সুনীল চিঠিতেই জানিয়েছিল সে আজ সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যেই বাড়ি ফিরবে। সে দশটার আগেই ফিরে আসে।

প্রণব ঘুমিয়ে পড়েছে শুনে সেও একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। তার সঙ্গে নানাবিষয়ে কথা বলাব সুযোগ অবহেলা করে প্রণব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে !

শরীর খারাপ ? কিন্তু শবীর খাবাপ হলে আচমকা আজ ওর আসবার কী দরকার ছিল ? দু-একদিন পরে এলেই হত।

কল্পনার থমথমে মুখ দেখে সুনীলও অস্বস্তি বোধ করে।

বাড়ির সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। নন্দার ব্যবস্থায় বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরে খাওয়াব হাঙ্গামা সুনীলকে করতে হয় না।

একে একে সকলে শুয়ে পড়েছে, সুনীলও শোয়ার কথা ভাবছে, বিভা এসে হাজির হয। শুধু হাজিব হয় না, গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে হুকুম দেয়, গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, গাড়ি আনবাব দবকাব নেই।

ড্রাইভার বলে, আজ্ঞে, আপনি এখানে থাকবেন ?

তা দিয়ে তোমার দরকার কী ?

কল্পনা বাইরের দরজা খুলে বেরিয়েছিল, গাড়ি চলে গেলে সে বলে, ব্যাপার কী বিভাদি ?

তা দিয়ে তোমার দরকার কী ? বাড়িতে অতিথি এসেছে ধরে নাও।

প্রণবেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তাকে অনিলের বিছানায় বসে হাই তুলতে দেখে, মেঝেতে আরেকটা বিছানা দেখে এবং কল্পনাকে ভিতরের দিকের দরজা খুলতে দেখে বিভা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে চেয়ে থাকে।

তারপর হেসে বলে, আগেই আরেকজন অতিথি হাজির হয়েছেন !

এ বাড়িতেই বিভার সঙ্গে প্রণবের পরিচয়। সে জিজ্ঞাসা করে, আপনি এত রাত্রে হঠাৎ ?

বিভা হেসে বলে, রাত বেশি হয়নি, এখনও অনেকটা রাত বাকি আছে। ভয় নেই, তোমাদের অসুবিধা করব না।

আগে এ রকম পরিহাস করলে কল্পনা মন্তব্য করত, আহা !

আজ সে কিছুই বলে না। প্রণব একটু শুকনো হাসি হাসে।

বিভা বাড়ির ভিতরে যায়।

সুনীল বলে, ব্যাপার গুরুতর নিশ্চয় !

বিভা বলে, গুরুতর বইকী। কাল সকালে আমার আশীর্বাদ। তোমার উপদেশ পালন করতে এলাম। নিজে শিখিয়েছ, তাড়াতে পারবে না কিন্তু। বাবা এসে হাঙ্গামা করলে সইতে হবে।

সুনীল বলে, হঠাৎ আবার—

বলছি। প্রণব এসেছে, তোমাদের অসুবিধা হবে জানলেও আমি কিন্তু এখানেই আসতাম। আত্মীয়বন্ধু অনেকের বাড়ি যেতে পারতাম—কিন্তু বাবা গিয়ে হাজির হলেই তারা বাবার পক্ষ নিত, আমার বিরুদ্ধে যেত। তাই এখানেই এলাম।

বেশ করেছ।

অনিল আজ এ ঘরে শুয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েনি। তাকে বলতে হয়নি, বিভা সুনীলের সঙ্গে জরুরি কথা বলতে এসেছে বুঝে নিজেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তাদের কথা বাড়ির কেউ শুনতে পায় না, কিন্তু একনজর তাকিয়েই টের পায় বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই হচ্ছে দুজনের মধ্যে।

বিভা ম্লানমুখে বলে, আরেকটা খারাপ খবর আছে। তোমায় যে টাকা দেব বলেছিলাম, নেবে কিনা ভেবে আর দরকার নেই। বাবা আমার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। আমার চেনা একটি মেয়ের স্বামীর টিবি হয়েছে, একটা চেক দিলাম, চেকটা ব্যাংক ফেরত দিয়েছে। বাবার সই ছাড়া চেক ভাঙানো যাবে না।

সুনীল বলে, এবার বুঝতে পারছ, তোমার টাকা নিতে কেন ইতস্তত করেছি ? টাকা যে আসলে তোমার বাবার এটা কিছুতে ভুলতে পারছিলাম না। অ্যাকাউন্ট ওর নিজের নামে, ব্যাংক-কে হুকুম দিয়েছিলেন তুমি চেক কাটলেও যেন টাকা দেয়, এখন হুকুমটা বাতিল করে দিয়েছেন।

সুনীল একটা সিগারেট ধরায়।—কিন্তু হঠাৎ তোমার আশীর্বাদ কেন ?

পরশু তোমার পক্ষ নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করলাম না ? তারপর থেকে বাবা কেমন বিগড়ে গেছে। কিছু ভেবে নিয়ে যেমন রেগেছে তেমনি ভয় পেযে গেছে। আমার টাকার জোর কেড়ে নিয়ে, জোর করে বিয়ে দিয়ে আমায় বেঁধে ফেলতে চাইছে।

সুনীল হেসে বলে, বাড়ি ছেড়ে তুমি তবু আমার বাড়িতেই এলে ! তোমার বাবা খেপে যাবেন।

বিভা বলে, আসব না ? আমি কচিখুকি যে বাবার ভয়ে কাঁপব ? আমার পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে, আশ্বিনে ছাব্বিশ হবে। আমার যেখানে সুবিধা সেখানে যাব।

একটু থেমে বলে, তোমার সঙ্গে একচোট হয়ে গেছে, হাঙ্গামা করতে বাবা নাও আসতে পারে তোমার বাড়িতে !

সেই আশাতেই থাকো ! নিজের বাবাকে চেনো না তুমি ?

অঘোরের দামি গাড়িটি আস্তে চালালেও তার বাড়ি আর সুনীলদের বাড়ির মধ্যে একবার পাড়ি দিতে বিশ মিনিটের বেশি লাগে না। ড্রাইভার নিশ্চয় আজকের বিশেষ অবস্থায় আস্তে গাড়ি চালিয়ে ফিরে যায়নি, অঘোরকে নিয়ে আসবাব সময় আবও বেশি জোবেই চালাতে হয়েছে অঘোরের হুকুমে।

আধঘণ্টার মধ্যে অঘোর এসে পড়ে। তখনও সবাই জাগা।

গাড়িতে বসে সে মেয়েকে কথা বলার জন্য ডেকে পাঠায না। অত বোকা সে নয়। ড্রাইভার মেয়ের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি শুনুক আর কাল চারিদিকে ছড়িয়ে যাক তার মেয়ের পাগলামির গল্প !

গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে সে বাইরের ঘরে গিয়ে বসে।

ভেতর থেকে বিভা ধীরপদে ঘরে এলে আগে অঘোর তার মুখটা ভালো করে দেখে নেয।

তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, এ কী পাগলামি জুড়েছ ?

বিভা বলে, কী করব ? তুমি পাগলামি জুড়লে আমাকেও করতে হয়।

অঘোর ক্ষুব্ধস্বরে বলে, আমি তোর ভালো না করে মন্দ করব এটা তুই ভাবতে পারলি ? তুই জানিস না—

অঘোরের মুখে কথা আটকে যায় !

বিভা শান্তসুরে বলে, তুমি আমার ভালোই চাইবে মন্দ চাইবে না, তা আমি ভালো করেই জানি। আমার ভালো হবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস কর বলেই তুমি এ রকম করছ এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি

আমার আছে। না বুঝে ভালো করতে চেয়ে আমাব সর্বনাশ করতে চাইছ জানলে কী আর তুমি জবরদস্তি কবতে !

টের পাওয়া যায় বিভার কান্না এসে গেছে।

কিন্তু সে কাঁদে না।

এই যদি তোমার ইচ্ছা ছিল, আট-দশ বছর আগে যাকে হোক কিনে নিয়ে চুকিয়ে দিলেই পারতে। আমিও খুশি হতাম।

অঘোর নীরবে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কান্না এসে যায় কিন্তু তার সামনে কাঁদে না, মেয়ে তো সত্যিই তার কচিখুকি নেই !

অঘোর নিশ্বাস ফেলে বলে, ভগবান ফাঁদে ফেলেছেন, কী আর করি। কেন যে তোকে নিজেব হাতে মানুষ করার শখ হয়েছিল, আজ তাহলে এই মায়ার ফাঁদে পড়তে হত না। তোর জন্যে দু-তিনটে নার্স রেখে দিয়ে নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাকতাম—

বিভা কান্না পেলে কাঁদেনি। কিন্তু এবার হাসি পাওযায় হঠাৎ সে হেসে ফেলে।

বলে, এটা কী বলছ বাবা ? তিন-চারটে নার্স রেখে দিতে ! আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, ক জন নার্সের মাইনে তোমার রোজগার ছিল ভুলে গেছ একেবারে ?

অঘোর বিব্রত হয়ে বলে, তখনকার কথা বলছি নাকি ? অবস্থা ফিববাব পব—

বিভা বলে, অবস্থা তো তোমার ফিরল এই সেদিনের যুদ্ধেব বাজারে। তখনই তো আমি প্রায় বুড়িয়ে গেছি ! দু-তিনজন নার্স আমার কী করত ?

বলতে বলতে হাসি উপে গিয়ে তার মুখ ম্লান হয়ে যায় !—তা বটে, তুমি ঠিক বলেছ। নার্স না হোক, এখন দু-তিনজন ঝি রাঁধুনি তো বেখেছ খোঁড়া মেযেব সেবার জন্য। তার আগে পর্যন্ত তুমিই করতে।

অঘোর বলে, সেটাই ভুল হয়েছিল।

বিভা হেসে বলে, ভুল হয়নি। তখনও তুমি কম খাটতে নাকি ? শুধু টাকাই আসত না। শুধু কাজ আর টাকার ভাবনা নিয়ে থাকলে মানুষের চলে ? দু-একজনকে একটু মায়া কবতে হবে না ? সেটাও খুব দরকার। ভগবানকে টেনে এনো না, তোমার মায়া কবা দবকাব ছিল বলেই তুমি আমাকে মায়া করেছ।

স্বার্থপরের মতো ?

না না, অন্য সব কিছুর সঙ্গে সবার যেটা চাই নিজের খোঁড়া মেয়েকে দিয়ে সেটা মেটালে স্বার্থপর হবে কেন ? বাপ ছেলেমেয়েকে ভালোবাসবে না ? তুমি যদি আমায় এতখানি না ভালোবাসতে পারতে বাবা, তুমি যে আজ কী দাঁড়াতে—

তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস ?

অনেকটা।

অঘোর হেন লোক এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে বলে, তোদের কথা হেঁয়ালির মতো লাগে, তবে খানিকটা সত্যি বইকী তোর কথা। তুই একটা নেশা দাঁড়িয়েছিলি আমার। বুড়ো বয়সে আরও কাবু করেছিস। নইলে এভাবে হার মেনে ছুটে আসি ?

বিভা বলে, আমিও কী সাধে যার তার হাতে পড়ে নেশা ছুটিয়ে তোমায় মারতে চাই না ? তুমি খালি আমার কথা ভাব, টাকাপাগল জামাই আনলে তোমার দশা কী দাঁড়াবে তা তো ভাবো না। দুদিনে পাগল করে দেবে না তোমাকে ?

অঘোর ক্লিষ্টস্বরে বলে, ভাবিনি ? এ তো জানা কথাই। আমি ভাবছিলাম, আমায় নয় টাকার জন্য পাগল করুক, তুই যদি সুখী হোস। ভাবছিলাম, বাঁচব তো আর দশ কী পনেরো বছর বড়ো

জোর। দশ বছরের বেশি আশা করতেও সাহস হয় না। হয়তো দু-একবছরেই কাত হতে পারি। তারপর তোর কী দশা হবে ভেবে—

অঘোর যেন গা-ঝাড়া দিয়ে সিধে হয়ে বসে বলে, যাকগে। আমি মরলে যা হবার হবে, আমি তো আর দেখতে আসব না ! চলো যাই এবাব, আমার ঘুম পেয়েছে।

চলো।

অঘোর অবাক হয়ে বলে, ওদের বলে আয় ?

কিছু বলতে হবে না, তুমি চলো। বাড়ি গিয়ে আর ঝগড়া করবে না। সটান শুয়ে পড়ে ঘুমোবে।

তারা গিয়ে গাড়িতে উঠে বসতে বসতে, সিগারেট নিভিয়ে ড্রাইভার নিজের সিটে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে সুনীলেরা কয়েকজন অবশ্য বাইরে বেরিয়ে এসে প্রমাণ দেয় যে বিভার বিদায় না নিয়েই চলে যাওয়াটা তারা অভদ্রতা মনে করেনি।

সুনীল বলে, কাল বারোটা নাগাদ আমি আসছি বিভা। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

অঘোর বলতে যায়, আমি তখন বাড়ি থাকব না—

সুনীল বলে, বিভার সঙ্গে কথা সেরে আমি কাগজের কয়েকটা জরুরি কাজে বেরোব। কাজগুলি সেরে চারটে সাড়ে চারটের সময় আমি আপিসে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনার সঙ্গেও আমার জরুরি কথা আছে।

কল্পনাব দিকে চোখ পড়ায় বিভা ড্রাইভারকে বলে, দাঁড়াও গাড়ি ছেড়ো না।

অঘোরকে বলে, তোমার ঘুম পেয়েছে কিন্তু আমি একটা জরুরি কথা ভুলে গেলাম। পাঁচ-দশ মিনিট একটু বোসো গাড়িতে।

আবার নার্মবি ? কী এমন জরুবি কথা ?

বাড়ি গিয়ে বলব।

মেয়ের অতি কষ্টে গাড়ি থেকে নামার প্রক্রিয়া চেয়ে দেখতে দেখতে অঘোরের মনে হয় বুকে পিঠে করে মানুষ করা পঙ্গু কুৎসিত মেয়েটা তার যেন রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

তাকে আবার নামতে দেখে বাড়ির সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কল্পনাকে ডেকে নিয়ে আড়ালে যেতে তারা আরও বেশি অবাক হয়ে যায়।

বিভা ভিতরের বারান্দায় গিয়ে রেলিংহীন ফাঁকা ছাদে উঠবার সিঁড়িতে বসে বলে, চটপট মন দিয়ে কথা শুনবি, বাবার ওদিকে ঘুম পেয়েছে। আমার কাছে হার মেনে আরও বেশি ঘুম পেয়েছে।—বুঝছিস তো ? ন্যাকামি করবি না।

কল্পনা বলে, তোমার কী হল বিভাদি ?

বিভা বলে, আমার কিছু হয়নি, হয়েছে তোর। আমি কি তোর মতো বোকা ? দেখলি না খোঁড়া অচল মেয়ে বাবাকে কীভাবে বাগে আনলাম ?

কল্পনা বলে, সে তুমি খোঁড়া বলেই পারলে। আমাদের মতো হলে পারতে না।

বিভা বলে, তুই ভারী বোকা। আমি খোঁড়া বলে ? বাবার আর একটাও ছেলেমেয়ে নেই বলে। তোর মতো আরেকটা মেয়েও যদি থাকত, বাবা আমার দিকে ফিরেও তাকাত না। নিজে মানুষ করত তোকে, আমার জন্যে কিছুই করত না। ছেলেবেলাতেই অক্কা পেয়ে যেতাম।

কল্পনা চুপ করে থাকে।

বাড়ির সকলে বাইরের রোয়াকে চুপ কবে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়িতে অঘোর চুপচাপ অপেক্ষা করছে, স্টার্ট দেওয়া ইঞ্জিনটাকেও ড্রাইভার চুপ কবিয়ে দিয়েছে। পাড়ার অনেকগুলি বাড়ির আধ-ঘুমন্ত কিছু কিছু চোখ এ বাড়ির দিকে উঁকি দিচ্ছে।

বিভা বলে, আমি খোঁড়া, চলে ফিরে দেখে বেড়াতে পারি না ! এক জায়গায় বসে চারিদিকে চোখ পেতে রাখি। চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব তন্নতন্ন করে দেখি শুনি।

কল্পনা চুপ করে থাকে।

বিভা বলে, তোকে দেখেই টের পেয়েছি ছেলে হোক মেয়ে হোক একটা তোর হবে। এটাও টের পেয়েছি তুই বোকার মতো তোর ছেলে বা মেয়ের যে বাপ হবে তাকে মিছিমিছি নস্যাৎ করেছিস। তুই সত্যি বোকা। ছেলে হোক মেয়ে হোক, তোর পেটে যা জন্মাবে তার বাপ ছাড়া তাকে কেউ বেশি ভালোবাসতে পারবে না, এই সোজা কথাটা তুই বুঝিস না।

কল্পনা এবার ঝেঁঝে ওঠে, বাপ বলেই তো নয়, ছেলেমেয়ের মানুষের ভালোবাসা চাই তো। বাপ হোক যে হোক অমানুষের ভালোবাসা ছেলেমেয়েদের নষ্ট করে দেয়।

অমানুষ ? তোর হৃদয় নেই বলে, ভালোবাসা বুঝিসনে বলে তোকে যে চিরদিনের জন্য ছেড়ে দেবে ভাবছিল, শুধু ছেলে বা মেয়েব মা হবি বলে সে যেচে যেচে তোর কাছে এসে অপমান হচ্ছে। অমানুষ এটা পারে ?

কল্পনা নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমি কাব্যি করছ বিভাদি। ও জানে না।

জানে না ? না জেনে শুধু তোমার রূপযৌবনেব খাতিরে এ রকম অপমান হতে এসেছে ? কী বোকা তুই, রূপযৌবন বাজারেও তো কিনতে পাওয়া যায় রে ! সাদা চোখে খানিকটা কম মনে হলেও মদের চোখে তুলনা মেলে না। তুই এত অপমান করেছিস যে ও বেচারাব চোখে তোকে কুৎসিত লাগে। শুধু ও বেচারার কাছেই কি তোর নারীত্বের মর্যাদা দাবি ? আর কারও কাছে দাবি করতে ভরসা পাস না ? সাহস পাস না ? ও বেচারা শুধু একা তোর জন্য না খেটে তোব মতো আরও অনেকের জন্য খাটছে বলে, ন্যাকা ন্যাকা ভালোবাসা জানে না বলে, ওকে তুই বাতিল করবি ! তোর মতো বোকা মেয়ে আমি খুব দেখছি ভাই।

কল্পনা ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থাকে।

বিভা বলে, ঢের বোকামি করেছ, আর নয়। আমি মিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছি—বলে বিভা ডাকে, আলপনা ?

আলপনা বলে, এ ঘরের চৌকি থেকে অনিলের বিছানাটা সরিয়ে নিয়ে যা তো।

প্রণবের দিকে চেয়ে হাসিমুখে সে বলে, বোকা মেয়েকে চালাক করে দিয়ে গেলাম, তুমি যেন আবার বোকার মতো কোরো না।

পরদিন যেতেই বিভা অনুযোগ দেয়, অমনভাবে না বলে কয়ে এলেই হত। তুমি কি জানো না খোঁড়া মেয়ে বাড়িতেই থাকে ? সারারাত ঘুমোতে পারিনি। বাবাও ছটফট করেছে—তোমার কী মতলব বুঝতে না পেরে।

সুনীল বলে, বড়ো ব্যাপারে একরাত না ঘুমোলে ছটফট করলে কী আসে যায় ? খিদেয় রোগে কত লোক কত রাত ঘুমোতে না পেরে ছটফট করছে।

বিভা বলে, বুঝেছি। নানাভাবনার মধ্যে মাঝে মাঝে আমি যা ভাবছিলাম সেটা সত্যি নয়। তুমি এলোমেলো কথা বলে টাকা জোগাড়ের ব্যবস্থার জন্য আসনি।

টাকার জন্যই এসেছি।

তা জানি। সেই জন্যই তো আমাদের এত ভাবনা যে ব্যাপারটা কী ? এলোমেলো ধাপ্পাবাজি উপায় তোমার ধাতে আসে না। টাকাও তোমার নিজের জন্য চাও না। তাই তো বাপবেটি আমরা

দুজনে সারারাত ঘুমিয়েছি আর ছটফট করেছি আর ভেবেছি। তুমি আমাদের ক্ষতি করবে না জানি, কিন্তু কী করতে চাইছ তা তো জানিনে।

সুনীল বলে, রাত্রে না ঘুমিয়েও মুখ তো বেশ তাজা দেখাচ্ছে !

বিভা বলে, আমার মুখে এত লোম, প্রথম বয়সে পুরুষ ছেলের যেমন গোঁফদাড়ি গজায়। তবু তুমি বুঝতে পার আমার মনের ভাব ?

সুনীল বলে, তা খানিকটা বুঝতে পারি বইকী। অনেকদিন থেকে দেখে আসছি তো, খোঁড়া পা, মুখের লোম, বাপের টাকার অভিশাপ নিয়েও তুমি মানুষের মতো বাঁচার জন্য লড়াই করছ। যারা এ রকম লড়াই করে তাদের বিশেষ এক ধরনের সরলতা থাকে, মনে কোনো ভাব জোরালো হলে মুখে তার ছাপ পড়ে। রাতে না ঘুমোলে কী হবে মনে খুব উৎসাহ বোধ করছ, মুখখানা তাই তাজা দেখাচ্ছে।

বিভা হেসে বলে, তা ঠিক। শুধু দুশ্চিন্তায় তো নয়, বেশি আনন্দেও মানুষের ঘুম আসে না। আমার এত উৎসাহ কেন, আনন্দ কেন জানো ?

জানি।

সত্যি জানো ?

জানি বইকী। তোমার সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাবনা শেষ হয়েছে। অঘোরবাবু আর তোমার বিয়ের চেষ্টাও করবেন না, আমার পিছনেও লাগবেন না। মনে মনে তুমি খালি নিশ্বাস ফেলছ আর ভাবছ, বাব্বা, বেঁচেছি !

বিভা যেন হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বলে, বাবার চেয়ে তোমার অনেক বেশি বুদ্ধি—গভীর বলো, চোখা বলো, সবদিক দিয়ে। কিন্তু বাবা আর তোমার শত্রুতা করবে না এটা কী করে বুঝলে ?

সুনীল বলে, ওঁর সঙ্গে ঠোক্কর লাগলেই তুমি আমার কাছে ছুটে যাও, পরামর্শ চাও। সেদিন আমার পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করলে, বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতেই বাড়ি ছেড়ে আমার ওখানে গিয়ে উঠলে। অঘোরবাবুর কী আর বুঝতে বাকি আছে যে আমায় ঘা দিলে সেটা তোমার গায়ে লাগবে ?

বিভা খুশির হাসি হাসে।

বলে, বাবার চেয়ে তোমার বুদ্ধিই বেশি নয়, তুমি ঢের বেশি চালাক। বাবা সোজাসুজি তোমাকে বাগে আনতে চেয়েছিল, তুমি আমাকে দিয়ে বাবাকে কাবু করেছ। আমার টাকা ধার নেবে তো ?

সুনীল অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, জবাব দেয় না।

কী ভাবছ ?

সুনীল বলে, ভাবছি খুব গুরুতর কথা। টাকার জন্য আমি যদি তোমায় বিয়ে করতে চাই, তুমি রাজি হবে ?

বিভা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

সুনীল বলে, তামাশা করছি না। ক-দিন ধরে কথাটা ভাবছিলাম। সোজাসুজি বলি, প্রেম আমার কাছে তুমি পাবে না, ওটা আমার ধাতেই আসে না। তবে অন্য স্ত্রীরা যেমন আদরযত্ন পায় স্নেহ-মমতা পায় সে সব তেমনি পাবে।

তুমি টাকার জন্য বিয়ে করবে ?

দোষ কী ? অন্যে তোমায় বিয়ে করলে টাকা পেত, আমিও পাব। তুমি এমনিই টাকা দিতে চাইছিলে, কিন্তু এমনি তো টাকা নিতে পারি না। বিয়ে হলে তোমার টাকায় আমার অধিকার জন্মাবে।

ক্ষণে ক্ষণে কতরকম ভাব যে খেলে যায় বিভার মুখে। একবার বোধ হয় লজ্জাতেই লাল হয়ে যায় সমস্ত মুখখানা। যা ছিল তার কল্পনাতীত অভাবনীয় ব্যাপার তাই আজ এমন আচমকা বাস্তব সত্যের বাস্তব সম্ভাবনার রূপ নিয়ে সামনে হাজির হয়ে বিচলিত অভিভূত করে দিয়েছে তাকে।

হঠাৎ সে বলে, কিন্তু খোঁড়া বউ বলে তোমার খারাপ লাগবে না ?

সুনীল বলে, না। অন্য মেয়ে হলে হয়তো লাগত, তুমি বলে লাগবে না। তোমায় খোঁড়া দেখে দেখেই আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি সমস্ত দিক তলিয়ে ভেবে দেখেছি। খারাপ লাগার সম্ভাবনা থাকলে আমি তোমায় বিয়ের কথা বলতাম না। কারণ তোমায় আমার খারাপ লাগা মানেই দাঁড়াবে তোমাকে অসুখী করা। আমার দিক থেকে ও সব কোনো খুঁতখুঁতানি নেই। খোঁড়া মেয়ে হয়েও টাকার দামে নিজেকে বিক্রি করনি—তোমার বাবা টাকা দিয়ে রাজপুত্র কিনে আনলেও আসলে কিন্তু তোমার নিজেকেই বিক্রি করা হত। তুমি এ ভাবে ধবনি, সোজাসুজি হিসেব করেছ—টাকার জন্য যে তোমায় চাইবে সে অমানুষ। নিজেকে বিক্রি করনি বলেই কিন্তু আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি।

শ্রদ্ধা !

তুমি দেখছি আকাশ থেকে পড়লে ! শ্রদ্ধা বুঝি শুধু পুরুষের পাওনা ?

সুনীল হঠাৎ সুর পালটে বলে, যাকগে, বেশি বলে তোমার মাথা গুলিয়ে দেব না। এখন তুমি নিজের মন বুঝে দ্যাখো। তোমাকে আমার খারাপ লাগবে না এটা সত্যি কথা, তোমার জন্য স্নেহও আছে কিন্তু বিয়ে আমি তোমাকে করছি টাকার জন্য। এটা অস্বীকার করব না। টাকার দরকার না পড়লে কথাটা হয়তো আমার মনেও আসত না।

বিভা মুখ নিচু করে।

একটা বড়ো কাজে টাকার দরকার পড়ায় করছ, নিজের জন্য টাকার লোভে তো নয়।

তুমি তা হলে রাজি ?

বিভা মুখ তোলে না।

রাজি না হয়ে পারি ? তুমি জানো না, তোমার জন্যেই তো কারও বেলা মন উঠছিল না।

সুনীল তার মাথায় একটা হাত রাখে।

সত্যি ? আমি তো টের পাইনি। আমায় খুব শ্রদ্ধাভক্তি কর এটুকু জানতাম।

শ্রদ্ধাভক্তির নীচে মেয়েরা ও সব চাপা রাখতে পারে। কোন মুখে তোমাকে জানতে দিতাম ? আজ তুমি নিজের দরকারে এসে বলেছ, তবু আমার মনটা খুঁতখুত করছে, তোমার উপযুক্ত বউ পাবে না, একটা বাজে মেয়ে জুটবে।

এ খুঁতখুঁতানি মন থেকে মুছে ফেলো। খুব সুন্দরী হবে, নাচবে বেড়াবে সেবা করবে—এ রকম বউয়ের লোভ থাকলে টাকার লোভে তোমায় বিয়ে করতাম না। ও সব আলগা হিসাব আমার আসে না। তোমার দিকের হিসাবটাই এখন সবচেয়ে গুরুতর দাঁড়াচ্ছে কিন্তু। যাদের তুমি অমানুষ বলে বাতিল করেছ তাদের মতোই আমি কিন্তু টাকার জন্য এগিয়ে এসেছি,—আমায় শ্রদ্ধা করতে পারবে তো ?

পারব না ? নিজের জন্য তো টাকা চাইছ না। আমার শ্রদ্ধা বরং বেড়ে গেছে।

দুজনে নানাকথা বলে। অঘোরের সম্মতির প্রশ্ন নিয়ে আগে মাথা ঘামাবার কোনো দরকার হত না কিন্তু সুনীলের উপর তার বর্তমান বিরাগের জন্য কথাটা নিয়ে একটু আলোচনা দরকার হয়।

বিভা জানায় যে ওই বিরাগের জন্য কিছু আসবে যাবে না।

খোঁড়া মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য অঘোর পাগল। সুনীল তাকে বিয়ে করবে শুনলে সব বিরাগ জল হয়ে যাবে। শত্রুতা না করলেও কাগজটা বাগাবার মতলব সে ছাড়েনি, সেটাও ছেড়ে দেবে।

সুনীল নিজেই যাতে কাগজটা দাঁড় করাতে পারে সে জন্য নানাভাবে বরং সাহায্যই করবে।

বিভা হাসে।—তুমি সত্যি ভারী চালাক। এক ঢিলে কটা পাখি মারছ ভাব দিকি ?

সুনীলও হাসে, উপায় কী ? ঢিল যে আমার মোটে একটা !

বিভা একটু ভেবে বলে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মায়ার সঙ্গে তোমার নাকি ভাব আছে শুনেছিলাম ?

মনে বুঝি খটকা লাগল ? ভাব আছেই তো।

তবে ?

সুনীল হেসে পালটা প্রশ্ন করে, একজনের সঙ্গে ভাব থাকলেই বুঝি ভালোবাসা থাকতে হবে ?

লোকে তাই ধরে নেয়।

লোকে অমন কত কিছু ধরে নেয়। তোমায় তো বলেছি কোনো মেয়ের জন্যই আমার ভালোবাসা আসে না। ওটা আমার ধাতে নেই।

তাই বল। আমার সত্যি মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি কাগজটার ভবিষ্যতের জন্য দুদিক দিয়ে মস্ত মস্ত দুটো ত্যাগ স্বীকার করতে চলেছ।

ও রকম ত্যাগে আমি বিশ্বাস করি না।

সুনীলের চলে যাবার সময় আজ বিভা তাকে প্রণাম করে বলে, এত বড়ো হৃদয় তুমি কোথায় পেলে ?

সুনীল হাসিমুখে বলে, আজ বুঝি ভক্তি বেড়ে গেছে ?

বিভা খুশির সঙ্গে বলে, সত্যি বেড়ে গেছে। সবাই বলে তোমার নাকি হৃদয় নেই, তুমি রসকষহীন নিষ্ঠুর মানুষ। সব মিছে কথা ! তোমার হৃদয়টা মস্ত কিনা তাই লোকে ভুল করে, চিনতে পারে না।

সুনীল তাকে আদর করে বলে, কী জানো, আমার হৃদয় ভাবলে হৃদয়টা ছোটো হয়ে যায়, হালকা হয়ে যায়। দশজনের হৃদয়ের সঙ্গে কারবার করার জন্য হৃদয়—এ রকম ভাবলেই হৃদয়টা ছোটো না বড়ো সে চিন্তা চুকে যায়, অনেক মিথ্যা যন্ত্রণা থেকে হৃদয় বেচারা রেহাই পায় !

খবর শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় আত্মীয়বন্ধু।

অঘোরের খোঁড়া মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবে সুনীল !

টাকার লোভের কাছে শেষ পর্যন্ত সুনীলের মতো শক্ত আদর্শবাদী মানুষকেও মাথা নত করতে হয় !

এ যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

খবর শুনে প্রথমে ফ্যাকাশে হয়ে যায় মায়ার মুখ, তারপর সে মুখে ঘটে অসহ্য ক্রোধের কালো মেঘের সঞ্চার।

অপমানে লজ্জায় ঘৃণায় তার যেন মরে যেতে ইচ্ছা হয়। নিজেকে সে বারংবার ধিক্কার দেয় ! তাকে নরম পেয়েছে ভালোমানুষ পেয়েছে বলেই না তার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করার সাহস হয় সুনীলের।

এতখানি তুচ্ছ সে সুনীলের কাছে ?

সব ব্যাপারে তবে তার পরামর্শ দরকার হয় কেন ?

সুনীলের সঙ্গে তার তখন সামনাসামনি দেখা হলে বিশ্রী একটা কাণ্ড হয়ে যেত সন্দেহ নেই।

মায়া তাই ঘটনাচক্রকে ধন্যবাদ দেয় যে রাত জেগে কাজ করতে হওয়ায় বাড়ি ফিরে সকালবেলা সুনীল ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সুনীলের ঘুম ভাঙতে ভাঙতে মন শান্ত হয়ে যায় মায়ার।

না, এতে তার কোনো অপমান নেই।

তাকে কোনো কথাই তো দেয়নি সুনীল। কথা দেওয়ার মতো কোনো কথাই তো তার সঙ্গে হয়নি সুনীলের। তার নারীত্বের বদলে তার বন্ধুত্বকে বড়ো করে সমানভাবে তার সঙ্গে বাস্তব সুখসুবিধার দিকটা খোলাখুলি আলোচনা করেছিল—ওভাবে কথা বলে কথাটা বাতিল করে দিলে তার কোনো অপমান হয় না, এটা সুনীল জানে।

নিজের মনটা তার নরম হয়ে গিয়েছে বলে, সেদিনের পর থেকে একটা প্রত্যাশা নিয়ে স্বপ্ন ও কল্পনার জাল বুনতে শুরু করেছিল বলে সুনীলের স্বাভাবিক ও সঙ্গত ব্যবহারে এতখানি আঘাত লেগেছে, নিজেকে অপমানিতা মনে হয়েছে।

সুনীল কী করে জানবে যে সম্প্রতি তার মধ্যে এই দুর্বলতা এসেছে ?

সে নিজেই সেদিন সুনীলের প্রস্তাবকে আমল দেয়নি। কিছুদিন ভেবে দেখার কথা বলেছিল।

সুনীল যদি ধরে নিয়ে থাকে যে, কথাটা তারপর আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেছে, তাকে তো দোষ দেওয়া যায় না।

তা ছাড়া এটা তার শখের বিয়ে নয়।

কাগজটার জন্য টাকা দরকার বলে জীবনে সে একটা ঝঞ্ঝাট বাড়াচ্ছে।

মায়া এ সব কথা তলিয়ে ভাববাব সুযোগ পায় বলে অতি অল্পের জন্য তাদেব ঝগড়াটা বেঁচে যায়। বেলা হলে মায়া সহজভাবে শান্ত মনে নিজেই সুনীলের সঙ্গে কথা বলতে যেতে পারে।

আলপনা বলে, খবর শুনেছ মায়াদি ?

শুনলাম তো।

দাদার শেষে এই মতি হল ?

কেন, দোষ কী ? বড়োলোকের মেয়ে, অনেক টাকা পাবে।

আলপনা গম্ভীর হয়ে বলে, তা ঠিক বলেছ। দাদাকে দিয়েই এ রকম কাণ্ড সম্ভব। হৃদয় বলে তো কিছুই নেই, শুধু দরকারের হিসাব। টাকার দবকার হয়েছে, একজনকে বিয়ে করলে টাকা পাওয়া যাবে, করো তাকে বিয়ে। বউ কেমন হবে না হবে তাতে কী এসে যায় ?

মায়া বলে, সব সময় সব মানুষকে এ রকম সোজাসুজি বিচার কোরো না বোন। তুমি কী করে জানলে মেয়েটার কথাও তোমার দাদা ভাবেনি ?

আলপনা ভড়কে যায়।

তার মানে ?

দাদার মনের মধ্যে ঢুকেছ কী ? বড়োলোকের খোঁড়া মেয়েকে টাকার লোভে বিয়ে করবে শুধু বাজেমার্কা মানুষ—হয় বাজে লোকের হাতে সারা জীবন কষ্ট পাবে, নয় জীবনে কোনো সাধ-আহ্লাদ মিটবে না। এটা হিসেব ধরেও হয়তো তোমার দাদা বিভাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। কেবল টাকার জন্যেই নয়।

আলপনা মায়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মায়া বলে, নিজের শখের কথা তোর দাদা কত কম ভাবে জানিস না তুই ? তোরাই বলিস মানুষটার হৃদয় নেই !

সুনীল স্নান করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

মায়া যতদূর সম্ভব মুখ গম্ভীর করে বলে, এ সব কী শুনছি ? তুমি নাকি বিভাকে বিয়ে করবে ? তা হবে না। তুমি আগে আমায় কথা দিয়েছ, আমি ছাড়ব না।

সুনীল বলে, তুমিই তো রাজি হলে না তখন। ভাগ্যে রাজি হওনি মায়া ! আমার এতগুলি টাকা পাবার সুযোগ ফসকে যেত।

মায়া ভাবে, ঠিক যা সে ভেবেছে ! সেদিন সে রাজি হয়নি বলে কথাটা একেবারে বাতিল ধরে নিয়েছে সুনীল। নইলে একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা বলে নিলে জগৎ-সংসার উলটে গেলেও কি এ মানুষটার কথার নড়চড় হত !

মুখে সে বলে, কে বললে রাজি হইনি ? আমি তো রাজিই হয়ে গেলাম। তোমার মত বদলানো দরকার হতে পারে মনে করে কয়েকদিন কথাটা তোমায় ভেবে দেখবার সুযোগ দিয়েছিলাম।

সুনীল হেসে বলে, সেই এককথাই দাঁড়াল। আমি ভেবেচিন্তে মত বদলেছি—তুমি যে সুযোগ দিয়েছিলে সেটা কাজে লাগিয়েছি। কাজেই আমার কোনো দোষ নেই।

মায়া এবার হাসে।

তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বলো ? আমি কিন্তু সত্যি রাগ করতে পারি। আমায় একবার জানানোও দরকার মনে করলে না ? অন্য সব বিষয়ে তো আমার সঙ্গে পরামর্শ কর ! কাগজের জন্য টাকার দরকারের কথাটা আমায় জানাতে পারলে, টাকা জোগাড়ের এ রকম উপায়ের কথাটা একেবারে চেপে গেলে।

সুনীল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের ভাব লক্ষ করে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে সত্যই বিব্রত মনে হয়।

তারপব সহজভাবেই সে বলে, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করার কথা ভেবেছিলাম মায়া। কিন্তু ভেবেচিন্তে দেখলাম এ ব্যাপারে তোমার পরামর্শ না নেওয়াই ভালো। পরামর্শ তুমি দিতে পারবে না, আমার মাথা গুলিয়ে দেবে। এ এমন একটা ব্যাপার যে আমার একার বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

মায়া চুপচাপ তার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করে।

সুনীল আবার বলে, তুমি আমার ভালোই চাইতে তাতে আমার সন্দেহ নেই। তোমার ঈর্ষা হবে, তুমি চোখ-কান বুজে আমাকে ঠেকাবার চেষ্টা করবে, এ ভয় আমি করিনি। আমার মঙ্গল চেয়েই তুমি আমায় ভুল পরামর্শ দিতে। কাবণ হাজার মঙ্গল চেয়ে হাজার চেষ্টা করেও ঠিক আমার অবস্থায় নিজেকে ভাবা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়াও একটা বড়ো প্রশ্ন, আরেকজনের সারা জীবনের সুখদুঃখের দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। এ প্রশ্নটা ঠিকভাবে বিবেচনা করাও অসম্ভব তোমার পক্ষে।

মায়া অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তুমি সুখী হতে পারবে তো ?

সুনীল তার ব্যাকুল প্রশ্নের জবাবে হেসে বলে, ঠিক এই কথাটাই বললাম এতক্ষণ। একটি মেয়ের সারাজীবনের সুখদুঃখের দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে—আমার সুখদুঃখের প্রশ্নটাও যে তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তুমি সেটা ধরতে পারবে না। এই কথাটাই আমাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়েছে। এ তো শুধু একটা নীতি বা আদর্শের কথা নয়। তোমার মনে কেবল প্রশ্ন জাগছে,—আমি সুখী হব তো ? আমাকেও ঠিক এই কথাটা বিবেচনা করতে হয়েছে। কারণ আমি যদি সুখী না হতে পারি, আমার যদি মনে হয় জীবনটা এদিক দিয়ে আমার ব্যর্থ হয়ে গেল—বিভাকে সুখী করার সাধ্য আমার হবে না। যতই সংকল্প করি আর প্রতিজ্ঞা করি যে ওকে সুখী করবই—আমি নিজে অসুখী হলে শেষ পর্যন্ত বেচারাকে চোখের জলে ভাসতে হবেই। আমি নিজে সুখী না হলে আরেকজনকে সুখী করার দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতাও আমার থাকবে না।

মায়া বলে, এবার বুঝেছি। সাধে কী এত বড়ো হৃদয় থাকতেও লোকে তোমায় হৃদয়হীন ভাবে ? সুখদুঃখের হিসাবনিকাশটা পর্যন্ত তুমি অঙ্ক কষার হিসাবে দাঁড় করিয়েছ।

অঙ্কশাস্ত্র বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ভুল করবে না।

বেশ তো। আমি বোকাহাবা মেয়েমানুষ, আমাব একটা কথার সোজাসুজি জবাব দাও। হিসেব কষে দেখলে তুমি সুখী হবে ?

বিভাকে নিয়ে সুখী হব কি না জানি না। দেখলাম, ওটা হিসাব করে বার করা যায় না—অন্তত আমার সে ক্ষমতা নেই। কারণ ওই রকম সুখী হওয়াটা ঠিক কী ব্যাপার আমার কোনো ধারণাই নেই। তবে এটা জেনেছি যে অসুখী হব না। তা ছাড়া অন্যদিকে সত্যই সুখ পাব—কাগজটা দাঁড় করাবার জন্য লড়াই করার সুখ। আবেকটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি—বিভাকে অসুখী করব না। নইলে ও বেচারাকে সুখী করার দায়িত্ব নিতে পারতাম ?

মায়া একগাল হেসে বলে, তার মানেই তুমি ববাবর ওই মেয়েটাকে ভালোবেসে এসেছ।

সুনীলও হাসে।

মুশকিল হল কী জানো ? ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানি না। আমার এই মনোভাবটা, এই বিচারবিবেচনা হিসাবনিকাশটা তোমার মতে যদি ভালোবাসা হয়, আমার কিছুই বলার থাকবে না। কিন্তু একটা কথা ভুলে যেয়ো না। কাগজের জন্য টাকার দরকার না হলে ওকে বিয়ে করার কথা আমার মনেও আসত না। ভালোবাসা কি এ রকম বাস্তব প্রয়োজন দাঁড়াবার পর জন্মায় ?

মায়া বলে, যাক গে, ভালোবাসা থাক বা না থাক যাকে খুশি তোমাব বিয়ে করো আমার বয়ে গেল। আমার একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দাও, তাহলে আমি খুশি হব।

তোমার কীসের চিকিৎসা ?

আমি তো মেয়েমানুষ ? আমার কেন বউ হতে, মা হতে, সাধ যায় না ? তুমি বউ কবতে চাইলে, মা হবার সুযোগ দিতে চাইলে, তবু আমি রাজি হতে পারলাম না !

সুনীল বলে, এই ব্যাপার ! স্পেশালিস্ট দেখিয়ে মতামত নিতে হবে না, আমিই বলে দিচ্ছি তোমার কী হয়েছে। মা হয়েছ বইকী। বাবা বিছানায় পড়ে আছে, মা আর ভাইবোনেবা নিরুপায়—ওদের মা হতে হয়েছে তোমাকে। এ দেশে অন্যরকম মা হতে গেলে আর ওদের মা থাকা যাবে না, কাজেই তোমাকে বউ হয়ে ছেলেমেয়ে বিইয়ে মা হবার আশা ছাড়তে হয়েছে।

শুধু দায়িত্বপালন ?

দায়িত্বপালন। এ সব অস্বাভাবিক দাযিত্ব, কিন্তু সমাজ আর রাষ্ট্র দুই-ই অস্বাভাবিক, কাজেই এ দায়িত্ব না নিয়ে উপায় নেই। তুমি হিসাবনিকাশ করে দ্যাখোনি কিন্তু টের পেয়ে গেছ যে একজন পুরুষের বউ আর ছেলেমেয়ের মা হতে গেলে এদের ভাসিয়ে দিতেই হবে। তোমার তাই বউ হতে, মা হতে, এত বিতৃষ্ণা। অনেকে ভাবে দায়িত্ব মানেই নীরস কঠোর কর্তব্য করা, নিজেকে বঞ্চিত করা। তুমি হাতেনাতে দায়িত্ব পালন করে দেখেছ, এতেও কম রস নেই, এভাবেও জীবনে কম রং আসে না।

মায়া খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করে, এটা তাহলে আমার রোগ নয় ?

সুনীল বলে, রোগ বইকী। তবে রোগটার জন্য তুমি দায়ি নও। যারা দায়ি আমার কাগজটায় তাদের মুখোশ খুলে দিচ্ছি।

মায়া বলে, এবার বুঝেছি। তুমি আমার কাছে একটা লেখা চেয়েছিলে না ? স্কুলটার বিষয়ে ? কীভাবে স্কুল চালাই, কী ধরনের ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে, পাস করে চাকরি-বাকরি কীরকম পায় ? কালকেই লেখাটা দিয়ে আসব।

মায়া চলে যাবার পর নবীন আসে।

সুনীল তখন স্নান করে খেতে বসেছে।

নবীন চটের আসনটা টেনে বিছিয়ে জাঁকিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করে, কথাটা কি সত্যি সুনীলদা ? আপনি বিভাদিকে বিয়ে করছেন ?

সত্যি বইকী। তুমি যথাসময়ে দুপক্ষের নেমন্তন্ন পাবে।

নবীন বলে, সে তো পাবই। অঘোরবাবুর কাছে খবরটা যাচাই করতে গিয়েছিলাম, বিভাদি অঘোরবাবুকে দুধ-খই খাওয়াচ্ছিল। আমাকে সন্দেশ দিল। অঘোরবাবুর নাকি সন্দেশ সয় না, মিষ্টি জিনিস খাওয়া বারণ। বিভাদির সামনে অঘোরবাবু আমার পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন।

ভালোই তো।

আমি রিজাইন দেব ভাবছি।

ভেবেচিন্তে যদি রিজাইন দেওয়া ভালো মনে কর, রিজাইন দেবে।

আলপনা চা এনে দেয় কিন্তু নবীনের সঙ্গে কথা বলা চলে না।

নবীন গরম চায়ে চুমুক দিয়ে জিভ পুড়িয়ে খানিকক্ষণ মুখ বাঁকিয়ে থেকে বলে, আপনি বিভাদিকে বিয়ে করছেন বলেই আমার মাইনে বাড়াল। অঘোরবাবু নিশ্চয় ধরে নিয়েছেন আমি ঘটকালি করে বিয়েটা ঘটিয়েছি। অঘোরবাবু জানেন যে বিভাদি দরকার হলেই আমাকে আপনার কাছে পাঠাত—গাড়ির ড্রাইভার থেকে শুরু করে অঘোরবাবুর অনেকগুলি স্পাই আছে।

সুনীল চিচিঙ্গার ছেঁচকি দিয়ে শক্ত মোটা ভাত মাখতে মাখতে বলে, ভালোই তো হয়েছে।

নবীন বলে, আপনি তো বলবেন ভালোই হয়েছে। আমার মন যে উলটো কথা বলছে ? আপনি অঘোরবাবুর মেয়েকে বিয়ে করবেন, আমার পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়ল—আপনার বোন আগেই বলেছিল কাজে রিজাইন দিয়ে আপনার কাগজে যোগ দেওয়া উচিত ছিল। আমি তা করিনি বলে আপনার বোন আমাব সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে।

সুনীল বলে, এটা আবার কী রকম কথা শুনছি ? আলপনা যে আমায় বললে তুমি প্রতিজ্ঞা ভাঙানোর জন্য কথা বন্ধ করেছ ?

নবীন জোর দিয়ে বলে, না, ওটা মিছে কথা। আমি নই, আপনার বোন কথা বন্ধ করেছে। কথা বন্ধ করার পর আমি ভেবেচিন্তে দেখলাম যে সত্যই তো, আপনার সঙ্গে আমার কথা বন্ধ থাকলে ও আমাব সঙ্গে ভাব বাখে কী করে ? তাছাড়া আমিই ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার করেছিলাম আপনার সঙ্গে।

সেটা বুঝতে পেবেছ ?

পেরেছি বইকী ! নইলে আমি মরে গেলেও আপনার সঙ্গে যেচে এসে ভাব করতাম ভেবেছেন ? আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙলাম কিন্তু আপনার বোনের রাগ ভাঙল না।

কী কবে জানলে রাগ ভাঙেনি, তোমার সঙ্গে কথা বলবে না ? ডেকে যাহোক কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেই দ্যাখো না !

নবীন বলে, আমি কেন যেচে কথা বলতে যাব ? যে আগে কথা বন্ধ করেছে সেই আগে কথা বলবে। আমার যা করার ছিল আমি করেছি, এখনও রেগে থাকবে কেন ?

সুনীল হেসে বলে, বেশ কবেছে। তোমাদের মতো খোশামুদে মতলববাজ ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বন্ধ করাই উচিত।

নবীন বলে, বটেই তো। বোনের দিকে টানবেন বইকী।

ভাই বোনের দিকে টানবে এটা তোমার কাছে বুঝি খুব খাপছাড়া ব্যাপার ?

এ ছেলেমানুষি রাগ-অভিমান ওদের মিটে যাবে, সে জন্য সুনীল ভাবে না। কিন্তু ছেলেমানুষ নবীন, সুনীলকে বড়োই দমিয়ে দিয়ে যায়। তার মনে হয় যে তার সমস্ত হিসাবনিকাশের মধ্যে কোথাও যেন মস্ত একটা ছেলেমানুষি গলদ রয়ে গেছে। তাকে আর নন্দার কাগজটাকে বেদখল করার জন্য

চারিদিকে যে ষড়যন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার ফাঁদে সে ধরা দিয়েছে নিজে। তাকে সোজাসুজি বশ করা যায় না, সাধারণ স্বার্থ আর সুবিধার হিসাবটা তার খাপছাড়া, তাই তার নিজের পছন্দমতো পথে চলার ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে বাগাবার কৌশল করা হয়েছে।

বিভা না জানুক তাকে জয় করার খেলায় বিভা অঘোরদের হাতের একটি খুঁটিমাত্র।

কাগজটা বাঁচাবার জন্যও অঘোরের কাছে সে টাকা নেবে না জানা কথা, তাই এমনভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে সে যেন স্বেচ্ছায় খুশি মনে অঘোরের মেয়েকে বিয়ে করে অঘোরের টাকা নিতে এগিয়ে যায়, নিজে বিচার-বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কার করার আত্মপ্রসাদ নিয়ে সে যেন ধরা দেয় অঘোরেরই ফাঁদে।

সে মনে করুক না যে তারই জয় হয়েছে। এই ছেলেমানুষি অহংকার নিয়ে সে যত খুশি তৃপ্তি পাক না। কী তাতে আসে যায় অঘোরের !

সে তো নিজের মতলব হাসিল করে নিচ্ছে তাকে দিয়েই।

দারুণ অস্বস্তির মধ্যে তার সময় কাটে। নিজেকে তার আজ অসহায় মনে হয় বিশেষভাবে এই জন্য যে সে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, নিজের বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করে এতদূর এগিয়েছে যে এখন নিরপেক্ষভাবে সমস্ত বিষয়টা তলিয়ে দেখা তার পক্ষেও সম্ভব নয়, অন্যের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করাও সম্ভব নয়।

কাগজের আপিসে যাওয়ার আগে সে নন্দাদের বাড়ি যায়। বেলা তখন তিনটে বাজে, নন্দা অবেলায় খেয়ে নিশ্চিন্তমনে আরাম করে ঘুম দিচ্ছিল। চোখে মুখে জল দিয়ে উঠে এসে সুনীলের সামনে আঁচলের আড়ালে মস্ত একটা হাই তুলে সে লজ্জা পেয়ে হাসে।

সুনীল রীতিমতো ঈর্ষা বোধ করে।

কে জানে নন্দাও তার সঙ্গে কী খেলা খেলছে। উদারতার ভান করে কাগজের মালিকানার অংশের সঙ্গে কাগজটার সমস্ত দায় তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

নন্দা বলে, আপনার মুখ যে শুকনো দেখাচ্ছে ? শরীর ভালো নেই ? বড়ো বেশি খাটছেন আপনি।

সুনীল বলে, খাটলে শরীর খারাপ হয়? যে বোঝা চাপিয়েছেন, ভাবনায় চিন্তায় ঘুম হয় না।

নন্দা নালিশের সুরে বলে, আমায় দোষ দেবেন না, আমি হালকা বোঝাই চাপিয়েছিলাম। সে রকম রাখলে ঠুকঠাক করে জোড়াতালি দিয়ে অনায়াসে কাগজটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। বোঝা ভারী করেছেন আপনি নিজে। কাগজের ভার বাড়াবেন, কাগজ নিয়ে চারিদিকে হইচই লাগিয়ে দেবেন, হাঙ্গামা পোয়াবেন না ?

সুনীল একটু ভাবে।

খানিকটা বাড়াবাড়ি করছি, না ?

মোটেই না। কাজটা যদি সহজ হত তবে আপনার মতো লোকের দরকার পড়ত নাকি ! তবে টাকার জন্য যে ব্যবস্থা করছেন সেটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে কি না বলতে পারব না। আমরা সবাই থ বনে গেছি।

কেন ? বিয়ে করাটা এমন কী অদ্ভুত ব্যাপার ?

টাকার জন্য আপনার এভাবে বিয়ে করাটা অদ্ভুত ব্যাপার বইকী। তাও অঘোরবাবুর মেয়েকে বিয়ে করছেন। কাগজের সকলের মুখে আর কোনো কথাই নেই। মত হয়েছে দুরকম—আপনার পক্ষে আর বিপক্ষে।

সুনীল কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কী বলছে দুপক্ষ ?

নন্দা বলে, শিশিররা কয়েকজন বলছে এভাবে টাকা সংগ্রহ করা উচিত নয়, এতে নৈতিক জোর কমে যায়। আপনি খাঁটি থাকলেও কেবল এভাবে টাকা জোগাড় করার জন্যই শেষ পর্যন্ত ফলটা খারাপ দাঁড়াবে। এর চেয়ে পাবলিকের কাছে চাঁদা চেয়ে সাহায্য চেয়ে টাকা তোলা ভালো ছিল, জনসাধারণের উপর নির্ভর করাই সব সময় উচিত।

অন্যপক্ষ কী বলছে ?

বিভূতিবাবু নরেশ এরা আপনার প্রশংসা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

কাগজের এই সংকটের সময় কাগজটার জন্য আপনি যে স্বার্থত্যাগ করছেন তার নাকি তুলনা হয় না।

সুনীল এবার হাসে।

আপনি নিজে কী ভাবছেন ?

ওই যে বললাম ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমি অবশ্য আপনার কোনো কাজেই বাধা দেব না, আগেই সেটা আপনাকে বলে দিয়েছি। এটুকু স্বাধীনতা না দিলে দায়িত্ব দেওয়ার কোনো মানে হয় না। যেভাবেই জোগাড় করুন, কাগজটার পিছনে শেষ পর্যন্ত আপনিই টাকা ঢালবেন বেশি। আমার মন কিন্তু খুঁতখুঁত করছে, তা জানিয়ে রাখি। দাদা অবশ্য আপনার পক্ষ নিয়ে খুব লাফাচ্ছে।

প্রদ্যোতবাবু বাড়ি নেই ?

নাইতে গেছে।

তার স্বপক্ষে প্রদ্যোতের কী বলার আছে শুনবার জন্য সুনীল অপেক্ষা করে। নিখিলের ষড়যন্ত্র করে ছাপিয়ে দেওয়া সম্পাদকীয় প্রত্যাহার করলে কাগজের প্রেস্টিজ নষ্ট হবে বলে সে যে জেলে গিয়েছিল, তারপর থেকে তার বিচার-বিবেচনাকে সুনীল বিশেষ মূল্য দেয়।

স্নান করে এসে প্রদ্যোত খুশির সঙ্গে বলে, এই যে সুনীলবাবু ! এ দেশে অনেক রকম ত্যাগের কম্পিটিশন চলে আসছে বহুকাল ধরে, আপনি নতুন রকম ত্যাগের নমুনা দেখালেন।

ত্যাগ কী রকম ? বিয়ে করেছি, টাকা পাচ্ছি—

বিয়ে না করাটা আর এভাবে টাকা না পাওয়াটা অনেক দামি ছিল আপনার কাছে। কাজেই এটা ত্যাগ বইকী !

নন্দাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুনীল কিছুক্ষণ ইতস্তত করে। তারপর কাগজের আপিসে যাওয়ার বদলে রওনা দেয় অঘোরের আপিসের দিকে।

ধীরে ধীরে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তার মনে। তার অস্বস্তি বোধ করার কারণ হল অঘোর। বিভাকে সামনে রেখে অঘোর মতলব হাসিল করছে এই খাপছাড়া চিন্তা সে বাতিল করে দিয়েছে।

তাকে জামাই করার পর অঘোর কোনো মতলব আঁটবে কি না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে না পারলে তার অস্বস্তি যাবে না।

আগে যে ঘরে সে নিজে কাজ করত সেখানে ঢুকতেই চেনা কর্মচারীদের মধ্যে একটা শোরগোল পড়ে যায়। নানাপ্রশ্ন আর মন্তব্যে সুনীলকে যেন ঝাঁঝরা করে ফেলার চেষ্টা চলে।

এ আপিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে একটা খবরের কাগজ চালিয়ে চারদিকে হইচই পড়িয়ে দিয়েছে, তারা কী ধারণাও করতে পেরেছিল, সুনীল একদিন এই লাইন ধরবে !

সনৎ বলে, কার মধ্যে যে কী প্রতিভা গোপন থাকে জানা যায় না। আপনি তার প্রমাণ দেখালেন।

সুধীর জিজ্ঞাসা করে, এডিটোরিয়ালগুলি কি আপনিই লেখেন ? তর্ক করার সময় আপনি যেভাবে যুক্তি দিতেন কাগজের লেখায় তেমনিভাবে যুক্তি সাজানো দেখতে পাই কিনা !

ভূপেন বলে, খুব জোরালো লেখা হচ্ছে। শত্রু বাড়াচ্ছেন খেয়াল বাখবেন কিন্তু।

বুড়ো নরেশ বলে, শত্রু তো বাড়বেই। খাঁটি কথা বললে খাঁটি কথা লিখলে মতলববাজদের স্বার্থে ঘা লাগে। শত্রু যত বাড়ছে তার চেয়ে বন্ধু ঢের বাড়ছে এটাও ভুলবেন না যেন।

অঘোরের মেয়েকে সে যে বিয়ে করবে এ কথাটা কেউ উল্লেখও করে না। সুনীল টের পায়, এরা তাকে লজ্জা দিতে চায় না তাই কথাটা সকলে চেপে যাচ্ছে।

অঘোরের ঘরে ঢুকতে সে হাসিমুখে সানন্দে তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

তার সামনে টেবিলে খান চারেক ইংরাজি বাংলা দৈনিক কাগজ পড়েছিল, সুনীলদের কাগজও তার মধ্যে ছিল। কাগজটা তুলে নিয়ে অঘোর বলে, তোমাদের এডিটোরিয়ালটা পড়ছিলাম। তোমাদের লেখার আসল কায়দাটা বেশ ধরা যায়—তোমবা কোনোরকম কায়দা করার চেষ্টা কর না। বিভা তাই বলছিল—কায়দা না করার কায়দা দিয়ে তোমরা পাবলিককে বশ কবছ।

তাদের সেদিনকার কাগজে প্রধান সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল চোরাবাজাবকে আক্রমণ করে। কিন্তু কড়া লেখাটা পড়ে যেন খুশিই হয়েছে অঘোর। ভাবী জামাইযেব দিকে সে স্মিতমুখে চেয়ে থাকে।

যেন জানাতে চায় যে তুমি যা কর তাতেই আমার সমর্থন আছে।

সুনীল দেখা করতে আসাব কারণ হিসাবে বলে, আমি আপনাব কাছে এসেছিলাম নবীনেব ব্যাপারটা জানতে।

অঘোর বলে, নবীন ? নবীন ভালো কাজ করছে। ওব মাইনে বাড়িযে দির্যেছি।

সুনীল বলে, আপনি জানেন তো আমার বোনের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হয়েছে ? ওব সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী রকম ?

ছেলে খুব বুদ্ধিমান তবে একটু খেযালি। কাজ করলে বেশ মন দিয়েই করে কিন্তু দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। বয়সের সঙ্গে এটা কমে যাবে আশা কর্বছি। বিভা ওকে খুব স্নেহ করে। মেয়ের খাতিরে ওর খামখেয়ালি খানিকটা সয়ে যেতে হয়, উপায় কী।

মাসিকটাকে সাপ্তাহিক করে চালাবে শুনছিলাম ? আপনি নাকি ফাইন্যান্স করবেন ?

হ্যাঁ। একটা বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ চালিয়ে দেখা যাক কিছুদিন ! তারপর দৈনিকেব কথা ভাবা যাবে। তোমরা তো তোমাদের কাগজে মাথা গলাতে দিলে না।

সুনীল বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে অঘোবেব মুখের ভাব লক্ষ করে। তাদের খবরের কাগজটি সম্পর্কে অঘোর যে বর্তমানে উদাসীন তাতে সন্দেহ নেই। কাগজ সম্পর্কে হাল ছেড়ে দিযে এখন সুনীলকে জামাই হিসাবে বাগাতে পারার আনন্দে নয়, মেয়ের বিয়ে হবে এই আনন্দেই সে মশগুল।

কিন্তু সম্পর্ককে পরে কাজে লাগাবার কথা সে কি কিছুই ভাবেনি ?

সুনীল বলে, আপনাকে আগেই জানিয়েছি আমি কাগজটার অংশীদারমাত্র, এই অংশও আমাকে দেওয়া হয়েছে এই শর্তে যে আমি অন্য কারও কাছে বিক্রি করতে পারব না।

অঘোর বলে, থাক থাক, সে জন্য কী ! তুমি আছ বলেই একটা দৈনিক চালাবার শখ হয়েছিল। আমি হলাম কী জানো, ব্যবসায়ী মানুষ, আমরা সব সময় চেষ্টা করব ঝোপ বুঝে কোপ বসাতে। কাগজটার উন্নতি তুমি করবেই জানতাম, তাই ভাগ বসাতে আগ্রহ হয়েছিল। তুমি এখন আমার নিজের লোক হয়ে যাচ্ছ, কাগজটার লাভ তোমার থাকা আমার থাকা সমান কথা।

খবরের কাগজে লাভ অবশ্য অনেকটা অনিশ্চিত থাকে। কখনও ওঠে, কখনও পড়ে যায়।

সে তো বটেই। ব্যাবসামাত্রেই ওঠাপড়া আছে।

আরও কিছুক্ষণ অঘোরের সঙ্গে আলাপ করার পর সুনীল বিদায় নেয়। এ বিষয়ে তার সন্দেহ থাকে না যে কাগজ সম্পর্কে অঘোরের মনে এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট চিন্তা বা পরিকল্পনা নেই, ও চিন্তা সে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখেছে। অনির্দিষ্ট আশা হয়তো তার মনে আছে, কিন্তু কোনো মতলব নেই।

এটা টের পেয়ে সুনীল নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কারণ অঘোর কাগজটা সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু যে ভেবে রাখেনি, তার মানেই দাঁড়ায় এই যে তাকে জামাই করার পথে ভবিষ্যতে কাগজটা সম্পর্কেও সুবিধা করে নিতে পারবে, এ বিষয়ে অঘোর অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

অঘোরের আপিস থেকে সুনীল বিভার কাছে যায়।

বলে, তোমায় স্পষ্টভাবে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম। তোমায় বিয়ে করা ছাড়া আর কোনো শর্ত থাকবে না তো আমার টাকা পাওয়ার ?

বিভা আশ্চর্য হয়ে বলে, আবার কীসের শর্ত ?

তোমার বাবা যদি কোনো গোলমাল করেন ?

ইস। গোলমাল করলেই হল ! বাবা তো আর তোমায় টাকা দেবে না, টাকা দেব আমি। বলো না এখুনি চেক লিখে দিচ্ছি।

এ টাকাও তোমার বাবার, ভুলে যাচ্ছ ? চেক নিয়ে যদি তোমায় বিয়ে না করি ?

তোমার কী হয়েছে বলো তো ? এ সব আবোল-তাবোল কী বকছ ? না করলে করবে না বিয়ে। আমি কী মামলা করতে যাব তোমার নামে ? সুনীল চুপচাপ বসে খানিকক্ষণ সিগারেট টানে।

তোমার জন্যই আমি একটা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি। তোমার জীবনে আমি না অশান্তি নিয়ে আসি।

কেন ?

আমার পক্ষ নিয়ে বাবার সঙ্গে যদি তোমার লড়াই করতে হয় ? সম্পর্ক আর টাকার বিনিময়ে উনি যদি আমার কাছে কিছু বাগাবার চেষ্টা করেন, তাই নিয়ে ওর সঙ্গে যদি তোমার ঝগড়া হয় ? তুমি দোটানায় পড়ে কষ্ট পাবে।

বিভা দ্বিধামাত্র না করে বলে, না। কষ্ট পাব, দোটানায় পড়ব না। বাবা যদি অন্যায় করে তোমার কাছে কিছু বাগাতে চায়, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার দোটানার কষ্ট হবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি বলে বুকে জোর পাব। দরকার হলে, বাপের দিক ছেড়ে মেয়েরা স্বামীর দিকেই ঝোঁকে—এটাই তো চিরকালের নিয়ম। তবে আমার মনে হয়, ও রকম কোনো আশঙ্কা করার কারণ তোমার নেই। নিজের বাপের নিন্দে করতে নেই কিন্তু বাবার দোষের দিকগুলি আমি জানি না, ভেব না। দোষ যতই থাক, মেয়ের জীবনে অশান্তি ঘটবে এমন কিছু বাবা করতে পারবে না।

বিভার জোরালো আত্মবিশ্বাস সত্যই বুকে বল এনে দেয় সুনীলের। অনেকটা হালকা মন নিয়ে সে কাগজের আপিসে যায়।

Space →

[illegible]

পাশাপাশি পাণ্ডুলিপি চিত্র

সার্বজনীন



সার্বজনীন প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

লেখকের কথা

এই উপন্যাসের পূর্ববঙ্গত্যাগী চরিত্রগুলিব মুখে তাদের কথ্যভাষা, এমনকী, বিশেষ টানটুকু দেবাবও চেষ্টা কবিনি। তার কারণ, এই উপন্যাসে আরও অনেক প্রধান চরিত্র আছে যারা ও ভাষায় কথা বলে না, যাদের কথায় ও রকম টান নেই। এ ক্ষেত্রে কতগুলি চরিত্রের মুখে স্বাভাবিক আঞ্চলিক ভাষা বা টান দিলে চবিত্রগুলির মধ্যে একটা ভাগাভাগি এনে দেওয়া হত।

কোনো কাহিনিতে দু-চারটি বিশেষ চরিত্রকে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলানো যায়—তাতে চরিত্র-ক-টির বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট ও স্বাভাবিক হয়। বিশেষ কাহিনিতে বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়া চবিত্রগুলিকে মোট দুটি ভাগ করে দুরকম আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলানো উচিত নয়—বিশেষ করে চরিত্রগুলি যদি একই শ্রেণির মানুষ হয়।

আমার এই উপন্যাসে কোনো চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা আমদানির কোনোই প্রয়োজন নেই। এই কাহিনির মূল ভিত্তি হল সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সংকীর্ণ সীমা ভেঙে গিয়ে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার যে নতুন গতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমাজের কোনো শ্রেণিতে ভাঙন ধরার অর্থ অনেকে মনে করেন মানুষগুলিবও ভেঙে চুরমাব হযে শেষ হয়ে যাওযা—আসলে মানুষগুলিব জীবনও নতুন দিকে গতি পায়, নতুন বূপ গ্রহণ করতে থাকে। সমাজ জীবনে ভাঙন ধরার সঙ্গে গড়ন চলাও থাকবেই।

কাজেই এই কাহিনিতে কতগুলি চরিত্রকে আবও বেশি বাস্তব করার উদ্দেশ্যে তাদের মুখে আঞ্চলিক ভাষা দান করলে চরিত্রগুলির পবস্পরের সম্পর্কের মধ্যে একটা অকারণ ও নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যবধান সৃষ্টি কবা হত, কাহিনি ব্যাহত হত।

এই কৈফিয়ত দেবার কারণটা বলি। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে সকলেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে। অন্য বইয়ে এ পর্যন্ত যত পূর্ববঙ্গীয় চবিত্র এনেছি সকলকেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলিয়েছি। এই কাহিনিতে সর্বপ্রথম ও রকম চরিত্রের মুখে সাহিত্যের চলতি কথ্যভাষা বসালাম।

এক

সদানন্দ পুরুষ। সর্বদা হাসিখুশি ভাব।

অতি লাগসই মৃদু ও মার্জিত ঠাট্টা-তামাশা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষকে তো হাসিয়ে মারেই—হতাশার কালি লেপা গোমড়া মুখে পর্যন্ত হাসির অন্তত একটু ঝিলিক ফুটিয়ে ছাড়ে।

আজকের পৃথিবীতে এ রকম মানুষ কল্পনা করা কঠিন মনে হলেও এ কথা সত্য যে কোনোদিন কেউ তাকে চিন্তিত দেখেছে বলে স্মরণ করতে পারে না। দুশ্চিন্তার মানেই যেন সে জানে না। কী করে মুখ ভার করতে হয় সেটা শিখবার সুযোগ যেন তার চল্লিশ বছর বয়সে জোটেনি—মুখে মেঘের ছায়াটুকু সঞ্চার করাও যেন তার পক্ষে অসাধ্য !

কতকগুলি পদার্থ বিদ্যুৎ তাপ ইত্যাদির গতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করে। কতকগুলি পদার্থ আবার চল্লিশ বছর জলে ভিজিয়ে রাখলেও ভেজা দূরে থাক, স্যাঁতসেঁতে পর্যন্ত হয় না—সাধারণত জলের বদলে খাঁটি চোখের জল প্রযোগ করলেও নয় !

তার ধাতটাও যেন গড়া হয়েছে শোক-দুঃখ-বেদনার শক প্রতিরোধক মাল-মশলা দিয়ে। হাসি আনন্দেপ ওয়াটারপ্রুফধর্মী আবরণে এমনভাবেই যেন তার হৃদয়-মন ঢাকা যে জগতে নিরানন্দের বর্ষা আছে এটা সে টেরও পায় না !

সে বলে, ঈশ্বর আছেন, আমি আছি। ঈশ্বর সত্যই আছেন, আমি আছি কিনা সেটাও ঈশ্বর জানেন। আমি জানি ঈশ্বর আছেন, তাই আমিও আছি। নইলে কী করে জানব ঈশ্বর আছেন ? এটা অতি সোজা কথা। পাত্রাধার তৈল কী তৈলাধার পাত্র—সে ইয়ার্কি নয় ! সহজ সরল কথা। আমি আছি কী নেই ? এটা জানেন ঈশ্বর। বেশ কথা। ঈশ্বর কী জানেন বা না জানেন সে প্রশ্নই ওঠে না। তিনি সব জানেন—আবার কিছুই জানেন না। তিনি অনন্ত কিন্তু সৃষ্টি করেন—আবার অনন্ত শয্যায় অনন্ত ঘুমে ঘুমিয়ে থাকেন। কাজেই হিসাবটা ওদিক দিয়ে নয়। ঈশ্বর আছেন আমি এটা জানি। সেটাই প্রমাণ যে ঈশ্বরও জানেন আমি আছি। আমি যদি না থাকব তবে কী করে জানব একমাত্র ঈশ্বরই জানেন আমি আছি কী নেই ? কাজেই আমি আছি।

বলতে বলতে যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

সত্যি আছি তো ?

কয়েক মুহূর্ত ভয়ার্ত দিশেহারা মানুষের মুখভঙ্গি অপূর্ব অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলে, বিহ্বল নেশাখোরের মতো উপস্থিত সকলের মুখ, নোংরা রাস্তা, সামনের বাগানবাড়ি আর আকাশের দৃশ্যমান অংশটুকুতে চোখ ঘুরিয়ে এনে নিজের পেট চাপড়ে হো হো শব্দে সে হেসে উঠে !

আছি আছি, আমি আছি ! রেশন নিতে এসেছিলাম আমি, ভুলেই গেছিলাম বাবা ! পেটে খিদেটা ছোবল মারছে সাতাশ কোটি সাপের মতো ! আমিই যদি না থাকব, তবে কীসের রেশন, কীসের খিদে !

হাসতে হাসতে সেনদের পাঁচ বছরের মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, তুইও রেশন নিবি বউ ? একলা এসেছিস ? মোটে শখানেক বছর আগে তোকে যে অসতী বলে পুড়িয়ে মারত বউমণি সে কথা বুঝি ভুলে গেছিস ? কুলীন বামুন আমি তোকে টাকা নিয়ে বিয়ে করে বলে যেতাম, খবরদার, বাকি জীবন সতী থাকবি। পাঁচ-ছবছর বয়স হয়েছে, বাকি মোটে আর তিরিশ-চল্লিশটা বছর। আমাকে ধ্যান করে এ ক-টা দিন কাটিয়ে দিবি, বুঝলি ?

হাসির রোল ওঠে।

রেশনের দোকানে রেশন নিতে এসে হত্যা দিয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই হাসতে তো তারা ভুলে যায়নি।

অভাব শুধু হাসাবার মানুষের।

অভাব-অনটন রোগ-শোক দুর্ভিক্ষও যে জ্যান্ত মানুষের হাসির পাট চুকিয়ে দিতে পারে না, এটুকু যে মানুষটা জানে। সত্যই তো. আনন্দময় সুন্দর জীবন যারা দাবি কবছে তাবা যদি উপোস দিয়ে গামছা পরে রেশনের দোকানে এসে হত্যা দিতে হয়েছে বলেই হাসতে ভুলে যাবে, শুধু বেঁচে থাকার আনন্দে এ জগতে তবে হাসবে কারা ?

তবে কি সে জেনেশুনেই হাসায় ? মানুষের হাসির প্রয়োজনটা বড়োই জরুরি বলে ?

বাপ-মা দুজনেরই জ্বর। পাঁচ বছরের মেয়েটা রেশন নিতে এসেছে। তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে ওইটুকু মেয়ে পর্যন্ত উপভোগ করে তার তামাশা।

পাঁচ বছরের ভয়-ভোলা চালাক-চতুর শক্ত মেয়ে !

তার মাথায় পিঠে বাপের মতো হাত বুলোতে বুলোতে সে একেবারে যাত্রাদলেব ভাঁড়ের মতো ভঙ্গি করে বলে, আপনারা তো জানেন না, আপনাদের কী বলব। সেদিন একটি মেয়ে সত্যি আমায় বিয়ে করতে এসেছিল !

সে মুচকে মুচকে হাসে। সকলে উৎসুক আগ্রহে তার রসিকতাব আসল কথাটুকুর জন্য প্রতীক্ষা করে। হাসবার জন্য প্রস্তুত হয়েই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। তারা জানে যে রসিকতার এই ভূমিকা শুধু তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য—এবার সে যা বলবে তাতে না হেসে উপায় থাকবে না তাদের।

পরপর সাজানো রেশন কার্ডগুলি নিয়ে দোকানের যে কর্মচারী এ খাতায় ও খাতায় সে খাতায় এটা ওটা সেটা টুকে নিয়মরক্ষা করছিল—সে পর্যন্ত কলমটা উঁচিয়ে ধরে অপেক্ষা করে।

সে-ও তো পাড়ারই ছেলে।

সে হাসির গাম্ভীর্য দিয়ে মুখটা হাস্যকরভাবে গম্ভীর করে বলে, ভারী সুন্দরী মেয়ে। সত্যি বলছি ভাই, এত সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনও দেখিনি। রং মেটে, মোটাসোটা চেহারা, বোঁচা নাক—

একটু থামে। এদিক ওদিক তাকিয়ে নেয়।

সকালবেলা নাইতে যাব, বাড়িতে এসে হাজির। আমায় জিজ্ঞেস করলে, আপনার অভিভাবক কে ? আমি বললাম, আজ্ঞে আমার তো অভিভাবক নেই ! শুনে বললে, যাকগে, সে জন্য আসবে যাবে না, আপনার সঙ্গে কথা বললেই চলবে। আমি ব্যাচেলার নিউজ এজেন্সি থেকে আপনার খবর পেয়ে এসেছি। কিছু সম্পত্তি আছে, চাকরিও করেন, না ? বিয়ে না করে দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছেন তো ? এটা সমাজ-বিরোধী কাজ, তা জানেন ? এ সব আর চলবে না, আপনাকে বিয়ে-থা করতে হবে।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ঘটকী বুঝি ? জবাব দিলে, না, আমিই তোমাকে বিয়ে করব।

সে নিজে সশব্দে হাসে।

সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ে রেশনপ্রার্থী বালক-যুবক-বৃদ্ধেরা।

পুরানো পচা রসিকতা। তবু সকলে সশব্দে হাসে। তার বলার ভঙ্গিতে সকলের মনে হয় যেন নতুন শুনছে রসিকতাটা। নিখিলের রুচি বোধ হয় খুব মার্জিত, সে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, সস্তা রসিকতা করেন কেন ?

সবাই যে বড়ো গরিব দাদা ! সস্তা না হলে নেবে কেন ?

খদ্দরের শায়া ব্লাউজের উপর রেশন-বিগর্হিত সুপারফাইন শাড়ি—যেটা আজকের সস্তা মসলিন—গায়ে জড়ানো মোটাসোটা মহিলাটি বলে, আপনাকে চাবকানো উচিত !

সে বলে, কেন ? আমি তো মন্ত্রীদের গাল দিইনি !

সকলে আরেকবার হাসে।

মহিলাটি আরও চটে বলে, মেয়েদেব অপমান করছেন—লজ্জা করে না ?

সে যেন আঁতকে ওঠে। মুখে ভয় আর হতাশাব ভাবটা হাস্যকর রকম প্রকট হয়ে পড়ে।

এ কী বলছেন ? কী সর্বনাশ ! মেয়েরা যে আমার মা !

এবার কেউ হাসে না। ভদ্রমহিলা মুখ ফিরিয়ে ঝামটা দিয়ে বলে, ভাঁড় !

বরুণ বলে, মিসেস দাস, আপনি ওঁকে চেনেন ?

মিসেস রেণুকা দাস শুধু মুখ বাঁকায়।

বরুণ বলে, উনিই আমাদের পরমেশ্বরবাবু।

তাতে কী হয়েছে ?

রাগ করবেন না, ইনি অতি সদাশিব লোক। কাউকে ইনি খোঁচা দেন না—এমনিই হাসান। আজকালকার দিনে পাড়ায় একজন হাসাবার মতো লোক থাকা কী সহজ ভাগ্যের কথা !

লোকে না খেয়ে মরছে, উলঙ্গ হয়ে থাকছে, এখন ভাঁড়ামি সয় মানুষের ? তাও আবার মেয়েদের নিয়ে ইয়ার্কি !

পরমেশ্বর গম্ভীর হয়ে বলে, এখানে আরও মহিলা উপস্থিত আছেন, তারা কিন্তু রাগ কবেননি।

প[illegible]শ্বব শুধু হাসায় না, দবকার হলে খোঁচা দিতে পারে !

রেণুকা ছাড়া যে পাঁচজন স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল তাদের কেউ মহিলা বলে না। দুজন হিন্দুস্থানি স্ত্রীলোকেব কাপড়ে স্পষ্ট ছাপ লাগানো আছে যে তারা নূতন বাড়ি তুলবার চুন-বালি বয়, অন্য তিনজন বাঙালি স্ত্রীলোককে দেখেই বোঝা যায় পেট চালাবার জন্য তারা ঝি-গিরি ধবনের কাজ কবে !

বেশন-ক্লার্ক বরুণ তাড়াতাড়ি রেণুকার কার্ড কখানা আগে লিখে কেষ্টকে বলে, আগে এঁরটা মেপে দাও—হাত চালাও একটু !

পরমেশ্বর জোরালো একটা আপশোশেব শব্দ করে বলে, নাঃ, আর ভাঁড়ামি নয়। এবার থেকে বেশন নিতে এসে চোটপাট করতে হবে। তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব সকলের আগে।

রেণুকা তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

সে নিজেই যে গায়ে পড়ে পরমেশ্বরকে শাসন করতে গিয়েছিল সে ভুললেও উপস্থিত অন্য কেউ কথাটা ভোলেনি।

তাই, পবমেশ্বরেব ঝাল ঝাড়বার ইচ্ছা ও ক্ষমতার পরিচয়টা তারা বিশেষভাবে উপভোগ করে। মানুষটা অন্য কেউ হলে হয়তো শুধু মেয়েছেলে বলেই অনেকে রেণুকাব পক্ষ নিত।

রেণুকা রেশন নিয়ে চলে যাবার পর চশমা-পরা সুরঞ্জন বলে, কথাটা উনি বলেছিলেন ঠিকই, ওভাবে না বললেই ভালো করতেন।

কীরকম ?

দেশের এই দুর্দিনে নাচগান সিনেমা-থিয়েটার আমোদ-প্রমোদ বর্জন কবাই উচিত। সোজা কথাটা সহজভাবে বলবেন, তা নয় আমাদের ঈশ্বরদাকে খোঁচা দিয়ে বললেন !

সুরঞ্জনের বয়স বেশি নয় সদ্য সদ্য পাস করে চাকরিতে ঢুকেছে, এখনও বিয়ে করার পর্যন্ত সময় পায়নি।

কিন্তু আজকালকার দিনে পাস করে চাকরি পেয়েছে এ কী সোজা কথা !

দেশে যখন বেকার বোঝাই।

ছাঁটাই হয়ে হয়ে দিন দিন তাদের সংখ্যা যখন বাড়ছে !

ছাত্র সুরঞ্জন রাতারাতি চাকরি পেয়ে বদলে না গেলেও তার একটা সাধ জেগেছে ভাবিক্কি ভদ্রলোক হিসাবে পবিগণিত হবার জন্য। ধীরে ধীরে অমায়িকভাবে চারিদিকে একটা সামঞ্জস্য রেখে সে মতামত বলার চেষ্টা করে।

পরমেশ্বর বলে, তুমিও যে আমায় খোঁচা দিয়ে বসলে হে রশুন !

সে কী ঈশ্বরদা ?

যা কিছু আনন্দ দেয় সব তুমি বর্জন করা উচিত বললে। দেশের অবস্থা বড়ো খারাপ। আমিও আনন্দ দিই, আমিও তোমার মতে বর্জনীয়।

আমি বলছি বাজে আমোদ-প্রমোদের কথা—

তাছাড়া লোকে পাবে কোথা ? কে দিচ্ছে ? সিনেমা খারাপ, থিয়েটাব খারাপ, সবই খারাপ—ভালো যে আমি তা কিন্তু বলছি না ভাই। কিন্তু যা আছে তাই নিয়ে তো একটু ভুলে-টুলে থাকবে মানুষ—যা নেই তা পাবে কোথা ?—তাহলে সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের ওই মিসেস দাস না কে, ওঁর মতো মেজাজ করে দিন কাটাতে হয় !

আদিনাথ বলে, বড়ো কষ্ট করে চালাতে হয় মিসেস দাসকে।

পরমেশ্বর বলে, তাই বলে মেজাজ চড়িয়ে বেখে লাভটা কী ? কষ্ট তাতে কিছু কম হবে ? দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না বলে লোকে সিনেমা দেখবে না—এ কথার মানে চোরের উপর বাগ করে সেই কাজটা করা। গাল দেওয়া উচিত সিনেমা যারা করছে। দেশেব লোকেব এত কষ্ট, ব্যাটাবা কোথায় একটু ভালো সিনেমা করে মানুষকে আনন্দ দেবে—তা নয়, স্রেফ বিষ দিয়ে পয়সা নিয়ে ঠকাচ্ছে !

শশধর বলে, বিষ খায় কেন দেশের লোক !

পরমেশ্বর বলে, বিষ খেলে যে নেশা হয় রে ভাই !

অনেকে হেসে ফেলে।

শশধর বুমাল দিয়ে মুখ মোছে। ·

সে নামকরা নেশাখোর। মদটা তার প্রধান নেশা হলেও আরও তিন-চাররকম নেশা তাব আছে। অবস্থা ভালোই ছিল, চাকরিও করে ভালোই—শুধু নেশায় তাকে কাহিল করে ছেড়েছে। শরীব এবং পয়সা দুদিক দিয়েই !

প্রৌঢ়বয়সি রবীন্দ্র সরকার বলে, যাক, যাক। আপনার দেশের খবর কী ঈশ্বরবাবু ?

আমার দেশ ? আমার দেশ তো এটাই !

আগে যেটা দেশ ছিল। আপনার ভাই নাকি চলে আসবেন সবাইকে নিয়ে ?

আসবে আসবে তো করছে—এখন কবে হঠাৎ এসেই পড়ে ভাবছি।

ভাবনার কী ?

ভাবনা নয় ? দুর্ভাবনায় রাতে ঘুম হয় না দাদা। সকলকে ঘাড়ে করে এনে দিয়ে শ্রীমান নিজে নিশ্চয় ফিরে যাবে। দেশে জমিজমা না দেখলে খাবে কী ? বোঝাটি সব কাজেই চেপে থাকবে আমারই ঘাড়ে ! সংসারটি কী সোজা ভায়া ? স্ত্রী, দুটি, ছেলে দুটি মেয়ে ! বড়ো ছেলেটি হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ে, বড়ো মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে,—নইলে কী যে হাল হত আমার !

আচ্ছা আপনি দেশে যান না কেন ?

কোন দেশে ?

ধীরেন বলে, সে তো অল্পদিনের কথা। আগে যখন দুটো দেশ একটা ছিল তখনও তো আপনাকে বিশেষ যেতে দেখিনি !

নরেশ প্রশ্ন করে, আপনি কতদিন দেশে যান না ?

পরমেশ্বর বলে, বিশ বছর কী ত্রিশ বছর হবে ! নিজের বয়স কুড়ি হল না পঁচিশ হল হিসেব রাখি না, দেশে ক-দিন যাই না যাই কে হিসেব রাখে মশায় ? আর কেনই বা যাব বলুন ? দেশে আপনার লোক কে আছে বলুন ? ভাই আর তার সংসার, ভায়ের বুড়ি মা আর বিধবা বোন আর তার গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে—

বিশু বলে, ভায়ের সংসারের আগের হিসাবের সঙ্গে তো মিলল না ঈশ্বরবাবু ?

তাই কী আর মেলে ভাই ? পরের সংসারের হিসাব। কা তব কান্তা কস্তে পুত্র—তার আবার ভায়ের ছেলে বউ মা বোনের হিসাব !

পবমেশ্বর রেশন নিয়ে চলে গেলে রেশনার্থীদের অনেকে তারই সম্পর্কে আলোচনায় সরগরম হয়ে উঠে।

হাসিখুশি সদানন্দ মানুষ কিন্তু একেবারেই সৃষ্টিছাড়া। এই নিরানন্দ জগতে হাসিখুশি সদানন্দ হলেই অবশ্য সৃষ্টিছাড়া হয়—শুধু সেদিক দিয়ে নয়।

লোকটি সে সন্ন্যাসী নয়। কেউ কোনোদিন তাকে জপ-তপ পূজা-অর্চনা করতে দ্যাখেনি—কোনো রকম গোপন সাধন-ভজন আছে কিনা চেষ্টা করেও জানা যায়নি।

শুধু গভীর রাত্রে নয়, বিশেষ বিশেষ তিথিতেই শুধু নয়, বহুদিন ধরে দিবারাত্রির নানারকম সময়ে তার ঘরে হানা দিয়ে দেখা গেছে,—ও সব ধার সে ধারে না।

বিয়ে করেনি।

কিন্তু এতকালেব মধ্যে কামিনী সম্পর্কিত কোনোরকম ভজখট কেউ তার বেলা কল্পনা করারও সুযোগ পায়নি।

নেশাও করে না।

শুধু খইনি খায়।

ভোজনবিলাসী নয়। খাওয়া-দাওয়া অতি সাধারণ। এবং বিশেষ কোনো বাছবিচার নেই।

ভোগীও নয় ত্যাগীও নয়, এ কেমন মানুষ ? খায়-দায় ঘুরে বেড়ায় আর দশজনের সঙ্গে হাসিমুখে মেলেমেশে—অন্তরঙ্গ না হয়ে নিছক শুধু মেলেমেশে—এ কীরকম মানুষ ?

প্রণব বলে, এরা হল এক ধরনের পাগল। এরা গা বাঁচিয়ে চলে। কোনো কিছুর মধ্যে নেই অথচ এমন ভাব দেখায় যেন সব কিছুর মধ্যে আছে।

নিশীথ বলে, পাগল কিছুই দেখাতে চায় না। দেখাতে চাওয়ার সেন্স থাকলে কেউ পাগল হয় না। তুমি আমি যেমন স্বাভাবিকভাবে এটা ওটা করি, পাগলও তেমনিভাবেই এটা ওটা করে।

সুরঞ্জন গম্ভীর সুরে বলে, আমরা কি স্বাভাবিকভাবে সব কিছু করি নিশীথবাবু ?

করি না ? আমরা স্বাভাবিক মানুষ নই ?

সবটা কী স্বাভাবিক ? অনেক দিক দিয়ে আমরা অস্বাভাবিকও বটে তো !

কেন ?

যুগটাই অস্বাভাবিক বলে।

নরেশ মন দিয়ে শুনছিল। এবার সে জোর দিয়ে বলে, তাই কখনও হয় ! একটা যুগ কখনও অস্বাভাবিক হতে পারে না। মানুষও কখনও অস্বাভাবিক হয় না—দু-চারজন যারা হয়, তারা রোগী। ইতিহাস এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলে, যখন যে অবস্থা থাকে সেটাই স্বাভাবিক অবস্থা।

তখন ইতিহাসের আঁকাবাঁকা গতি নিয়ে তাদের কয়েকজনের তর্ক শুরু হয়। রেশন মাপা হলে এক-একজন থলি হাতে বিদায় হয়ে যায়। অন্যেরা এ ওর সঙ্গে নানাবিষয়ে এলোমেলো কথা শুরু করে।

অসুখ বিসুখ অভাব অসুবিধার কথা। জীবনে যত নালিশ জমা হয়েছে তাব কথা। দেখা যায়, পবমেশ্বব যে হাসিব আবহাওয়াটা সৃষ্টি করে গিয়েছিল সেটা উপে গেছে।

দুই

সুরঞ্জনদের একই বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে।

পবমেশ্বব নামে বিশেষ প্রকৃতির একজন মানুষ বাড়িতে আছে এটা যেন তারা টেবও পায না। তিনতলা বাড়িতে আরও তিন-ঘর ভাড়াটেব সঙ্গে তাবাও আছে, ওই তিন-ঘর ভাড়াটের অস্তিত্ব তারা প্রতিদিন টের পায় মর্মে মর্মে—ভাড়াটেদেরও অবশ্য মর্মে মর্মেই টের পাইযে দেয়—পরমেশ্বর যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে তাদের সকলের অস্তিত্ব আব সংঘাতের সঙ্গে।

সে ভিন্ন ভাড়াটে—লম্বা-চওড়া একজন স্বতন্ত্র লোক সে ভিন্নভাবেই রাঁধে-বাড়ে খায়-দায় ঘুমায় এবং ঘরের ভাড়া দেয়—কিন্তু ভাড়াটে হিসাবে তার অস্তিত্বকে যেন ভিন্নভাবে অনুভব করাই যায় না।

মাস শেষ হতে না হতে কখন যে সে ভাড়া দিযে রসিদ কেটে নিযে যায়।

অন্যদের ভাড়া নিয়ে খেঁচাখেঁচি কবার সময় যেন প্রথম সুবঞ্জনেব বাবা অচিন্ত্যেব চোখে পড়ে রসিদটা,—পরমেশ্বর ভাড়া দিয়ে দিয়েছে।

ভাড়ার জন্য একবারও যেতে হয়নি পবমেশ্বরের কাছে।

বিধুভূষণের সুন্দরী মেয়ে পদ্মা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিযে লজ্জা পায়—আজ কত বছর প্রতিদিন কতবার এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে আসছে, কিন্তু সামনাসামনি না হলে পবমেশ্বব আছে কী মরেছে চেয়ে দেখার সময় হয়নি, খেয়াল হয়নি !

কেমন আছেন ঈশ্বরবাবু ? খববেব কাগজ পড়ছেন ?

খবর কই ? কাগজ কই ? ব্যাপারটা কী দেখছি।

পদ্মা সুখের হাসি হাসে। তাহলে অপরাধ হযনি ! পবমেশ্বব দীর্ঘ অবহেলাতেও অপরাধ নেয়নি !

ঈশ্বর উঠে এসে কুকারে আগুন জ্বলছে কিনা দেখতে থাকে।

পদ্মা বলে, খবর কাব ? কাগজ কার ঈশ্বরবাবু ?

সে ভাবে, এবার নিশ্চয় তাকে ঘরে ডাকা হবে। বলা হবে, বোসো।

খানিকটা ন্যাকামি করেছে তো।

তারপর অনেক রকম অনেক কথা কইতে কইতে ঈশ্বব তার কোমল হাতটি অন্তত একবার নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেবে।

সে বলবে, কী কবছেন ?

তোমার হাতের রেখা দেখছি।

একটু মিষ্টিকথা বললেই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে এই সব একক রহস্যময় জীবনযাপনকারী মানুষ, এই সব সুযোগ পাবার জন্যই এই রকম একাকিত্বের ফাঁদ পেতে বসে থাকে মাকড়সার মতো।

কিন্তু পবমেশ্বর নড়েচড়ে না। কাগজটা নামিয়ে তার দিকে চেযেও দ্যাখে না।

মানুষটা কি ভণ্ড ?

পরমেশ্বর কাগজ পড়তে পড়তেই বলে, খবর তোমার আমার। কাগজটা আমেরিকার।

তাতে কী ?

কাগজ বেচেই ওরা সুখী নয়। খবর ছাপা কাগজ বেচতে চায়। বলে কিনা খবরের চেয়ে কাগজের দাম বেশি ! কাগজ যদি চাও, আমাদের বানানো খানিক খবর সাথে নাও। ভেজাল নিতেই হবে।

পদ্মা হেসে বলে, আপনি এ সব কথাও ভাবেন নাকি !

পরমেশ্বর যেন অভিমান করে বলে, ভাবনাও একচেটিয়া করতে চাও তোমরা ?

পদ্মা অগত্যা মনের ভাবনা খুলেই তাকে বলে। মানুষটার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আমরা তো চললাম ঈশ্বরবাবু।

তাই শুনছিলাম।

এ পাড়ায় থাকব না। পাড়াটা সুবিধে নয় তেমন।

কী করেছে পাড়াব লোক ? তোমাদের পাকা ধানও নেই, পাড়ার লোকে মই দিতেও জানে না !

মোটে মিশুক নয়। কেমন হিংসুটে স্বভাব। অন্তত আমবা একটু ফরোয়ার্ড বলে হিংসে করে !

সে তো যেখানে যাবে সেখানেই করবে ! অন্তত তোমাদের তাই মনে হবে। যদি সবাই হিংসাই না করল, ফবোয়ার্ড হয়ে লাভ কী ? প্রমাণ কী যে সবার চেয়ে এগিয়ে আছি ?

আপনাব সঙ্গে কথায় পাবা দায়।

কাজে ?

পদ্মা একটু হাসে।

সামনে থাকলে আলাপ করার সময় এত ভালো লাগে মানুষটাকে, অথচ চোখের আড়াল হলে একবাড়িতে থাকলেও সে যে আছে এটুকুও যেন খেয়াল থাকে না ! একেবারে মুছে যায় মন থেকে !

পদ্মা বলে, আমরা চলে গেলে আপনি কোথায় যাবেন ? আমাদের নতুন বাড়িতে যদি এই রকম দুখানা ঘর আপনাকে দিই—

আমি তো যেতে পারব না। এখানেই থাকতে হবে।

কেন ?

তোমাদের এ বাড়িটা আমিই কিনব যে ?

তাই নাকি ! আমি তো কিছুই জানি না !

কী করে জানবে বলো ? আজ বসে বসে আমিই শুধু মনে মনে ঠিক করেছি ঘণ্টাখানেক আগে। তোমার বাবার সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। তবে বিধুবাবু যখন বিক্রিই করে দেবেন বাড়িটা, খদ্দের খুঁজছেন, আমাকে বিক্রি করতে আপত্তি হবে না নিশ্চয়। অবশ্য যদি দরে বনে।

দাড়িতে হাত বুলিয়ে ঈশ্বর আবার বলে, দরেও বনবে মনে হয়। সেদিন যে রকম দামের কথা বলছিলেন, আমার তাতে আপত্তি নেই।

পদ্মার কৌতূহলের সীমা ছিল না। সে জিজ্ঞাসা করে, বাড়ি কিনবেন কেন ? আপনি তো একলা মানুষ ? বিয়ে করবেন নাকি ?

বিয়ে ? কাকে বিয়ে করব, মেয়ে কই ?

মেয়ে নেই দেশে ? কী যে বলেন আপনি ! আমি মেয়ে ঠিক করে দিচ্ছি !

ঈশ্বর গম্ভীর হয়ে বলে, সে তো তুমি আমার একটি মা কী বোনকে ঠিক করে দেবে—দেখতে গেলেই চিনতে পারব।

ও ! সব মেয়েই আপনার মা বোন—এই জন্য !

হয়তো সবাই নয়, একজন হয়তো আছে কোথাও যাকে বিয়ে করা চলে। কিন্তু কে খুঁজে বেড়ায় বলো ? তার চেয়ে দিব্যি আছি, খাই-দাই ঘুরে বেড়াই।

তবে যে বাড়ি কিনবেন ?

আমার ভাই আসছে সবাইকে নিয়ে। সাতপুবুষের ভিটে ফেলে আসবে—একেবাবে ভাড়া বাড়িতে উঠবে ? তার চেয়ে একটা বাড়ি কিনে রাখাই ভালো।

কবে আসবেন আপনার ভাই ?

ভিটে ছেড়ে আসবে, তাব আবার কবে কী। যেদিন খুশি আসতে পাবে।

বিধুভূষণ তার প্রস্তাব শুনে বলে, আপনি কিনবেন ? সে তো ভালো কথাই। আমার মশায় বাড়িটা বেচবার ইচ্ছে ছিল না, মেয়েরা থাকতে চাইছে না। এ পাড়ায় ভালো অ্যাসোসিয়েশন নেই।

কোন দিকে যাবেন ?

বালিগঞ্জের দিকে যাব ভাবছি।

ভালোই তো, ভালোই তো।

বিধুভূষণের কাছে আরেকবার পরমেশ্বরকে বাড়ি কেনার কারণটা বিশ্লেষণ করতে হয।

বলে, বাড়িটা আসলে কিনছে আমার ভাই, আমি এক বকম এজেন্ট হিসাবে কিনে দিচ্ছি, এইমাত্র।

আপনিও তো সম্পত্তির সমান অংশীদাব ?

অংশ আছে আইনে—কিন্তু টাকা দিয়ে বাড়ি দিযে আমি কী করব বলুন ? একলা মানুষ—খেতে পরতে আর একটু মাথা গুঁজতে পেলেই হল।

বিধুভূষণ আবও অনেকবারের মতো বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, সত্যি ! আপনি না সন্ন্যাসী না গৃহী। ব্যাপারটা বুঝতে পারি না আপনার।

পরমেশ্বর হেসে বলে, আমাব ব্যাপার খুব সোজা। ঝঞ্ঝাট ভালোবাসি নে। ঘব-সংসাব কবলেও ঝঞ্ঝাট আবাব সন্ন্যাসী হলেও কম ঝঞ্ঝাট নয়। তাব চেযে নির্বিবাদে একলা জীবনটা কাটিযে দেওযাই ভালো।

কামনা-বাসনা ত্যাগ কবেছেন ?

আমি কিছুই ত্যাগ করিনি। কামনা জাগে—মিলিয়ে যায়। বাসনা হয—ভুলে যাই। কামনা-বাসনা থাকলেই তো হয় না—ও সব মেটাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে তো। ওই চেষ্টাটাই আমাব আসে না মশাই। আবার দোকানে যাব বসগোল্লা খেতে ? তার চেয়ে কোঁচরে মুড়ি আছে তাই চিবাই !

কিছুই ত্যাগ করেননি—আবার কিছু ধরতেও চান না !

পারলে ধরি। কষ্ট করে ধরতে নারাজ। কষ্ট কবলে যদি কেষ্ট মেলে--আমাব কেষ্ট মিলে কাজ নেই। এমনিই বেশ চলে যাচ্ছে।

একটু দার্শনিকতা অবতারণার চেষ্টা করে বিধুভূষণ বলে, আচ্ছা ঈশ্বরবাবু, মানুষ কি কর্ম ত্যাগ করতে পারে ? কর্মফল নয় ভগবানে সমর্পণ কবা যায়, কিন্তু কর্ম--

কে ও সব নিয়ে মাথা ঘামায় বলুন ? ভগবান আছেন, জগৎ-সংসার আছে, আমি আছি—বাস্ মিটে গেল। মনের আনন্দে দিন কাটাও।

আনন্দে ?

নিশ্চয়। আনন্দই সহজে হয।

কার কাছে খবর শোনে পঙ্কজ। সে উৎসাহিত হয়ে এসে বলে, আপনি সত্যি এ বাড়িটা কিনছেন ঈশ্বরবাবু ?

কিনছি বইকী।

দেশের সবাই চলে আসবেন ?

তাও আসবেন বইকী !

অনেকদিন পরে ওদের সঙ্গে দেখা হবে।

পরমেশ্বর তার আনন্দ দেখে মৃদু হেসে বলে, তুমি তো আচ্ছা ছেলে হে ! ওদের হল চরম দুর্গতি, জলের দামে যা পারে বেচে দিয়ে সব ফেলে-টেলে চলে আসছে, দেখা হবে বলেই তুমি খুশি হয়ে উঠলে।

পঙ্কজ লজ্জিত হয়ে বলে, ছিছি, ওদিকটা আমার খেয়ালও হয়নি !

পঙ্কজ পাড়ার ছেলে, বোধ হয় সব বিষয়েই সব চেয়ে বেশি উৎসাহী ছেলে। দেশ ভাগ হবার আগে একটা বিশেষ প্রয়োজনে পঙ্কজকে পরমেশ্বর দেশের বাড়িতে পাঠিয়েছিল। পাঠিয়েছিল মানে পঙ্কজ নিজেই উৎসাহ করে গিয়েছিল—ও দেশটা বেড়িয়ে আসবার শখ তার ছিল অনেকদিনের।

দু-তিনদিনের জন্য গিয়ে পরমেশ্বরের ভাই মহেশ্বরের বাড়িতে অতিথি হয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল দু সপ্তাহ। পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকে তার স্পষ্ট স্মরণ আছে, বিশেষভাবে প্রতিমাকে।

প্রতিমা তখন স্কুলে পড়ত। এখন কলেজে উঠেছে। না জানি কত বড়ো হয়েছে আর কত দিক দিয়ে বদলে গিয়েছে প্রতিমা !

সেবার বেড়াতে গিয়ে তোমার খুব ভালো লেগেছিল, না হে ? পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করে।

খুব ভালো লেগেছিল !

যাবে আরেকবার ? দু-চারদিনের জন্য ?

পঙ্কজ চিন্তিতভাবে বলে, ছুটি পাব কী ? নতুন চাকরি !

পরমেশ্বর বলে, আমার কিন্তু বাবা স্বার্থ আছে ! তোমায় শুধু বেড়াতে যেতে বলছি না। যেতে লিখেছে আমায়—সকলকে নিয়ে আসতে একটু সাহায্য হবে। আমার আর নড়তে চড়তে ভালো লাগে না কোথাও। তুমি গেলে আমি রেহাই পাই !

কবে যেতে হবে ?

সেটা তোমায় যথাসময়েই জানাব।

একটু আগে জানা দরকার, আপিসে ছুটি নিতে হবে কিনা।

সামনের সপ্তাহে ?

বেশ। সকলেই চলে আসবে ?

সবাই। জন্মের মতো চলে আসবে—জলের দামে সব বেচে দিয়েছে। ভেবেছিলাম ভাই বুঝি সকলকে আমার জিম্মায় রেখে সম্পত্তি দেখতে ফিরে যাবে—কিন্তু ও একেবারে সব সাফ করে দিয়ে আসছে। মানুষটা একটু গোঁড়া, বুঝলে না ? নিজের ভগবানটিকে ছাড়া কারও ভগবানকে পছন্দ করে না।

পঙ্কজ হেসে বলে, আপনি ?

পরমেশ্বর বলে, আমি ? আমার ভগবান একটা হলেই হল। তিনি কী আর কেমন আর বিশেষভাবে কাদের, অতসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

সময় নেই কেন ? কিছুই তো করেন না। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।

কিছু না করার জন্য সময় দিতে হয় বলেই তো কিছু করার জন্য সময় পাই না। তুমি যাবে তো ঠিক ?

যাব।

খবর শুনে পঙ্কজের বাড়ির মানুষ অসন্তুষ্ট হয়।

জ্ঞান বলে, তোমার চিরদিন পরের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাওয়া। আগে যা হোক চলে যেত, এখন চাকবি-বাকবি নিয়েছ, এখনও কী ও সব পোষায় ? নিজেব দিকে একটু তাকাবে না ?

একটু বেড়াতে যাব তাতে দোষ কী ?

ছুটির সময় বেড়াতে যেযো। ছুটি নিয়ে আপিস কামাই কবে বেড়াতে যাওযার কোনো মানে হয় না।

ক-দিনের তো ব্যাপার।

ক-দিনেই অনেক এসে যায়। তাছাড়া তুমি তো আব সত্যিসত্যি বেড়াতে যাচ্ছ না, যাচ্ছ বেগার ঠেলতে।

পঙ্কজ গম্ভীর হয়ে বলে, আপনাদের হিসাব আমি বুঝি না। নিজের বেড়ানো হবে, অন্যের একটু উপকার হবে—সব বাদ দিয়ে শুধু যদি চাকরিই করতে হয়, অমনভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী ?

জ্ঞানও গম্ভীর হয়ে বলে, পরমেশ্বরের হাওয়া লেগেছে তোমার গায়ে। সাবা দেশেব বেকারেব সংখ্যা জানো যে চাকরিকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিচ্ছ ? এই চাকরি করেই তোমায খেতে হবে।

পঙ্কজ আর তর্ক করে না।

তিন

ট্রেন হুহু করে ছুটেছে।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ কবে।

গাড়ির মধ্যে টিমটিমে আলো। যাত্রীরা ঠাসাঠাসি গাদাগাদি কবে কোনোবকমে নিশ্বাস নিযে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। স্টিমারেও ভিড় ছিল কিন্তু ট্রেনে যা অবস্থা হযেছে তাব বর্ণনা হয না। মানুষের দেহ যদি আবেকটু নবম হত তাহলে সকলে বোধ হয তালগোল পাকিয়ে একটা মাত্র মাংসপিণ্ডে পবিণত হয়ে যেত !

তবু, এর মধ্যেও মানুষের প্রাণ যে কত উদাব তাব প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রমাণ মিলছে। এ অবস্থায আত্মরক্ষাব অন্ধ স্বার্থপরতাকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে উঠে যাত্রীরা গাড়ির একটা কোণ মেয়েদেব ছেড়ে দিয়েছে, তারা যাতে একটু স্বস্তিতে বসে যেতে পারে।

কারও শোয়াব প্রশ্নই অবশ্য উঠে না।

বাচ্চারা শুধু মা-বাপেব বুকে শোবাব ঠাঁই পেয়েছে।

ছোটো একটি মেয়ে কোলে নিয়ে একজন অল্পবযসি বউ বেঞ্চির কাঠে মাথা হেলান দিয়ে মুষড়ে পড়ে আছে। পাশের অজানা অচেনা মেয়েটি এমনভাবে পাখা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে যাতে বেশি হাওয়া অসুস্থা স্ত্রীলোকটির গায়ে লাগে ! হাতটা যেন তাব আপনা থেকে ওই দিকে সরে পাখাটা নাড়ছে ওইভাবে।

এটা থার্ডক্লাস কামরা। যাত্রী উঠেছে সব ক্লাসেরই। ঘরবাড়ি ফেলে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দেশান্তরী হবাব সময় গাড়ির কামরা কোন ক্লাসের বিচার-বিবেচনা করার সুযোগ হয়নি।

দু-চারজন যারা সে চেষ্টা করেছিল তারা ভেসে গেছে ভিড়ের অসমর্থনে।

সাধন বলে, শুধু থার্ডক্লাসের যাত্রী না থাক, থার্ডক্লাসের যাত্রীরাই একটু অভদ্র হয় স্বার্থপর হয়, জায়গা নিয়ে মারামারি করে, এটা চিরকালের মিথ্যা কথা। আমরা ভেবে দেখি না, উঁচুক্লাসে যেটুকু ফাঁকা ভদ্রতার দেখা মেলে সেটা শুধু ওটুকু ভদ্রতা করার সুযোগ সুবিধা থাকে বলেই ! আজকাল উঁচুক্লাসেও ভিড় হয়—অভদ্রতা স্বার্থপরতা থেকে জায়গা নিয়ে মারামারি পর্যন্ত কিছুই বাদ যায় না। বরং থার্ডক্লাসের চেয়েও বিশ্রীভাবে অভদ্রভাবে হয় !

পঙ্কজ বলে, আমারও উঁচুক্লাস নিচুক্লাস সম্পর্কে ওই রকম ধারণা ছিল। যুদ্ধের সময় কলকাতায় যখন জাপানি বোমার আতঙ্ক হয়, সেবার ট্রেনে উঁচুক্লাসের ভদ্রতা আর মার্জিত রুচির চরম পরিচয় পেয়েছিলাম।

পঙ্কজ সেই অভিজ্ঞতার কথা বলে। বড়োলোকেরাই বেশির ভাগ শহর ছেড়ে ভাগবে তাড়াতাড়ি—ফার্স্টক্লাসের টিকিট কিনেও গাড়িতে উঠবার জন্য ভিড় ঠেলে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। অন্যের ছেলেপিলে আর মেয়েদের সরিয়ে নিজের পরিবারটি নিয়ে গাড়িতে ওঠার জন্য সে কী ঝগড়া মারামারি ! যারা আগে উঠতে পেরেছে কামরার মধ্যে জায়গা দখল নিয়ে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু, কিন্তু দরজা বন্ধ রেখে বাইরে থেকে আর কেউ উঠে যাতে তাদের অসুবিধা ঘটাতে না পারে সে জন্য তাদেরই আবার কী কুৎসিত একতা।

থার্ডক্লাসের মানুষ এ ধরনের স্বার্থপরতা জানে না। জোট বেঁধে তারা বিপন্ন মানুষকে গাড়িতে উঠতে বাধা দেয় না। উঠবার যদি সাধ্য থাকে, ওঠো ! আগে উঠে বসেছি, এবার নিজেদের কষ্ট বাড়বে বলে গায়ের জোরে তোমায় উঠতে দেব না, তুমি ছেলেপুলে-স্ত্রীকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকবে, থার্ডক্লাসের যাত্রীরা কোনোদিন এভাবে চিন্তা করতেই জানে না।

ছেলেমানুষ গণেশ সায় দিয়ে বলে, সত্যি !

দ. আটকানো গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে এবং কামরার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মেয়েদের বসবার জায়গা করে দেবার মধ্যে সে-ও যেন দেখতে পায় ভদ্রতা কাকে বলে তার আসল রূপটা।

সাধন বলে, বাইরে থেকে মনে হয় গরিবরা বড়োই ঝগড়াটে। কিন্তু খাঁটি মিল শুধু গরিবদের মধ্যেই হয়। লোক দেখানো মিল নয়, দরকারি বাস্তব মিল।

পঙ্কজ বলে, গাড়ির সকলেরই সমান অবস্থা। টাকাপয়সা হয়তো কারও আছে কারও নেই—কিন্তু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, টাকাপয়সা ক-দিন চলবে, কেউ জানে না।

প্রতিমার সঙ্গে চোখোচোখি হয় পঙ্কজের। পাখাটা নামিয়ে প্রতিমা একটু হাসে।

এ অবস্থাতেও প্রতিমা হাসতে পারে !

দুহাতে হাঁটু জড়িয়ে মহেশ্বর হাঁটুতেই মাথা গুঁজে একভাবে বসে আছে।

তার বুকটা কীরকম হুহু করছে কে জানে!

এদের কলকাতা যেতে সাহায্য করার জন্য না এলে সে বোধ হয় এতটা স্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারত না সাতপুরুষের ভিটে ফেলে চিরদিনের জন্য দেশান্তরী হওয়া এই সব মানুষের কাছে কী মর্মান্তিক ব্যাপার !

প্রতিমার মা সুভাগিনী চোখ বুজে আছে।

কে জানে চোখের পাতা দিয়ে চোখের জল ঠেকাবার জন্য কি না !

হুহু করে ট্রেন চলেছে।

মালপত্রের একটা পাহাড়ের ডগায় তারা তিনজন কোনোরকমে বসেছে। একটু ঘুমিয়ে নেবার আশা করাও বাতুলতা। ঘুমানো দূরে থাক, একটু অসতর্ক হলেই একেবারে নীচের লোকের ঘাড়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

পাশেই বসেছে গণেশ।

বয়স তার বেশি নয় কিন্তু কিশোরবয়সি ছেলের পক্ষেও আশ্চর্যরকম কোমল তার মুখখানা। এ রকম কোমলতা দেখেছে মনে পড়ে না পঙ্কজের। গলার আওয়াজটাও তার মিষ্টি।

পঙ্কজকে সাবধান করে দিয়ে সে বলে, ঝিম ধরলেই পড়ে যাবেন কিন্তু। ওদিক দিয়ে আমার অবস্থা বরং ভালো।

ঝিম ধরাই ঠেকাচ্ছি।

গণেশ একটু হাসে।

দাঁতগুলি ঝকঝকে। হাসিটা পঙ্কজের বড়ো ভালো লাগে। তার চোখে সোনাব চশমা, শখের হওয়াই সম্ভব।

সে বলে, আপনি বরং এক কাজ করুন না ? ওই আংটার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলুন। সবে বারোটা বেজেছে, ঘুম ঠেকাতে ঠেকাতে কখন চোখ লেগে যাবে, দুর্ঘটনা ঘটে যাবে একটা।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

কিন্তু সমস্যা হল দড়ি পায় কোথা, নিজেকে আংটার সঙ্গে বাঁধে কী দিয়ে। কোঁচাটা খুলবে কি না ভাবছে, গণেশ ডেকে বলে, মা, আলগা চাদরটা ছুঁড়ে দাও তো ?

মেয়েদের জায়গা থেকে একজন প্রৌঢ়বয়সি বিধবা বলে, চাদর আবার কী হবে ? দ্যাখ তো বেলা চাদরটা গেল কই।

বেলাই চাদরটা পেতে বসেছিল। চাদরটা তুলে তাল পাকিয়ে ভাইয়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঈর্ষা মেশানো অনুযোগের সঙ্গে কিশোরী মেয়েটি বলে, চাদরটাও তোমার চাই ? ওখানে পাতবে কোথায় ?

দেখা গেল, কোমরে জড়িয়ে আংটায় চাদর বাঁধা যায় না। এক মুহূর্ত একটু অপ্রতিভ হয়ে থেকে ছেলেটি চাদর লম্বা করে তাদের দুজনের কোমরে জড়িয়ে বেঁধে দেয়। তাব পড়ার ভয় নেই— পঙ্কজের এই নিরাপত্তাটুকুর ব্যবস্থা করে দিতে পেরে ভারী খুশি মনে হয় তাকে।

তোমার নাম কী ?

নাম ? আমার নাম গণেশ।

নাম বলতে মুহূর্তের ইতস্তত ভাব একটু খাপছাড়া মনে হয়।

তারাও দেশ ছেড়ে বাড়িঘর ছেড়ে কলকাতায় চলেছে। এক রকম নিরুদ্দেশ যাত্রা, কোথায় উঠবে কোথায় থাকবে কী করবে কিছুই ঠিক নেই। এবং পরিবারটির অভিভাবক হয়ে সঙ্গে চলেছে এই ছেলেমানুষ গণেশ।

আত্মীয়স্বজন কেউ নেই কলকাতায় ?

আছেন বইকী। একটি পিসে, আর একটি দূরসম্পর্কের কাকা। মাকে স্পষ্ট লিখে দিয়েছেন দুজনে তাঁদেরও বাড়িতে তিলধারণের ঠাঁই নেই। লিখে দেওয়া সত্ত্বেও আমরা অবশ্য হাজির হব।

তারপর কী করবে ?

যেমন তেমন একটা বাসা খুঁজে নিতে হবে।

সেটাই তো সমস্যা। বাসা খুঁজতে ক-মাস লেগে যাবে কে বলতে পারে ?

গণেশ চুপ করে থাকে।

চুপ করে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। ব্যাপারটা আরেকবার ধারণা করার চেষ্টা করে পঙ্কজ। শুধু গণেশেরা নয়, গাড়ির বোধ হয় অধিকাংশ পরিবারই এমনই অনিশ্চিতের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। এবং গাড়িও আজ এই একটি চলছে না কলকাতার দিকে।

গা ব্যথা হয়ে গেছে, পা দুটো আড়ষ্ট লাগছে। ধীরে ধীরে চোখ বুজে কষ্টটা ভুলবার চেষ্টা করে। মনটা আবার গভীরভাবে নাড়া খেয়েছে। কী বিশৃঙ্খল অনিশ্চিত অবস্থা দেশে। মানুষের যেন খেয়ে-পরে সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই, চারিদিকে সব লন্ডভন্ড হয়ে থাকতেই হবে, দুঃখ দুর্দশা চরমে উঠতেই হবে। পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ বেঁধে বছরের পর বছর ধরে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ভয়ংকর

সব মারণাস্ত্র নিয়ে খুনোখুনি চলবে, দুর্ভিক্ষ উজাড় করে দিয়ে যাবে, পরনের কাপড়ের জন্য লোকে পাগল হবে। যুদ্ধ থেমে গেলেও সাধারণ মানুষের স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার উপায় থাকবে না। আরেকটা যুদ্ধের নানাসূচনা চালাবে দানবেরা। ধনীব চেয়ে বড়ো জঞ্জাল জগতে আর নেই। পুরানো পচা-গলা সংস্কার ও প্রবৃত্তির সব চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, সভ্যতাকে ব্যর্থ করার সব চেয়ে বড়ো অজুহাত ! এ আঘাত কি মানুষ ভুলতে পারবে ?

মাঝে মাঝে স্টেশনে গাড়ি থামছিল। বাইরে না তাকালেও বেশ বোঝা যায় এতরাত্রেও স্টেশনগুলি মানুষে বোঝাই হয়ে আছে—সকলেই তারা ট্রেনের প্রত্যাশী নয়।

নিরুদ্দেশের যাত্রীরা কিছু কিছু আশ্রয়ের খোঁজে স্টেশনে স্টেশনে নেমে পড়বে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তারপর অদৃষ্টে যা থাকে হবে।

প্রত্যেক স্টেশনে গাড়িতে ওঠার জন্য মানুষের কাকুতিমিনতি প্রাণের মধ্যে বেঁধে। কিন্তু উঠবে কোথায় ? ছোটো একটা ছেলের দাঁড়াবার মতো স্থানও কোনো কামরাতে নেই। প্রাণের মায়া ছেড়ে গাড়ির ছাদের উপরও মানুষ উঠেছে।

হঠা২ দুটি স্টেশনের মাঝামাঝি মাঠের মধ্যে গাড়িটা থেমে গেল। খানিক পরেই একটা হইচই গোলমাল শোনা গেল। কয়েকটা গুলির আওয়াজও শোনা গেল। যাত্রীরা নেমে পড়ছিল, চাদরের বাঁধন খুলে পঙ্কজ আর গণেশ নেমে পড়ল।

কী ব্যাপার ? গাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। কতগুলি লোহা-লক্কড় ইট-পাথর ফেলে রেখে লাইনটা ডাকাতেরা বন্ধ করেছিল, গাড়ি থামতেই একদল লোক মেয়েদের গাড়িতে উঠে পড়ে। রিভলবার দেখিয়ে মেয়েদের গায়ের গয়না কেড়ে নিয়েছে। অন্য কামবায় যাত্রীরা টের পেয়ে হইচই করে নেমে আসতে আসতে যা লুট করেছিল তাই নিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ডাকাতরা পালিয়ে গেছে। কয়েকজন যাত্রী সাহস করে তাদের পিছু নিয়েছিল, কিন্তু অজানা স্থানে অন্ধকার মাঠ-জঙ্গলে বেশি দূর তাড়া করে যেতে পারেনি।

অন্ধকারে ডাকাতেরা সরে পড়েছে।

গাড়িতে আর্মড গার্ড ছিল। তারা একবার ইঞ্জিনের দিকে একবার গার্ডের গাড়ির দিকে খুব ছুটোছুটি করছে দেখা গেল।

ডাকাতদের যে সব যাত্রী তাড়া করে গিয়েছিল, ফিরে আসতে অন্য যাত্রীরা তাদের ঘিরে ধরে। দেখলেই বোঝা যায় কেউ তারা অসাধারণ মানুষ নয়, সাধারণ হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি। হাতে সকলের লাঠি পর্যন্ত নেই।

মানুষ সত্যি কখনও ভীরু হয় না। পৃথিবীতে যেমন দু-চারটে চোর আছে বলে চোর শব্দটা এসেছে, তেমনি কয়েকটা ভীরু আছে বলে ভীরু শব্দটা এসেছে ! আসলে মানুষ যেমন চোর নয়, ভীরুতাও তেমনই তার ধর্ম নয়।

উত্তেজিত গণেশ বলে, এরা কোন সাহসে ডাকাতের পিছু নিয়েছিল, অ্যাঁ ? ওদের যে বন্দুক ছিল !

পঙ্কজ বলে, সাহস ? এতগুলি মানুষ আছি, এই তো সাহস ? ডাকাতরা তবে পালাল কেন ? একগাড়ি লোকের কাছে দু-চারটে বন্দুক কিছুই নয় জানে বলে তো !

আধঘণ্টা দেরি করে গাড়ি ছাড়ে। তারা তখন নিজের জায়গায় উঠে বসেছে, দুজনে চাদরটা গায়ে জড়িয়েছে। আধঘণ্টা উঠে হেঁটে বেড়িয়ে হাত-পায়ের আড়ষ্ট টনটনে ভাবটা কেটে যাওয়ায় কী আরামটাই যে বোধ হচ্ছিল !

গণেশ বলে, এই ব্যাপার নিয়ে কাল অনেক কাগজে বিষ ছড়াবে।

পঙ্কজ সায় দিয়ে বলে, তাই তো মুশকিল। চোর-ডাকাত যে শুধু চোর-ডাকাত, শুধু অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে, এটা লোকে ভুলে গেছে।

গণেশ অনুযোগের সুরে বলে, লোকের কী দোষ ? যাদের তারা বিশ্বাস করবে তারাই যদি মাথা গুলিয়ে দেয়, লোকে কী করবে ? লোকে মিথ্যা চায় না, অন্যায় সহ্য করে না। সত্যের নামে ন্যায়ের নামে তাই না তাদের ভুলাতে হয় !

পঙ্কজ খুশি হয়ে বলে, তোমার বয়সের ছেলেরা যখন এটা বুঝতে শিখেছে তখন আর ভাবনা নেই। লোকে আর বেশি দিন ভাঁওতায় ভুলবে না। এ দেশের লোকের বিশ্বাসটা জোরালো, সহজে অবিশ্বাস করতে চায় না। তাই এত দুর্ভোগ। কিন্তু এবার দায়ে পড়ে বিচার করতে শিখছে।

ম্লান গম্ভীর মুখে গণেশ নীরবে সায় দেয়। এই অবস্থায়, নিজেরা যখন উৎখাত হয়ে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, তখন এই বয়সের একটি ছেলের এই রকম সুস্থ বিচারশক্তি পঙ্কজকে অভিভূত করে দেয়। পথে পাওয়া অসমবয়সি বন্ধুটিকে আরেকটু কাছে টানতে চেয়ে সে হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে যায়। আচমকা থেমে গিয়ে বোকার মতো চেয়ে থাকে। দেখা যায় গণেশের মুখ আরক্ত হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে সে হাতটি গলা থেকে খুলে দেয়।

ধীরে ধীরে পঙ্কজের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, সহানুভূতির সঙ্গে জোর দিয়ে বলে, তাতে কী হয়েছে ? ঠিক করেছ।

গণেশ চোখ তুলে চেয়ে হাসে।

পঙ্কজ সহজভাবে মৃদুস্বরে বলে, চুল কাটতে মায়া হয়নি গণেশ ?

হয়েছিল। কী করব ?

গণেশ আবার একটু হাসে।

বিছানার উপরে বসে রাতারাতি গণেশের সঙ্গে পঙ্কজের বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওদিকে মেয়েদের কোনায় পাশাপাশি না বসেও গণেশের মা আর সুভাগিনীরও যে ভাব হয়ে গেছে জানা ছিল না। পরদিন শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে টের পাওয়া গেল।

গণেশের মা নেমেই গণেশকে বলে, ইনি বলছেন, আমাদের যখন যাবার জায়গা নেই, এঁদের সঙ্গে যেতে। দু-একদিন এদের বাড়ি থেকে একটা ঘর খুঁজে উঠে যাব। সুবিধা হলে এদের বাড়িতেও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে পারি।

পঙ্কজ বাক্যহারা হয়ে তার কথা শোনে। জগৎ-সংসারে এত কাণ্ড ঘটে গেল, এরা এখনও এদের পুরানো ধারণার জগতে রয়ে গেছে ! এখনও যেন আগেকার যুগ রয়ে গেছে, যখন বিরাট কলকাতা শহরের অসংখ্য বাড়ির তুলনায় বাসিন্দার সংখ্যা কম ছিল, তিরিশ চল্লিশ টাকায় কেউ দোতলা বাড়ি ভাড়া নিলে বাড়িওলা পুলকিত হয়ে ভাবত তার কপাল বড়ো ভালো !

কেউ কিছু বলার আগেই গণেশ বলে, তাই কী হয় মা ? এঁদের কত অসুবিধা হবে।

কিন্তু সকলের মতো সে-ও খুব ভড়কে গিয়েছে বোঝা যায়।

ভড়কে যাবার কথাই। স্টেশনের চারিদিকে একবার চোখ বুলোলেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম করবে সেটা আশ্চর্য নয়। কোথাও কোনোদিকে তিলধারণের স্থান নেই। এত যে ভিড় হয়েছে স্টেশনের ঢাকা অঙ্গানের নীচে সেটা ট্রেনে যাবার যাত্রীর ভিড় যে নয় সহজেই বোঝা যায়। তাদেরই মতো অনেকগুলি পরিবার স্টেশনে বাসা বেঁধেছে—ভদ্র এবং চাষি পরিবার !

এক-একটি পরিবারেব ভাগ্যে কয়েক হাত মাত্র জায়গা জুটেছে, তারই মধ্যে মাদুর-পাটি বিছিয়ে হাঁড়িকুঁড়ি-বাক্সো-প্যাঁটরা মালপত্র নিয়ে সকলে দিনরাত্রি কাটাচ্ছে ! মেয়েদের কোনো আবরু নেই, একেবারে খোলা জায়গায় এত লোকের মধ্যে তাদের চব্বিশ ঘণ্টা কাটছে। কোনো কোনো পরিবারের আস্তানার দিকে তাকালেই বেশ টের পাওয়া যায় যে দু-চারদিন এখানে মাথা গুঁজে তাদের কাটেনি, কিছুকাল এখানে এই অবস্থায় বসবাস চলছে। এর মধ্যে রোগী যে কত চারিদিকে শুধু একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই টের পাওয়া যায়। কেউ জ্বরে ধুঁকছে, কেউ চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে, অসুস্থ ছেলে কোলে কোনো মা বিবস মুখে বসে আছে, কেউ হাওয়া করছে রোগীর মাথায়। মনে হয় একটা হাসপাতাল যেন গড়ে তুলেছে জগতের পরিত্যক্ত জীবেরা—স্টিমারের ডেকের মতো সে হাসপাতালে অভাব শুধু স্থানের এবং ডাক্তার নার্স ওষুধপত্র এবং চিকিৎসার ব্যবস্থার ! আর সবই আছে, নোংরামি, অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা !

বিশ্রী একটা দুর্গন্ধে বাতাস ভরাট হয়ে আছে। মানুষ পচেও বুঝি এমন কটু দুর্গন্ধ ওঠে না, মনুষ্যত্ব পচে গিয়ে গন্ধ ছাড়ছে।

মুখগুলিতে অসহায় বিপন্ন ভাবের সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাঠিন্য—প্রত্যেকের মুখ যেন তাতে একটু লম্বাটে দেখাচ্ছে। অবস্থার ফেরে একান্ত নিরুপায় হয়ে কোনোদিকে আশার আলো দেখতে না পেলে মরিয়া মানুষেব মুখের চেহাবা যেমন রুক্ষ কঠিন হয়ে ওঠে—যার মধ্যে শুধু একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ! শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে, লড়াই করে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই, সুতরাং শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে।

প্রতিমা হঠাৎ মন্তব্য করে, জ্যাঠামশাই স্টেশনেও আসেননি।

পঙ্কজ হেসে বলে, কেন আসবেন ? আমাকেই তো প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। যা না করলে চলে সে কাজ তিনি কখনও কারও খাতিবে করেন না।

সুভাগিনী বলে, এরা তবে আমাদের সঙ্গেই চলুক ?

মহেশ্বর বলে, চলুক।

গণেশ বলে, এক কাজ করা যাক। আমরা কাকার ওখানে উঠব ভাবছি, সবাই আমরা ওদিক দিয়ে একটু ঘুরে যাই আসুন। কাকা লিখেছেন জায়গা নেই—জায়গা যদি সত্যি না পাই তবে আপনাদের সঙ্গে চলে যাব। আপনারাও প্রথম আসছেন, কত হইচই হাঙ্গামা। আমরা গেলে আরও হাঙ্গামা বাড়বে।

পঙ্কজ তার কথায় সায় দিয়ে বলে, সেটা মন্দ হয় না।

প্রতিমা বলে, তাই করা যাক। তুমি কী বল দাদা ?

সাধন বলে, এ ব্যবস্থা মন্দ কী !

তারা গাড়ি জোগাড়ের চেষ্টা করছে, ভাবিক্কি ভদ্র চেহারার একটি লোক কোথা থেকে এসে দাঁড়ায়। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সরু পাকানো গোঁফ, লাইমজুস দিয়ে পালিশ করা চকচকে চুল।

আপনাদের বাড়ির দরকার ?

গণেশ সাগ্রহে বলে, আপনার জানা আছে নাকি বাড়ির খবর ?

ভদ্রলোক হেসে বলে, আমার হাতেই আছে।

তার দু-হাতের আঙুলে গোটা পাঁচেক আংটি। এ রকম যার হাত তার হাতে বাড়ি থাকা আশ্চর্য নয়। তবে কিনা, কলকাতার সাংঘাতিক বাড়ি-সমস্যার গুজব তাদের কাছেও পৌঁছেছিল। ভদ্রলোকের প্রস্তাব শুনে তারা খানিকটা থ বনে যায়। বাড়ির জন্য ভাড়াটের খোঁজে মানুষকে যদি এভাবে স্টেশনে এসে ধন্না দিতে হয় তাহলে কলকাতায় বাড়ির দুর্ভিক্ষটা তো মোটেই সত্য হতে পারে না।

আপনারই বাড়ি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বাড়িটি অধীনের। আমাদেরও আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে, পিতাঠাকুরের ব্যাবসা করতে কলকাতা আসেন। শেষ জীবনে তিনিই বাড়িটি করে যান। ওপরে নীচে খানদশেক কোঠা—আমরা স্বামী-স্ত্রী আর একটি ছেলে, মোট এই তিনটি প্রাণী, আদ্দেক কোঠা কোনো কাজেই লাগত না। তবু ভাড়া দেবার কথা কখনও ভাবিনি মশাই ! কাজ কী ? বাবা যথেষ্ট রেখে গেছেন, ভগবানের দয়ায় আমারও রোজগার কম নয়, ক-টা টাকার লোভ করে দবকার কী আমার ? না কি বলেন ?

মহেশ্বর সায় দিয়ে বলে, সে তো বটেই !

ভদ্রলোকের গলা এবার ভারী শোনায়। বলে, কিন্তু আপনাদের মতো হাজার হাজার দেশের মানুষ এসে বাড়ির জন্য কী দুর্দশা ভোগ করছেন জানার পর মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম কী, এ বড়ো স্বার্থপরের মতো কাজ হচ্ছে। এতগুলো ঘর আমার পড়ে থাকবে আর আমার দেশের লোক স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে ফুটপাতে দিন কাটাবে ? সবাইকে না পারি দুটি তিনটি পরিবারকেও তো বাড়িতে আমার জায়গা দিতে পারব ! নিজেরা তাই দুটিমাত্র ঘর নিয়ে অন্যগুলি ভাড়া দিচ্ছি। কাল একটি পরিবারকে দু-খান ঘর ভাড়া দিয়েছি। আপনারা যদি চান, বাকি চাবখানা ঘর নিতে পারেন।

ভাড়া কত ? আর সেলামি—

রাম রাম রাম ! সেলামি কী মশাই ? এক পয়সা সেলামি নেব না। শুধু ছ-মাসের ভাড়াটা আগাম দেবেন। ভাড়া খুব কম করেছি—আমার তো ব্যাবসা নয় বাড়ি ভাড়া দেওয়া ! চাবখানা ঘব আশি টাকা মাসে। বড়ো বড়ো ঘর, ইচ্ছে করলে দেড়শো টাকায ভাড়াটে বসাতে পারি।

গণেশের ভাব দেখে মনে হয়, সত্যিই বুঝি ভাগ্যে তাদেব সিকে ছিঁড়ে স্বর্গ জুটেছে ! গণেশের মা এ পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি, এবার থাকতে না পেবে সোজাসুজি জানায়, বেশ তো, আপনাদের বাড়ি আমরা নেব।

কিন্তু দেখা যায় চারখানা বড়ো বড়ো ঘরওলা স্বর্গ অত সহজে মুখের কথায জোটে না ! ছ-মাসের ভাড়া ভদ্রলোককে হাতে হাতে দিতে হবে, এইখানে দিতে হবে—নগদ চাবশো আশি টাকা !

এ কথা শুনলে মানুষের মনে সন্দেহ জাগে বইকী !

বাড়িটা একবার চোখে না দেখে—

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বলে, ভাবছেন, কে জানে লোকটা কলকাতার চোর না জোচ্চোব, টাকা হাতে পেয়ে যদি পালায় ! তা কথাটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। এ কলকাতা শহরে কত রকম জোচ্চুরি যে চলে তার হিসেব হয় না। তবে আসল কথাটা শুনুন বলি।

ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে দামি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, বাড়ি ভাড়া নিয়ে যে আইন হয়েছে জানেন তো ? বাড়িতে যদি ভাড়াটে একবার ঢোকে, কারও সাধ্যি নেই আর তাকে বার করে ! বাড়িতে ঢুকে জেঁকে বসে আপনাবা যদি গোলমাল করেন আমি কোথায় যাব ?

বাড়িটা শুধু একবার চোখে দেখে—

ভদ্রলোক উৎসাহিত হযে বলে, নিশ্চয়, নিশ্চয় ! বাড়ি দেখাব বইকী। কিন্তু ওই যে বললাম, ভেতরে ঢুকতে পাবেন না। বাইরে থেকে দেখে দু-মাসের ভাড়াটা দিয়ে তবে ভেতরে যাবেন। এটুকু মশায় আমার দিকের প্রোটেকশন ! তা বাইরে থেকে দেখেই বাড়ি আপনাদের পছন্দ হয়ে যাবে। লেন-দেনটা এখানে চুকিয়ে নিতে চেয়েছিলাম কেন জানেন ? বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াবেন, ভেতরে ঢুকতে পারবেন না, সে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয় তো ! তা আপনারা যখন তাই চাচ্ছেন তখন আর কথা কী ?

ইতিমধ্যে একটি লম্বা কালো চশমাপরা যুবক এসে লোকটির পিছনে দাঁড়িয়ে এদের সঙ্গে তার আলাপ শুনছিল।

এবার সে আচমকা সামনে এগিয়ে বলে, তা এটা আপনার যুক্তিসঙ্গত কথা। চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

ভদ্রলোকের মুখটা যেন একটু কেমন হয়ে যায় হঠাৎ !

আপনি কে ?

আমি একজন ভলান্টিয়ার।

বলতে বলতে যুবকটি পকেট থেকে একটা ব্যাজ বার করে পিন দিয়ে শার্টের বুকপকেটে এঁটে দেয়।

দেখে ভদ্রলোকটি উদাসভাবে সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, আচ্ছা আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমার গাড়িটা নিয়ে আসি।

সেই যে গাড়ি আনতে যায়, আর তার পাত্তা মেলে না ! পাঁচ-সাতমিনিট পরে নবাগত যুবকটি বলে, ওর জন্য অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। ও আর ফিরছে না।

গণেশের মা বলে, মাগো, এমন সব কারবার এখানে !

মহেশ্বর নিশ্বাস ফেলে বলে, যারা ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাশ্রয় হয়ে এসেছে তাদেরও মানুষ ঘাড় ভাঙে ?

ভলান্টিয়ার ছেলেটি বলে, ঘাড়-ভাঙা সমাজে এ তো হবেই। দুর্ভিক্ষে যখন লাখ লাখ মানুষ মরছিল তখন চালের কারবারে কত লোক লাখপতি হয়েছে বলুন তো ?

বলতে বলতে ছেলেটি একজন বুড়োর দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

বুড়ো বলে বুড়ো, বয়স বুঝি তার একশোর কাছে গেছে। ছেঁড়া একটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু করে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টি যে তার ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে, অপরিচিত এই জগৎ যে আবছা অস্পষ্ট একটা অদ্ভুত রহস্যের মতো ঠেকছে তার কাছে, নড়বড়ে ঘাড়ে বসানো মাথাটা সঞ্চালন করা দেখেই তা বোঝা যায়। শণের মতো পাকা চুলগুলিও তার অধিকাংশ ঝরে গেছে।

এই মানুষটা কী একা এসেছে দেশ বাড়ি আশ্রয় ছেড়ে ? না, তাও কী সম্ভব ! একটি বউ এক হাতে একটি শিশু বুকে চেপে ধরে অন্য হাতে টিনের একটা রংচটা তোরঙ্গের পাশে কাঁথা বিছিয়ে শয্যা রচনা করছিল, তার কপালে মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর লেপা ! বুকের শিশুটিকে কাঁথায় শুইয়ে দিয়ে সে বুড়োর পাশে এসে দাঁড়ায়, ভলান্টিয়ার ছেলেটিকে বলে, উনি তো কানে শুনতে পান না।

ছেলেটি বুড়োকে জিজ্ঞেস করছিল, সে কোথায় যাবে, কী করবে, কোনো সাহায্যের দরকার আছে কি না। বুড়ো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল তার মুখের দিকে !

কাঁথায় শোয়ানো শিশুটির দিকে চেয়ে পঙ্কজ শিউরে উঠে। একমাসও বোধ হয় বয়স হবে না। সে যে কী রোগা আর আকারে কতটুকু, না দেখলে কল্পনা করা যায় না। কাঁদছে—আওয়াজ নেই। মুখের কাছে কান নিয়ে গেলে বোধ হয় কান্না শোনা যাবে। একদিকে এই বুড়ো, অন্যদিকে ওই শিশু। এই সম্বল নিয়ে একা বউটি বেরিয়েছে নুতন আশ্রয়, নূতন জীবনের সন্ধানে !

চেয়ে দ্যাখে, গ ণেশ একদৃষ্টে বউটির মুখের দিকে চেয়ে আছে।

গণেশের কাকার নাম ঘনশ্যামবাবু, বাড়ি শ্যামবাজারের দিকে একটা ছোটো রাস্তার মধ্যে। ছ্যাকড়া গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়াতে দেখা গেল বাড়িটা বড়ো ও তিনতলা। দেখে সকলের ভরসা হল।

আশেপাশে কয়েকটা বাড়িতে রেডিয়ো বাজছিল, কিছু তফাতে একটা বাড়িতে আবার চলেছে গান শেখাবার ক্লাস। সংগীতে আর সঙ্গাতে সমস্ত পাড়াটা যেন গমগম করছে। সুস্থ লোকের মাথা ধরে যাবার কথা। যাদের মাথা ধরাই থাকে তাদের মাথা ধরা সারে কিনা অবশ্য বলা যায় না।

গাড়ি থেকে দেখা গিয়েছিল বাড়ির সদব দরজা খোলা। নেমে দেখা গেল ইতিমধ্যে কে যেন গাড়ি দাঁড়াতে দেখে ভেতব থেকে দবজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

খানিক ডাকাডাকির পর স্বয়ং ঘনশ্যাম নেমে এসে দরজা খুলল। গণেশদের সাদবে অভ্যর্থনা জানাবার কোনো লক্ষণই কিন্তু তার ব্যবহারে দেখা গেল না। বাইবে এসে দাঁড়িয়ে পিছনে হাত বাড়িয়ে দরজাটি আবার সে ভেজিয়ে দিল !

এর মানে কী ? এমনভাবে হঠাৎ এলে যে তোমবা ?

গণেশ বলে, সাত-আটদিন আগে তো একটা চিঠি দিয়েছি কাকা ?

ঘনশ্যাম বলে, তোমরা চিঠি দিলেই হল ? সে চিঠির জবাবে আমি যে চিঠি দিলাম তোমাদের আসতে বারণ করে, সে চিঠি বুঝি বাতিল হয়ে গেল যেহেতু তোমবা আসবে বলে চিঠি দিয়েছিলে ?

কী রাগ ঘনশ্যামের ! তার রাগ দেখে গণেশ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে, তার মুখে কথা জোগায় না। গণেশের মা এক পা এগিয়ে এসে বলে, এ তো চিঠিপত্রের ব্যাপার নয় ঠাকুরপো, বাঁচন-মরণ নিয়ে কথা। আমরা থাকতে আসিনি, শুধু কয়েকটা দিন আশ্রয় নেব—যদ্দিন না একটা ঠাঁই খুঁজে পাই।

ঘনশ্যাম বলে, কয়েকটা দিন ? একবেলা থাকাব জায়গা নেই, কয়েকটা দিন ? এ বাড়িতে উঠবার যদি সাধ ছিল, এত দেরি না করে কিছুকাল আগে এলেই হত ! আত্মীয়স্বজন কী একবিন্দু জায়গা খালি রেখেছে ভেবেছেন ? সব দখল কবে নিয়েছে। বাইবেব লোককে ভাড়া দিলে কত টাকা ভাড়া পেতাম। ধনে-প্রাণে মাবা গেলাম আত্মীযস্বজনেব জন্য !

গণেশের মা বলে, আমবাও নয় ভাড়া দেব, যদ্দিন থাকি।

ঘনশ্যাম হঠাৎ অট্টহাস্য করে ওঠে !—ভাড়া দেবেন ? বেশ তো, বেশ তো, দেখুন না চেষ্টা করে একটা ঘর দখল করতে পাবেন নাকি ! চিলেকুটি পর্যন্ত বেদখল হয়ে আছে। আমাব বড়ো শালার শ্বশুরমশায় দোতলার বাথরুমটি নিয়েছেন। আসুন, পারেন তো দখল করুন ঘব।

বলে সত্যসত্যই দরজা খুলে ঘনশ্যাম সবে দাঁড়ায়। দেখা যায় প্যাসেজে ভিড করে দাঁড়িয়েছে জন ত্রিশেক মেয়েপুরুষ ! মেয়েদের সংখ্যাই বেশি।

গণেশের মা অনেককেই চিনতে পারে, মুখে আনন্দেব হাসি ফুটিয়ে নাম ধরে সম্পর্ক ধরে একে ওকে তাকে ডেকে বলে, তুমিও এখানে আছ ? অমুক কই ? কেমন আছে ?

বলতে বলতে গণেশের মা এগিয়ে যায়, কিন্তু তারা কেউ একচুল নড়ে না, বাড়িতে ঢুকবার প্যাসেজ ব্যারিকেড করে দাঁড়িয়ে থাকে !

একজন প্রৌঢ়া বিধবা বলে, এ বাড়িতে কোথায় উঠবে গণেশের মা ? তিলধারণের জায়গা নেই। আমরাই বলে যে কষ্টে আছি।

গণেশের মা বলে, তাহলে উঠব কেন পিসি ? এ বেলাটা বিশ্রাম করি, ওবেলা কোথাও চলে যাব।

পিসি বলে, কোথা যাবে ? যাওয়ার জায়গা আছে এ শহরে ? ভেতরে একবার ঢুকলে বাছা তোমরা আর নড়বে না, নড়তে পারলে তো নড়বে ? আমাদের শোয়া-বসা নড়াচড়ার জায়গা নেই, তোমরা এতগুলি লোক ঢুকলে কেউ আর বাঁচবে না।

ঘনশ্যাম আবার অট্টহাস্য করে ওঠে।

গণেশের মা হতভম্ব হয়ে বলে, দুয়ার থেকে ফিরে যাব ঠাকুরপো ? বাড়িতে ঢুকতে দেবে না, দু-দণ্ড বসতে দেবে না ?

ঘনশ্যাম বলে, আমি কী করব ? দেখছেন তো অবস্থা, নিজের বাড়িতে কোণঠাসা হয়ে আছি।

সুভাগিনী বলে, চলেন চলেন, আমাদের বাড়িতে চলেন। কী দরকার এদের অত তোষামোদ করার ?

চার

বিধুভূষণ মানুষটা খুব চাগা আর হিসাবি।

বাড়ির যে দর সে দিয়েছে, পরমেশ্বর যে কোনো কথা না বলে সেটাই মেনে নিয়েছে তার কারণ সে জানে। দেশ ভাগ হওয়ায় যারা ভিটে ছেড়ে আসছে তাদের প্রথম ঝোঁকটাই হয় নতুন ভিটে সংগ্রহ করার—একটি নিজের বাড়ি করার।

পরমেশ্বর প্রায় একযুগ নীচের তলাটা ভাড়া নিয়ে আছে—একা একজন মানুষের জন্য এতগুলি ঘর ! একটি মস্ত পরিবার অনায়াসে থাকতে পারে। পরমেশ্বর ভাড়া দিয়ে এসেছে নিয়মিত, ভাড়া বাড়াতে চাইলে বিনা আপত্তিতে মেনে নিয়েছে। বিধুভূষণের নিজের কোনো ক্ষতি নেই, বরং লাভই হয়েছে এ রকম একজন ভাড়াটে পাওয়ায়, অন্য মানুষ হলে এভাবে নানা অজুহাতে ভাড়া বাড়াবার সুযোগ তাকে দিত না,—তবু পরমেশ্বরের বেহিসাবি চালচলনে গা-টা বরাবর জ্বালা করেছে বিধুভূষণের !

টাকা উড়িয়ে নষ্ট করলে বরং অন্য কথা ছিল,—বিধুভূষণের হিসাবে ওভাবে খরচ করলেও টাকাটা অন্তত ভোগে লাগে।

অকারণে বিনা প্রয়োজনে টাকা খরচ কবার মানে বোঝে না বিধুভূষণ।

সে কৃপণ নয়, সকলের স্টাইলের স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতেই সে যথেষ্ট টাকা খরচ করে। দামি আসবাব কিনে ঘর সাজানো বা মেয়ে বউকে ভালো শাড়ি কিনে দেওয়া তার কাছেই মোটেই বেহিসাবি খবচ নয়। কিন্তু নিজেদের কোনো দরকাব না থাকলেও একতলাটা যদি সে ভাড়া না দিত—সেটা হত তার কাছে বেহিসাবি অপচয়। ঠিক এই হিসাবে ঘর খালি ফেলে রাখার জন্য সমস্ত একতলাটা পরমেশ্বরের ভাড়া করা তার কাছে নিছক টাকা নষ্ট করা—বোকামি !

পরমেশ্বরকে সে বলে, সাব-টেনান্ট বসিয়ে কিছুটা ভাড়া তুলে নিতে পারেন অনায়াসে।

পরমেশ্বর হেসে বলে, তাহলে তো একখানা ঘর ভাড়া নিয়েই থাকতে পারি ! সংসার নেই, নেশা কবি না, নিজের মনে একটু আরামে থাকব না ?

আরাম ! কে জানে এ কীরকম আরাম ? বিধুভূষণের মাথায় ঢোকে না !

অনেক কিছুই অবশ্য মাথায় ঢোকে না বিধুভূষণের। কারণ সে ধরে শুধু তার নিজের হিসাব, পরমেশ্বরের দিকটা বিবেচনা করে না। একটা মানুষ বিষয়সম্পত্তি সব কিছু ভাইকে ছেড়ে দিয়ে আত্মীয়স্বজনকে পরিহার করে একা এভাবে জীবন কাটায়, তাকে গৃহীও বলা যায় না সন্ন্যাসীও বলা যায় না, সে ভোগীও নয় ত্যাগীও নয় : সহজ সাধারণ মানুষ হলেও শুধু দশজনের মতো নয় বলেই জীবনটা তার অসাধারণ।

তার বেলা একটু অন্যরকম হিসাব ধরতে হবে বইকী !

বিধুভূষণ তাই ধারণাও করতে পারে না যে নিরীহ আপনভোলা মানুষ বলে বা ঝঞ্ঝাট এড়াবার খেয়ালে পরমেশ্বর তার বেশি ভাড়ার দাবি মেনে নেয়নি মোটেই, তার ছেলেমেয়েদের জন্য ওটা নিছক তার উদারতা।

এ উদারতার মানে বোঝা তার পক্ষে কঠিন। কারণ, তার ছেলেমেয়েদের জন্য স্নেহমমতার কোনো পরিচয়ই পরমেশ্বর কোনোদিন দেয়নি।

তবে তার সম্পর্কে সমীরের যে অসীম কৌতূহল আছে সেটা পরমেশ্বর হাসি মুখেই প্রশ্রয় দিলে চলে।

অনেক অসংগত ব্যক্তিগত প্রশ্নও বরদাস্ত করে যায়।

প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে সমীর তাকে এমন প্রশ্নও করে বসেছিল যে প্রথম জীবনে কোনো ব্যর্থ প্রেমের ব্যাপার ঘটার ফলে কি সে এ রকম উদাসীন হয়ে আছে ?

আমি কী উদাসীন ? আমার মতো আয়াস-প্রিয় লোক ক-টা আছে ?

তবু, বিয়ে করলেন না, একলা থাকেন—

সে তো আমি আরামে থাকতে ভালোবাসি বলে ! ব্যর্থ প্রেমের জন্য সব ত্যাগ করে থাকলে কি এ রকম আনন্দে থাকতে পারতাম ?

সমীর আমতা অমতা করে বলেছিল, মানে, আপনি ভুলতে পারেন না, ভুলতে চানও না। স্মৃতি নিয়েই আপনি আনন্দে থাকেন।

পরমেশ্বর হেসে বলেছিল, একটি মেয়েকে ভালোবাসলে তাকে ভোলা না যেতে পারে, কিন্তু তার স্মৃতিটা অবলম্বন করে মানুষ আনন্দে জীবন কাটায় কী করে হে ? ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতিতে আনন্দ আছে না কি ?

কিন্তু—

তোমার মন মানতে চাইছে না, কেমন ? তুমি মানে বুঝতে পারছ না। বড়ো একটা কোনো আদর্শ থাকত, দেশের কাজ, সমাজ-সংস্কার সেবাব্রত এ সব কিছু নিয়ে মেতে থাকতাম—হ্যাঁ, তাহলে একটা মানে বোঝা যেত ! একটা কিছু নিয়ে থাকবে তো মানুষ ? এ মানুষটা খায়-দায়-ঘুমায়, কিছুই করে না। কোনোরকম পাগলামি ছাড়া তো মানুষের চলে না, এ মানুষটা কী নিয়ে দিন কাটায় ? তোমার রীতিমতো ভাবনা হয়েছে এই নিয়ে !

সমীর একটু হাসবার চেষ্টা করেছিল।

পরমেশ্বর বলেছিল, তোমার হিসাবটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি নিজের মাপকাঠিতে আমার বিচার করছ ! তুমি যা দামি মনে করো, তুমি যা চাও, আমি তা চাই না কেন—ইচ্ছা করলেই পেতে পাবি অথচ আমার দরকার হয় না কেন ওসবের ? তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তোমাতে আমাতে অনেক তফাৎ ! তুমি জীবনে এক রকম সুখ চাও—আমি আরেক রকম সুখ চাই। চাওয়ার দিক দিয়ে আমরা কেউ কম চাই না, তফাৎ শুধু কী চাই তাতে। তুমি বড়ো হতে চাও, টাকা চাও, বউ চাও, প্রেম চাও, প্রতিষ্ঠা চাও, হইচই উত্তেজনা-ভরা জমজমাট জীবন চাও। আমি চাই নিজের ভাবে বিভোর হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে।

নিজেব ভাবে ?

তবে কী ? এও তো আমার একটা পাগলামি,—এই পাগলামি নিয়ে আমি আছি ! এ রকম পাগলামি সকলের আসে না—কিন্তু সেটা হল আলাদা কথা। তুমি টাকা-পাগল, দেশ-পাগল, ধর্ম-পাগল, জ্ঞান-পাগল, কর্ম-পাগল, নির্বাণ-পাগল, কাম-পাগল—অনেক রকম পাগল দেখেছ। আমার মতো আনন্দ-পাগল দ্যাখোনি, তাই তোমার খটকা লাগে।

আপনি এ বকম হলেন কেন ?

কেন হলাম ? দেখলাম যে এ রকম হওয়াই আমার পক্ষে সব চেয়ে সহজ আর সুবিধাজনক !

সমীর তবু ছাড়েনি।

জীবনটা সহজ হলেই কী— ?

না, সবার পক্ষে তা নয়। এ জীবন সকলের পোষাবে না। সংসারের ঝঞ্ঝাটে যে পাগল হতে বসেছে—সে একেবারে ডিগবাজি খেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে। আমার এই জীবন তার একটা দিনের জন্য পছন্দ হবে না।

সমীর ভেবেচিন্তে বলেছিল, মানুষ তো সামাজিক জীব ?

নিশ্চয় !

সমাজকে বাদ দিয়ে আপনি আনন্দ পান কী করে ?

সমাজকে বাদ দিলাম কই ? তাহলে তো সন্ন্যাসী হয়ে বনে যেতাম। আমি সামাজিক জীবনযাপন করছি। ব্যক্তিগত জীবনটা আমার যেমন হোক—সমাজে যেভাবে চলা উচিত আমি সেইভাবে চলছি।

সমীর নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, আমি কত কী করব ভাবি—মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে যায় !

পরমেশ্বর হাসেনি।

তা তো যাবেই। অনেকের মাথা বিগড়ে যায়, তোমার তো শুধু ঘুরে যাওয়া।

আরেক দিন সমীর বলেছিল, আপনি এত বোঝেন, কিন্তু কখনও আমাকে কোনো পরামর্শ বা উপদেশ দেন না।

পরমেশ্বর হাসি মুখে তার ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ মুখের ভাব খানিকক্ষণ লক্ষ করেছিল।

পরামর্শ বা উপদেশ কেন দেব ? তুমি আমার কে ?

চেনাশোনা তো আছে ?

তাতে কী ? পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—শাস্ত্রের উপদেশ। এ উপদেশ নিজে মানিনি। পরের ছেলে তোমাকে উপদেশ দিতে যাব কীসের গরজে ?

আপনি কি চান না আমি বড়ো হই ?

বড়ো হবে তুমি—সেটা চাইবেও তুমি। আমি কেন তোমার ঝঞ্ঝাট যেচে নেব ? তবে কোনো বিষয় পরামর্শ করতে চাও—যখন ইচ্ছা এসে পরামর্শ করে যেতে পার। কিন্তু কোনো দায়িত্ব আমি নেব না ! আমার মতামত শুনতে চাও শুনিয়ে দেব। কিন্তু পরে এসে বলতে পাবে না যে আপনার কথা শুনে আমার এই হল কিংবা এই হল না।

আপনি আশ্চর্য মানুষ।

পদ্মারও মাঝে মাঝে ঝোঁক আসে এই নিঃসঙ্গ নির্বিরোধী সদানন্দ মানুষটাকে জয় করতে।

অন্যভাবে নয়। সাধারণভাবে।

একটু দরদ দেখালে, নির্জন ঘরে নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে তার সঙ্গে গল্প করলে, নিজের সুখ দুঃখের কথা বললে, একটু সেবা করলে—পরমেশ্বরের মতো মানুষ যেন খুশি হয়।

কিছুতেই বাগ মানাতে না পেরে প্রচণ্ড বিরাগের মধ্যে তার ঝোঁকটা কেটে যায়।

ভালো করে সে কথা পর্যন্ত বলে না তার সঙ্গে। দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ফ্রকপরা অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তার নতুন কায়দায় শাড়ি পরে কলেজ যাওয়ার অবস্থায় পরিবর্তিত হবার প্রক্রিয়াটা পরমেশ্বর যে দেখে এসেছে, এটা তার খেয়াল থাকে না !

শাড়ি পরতে শেখার প্রথম দিকে, নিজেকে নারীত্বের প্রতিনিধি মনে করার ঝোঁক যখন মেয়েদের আসে—একবার সে এক কাণ্ড করেছিল।

তার সাধ হয়েছিল, পরমেশ্বরকে সে জব্দ করবে।

এমন জব্দ করবে যাতে চিরদিন ছিছি বলার অধিকার তার জন্মে যায় !

ছুটির দিন দুপুরবেলা পাতলা একটা শাড়িতে আলুথালু বেশ করে সে গিয়ে হাজির হয়েছিল পরমেশ্বরের ঘরে।

বলেছিল, কী করছেন ? একটু গল্পটল্প করতে এলাম।

সে ভেবেছিল, পবমেশ্বর নিশ্চয় তাকে দেখে নিজেকে সামলাতে পারবে না। নভেল পড়ে পড়ে আর সিনেমা দেখে দেখে তার ধারণা হয়েছিল নিজের বাপভাই ছাড়া এ জগতে কোনো বয়সের এমন পুরুষ থাকা অসম্ভব, নির্জন দুপুরে তাকে এভাবে যেচে ঘবে আসতে দেখে যাব পক্ষে আত্মসংবরণ করা সম্ভব।

পরমেশ্বর বলেছিল, এসো মা এসো ! আমার মা জননী এসো। আজকে বুঝি মা-র মনে পড়ল ছেলে একলাটি আছে, তার সাথে দুটো কথাবার্তা বলে আসতে হবে ?

এমন জব্দ পদ্মা আর হয়নি।

সেই থেকে তার নভেল সিনেমার বাঁকা শিক্ষায় একচেটিযা প্রভাবে এসেছিল একটু বিচার-বিবেচনা করে চলার সুবুদ্ধি !

মহেশ্বরের পরিবার শুধু নয়, গণেশরা পর্যন্ত এসে একটা ঘর দখল করে বসায় মনে হল এতদিনে বুঝি একাকিত্বের অবসান হয়েছে পরমেশ্বরেব, তাব জীবন ভরে উঠেছে আত্মীযতাকে স্বীকৃতি দানে।

আপনজনের দায়িত্ব গ্রহণে !

সমীর বলে, আপনি তবে আপনপর হিসাব করেন ?

পরমেশ্বর হেসে বলে, করি বইকী। চিবদিন কবে এসেছি।

কীরকম ?

রকম তুমি বুঝবে না। সর্বঘটে সমান জ্ঞান তুমি কবে আমাব দেখলে যে আপনপর ভেদ কবে আশ্চর্য হচ্ছ ? এ আমার আপন, এ আমার পর দেখিয়ে সব সময় হইচই করি না বলে কী আমাব আপনপর থাকবে না !

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করে, বাড়িটা সত্যিই আপনি কিনবেন তো ঈশ্ববাবু ?

আমার ভাই কিনবে। জলের দরে সব বেচে এলেও আপনার বাড়িটা কিনতে পারবে। তারপব দেখা যাবে কী হয়।

অনেক বিষয়ে মহেশ্বরের পবিবারটি অত্যন্ত রক্ষণশীল। তারা অনেক সংস্কাবের বোঝা বয়, অনেক পুরানো চালচলন আঁকড়ে থাকে।

গণেশ শাড়ি পরেছিল এ বাড়িতে এসে রাত্রে শুতে যাবার সময়।

পরদিন পঙ্কজ এসে তাকে দেখে হেসে বলেছিল, গণেশ এবার কী হলেন ?

সবিতা হলেন।

গণেশের মা মানদা বলে, আর বলো কেন বাবা। দুটি বয়স্কা মেয়ে নিয়ে পড়লাম বিপাকে—কী করি, কোথা যাই। মেয়ে আমার কচকচ করে মাথার চুলগুলি কেটে ফেলল ! বাপ মরেছে কবে, তার পুবানো কোটটা গায়ে চাপাল। শাড়ির পাড় ছিঁড়ে ধুতি করে পরল। বলল, মা, আমি তোমার ছেলে। চুলগুলি গেল এই যা আপশোশ।

পঙ্কজ সাহস দিয়ে বলে, আজকাল এ রকম চুলও রাখে মেয়েরা।

সবিতা বলে, চার-পাঁচমাস ধরে জমিজাযগা ঘরবাড়ি বিক্রি করে টাকার জোগাড়টা মা-ই করেছিল। আমি শুধু পুরুষ সেজে সঙ্গে এসেছি। ভারী কাজ ! শুধু মেয়েছেলে দেখলে কে কী গোলমাল পাকাবে, এই জন্য পুরুষ সেজেছিলাম। তা সত্যিই দেখলাম—একটা ছোকরা পুরুষমানুষেরও অনেক খাতির ! মেয়ে হলে হাসত—পুরুষ সেজে চোটপাট করতে অনেকে ভড়কে গেছে।

মাথার চুলগুলি ছিঁড়ে ফেলার ভঙ্গি করে বলে মেয়ে হয়ে জন্মানোই ঝকমারি ! সবিতা না হয়ে সত্যি যদি আমি গণেশ হতাম !

একখানা ঘব ভাড়া নিয়েছে গণেশের মা। বলেছে, আমার এখন যত কম খরচে দিন চালানো যায়। চুমুক চুমুক খেয়ে খেয়ে কলসির জল ফুরিয়ে যায়। আমার কে আছে রোজগার করবে ?

দেশে কে রোজগার করত ?

নিজে করতাম—লোক দিয়ে করাতাম। জমি বিলি করতাম, দুধ বেচতাম, সুপারি বেচতাম—সব কবতাম। এখানে কে আছে আমাব জন্য রোজগার করবে ? আমার নিজের রাস্তা আছে রোজগারের ?

সবিতা বলে, আমি পারি।

থাক থাক। কাম নাই।

পঙ্কজ জানে সবিতার এত যে উৎসাহ নতুন নতুন পথে মেয়ে হয়ে জন্মানোর বাধা ডিঙিয়ে নতুন কিছু করার উৎস তার অনভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই অনভিজ্ঞতা তো আরও অনেকের মধ্যেই থাকে—এমন সহজভাবে দুঃসাহসী কাজের মধ্যে নিজেদের দুরবস্থার প্রতিকার করার ঝোঁকটাই শুধু সকলের মধ্যে দেখা যায় না।

অভিজ্ঞতা যে এ উৎসাহকে দমিয়ে দেবে, তাকে হতাশায় পাঁকে ডুবিয়ে দেবে এমন কোনো কথা নেই।

মনটা শক্ত হলে হয়তো আরও বেশি জোর সে খুঁজে পাবে নিজের মধ্যে, মা আর বোনের দায়িত্ব নেবার জন্য আরও বেশি উৎসাহ বোধ করবে।

একেবারে ভোঁতা হয়ে যাবে না এমন কথাও অবশ্য জোর গলায় বলা চলে না।

সবিতার কাছে সে তার দেশ বাড়ি আত্মীয়স্বজনের গল্প শোনে।

বলে রাখে, সংসারের কাজে ফাঁকি দিয়ে আমার বদনাম কোরো না। তোমার মা যেন না ভাবতে পাবেন তিনি খেটে মরছেন, আমি তাব মেয়েটিকে আটকে রেখেছি। অবসর পেলেই চলে আসবে আমার কাছে।

আমি কেন আসব। তাও একবার নয়, রোজ রোজ—বারবার !

পঙ্কজ হেসে বলে, কেন আসবে বলছি শোনো। আমি আসতে পারি—দশবাব ছেড়ে একশোবার। আমাব তাতে অপমান হবে না। কিন্তু তোমার কখন কাজ থাকবে, কখন থাকবে না জানব কী করে ? দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আপিস,—ছুটির দিন ছাড়া সকালে আর সন্ধ্যায় শুধু কথা বলার সময়। তখন তুমি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকবে।

সবিতা মুচকে হাসে। গণেশের হাসিটা মনে পড়ে যায় পঙ্কজের।

আপনি যে কী বলেন তার ঠিক নেই।

কেন ?

কথাটা বুঝে বলেছেন ? সারাদিন করবেন আপিস—আর আমি কখন ফাঁক পাব, কখন যাব, সে জন্য হত্যা দিয়ে সকাল সন্ধ্যা বাড়িতে বসে থাকবেন ?

তাও তো বটে ! তবু তুমি যেয়ো।

সবিতার বাবা ছিল কাপড়ের ছোটো কারবারি আর কবি।

কাপড়ের কারবারি, হাটে-বাজারে খুচরো ব্যবসায়ীদের সে কাপড় সরবরাহ করত, সে ছিল কবি !

স্বভাব কবি।

কিন্তু লড়ায়ে কবি।

নাম ছিল গোপেশের। গোপেশ আসরে নামবে শুনলে লোকারণ্য হয়ে যেত।

কত সুন্দর সুন্দর গান যে গোপেশ বেঁধেছিল।

বলতে বলতে গুনগুন করে সবিতা গান ধরে দেয়। পূর্ববঙ্গের ভাষায় কবিগানের সুরে দেশের অনাচার অত্যাচার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেব গান—যেমন তীব্র ব্যঙ্গ তেমনই সুগভীর দরদ।

নীচের তলায় কোণের দিকেব ঘরের সামনে বাবান্দায় খালি গলায় গান ধরে সবিতা, একে একে বাড়ির মানুষ এসে হাজির হয় সেখানে।

পাটি পেতে মানদা সকলকে বসতে দেয়।

ঘরের দুয়ারের কোণে হাঁটু মুড়ে বসে সে মেয়ের মুখে স্বামীর রচিত গান শোনে—দুটি চোখ বন্ধ করে।

পাড়ার কয়েক বাড়ি রেডিয়ো বাজছে—সন্ধ্যার প্রোগ্রামের বাছা বাছা গান।

কী একঘেয়ে হয়ে গেছে মার্কিনি ঢংযেব প্রাধান্য পাওয়া বাছা বাছা গান আর যন্ত্রসংগীত !

জগতে যেন একটাই রস উপভোগ করতে শিখেছে মানুষ—মিহি মধুর রস।

বেশি মিহি করতে গিয়ে মাঝে মাঝে রেডিয়োতে রবীন্দ্রনাথের গানের নামে বিড়াল ছানাব কান্নাও শুনতে পাওযা যায় !

সবিতা গান বন্ধ করলে খানিকক্ষণ সকলে চুপ করে থাকে।

পরমেশ্বর নমিতাকে বলে, দিদিকে সামাল দিস। এ মেয়েকে সিনেমায় টেনে নেবে।

সুভাগিনী বলে, চমৎকার গলা মেয়ের—সুন্দর গায়।

পঙ্কজ বলে, ওকে শেখালে খুব নাম করতে পারবে।

মানদা বলে, বাপের কাছে নিজে নিজে শিখেছে। এ সব গানের কি কদব আছে ?

পঙ্কজ বলে, আছে বইকী ? সভায় এ সব গান হলে লোকে মেতে যায়।

প্রতিমা বলে, আপনি গানও এত ভালোবাসেন তা তো জানতাম না। মহশ্বেব বলে, শ্যামা সংগীত জানো মা ?

আরেকটা গান করে সবিতা। খালি গলায় গ্রাম্য ঢংয়ে গান।

গান শেষ হলে সকলে নানাবিষয়ে কথা বলে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাধন থাকে চুপ করে।

চিরদিনই সে চুপচাপ।

পরমেশ্বর সর্বদা হাসিখুশি, চেনা-অচেনা সকল মানুষের সঙ্গে চলে তার অফুরন্ত কথা।

মহেশ্বর গম্ভীর ও ভাবুক কিন্তু বিশেষ ধরনের লোকেদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সে-ও অজস্র কথা বলে।

সাধন হয়েছে বাপ-জ্যাঠার ঠিক বিপরীত।

বোবা হয়ে থাকতে পারলেই সে যেন খুশি হয়।

একটিমাত্র কথা সে আজ বলে, সোজাসুজি সবিতাকে জিজ্ঞাসা করে, গান শিখবে ?

শিখব।

তারপর সাধন আর একটি কথাও বলে না।

কয়েক দিন পবে তার বন্ধু অসীম গান শেখাতে আসে সবিতাকে।

সপ্তাহে দু-তিনদিন গান শেখাতে আসবে।

বিনা পয়সায়—নিজের পকেট থেকে বাসের পয়সা খরচ করে।

পরমেশ্বর বলে, মেয়েটা গেল—শহরের কালচারের পাল্লায় গেল। শহরতলি থেকে প্রথমে বলবে অ্যামেচার—তারপর দাঁড়াবে প্রফেশনাল। একখানা গানের দাম হবে—

মানদা প্রায় ভীতমুখে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

এমনি করেই ভগবান উপায় করে দেন।

শুনে মানদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

শিক্ষাদীক্ষা চালচলন রুচি অরুচিতে অনেক তফাত দুটি পরিবারে, শহর অজানা না হলেও এবং স্কুল কলেজে শিক্ষার অভাব না থাকলেও মহেশ্বরের পরিবারটি স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক গ্রাম্যতা ও গোঁড়ামি নিয়ে এসেছে। তিন বছর কলকাতাবাসী বিধুভূষণের পরিবারটি শহুরে আধুনিকতার সঙ্গে মহেশ্বরের পরিবারের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতার খাপ খাওয়া সম্ভব নয়। তবে, শুধু কয়েকটা দিন তারা এক বাড়িতে বাস করবে, কয়েক দিন পরে পৃথক হয়ে দূরে সরে যাবে, শুধু এই জন্যই দুটি পরিবারের হৃদ্যতা যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেড়ে গিয়ে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়ে যায়।

ট্রেনে বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন প্রকৃতির যাত্রীদের মধ্যে যেমন হয়।

ক-টা দিনের তো ব্যাপার। পরমেশ্বর বায়না করে রেখেছে, মহেশ্বর টাকা নিয়ে এসে দিলেই বাড়ির দখলিসত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে বিধুভূষণেরা চলে যাবে।

তারপর কে ধারবে কার ধার, কে দেখতে যাবে তাদের মধ্যে কতদিক দিয়ে পার্থক্য।

দুদিন পরেই সাধন দেশে ফিরে যায়। সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে মহেশ্বরকে সাহায্য করতে হবে।

এ দুদিন নিজেদের সঙ্গে সে সবিতাদেরও বাইরের কতগুলি প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করেছে। বাজার করেছে, দোকান থেকে জিনিস এনে দিয়েছে, রেশন কার্ডের জন্য দরখাস্ত দাখিল করে এসেছে।

জিজ্ঞাসা করেছে, হেড অব দি ফ্যামিলির নাম কী লিখব—

পঙ্কজ হেসে বলেছে, কেন, গণেশ চন্দ্র লিখবে।

গণেশ হিসাবে এখানে পৌঁছে বেশ বদল করে নিজের পরিচয় দিলে সবিতা নিশ্চয় ইতিমধ্যে লজ্জা কাটিয়ে উঠত। ট্রেনে গণেশ হিসাবে তাকে একটু আরাম দিতে চেয়ে কাছে টেনে আনতে যাওয়ায় যেভাবে পঙ্কজের কাছে তার পরিচয় ফাঁস হয়ে গিয়েছিল, সেটা বোধ হয় সে এখনও ভুলতে পারেনি।

পঙ্কজের পরিহাসে আবার তার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সে শক্ত মেয়ে। তবু হাসবার চেষ্টা করে বলেছে, দুটো কার্ড হয় না ? একটা গণেশ নামে, আর একটা সবিতা নামে ?

হয় বইকী ! এনকোয়ারি করতে এলে গণেশ সেজে সামনে গেলেই হল !

সাধন দরখাস্ত দিয়ে এলেও রেশন কার্ড জুটিযে আনার হাঙ্গামা করার দাযিত্বটা সমীব যেচে নিয়েছে।

সাধনকে বলেছে, আমি সব ঠিক করে দেব, ভাববেন না।

পঙ্কজ উপস্থিত ছিল।

সে বলেছে, আপনার তো আপিস আছে। অসুবিধা হবে। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

সমীর বলেছে, না না, অসুবিধা কিছু নেই।

শুধু রেশন কার্ড জোগাড় করার দায়িত্ব নয়, সাধনকে কিছু না বললেও দৈনিক বাজারের ভারটাও সে যেচে গ্রহণ করেছে।

সকাল সাতটা বাজতে না বাজতে থলি হাতে নীচে নেমে এসে সে সুরমাকে সামনে দেখে বলে, আপনাদের তো বাজার করার লোক নেই আজ। আমি বাজারে যাচ্ছি, আপনাদেরটাও এনে দিই।

সুরমার হাতে ছিল বাসনের পাঁজা। সে বলে, আপনি আবার কষ্ট করবেন ?

কষ্ট কীসের ? আমাদের জন্য মাছ তরকারি কিনতেই যাচ্ছি—সেই সঙ্গে আপনাদেরটাও কিনে আনব। ঈশ্বরবাবুকে এ সব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে, ভাবতেও আমার বিশ্রী লাগছে।

কেন, জ্যাঠামশাই বাজার করতেন না ?

করতেন—কিন্তু সে ছিল একার জন্য বাজার, বেড়াতে গিয়ে কিনে কেটে আনলেন, দুদিন চালিয়ে দিলেন।

সুরমা আশ্চর্য হয়ে বলে, সে কী ? এতকাল এ বাড়িতে আছেন, আপনি জানেন না তিনি রোজ নিয়মিত বাজার করেন ?

সমীর লজ্জিত হয়ে বলে, অতটা খেয়াল করিনি।

সুরমা বলে, তবে হ্যাঁ, বেড়াবার জন্য বেড়াতে যাওয়া, বাজার করার জন্য বাজার করতে যাওয়া—এ সব জ্যাঠামশাই ভিন্ন ভিন্ন করেন না। হেঁটে বাজারে যান—বেড়ানোও হয়, বাজার করাও হয়। আলসেমি উনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আলসেমির জন্য টাটকা মাছ তরকারি না খাওয়া ওঁর মতে পাপ !

পরমেশ্বর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, কেন বদনাম দিচ্ছিস সুরমা ? আমি আলসেমি খুব ভালোবাসি। এ দেশে বেশি বেশি খেটে মানুষের প্রাণ যায়—আলসেমিকে প্রশ্রয় দেওয়া এ দেশে ধর্ম হওয়া উচিত ! আলসেমি মানেই তো বিশ্রাম।

বাসনটা রেখে আসি।

সুরমা রান্নাঘরে যায়। প্রতিমা আঙুল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বুঝা যায়, সে সদ্য সদ্য ঘুম ভেঙে উঠেছে।

পরমেশ্বর বলে, সামনেই প্রমাণ দ্যাখো। তুলনা করো।

সমীর বুঝতে পারে না।

কীসের প্রমাণ ? কীসের তুলনা ?

আলসেমি যে আসলে বিশ্রাম তার। এরা দুটি বোন—সুরমা দেড় বছরের বড়ো। কিন্তু প্রতিমাকেই বড়ো মনে হয় না ? এখানে নয় ঝি চাকর নেই, বাসন মাজা ঘরের কাজ করা দরকার হয়েছে। দেশে পানটুকু সেজে দেবার লোক ছিল—সারাদিন শুয়ে থাকলেও কেউ দোষ ধরত না। কিন্তু সুরমার হল কর্মের আদর্শ, বসে থাকতে নেই কাজ করতে হয়, দায়িত্ব নিতে হয়। প্রতিমা ও সবের ধার ধারে না। আরাম-বিলাসের সুযোগ আছে, নেব না কেন ?

সমীর বলে, কিন্তু—

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই ! প্রতিমা ফিগার ঠিক রাখার জন্য স্কিপিং করে—আরও কী সব যেন ব্যায়াম-ট্যায়াম কায়দা-কৌশল করে।

সমীর কী বলত কে জানে, রান্নাঘরে বাসন নামিয়ে রেখে এসে সুরমা বলে, ইনি আমাদের বাজার করে এনে দিতে চাইছেন।

পরমেশ্বর বলে, চেয়ে কী মস্ত একটা অপরাধ করেছেন ?

তা নয়। সবিতাদের বাজারটাও তো করতে হবে ?

তাও ইনি নিশ্চয় করবেন। সবিতাকে ডাকো।

সবিতা আসে। কিন্তু আসে একেবারে খালি হাতে। বাজারের পয়সা বা থলি কিছুই আনে না।

কী বলছেন ?

প্রতিমা বলে, ইনি বাজারে যাচ্ছেন, বললেন কী আমাদেরও বাজারটা এনে দেবেন।

সবিতা বলে, আমাদের দরকার নেই বাজারের।

বলে সে খালি হাতে বাজার করতেই বেরিয়ে যায় !

সমীর বলে, মেয়েটা তো ভারী অহংকারী !

পরমেশ্বর বলে, না না, তুমি ভুল বুঝলে। বেচারা নিজেদের বাঁচাচ্ছে। সাধন দুদিন ওদের বাজার করেছে—নিজেদের জন্য দামি দামি মাছ তরকারি যা কিনেছে ওদের জন্যও তাই এনেছে। ওদের কী অত খরচ পোষায় ? মেয়েটি বুদ্ধিমতী, নিজে শাকপাতা কিনে আনতে গেছে।

মাছের বাজারে সবিতার সঙ্গে দেখা হয় সমীরের।

কী মাছ কিনলে ?

সবিতা বলে, মাছ ? কুচো চিংড়ি দুটাকা সের—মাছ কিনব কী করে ?

সমীর বুঝি হঠাৎ ভাবের বশে বুদ্ধি হারায়, পরমাত্মীয়ের দাবিটা নিজের ভাবে নিজেই খাড়া করে উৎসাহের সঙ্গে বলে, আমি আজ তোমাদের মাছ খাওয়াবো।

মহৎ ভাব। উৎখাত হয়ে এসেছে একটা পরিবার, একটা মেয়ে ভার নিয়েছে সেই পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রেখে নতুন স্থানে শিকড় গেড়ে স্থায়ী করবার—এমন একটি মেয়েকে একটু আদর করার মহৎ ভাব !

তাই, সবিতার প্রতি প্রশ্নে সে বেসামাল হয়ে যায়।

মাছ খাওয়াবেন কেন ? আমি কমবয়সি মেয়ে বলে ?

না না, এমনি বলছিলাম—

আমি কিন্তু ঠিক করেছি কোনোরকমের বেশ্যা হব না—ধর্মভাবেও হব না—ভালোবাসার ভাবেও হব না। আপনি মিছেই আমার পিছনে লেগেছেন।

বাজারের মধ্যে গায়ে ঠেলাঠেলি করা ভিড়, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ধরনের কথাবার্তা ! সমীরকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে মাঝবয়সি একজন মন্তব্য করে, বাপ্‌রে বাপ, এরা হাটে-বাজারেও প্রেম চালাবে !

সবিতা হঠাৎ সুর পালটায়।

আচ্ছা, আপনার মাছ খাব। কিনে নিয়ে যান, রান্না করে পাঠাবেন।

মাছ কেনা হয়ে গিয়েছিল সমীরের। আর পোয়াটেক কিনলেই সবিতাদের দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হত। সে এক সের মাছ কিনে বসে—বাজারের সব চেয়ে দামি মাছ।

অলকা বলে, এত মাছ এনেছিস ? দুরকম মাছ ?

সমীর বলে, কাটা মাছটা রান্না করে সবিতাদের পাঠিয়ে দিয়ো।

পদ্মা বলে, সবটা ? কেন ?

কেন মানে ? আমাদের রান্নামাছ খেতে চেয়েছে।

তা তো চাইবেই ! কত কী চাইবে। সুরমাদের না দিয়ে সবিতাদের জন্য কেন ?

ওদের মাছ এনে দিয়েছি।

অলকা বলে, তুই চুপ কর পদ্মা। একজনদের একদিন একটু মাছ খাওয়ালে সমীর ফতুর হবে না।

সমীর পুরো একটা সিগারেট খায়।

তারপর অলকাকে বলে, সবটা মাছ সবিতাদের পাঠিয়ো না। খানিকটা সুরমাদেরও পাঠিয়ো। দুঘরেই পাঠানো উচিত।

মাছ রান্না হয়ে যাবার আগেই সমীর স্নান করে খেতে বসে। আপিস যাবে।

সবিতার সাত বছরের ভাই বুনো ছোটো একটা বাটিতে খানিকটা বড়ি দেওয়া তরকারি এনে দেয়।

দিদি বলল, চেখে দেখবেন।

বুনো ফিরে যেতে না যেতে স্বয়ং সুরমা একটা বাটি হাতে করে আসে।

পাতের কাছে বাটিটা নামিয়ে রেখে বলে, শুধু পটোল দিয়ে এ তরকারিটা আমি মাথা ঘামিয়ে রের করেছি। খেতে ঠিক মাংসের মতো লাগে। কেমন লাগে বলতে হবে কিন্তু।

পদ্মা হেসে বলে, দাদা, তুমিই দেখছি ভাগ্যবান মানুষ।

সুরমা বলে, না ভাই। তোমাদের সবাইকে চাখতে দেব বলে বেশি করেই বেঁধেছি। উনি আপিস যাবেন—একেবারে কড়াই থেকে খানিকটা তাই এনে দিলাম।

সুরমার তরকারিটা আগে খেয়ে সমীর বলে, এটা পটোলের তরকারি নয়, এটা নিশ্চয় কোনো নতুন রকম মাংস।

সুরমা খুশি হয়ে বলে, যাক, খারাপ হয়নি তাহলে।

সুরমার প্রকৃতি শান্ত ও কোমল। স্নেহ করতে আর ঘরের কাজ করতে -যেটা আসলে হল অন্যের সেবা—সে খুব ভালোবাসে।

প্রতিমা তার চেয়ে বছর দেড়েকের ছোটো, কিন্তু তুলনায় সুরমাকেই আরও ছোটো মনে হয়। সে চটপটে চালাক চতুর মেয়ে সর্বদা হাসিখুশি ভাব— কিন্তু অভিমান তার প্রচণ্ড।

রাগে সে সহজেই এবং সামান্য কারণে তার রাগের পরিমাণ দেখে মনে হয় মাথার বুঝি তার গোলমাল আছে। তবে সহজেই রাগটা আবার তার পড়েও যায়।

এ বিষয়ে সুরমা একেবারেই অন্যরকম। রাগ অভিমান বলে কিছুই যেন তার নেই, সে যেন মূর্তিমতী ধৈর্য আর ক্ষমা।

সমীরের সঙ্গে সুরমার আলাপ জমে পরমেশ্বরকে নিয়ে আলোচনায়। মানুষটা সম্পর্কে দুজনেরই খুব আগ্রহ—কিন্তু দেখা যায় তার সম্পর্কে তাদের মতের অনেক অমিল।

সমীর বলে, আপনারা কলকাতা আসেননি আগে?

কতবার।

জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তো একবারও দেখা করতে আসেননি?

বাবার বারণ ছিল। জ্যাঠামশাই নিজেও কখনও যেতেন না, আমাদেরও আসতে লিখতেন না। বাবা বলেন, যে চায় না তাকে জ্বালাতন করতে নেই। বাবা ওঁকে দেবতার মতো ভক্তি করেন, ওঁর প্রত্যেকটা ইচ্ছা মেনে চলেন।

সমীর মনে মনে বলে, সে তো বটেই— অর্ধেক সম্পত্তি ভোগ দখল করতে দিয়েছেন, তাকে ভক্তি না করলে চলবে কেন।

মুখে বলে, এবার তো এতটুকু জ্বালাতন হলেন না? বরং খুশিই হয়েছেন মনে হয়। আপনারা আগে এলে বিরক্ত হতেন জানলেন কী করে? আসতে তো তিনি বারণ করেননি আপনাদের।

বিরক্ত হতেন কে বললে? আমরা আগে এলেও বিরক্ত হতেন না।

তবে?

আহা, বিরক্ত না হওয়াটা ওঁর স্বভাব। কিন্তু আমরা তো জানি উনি আত্মীয়বন্ধু চান না, নিজের মনে একলা থাকতে ভালোবাসেন। নইলে দেশ ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে এখানে এসে এভাবে থাকবেন কেন? জেনেশুনে আমরা কেন ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব? জুলুম করব?

সমীর হেসে বলে, আপনারা ভুল করেছেন।

ভুল ?

আমি এখন বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। উনি আপনাদের ভালোবাসতেন---আপনারা ওঁর সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা করে নিয়ে ওঁকে এমনভাবে অবহেলা করেছেন যে উনিও আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি---একলা জীবনটা কাটিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন। শুধু দেখা করতে আসা নয়, আপনারা সবাই একরকম ওঁর ঘাড়ে এসে চেপেছেন। তবু ওনার দিব্যি খুশির ভাব। এটা কী করে হয় ? আগে যদি আপনারা একটু স্নেহমমতা দেখাতেন আর স্নেহমমতা চাইতেন, ওনার জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেত।

সুরমা হেসে বলে, আমরা তো সেদিন জন্মালাম। বাবার চেয়ে উনি মোটে দেড় বছরের বড়ো। ছেলেবেলা থেকে বাবা ওঁকে দেখে আসছেন, বাবার কখনও ভুল হয় ? অল্পবয়স থেকে উনি আত্মীয়স্বজনকে ছাড়তে আরম্ভ করেন। কলেজে পড়বার সময় প্রথম প্রথম পুজোর ছুটি গরমের ছুটিতে দু-চারদিনের জন্য বাড়ি যেতেন, পরে একেবারে যেতেন না....

মহেশ্বরের কাছে শোনা পরমেশ্বরের অতীত জীবনের কাহিনি সুরমা সমীরকে শোনায়। ছুটিতেও বাড়ি না যাওয়ায় মা কেঁদেকেটে আর বাবা কড়া সুরে বুঝিয়ে ছেলেকে চিঠি লিখত—তাকে স্মরণ করিয়ে দিত তার দায়িত্ব আর কর্তব্যের কথা। পরমেশ্বর জবাবে লিখত, বাড়ি যেতে তার ভালো লাগে না, কারণ বাড়ির সকলে সবসময় অকারণে দুঃখী সেজে থাকে, বাড়িতে আনন্দ নেই। মিছিমিছি নানারকম ঝঞ্ঝাট বাঁধিয়ে বাড়ির সবাই যেন সবসময় দুঃখী হয়ে থাকতে ভালোবাসে। কোনো অভাব নেই, অথচ কারও মুখে হাসি দেখা যায় না। এই নিরানন্দ আবহাওয়ায় যেতে তার মন চায় না, গেলেও তার হাসিখুশি ভাব দেখে সবাই তাকে ছ্যাবলা মনে করে। এ অবস্থায় বাড়িতে না যাওয়াই তার পক্ষে ভালো ! ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে ভেবে মা বাবা কীরকম ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল পরমেশ্বরের, কীভাবে চেষ্টা করেছিল সুন্দরী মেয়ে খুঁজে তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দেবার, সে কাহিনিও সুরমা শোনায়।

পরমেশ্বর জানিয়েছিল, বিয়ে সে করতে রাজি আছে।

সমীর অবাক হয়ে বলে, সত্যি ?

সুরমা বলে, আমি কি বানিয়ে বলছি ?

বিয়ে করতে পরমেশ্বর রাজি হয়েছিল, কিন্তু একটি শর্তে ! ছোটো একটি মেয়েকে সে বিয়ে করবে, বিয়ের পর বউ নিয়ে একেবারে পৃথক হয়ে থাকবে।

কেন ?

না, বউকে সে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে, গড়ে তুলবে—যাতে অকারণে অসুখী হবার ধাতটা তার বদলে যায়। সত্যি সত্যি দুঃখ পাবার কারণ না ঘটলে, রোগ ব্যারাম না হলে---শুধু বদশিক্ষার জন্য সে যাতে হাসতে না ভুলে যায়। জীবন আনন্দময়---এই সত্যটা বুঝতে শেখে !

সুরমা বলে, বুঝছেন তো ? উনি চিরদিনই এই ভাবের ভাবুক। কারও খাতিরে উনি কারও বানানো দুঃখের ভাগ নেবেন না। এটাকেই উনি ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলা বলেন।

সমীর বলে, এটাই তো বৈরাগ্য !

সুরমা বলে, কীসে ?

সংসারে সুখ নেই কেবল দুঃখ— এই ভাবকেই বৈরাগ্য বলে, এই ভাব থেকেই লোকে সংসার ছাড়ে।

উনি তো বলেন না সংসারে সুখ নেই কেবল দুঃখ। বরং উলটো কথাই বলেন যে জীবন আনন্দময়। তিনি সংসার ছাড়েননি—অকারণে দুঃখ ভোগ করাকে ছেড়েছেন।

ওটা একই কথা। সংসারে সবাই যে রকম আমি সে রকম হব না, একা নিজের ভাব নিয়ে থাকব—তাকেই বৈরাগ্য বলে ! অন্যে সংসার ছেড়ে ঈশ্বরকে নিয়ে থাকে, উনি আনন্দ নিয়ে আছেন। কোনো তফাত নেই।

আপনি ভুল বুঝলেন।

সুতরাং তর্ক বেধে যায়।

এই একটি কথা থেকে আসে হরেক রকম কথা। সমীব বড়ো বড়ো কথা টেনে এনে সুবমাকে কাবু করে দেয়।

সুরমা বলে, মুখ্যু মানুষ, আপনার সঙ্গে পারব কেন ? এ সব কথা আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি বোঝেন। সমাজ, ধর্ম, সাইকলজি নিয়ে কি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে পারি ? জ্যাঠামশায়ের ব্যাপারটা ভালো করে জানি তাই বলছিলাম।

সানন্দভাবে বউ একটু হাসে।

গুরুজনের সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে নেই, কিন্তু ঠিকমতো সাথি পেলে আজও উনি বিয়ে করে সংসারী হতে রাজি হবেন।

সমীরও হাসে।

এ দেশে লোকে বউ ছেড়ে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়। খাঁটি সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী খুঁজে পায় না। আপনি ভুল বুঝেছেন জ্যাঠামশাইকে।

প্রতিমা বলে, দিদি, পুরো একটি ঘণ্টা তুমি কাটিয়ে এলে সমীরবাবুর ঘরে।

সুরমা বলে, আপিসের বেলা হয়ে গেল, নইলে আরও দু-একঘণ্টা কাটিয়ে আসতাম।

আমি বুঝি একলা খেটে মরব ?

আমি যে সারাদিন একলা খেটে মরি ? একঘণ্টা খেটেই তোব গোসা হল ! কী খেটেছিস শুনি ? মশলা বেটেছিস ? কাপড় কেচেছিস ? রান্না করেছিস ?

প্রতিমা বলে, আমি কাজে যেতাম, আটকে রাখলে।

সুরমা বলে কী কাজে যেতে ?

সেটা আমার কাজ।

সুরমা হেসে বলে, দ্যাখ, আমি কচিখুকি নই। পঙ্কজদের বাড়ি যেতে পারিসনি বলে তো ? পঙ্কজ আজ দেরিতে কাজে যাবে। এখন গেলেও দেখা পাবি।

প্রতিমা মুখ বাঁকায়।

তুমিও যেমন ! পঙ্কজবাবু সবিতাকে নিয়ে উদ্‌বাস্তু মিটিংয়ে গেছেন।

তোকে নিলেন না ? হায় হায় !

সুরমা হাসে।

বড়ো হাঙ্গামাগুলি মোটামুটি সেরে আসতে মহেশ্বর ও সাধনের প্রায় দুসপ্তাহ সময় লাগে।

তার দুদিন পরেই টাকা নিয়ে বাড়ির দখল ছেড়ে দিয়ে বিধুভূষণেরা চলে যায়।

সুরমা বলে সমীরকে, মাঝে মাঝে আসবেন তো ?

সমীর বলে, নিশ্চয় আসব। এমনিই ঈশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসতে হত, এবার আপনাদের সঙ্গেও ভাব হল।

এ রকম ভাব তো আপনার কত মানুষের সঙ্গেই হচ্ছে।

সবার সাথে কি এ রকম ভাব হয় ?

আমাদের পুজো হবে। নেমন্তন্ন রইল।

আপনারা দুর্গাপূজা করেন নাকি ?

বহুকাল ধরে পুজো চলে আসছে।

পাঁচ

বাড়ির দখল পেয়েই মহেশ্বর বলে, এবার ওপর তলায় যাবার ব্যবস্থা করো। দাদা একতলায় যেমন ছিলেন তেমনই থাকবেন।

সুভাগিনী বলে, আমাদের এত লোকের কুলোবে ? সবিতাদেরও একটা ঘর দিতে হবে তো !

মহেশ্বর বলে, না কুলোলেও কুলোতে হবে। দাদার অসুবিধা করা চলবে না। দাদার জন্যই এ বাড়ি কেনা হয়েছে, নইলে আমি এত টাকা দিয়ে বাড়ি কিনতাম না—কম টাকায় ছোটো বাড়ি কিনতাম।

সাধন বলে, জ্যাঠা রাজি হবেন না।

সুরমা বলে, আমারও তাই মনে হয়। ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে—

মহেশ্বর বলে, না, মন বুঝবার জন্য যদি জিজ্ঞেস করতে যাই, আপনার অসুবিধা হবে নাকি, দাদা নিশ্চয় বলবেন, ওঁর কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা নেই ? আমরা কেন ওঁর শান্তি নষ্ট করব !

সবিতাও শুনছিল।

সে বলে, আমরা বরং তাহলে একটা ঘর খুঁজে উঠে যাই।

সাধন বলে, আগে থেকেই কেন ব্যস্ত হচ্ছ ? দেখা যাক না কী ব্যবস্থা হয়।

আমাদের জন্য আপনারা কষ্ট করবেন—

তা নয় একটু করলাম।

কিন্তু সবিতার মুখ দেখে বোঝা যায় তার অস্বস্তি দূর হয়নি। নিজেদের অসুবিধা ঘটিয়ে তাদের উপকার করাটা সে ঠিক পছন্দ করে উঠতে পারছে না।

মহেশ্বরের নির্দেশমতো পরমেশ্বরকে কিছু না জানিয়েই জিনিসপত্র সব দোতলায় চালান যাচ্ছে, স্বয়ং পরমেশ্বর বাড়ি এসে বলে, এ আবার কী ঝঞ্ঝাট বাধালে তোমরা ?

আমরা ওপরে চলে যাচ্ছি।

কেন ?

একতলায় আপনি যেমন ছিলেন তেমনই থাকবেন।

কেন ?

নইলে আপনার অসুবিধা হবে।

কেন অসুবিধা হবে ?

এ কেন-র জবাব দিতে না পেরে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মহেশ্বর হাজির থাকলে বোধ হয় জবাব দিতে পারত। মহেশ্বর গিয়েছিল দোকানে। ভালো খাঁটি গাওয়া ঘি কিনতে।

শহরের দোকানে খাঁটি গাওয়া ঘি—তাও আবার ভালো !

কাছেই রাস্তার ওপর তারই মতো এক দেশছাড়া মানুষের নতুন মনোহারি দোকান।

মহেশ্বর বলে, খাঁটি গাওয়া ঘি বলছ ?

কালীপদ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। এখনও ভেজাল বেচতে শিখিনি !

খাঁটির চেয়েও যেন বেশি উৎকৃষ্ট মনে হয় বর্ণ আর গন্ধ ঘিয়ের—চেয়ে দেখে গন্ধ শুঁকে রীতিমতো সন্দেহ হয় !

আঙুলে একটু ঘি নিয়ে হাতে খানিকক্ষণ ঘষে পরীক্ষা করে দেখে মহেশ্বর বলে, খাঁটিই বটে—জিনিসটা যা সেটা খাঁটি। তবে ঘি নয়।

আজ্ঞে ?

মহেশ্বর তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, আট-দশটাকা সের বিক্রি হয় গাওয়া ঘি - তাব রং আর গন্ধ তৈরি না হয়ে কী যায় ! তবে আমাকে ভুলানো অত সোজা নয়। সাতপুরুষ ধবে ঘবের গোরুর দুধের মাখন থেকে তৈরি ঘি খেয়ে আসছি।

কালীপদ বলে, ঘি পৃথিবীতে আপনিই খেয়েছেন একা ?

তুমি তো দিয়েছ মুদিখানা, তোমার বাপ কী করত হে ? তোমার ঠাকুরদাদা ? আমি কোন বংশের ছেলে জানো ?

কালীপদ রাগে কিন্তু কথা কয় না। সে তিনপুরুষে দোকানদার, খদ্দেরকে না চটানো তার একেবারে ধাতস্থ। অবস্থার ফেরে আজকাল মেজাজ খানিকটা বিগড়ে গেছে, নইলে তার ঘিয়ের নিন্দা শুনেও মহেশ্বরকে খোঁচা দিয়ে মন্তব্য করত না যে পৃথিবীতে একাই সে খাঁটি ঘি খেয়েছে, আর কেউ স্বাদ জানে না।

রাগে গজগজ করতে করতে মহেশ্বর বাড়ি ফেরে কিন্তু পরমেশ্বরকে সামনে দেখে সে চোখের পলকে একেবারে যেন অন্যমানুষ হয়ে যায়।

পরমেশ্বর হাসিমুখে বলে, তুমি কি আমাকে তাড়াতে চাও মহেশ্বর ?

মহেশ্বর বলে, আজ্ঞে, সে কী কথা ?

তবে এ রকম উদ্ভট ব্যবস্থা কবছ কেন ? তোমরা সবাই ওপবে যাবে আমি একলা নীচেব তলাটা দখল করে থাকব ?

লোক থাকলে আপনার অসুবিধে হবে না ? এতকাল নিরিবিলি ছিলেন—

পরমেশ্বর হাসে।

তুমি আজও আমায় বুঝলে না মহেশ্বর ! এতদিন পয়সা ছিল, একতলাটা ভাড়া নিয়ে একলা ছিলাম। এখন এটা আমাদের নিজেব বাড়ি, তোমাদের ওপরে পাঠিয়ে আমি ওভাবে থাকতে পারি ? প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হবে না একটা খাপছাড়া অদ্ভুত অবস্থায় আছি ?

মহেশ্বর বলে, ঠিক বুঝতে পারিনি। আপনি চিরদিন একলা থাকতেই পছন্দ করেন—

সে যখন সুযোগ ছিল তখন ছিলাম। কারও অসুবিধা ঘটাতে হয়নি। আজ সুযোগ নেই তবু জোর করে একলা থাকব ? এখন তো সেটা পছন্দ হবে না আমার ?

সুরঞ্জনেরা বাড়ির পিছনের অংশে থাকে। সম্পূর্ণ পৃথক। দুখানা ঘর, একটা গ্যারেজ আর ছোটো একটুকরো উঠান।

কবে কোনো প্রয়োজনে হয়তো গাড়ি কিনতে হবে ভেবে বিধুভূষণ গ্যারেজটা তৈরি করেছিল। পরে হিসেব করে দেখল যে কবে গাড়ি কিনবে সেটা অনিশ্চিত কিন্তু দুখানা ঘর আর গ্যারেজটা অনায়াসে পৃথক করে অবিলম্বে ভাড়া গোনা যায়।

গ্যারেজে সুরঞ্জনদের রান্না হয়।

বিধুভূষণের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে খ্যাঁচাখেঁচি হত অচিন্ত্যের। এখন তারা ভাড়াটে হয়েছে মহেশ্বরের।

অচিন্ত্যের বদলে এখন চাকুরে সুরঞ্জন মাসের পয়লা তারিখে যেচে এসে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে যায়।

পরমেশ্বর বলে, দশ টাকা কম দিতে হবে, নইলে চলবে না। তোমরা অন্য বাড়ি খুঁজে নাও। ভয়ানক যেন রেগে গিয়েছে এমনিভাবে বলে।

সুরঞ্জন একটু ভড়কে গিয়ে বলে, বরাবর যা দিয়ে এসেছি—

বিধুবাবু বরাবর দশ টাকা বেশি নিতেন, এবার থেকে দশ টাকা কম দিতে হবে। ঠিক ভাড়া কত হওয়া উচিত আমি হিসেব করে দেখেছি। আমাকে ঠকাতে পারবে না। ঠিক ভাড়া দিতে না চাও, উঠে যাও।

এবার সুরঞ্জনের মুখে হাসি ফোটে।

বেশ তো ঠিক ভাড়াই নিন!

টাকা নিয়ে মহেশ্বর রসিদ দেয়।

পরমেশ্বর হেসে বলে, আমার মতলবটা টের পেলে না, এই তুমি শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলে? কয়েক মাস দশ টাকা করে কম নিয়ে ডিফল্টার দাঁড় করিয়ে তোমাদের ভাগিয়ে দেব।

সুরঞ্জন হাসিমুখে তাকে রসিদটা দেখায়। মহেশ্বর নিজেই রসিদের পিছনে লিখে দিয়েছে যে চলতি মাস থেকে দশ টাকা ভাড়া কমানো হল।

পূজা এগিয়ে আসছে।

মহেশ্বর নতুন অবস্থায় নতুনভাবে পূজার ব্যবস্থা করার চিন্তা আর হিসাবনিকাশ নিয়ে সব সময় ব্যস্ত আর বিব্রত হয়ে আছে। পরমেশ্বর নিজে থেকে পরামর্শ দিয়েছে, পঙ্কজের সঙ্গে পরামর্শ কর। ও পাড়ার সার্বজনীন পূজায় খুব খাটে— ওর কাছে সব জানতে পারবে।

ছোটোখাটো কিন্তু চকচকে নতুন গাড়িতে চেপে এক রবিবার সকালে বিধুভূষণেরা এ পাড়ায় বেড়াতে আসে, চেনা লোকদের সঙ্গে দেখা করতে আসে।

বুঝতে অবশ্য কষ্ট হয় না কারুরই যে দেখা করার চেয়ে নতুন কেনা গাড়িটা দেখাতে আসাই তাদের বেশি জরুরি ছিল।

কোনো একদিন গাড়ি কেনাটা টাকা নষ্ট করার বদলে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে ভেবে এ বাড়িতে বিধুভূষণ একটা গ্যারেজ তৈরি করেছিল, সম্ভ্রান্ত পাড়ায় আধুনিক প্যাটার্নের গ্যারেজবিহীন ছোটোখাটো বাড়িটা কেনার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি কেনাও তার দরকার হয়ে পড়েছে।

একটা গ্যারেজও তৈরি করে নিতে হয়েছে তাড়াতাড়ি। একজন ড্রাইভারও রাখতে হয়েছে গাড়িটা চালাবার জন্য। তারা কেউ গাড়ি চালাতে জানে না। বিধুভূষণের অবশ্য হিসাব ঠিক করাই আছে। নিজেরা গাড়ি চালালে কোনোই দোষ হয় না আজকাল, গাড়ি একটা থাকলেই হল।

গাড়ি চালাতে শিখে লাইসেন্স পাওয়া পর্যন্তই সে কান্তিলালের মাইনে গুনবে। অবশ্য গাড়ি চালাতে শিখতে হবে খুব ভালো করেই। কান্তিলালের খরচটা বাঁচাতে চেয়ে কলকাতা শহরে কাঁচা হাতে গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে হয়তো অপচয় করে বসবে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিংবা জীবনের! ও রকম বেহিসাবি টাকার মায়া বিধুভূষণের নেই।

তার আগের বাড়ির সামনেই গাড়ি দাঁড়ায়। পাড়ার অনেক বাড়ি থেকেই গাড়িটা এখানে দেখা যাবে।

তারা নেমে বাড়ির ভিতরে গেলে কান্তিলালও নেমে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরায়। এমন একটা মুখভঙ্গি করে থুতু ফেলে যেন গাড়ি আর গাড়ির মানুষগুলির নোংরা সান্নিধ্য থেকে মুক্তি পেয়ে বেঁচেছে।

পদ্মা মুখ ফিরিয়ে তার সেই মুখভঙ্গি দেখে ভাবে, বিড়ি টানতে ভালো লাগে না বেচারার। কিন্তু কী করবে সিগারেট কিনতে নিশ্চয় পয়সা কুলোয় না।

কিন্তু কেন কুলোয় না ? মাইনে তো কম পায় না একজন লোকের পক্ষে। খাওয়ার খরচ, থাকার খরচও লাগে না একপয়সা।

কী করে এতগুলি টাকা ?

পরমেশ্বর চিঠি লিখছিল নিজের ঘরে। সেখান থেকে জানালা দিয়ে গাড়ি থামা থেকে সকলের নেমে বাড়িতে ঢোকা চোখে না পড়েই পারে না।

নিজের ভাবে মশগুল হয়ে বাড়ির সামনে মোটর গাড়ি থামার আওয়াজ কেউ যদি কানে না শোনে, চোখটি তুলে জানালা দিয়ে চেয়েও না দ্যাখে কে এল, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

পদ্মা একটু যেন ভয়ে ভয়েই টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দামি টেবিল, দামি চেয়ার, খালি গায়ে চেয়ারে বসে পরমেশ্বর দামি পেন দিয়ে একটি পোস্টকার্ডে চিঠি লিখছে।

মুখ না তুলেই পরমেশ্বর বলে, এসো মা। নতুন রথে চড়ে এসেছ দেখছি। বেশ বেশ, নিত্য নতুন চাই, নইলে জীবন একঘেয়ে হয়ে যায়। বোসো মা জননী, টুলটা টেনে নিয়ে বোসো।

চিঠিটা লেখা শেষ করেই বোধ হয় মুখ তোলে।

মাকে একখানা চিঠি লিখলাম !

আপনার মা ? আপনার মা বাবা দুজনেই মারা গিয়েছেন শুনেছিলাম ?

পবমেশ্বর মুচকে মুচকে হাসে।

মা কখনও মারা যায় ? আমার মা মরতে না মরতে বাবা আমাদের একটি কচি মা এনে দিয়েছিলেন।

পদ্মা আমতা আমতা করে বলে, আপনাব সৎমা ?

পরমেশ্বর আঙুল উচিয়ে তাকে শাসানোর ভঙ্গি করে বলে, মা কখনও অসৎ হয় ? সব মা-ই সৎ। বাবার তিন বিয়ে ছিল বলে কি আমার শুধু দুটি সৎমা ? তোমায় যে মা বলি, তুমি তাহলে অসৎ নাকি ?

পদ্মা অধীর হয়ে বলে, সত্যি করে বলুন না কাকে চিঠি লিখলেন ?

সৎমাকেই লিখলাম। বাবার তিন নম্বরের বউ। তীর্থে বাপের বাড়ি, তাই সেখানেই আছেন। দশ বছর মাসে মাসে টাকা পাঠাবার দায়টা বয়ে আসছি। নতুন মাস শুরু হলেই আমাব এক দায়—মাকে টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠানো। না পাঠিয়ে উপায় নেই। ক-দিন পরেই মার আমাব চিঠি আসবে।

পদ্মা টুলে বসে যেন উশখুশ করে। দুবছর বোধ হয় পুবো হয়নি, নির্জন দুপুরে মিহি শাড়ি এলোমেলোভাবে গায়ে জড়িয়ে এই লোকটাকে সে জব্দ করে এসেছিল।

মা জননী বলে ডেকে কী জব্দই তাকে করেছিল মানুষটা।

ওর নাকি সৎমা আছে। বাবার তৃতীয় পক্ষের বউ ! দশ বছর তাকে নাকি সে মাসে মাসে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে এসেছে।

শুধু এটুকু জানলে সে কি আর সেদিন মানুষটাকে জব্দ করার কথা মনে আনত ? একেবারে একা দেখত মানুষটাকে, গা-ছাড়া ভাব, হালকা হাসি-তামাশা নিয়ে দিন কাটায়। ওর যে আবার আপনজন আছে ভাবতেও পারা যেত না।

কী লিখলেন ?

লিখলাম টাকা আর পাঠানো হবে না, ছেলেদের কাছে চলে এসো। আনতে লোক পাঠাচ্ছি।

পদ্মা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়।

আপনি ভয়ানক নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর হয়ে আপনি আনন্দ পান।

পরমেশ্বর যেন খুশি হয়ে বলে, এত চটে গেলে ? বয়স হলে বুঝবে, এটা নিষ্ঠুরতা নয়, এ হল প্রকৃতির দায়, জীবনের নিয়ম। গোরু দোয়া দেখেছ কখনও ? বাছুর কীভাবে স্তন পান করে ?

মায়ের দেহের সারাংশ চুষে নিচ্ছে, একটু তাতে কম পড়লেই প্রাণপণে ঢুঁ মারে। গাইটি আর পারছিল না দুধ ছাড়তে, বন্ধ করে দিতে চাইছিল সাপ্লাই। বাছুরের গুঁতোয় আবার সে খানিকটা দুধ ছাড়ে রিজার্ভ ফান্ড থেকে। বাছুরটা কী নিষ্ঠুর ?

গোয়ালা বাছুরটাকে বেঁধে রেখে প্রায় সব দুধ দুয়ে নিয়েছে, তাই বাছুরটাকে গুঁতো মারতে হয়।

আমিও তো তাই বলি। বাছুরগুলি ও রকম গুঁতো মেরে দুধ আদায় করে বলেই তো গোয়ালারা কচিবাছুর মেরে ফেলে। চামড়াটা ট্যান করিয়ে ভিতরে খড় পুরে চারটে বাঁশের বাতায় ঠ্যাং লাগিয়ে গোরুটাকে ভুলায়। খড়-ভরা শুকনো চামড়া চাটতে চাটতে পশ্চিমের মস্ত গাই বালতি-ভরা দুধ ছেড়ে দেয়—তার প্রত্যেক সেরের দাম এক টাকা। রোজ দেয়। ভুল ভাঙে না।

সকালবেলাই কেমন বিষাদ অনুভব করে পদ্মা। নতুন গাড়ি চেপে এ পাড়ায় বেড়াতে আসার উৎসাহ কোন ফাঁকে উপে গেছে।

সবিতা গান শিখছিল অসীমের কাছে। তার গলায় গ্রাম্যতা এখনও স্পষ্ট হয়ে আছে সুরে আর টানে।

গলা সাধা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করে, সমীরবাবু আসেননি ?

পদ্মা বলে, না। পরে আসবে।

পদ্মা জানে তারা গাড়ি দেখাতে আসছে বলেই সমীর তাদের সঙ্গে আসেনি। এখন তারও মনে হয়, সত্যি, এ ক্যামন গ্রাম্যতা তাদের ? এত দামি দামি গাড়ির ছড়াছড়ি কলকাতা শহরের আর তুচ্ছ একটা গাড়ি কিনে তারা একটু ঈর্ষা জাগাতে এসেছে এ পাড়ার সেকেলে রক্ষণশীল মানুষদের বুকে—যাদের সঙ্গে মিল না খাওয়ায় তাদের পালাতে হয়েছে অন্য পাড়ায় !

পদ্মাও এভাবে চিন্তা করে ? সস্তা নভেল আর সস্তা সিনেমা মানুষ আর জীবনকে যে বেচারির কাছে এত সস্তা করে দিয়েছিল যে নিজের সুন্দর দেহটার সাহায্যে পরমেশ্বরের মতো মানুষকেও জব্দ করতে যেতে এই সেদিনও যার দ্বিধা জাগেনি ? সেদিন মা বলে ডেকে পরমেশ্বর কি তার এই দশা করেছে ?

এভাবে চিন্তা করতে অনুভব করতে শিখিয়েছে ?

কিন্তু মা বলে ডেকেই যদি বিষিয়ে তোলা কাঁচা মনে মানুষ আর জীবনকে শ্রদ্ধা করার অমৃত সৃষ্টি করে নিজের উপরেও শ্রদ্ধা জাগানো যেত তবে আব ভাবনা ছিল কী !

পদ্মা শুধু ভড়কে গেছে। ভদ্র জীবনের মিথ্যা আর ফাঁকিগুলিই আরও বেশি করে ধরা পড়ছে তার কাছে।

নইলে সুরঞ্জন অধ্যাপক হয়েছে শুনে আত্মগ্লানিতে তার মন এমন বিরূপ হয়ে ওঠে যে এ বাড়িতে এসেও একবার ওদের পিছনের অংশটুকুতে যেতে অনিচ্ছা বোধ করে !

ইতিমধ্যে সুরঞ্জন কলেজ থেকে তিন-চারবার তাদের বাড়ি গিয়েছে। তার জন্যই গিয়েছে সে তো জানা কথাই।

চাকরি পাওয়ার আগে পর্যন্ত সুরঞ্জন খুব সংযতভাবে তার সঙ্গে মিশত। ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার কোনো চেষ্টাই করত না। এখন সে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। অত্যন্ত সদিচ্ছা নিয়েই চায় তাতে সন্দেহ কী !

কিন্তু চাকরি পাওয়া না পাওয়ার উপরেই যে সদিচ্ছা নির্ভর করে সেটা সার্থক করার জন্য তার সঙ্গে এবার বেশি করে মিলেমিশে একটা ভালোবাসা তৈরি করে নেবার কোনোই তো দরকার নেই।

সোজাসুজি বিধুভূষণের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেই পারে। ভালো ছেলে, ভবিষ্যৎ আছে। বিধুভূষণ রাজি হয়ে যাবে।

তার মতামত ?

ছাত্র সুরঞ্জনকে কত সুযোগ সে দিয়েছে তার মতামত জেনে নেবার—তখন জেনে নিলে তার একটা মানে থাকত। আজ অধ্যাপক হবারও মানে থাকত—অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে ভয় না করে তার জন্য দুঃসাহসের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়েছে।

অধ্যাপক হবার পর, ভবিষ্যৎ উন্নতি সুনিশ্চিত হবার পর নিশ্চিন্ত হয়ে আজ তার মতামত জানার চেষ্টা কি ছেলেখেলা নয় ? সুবোধ সুশীল কাপুরুষেরা যে খেলা খেলে ?

তবু অনিচ্ছা জয় করে একবার যেতে হয়। না গেলে ভালো দেখাবে না।

কান্তিলাল পিছনের সিটে আরাম করে বসেছিল, পদ্মাকে বেরিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করে, ফিরতে দেরি আছে ?

দেরি থাকলে সে আরও আরাম করে বসে ঘুমের আয়োজন করবে ! যখন তখন যেখানে সেখানে ইচ্ছামতো ঘুমিয়ে নিতে পারে বলেই কি ওর মুখে চিন্তাভাবনার এতটুকু ছাপ নেই ? অথবা চিন্তাভাবনা নেই বলেই এভাবে ঘুমোতে পারে ?

পদ্মা বলে, খানিকটা দেরি আছে।

সুরঞ্জনদের দরজার দিকে চলতে চলতে পদ্মা অনুভব করে কান্তিলালের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে, কিন্তু সে দৃষ্টি উদাস, নির্বিকার।

দুটি ঘরে সুরঞ্জনদের কোনো অসুবিধা নেই। মানুষ তারা তিনটি— অচিন্ত্য, অহল্যা আর সুরঞ্জন।

সুরঞ্জন খুশি হয়ে বলে, এসো, বোসো। গাড়ি কিনে খুব বেড়াচ্ছ দেখছি।

বেড়াব না ? বেড়াবার জন্যেই তো গাড়ি কেনা !

পদ্মা একটু হাসে। কিন্তু সে ভিতরে বোধ করে অস্বস্তি। সুবোধ সুশীল কাপুরুষ ? কে জানে ! জীবনকে যারা হালকাভাবে না, তারা হয়তো এ রকম ধীর শান্ত সংযতই হয়।

কিন্তু সারাজীবন তার কথায় উঠতে বসতে যে প্রস্তুত, তার কাছে সে অস্বস্তি বোধ করে কেন ?

অল্পক্ষণের মধ্যেই পদ্মা উঠে পড়ে।

বলে, পাড়া ছাড়বার পর এই প্রথম পাড়ায় এলাম, চেনা লোকদের সঙ্গে দেখা করে আসি।

এইটুকু সময়ের মধ্যে সত্যসত্যই কান্তিলালের ঘুম এসে গিয়েছিল—তবে ঘুমটা গাঢ় হয়নি। পদ্মা ডাকতেই সে চোখ মেলে তাকায়।

চলুন তো একটু—কাছেই।

কান্তিলাল নিজের সিটে গিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

কাছে বলে কাছে, এই পাড়াতেই বিনোদের হলুদ রঙের বাড়িটার সামনে পদ্মা গাড়িটা দাঁড় করায় ! দূরত্ব একশো গজের বেশি হবে না !

কান্তিলাল মুচকে হাসে। নতুন গাড়ি দেখাতে এসেছে।

তার সে হাসি দেখতে পেয়ে পদ্মা চটে যায়।

হাসছেন যে ? ভাবছেন গাড়ি পেয়ে খোঁড়া হয়েছি ?

না না, আমি কিছু ভাবিনি।

বন্ধুদের গাড়িটা দেখাতে এসেছি। নইলে এটুকু আসতে গাড়ি লাগত না।

কান্তিলাল সায় দিয়ে বলে, নতুন গাড়ি কিনেছেন, পাঁচজনকে দেখাবেন বইকী ?

বাড়ির ভিতরে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে পদ্মা আবার বেরিয়ে আসে। তার সঙ্গে আসে বিনোদের সমগ্র পরিবারটি।

গাড়ি দেখে সকলে নানারকম মন্তব্য করে, খুশি আর প্রশংসার মন্তব্য।

প্রণব বলে, বাঃ, সুন্দর ছোটোখাটো গাড়িটি। দেখে লোভ হচ্ছে। বাবা সেকেলে ধ্যাড়ধেড়ে গাড়িটা আঁকড়ে আছেন। বললে বলে, আজকালকার গাড়ি কী টেঁকসই হয় ? এ সব পুরোনো মডেলের গাড়ি মজবুত কত।

বিনোদবাবু বাড়ি নেই ?

বাবা ও পাড়ায় গেছেন—পুজো কমিটির মিটিং হচ্ছে। ভেতরে এসো ?

না, আমি যাই। ওরা সবাই ওয়েট করছে, এবার বাড়ি ফিরব।

শুনে কেউ আর কিছু বলে না। মনটা খুঁতখুঁত করে পদ্মাব। সাধে কী এ পাড়ার মানুষদের সঙ্গে তাদেব মিশ খেত না। হালচাল বুঝে কথা কইতে জানে না। কী তার দরকার ছিল এ কথাটা উল্লেখ করার যে আর সকলে মহেশ্বরের বাড়িতে অপেক্ষা করছে !

সে একা গাড়ি দেখাতে এসেছে, আব কেউ এল না এদের বাড়ি। পাড়ায় এসে অন্যদের সঙ্গে দেখা কবল, তাদের বাড়ি এল না। এদের মনে লেগেছে, অপমান হয়েছে।

পদ্মা ভাবে, কত প্যাঁচ সংসারে মানুষের মেলামেশায় !

বিধুভূষণের বিদায় নেবার সময় মহেশ্বর আবার বিশেষভাবে তাদের পূজা দেখে যাবার নিমন্ত্রণ জানিযে রাখে।

পদ্মা জিজ্ঞাসা কবে, কোথায় পূজা হবে ?

ওই বারান্দায় প্রতিমা বসাব। জায়গা বড়ো কম হল, উপায় কী !

বিধুভূষণ বলে, বাড়ির মধ্যে পূজা করার বড়ো অসুবিধা। একটা সদর দরজা দিয়ে অত লোকের আসা-যাওযা—

মহেশ্বর বলে, উপায় কী ? বাড়ির পূজা বাড়িব মধ্যেই করতে হবে।

কোথা দিযে বর্ষা কেটে গিযে শবৎ এসে গিয়েছে।

বর্ষার গোড়ায তাবা এসেছিল। বেশি দিন বাকি নেই দুর্গা পূজাব।

মহেশ্বর চায় এবার সে মহাসমারোহে পূজা কববে।

কলকাতা শহরে পয়সা খরচ করলে কোনো আয়োজন কবতেই বেশি সময লাগে না।

তাদের সাতপুরুষেব পূজা।

দেশের বাড়িতে বেশ ঘটা করেই হত। দেশ ছেড়ে আসার মনোবেদনায় ঘটাটা একটু বাড়িয়েই দিতে চায় মহেশ্বর।

পরমেশ্বর একবার বলেছিল, খরচপত্রও কম কবাই উচিত মহেশ্বর। সমারোহ কমিয়ে দাও। বাড়িটা কিনতে অনেক টাকা গেছে।

মহেশ্বর বলেছিল, মা ফেলেছেন দুর্দশায়। দুর্দশায পড়লে আবও বেশি ঘটা কবে মার পূজা করতে হয়।

আগামী বছরও করতে হবে তো। মা তো আর ছেড়ে কথা কইবেন না !

মা-র পুজো মা-ই করিয়ে নেবেন।

অনেক কথা বলে ফেলেছিল পরমেশ্বর। আর সে কিছু বলেনি। নিলে সব দাযিত্বই তার। সে বড়োভাই। কিন্তু টাকার ভাগও সে কোনোদিন নেয়নি, কোনো দায়িত্বও কখনও গ্রহণ করেনি।

ছয়

কারও অসুবিধা ঘটাবার জন্য সংকোচ বোধ করার কারণ সবিতার ছিল না। একতলাটা সম্পূর্ণ দখল করার বদলে পরমেশ্বর মাত্র একখানি ঘর নিজের জন্য নেওয়ায় স্থানের মোটেই অভাব ছিল না।

তাছাড়া সবিতা তাদের ঘরখানার জন্য ভাড়া দেবে।

দশ টাকা ভাড়া নিতে রাজিও হয়েছে সাধন।

তবু সবিতার অস্বস্তি ঘোচে না!

সে মাকে বলে, এখানে থাকতে ভালো লাগে না মা!

মানদা বলে, কেন? ভগবানের দয়া ছিল তাই বদলোকের পাল্লায় না পড়ে এখানে ঠাঁই পেয়েছি। বিপদে-আপদে এঁরা সহায় হবেন।

সেই জন্যেই তো। একে আমরা গরিব, তায় একেবারে নিঃসহায়। খালি মনে হয় যেন এদের দয়ায় এদের আশ্রয়ে আছি!

অত খুঁতখুঁতে হতে নেই। মেয়েছেলে না তুই?

মেয়েছেলের বুঝি মান-সম্মান নেই?

মানদা বিরক্ত হয়ে বলে, কী জানি বাবু, তোর সাথে তর্ক করে পারি না।

পাশের বাড়িতে নিশীথ একখানা ঘরের ভাড়াটে। একটু ত্যারচাভাবে হলেও সবিতা আর তাদের দুটি ঘরের জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরের খানিকটা দেখা যায়।

নলিনী জানালায় পর্দা দিয়ে রাখে। জানালার তলার দিকে রঙিন কাপড়ের সুন্দর পর্দা। তবু দাঁড়ানো মানুষের বুক পর্যন্ত উপরের দিকটা দেখা যায় সবিতাদের ঘর থেকে।

শুধু নিশীথ আর সবিতার। তাদের তিন বছরের ছেলেটির নয়।

জানালায় দাঁড়িয়ে নলিনী তার সঙ্গে আলাপ করে। তারা কোথা থেকে এল, কেন এল, ক-জন এল ইত্যাদি নানাবৃত্তান্ত জেনে নেয়।

প্রশ্ন করে, ঘরটা তোমরা ভাড়া নিয়েছ?

হ্যাঁ।

একখানা ঘর? কত ভাড়া?

দশ টাকা।

শুনে চোখ বড়ো বড়ো করে নলিনী বলে, সত্যি?

তার অবাক হবার মানেটা সবিতা বুঝতে পারে কয়েকদিন পরে। নলিনী তকে তার ঘরে বেড়াতে যাবার আহ্বান জানিয়ে রেখেছিল। সবিতারও কৌতূহল ছিল জানালা দিয়ে আংশিকভাবে দেখা ঘরখানা ভালো করে দেখবে।

তাদের ঘরের চেয়ে ছোটোই হবে ঘরখানা। আসবাবপত্র খুব বেশি দামি নয় কিন্তু ঘরখানা যেন ছবির মতো সাজানো।

এসো ভাই, বোসো।

নলিনী তাকে বসতে দেয় ছবি আঁকা সিঙ্গাপুরি মাদুরে—বোঝা যায় মাদুরটি খুবই পুরানো কিন্তু যত্নে রাখায় জীর্ণ হয়নি।

সবিতা বলে, আপনারা ক-দিন এখানে আছেন?

বছরখানেক আগে ছিলাম ওই শশধরবাবুর বাড়ি। লোকটা এক-একদিন মদ খেয়ে এমন হল্লা করত! কী ভয়ে ভয়ে যে থাকতাম কী বলব তোমাকে! এ ঘরখানা পেয়ে যেন বেঁচেছি।

কত ভাড়া দেন?

লাইট নিয়ে পঁয়ত্রিশ টাকা।

শুনে এবার সবিতা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকায়।

এত ভাড়া ? একখানা ঘব পঁয়ত্রিশ টাকা ?

নলিনী হাসে।

ভাড়া আজকাল এই রকম দাঁড়িয়েছে। দু-পাঁচটাকা কমবেশি হবে। তোমরা দশ টাকায় অমন ভালো একখানা ঘর পেয়েছ শুনে তাই তো অবাক হয়ে গেছি। আত্মীয়তা আছে ?

না। একমাস আগে চেনাও ছিল না।

ওরাও বোধ হয় রেট জানেন না, তাই।

বাড়ি ফিরেই সে বলে, আর এখানে থাকা হয় না মা।

কেন ?

ত্রিশ পঁযত্রিশ টাকা ভাড়ার ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না।

অত কেন ? ওরাই তো দশ টাকা ভাড়া বলে দিয়েছে।

সে ওরা দয়া করে বলেছে। আমরা দয়া নিতে যাব কেন ? একটা কম ভাড়ার ঘর খুঁজে নিতে হবে তাড়াতাড়ি !

মানদা চটে বলে, তুই বড়ো বাড়াবাড়ি কবিস !

সবিতা শান্তভাবে বলে, বাড়াবাড়ি কীসেব মা ? বাবা থাকলে এ রকম দয়া নিতেন ? তুমি পরের ঘব থেকে এসেছ, তোমার গায়ে লাগে না,—আমি তো বাবার মেয়ে ! এমনি উপকার নিতে পাবি, মাসের পর মাস দয়া নিতে পারব না হাত পেতে।

পঙ্কজকে সে জিজ্ঞাসা করে, কম ভাড়ার ঘর পাওয়া যায় কোথা ?

কত কম ?

আট-দশটাকা।

পঙ্কজ সোজাসুজি ডোবাটার ওপাশের বস্তিটা দেখিয়ে দিয়ে বলে, ওখানে। আরও কমেও পাবে—তিন-চারটাকার ঘরও আছে। এখানে থাকবে না বুঝি ?

না।

কারণটা শুনে পঙ্কজ একটুও আশ্চর্য হয় না। ববং সায় দিয়ে বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

সবিতা আশ্চর্য হয়ে বলে, বলেন কী ! কী থেকে ভাবলেন ?

পঙ্কজ হেসে বলে, তোমার মাথা একটু খারাপ আছে জানি তো ?

বটে ?

অন্য কেউ হলে খুশিই হত—আরও সুযোগসুবিধা আদায় করার চেষ্টা করত। কিন্তু তোমার কিনা মাথা খাবাপ, ছেলে সেজে পথে বার হও, তুমি ঠিক উলটোটা ভাববে। গরিব হয়ে বড়োলোকের সঙ্গো খাতিরের সম্পর্ক রেখে তুমি চলতে পারবে না।

সবিতা খুশি হয়ে বলে, তাই বলুন !

তুলসী মহেশ্বরদের বাড়ি কাজ করতে এলে সবিতা জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের ওদিকে ঘর খালি আছে বলতে পার ?

কেন গা ? ঘর কী হবে ?

ভাড়া নেব।

এখানে রইবে না ? এ ঘর কী দোষ করলে গা ? ভাড়া বেশি তো নয় মোটে ! কপালজোরে দশ টাকায় এমন ঘর পেয়ে গেছ !

কপালজোরে কাজ নেই। তুমি যাবার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যেয়ো।

কাজেই তুলসীর মারফতে খবরটা জানাজানি হয়ে যায়।

তুলসী সুরমাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের ভাড়াটে উঠে যাবে কেন গো ? বনিবনা হলনি ?

সাধন চা খাচ্ছিল কাছে বসে। সে বলে, তোমায় কে বললে উঠে যাবে ?

ওই মেয়েই বললে। মোর সাথে ঘর দেখতে যাবে বস্তিতে।

তাই নাকি ? কখন বললে ?

এই তো আসতে না আসতে চেপে ধরেছে, ঘর খালি আছে তোমাদের ওদিকে ? সস্তা ঘর ? আমি বললাম, দশ টাকায় এমন ঘর পেয়েছ, মন উঠছে না ? তা কোনো জবাব দিলে না।

তুলসী কলতলায় চলে গেলে প্রতিমা বলে, ব্যাপার কী ? এমন সুবিধে ফেলে চলে যেতে চায় ? নিশ্চয় কিছু হয়েছে।

বলে সে বিশেষ এক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাধনের দিকে তাকায়।

সাধন গম্ভীর হয়ে বলে, হবে আবার কী ? ও তোমাদের সঙ্গে থাকতে চায় না—এই হল ব্যাপার ! বড়োলোকের মেয়ে তোমরা, কত উদারতা দেখিয়ে গরিব বেচারিদের ঘরে স্থান দিয়েছ, সারাদিন তাই ভালোভাবে একটা কথা কইবার সময় পাও না। এভাবে থাকবে কেন ?

সুরমা বলে, দোষটা শেষে হল আমাদের ?

সাধন বলে, বাপের পয়সায় দুধ-ঘি খেয়ে ক্রিম-পাউডার মেখে রঙিন শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ঘুরে বেড়াও—ওকে তোমরা বুঝবে না। আমার সঙ্গে তোমরা কলকাতা আসতে ভরসা পাও না, আমি যে মোটে একজন ব্যাটাছেলে। তোমাদের আনবার জন্য জ্যাঠামশাইকে লোক পাঠাতে হয়। ওর বাপ নেই, ভাই নেই, একগাদা টাকাও নেই, তবু ও একলা ব্যবস্থা করে মা আর ভাইবোন দুটিকে কলকাতা পার করে এনেছে।

সুভাগিনী বলে, তুই কি পাগল হলি সাধন ? কী যা তা বকছিস ? ও রকম পাকামি করা কি ভালো কোনো মেয়ের পক্ষে ? সৎ ঘরের ভালো ঘরের কোনো মেয়ে ও রকম করে ? বাপ-ভাই না থাক—আর কি কেউ ছিল না, খুড়ো জ্যাঠা মামা মেসো আত্মীয়কুটুম ? নরম হয়ে বললে তারা কি সাহায্য করত না ? তুই খালি বীরত্ব দেখছিস মেয়েটার। বীরত্ব না ছাই, এ হল পাগলামি মেয়েটার—বদ খেয়াল।

তুমি বুঝবে না মা।

আমি সব বুঝি। গুরুজন কেউ থাকলে বজ্জাতি করার অসুবিধা হবে—তাই নিজেই পুরুষছেলে সেজে মস্ত বাহাদুরি করেছেন। এখানে আমরা মায়া করে ঠাঁই দিয়েছি—আমাদের চোখের সামনে যা খুশি করতে পারছে না। তাই ঝোঁক চেপেছে উঠে যাবার।

সুরমা চুপ করে থাকে।

প্রতিমা খুশি হয়ে বলে, তুমি ঠিক বলেছ মা।

সাধন বলে, তুমি দু-চারশো বছর পিছিয়ে আছ মা। তুমি বুঝবে না। অ্যারিস্ট্রোকেট মেয়েরা যা খুশি করে—তাদের তোমরা দোষ দিয়ো না। একটি মেয়ে দু-চারবছর একলা সারা পৃথিবী টহল দিয়ে এল—তাকে তোমরা মেনে নিচ্ছ। তিনি মেয়েদের মুক্তি দিচ্ছেন—কত কী করছেন ! কিন্তু গরিব ঘরের মেয়ে একটু স্বাধীন হতে চাইলেই তোমরা সেটা ধরে নাও বজ্জাতি ! সে যে মোটর এরোপ্লেন চড়ে না, ইংরাজিতে কথা কয় না, হোটেলে খানা খেতে জানে না !

সুভাগিনী রেগে বলে, সাধন !

সাধনও রেগে বলে, মা !

আমাকে মারবি নাকি তুই ? মার মার !

প্রতিমা বলে, তাই করো। একটা চাবুক এনে মাকেও মারো, আমাদেরও মারো।

সাধন আগে চা খেয়ে জলখাবার খায়। ভেজাল চায়ের স্বাদে তার নাকি মুখটা বিশ্রী হয়ে থাকে নইলে।

আধ ভর্তি চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট সে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

বলে, আমি শুধু কথা বললাম। আমার কথা শুনেই তুমি বলতে পারছ আমি তোমায় মারতে পারি ? প্রতিমা চাবুক দিয়ে মারতে বলছে। আমার কোনো অপরাধ হয়েছে নিশ্চয় । কী অপরাধ করেছি বুঝতে পারছি না।

তার ভাবভঙ্গি এবং কথা শুনে সকলেই একটু ভড়কে গিয়ে চুপ করে থাকে।

আমি দুদিন নির্জলা উপোস করব।

খানিকক্ষণ সবাই চুপ করে থাকে।

মহেশ্বরের ছেলে পবিত্রার স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে পুরো দুদিন সে নির্জলা উপোস করবে—এরপর কথা বলতে যাওয়া মুশকিলেরই কথা।

সুরমা বলে, চা খাবারটা খাচ্ছিলে খেয়ে নাও ?

না। দুদিন কিছু স্পর্শ করব না।

সভাগিনী হঠাৎ কেঁদে ফেলে, সেই মার তরে মারলি তুই আমাকে ? একটু তোর মায়াদয়া হল না ?

আত্মশুদ্ধির জন্য উপোস করব। তোমাদের কী ক্ষতি করলাম ?

সবিতাকে সাধন নিজে ঘরে ডেকে নিয়ে আসে। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও আহত মনে হয় তাকে।

বলে বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

তবেই সেরেছে ! একটা কিছু দোষ করেছি নিশ্চয় !

মোটা মিলের শাড়িতেও তার রোগা ছিপছিপে দেহটিতে যে অপরূপ সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটা শুরু হয়েছে সেটা চাপতে পারেনি। রং তার খুব বেশি উজ্জ্বল নয়, কোমল লাবণ্যে যেন চাপা পড়ে আছে।

মুখখানা শান্ত কোমল। দেখলে মায়া হয়।

দেখে কল্পনাও করা যায় না তার মধ্যে মেয়েলি লাজুকপনার কত অভাব কত সুদৃঢ় তার আত্মপ্রত্যয় ! মেয়ে হয়ে জন্মে কীভাবে ভিতরটা তার এভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে কে জানে !

কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না ?

সবিতা সরলভাবে হাসে।

কীভাবে বলব ভাবছি। সোজাসুজিই বলি। ঘর খুঁজছ কেন ?

আমিও সোজাসুজি বলি। ঘরের ভাড়া খুব কম ধরেছেন।

বাড়িয়ে দেব ?

সে আপনাদের ইচ্ছা। যত ভাড়া হওয়া উচিত, তত ভাড়া দিয়ে থাকতে পারব না।

কত ভাড়া হওয়া উচিত তুমি ঠিক করলে কী করে ?

আরও দশজনে তো এ রকম ঘর ভাড়া নিয়ে আছে।

সাধন মাথা নাড়ে।

এ যুক্তি ঠিক নয়। অন্য বাড়িওলা যদি ভাড়াটের গলা কেটে বেশি ভাড়া নেয়, আমরা সে অন্যায়টা করব কেন ?

সবিতা হেসে বলে, দশজনে করছে, আপনারা না করলেই তার মানে দাঁড়াবে আমাদেব খাতির করছেন।

একটু খাতির করলে দোষ কী?

অবস্থাবিশেষে দোষ আছে বইকী। আমরা গরিব।

সাধন একটু চুপ করে থাকে।

তুমিও বন্ধুত্ব স্বীকার কর না?

করি না! আপনি তবে বন্ধু হলেন কী করে?

বন্ধুর মনে কষ্ট নিয়ে কী করে চলে যাবে? শোনো, তোমায় স্পষ্ট করে বলি—তোমরা গরিব বলে দয়া করে আশ্রয় দিইনি। তোমরা গরিব কী বড়োলোক আমি জানি না—তোমায় আমার ভালো লেগেছে। তোমরা চলে গেলে সত্যি আমার মনে কষ্ট হবে।

সবিতা একটু চুপ করে থাকে।

একটা কথা আপনি বুঝলেন না। বাড়িতে আপনি একা নন।

তাতে কিছু আসে যায় না।

এটা কী বলছেন আপনি? আসে যায় না মানে তো এই যে আপনার জন্য কেউ মুখে কিছু বলবেন না, মনে যাই হোক চুপ করে থাকবেন। আমবা এভাবে বেশি দিন ঘর জুড়ে থাকলে সবাই নিশ্চয় সেটা অপছন্দ করবেন, বিরক্ত হবেন। হবেন কেন, ইতিমধ্যেই হয়েছেন। কিন্তু আপনার জন্য উপায় নেই তাই সবাই মেনে নিয়েছেন আমাদের। ঠিকমতো ভাড়া দিলেও বরং কথা ছিল!

সাধন আশ্চর্য হয়ে শোনে। মনে হয় যেন শিশুর মুখে সংসারের জটিল সমস্যার পাকা ব্যাখ্যা শুনছে—তার নিজের যেদিকটা খেয়ালও হয়নি।

সবিতা যে সত্য কথাই বলেছে তাও অস্বীকাব করার উপায় নেই।

পরম উদারতার সঙ্গেই গোড়ায় সকলে সবিতাদের বাড়িতে উঠিয়েছিল—একটা মহৎ কাজ করে খুশিই হয়েছিল সকলে। সবিতা ভাড়া দেবার কথা তোলায় সকলে অপমান বোধ করে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। ক্রমে ক্রমে সাধন টের পেয়েছে যে ধীরে ধীরে উদারতা উপে গিয়ে প্রায় সকলের মধ্যেই এসেছে কমবেশি বিরক্তির ভাব।

তাদের পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা গেলেও বরং কথা ছিল, সকলে এতটা বিরক্ত হত না। অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাদের সকলের মধ্যে একটা ঘর নিয়ে ওরা বাস করবে, তাদের পরিবারের কোনো ব্যাপার ওদের অগোচর থাকবে না, সারাদিন বাধ্যতামূলক মেলামেশা চলবে—এ কথা ভেবে মনটা বিগড়ে গেছে সকলের।

একটা পার্টিশান তুলে কোণের দিকের ঘরখানায় সবিতাদের থাকবার ব্যবস্থা করার কথাও উঠেছে ইতিমধ্যে।

সবিতা বলে, এবার বুঝলেন তো? এ রকম খাপছাড়া ব্যাপার কি সংসারে চলে? আমরা কেউ নই, সমান দরের লোকও নই, আমরা এসে বারোমাস ঘরের লোকের মতো ঘর জুড়ে থাকব—এটা কেন বরদাস্ত করবে সবাই? অবশ্য আপনার কথা আলাদা।

সাধন বিমর্ষ হয়ে বলে, বস্তির ঘরে থাকতে পারবে?

কেন পারব না? ওখানে মানুষ থাকে না? বস্তিতে সুবিধা না হয়, কাছের ওই কলোনিতে চলে যাব—একটা ঘর তুলে নেব। কলোনির কথাই আমি বেশি করে ভাবছি।

আমি যদি ব্যবস্থা করে দিই?

সবিতা একটু ভেবে বলে, দেবেন। কিন্তু ভুলবেন না যেন আমরা গরিব। সামান্য যে টাকা আছে খরচ করে ফেললে চলবে না। কতদিনে কী ব্যবস্থা হয় কিছুই ঠিক নেই।

সাধন তার ডান হাতটি চেপে ধরে বলে, না গো গণেশ, আমি তা ভুলব না। তোমাদেব আমি টাকা দিয়ে সাহায্যও কবব না, তোমরা যে গরিব তাও ভুলব না।

সবিতা বলে, আমি সত্যি গণেশ নই, মেয়েছেলে—এটাও ভুলবেন না যেন !

সাধন তার হাত ছেড়ে দেয়।

বস্তিতে অঘোরদের বাড়িতে একখানা ভালো ঘর খালি ছিল। ইটের দেয়াল, খোলার চালের বাড়ি। এখানকার অর্ধেক বাড়ি এই বকম, বাকি বাড়ির দেয়াল কাঁচা।

খালি ঘরখানা ভাড়া করে সবিতাবা উঠে যাবার ব্যবস্থা করে। মাসটা কাবার হবার জন্যও অপেক্ষা করে না।

পরমেশ্বর সবিতাকে বলে, বিদায় নিলে ?

হ্যাঁ। কাছেই আছি।

কাজটা একটু ছেলেমানুষি হয়ে গেল।

তার মুখে কৌতুকের হাসি লক্ষ করে সবিতা বলে, এত কাছে থাকতে যাওয়াটা ?

যাওয়াটাই ছেলেমানুষি হল। তা তুমি ছেলেমানুষ বটেই তো, সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধি পাকেনি। এ অবস্থায় এ রকম একটা আশ্রয় পাওয়া গেলে ছাড়তে আছে ? আমি হলে তাড়িয়ে দিলেও যেতাম না।

বাঃ, কোন অধিকারে থাকব ?

এখানে জায়গা আছে, তোমার থাকার জায়গা নেই—এই অধিকারে।

সবিতা হেসে বলে, জায়গা তো কত বাড়িতেই আছে, থাকবার জায়গাও কত লোকের নেই। তারা সবাই যদি জোর করে—

পরমেশ্বর তার মাথায় হাত দিযে বলে, সাধে কী ছেলেমানুষকে বলি ছেলেমানুষ ? একদিকে টনটনে পাকা বুদ্ধি—অন্যদিকে স্রেফ বোকামি। তুমি কি জোর করে ঘর দখল করেছ ? বিশেষ অবস্থায় তুমি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়েছ, তুমি সেটা নেবে—অন্যদের কথা আলাদা।

সবিতা মাথা নাড়ে।

নাঃ, আমার মন চায় না, করব কী !

মনকে চাওয়াতে হয়। মনের ওপর জোর খাটাতে হয়।

প্রণব প্রতিদিন ভোরে অঘোরের বাড়ি দুধ আনতে যায়।

সামনে দোয়ানো দুধ না খেলে বিনোদের নাকি পেট ফাঁপে। জল-মেশানো দুধের চেয়ে খাঁটি দুধটা তার সহ্য হয় বেশি।

অন্য কেউ দুধ এনে দিলেও তার চলে না। একমাত্র নিজের ছেলেকে ছাড়া আর কারও প্রতি তার বিশ্বাস নেই। নিজেও মাঝে মাঝে যায়—প্রণবকেই যেতে হয় বেশির ভাগ দিন।

বাড়িতে গোরু নিয়ে এসে অঘোর দুধ দুয়ে দিয়ে যেতে রাজি আছে— গোবুর সবটা দুধ কিন্তু নিতে হবে। অনায়াসেই তা নিতে পারে বিনোদ, তার সংসারের লোকের হিসাব ধরলে দুটো গোরুর দুধই তার নেওয়া উচিত, কিন্তু জমা টাকা খরচ করে সকলকে দুধ খাওয়াবার কথা ভাবতেও পারে না বিনোদ।

বিশেষত আজকাল যা দাম দুধের।

সে হতাশভাবে বলে, পেনশনের পয়সায় কি আর ভালোভাবে চালানো যায় আজকাল !

কিছু কিছু জমাতেও হয় পেনশনের টাকা থেকে।

তাই সে ছাড়া বড়োরা কেউ দুধ খায় না। বড়ো মানে যাদের বয়স পাঁচের বেশি।

জবরদস্ত হাকিম ছিল বিনোদ। কড়া হাতে আন্দোলন দমন করে আর স্বদেশিদের জেলে পাঠিয়ে পদোন্নতির পথে মাইনে বাড়িয়ে পয়সা রোজগার করেছে, একস্‌টেনশন টেনে টেনে পেনশন নিয়েছে দেশে ভাগের স্বাধীনতা আসবার বছর তিনেক আগে।

তার টাকার মায়া দাঁড়িয়েছে অদ্ভুত রকম। তার ঠিক কৃপণতা নয়—সাধারণ কৃপণের পয়সা খরচ করতেই কষ্ট হয়। তার কিন্তু কতগুলি বিষয়ে হাত খুব দরাজ, অম্লানবদনে টাকা খরচ করে। আবার কতগুলি বিষয়ে সে কৃপণের চেয়েও অধম।

বাড়িটি তার দামি আসবাবে সাজানো, রেডিয়ো ইত্যাদির অভাব নেই, ছেলেমেয়েদের বেশভূষায় কৌলীন্যের ছাপ, বাড়িতে সে চাকর রাখে এবং মালি দিয়ে বাড়ির সামনের বাগানটির সৌন্দর্য বজায় রাখে।

কিন্তু পয়সা খরচের ভয়ে আত্মীয়বন্ধু কাউকে সে বাড়িতে ডাকে না, কোনো সম্পর্ক রাখে না—দু-একজন ছাড়া। নিজের বিবাহিতা মেয়ে দুটিকে পর্যন্ত সে দু চারদিনের বেশি পুষতে রাজি হয় না—পেনশনের অজুহাতে মেয়েদের মারফতেই জামাইদের কাছ থেকে খরচ আদায় করে নেয়।

সাধারণ অবস্থার আত্মীয়স্বজনের বাড়ি সে বিয়ের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত রাখতে যায় না, বাড়ির লোককেও যেতে দেয় না—কিছু দিতে হবে এই জন্য !

নিজের মান বাঁচাতে তাকে দিতে হবে দামি জিনিস—কিন্তু তার বাড়িতে কোনো কাজ হলে গরিব বলে ওরা নিমন্ত্রণ রাখতে আসবে হয় শূন্য হাতে, নয় সামান্য কিছু উপহার নিয়ে।

দু-চারজন আত্মীয়বন্ধু, যাদের কাছে সমান সমান প্রতিদান প্রত্যাশা করা যায়, তাদের সঙ্গেই সে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

এটাই আসল কথা তার কার্পণ্যের !

টাকা খরচ করলে প্রতিদানে তার কিছু পাওয়া চাই।

দুধ যে সে কাউকে খেতে দেয় না, মাছ মাঝে মাঝে শুধু একবেলার মতো অল্প পরিমাণে আসে, সস্তা তরকারি দিয়ে রেশনের চাল-বুটিতেই সকলকে পেট ভরাতে হয়, তার কারণও তাই।

শরীর তো সুস্থই আছে সবার। ভালো খাওয়ার জন্য পয়সা খরচ করে লাভ কী ?

মেয়ে সেজেগুজে বাইরে গেলে, ছেলে দামি সুট পরে কলেজে গেলে দশজনে সেটা দেখবে—বলবে এরা বিনোদবাবুর ছেলেমেয়ে।

কিন্তু কে দেখতে আসবে ঘরে বিনোদবাবুর রোজ পোলাও-মাংস রান্না হয় ?

দেখাবার যেদিন দরকার হয় সেদিন তাই হাত খুলে যায় বিনোদের, দামি দামি জিনিস রান্না হয় সমারোহের সঙ্গে।

অঘোর আয়োজন করে দুধ দোয়ার।

উঠানে দাঁড়িয়ে মণ্টুকে প্রণব বলে, তোমাদের বুঝি নতুন ভাড়াটে এল ?

মণ্টু বলে, হ্যাঁ।

পাশেই সবিতা তোলা উনান সাফ করে কয়লা সাজাচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে থেকে প্রণব এবার বুনোকে বলে, তোমাদের যেন কোথায় দেখেছি খোকা ?

বুনো চুপ করে থাকে।

সবিতা বলে, আমবা ঈশ্বরবাবুর বাড়িতে ছিলাম।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। দেশ থেকে মহেশ্বরবাবুদের সঙ্গে তোমরা এসেছ না ?

সবিতা সায় দিয়ে বলে, আপনি হলুদ বঙের বাড়িটাতে থাকেন না ?

প্রণবও সায় দিয়ে সাগ্রহে বলে, তুমি সেই মেয়েটি না যে ছেলে সেজে এসেছিল ?

সবিতা হেসে বলে, আপনি কার কাছে শুনলেন ?

পঙ্কজ বলেছে। এইখানে দুধ নিতে এসেই গল্প করেছিল। শুনে ভারী ইচ্ছা হচ্ছিল তোমাব সঙ্গে আলাপ করি।

গেলেন না কেন ?

ভাবলাম, কে জানে, মেয়েছেলে—যদি কিছু মনে করে ! তুমি এমন আলাপী জানলে নিশ্চয যেতাম।

ইতিমধ্যে পাত্র হাতে পঙ্কজ এসে দাঁড়ায়।

সবিতা বলে, আপনি বুঝি গণেশের গল্পটা দেশসুদ্ধ লোককে শুনিয়ে বেড়িয়েছেন ?

পঙ্কজ বলে, নিশ্চয় শোনাব ! গাঁয়ের একজন সামান্য ব্যবসায়ীব মেয়ে এমন সাহসের পরিচয় দিতে পারে—এ গল্প সবার শোনা উচিত।

লিখে ছাপিয়ে দিন।

বলে উনান ধবিয়ে দিযে সবিতা ঘরে চলে যায়।

প্রণব বলে, তুমি ভারী অন্যায় কবছ ভাই। বেচাবিকে বিপদে ফেলছ।

কেন ?

সামনাসামনি প্রশংসা করে আকাশে তুলে দিচ্ছ, ওর মাথা বিগড়ে যাচ্ছে। এর ফলে একগুঁযেমি আসবে—নিজে যা ভালো বুঝবে তাই কবতে চাইবে। একদম ভুলেই যাবে সংসারে একটু সামঞ্জস্য করে চলা দরকার।

ঘবে বিছানা তুলতে তুলতে সবিতা তার কথাগুলি কান পেতে শোনে।

মানদার জ্বর হয়েছে।

এখনও সে ওঠেনি। কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুযে আছে এককোণে।

একটিমাত্র মশারি। তাব নীচে মানদা ছেলেমেয়েদের শোযায। ছোটো মশাবি, তিনজনকেই গাদাগাদি করে শুতে হয়। মানদা ভিন্ন শোয়—মশাবি ছাড়া।

তোমায় মশা কামড়াবে না ?

কাঁথামুড়ি দিয়ে শুই না আমি ?

বুনো উঠেছে, বাইরে গেছে। নিজেই মুখ হাত ধুযেছে। অপেক্ষায় আছে কখন খাবার পাবে।

বেলা উঠে ঘরের মধ্যে ক্ষীণস্বরে কাঁদছে।

ওর মুখ ধুইয়ে দিতে হবে, ওকে খেতে দিতে হবে।

মানদার জ্বর বেড়েছে—গায়ে হাত দিয়ে না দেখলেও টের পাওয়া যেত। কারণ, জ্বব না বাড়লে মানদা কাঁথামুড়ি দিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে পারত না—যেন সে মা নয়, তার যেন ছেলেমেয়ে নেই।

শুধু ভাইবোন নয়, মা-র দায়িত্বটাও আজ পুরোমাত্রায় সবিতার।

বিছানা তুলতে তুলতে তাই সে প্রণবের কথাগুলি কান পেতে শোনে।

বিছানা তুলে বাইরে যখন যায় প্রণব আর পঙ্কজ দুজনেই দুধ নিয়ে চলে গেছে।

মণ্টুকে কাছের দোকান থেকে দুপয়সার মুড়ি আনতে পাঠিয়ে দাওয়ায় বসে ধোঁয়ানো উনানটার দিকে চেয়ে সবিতা ভাবে। ভাবে, প্রণবের কথাই কী ঠিক ?

আজ তাকে সব দায়িত্ব সব ভার বইতে হবে একা। শুধু ভাইবোন দুটির ভার নয়—মা-র জ্বরের ভার পর্যন্ত।

সকালবেলাই এত জ্বর—এ জ্বর কত বাড়বে ঠিক নেই।

সেই কর্ত্রী সবকিছুর। সে যা করবে তাই হবে।

তাই তাকে এদিকে ক্ষিদে মিটিয়ে বেঁচেবর্তে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে ভাইবোন দুটির, ওদিকে ডাক্তার এনে চিকিৎসাব ব্যবস্থা করতে হবে মা-র।

এ সব নয় করল। সে জন্য সবিতা ভাবে না। এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম সে নয় না পেল, সে জন্য কিছু আসে যায় না।

সে সব কিছুই সামলে চলতে পারবে।

কিন্তু কতদিন পারবে ?

হাতের টাকায় যে ক-টা দিন চলবে শুধু সে ক-টা দিন !

দুরাশা কিনা জানে না, সে স্থির করেছিল চারিদিক বুঝেশুনে বিচাব-বিবেচনা করে মাস দুয়েকের মধ্যে কোনো একটা রোজগারের ব্যবস্থা করে নেবে। যত সামান্যই হোক— নিয়মিত একটা উপার্জনের ব্যবস্থা। শাকভাত খেয়ে কোনোরকমে হোগলার চালায় ভাইবোন মাকে নিয়ে যাতে বেঁচে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা।

কিন্তু উনান ধরিয়ে বাসন মেজে খাদ্য আর পথ্য রেঁধে, ভাইবোনদের নাইয়ে-খাইয়ে, মা-র সেবা করে যদি তার দিনটা কেটে যায়—ব্যবস্থা সে করবে কী করে ?

ঘরেই যদি সে আটকে থাকে, বাইরে না বেরোতে পারে—তার পক্ষে কিছু করা কি সম্ভব ?

ধোঁয়াটে উনানের সামনে বাঁধানো রোয়াকে বসে তাব মনে হয়, পরমেশ্বর যা বলেছিল প্রণবও যেন আবার তার কথারই প্রতিধ্বনি করে গেছে।

একটা মীমাংসা দরকার।

সে তো জানে যে শেষ পর্যন্ত তার দেহটাও বিক্রি করা দরকার হতে পারে !

মানদা জ্বরের ঘোরে ডাকে, সুবি !

রেখা কান্নার মধ্যে ডাক চালায়, ডিডি ! ডিডি ! মণ্টু সামনে দাঁড়িয়ে থাকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বালকের মতো।

সব দায়িত্ব ফেলে সবিতা হঠাৎ বেরিয়ে যায়। তার খেয়ালও থাকে না যে ভদ্রলোকদের যে পাড়ায় সে যাচ্ছে সেখানকার মেয়েদের নিয়ম অনুসারে সকালবেলা গায়ে সে শায়া-ব্লাউজ চড়ায়নি— মৃত বাপের একটা ধুতি দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছে।

পরমেশ্বর দাওয়ায় বসে চা খাচ্ছিল।

কাপ নামিয়ে রেখে সে বলে, মা, সকালবেলাই কালী হয়ে এলে ? এসো, আমার ঘরে এসো। সুরমা, একটা সুজনি বা চাদর এনে দে তো চট করে।

সবিতা বলে, ফিরেই যাই তাহলে। একটা পরামর্শ চাইতে এসেছি—সুজনী এনে দে, চাদর এনে দে ! আপনাদের কাছে পরামর্শ চাইতে আসাই বোকামি হয়েছে আমার।

পরমেশ্বরের মুখের হাসি হঠাৎ মুছে যায়।

হাতজোড় করে সে বলে, মা, আমায় ক্ষমা করো।

ক্ষমা করতে আমি আসিনি।

বলে সবিতা বেরিয়ে যায়।

পরমেশ্বরের মুখ গম্ভীর ! গুম খেয়ে বসে সে যেন কী ভাবছে !

সুরমা ভয়ে ভয়ে বলে, কী হল জ্যাঠামশায় ?

পরমেশ্বর হঠাৎ হেসে ফেলে।

কী হল তাই তো বুঝতে পারছি না। একটা যেন অন্যায় করে ফেললাম মনে হচ্ছে। অন্যায়টা কী করলাম বল দিকি ?

তার হাসি দেখে সকলেই স্বস্তি ফিরে পায়।

ও মেয়েটার কথা বাদ দাও। ও এখন কত রকম কাণ্ড করবে।

পরমেশ্বর বলে, কেন করবে ?

এইভাবে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

পরমেশ্বর ধীরে ধীরে বলে, সত্যি, এ বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার। তোরা যেন সব বুঝে গিয়েছিস। সব যেন ছকে বাঁধা হয়ে আছে তোদের কাছে। কেউ হাসলেও তার মানে বুঝতে বাকি থাকে না। মানুষ যেন তোদেরই নিয়মে হাসে কাঁদে !

তারা নির্বাক হয়ে থাকে।

চা খেয়ে পরমেশ্বর ধীরে ধীরে বস্তির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে।

চটপট ভাইবোনকে খাইয়ে নিজে খেয়ে বেশ বদলে সবিতা মা-র জন্য ওষুধ আনতে বার হচ্ছিল। ভাবছিল পঙ্কজকে জিজ্ঞাসা করে যাবে কোন ওষুধের দোকানে গেলে ডাক্তারকে অবস্থা বলে ওষুধ আনা সুবিধা হবে।

পরমেশ্বর বলে, এইতো দিব্যি মানিয়েছে। ক্ষমা চেয়ে অন্যায় করেছিলাম, ফিরিয়ে নিতে এলাম। তোমার ও বেশে বাইরে যাওয়া সত্যি অন্যায় হয়েছিল।

অতটা খেয়াল করিনি।

সেটা বুঝেছি। খেয়ালও করনি, গ্রাহ্যও করনি ; কিন্তু করতে হবে। দায় ঘাড়ে নিয়েছ, তার মানেই দশজনের সঙ্গে তোমার মানিয়ে চলতে হবে। তোমায় দেখেই যদি লোকে নানাকথা ভাবে, তাতে তোমারই অসুবিধা।

সবিতা চুপ করে থাকে।

পরমেশ্বর হেসে বলে, আমি সহজে কাউকে উপদেশ দিই না, পরামর্শও দিই না। তোমায় দিয়ে ফেললাম। মুশকিলটা কী হয়েছে শুনি ?

সব শুনে বলে, কারও কোনো দায় নিই না, তোমারটা নিলাম। আমার নিয়ম উলটে যাচ্ছে তোমার বেলা। ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছি—পরে দাম দিয়ো। জ্বর দেখেছ ? থার্মোমিটার চেয়ে নিয়ে এসো আমার বাড়ি থেকে। সুরমা জানে কোথায় আছে।

সাত

পাড়ায় দুজন দুরকমের সবচেয়ে বড়োলোক আছে।

সদাশিব সামাজিকভাবে সস্তা, কারণ সে সুবিধা-সুযোগ বাগিয়ে নিয়ে কালোবাজারি ব্যাবসাযে টাকা করেছে। লোকে কী ভাবছে সে গ্রাহ্যও করে না। যার টাকা আছে তাকেই লোকে প্রণাম করে !

বিনোদ যত পারে কমিয়ে নিয়েছে সরকারি হাকিমি চাকরিতে বহাল থাকার সময়কার চাল, এখন পেনশন নিয়ে তার সমাজ জীবনে প্রধান হবার সাধ।

বিনোদ বলে, আপনি বাড়িতে পুজো করবেন ?

মহেশ্বর বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ তো, বেশ তো। পাড়ায় পুজো হবে এ তো সুখেরই কথা। তা, পাড়ার ছোকরাগুলিকে না ডেকে বয়স্ক লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করলে ভালো করতেন।

মহেশ্বর সবিনয়ে জানায়, এ পুজোর ব্যাপারে পরামর্শ করার তো কিছু নেই ! বছরের পর বছর পুজো হয়ে আসছে, কী করতে হবে, কী করতে হবে না, সব ঠিক করাই আছে। ছেলেদেরও সে পরামর্শ করতে ডাকেনি, ওরা নিজেরাই উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এসেছে কাজ করার জন্য, পূজাটা সুসম্পন্ন করার জন্য।

নতুন এসে পড়েছি আপনাদের পাড়ায়, সবাই সাহায্য না করলে, এ ভার নামাতে পারব কেন ?

তার এই বিনয়ে খুশি হয় না বিনোদ। তার কাছে যে আসেনি মহেশ্বর, তার পরামর্শ আর সাহায্য চায়নি পাড়ায় দুর্গাপূজার মতো একটা ব্যাপার করতে নেমে, এ বেআদবির ক্ষমা তার ধাতে আসে না !

মহেশ্বর পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে বিনোদ কথা বলে, সদর উঠানের ফালিটুকুতে দাঁড়িয়ে। মহেশ্বরকে ভেতরে ডেকে বসতেও বলে না।

সে চলে গেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রণব বলে, বাড়িটা বিক্রি করে বিধুবাবু এখন আপশোশ করছেন—পদ্মার কাছে শুনলাম।

আপশোশ কেন ?

নিজে ভালো মালমশলা দিয়ে বাড়িটা করেছিলেন, কেনা বাড়িতে গিয়ে দেখছেন, ওঁচা সস্তা মাল দিয়ে তৈরি।

বিনোদ শুনে পরিতুষ্ট হয়ে বলে, দেমাক হলে এমনিই হয় ! পাড়ায় মানুষ একটু গেঁয়ো তো বটেই কিন্তু আমরাও তো আছি এ পাড়ায় ! একটু গা বাঁচিয়ে চললেই হত। উনি একেবারে বাড়ি বেচে পাড়া ছেড়ে পালালেন ! আমরা থাকতে পারি, উনি থাকতে পারেন না !

কী ভেবে বলা যায় না, হঠাৎ একদিন বিকালের দিকে বিনোদের বাড়ির মেয়েরা বেড়াতে আসে মহেশ্বরের বাড়িতে।

প্রণবের মা বলে সুভাগিনীকে, আপনি এত ভারী ভারী গয়না গায়ে রাখেন কী করে !

সুভাগিনী হেসে বলে, এবার তো তবু অনেক কম ওজন। আগের দিনের দু-একখানা গয়না যা আছে গায়ে রাখা যায় না। এই অনন্ত জোড়া করেছিল আমার শাশুড়ির শাশুড়ি।

প্রণবের বোন সন্ধ্যা বলে, আপনারা কি আর দেশে যাবেন না ?

কী আছে দেশে, কোথায় যাব ?

আপনাদের বাড়িতে একটি মেয়ে কে গান শেখে—

সুভাগিনী অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এককথা থেকে আচমকা আরেক কথাতে যাওয়া শুধু নয়, এতদিনের প্রতিবেশীর বাড়িতে কোন মেয়েটি গান শেখে সে প্রশ্ন এ জিজ্ঞাসা করছে তাকে !

এ খবরটাও রাখে না প্রতিবেশীর বাড়ির ?

সবিতা উপস্থিত ছিল। বস্তির ঘরে উঠে গেলেও সে এদের উপকারও ভুলে যায়নি, সম্পর্কও তুলে দেয়নি। গান শিখতে গলা সাধতেও তাকে আসতে হয়।

সে বলে, গান শিখি আমি !

কত মাইনে ওস্তাদের ?

এমনিই শেখান।

সত্যি ? আমিও শিখব তো !

অঘোরের বউ ডুমুরের সঙ্গে আগেই সবিতার ভাব হয়েছিল—তাদের বাড়িতে উঠে আসার আগে।

ডুমুর মাঝে মাঝে দুধ দিতে আসত।

গোরু আছে, দুধ তারা নিজেরা এককোঁটাও খায় না। দুধ বেচে সংসার চলে।

অঘোর খরচ দেয়। তাতে তার নিজের খাওয়া-খরচটা কুলিয়ে গিয়ে হয়তো বা ডুমুরের জন্য সামান্য কিছু বাড়তি থাকে।

সংসার চলে না।

দুধ বেচে ঘুঁটে বেচে আর মায়ে-বেটিতে তিন বাড়ি ঠিকে কাজ করে কোনোমতে তারা দিনপাত করে।

নলিনী আর সবিতা দুজনেই খুব ভাব জমিয়ে ফেলেছিল ডুমুরের সঙ্গে।

নলিনী তার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

কতভাবে কত রকম প্রশ্নই যে সে করত ডুমুরকে ! বলত, তুমি এই বয়সে লোকের বাড়ি কাজ কর, স্বামী আপত্তি করে না ?

করুক না আপত্তি। তবে তো বাঁচাই যেত। যা রোজগার করি দিতে হবে তো আপত্তি করলে,—নিজে খেতে পরতে দেবে না, আপত্তি করবে কোন মুখে ?

তোমাদের ঝগড়া হয় না ?

মাগ-ভাতারে ঝগড়া হবে না ?

সে ঝগড়া নয়—খারাপ ঝগড়া। সত্যি সত্যি যাতে রাগারাগি হয়ে যায়।

তাও হয় দু-একবার। নিজেই মিটিয়ে নেয়।

কেন ?

ডুমুর হেসে ফেলত।

নিজের দোষ তো বোঝে দিদিমণি ? হেথা রইবে, বদ খেয়ালে পয়সা উড়োবে, বউকে পুষবে না—ঝগড়া করে শক্ত রইবে কীসের জোরে ?

দোষ বোঝে ?

বুঝবে না ? সবাই বউকে পোষে, ও পুষছে না। এটা বুঝবে না পুরুষ মানুষ ? আমরা খেদিয়ে দিতে পারি অনায়াসে—দিই না সে তো আমাদের দয়া।

ডুমুর মুচকে হাসত, বলে, দয়া মানে আর কী, টান তো পড়েছে একটা। ফেলবার তো মানুষ নয়। বাড়াবাড়ি করে না, সামলে-সুমলে চলে—কী আর করা যায়, আছে থাক। চলে গেলেও তো জ্বালা !

নলিনী গম্ভীর হয়ে বলত, তা নয়। উপায় নেই তাই তাড়াতে পার না। স্বামী ছাড়া তো গতি নেই আর—

ডুমুর আবার মুচকে হাসত।

সে আপনাদের নেই দিদিমণি। মোদের কতটুকু আসে যায় ? মানুষটাকে দূর করে দিয়ে যদি আরেকজনের সাথে থাকি, লোকে একটু উঁ আঁ করবে—বাস্। যেমন আছি তার চেয়ে ঢের ভালোই থাকব !

ক-দিন থাকবে ?

ডুমুর চুপ করে থাকত।

ছেলেপিলের কী হবে ?

এবারও ডুমুর চুপ করে থাকত। সে বেশ একটু ভড়কে গিয়েছে বোঝা যেত।

নলিনী বলত, না তোমার হিসেব ঠিক নয়। স্বামীকে নিয়ে থাকার অনেক সুবিধা, নইলে তুমি অনেক আগেই খেদিয়ে দিতে মানুষটাকে। বাড়াবাড়ি করে না, তোমার দিকটাও হিসেব করে চলে, তাই অবশ্য বরদাস্ত করে চলেছ।

তারপর নলিনী হঠাৎ কথা পালটে বলত, দুধে এত জল দাও কেন ? আমার দুটো বাচ্চা তোমাদের দুধ খাচ্ছে মনে রেখো !

নলিনী আধসের দুধ রাখে, সে তাকে বসিয়ে রেখে জেরা করে আলাপ চালাতে পারে।

সবিতারা দুধ রাখে না।

কাজেই সবিতা তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসত।

বলত, ভাইটার জন্য এক পো দুধ রাখব ভাবি, তা রাখব কী দিয়ে। তুমি তো ভাই দিব্যি নিজে রোজগার করে খাও, কাউকে কেয়ার কর না। আমার হয়েছে মুশকিল।

বিয়েই হল না, মুশকিল কীসের গো ?

বিয়ে হলে তবু একটা লোক সম্বল থাকত ! আমার যে কেউ নেই।

বিয়ে বসো না তাড়াতাড়ি ?

কে করছে বিয়ে ?

পঙ্কজবাবু— ?

সবিতা ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করতে করতে তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পুকুর ঘুরে বস্তিতে চলে যেত।

বদনাম রটেছে তার আর পঙ্কজের নাম জড়িয়ে ? কিন্তু কেন ? কী জন্য তাদের এমন কলঙ্ক রটল যা গিয়ে বস্তিতে পর্যন্ত পৌঁচেছে ? অথবা শুধু বস্তিতেই গিয়ে পৌঁচেছে ?

ডুমুর বলত. হবে না বিয়ে ? ওই দিদিমণি বললে কিনা, তাই বলছি।

কে বললে ?

ওই তোমাদের ও ঘরের প্রতিমা দিদিমণি। বললে যে পঙ্কজবাবু ওস্তাদ রেখে গান-টান শিখিয়ে নিচ্ছেন বিয়ে করার জন্য !

ডুমুর হেসে ফেলেছিল।

বাবা, বিয়ের আগে বউকে তৈরি করা !

প্রতিমা এমন কথা বলেছে ডুমুরকে ? সাধনের চেষ্টায় তার বন্ধু অসীম তাকে গান শেখায় জেনেও ? ব্যাপারটা এমন রহস্যময় মনে হয়েছিল সবিতার !

এক বাড়িতে এখন দুজনের গলায় গলায় ভাব। যখন তখন তাদের ঘরে গিয়ে বসে সবিতা।

অঘোর কাজে যাবার আয়োজন করতে করতে আড়চোখে তাকায়।

ডুমুর মুচকে হেসে বলে, সুবিধে হবে না। সে চিজ্ নয়। দু-পাঁচহাজার দিয়ে লোকে চেষ্টা করেছে পারেনি।

পিঁড়ি পেতে সবিতাকে বসতে দেয়।

পুকুরে ডুব দিয়ে এসে অঘোর মাথা আঁচড়াচ্ছিল, ভাতের থালার সামনে পিঁড়িটাতে উবু হয়ে বসে সযত্নে সস্নেহে ভাত ভাঙতে ভাঙতে সে বলে, পারবে কী করে ? মানুষ কি পয়সায় বিকোয় ?

সবিতা বলে, বিকোয় না ? মানুষ পয়সায় বিকোয় বলেই তো আমাদের এই দুর্দশা। ব্যাপারটা বুঝিনে ভালো। গরিব মানুষ আছে, পয়সাওলা মানুষ আছে। তাই ধাঁধায় পড়ে গেছি। চারটে পা না থেকে হাত-পা থাকলে মানুষ হয় এটা বুঝেছি, কিন্তু পয়সা থাকলে কী করে মানুষ হয়, সেটা মাথায় ঢোকে না।

ডুমুর বলে, এই নিয়ে কত বড়ো বড়ো মাথা খাটছে, কত মাথা দিনরাত শুধু ঘামছে। মাথায় ঢোকে কি ঢোকে না তা নিয়ে আব মাথা ঘামিয়ো না ?

সবিতা বলে, কেন ?

ডুমুর বলে, মাথা যাবা ঘামায় তারা মাথা ঘামিয়ে পয়সা কামানোর চেয়ে ওটা একটু উঁচুতে রাখতে চায়—মাথা ঘামিয়ে পয়সা কামানো বড্ড সম্মানের ব্যাপার, বড্ড উঁচুদরের ব্যাপার !

পূজা প্রায় এসে গেছে।

অভাব সব কিছুরই। পূজার আগে জামাকাপড়েব অভাবটা আরও বীভৎস লাগছে মানুষের।

কিন্তু এ এলাকার সকলে আশ্চর্য হয়ে যায় এই জন্য যে জামাকাপড়ের অভাবের প্রতিবাদে মিটিং করার তাগিদটা সব চেয়ে বেশি দেখা যায় সদাশিবের !

তিনতলা বাড়ির মালিক পয়সাওয়ালা সদাশিবের।

এবং তাগিদটা যেন হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে !

নিজের বাড়িতে সে একটা বৈঠক ডাকে মিটিং করা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। পাড়ার কয়েকজনকে ডাকে—বস্তির জিতু অঘোর মাখনকেও ডাকে !

একটা প্রতিবাদ সভা ডাকার ভূমিকা হিসাবে যে এমন জমকালো বৈঠকের দরকার হয় এটা কারও জানা ছিল না এতকাল। সকলেই আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে ব্যাপাব কী ?

অল্পবিস্তর অস্বস্তি বোধ করে।

কে জানে সদাশিবেব আসল মতলবটা কী !

সদাশিব বলে, দেখুন, এমনি না হয় সারাবছর ন্যাংটো হয়ে কাটানো যায়, পুজোর সময় নতুন জামাকাপড় ছাড়া কি বাঙালিব চলে ? আমাদের এদিকে কম দামে দেবার কোনো ব্যবস্থাই হয় না। চুপচাপ থাকলে কিছুই হবে না। একটা খুব জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

জিতু নানা আন্দোলনে জড়িত থাকে। কিছুদিন জেলও খেটেছে।

জিতু বলে, শুধু জামাকাপড়ের জন্য আন্দোলন ?

জামাকাপড়টাই হোক না !

ভাতের আন্দোলনটা যোগ করুন ওর সঙ্গে ? ভাত-কাপড়ের আন্দোলন হোক।

আহা, জামাকাপড়টাই হোক না পূজার সময় !

কিন্তু সদাশিবের চেষ্টা সফল হয় না। শুধু জামাকাপড়ের জন্য মিটিং ডাকাব আলোচনা পরিণত হয় সব রকম জরুরি জিনিসের দাবি নিয়ে মিটিং করা হবে কি না তারই বিতর্কে। বৈঠকে উঠে পড়ে দেশের মানুষের খাদ্যবস্ত্র বেকাবি থেকে শুরু করে আরও অনেক সমস্যা।

দক্ষিণে ভরা ডোবাটার দিকে চওড়া বারান্দা, যেখানে বসেছে এতগুলি ভিন্ন স্তরের ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। আর কিছু না হোক, শুধু এই সমাবেশটাই খুশি রেখেছে পঙ্কজকে।

সদাশিব চা আর শিঙাড়া আনায়। প্রচুর পরিমাণে !

সবিনয়ে জানায়, এত বেলা হয়ে যাবে বোঝা যায়নি, দেরি হয়ে গেছে। চা আর শিঙাড়া দিয়ে একঘণ্টা চালিয়ে দিন। ঘরে ভাজা জিনিস।

মাখন বলে, আবার খেতে হবে নাকি এখানে ? লুচি খেলাম, কচুরি খেলাম—

সদাশিবের মুখ লাল হয়ে যায়, তার কথা বলার ভঙ্গি আর তার ইঙ্গিতে।

শশধর বলে, এটা তুমি অন্যায় বললে মাখন। নিজেকেই ছোটো করলে। সদাশিববাবু কী বড়োমানুষি চাল দেখাচ্ছেন ? উনি বড়োলোক মানুষ, পয়সা আছে, এ তো আর মিছে নয় ! ওঁর ঘরে এয়েছি, ওঁর যেমন অবস্থা সেইমতো আদরযত্ন করতেই হবে। মুড়িমুড়কি খেতে দিলে ভালো হত ?

অঘোরও তার পক্ষ নিয়ে বলে, শুধু পয়সাটা দ্যাখো না মাখন, মানুষের মনটাও দ্যাখো।

মাখন হাতজোড় করে বলে, এই ঘাট মানলাম। অত ভেবে বলিনি কথাটা।

কিন্তু আসল কথার কী হবে ? আরও কী আলোচনা হবে একটা জনসভা ডাকা নিয়ে ?

সদাশিব বলে, তুমি কী বল পঙ্কজ ?

পাড়ায় এবং ইতিমধ্যে এ বৈঠকে প্রতিষ্ঠা অর্জন না করে থাকলে শেষকথা বলার জন্য তাকে মধ্যস্থ মানার ফলে প্রণব অন্তত খুব চটে যেত। কিন্তু পরিষ্কার টের পাওয়া গেছে যে হালকা আলগা কথা পঙ্কজ বলে না। সকলে তার কথা শোনার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে।

নতমুখে পঙ্কজ খানিকক্ষণ ভাবে।

কী বলব বলুন ? মনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারব ভরসা নেই। শুধু কথায় বোঝানো যায় না।

পরে কাজে বুঝিয়ে দেবেন। আজ কথায় যতটা পারেন বলুন। কথাটা বলে প্রণব।

আজ কথায়, কাল কাজে ? তাই তো বলছি, ওইখানে আমার মুশকিল। এটা সে জিনিস নয়, কথায় কাজে ফারাক রেখে বোঝানো যায়। যাকগে, আমি বলি কী, খাদ্য আর বস্ত্র দুটো দাবি নিয়ে মিটিং হোক।—

প্রণব সশব্দে হেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নেয়।

পঙ্কজের কোনো ভাবান্তর দেখা যায় না।

সেই মিটিংয়ে ওই তারিখে আপনারা সবাই বলুন। পূজার সময়টা অন্তত ভাতকাপড়ের রেশন বাড়িয়ে সস্তায় কাপড়জামা দেওয়া' হোক।

জিতু বলে, আমিও তাই বলি।

একটু থেমে সে যোগ দেয়, আরও সোজাসুজি বলি, নিজের নিজের মন না হাতড়ে মিটিংয়ে যারা শুনতে আসবে তাদের দিকে তাকান, তাদের কথা ভাবুন,—যার যা বলার আছে ওদের ভাষায় বলুন।

ক্ষণিকের জন্য আবার সে থামে। চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে।

পঙ্কজ বলে, অ্যাদ্দিন চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসত নতুন জগতের নতুন ভাব, শিখে পড়ে দু-চারজনে ভাবুক হতাম। অন্যরকম মানুষ হতাম দেশের মানুষের চেয়ে। উপর থেকে উপদেশ আর হুকুম দিতাম এদিক চলো ওদিক চলো। এবার তো আর তা চলবে না। নতুন ভাবের বন্যা এনে দেশ ভাসাতে হবে, মুখ্যু অমানুষগুলোকে ভাবুক করে ভাবাতে হবে। নিজেরা ক-জন ভাবলে চলবে না।

অমানুষ পঙ্কজ ? আমার দেশের মানুষ মুখ্যু বটে, কিন্তু অমানুষ ? সদাশিব যেন গভীর বেদনার সঙ্গে বলে !

আহা, অমানুষ মানে কি শুধু বজ্জাত ? পশুর মতো যাদের জীবন তারা অমানুষ বইকী?

জিতু ক্ষোভের সঙ্গে বলে।

চারিদিকে সকলের মুখের দিকে একনজর তাকিয়ে জোরের সঙ্গে বলে যায় এও আমাদের আরেকটা দোষ। দেশের মানুষ বলতে গদগদ হয়ে উঠি, তারা যা নয় তাই বানিয়ে বলি। কতকাল ধরে পাঁকে গড়াচ্ছে, খেতে পায় না, নেংটি পরে—

জিতু আচমকা থেমে যায়।

কিছু মনে করবেন না। বড়ো রাগ হয় আমার। নিজের দেশের মানুষ চিনি না, তাদের উদ্ধার করব। একী ছেলেখেলা ? হয় তাদের বাড়িয়ে ভাবব, নয় গোরুছাগল বলে ধরে নেব। তারা ঠিক যেমন তেমনটি ভাবব না কিছুতেই।

নালিশ করল না উপদেশ দিল জিতু ? এমনভাবে জোরের সঙ্গে সে কথা বলে গেল যেন দেশের অগণিত জনগণ তাকে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল সদাশিবের বাড়িতে এই তুচ্ছ বৈঠকে।

সকলের মনকেই সে নাড়া দিয়েছে, যদিও প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিভিন্ন। মনের কথাটা তার সত্যিই পরিষ্কার ধরতে পারেনি একজনও, একমাত্র পঙ্কজ ছাড়া। জিতু যা বলেছে সেটা পঙ্কজকে সমর্থন করার জন্যই। পঙ্কজ আর জিতুর এই মানসিক সমতার ভাবটা খেয়াল হয়েছে অনেকের। অন্যভাবে বললেও তার কথা সকলে ঠিক ধরতে পারবে না সেটা জেনেই যেন পঙ্কজ আগে থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে বুঝিয়ে বলতে পারবে এ ভরসা তার নেই !

তার মানে যেন এই যে দেশের মানুষকে আরও ভালোভাবে আরও সঠিকভাবে না জানলে আমার কথা বুঝবার সাধ্য তোমাদের হবে না— যতই তোমরা বিদ্বান হও, চিন্তাশীল হও, যতই তোমাদের অভিজ্ঞতা থাক সংসারের।

পঙ্কজের নয় এ কথা বলা সাজে। সে নিজে বিদ্বান এবং চিন্তাশীল—সংসারের অভিজ্ঞতা যতই তার কম থাক।

তার বলার বিনীত ভঙ্গিটাই সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ যে, কেউ বুঝুক না বুঝুক মনের কথা বলার অধিকার তার আছে।

সে যাই বলুক যেন গায়ে লাগে না।

কিন্তু সামান্য লেখাপড়া-জানা জিতু কোন সাহসে কথাটা এমন সহজ সাদা স্পষ্ট ভাষায় বলে ? সদাশিবের দাওয়ায় বসে পাড়ার এতগুলি গণ্যমান্য ভদ্রলোকের সামনে ?

সে কি জানে না যে এই বৈঠকে সদাশিব তাকে শুধু এই জন্য ডেকেছে যে সভায় সাধারণ মানুষের ভিড় জমানোর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা তার আছে ?

জনতা খানিকটা না জমলে কর্তারা সভাকে মর্যাদা দেয় না ?

অনেক ভেবেচিন্তে পাড়ার মান্যগণ্য ভদ্রলোকের এই বৈঠকে সদাশিব তাকে ডেকেছে।

এ সম্মান পেয়েও তার এমন স্পর্ধা !

কিন্তু অন্যেরা অনেকে ভাবে এটা যে স্পর্ধা বস্তিবাসী মানুষটার তাই বা কী করে বলা যায় ? সে তো বাহাদুরি করার কোনো চেষ্টাই করেনি। তার আন্তরিকতায় ফাঁকি ছিল না।

সামনের পথ দিয়ে পরমেশ্বরকে যেতে দেখে বৈঠকের কয়েকজন সমস্বরে তাকে আহ্বান জানায়।

আসুন আসুন ঈশ্বরবাবু। আপনার মতটা বলুন।

আমার কোনো মত নেই। মতামতের ধার ধারি না। বৈঠকটা কীসের ?

সদাশিববাবু জামাকাপড় সস্তায় পাবার জন্য একটা মিটিং ডাকতে বলছেন। আপনার মত কী ঈশ্বরবাবু ?

ঈশ্বরকে বাবু বলে ডাকলেই কি তার মতামত তৈরি হয়ে যায় ? ঈশ্বরের মতও নেই, অমতও নেই। ঈশ্বরবাবু মতামত কোথায় পাবেন ? তা আপনাদের—

সদাশিব বলে, পুজোর সময় মানুষের জামাকাপড়ের দরকারটাই বেশি হয়, না কি বলেন ঈশ্বরবাবু ? জামাকাপড় সস্তায় না পেলে দেশের লোকের পুজোটাই মাটি হয়ে যাবে।

জিতু বলে, আমরা মানে আমি আর পঙ্কজবাবু বলছিলাম, পেটটা ভরা না থাকলে শুধু সস্তা জামাকাপড় পেলেই কি পূজার আমোদ জমবে ? চীন থেকে চাল এনে পেট ভরাবার ব্যবস্থা হোক। ওরা সস্তায় চাল দিতে চায়। আগে পেটে খাই তবে তো ভালো জামাকাপড় পরে পূজাব আমোদ করা যাবে।

সদাশিব চটে বলে, ভালো জামাকাপড় মানে ? ভালো দামি জামাকাপড়ের কথা কে বলছে ? দেশের মায়েরা লজ্জা নিবারণ করতে পারছেন না খবর রাখ না তুমি ? না খেয়ে তো মানুষ বাঁচেই না। সেটা আর নতুন কথা কী ! কিন্তু মেয়েরা-মায়েবা কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ হয়ে থাকবেন সে দৃশ্য দেখার চেয়ে আমাদের না খেয়ে মরাই ভালো।

পরমেশ্বর মৃদু হাসে।

জোটাতে পারেননি বুঝি সদাশিববাবু ? ফসকে গেছে ? তাই চাপ দিয়ে আদায়ের চেষ্টা করছেন ?

সবাই থ বনে থাকে। সদাশিবের মুখের ভাব অবর্ণনীয।

একটু সামলে সে বলে, অন্তত এ এলাকাতেও ছিটকাপড় দেবার ব্যবস্থা যদি করতে পারি, ক্ষতি আছে কিছু ?

তাই বলছি। ব্যবস্থা করার লাইসেন্সটা আপনাকেই দিতে হবে।

বৈঠক শেষ হয়।

অনিশ্চয়তার মধ্যেও কিন্তু সদাশিবের উৎসাহ কিছুমাত্র কম দেখা যায় না। নিজে সে পয়সা খরচ করে সভার জন্য হ্যান্ডবিল আর পোস্টার ছাপায়।

সভা কিন্তু হয় না—স্থগিত হয়ে যায়। কারণ, তাব আগেই সদাশিব যা চাইছিল পেয়ে যায়, সোজাসুজি নিজে না হলেও ভাগনের মারফতে।

আট

পুজোয় সমারোহ করে মহেশ্বর।

পাড়ার লোক খুশি হয়। এ বছর আরও প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠভাবে পুজোর আনন্দ উপভোগ করে।

দশ-বারোবছর আগে কাছাকাছি পুজো হত শুধু সরকারদের বাড়ি আর সাহাদের বাড়ি। তারপর আশেপাশে একে একে আরও কয়টি পুজো বেড়েছে।

কারও ব্যক্তিগত পুজো নয়—সার্বজনীন।

কিন্তু ঠিক এই পাড়াতে—বস্তি, ফাঁকা জমি আর ডোবাটা এবং মোটামুটি ত্রিশ-বত্রিশখানা ছোটোবড়ো বাড়ি নিয়ে পঙ্কজদের এই ছোটো পাড়াতে—আজ পর্যন্ত পুজো হয়নি।

পাড়ার প্রায় কেন্দ্রীয় স্থানে বিধুভূষণের বাড়িতে পুজো হওয়ায় পাড়াটা এবার সরগরম হয়ে উঠল।

ছোটো ছেলেমেয়েদের সীমা রইল না আনন্দের।

মনে হল পুজো বুঝি তাদেরই, বিধুভূষণ শুধু পূজাটা সম্পন্ন করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে।

কিন্তু শুধুই কি আনন্দ ?

কয়েকটা বুকে জ্বলেছে ঈর্ষারও আগুন !

কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে—এসেই পাড়ায় আরম্ভ করবে দুর্গাপূজা !

পাড়ায় কি আর মানুষ ছিল না ?

বিনোদ বলে, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকাব মনে করল না ? নিজের বাড়িতে পুজো করবে তাতে কী হয়েছে ? ব্যাটা জানে না যে ইচ্ছা করলে আমি ওর বাড়িতে হামলা করাতে পারি, প্রতিমা বিসর্জন ঠেকিয়ে দিতে পারি—

প্রণব বাপের জন্য বস্তি থেকে সামনে দোয়ানো দুধ এনে দিয়ে খোলা ছাদে ডন বৈঠক সেরে ভিজানো ছোলা চিবোতে চিবোতে নীচে নেমে এসে বাপের মন্তব্য শুনে চটে যায়।

বলে, কী সেকেলে হাকিমি চাল চালছেন আপনি ? একজন নিজের বাড়িতে পুজো করবে, তাও আপনি ঠেকাতে পারেন এখন ?

বিনোদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, চা আর পুষ্টিকর বিদেশি বিশেষ দুগ্ধ জাতীয় খাদ্যের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি করা পানীয় চুমুক দিয়ে বলে, পারতাম। তোমার মতো সন্তান না হলে পারতাম।

আমায় তাড়িয়ে দিন।

বিনোদ চা প্লাস ফুডের ঈষদুষ্ণ পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে বলে, পারলে দিতাম। পারলে দিতাম রে হারামজাদা, পারলে দিতাম।

তেতলা বাড়ির সদাশিব বলে, এ যে পাড়াতে ঢুকেই সকলের উপর টেক্কা দিতে চায় !

প্রৌঢ় রমেশ বলে, টেক্কা কী মশায় ?

পূজা করবে—এত বাহাদুরি কেন ?

বাহাদুরি ? এটা ওঁদের সাতপুরুষের পূজা।

রবীন্দ্র সরকার বলে, সেদিন দুঃখ করছিলেন ভদ্রলোক, দেশে স্থায়ী পাকা দালানে এসে মা পূজা নিতেন—মাকেও এবার ঠাঁই নাড়া হতে হল।

পঙ্কজ বলে, খেতে না পেলেও এ পুজো ওঁকে চালিয়ে যেতে হবে।

সদাশিব চুপ করে থাকে।

কিন্তু গায়ের জ্বালা তার কমে না। একজনের সাতপুরুষের পূজা আছে—এটাও তার কাছে গায়ের জ্বালার একটা মস্ত কারণ। তার কোনো পুরুষেই কিছু ছিল না গর্ব করার মতো, না টাকাপয়সা, না বংশগৌরব, নিজের চেষ্টায় সে তিনতলা বাড়ি তুলেছে, চোরাবাজারের কৃপায় দুর্গাপূজাও যে বাড়িতে একটা লাগিয়ে দিতে না পারে এমন নয়, কিন্তু নিজের চেষ্টায় উন্নতি করে সে জন্য গর্ববোধ করতে গেলেই তাকে যেন ঠোক্কর খেতে হয়।

লোকে যেন কিছুতেই এটাকে তার বাহাদুরি মনে করতে রাজি নয়—দু-চারজন অনুগত ব্যক্তি ছাড়া।

তারাও মুখে যাই বলুক মনে মনে কী ভাবে কে জানে !

বিপিন আরও বাড়িয়ে দেয় সদাশিবের গায়ের জ্বালা।

সে মন্তব্য করে, প্রশংসাই করতে হয় ভদ্রলোকের। দেশ ঘর ছেড়ে এসেও এ অবস্থায় ভদ্রলোক তবু পুজোটা করছেন। কালো পয়সার পাহাড় জমিয়েও অনেকে আনন্দ উৎসবে দুটো পয়সা খরচ করতে নারাজ !

বিপিন ছমাস সদাশিবের একতলার ভাড়াটে ছিল। যত ভাড়া হওয়া উচিত তার তিনগুণ ভাড়ায়।

এমনিতে এত বেশি নিরীহ অমায়িক মানুষ বিপিন যে সদাশিব ধারণাও করতে পারেনি সে আবার দরকার পড়লে অমন ভয়ানক গোঁয়ারও হয়ে উঠতে পারে !

তাহলে হয়তো সে জল নিয়ে প্যাসেজ নিয়ে এটা-ওটা খুঁটিনাটি ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাকে খ্যাপাতে যেত না।

যতটা তার সয় সেইখানেই সীমা রাখত।

দুমাসের মধ্যে বাড়িওলা আর ভাড়াটের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শত্রুতায় ! শুধু কলহ বিবাদের শত্রুতা নয়, একেবারে যতদূর সম্ভব পরস্পরের ক্ষতিসাধন করার শত্রুতা।

সদাশিব বিশেষ কিছু করতে পারেনি বিপিনের। বিপিন নালিশ করে ভাড়া কমিয়ে নিয়েছিল তিনভাগের একভাগ। পুরো দুটি বছর সদাশিবেব বাড়িতে জেঁকে বসে থেকে ধীরে ধীরে নিজেব ছোটোখাটো বাড়িটি তুলেছিল।

তারপর রেহাই দিয়েছিল সদাশিবকে।

সদাশিবের রাগ আজও কমেনি।

মহেশ্বর বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে বলে আসে। পাড়ার যুবকদের কাছে আবেদন জানায় তার পূজা সুসম্পন্ন করতে তাকে সাহায্য করতে।

বলে, এটা তোমাদেরই পূজা। আমি নিমিত্তমাত্র।

পঙ্কজ বলে, আপনাকে বলতে হবে কেন বিধুবাবু ? আমরা সব ঠিক কবে দেব।

পরমেশ্বর বলে, সাতপুরুষের পুজো কিন্তু, বেদখল কবে ফেলো না।

মহেশ্বর বলে, তুমি পরিহাস করছ দাদা !

পরমেশ্বব বলে, তুমি তো জানো আমি সব বিষয়েই পরিহাস করি ? তোমার মা কি হাসি ভালোবাসেন না ?

মা কি শুধু আমার ?

তবে বিষণ্ণ হচ্ছ কেন ? মাকে তুমি নিজের করে রাখতে পার—কাবও আপত্তি নেই। কোনো দোষও নেই। তোমার অধিকাব তুমি খাটাবে, কাব কী বলাব আছে ? কিন্তু অন্যের অধিকারও মানবে তো তুমি !

সমীর আর পদ্মা পুজোর আগে এ পাড়ায় বেড়াতে আসে।

পাডার লোকেব সঙ্গে খাপ খায়নি বলে পাড়ার লোক মিশুক নয বলে তাবা উঠে গিয়েছে শহরের আরও জমজমাট অংশে কিন্তু এ পাড়ার জন্য মন কেমন করার হাত থেকে তারা রেহাই পায়নি।

মেলামেশা ঠিকই হত—তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

পদ্মা বলে, কেমন আছেন ?

সাধন শুধু মাথা হেলায়। অর্থাৎ সে ভালোই আছে।

আপনি নাকি কবিতা লেখেন ?

ভড়কে গিয়ে এবার মুখ খুলতে হয় সাধনকে।

কবিতা ? কে বললে ?

এমনই জিজ্ঞেস করছিলাম—লেখেন কি না। এত চুপচাপ থাকেন আপনি যে মনে হয়েছিল কবিতাই বোধ হয় ভাবেন সবসময়।

সাধন একটু হাসে।

পদ্মা একটু ভাবে।

তারপর বলে, আসুন, নিরিবিলি বসে আপনার সঙ্গেই আজ একটু গল্প করি।

মতলবটা তার ছিল সাধনের নীরবতা ভঙ্গ করে তাকে দিয়ে কথা বলাবার। ভেবেছিল খুবই বুঝি কঠিন হবে কাজটা বেছে বেছে এমন সব কথা বলতে হবে প্রশ্ন করতে হবে যাতে মুখ খুলে কথার জবাব না দিয়ে সাধনের উপায় না থাকে, একটু হেসে বা একটু মাথা হেলিয়েই কাজ না চালিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু দেখা যায় চেষ্টা বিশেষ তার করতে হয় না, দরকার হলে কথা বলতে মোটেই আটকায় না সাধনের !

পদ্মা বলে, চাদ্দিকে পূজার সমারোহ শুরু হয়েছে। দেশের এই অবস্থায় পূজায় হইচই করা কি উচিত ?

সাধন বলে, আপনি আমি অনেকক্ষণ তর্ক করে নয় ঠিক করব এটা উচিত কী অনুচিত। তাতে কী আসবে যাবে ? লোকে ও সব উচিত-অনুচিত ভাববে না। যতটা পারে পুজোর সময় আনন্দ কববে।

সে চেতনা এখনও আসেনি লোকের ?

কোন চেতনা ?

দেশের লোকের ভাত নেই, কাপড় নেই, অনাচার অত্যাচারের সীমা নেই—এ অবস্থায় পুজোর আনন্দে মাতা উচিত নয় ?

যাদের নেই তাবাই তো মাতছে ? নতুন কাপড় না পরুক, একটা গামছা কিনবে। তাও না পাবে ছেঁড়াকাপড় পরে ঘুরে ঘুরে অন্তত ক-দিন প্রতিমা দেখে বেড়াবে।

পুজো পয়সাওয়ালা লোকেরা করে, ওরা করে না। আমি পয়সাওয়ালা লোকের কথা বলছি।

একটু থেমে পদ্মা বলে, আপনার বাবার সমালোচনা করছি ভাববেন না কিন্তু, সাধারণভাবে সকলের কথাই বলছি।

পুজোটা সকলেই চায়। একজন পয়সাওয়ালা না পারে, দশজনে চাঁদা তুলে করে। এর মধ্যে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন টানা যায় না। একটা আন্দোলন যদি করতে চান সে আলাদা কথা—কিন্তু লোকে আপনার আন্দোলন ওভাবে নেবে না। না খেয়ে লোক মরছে, এবার পুজো বন্ধ থাক, কিংবা এবার আমোদ-প্রমোদ বাদ দিয়ে সাদামাটা পুজো হোক—এ কথা বললে লোকে ধরে নেবে না খেয়ে মরার বিরুদ্ধে আপনি আন্দোলন করছেন। না খেয়ে মরার সঙ্গে পূজার আনন্দের কোনো সম্পর্ক নেই। লোকে না খেয়ে মরছে সেটা অন্যায়, এ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য দরকার হলে জেল খাটতে পারি, প্রাণ দিতে পারি—পূজার ফূর্তি বাদ দিতে যাব কেন ? আনন্দ বাদ দিয়ে সবাই মিলে মুখ গোমড়া করে থাকলেই কি দেশের সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে ? আপনি কথাটা বলছেন ঘরোয়া হিসাব থেকে। বাড়িতে একজনের কঠিন অসুখ হলে হাসাহাসি বন্ধ থাকে। কিন্তু পরিবার আর সমাজে অনেক তফাত। পরিবার প্রথা না থাকলেও সমাজ থাকতে বাধা নেই—বাধা নেই কেন, সমাজ থাকবেই।

পদ্মা গালে হাত দিয়ে বলে, আপনি নাকি কথাই বলেন না, চুপ করে থাকেন ! এই নাকি তার নমুনা ?

সাধন হেসে বলে, আপনি বলালেন—

বুঝেছি, বাজে কথা বলেন না। বাক্‌সংযমী মানুষ !

সাধন মৃদু একটু হাসে। বোঝা যায় সে আবার চুপ হয়ে গেছে।

পদ্মা বলে, আজ থেকে আমরা বন্ধু, কেমন ?

সাধন মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

মুখেও বলে, বেশ তো !

কেবল লক্ষ্মীর নয়। তার মতো যারা নিয়মনীতির ধরাবাঁধা পথে বাঁচতে চায়, বড়ো হবার আর বড়ো কিছু করার ইচ্ছাটাকে স্বপ্ন করে রেখে খানিকটা সুখ-সুবিধা আরাম-বিলাস নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারাই যথেষ্ট মনে করে, চেনাজানা এ রকম সমস্ত মানুষের সঙ্গ ক্রমে ক্রমে যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে পদ্মার।

আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত।

সে অনুভব করে, এরা শুধু নিজের কথা ভাবে, নিজের আরাম-বিলাসের চিন্তাতেই এরা ব্যাকুল।

সুরঞ্জন যে তাকে চায় এই চাওয়াটাই আসল কথা প্রধান কথা নয় সুরঞ্জনের কাছে। তার প্ল্যান করা জীবনের একটা অঙ্গ হিসাবে পদ্মাকে তার প্রয়োজন, তাই তাকে পাওযার জন্য তার এত আগ্রহ।

চাকরিটা যেমন প্রয়োজন ছিল সে ও তেমনই আরেকটা প্রয়োজন—হয়তো তুলনায় ছোটো প্রয়োজন।

নিজেকে একা মনে হয় পদ্মার। ধরাবাঁধা নিয়মে যন্ত্রের মতো তার সঙ্গে মিলুক মিশুক, বন্ধুত্ব করুক, স্নেহ আর দরদ দেখাক, প্রেম দিয়ে জয় করতে চাক, সবাই যেন আসলে নিজেকে নিযে বিব্রত, নিজের চিন্তা নিয়েই মশগুল।

সত্যিকারের আপন মানুষ তার কেউ নেই। এই চিন্তা এই অনুভূতি জোবালো হওয়াব সঙ্গে ক্ষোভ আর বিতৃষ্ণা দিন দিন বেড়ে চলেছে পদ্মার।

পরমেশ্বরের উপরেই তার গায়ের জ্বালাটা সব চেয়ে বেশি। সর্বদা তাব মনে হয় যে এই মানুষটা তাকে হালকা প্রকৃতির ছ্যাবলা মেয়ে ভাবে, তার সেদিনকার দুপুববেলার কীর্তি স্মরণে এলে মনে মনে হাসে।

অথচ, আশ্চর্য এই, অন্যদের সঙ্গ অস্বস্তিকর লাগলেও, সকলকে এড়িয়ে চলবার সাধ জাগলেও, পরমেশ্বর তাকে আকর্ষণ করে।

আকর্ষণটা হয় দুরকমের।

কখনও সাধ হয় গিয়ে নিজের কথা ব্যবহার চালচলন দিয়ে পরমেশ্বরের ধারণাটা বদলে দেবে যে সে মোটেই হালকা ফাজিল মেয়ে নয়।

আবার কখনও সাধ যায়, গিয়ে তর্ক করবে, ঝগড়া করবে পরমেশ্বরের সঙ্গে। ব্যঙ্গ করে খোঁচা দিয়ে তীব্র অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধা দেখিয়ে পরমেশ্বরকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবে সে কীরকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেকেলে মানুষ, আজকের দিনে কত তুচ্ছ আব হাস্যকর হয়ে গেছে তার মতো মানুষেরা।

অর্থাৎ কখনও ভাবে নম্রভাবে গিয়ে পরমেশ্বরের মন ভুলিয়ে তার খারাপ ধারণাটা নাকচ করে দেবে, আবার কখনও ভাবে অশ্রদ্ধা আর অপমান দিয়ে জর্জরিত করে দেবে পরমেশ্বরের মন, সে টের পাবে যে যাই সে ভাবুক পদ্মার সম্পর্কে পদ্মা গ্রাহ্যও করে না।

ভাবতে ভাবতে অধীর হয়ে ওঠে।

আচমকা বিধুভূষণকে বলে, আমি একটু গাড়িটা নিয়ে বেরোচ্ছি বাবা। শিগগির ফিরব।

একা তুমি রোজ রোজ এভাবে গাড়ি নিয়ে গেলে—

আমার আজ বিশেষ দরকার।

কোথায় যাবে ?

রঞ্জনদের বাড়ি।

বিধুভূষণ নির্বিকারভাবে বলে, আচ্ছা যাও।

সুরঞ্জনের বাড়ির অবস্থা আরেকটু ভালো হলে কোনো কথাই ছিল না, শুধু এই একটা বিষয়ে মনটা একটু খুঁতখুঁত কবে বিধুভূষণের। তবে আপত্তি করার ইচ্ছাও তার নেই। এক ছেলে, ছেলেটি ভালো, ভবিষ্যৎ আছে।

কান্তিলাল গাড়ি চালায়।

একা গাড়িতে চাপলে পদ্মার নিজেকে একা মনে হয় না, নিজেকে ছোটো মনে হয় না, অস্বস্তি আর আত্মগ্লানির বিশ্রী অনুভূতিটা টেরও পায় না।

মনটা আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে যায়।

নিজেকে সজীব মনে হয়। সে কেন তুচ্ছ হতে যাবে ? সে স্বাধীন মানুষ নয় ? নিজের ইচ্ছামতো বাঁচার অধিকার তার নেই ?

নিশ্চয় আছে।

আচ্ছা কান্তিবাবু, সেদিন যে বলছিলেন সংসারে আপনার কেউ নেই, তা কখনও হতে পারে ? মানুষের আত্মীয়বন্ধু থাকেই কেউ না কেউ।

কান্তিলাল স্পিড কমিয়ে দেয়।

তা থাকে বইকী। আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। দেশের বাড়িতে আমাব নিজেব লোক কে কে আছে, বাপ-মা ভাইবোন বউ ছেলেপিলে এদের কথা। তাই বলছিলাম কেউ নেই। বাবা ছেলেবেলা মারা গিয়েছিলেন, আমার বিয়ের পর মা মারা যায়। তারপর বউ মরেছে—ছেলেপিলে হয়নি। আমাব নিজেব দুটি বোন আছে, দুজনেরই অনেককাল বিয়ে হয়েছে, নিজের নিজের সংসার নিয়ে থাকে। আগে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি আসত, মা আর আমার বউ মরবার পর কদাচিৎ আসে।

কার কাছে আসে ? দেশের বাড়িতে কেউ নেই বললেন—

কেউ নেই কখন বললাম ? আমার খুড়ো থাকে। তার মস্ত সংসার। একটি খুড়তুতো বোন এসে আশ্রয় নিয়েছে, তার চারটি বাচ্চা

গাড়ির স্পিড আরও কমিয়ে আনে কান্তিলাল কথা বলতে বলতেই। তার সম্পর্কে পিছনের সিটের একজনের কৌতূহল মেটাতে গিয়ে কী কলকাতার রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে বসবে !

সে বলে যায়, আমার আর আমার খুড়তুতো ভায়ের বিয়ে হয়েছিল একসাথে। পরপর তার তিনটি মেয়ে হয়েছিল। কালকে কাকার চিঠি পেয়ে জানলাম, এবার একটি ছেলে হয়েছে সৌভাগ্যক্রমে।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজে গাড়িটা এই গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ফাঁকা রাস্তাটা। স্টিয়ারিং হুইলে হাতটা স্থির রেখে মুখ ফিরিয়ে পদ্মার দিকে চেয়ে কান্তিলাল বলে, বাড়িতে গিজগিজ করছে ছেলেমেয়ে।

সেকেন্ড দুই লাগে তার কথাটা বলতে। সেকেন্ড খানেক লাগে পদ্মার মুখের ভাব দেখতে।

সামনে রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বুঝতে পারে আরও সেকেন্ড দুই পদ্মার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখে থাকলে কোনো অ্যাকসিডেন্ট ঘটত না। সোজা রাস্তা—হাত তার ঠিক চেপে ধরে আছে হুইলকে ! ফুটপাতের দিকেও একটু বাঁকেনি গাড়িটা, ডাইনেও দু-চারইঞ্চির বেশি সরে যায়নি।

ছিছি, ছিছি ! আপনার টাকা না পেলে যাদের খাওয়া জোটে না তারা এ রকমভাবে ছেলেমেয়ে জন্মায় !

পরক্ষণে লজ্জিত হয়ে পদ্মা বলে, কিছু মনে করবেন না। এ সব ব্যাপার আমি ধারণাই করতে পারি না।

কান্তিলাল বলে, আমি ভাবি অন্যরকম। গরিব দেশের লোকবলটাই আসল বল। যত লোক বাড়ে ততই ভালো।

না খেয়ে মরবে যে ?

মানুষ কী না খেয়ে মরতে জন্মায় ?

মরে তো ঢের।

সে অন্যেরা মারে বলে।

কান্তিলাল সম্পর্কে জানবার কৌতূহল থেকে কথা শুরু হয় এমনই সহজ সাদামাটা আলাপে এসে দাঁড়ায়।

ড্রাইভারের সঙ্গে বাড়িতে আলাপ করা যায় না, গাড়িতে অন্য কেউ উপস্থিত থাকলেও করা যায় না।

শুধু একা কোথাও যাতায়াতের সময় তাদের আলাপ জমে। সংসারের নিয়মনীতি অনিয়ম কৃত্রিমতার চাপ যেন পদ্মাকে জোর করে এইভাবে কান্তিলালের সঙ্গে ভাব করায়।

সংঘাতের পীড়নে জর্জরিত কাঁচা মনটা কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পায়।

পরমেশ্বর বলে, এসো মা, এসো। আজ যেন বেশ তাজাতাজা লাগছে মাকে আমার।

আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম কিনা তাই।

হাসিমুখে কথাটা বলেই পদ্মার মনে খটকা লাগে, বলা কী উচিত হল কথাটা ? কে জানে পরমেশ্বর ভাবছে কিনা যে ছুঁড়িটা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছে !

পরমেশ্বরকে বশ করা বা আঘাত করার কোনো সাধটাই আর বাস্তব বা সম্ভব মনে হয় না এখন। কীরকম কথাবার্তা চালচলন তার পছন্দ কে জানে ! কী করলে মনে মনে খুশি হয়ে সে তার প্রশংসা করবে তাই যে তার জানা নেই।

একা এমনিভাবে এসেছে বলেই হয়তো পরমেশ্বর যা-তা ভাবছে তার সম্বন্ধে !

আঘাত করা ? অবজ্ঞা আর অপমানে বুকের মধ্যে জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া ?

নিজের বুকটাই জ্বালা করে পদ্মার। এই মানুষটাকে অবজ্ঞায় কাবু করার সাধ্যই যদি তার থাকত এমন ব্যাকুল হয়ে সে যেন ছুটতে আসত গায়ে পড়ে একে অবজ্ঞা করতে !

এটাই কি প্রমাণ নয় যে সত্যই ছ্যাবলা মেয়ে ? তবু কথা কইতে হয়, মুখ গোমড়া করে চুপ করে থাকলে আরও বিশ্রী হবে। বুঝতে পারে এলোমেলো আবোল-তাবোল কথা কইছে, তবু যেন থামতে পারে না।

হঠাৎ বলে, আচ্ছা যাই এবার।

পরমেশ্বর বলে, মন শান্ত হল না মা ? চব্বিশ ঘণ্টা সবাই মিলে ঝড় তুলে দিচ্ছে, বোকা ছেলের কী সাধ্য আছে দুদণ্ডে ঝড় থামিয়ে দেব ?

পদ্মা তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুরঞ্জনের নাম করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, দু-চারমিনিটের জন্য হলেও দেখা করে যাওয়া উচিত।

সুরঞ্জন বাড়ি নেই শুনে কী স্বস্তিটাই যে পদ্মা বোধ করে !

সুরঞ্জনের মা-র মুখ একটু গম্ভীর দেখায়:

একলাই এসেছ ? বাড়ির গাড়িতে এসেছ ?—ও !

অচিন্ত্য বলে, কিছু বলতে হবে রঞ্জনকে ?

না, কিছু বলতে হবে না।

গাড়িতে উঠে পদ্মা বলে, গঙ্গার ধারে চলুন। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

বাবুর আপিসের টাইম হয়ে যাবে।

পদ্মা হেসে বলে, সে ভাবনা আপনার কেন ? টাইম হয়ে যায় বাবা ট্রামে বাসে আপিসে যাবে। দুদিন আগেও তো তাই গিয়েছে।

বড়ো রাস্তায় খানিকটা যাবার পর পদ্মা গাড়ি থামিয়ে সামনের সিটে কান্তিলালের পাশে এসে বসে।

আপনার সঙ্গে আজ ভালো করে আলাপ করতে হবে।

শুধু পুজো দেখে যাবার নিমন্ত্রণ ছিল সমীরের। এক সুরমা ছাড়া তাকে বিশেষভাবে কেউ নিমন্ত্রণ করেনি। কর্তাব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে তাদের সমগ্র পরিবারটিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

সপ্তমীর দিন সকালে ভদ্রতা রক্ষার জন্য শুধু উঁকি দিয়ে যেতে এসে সমীর এখানে আটকে যায়।

সে ধারণাও করতে পারেনি মহেশ্বর এমন সমারোহের সঙ্গে পূজা করবে—করতে পারবে।

চার বছর এ বাড়িতে কাটিয়েছে, পাড়ার মেয়েপুরুষ সে চার বছর যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে তাদের এই বাড়িটাকে। পরস্পরের বাড়িতে এসেছে গিয়েছে কিন্তু তাদের বাড়িতে আসতে যেতে ভরসা পায়নি গেঁয়ো মানুষগুলি।

সেই বাড়িতে পূজা উপলক্ষে ভিড় করে এসেছে সমস্ত পাড়া !

নিদারুণ অপমানের মতোই এটা মনে হয়েছে সমীরের। কিন্তু সে সব চেয়ে অবাক হয়ে গেছে মহেশ্বরের কৃতিত্বে।

এত টাকা দিয়ে তাদের বাড়ি কিনে এত টাকা খরচ করে এমন সমারোহের সঙ্গে পূজা করছে মহেশ্বর ! তার টাকাও আছে, সে খরচও করতে পারে টাকা।

সুরমা ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে আছে। কাজের তার অন্ত নেই।

প্রতিমাও দেখায় যে সে-ও বাড়িতে পূজার কাজে সাহায্য করছে। কিন্তু আসলে তার শুধু শখের টুকটাক কাজ করা—চারিদিকে অবিরত পাক খেয়ে বেরিয়ে মজা উপভোগ করাই তার আসল কাজ।

সুরমা দায়িত্ব নেয়।

নিজের হাতে করুক বা অন্যকে দিয়ে করাক, দরকারি কাজটা করিয়ে দেবার দায়িত্ব সে পালন করে। সে তাই সত্যসত্যই ব্যস্ত হয়ে থাকে।

পূজার দিন তিনেক আগে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সমীর এলে প্রতিমা হেসে বলেছিল, দিদিকে খুঁজছেন ? ওই তো দিদি পুজোর বাসন মাজছে।

তাই বটে। কলতলায় তুলসী আর ভাদুর সঙ্গে সুরমা নিজে বাসন মাজতে বসেছে। ওরা দুজনে মাজছে ডেকচি গামলা থালা বাটি, সে শুধু মাজছে পূজার জন্য দরকারি কয়েকটি তামার পাত্র।

ধীরে ধীরে সমীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ আবার কী শখ ?

শখ ? এগুলো পড়ে থাকে, জং ধরে গেছে। অনেক কায়দা করে মাজতে হয়। একেবারে নতুনের মতো চকচক না করলে বাবা রক্ষা রাখবে না।

সেদিনও সমীর বুঝতে পারেনি উৎখাত হয়ে এলেও কত সমারোহের সঙ্গে মহেশ্বর পূজার আয়োজন করছে। পুজোর দিন তিনেক আগে সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন সুরমা বিশেষভাবে তাকে নিমন্ত্রণ করেছিল, পুজোর দিন নিশ্চয় আসবেন কিন্তু। না এলে রাগ করব।

পুজোর দিন বিকালে এসে পূজামণ্ডপে বেঞ্চে প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থেকে সে সব লক্ষ করে। পাড়ার লোকের আনাগোনা, সকলকে মহেশ্বরের অভ্যর্থনা, পাড়ার ছেলেমেয়েদের ভিড় করে দাঁড়িয়ে আনন্দের কলরব তোলা—প্রতিমা, পূজার আয়োজন আর সুসজ্জিত পূজামণ্ডপ।

সে ভাবে, এত বড়োলোক ছিল মহেশ্বর ? এত টাকা সে নিয়ে এসেছে ? খুব বেশি পরিমাণে টাকা না থাকলে তো আয়ের ব্যবস্থা বন্ধ হবার পর জমানো টাকা থেকে মানুষ এত খরচ করতে পারে না পূজার জন্য।

ছোটো একটি ছেলে এসে সমীরকে জানায়, ভিতরে তাকে ডাকছে।

ভিতরে যেতেই সুরমা বলে, বসুন, চা দিচ্ছি। সারাদিন থাকতে হবে, একেবারে রাত্রে খেয়ে যাবেন।

রাত্রেই বা যাব কেন ? থাকলে চলবে না ?

সে কি আর আপনি থাকবেন !

এই রইলাম। শুধু আজ নয়, পুজোর ক-দিন তোমাদের এখানে কাটিয়ে যাব। তোমাদের সঙ্গে আনন্দ করব !

তার উৎসাহ দেখে খুশি হয়ে সুরমা বলে, আমাদের আনন্দও বাড়বে !

সমীর খাবার খেতে খেতে বলে, বাইরে থেকে প্রতিমা দেখেছি আর প্রসাদ খেয়েছি। একেবারে পূজার হইচইয়ের মধ্যে কখনও থাকিনি। এবার সে অভিজ্ঞতা হবে।

একটু হেসে বলে, আমায় অতিথির মতো বসিয়ে রেখে শুধু আদর কোরো না কিন্তু ! আমাকেও খাটিয়ে নিতে হবে।

কাজের তো অন্ত নেই, আপনি লেগে যাবেন।

অনেকক্ষণ মনের মধ্যে যে কথাটা ঘুরছিল এবার সমীর সেই কথাটা পাড়ে। বলে, তোমাদের তো খুব সমারোহ হয় পূজায় !

এ আর কী দেখছেন ? দেশের বাড়িতে আরও কত লোকজন আসত, আরও কত বেশি হইচই হত ক-দিন ধরে। দশ-বারোটার কমে ঢাক না বাজলে বাবার মন উঠত না।

একটু থেমে বলে, বাবার কাছে এই পুজোর চেয়ে বড়ো কিছু নেই। আর সব ছাড়তে পারেন, পুজো বাদ দিতে পারবেন না।

পরমেশ্বরকে সমীর বলে, যেচে নেমন্তন্ন নিলাম—পূজার ক-দিন এখানে থাকব।

এই তো চাই। আনন্দ করতে কী নেমন্তন্নের মুখ চেয়ে থাকতে আছে ? যেচেই যোগ দিতে হয় !

এত হইচই আপনার ভালো লাগে ?

সবাই আনন্দ করছে—ভালো লাগবে না ?

রাত্রে খেতে বসে সমীর বলে, প্ল্যানটা একটু বদলাতে হল।

সুরমা বলে, কেন ?

আজ বাড়ি ফিরতে হবে। বলে আসিনি—বাড়িতে ভাববে। তাছাড়া জামাকাপড়ও আনতে হবে তো।

কয়েকজন একসাথে খেতে বসেছে, মহেশ্বর সামনে দাঁড়িয়েছিল।

সে বলে, জামাকাপড়ের জন্য আটকাত না—কিন্তু বাড়িতে যখন ভাববে, আজ ফেরাই উচিত। কাল আসবে কিন্তু।

সুরমা বলে, সকালেই আসবেন।

পরদিন সকালে ছোটো একটি সুটকেস হাতে নিয়ে সমীর ফিরে এলে সুরমা হাসিমুখে তাকে জানায়, আপনি নিজে থেকে পুজোর ক-দিন থাকতে চেয়েছেন শুনে বাবা খুব খুশি হয়েছেন।

তুমি ?

সুরমা শুধু একটু হাসে।

দিনরাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যায়।

সমীর সত্যই একেবারে যেন ঘরের ছেলে বনে গিয়ে কোমর বেঁধে সকলের সঙ্গে পূজার কাজে ভিড়ে যায়।

প্রতিমা তামাশা করে বলে, এ তো আপনাদের বাড়ি ছিল এই সেদিন পর্যন্ত—আপনাদের বাড়ির পুজোই হচ্ছে ধরে নিন !

সমীর বলে, ধরে নিতে হবে কেন ? তাই তো সত্যিসত্যি হচ্ছে !

আপনি যেন বড্ড বেশি আপন হয়ে যাচ্ছেন !

হবই তো ! আরও আপন হব।

প্রতিমা দেখতে এসে লোকে আলোচনা করে, নপাড়ার সার্বজনীন পূজা ছাড়া কাছাকাছি এত বড়ো প্রতিমাও হয়নি ; এমন সুন্দর সাজানো আর সমারোহও হয়নি।

পরমেশ্বর বলে, সার্বজনীন পূজার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে মহেশ্বর। দশজনের বোঝাটা একা বইতে চাইছে।

মহেশ্বর বলে, সমস্তই মা-র দয়া !

সমীর বলে, কলকাতায় পুজো অনেক বেড়ে গেছে।

পঙ্কজ বলে, দশজনে মিলে চাঁদা তুলে পুজো করতে শিখেছে যে।

পরমেশ্বর বলে, দশজনকে নিয়েই তো পূজা করা। সবাই আসছে যাচ্ছে তাই না আমাদের পূজা সার্থক।

দশমী আসে।

প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে আসার পর ঘনিয়ে আসে গভীর শ্রান্তি আর অবসাদ, সেই সঙ্গে মনে হয় সব যেন শেষ হয়ে গেছে।

সকলের আগেই ফিরে আসে সমীর।

মেয়েদের মধ্যে প্রতিমা ছাড়া আর কেউ প্রতিমার সঙ্গে যায়নি।

সুরমা জিজ্ঞাসা করে, আগে ফিরে এলেন ?

মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল।

সত্যি। উৎসব শেষ হলে এমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আবার সেই এক বছর পরে পুজো।

সমীর বলে, আমি এখুনি চলে যাব ভাবছি।

কেন ?

বাড়িতে লোক নেই ? বিজয়ার দিন না গেলে তাদের মনে কষ্ট হবে না ?

তাহলে খেয়ে যান।

খেতে বসে সমীর বলে, তোমায় একটা কথা বলব ভাবছিলাম।

বলুন।

আবার সেই এক বছর পরে পুজো। এক কাজ করবে, তার আগেই বাড়িতে আরেকটা উৎসব করাবে ? যত শিগগিরি সম্ভব হয় ?

সুরমা বুঝতে পারে। তাই চুপ করে থাকে।

জবাব দিলে না যে ?

উৎসব করানো কি আমার হাতে ?

উৎসব তোমার বাবা করবেন। তোমার অমত নেই তো ?

একবার চোখ তুলে চেয়ে সুরমা মাথা নাড়ে।

নয়

খুশিই হয় সকলে।

অবস্থা ভালো, ছেলেটি ভালো, চাকরিও করে।

পঙ্কজ ভাবে, কে জানে কীভাবে এর বিচার করা উচিত ?

সুরমা বুদ্ধিমতী। বিপন্ন বাপকে বর খুঁজে আনবার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে, বাপের একটা ভার লাঘবের ব্যবস্থা করেছে।

যত সমারোহের সঙ্গেই মহেশ্বর পূজা করে থাক, পঙ্কজ তার অবস্থা জানে।

এভাবে তার পূজা না করাই উচিত ছিল।

সাধন বাপকে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু মহেশ্বর গা করেনি। বলেছিল, মা-র পুজো করে কেউ ফতুর হয় না। পূজার ব্যবস্থা মা নিজেই করে নেবেন। ক্ষমতা যখন আছে আজ, কেন করব না।

ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে তো !

পূজার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ?

সাধন পরমেশ্বরকে বলেছিল, সে বুঝিয়ে বললে হয়তো মহেশ্বরের চৈতন্য হবে, পূজার খরচ কমিয়ে দেবে।

পরমেশ্বর বলেছিল, আমি তো কাউকে কিছু বলিনি। আজ আমি বলব পূজায় কম খরচ করো, এক বছরের মধ্যে ব্যাবসা করে কিংবা অন্য উপায়ে ঢের টাকা করবে, সামনের পুজোয় আরও বেশি খরচ করতে পারবে। কিন্তু আয়ের ব্যবস্থা যদি না হয় ? আমার তখন মুখ থাকবে কোথায় ? না বাবা, আমি কোনোদিন দায়িত্ব খাটাইনি, আজও খাটাব না !

সুরমা আর সমীরের বিয়েটা অতি সাধারণ এক ঘটনা, দুজনে যদি জানাশোনা না থাকত এবং মহেশ্বর খোঁজ পেয়ে বিধুভূষণের কাছে প্রস্তাব করে সমীরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে যা ঘটত একটু অন্যভাবে ঠিক সেই অতি সাধারণ ঘটনাটাই ঘটেছে।

কিন্তু অন্যভাবে এটা ঘটা কি উচিত ? এইখানেই পঙ্কজের খটকা।

ভালোবাসার জন্য নয়, সুবিধা পেয়ে শুধু বিয়ের জন্য একটি উপযুক্ত পাত্রকে বশ করা ?

প্রেম যে তাদের হয়নি পঙ্কজ জানল কী করে ?

ওটা জানা আর কঠিন কী !

সুরমা যে যেচে বেশ খানিকটা খাতির করেছে সমীরকে, তাকে বিশেষভাবে পছন্দ করার, তার আপন হওয়ার ভাব দেখিয়েছে এটা নজরে পড়েছে প্রতিমারও।

হৃদয়ে প্রেম এলে এটা সম্ভব হত না সুরমার পক্ষে।

তখন অন্যভাবে একেবারে অন্যরকম সম্পর্ক গড়ে উঠত তাদের মধ্যে।

অবশ্য পরস্পরকে তারা যে পছন্দ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

সংসারে এত যে গন্ডা গন্ডা ভালোবাসার বিয়ে হয়, দুপক্ষ ধরে নেয় তাদের খাঁটি প্রেম হয়েছে, পঙ্কজ জানে যে তার বেশির ভাগ নিছক পছন্দের ব্যাপার।

পরস্পরকে ভালো লাগা আর ভালোবাসা হওয়ার মধ্যে অনেক তফাত।

এদেরও শুধু পছন্দের বিয়ে হয়েছে বলে বলার কিছু নেই। কিন্তু সুরমা যে গায়ে পড়ে সমীরের মনে তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা জাগাবার চেষ্টা করেছে, এটা কীভাবে নেবে পঙ্কজ বুঝে উঠতে পারে না।

সুরমা ওই চেষ্টাটুকু না করলে এত তাড়াতাড়ি বিয়ের প্রশ্ন সমীরের মনে আসত না। হয়তো আরও বেশ কিছুকাল মেলামেশা চলতে চলতে ধীরে ধীরে তার মনে জাগত সুরমাকে বিয়ে করার সাধ– হয়তো কোনোদিন এটা তার খেয়ালও হত না।

সমীরের মনপ্রাণ কোন উচ্চাশা জুড়ে আছে তার খবর পঙ্কজ রাখে।

তার বড়োলোক হওয়ার সাধটা অত্যন্ত প্রবল।

বিধুভূষণের অবস্থা আগে আরও অনেক ভালো ছিল, নানাভাবে এখন অবস্থা পড়ে গেছে। আগে তাদের নাকি দুটো মোটরগাড়ি ছিল।

সমীর আগের সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায়।

কেবল আমার জন্য নয়। বাপের জন্যও একটা কর্তব্য আছে তো ছেলের ?

খানিকটা পাগলামিই মনে হয়েছে সমীরের এই ঝোঁকটা পঙ্কজের কাছে। যে টাকা করতে চায় অনেক টাকা করতে চায়—সে যে কী করে শ-তিনেক টাকা বেতনের চাকরি পেয়েই সাগ্রহে সেটা নিয়ে নেয়, আবার তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চায় পঙ্কজ বুঝতে পারে না। মহেশ্বরের ঘটা করে পূজা করা দেখে তার প্রচুর টাকা আছে ভেবে যে সমীর তাড়াতাড়ি সুরমাকে বিয়ে করেছে এটা তার খেয়ালে আসে না।

পরমেশ্বরকে সে বলেছিল, এ ও একটা চাল হবে ছুলেটার।

নিজের অজান্তে চাল দেয় বেচারার দোষ নেই।

যেমন শিক্ষা পেয়েছে সেটা যাবে কোথায় ?

এ দেশে ভালো শিক্ষা কে পায় বলো ?

এমনি ভালো ছেলে কিন্তু এই রকম কতগুলি পাগলামি আছে ওর। তিনশো টাকার চাকরি করে সে লাখপতি হবে।

পরমেশ্বর হেসে বলেছিল, সমীর যদি বা কোনোদিন লাখপতি হয়, তুমি কখনও হতে পারবে না।

কীরকম ?

তুমি টাকার মর্যাদা জান না। বি এ পাশ করেই ও সুযোগ পেল মাসে মাসে তিনশো টাকা রোজগারের– সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ নিয়ে নিলে। নইলে কী হত ? আরও দুবছর ঘরের পয়সা খরচ করে এম এ পড়ত। দুটি বছর সময় নষ্ট, পয়সা নষ্ট। তিনশো টাকার চাকরি নিয়ে ভালো করেনি ?

কিন্তু তবু পঙ্কজ মানে বুঝতে পারে না। তার চাকরি করার। চাকরি করার বদলে ছোটোখাটো একটা দোকান দিয়ে বসলে বরং সে বিশ্বাস করতে পারত যে সমীর দোকানদার থেকে ব্যাবসাদার হবার সঠিক পথ ধরেছে।

প্রতিমার মধ্যে কেমন একটা অস্থিরতা, উন্মনা ভাব দেখা যাচ্ছিল। মেজাজটা যে এলোমেলো হয়ে উঠছিল তার।

পূজার সময় পঙ্কজ দুটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সবিতার গান গাইবাব ব্যবস্থা করে দেয়।

নতুন যে গান শিখেছে সে গান নয়।

তার বাপের রচিত পূর্ববাংলার গ্রাম্য গান।

গান শুনিয়ে সবিতা জীবনে প্রথম রোজগার করে, দুটি আসর থেকে কড়কড়ে পঁচিশটা টাকা।

পঙ্কজ বলে রেখেছিল কিন্তু অনুষ্ঠান দুটির উদ্যোক্তাদের মনে যথেষ্ট খটকা ছিল। সবিতা গান গাওয়ার পর খুশি হয়ে তারা গানের দাম দিয়েছে—টাকার পবিমাণটা কম বলে লজ্জিতভাবে সবিতাকে বলেছে সে যেন কিছু মনে না করে !

প্রথম আসরে দুখানা গানের জন্য দশ টাকা দিয়েছিল। দ্বিতীয় আসরেও দশ টাকা মজুরিতে তার দুখানা গান গাওয়ার কথা ছিল।

শ্রোতাদের দাবিতে আরেকটা গান গাইতে হয়। দশ টাকা পেলেই সে খুশি হত। কিন্তু সে সভার উদ্যোক্তারা সানন্দে তাকে পনেরো টাকা দিয়েছিল।

পঙ্কজের সঙ্গে প্রতিমাও গিয়েছিল এ দুটি আসরে।

তারপরই যেন বেড়ে গিয়েছিল তার অস্থিরতা আর মেজাজ বিগড়ে যাওয়া।

সুরমার বিয়ের দুদিন আগে গায়ে পড়ে কী অপমানটাই সে করে বসল সবিতাকে !

একটি অসহায় নিরুপায় উদ্‌বাস্তু মেয়েকে সাধনের বন্ধু অসীম বিনা পয়সায় নিয়মিত বাসভাড়া দিয়ে তাদের বাড়ি এসে গান শেখাবে—এ পর্যন্ত তার যেন সহ্য হয়েছিল। কিন্তু পঙ্কজ তার গেঁয়ো বাপের গেঁয়ো গান দশজনের আসরে শোনাবার ব্যবস্থা করে তাকে কয়েকটা টাকা পাইয়ে দেবে এটা যেন সহ্য হয় না প্রতিমার।

কিন্তু সেটা বোঝা খুব কঠিন হয় আত্মীয়স্বজনের পক্ষে—পঙ্কজের পক্ষেও।

কারণ, ঠিক এই সময়েই আচমকা ঠিক হয়ে যায় সুরমা ও সমীরের বিয়ের কথা।

কথাটা ঠিক হওয়ামাত্র সে যেন কোমর বেঁধে শুরু করে বোনের সঙ্গে ঝগড়া।

উঠতে বসতে সুরমাকে খোঁচায়, রাগায়, অপমান করে।

এতখানি মাত্রা চড়িয়ে করে যে পরমেশ্বরকে পর্যন্ত বলতে হয়, তুই একটা কড়া জোলাপ খাবি না আমাকে তাড়াবি বাড়ি থেকে ?

জ্যাঠামশাই ! কী বলছ তুমি ?

তার পায়ের কাছে যেন আছড়ে পড়ে প্রতিমা।

চশমাটা অল্পের জন্য বেঁচে যায়।

পরমেশ্বরের পা জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে সবাই এমন তুচ্ছ করে কেন বলো তো ?

পরমেশ্বর তার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলে, তুই পরে বড়ো হবি তাই তোকে আজ তুচ্ছ করে।

প্রতিমা উঠে বসে। আঁচল খসে গেছে, ব্লাউজ ফেঁসে গেছে।

পরমেশ্বর বলে, থাক থাক, লজ্জা পেতে হবে না অত। তোকে আমি ন্যাংটো দেখেছি। সুরমাটা বোকা—ওর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। কিন্তু দুঃখ পেয়ে পেয়ে ও সামলে উঠতে পারবে। তুই বাঁকা পথে চলছিস, ডুবে যাবি, বয়ে যাবি। তোর এই বিকারের চেয়ে বড়ো অভিশাপ মেয়েদের আর হয় না।

এই ধিক্কারে সামলে গিয়েছিল প্রতিমা।

ধীরে ধীরে উঠে বসে গায়ে আঁচল জড়িয়েছিল : আছড়ে পড়ার জন্য কপাল কেটে রক্ত পড়ছিল টের পেয়েই বুঝি মুহূর্তের মধ্যে মাথাটা কাত করেছিল।

বাঁদিকের কানের উপরে মাথাটা কেটে গিয়ে—ফেটে যায়নি—ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।

হাতে ওই রক্ত মাখিয়ে চুলটা ঠিক করতে করতে প্রতিমা বলেছিল, উঃ ! তুমি যদি মরে যেতে জ্যাঠামশাই ! আমরা একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচতাম।

পরমেশ্বর উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠেছিল। আমাকে মেরে বাঁচতে চাস ? আমি মরব তবে তুই বাঁচবি ? বেশ বুঝেছিস তো বাঁচার নিয়ম !

প্রতিমা গায়ে পড়ে অপমান করার পর সবিতা গান শিখতে আসে না।

দুসপ্তাহে অসীম দুবার এসে ফিরে যায়—তার একটিমাত্র বিনে পয়সায় শেখাবার ছাত্রীও বাড়িতে এসে তার কাছে বিনা পয়সায় গান শিখবে না। শেখাতে হলে ওই বস্তিতে গিয়ে শেখাতে হবে।

পরমেশ্বর বলে, ওর একটা কিছু ভবিষ্যৎ হিল্লে করতে তুমি হপ্তায় একদিন বাসের পয়সা খরচ করে মেয়েটাকে গান শেখাতে আস। এ সংসারটা ভেঙে গিয়ে তোমার ওই ভবিষ্যৎ গড়ছে, বড়োই আনন্দের কথা। তুমি বরং এক কাজ করো। পঙ্কজের বাড়িতে মেয়েটাকে গান শেখাও।

সুরমার বিয়ের দুদিন আগে প্রতিমা শুনতে পায় পঙ্কজের পড়ার ঘরে অসীম গান শেখাচ্ছে সবিতাকে।

আধুনিক গান শেখাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর পড়ার ঘরে গিয়ে প্রতিমা হাসিমুখেই পঙ্কজকে বলে, বাপ-জ্যাঠা সবাইকে ডিঙিয়ে দিদি ক্যামন নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন !

ভালোই তো, বাপ-জ্যাঠার ঝঞ্ঝাট চুকে গেল।

সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছে কী জানো ? বাবা কোনো আপত্তি করলেন না ! বাবার কাছে ওদের সংসারটা তো ম্লেচ্ছের সংসার, এ রকম একেলে সংসারে গিয়ে দিদি তো বিপাকে পড়ে যাবে ! এ সব কোনো কথা একবার মনেও আনলেন না ! জ্যাঠাকে একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, আপনার আপত্তি নেই তো ? তারপরই মত দিলেন। অবস্থার সঙ্গে বাবার মনটাও কি পালটে গেল ?

তা কিছুটা যাবে না ? ক্রমে ক্রমে আরও যাবে। কিন্তু তুমি কি এ সব কথা মহেশ্বরবাবুকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে ?

আমার কী গরজ ?

আজ বিয়ের সব ঠিক হবার পর এ সব কথা নিয়ে তবে মাথা ঘামাচ্ছ কেন ?

দিদির কী অবস্থা হবে ভাবছি। সমীরবাবুর বাড়ির যারা আসে তাদের সাজপোশাক চালচলন দেখেছ ? আমাদের গেঁয়োমি দেখে হাসাহাসি করছে। দিদি আর সমীরবাবুর সত্যিকারের ভালোবাসা হলেও বরং কথা ছিল। ক-দিন ধোপে টিকবে ?

খানিক থেমে প্রতিমা আবার বলে, ক-মাসের আলাপেই ওনাদের ভালোবাসা জন্মে গেল ! দেরি সয় না, তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়া চাই !

পঙ্কজ একটু হেসে বলে, তোমার বাবার চেয়ে তোমার খুঁতখুঁতানিই দেখছি বেশি। হিংসে হচ্ছে নাকি ? এই সঙ্গে তোমার হলেও চুকে যেত ? কিন্তু তুমি এখন বিয়ে করবে না, পড়বে, এ তো জানাই আছে।

কে বললে ?

বল কী ! বিয়ের সাধ জেগেছে নাকি তোমার ?

সাধ জাগলেই বা আমায় বিয়ে করছে কে ?

পঙ্কজ সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়। তার পড়ার ঘরে এসে এভাবে প্রতিমা কথা বলছে ! গত কয়েকদিনের পাগলামি আর আজকের এ রকম গ্রাম্যভাব তার কেন এল কোথা থেকে এল কে জানে !

পঙ্কজ হাসিমুখেই বলে, লোকের কি অভাব আছে ? বাবাকে জানালেই ছেলে খুঁজে এনে বিয়ে দিয়ে দেবেন ! সেবার অত ভালো সম্বন্ধ এল, তুমি ঝগড়া করে সব ভেস্তে দিলে।

ও রকম বিয়ে চাইনে।

একটা বই টেনে নিয়ে প্রতিমা পাতা উলটায়। অগ্রহায়ণ এসে গেছে কিন্তু শীতের আমেজ ভালো করে টের পাওয়া যায় না। মুখ তুলে প্রতিমা বাইরের কুয়াশার দিকে তাকায়। কাছাকাছি আলোগুলিতে রহস্য ঘিরে রয়েছে। দূরের আলোগুলি হয়েছে অস্পষ্ট।

প্রতিমা হঠাৎ বলে, তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় কবে ?

গেঁয়ো স্কুল থেকে পাস করে যেবার কলকাতায় পড়তে এলে। তোমাকে এনেই সাধনের জ্বর হয়, আমি তোমায় ভর্তি-টর্তি করে দিলাম। প্রায় আড়াই বছর হল।

আড়াই বছর আমাদের আলাপ !

সত্যই আজ কী যেন হয়েছে প্রতিমার। এ রকম সুস্পষ্ট উসকানির ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলার মতো মানসিক অবস্থা তার হতে পারে শুধু সমীরের সঙ্গে তার পিঠাপিঠি বোনটির বিয়ে হবে বলে, এটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না পঙ্কজের।

ক-মাসের পরিচয়ে ভালোবাসা হয়েছে, সমীর ব্যস্ত হয়ে ব্যবস্থা করেছে বিয়ের- ব্যঙ্গের সুরে এ কথা বলার পরে এভাবে ইঙ্গিত করা যে তাদের পরিচয় আড়াই বছরের পুরানো।

অথচ আজ পর্যন্ত অস্পষ্টভাবেও মনের কথার আদানপ্রদান পর্যন্ত হয়নি তাদের মধ্যে।

পঙ্কজ ভেবেচিন্তে বলে, চাকরি করলেও আমি এখনও ছাত্রই। এদিকে শিখছি ওদিকে অ্যাপ্রেন্টিস খাটছি। পাস করলে তখন চাকরি পাকা হবে। ততদিনে আমাদের ভাব পাঁচ বছরের পুরানো হয়ে যাবে।

প্রতিমা চুপ করে থাকে।

অবশ্য ততদিন যদি আমাদের ভাব বজায় থাকে।

কেন থাকবে না ?

ছাত্রী বলেই রেহাই পেয়েছ। পড়া ছাড়লেই পার করে দেবেন।

পড়া আমি ছাড়ছি না।

পঙ্কজ আবার একটু ভাবে।

তুমি একটু বেশি বয়সে পড়া আরম্ভ করেছিলে, না ?

হ্যাঁ। ছেলেবেলা খুব অসুখে ভুগেছি।

এদিকটাও প্রতিমার মনে পড়িয়ে দেওয়া দরকার—পঙ্কজ ভাবে। সমীর তিনশো টাকার পাকা চাকরি করে, সে এখনও নামেই চাকুরে, শুধু এইটুকুই পার্থক্য নয় তাদের মধ্যে। সমীর তার চেয়ে বছরকয়েকের বড়ো।

ওদের বেলা বয়সের হিসাবে মানান-বেমানান হওয়ার কথা কারও ভাববার দরকার হয়নি কিন্তু তাদের বেলা হবে। আজ যদি সে বিয়ে করতে চায় প্রতিমাকে, সামান্য বেতনে কাঁচা চাকরি আরও দুবছর আড়াই বছর ধরে তাকে করতে হবে বলে মহেশ্বরের আপত্তি যদি নাও হয়, তাদের মধ্যে বয়সের তফাতটা কম বলে নিশ্চয় তার আপত্তি হবে। তার নিজের বাড়ির আপত্তির কথাটা না হয় নাই ধরল।

এটা বুঝতেই হবে প্রতিমাকে।

প্রতিমা অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকে।

মুখ ফিরিয়ে বলে, সত্যি, ছেলেবেলা ভাগ্যে অসুখ হয়েছিল, দেরিতে পড়া আরম্ভ করেছিলাম। নইলে মুশকিল হয়ে যেত, বিয়ে ঠেকাবার কোনো অজুহাত পেতাম না ! কিন্তু—

মুখে তার একটা অদ্ভুত হাসি ফোটে।

কিন্তু এম এ পাস করতে করতে বুড়ি হয়ে যাব।

বলে বিদায় না নিয়েই সে চলে যায়।

সে চলে যাবার পর পঙ্কজের মুখে গভীর উদ্‌বেগের ছায়া পড়ে। এতক্ষণ জোর করে মুখের ভাব শান্ত রেখেছিল। ঝড়ের আগেকার আকাশের মতো থমথমে মুখ প্রতিমার, চাউনি অস্বাভাবিক।

প্রতিমার মনোবিকারের ঝড়টা ওঠে সুরমার বিয়ের দিন।

সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে যায়—সারাদিন আর তার খোঁজ নেই। রাত প্রায় নটার সময় সুরমা যখন বিয়ের আসরে পিঁড়িতে বসেছে, তখন সে ফিরে আসে নিজেদের বাড়ির বদলে পঙ্কজদের বাড়িতে !

পঙ্কজরা সকলেই তখন বিয়ে বাড়ি এসেছে, বাড়ি পাহারা দিচ্ছে তার ভাগনে কানাই। স্তান নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি গেলে কানাই খেতে আসবে।

কানাই এসে পঙ্কজকে আড়ালে ডেকে বলে, প্রতিমাদি তোমায় ডাকছে।

কোথায় প্রতিমা ?

তোমার ঘরে শুয়ে আছে। মুখচোখ কীরকম হয়ে গেছে দেখলে ভয় করে। আমায় বলে, চুপিচুপি তোমাকে ডেকে দিতে !

পঙ্কজ ঠোঁট কামড়ায়। মাথা কি সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে প্রতিমার ? এদের খবর জানাবে কি না কয়েক মুহূর্ত তাকে ভাবতে হয়। ভেবে ঠিক করে আজ নিজে গিয়ে বুঝিয়ে মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করাই ভালো।

কানাইকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ি যায়।

তার ঘর অন্ধকার। ঘরে গিয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালায় পঙ্কজ।

বাঘিনির মতো বিছানা ছেড়ে যেন লাফিয়ে উঠে আসে প্রতিমা।

আলো নেভাও।

তোমার শরীর খুব খারাপ শুনলাম ?

আমার শরীর ঠিক আছে। দেখে বুঝতে পারছ না শরীর আমার ঠিক আছে ?

তোমার জ্বর হয়েছে নাকি ?

জ্বর হলে তো বাঁচতাম।

প্রতিমা নিজেই আলোটা নিভিয়ে দেয়।

বলে, এসো আমরা শুয়ে পড়ি। অনেক রাত হয়ে গেছে।

এটা নিছক রোগ। কিন্তু হিস্টিরিয়ায় কি মুখ-চোখ এ রকম হয়ে যায় ? চোখ এত লাল হয় ? কী করা যায় ?

প্রতিমা ফুঁসে উঠে বলে, সমস্ত হিসাব নিকাশ আমি চুলোয় দিয়েছি। চলে এসো।

পঙ্কজ বলে, হিসাব-নিকাশ ছাড়াও আমি তো আছি ?

থেকে কী লাভ হচ্ছে আমার ? মস্ত পুরুষ মানুষ !

তোমার আমার লাভের হিসাব তো জগতে চলে না প্রতিমা। তোমার সত্যি অসুখ করেছে। বলে পঙ্কজ আবার আলো জ্বালে।

খাটের নীচে পঙ্কজেরই জুতা ছিল।

প্রতিমা একটা জুতা ছুঁড়ে মারে পঙ্কজকে।

বলে, তুমি যাও চলে, যাও সামনে থেকে।

পঙ্কজ শান্তভাবেই বলে, তোমার শরীর খারাপ তাই রাগ করছ। তোমাকে আদর করতেই তো এসেছি আমি।

সত্যি ?

প্রতিমা নিজেই হাত বাড়িয়ে আলো নিভিয়ে দেয়।

দুহাতে পঙ্কজের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, এসো।

ইস্, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে !

যাক পুড়ে। বিছানায় এসো।

চলো। কপালে জলপটি দিয়ে বাতাস করতে হবে। বরফ আনতে দিতে হবে। কানাইকে ডাকি ? আমি তোমার কাছে থাকি, কানাই ও সব নিয়ে আসুক। নইলে আমাকেই যেতে হবে।

না, না, তুমি যেয়ো না, কানাইকে ডাকো।

ওদিকে বিয়ে হয় সুরমার এদিকে সতীশ ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে প্রতিমাকে।

কখন জ্বর এল ?

সুভাগিনী বলে, আমরা তো কিছুই জানি না। বাড়িতে বোনের বিয়ে, মেয়ে সকাল থেকে সারাদিন বাইরে কাটিয়ে রাত্রে খালি বাড়িতে এসে শুয়ে পড়লেন। ভাগ্যে কানাই পঙ্কজকে ডেকেছিল।

প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়।

রাঙা চোখ মেলবার চেষ্টা করে সে বলে, জ্বর হয়নি। বিয়ে হয়েছে।

পরীক্ষা চালাতে চালাতেই ডাক্তার বালতি-ভরা ঠান্ডা জল আনবার হুকুম দেয়, বলে মেঝেতে শুইয়ে নাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। তিন-চার বালতি জল ঢালবেন।

তারপর প্রশ্ন করে, ম্যালেরিয়া আছে ?

গতবছর কয়েকদিন ভুগেছিল।

আধঘণ্টা পরে প্রতিমার গায়ের তাপ একশো একের নীচে নামলে অন্যান্য বিধান দিয়ে সতীশ বিদায় নেয়।

পঙ্কজের ঘরে তার বিছানায় প্রতিমার রাত কাটে। তার বিধবা পিসি আসে তাকে পাহারা দিতে, মেঝেতে মাদুর পেতে শোয়।

গম্ভীর থমথমে হয়ে গিয়েছিল এ বাড়ির মানুষদের মুখ, কে বলবে তারা এক বিয়ে বাড়িব উৎসবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এসেছে।

তেমনই ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখে তারা শুতে যায়।

পঙ্কজকে কেউ জিজ্ঞাসাও করে না সে কোথায় শোবে।

সকালেই দেখা গেল জ্বর একেবারেই নেই এবং মাথাও প্রতিমার অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

ও বাড়ির সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাড়ির আরেক মেয়ের বিয়ের হাঙ্গামার দিকে মন দেয়।

সকালে সতীশ ডাক্তার এসে কতগুলি প্রশ্ন করে মাথা নেড়ে বলে, না, এ তো সাধারণ জ্বর মনে হচ্ছে না।

প্রতিমাকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে, কাল সারাদিন কী করেছিলে, কী খেয়েছিলে, আমায় বলতে হবে মা !

আমি কিছুই করিনি, কিছুই খাইনি।

সতীশ ডাক্তার একটু হাসে।

যাক গে, যাক গে।

সতীশের সঙ্গে পঙ্কজ বেরিয়ে যায়।

একেবারে রাস্তায় নেমে জিজ্ঞাসা করে, জ্বরটা কীসের ডাক্তারবাবু ?

সতীশ থেমে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত তার মুখের আগ্রহ ব্যাকুলতার ভাবটা লক্ষ করে।

যতদূর বুঝেছি বাবা, জ্বরটা হল নার্ভাস ফিভার। নার্ভগুলি বিগড়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে আরও কতকগুলি ফিজিক্যাল কজ্ জুটে হাইপারপাইরেক্সিয়া ঘটিয়েছিল। কথাটার মানে বুঝলে তো ? ওটা হল একশো সাড়ে-পাঁচের বেশি জ্বরের ডাক্তারি নাম।

একটু থেমে সতীশ আবার বলে, বাড়িতে বিশ্রাম করলে নার্ভাস রিয়্যাকশনের জন্য জ্বর-জ্বর ভাব হত, সেরে যেত। তার বদলে শরীরের ওপর অত্যাচার হওয়ায় বেশি জ্বর এসেছে।

কিন্তু এত বেশি জ্বর নিয়ে চলতে ফিরতে পারে ?

সাধারণ জ্বরে পারে না, বিকারের জ্বরে পারে, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই বিপদ ঘটে। বিকারে একটা ঝোঁকে চলতে আরম্ভ করে, ঝোঁকটা একটু এলোমেলো হলেই পড়ে যায়। বাইরে থেকে একা ফিরে নিজে নিজে বিছানায় গিয়ে শোয়—এ একেবারে বেয়াব কেস। আমার মনে হয় সমস্ত বিকারের ঝোঁকটা কনসেন্ট্রেটেড হয়েছিল বাড়ি ফেরায়, তাই এটা সম্ভব হয়েছে।

রাতারাতি জ্বর কমে যাওয়ায় ও বাড়ির সবাই যে প্রতিমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে সুরমার বিয়ের উৎসবে মেতে থাকে তা নয়, তবে প্রতিমার সঙ্গে নির্জনে পাঁচ-দশমিনিট কথা বলার সুযোগ পঙ্কজ পায়।

কাল কোথায় গিয়েছিলে ?

বন্ধুব বাড়ি।

মিলিদের বাড়ি ?

মিলি আমার বন্ধু নাকি ? রত্নার কাছে গিয়েছিলাম বিয়ের নেমন্তন্ন করতে।

আগে করনি ?

না।

তাবপর ?

তারপর ভাবলাম, কলকাতার দেখবার জায়গাগুলি তো অনেকদিন দেখিনি। হাজার হাজার লোক রোজ দেখছে, আমি সেই যে ছেলেবেলা একবার দেখেছিলাম আর যাওয়াই হয়নি। তাই ভাবলাম আজকে যতগুলি পারি দেখলে দোষ কী ?

প্রতিমা হাসবার চেষ্টা করে। একবাত্রে তার মুখ হয়েছে সাতদিন কঠিন জ্বর ভোগ করা রোগীর মতো শুকনো।

তারপর ?

ঘুরে ঘুরে দেখলাম। প্রথমে গেলাম মিউজিয়ামে, তারপর দুপুরবেলা গেলাম চিড়িয়াখানায়।

কিছু না খেয়ে ?

তেলেভাজা খেলাম। আঃ, কী সুন্দর যে করে ওই সস্তা খাবারগুলো ! সন্দেশ রসগোল্লা পুডিং কোথায় লাগে।

পঙ্কজ সকাল থেকে তিনবার থার্মোমিটার দিয়ে তার জ্বর দেখেছে। আবার থার্মোমিটারটা নামিয়ে প্রতিমার বগলে লাগিয়ে দিয়ে বলে, জ্বর এল কখন ?

তা জানি না। চিড়িয়াখানায় ঘুরতে ঘুবতে ভারী শীত করতে লাগল। বমি বমি লাগতে লাগল। একবার বমি করে ফেললাম।

তেলেভাজাগুলি উঠে এল তো ?

উঠে তো এল। তুমি এতবার থার্মোমিটার দিচ্ছ কেন ?

পঙ্কজ সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তারপব কী হল ?

ভীষণ শীত করতে লাগল। ভেতব থেকে যেন কাঁপিযে কাঁপিয়ে উঠতে লাগল। ম্যালেরিয়ার শীত আর কাঁপুনি কোথায় লাগে। একটা বেঞ্চে শুযে পড়লাম।

তখন ক-টা হবে ?

পঙ্কজের প্রশ্নে এবার বিরক্ত হয়ে প্রতিমা বলে, তুমি দেখছি জেরা শুরু করলে ! বিকাল চারটে হবে।

থার্মোমিটার বগল থেকে বার কবে জ্বর দেখে পঙ্কজ বলে, তুমি তো বাড়ি ফিরলে রাত প্রায় সাড়ে আটটায়। এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

প্রতিমা বলে, তামাশা করছ আমার সঙ্গে ? বেঞ্চে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি গিয়ে গাড়ি করে আমায় বাড়ি নিয়ে এলে না ?

দশ

জীবনের কী বিচিত্র ব্যঞ্জনা। এইটুকু পাড়ার মধ্যে !

দোতলা তেতলা—তেতলা মোটে দুটি—কতগুলি দালান, এবড়ো-খেবড়ো ইটতোলা আব নম-নম করে পিচঢালা কয়েকটা গলিপথ, খানিকটা ফাঁকা জমি, ডোবার মতো একটা পুকুর, পুরানো বস্তির কাঁচা ঘরবাড়ি, তার ও পাশে জঙ্গলে বাগানটায় দশ বারোঘর উদ্‌বাস্তুদেব হোগলার ঘরের কলোনি—কত বিভিন্ন অবস্থার কত রকম রুচি ও প্রকৃতির কত রকমের বিচিত্র মানুষেব জীবন।

শীত নেমে এসেছে। মাঘেব শীত বাঘের শীত।

লম্বা অলস্টার গায়ে চাপিয়ে বেলা প্রায় ন-টার সময় বিনোদ বাগানেব গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াতে পোয়াতে রাস্তায় গাড়ি আর লোক চলাচল দেখছিল—পঙ্কজ গলি থেকে বেরিয়ে বাসের জন্য দাঁড়িয়েছে দেখে ডেকে বলে, শোনো—

পঙ্কজ এলে বলে, আমি তো বাবা বড়ো একটা বিপদে পড়ে গিয়েছি।

পঙ্কজ ভাবে, সর্বনাশ ! তার কি দু-চারমাস জেল খাটা দরকার হবে ?

বিনোদ বলে, মহেশ্বরবাবু তো কোনোদিকে না তাকিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের দুদিন আগে মোটে খবর পেলাম। তখন আর কী করা যায় বলো ? বিয়েটা পণ্ড করা, একটা কেলেঙ্কারি করা—

পঙ্কজ বলে, দেরি হয়ে যাবে। একটু তাড়াতাড়ি বলুন।

বিনোদ রেগে যায় কিন্তু রাগ সামলে বলে, বিধুভূষণ কি বালিগঞ্জে বাড়ি কবার জন্য এ বাড়ি বেচেছিল হে ? বাড়ি না বেচলে তার উপায় ছিল না। দেনার দায়ে জেলে যেতে হত।

আমি তার কী করব বলুন ?

তুমি ওদের বাড়ি যাওয়া আসা করো কিনা—

সে তো আমি সবার বাড়িতেই করি। আপনার বাড়িতেও যাই আসি।

দূর থেকে একটা বাস আসছে দেখে পঙ্কজ রাস্তার ওপারে সরে গিয়ে দাঁড়ায়।

তার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে থেকে বিনোদ ভাবে, খাঁটি ছেলেরা কি চিরকাল পাগল হবে ? কী আপশোশ ! কী আপশোশ !

কিন্তু এত বড়ো দুঃসংবাদটা মহেশ্বরকে না জানিয়েই বা পারে কী করে বিনোদ ?

মহেশ্বর এখনও তার বাড়িতে দেখা করতে আসেনি। সুতরাং তার বাড়িতে নিজের যাওয়াও সম্ভব নয় বিনোদের। অগত্যা সে পাড়ার যত চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় সকলকেই জানিয়ে দিতে থাকে যাতে পাঁচজনে বলাবলি করতে করতে খবরটা পৌঁছে যায় মহেশ্বরের কানে।

সদাশিব খবরটা জানায় মহেশ্বরকে।

ছড়ি ঘুড়িয়ে বেড়াতে যাবার পথে মহেশ্বরকে বাইরের বারান্দায় বসে থাকতে দেখে বলে, নমস্কার, ভালো আছেন ?

আছি এক রকম। আপনার খবর ভালো ? আসুন বসুন।

না আর বসব না, একটু বেড়িয়ে আসি। মেয়ে বুঝি শ্বশুরবাড়ি ?

হ্যাঁ।

বড়োই দুঃখের বিষয় হল, ভদ্রলোক এমন করে আপনাকে ঠকালেন ! আমরা তাই বলাবলি করছিলাম, একটা মানুষ দেশছাড়া হয়ে এসেছেন, তার সঙ্গে এমন জুয়াচুরি করা কি উচিত ?

কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না তো ?

বিধুবাবুর কথা বলছি—-আপনার বেয়াই বিধুবাবু। ছেলের বিয়ের আগে পর্যন্ত কী কৌশলে গোপনে রেখেছিল ব্যাপারটা, কাকপক্ষী টের পায়নি ! দেনার দায়ে পথে বসতে চলেছে জানলে তো আর আপনি মেয়ে দিতেন না ওর ঘরে।

মহেশ্বর আশ্চর্য হয়ে বলে, বিধুবাবুর দেনার দায় ? আমি তো কিছুই জানি না !

সদাশিব আশ্চর্য হয়ে যাবার ভান করে বলে, সে কী কথা মশায় ? সবাই জেনে গেল, আর আপনার নিজের মেয়ের শ্বশুর, তার এমন কীর্তিটা আপনিই জানলেন না ? বালিগঞ্জে বাড়ি করবেন বলেছিলেন বিধুবাবু—সব বাজে কথা। বাড়ি নিলাম হত, বেচে দেনা শোধ দিয়েছেন। একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকার ক্ষমতাও নেই—বড়োভায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

মহেশ্বর নীরবে শোনে। তার মুখের ভাবের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না।

সদাশিবের কথা শেষ হলে মহেশ্বর গম্ভীর মুখে বলে, উনি কোনো জুয়াচুরি করেননি।

বলেন কী !

বাড়ি বেচবার সময় ওনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবার কোনো কথাই ওঠেনি। আমাকে ঠকাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দেনার দায়ে বাড়ি বেচতে হলে মানুষ কী খবরটা ঢাক পিটিয়ে বেড়ায় ? আপনিও গোপন করতেন। আমি ছেলে দেখে মেয়ে দিয়েছি, বাপের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে যাইনি। কাজেই আমাকে ঠকালেন কোথায় ? তিনি অতি সজ্জন ব্যক্তি।

সদাশিব আর কথা বলতে পারে না।

মহেশ্বর বলে, এতকাল প্রতিবেশী ছিলেন, আপনারা মিথ্যে দুর্নাম রটাচ্ছেন মানুষটার !

সদাশিব চটে লাল হয়ে বেড়াতে যায় !

কিন্তু কথাটা তুচ্ছ করার মতো নয়।

সদাশিবকে মহেশ্বর মুখে যাই বলুক মনে মনে সে বিধুভূষণকে একেবারে রেহাই দিতে পারে না।

তার আর্থিক দুরবস্থার কথা জানলেও সমীরের চাকরি ইত্যাদির হিসাব ধরে তার হাতে মহেশ্বর মেয়ে দিত কিনা সেটা আলাদা কথা। বিধুভূষণ তো জানত যে তার অবস্থার হিসাবটাও মহেশ্বর ধরেছে সম্বন্ধ ঠিক করার সময়।

বালিগঞ্জে সে বাড়ি করবে এ কথাটা আগে অন্যভাবে বললেও কথাটা যে মহেশ্বর বাতিল করেনি এটাও তো খেয়াল ছিল বিধুভূষণের।

বিধুভূষণ অন্যায় করেছে শুধু এটাই বড়ো কথা নয়। বিয়ে যখন হয়ে গেছে আর ফিরবে না। সুরমাকে কত কষ্ট ভোগ করতে হবে ভেবে সকলের দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না।

মেয়েজামাই ফিরে এলে মহেশ্বর সুরমাকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে।

সুরমা জানায় কথাটা মিথ্যা নয়। দেনার দায়েই এই বাড়ি বেচতে হয়েছিল বিধুভূষণকে এবং সম্প্রতি বাড়ি তৈরি করার সাধ্য তার নেই।

তবে তার বড়োভাই ফণিভূষণের অবস্থা ভালো। তাবা লোকও ভালো। তারা অবস্থার উন্নতি করার জন্য চেষ্টা করবে, সে সুযোগ দেবার জন্য ফণিভূষণ দু-একবছর বিধুভূষণের পরিবারকে আশ্রয় দেবে। কেবল সমীরের আয়ের উপর নির্ভর করতে হবে না।

শুনে সকলে খানিকটা স্বস্তিবোধ করে।

কিন্তু বেশি দিনেব জন্য নয়।

আরেক পূজার দিন ঘনিয়ে আসে।

মহেশ্বর একদিন একটি চিঠি পায় বিধুভূষণের।

শুভ সংবাদ। সুরমার সন্তান হবে জানা গিয়েছে।

পরদিন মহেশ্বর মেয়েকে দেখতে যায়। বিধুভূষণকে অনুরোধ জানায় যে সুরমাকে কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যেতে চায়, বাড়ির মেয়েরা তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

পুজোর সময় অবশ্য সে যাবে। তখন ভারী মাস হবে সুরমার, একবারে বাপের বাড়িতেই থেকে যাবে। কিন্তু এখন কয়েকদিনের জন্য সুরমা একটু বেড়িয়ে আসবে।

বিধুভূষণ বলে, ছেলে বাড়ি আসুক, বলব। ওই গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

আপিস থেকে কখন ফেরে সমীর ?

তার কিছু ঠিক নেই। কোনোদিন দশটা হয়, কোনোদিন এগারোটাও বাজে। চাকরিতে ওর মন নেই, ব্যাবসা করার ইচ্ছা। ওই সব ব্যাপার নিয়ে মেতে আছে।

পরদিন সন্ধ্যার পর সমীর আসে। একা।

মহেশ্বর বলে, সুরমাকে আনলে না ?

ক-দিন বাদে আনব। আমি একটু কাজে এসেছি।

তার গম্ভীর অন্যমনস্ক ভাব দেখে মহেশ্বর অস্বস্তি বোধ করে।

কী কাজ ?

আপনার সঙ্গে দরকারি কথা আছে।

শুনে রীতিমতো ভয় করে মহেশ্বরের।

চা খেয়ে নাও। খারাপ সংবাদ নয় তো ?

না।

চা জলখাবার খেতে খেতে সমীর সুভাগিনীর কথার ছাড়া ছাড়া জবাব দেয়, সাধনের আলাপ করার চেষ্টা তার অন্যমনস্কতার জন্য ভেস্তে যায়।

খাওয়া শেষ হলে মহেশ্বর বলে, কী বলছিলে বলো। এরা কি চলে যাবে ?

এতক্ষণ সে গড়গড়া টানছিল। এখন নলটা নামিয়ে রাখে।

সমীর বলে, এদের যাবার কী দরকার। গোপন কথা কিছু নয়।

মহেশ্বর প্রতীক্ষা করে।

সমীর ধীরে ধীরে বলে, আমাকে হাজার দশেক টাকা ঋণ দিতে হবে। এক বছরের মধ্যে শোধ করে দেব।

ঘরে যেন বজ্রপাত হয়। সবাই নির্বাক হয়ে থাকে।

সমীর বলে, আমি অনেকদিন থেকেই ব্যাবসা করার কথা ভাবছিলাম। সামান্য মাইনেতে চাকরি করে কোনো লাভ নেই। বাবা নিজের দোষে লাখখানেক টাকা নষ্ট করে বসেছেন—বাবার আর কিছু নেই। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমাদের আগেকার অবস্থা ফিরিয়ে আনব। কীভাবে কী করব এতদিন বিচার বিবেচনা করছিলাম। কয়েকটা যোগাযোগ হয়েছে, সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি। আজকাল কতগুলি ব্যাবসা আছে, সাহস করে লাগতে পারলে এক বছরে লাল হয়ে যাওয়া যায়।

সমীর দু-একজন উচ্চপদস্থ লোকেব নাম করে। কীভাবে নানা ব্যাবসায়ে আজকাল মুনাফার পাহাড় জমানো যায় তার সাধারণ বিবরণ দাখিল করে।

বলে, টাকা ফিরিয়ে দিতে আমার এক বছরও লাগবে না।

সাধন বলে, তুমি যা বললে তার মানে তো দাঁড়ায় তুমি চোরাকারবারে নামতে চাইছ।

আমি পয়সার জন্য কারবার কবতে নামব, সেটা চোরাকারবার না খোলাকারবার অত দেখলে চলে না।

সুভাগিনী বলে, সে কথা যাক গে। কিন্তু আমরা অত টাকা কোথায় পাব বাবা ? জলের দরে সব বেচে দিয়ে এসেছি—

মহেশ্বর বলে, এক বছরের মধ্যে ফিরে পাব জানলে দশ হাজার টাকা আমি তোমায় দিতে পারি। কিন্তু চোরাকাববার করার জন্য আমি তো টাকা দেব না বাবা। তুমিই বা এদিকে যাচ্ছ কেন ? এ দুর্বুদ্ধি তোমার কেন হল ? সৎ পথে থেকে শাকভাত খাওয়া ভালো তবু অসৎ পথে পা দিতে নেই। তোমার ভালোর জন্যই বলছি, মরীচিকার পিছনে ছুটো না। এভাবে কোটি টাকা করেও জীবনে সুখী হতে পাববে না।

সমীর বলে. চোরাকাববার ? আপনার ছেলে বলল বলেই কি আমি চোরাকারবারে নামছি ? আপনি গিয়ে খাতাপত্র দেখে আসবেন।

মহেশ্বব জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যাবসা কববে তুমি ?

সমীব জবাবে বলে, আপনি টাকা দিতে পারবেন কিনা বলুন।

মহেশ্বর চুপ করে থাকে।

অন্য কেউ কোনো কথা কয় না।

সমীর বিদায় না নিয়েই শ্বশুববাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

সাধন বলে, মদ খেয়ে এসেছে। গন্ধ পেলাম।

মহেশ্বর বলে, মা ! মাগো !

পরমেশ্বর বলে, তোমাদের সবাইকার দেখছি নাড়ি ছাড়ার অবস্থা। মদ যদি খেয়েই থাকে—কত বড়ো আশার কথা যে একটি আবোল-তাবোল কথা বলেনি !

মহেশ্বর কপাল চাপড়ে বলে, মদ খেয়েছে, তবু আশার কথা ?

পরমেশ্বর বলে, মদ কী ও নিজের ইচ্ছায় খেয়েছে ? ওর কি শখ আছে মদ খাবার ? বেচারা শুধু টাকা চায়। মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার করে টাকা পেলে ও বেচারা মাতালদের গালাগালি দিত।

সুভাগিনী বলে, রাগ করে গেল, মেয়েকে আর আসতে দেবে না। পরমেশ্বর ভরসা দিয়ে বলে. না, ও সব করবে না। ও ছেলের প্রতিভা আছে, ও রকম সস্তা চালের দিকে যাবে না।

দেখা যায়, তার কথাই ঠিক। পরের শনিবার বিকালে সমীর সুরমাকে নিয়ে আসে, বোঝা যায় নিজেও শনি রবি দুদিন থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

বলামাত্র রাজি হয়ে যায়।

টাকা পায়নি বলে রাগ করেছে মনে হয় না তার ব্যবহার দেখে। শুধু একটু বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে থাকে।

তার চিন্তিত অন্যমনস্কভাব বিচলিত করে দেয় মহেশ্বরকে। জীবনে উন্নতি করবে, নিজের পথে উপরে উঠবে, সে জন্য সাহায্য চেয়েছে জামাই। টাকা দান চায়নি—চেয়েছে ঋণ। এক বছরের মধ্যে ফিরিয়ে দেবে। টাকা না পেয়ে রাগ করেনি, সম্পর্ক তুলে দেয়নি, শুধু অভিমান করে আছে।

বড়োই অস্বস্তি বোধ করে মহেশ্বর। মনে হয় মেয়ে-জামাই দুজনের কাছে সে মস্ত অপরাধ করেছে।

সুরমাকে সে বলে, দশ হাজার টাকা কোথায় পাব ? ক্ষমতা থাকলে চোখকান বুজে দিয়ে দিতাম। এক পয়সা আসছে না ঘরে, অথচ খরচের অন্ত নেই।

সুরমা বলে, এক কাজ করলে তো পার ? তোমারও তো আয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে—তুমিও ওর সঙ্গে ব্যাবসা শুরু কর না ? টাকা ধার না দিয়ে এইভাবে দাও—তুমি থাকলে সামলে সুমলে চলতে পারবে। নিজে হাজার আষ্টেক টাকা জোগাড় করেছে, বাকি টাকা ধার না পেলে একজনকে পার্টনার করে ব্যাবসায়ে নামবে। তুমিই নেমে যাও না ?

মহেশ্বর দুঃখ আর দুশ্চিন্তার মধ্যেও হাসে, তুই পাগল হয়েছিস সুরমা। এই বয়সে আমার ধাতে কী ও সব পোষায় ? সমীরের সঙ্গে ব্যাবসায় নামা ? দুদিনে আমাদের মধ্যে ফাটাফাটি হয়ে যাবে।

সাধন বলে, আমি নামতে পারি।

তোর পড়াশোনা নেই ?

কী হবে পড়াশোনা করে ? এই তো চাকরির বাজার। পাস-টাস করে চাকরি জোগাড় করতে করতে তোমার হাতের টাকা যাবে ফুরিয়ে। তার চেয়ে রোজগারের চেষ্টায় নেমে পড়াই ভালো।

ভবিষ্যতে দৃষ্টি চলে না—কী হবে জানা নেই, সব অন্ধকার। সবসময় চাপ দিচ্ছে এই দুর্ভাবনা। চব্বিশ ঘণ্টা নিদারুণ উৎকণ্ঠার পীড়ন চলেছে যে একটা কিছু করতেই হবে।

একেবারে দুঃস্থ হয়ে যারা এসেছে তাদের এই বিশেষ দুর্ভাবনার বালাই নেই—নিঃস্ব হয়ে পথে বসার দুশ্চিন্তা আর তাদের করতে হয় না। গাছতলা আশ্রয় যে করেছে তার আর গাছতলা সার করার ভয় কী।

কে জানে, সমীরের সঙ্গে ভাগ্য মেলালে হয়তো তাদের কপাল ফিরেও যেতে পারে ! সমীরের উৎসাহ আছে, শেয়ারের কারবারে বাপের অভিজ্ঞতারও সে অংশীদার।

কিন্তু সাধন পড়া ছেড়ে দেবে—এটা ভাবতেও সকলের মন বড়োই খুঁতখুঁত করে।

মহেশ্বর বলে পরমেশ্বরকে, সাধন তো পড়া ছেড়ে ব্যাবসা করতে চায়—সমীরের সঙ্গে।

সে তো চাইবেই। ওর ছিল শখের পড়া—এ অবস্থায় কি আর পড়ায় মন বসে ?

মন স্থির করতে পারছি না।

সে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে বড়োভায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

পরমেশ্বর একটা কথা বললেই তার মন স্থির হয়ে যায়—কিন্তু পরমেশ্বর সোজাসুজি কিছুই বলে না।

পূজা করার ব্যাপারে, সংসারের ব্যাপারে তোমার মন স্থির করতে অসুবিধা হয় না—এ সব ব্যাপারে কেন অসুবিধা হয় জানো ? এ সব নতুন ব্যাপার—মন স্থির করার নিয়মনীতি জানা নেই, অভ্যাস নেই। ভেবেচিন্তে বিচার-বিবেচনা করে একটা কিছু ঠিক করে ফেলো।

এগারো

ডোবার মতো পুকুরটির ও পাশের বস্তিতে আশ্বিনের রাত্রি ভোর হবার অনেক আগেই জিতুর ঘুম ভেঙে যায়।

নরকযাত্রার তাগিদে।

মিউনিসিপ্যালিটির মেথররা দশ দিন ধর্মঘট করেছে।

আবছা আঁধারে দু-একটা ডানপিটে পাখির ডাক শুনতে শুনতে জিতু ঘাটের দিকে এগোয়, জানা গাছটা থেকে আন্দাজে একটা দাঁতন ভেঙে নেয়।

শুকোতে শুকোতে পুকুরটার জল বর্ষার আগে একেবারে নীচে গিয়ে ঠেকে, তালগাছের গুঁড়ির ঘাটটাও ধাপে ধাপে নেমে যায়—খাড়া ঢাল বেয়ে সাবধানে নামতে হয়।

বর্ষার পর এখন পুকুরটা কানায় কানায় ভরা। এখন তবু পুকুর মনে করা যায় এবং জলটা ব্যবহার করতে ঘেন্না হয় না।

তালের গুঁড়িটার উপরে এসে দাঁড়াতে নতুন একটা দুর্গন্ধ জিতুর নাকে লাগল।

দুর্গন্ধের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কলকাতার গায়ে লাগানো গেঁয়ো পাড়ায় তার সাতপুরুষের বসবাস। চারিদিকে কারখানা ঘিরে ফেলেও বহুকাল যা করতে পারেনি, এবার যুদ্ধের বাজারটা তাই করে দিয়ে গেছে। পাড়ার এই অংশটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বস্তি। নিজের নাক দিয়ে চেখে চেখে সে জেনেছে জগতে কত রকমারি দুর্গন্ধ আছে—শুকনো, ভাপ্‌সা, গরম, ঘন, পাতলা, তীক্ষ্ণ, ভোঁতা কতই যে তার বৈচিত্র্য।

রকমারিতে সুগন্ধ তার কাছে দাঁড়ায় কোথায়। ফুল, চন্দন, ধূপ, এসেন্স সব গন্ধই প্রায় একরকম, একঘেয়ে।

ঘাটের এই দুর্গন্ধটা অদ্ভুত রকমের নতুন, আগে যেন কখনও শোঁকেনি জীবনে। গা-টা কেমন ঘিনঘিন করে ওঠে, দম আটকানো অস্বস্তি জাগে।

এ ভাবটাই যেন মনে পড়িয়ে দিতে চায় গন্ধটাকে তার। আরও একবার কী চেনা হয়েছিল তার এই বীভৎস ভারী গন্ধটার সঙ্গে ?

তাই বটে, ঠিক ! মন্বন্তরের সময় একদিন শহরতলির স্টেশনের দিকে হেঁটে যাবার সময় ঝাঁটার শলার গরম ঝাপটার মতো দুর্গন্ধটা তার নাকে লেগেছিল। চেয়ে দেখেছিল পথের ধারে গাছতলায় ফ্যানমাখা মগটা আঁকড়ে ধরে একটা প্রায় পচা-গলা দেহ পড়ে আছে মানুষের।

ভালো করে তাকিয়ে জিতু বুঝতে পারে তালের গুঁড়ির কাছেই কিছু একটা ভাসছে। অর্ধেক স্থলে, অর্ধেক জলে।

এটাও দেহ টের পেতে দেরি হয় না। চমক দেওয়া রাশভারি দুর্গন্ধটাও যে ওটা থেকে আসছে অনুমান করে নেওয়া যায়।

কষা দাঁতনটা চিবোতে চিবোতে অনিচ্ছুক পদে ফিরে গিয়ে জিতু তার টর্চটা নিয়ে আসে।

আলো ফেলে দেহের মুখটা দেখে বলে, রাম রাম !

খানিকক্ষণ সে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তোর শেষে এই গতি হল ছুঁড়ি ?

জিতু নিজেকে শুনিয়ে বলে।

সবার চেনা সেই পাগলি মেয়েটা। পনেরো-ষোলোবছরের বেশি বয়স হবে না, হাত-পাগুলি কাঠির মতো সরু। কোথা থেকে এসেছিল কেউ জানে না, বছরখানেক এই এলাকায় কুড়িয়ে কুড়িয়ে

খেয়ে ঘুরে বেড়িয়ে যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। আজ এ পাড়ায় দেখা গেলে কাল ও পাড়ায় দেখা যেত।

কার ঘরের কাছে মরে পড়েছিল। রাতারাতি তুলে ডোবায় এনে ফেলে দিয়ে গিয়েছে দুর্গন্ধ এড়াবার জন্য।

কুকুর বিড়ালের মৃতদেহ যেমন দূরে ফেলে দেয়।

ডোবার জলটা আজ আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না।

তারপর তাড়াতাড়ি ভোর হয়। এমন ঘটনার পর শেষরাত্রি আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে।

আলো ফুটতে থাকে এমন উজ্জ্বল ও সুন্দর যেন স্বর্গ সত্যই ফুটো হয়ে জ্যোতি ঝরে পড়ছে পৃথিবীতে।

পাখিরা পর্যন্ত গান ধরে দেয়।

বস্তির মেয়েপুরুষ ঘাটের ধারে এসে একবাক্যে বলে, কী সর্বনাশ !

সরলা বলে, এটা কার কীর্তি জানতে পেলে একচোট নিতাম।

সরলার মুখকে সবাই ভয় করে।

নালিশের কারণ ঘটলে সে যদি একবার লাগসইভাবে মুখ খুলতে পারে কারও সাধ্য থাকে না তাকে হার মানায়—ব্রিটিশ ফৌজ এসেও বোধ হয় পারবে না।

পরেশ বলে, ঘোষদের পুকুর ছাড়া আজ আর গতি নেই।

ভাগ্যে এটা বর্ষাকাল ! খানিকটা হেঁটে এগিয়ে যেতে হবে, অসুবিধার সীমা থাকবে না, তবু বর্ষাকাল বলেই ডোবাটার জল কামড়াবে না আশা করা যায়।

বুনো বলে, ওটা পড়ে থাকবে ওইখানে ?

বুড়ি রাধা বলে, ক-দিন চলবে ঘোষেদের ডোবা দিয়ে ?

পাঁচির মা বলে, তা বললে কী হবে। শুদ্ধ করে নিতে হবে না এ পুকুরটা ?

গোষ্ঠ বলে, বস্তির কেউ শত্রুতা করেছে নিশ্চয়।

প্রতিবাদ ওঠে সমস্বরে।

হারাণ বলে, খেপেছ তুমি ? বস্তির লোক নিজের অসুবিধা ঘটাবে ?

ডুমুর বলে, বস্তির ধারে কাছে ছুঁড়িটাকে দেখিনি দশ-বারোদিন।

ডুমুরের শাশুড়ি বলে, সোনার কারবার করো, বস্তিতে তুমি থেকো না বাবু। শত্রুই দেখবে বস্তিতে !

গোষ্ঠ নিজের দুই কান মলে।

বলে, বস্তির লোককে বলিনি গো, লোককে বলিনি। বাইরের শত্রুর কথা বলেছি।

তাই বলো !

জিতু বলে, তুমি বরং এই ডোবাটুকু মাঠটুকু পেরিয়ে ও পাশে গিয়ে একটা পাকা বাড়ি তোলো গোষ্ঠদা, ওই বাড়িগুলির সাথে !

তোমার এ পাশে বুঝি তোমাদের বস্তি আর তোমার ও পাশে বাবুদের শহর ?

প্রায় সবার নজর ঘাটের দিকে। কোথা থেকে পরমেশ্বর কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল তারাও সকলকে ডেকেডুকে সচেতন করে দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। ঘরের মানুষ নয় বটে কিন্তু এ মানুষটা পরও নয়।

ডুমুরের আজকাল বনিবনা হয় না তার স্বামী অঘোরের সঙ্গে। তবু অঘোর যেন পিছন থেকে এসে ঘাটের দিকে গটগট করে এগিয়ে গেল ঘরের মানুষের মতো। তাতে যদি কারও আপত্তি না

হয়ে থাকে পরমেশ্বর ধীরেসুস্থে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে কয়েকটা বাজে বুনো ফুল তুলে নিয়ে গন্ধ পাবার চেষ্টা কবতে করতে এগিয়েছে বলেই তাকে পর মনে করা কেউ সম্ভব মনে করেনি।

ব্যাপার কী ?

জিতু বলে, দেখুন ব্যাপারটা একবার। সারা বস্তিতে দুটো কল, নামেই কল। মোট দশ বালতি জল হবে না !

তা বললে চলবে কেন। লোকের পেট ভবছে না—তোমরা বালতি ভরে না বলে নালিশ কববে !

জিতু একটু হাসে—তিক্ত হাসি।

ঘোমটা ফাঁক করে ডুমুর বলে, জল ছাড়াই চলবে বুঝি মোদের ? লোকে খেতে পায় না ছুতো করে মোদের জলটুকুও ফাঁকি যাবে।

জিতু বলে, আহা, উনিও তো সে কথাই বলছেন গো !

পবমেশ্বর বলে, মা টের পেয়ে গেছেন, এ ছেলে মায়ের সাথেও ইয়ার্কি দেয় !

মাখন বলে, এখন মোদের উপায় হবে কী ?

সুধীর বলে, বাবুদের বাড়ি বাড়ি দু-চাব বালতি জল চেয়ে আনা যাক।

পরমেশ্বর বলে, বাবুদেরও জলে একেবারে থইথই !

সে ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়।

বলে, ভগবান মাঝে মাঝে নিজের বুদ্ধিভ্রংশ করে মজা দেখেন। তোমরাও কি নিজেদের বুদ্ধি লোপ করে মজা দেখছ?

কী করব তাই তো ভাবছি !

তাকেই বলে বুদ্ধিভ্রংশ ! পুকুর ছাড়া গতি নেই, পুকুরটা নষ্ট হচ্ছে, গন্ধে মানুষ পাগল হচ্ছে—তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছ ! ক-জন কোমর বেঁধে পুকুর থেকে অন্তত তুলে আনো পচা জিনিসটা ? পরেব ব্যবস্থা পরে হবে।

জিতু বলে, তা যা বলেছেন ! অঘোব, মাখন—এসো দিকি ভাই হাত লাগাই।

পরমেশ্বর বলে, পুকুরে ওষুধ দিতে হবে। একজন ওষুধ আনবে যাও। ডুমুরের কানে বাজছিল পবমেশ্বরের কথাটা—পচা জিনিসটা !

হঠাৎ সে নত হয়ে পরমেশ্বরকে প্রণাম কবে।

সমীবেব সমস্যা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রমে ক্রমে। মহেশ্বেবর কাছে সে হাজার দশেক টাকা ধার চেয়েছিল ব্যাবসা করার জন্য।

এক বছরের মধ্যে সে তার পরিবারের আগের অবস্থা ফিবিয়ে আনবে, শ্বশুরের ধারও শোধ করে দেবে।

তাকে টাকা দিতে ভরসা পায়নি মহেশ্বব। সাধন পড়া ছেড়ে ব্যাবসা করার ইচ্ছা জানালে, সমীরের মতোই পরিবারের আগের অবস্থা ফিবিয়ে আনার জন্য বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীর পথে চেষ্টা করার ইচ্ছা জানালে তাকে প্রায় হাজার দশেক টাকা দিয়েই ব্যাবসায়ে নামতে দেওয়া হয়েছিল সমীরের সঙ্গে।

সমীরের পরামর্শে বাপভাইকে প্রস্তাবটা দিয়েছিল সুবমা। সমীরকে টাকা ধার দেবার কী দরকার ? মহেশ্বর নিজেই হাজার দশেক টাকা নিয়ে সমীরের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যাবসায়ে নেমে পড়ুক না।

সমীরকেও সে সামলে চলতে পারবে। মহেশ্বর নিজে না নেমে ভেবেচিন্তে সাধনকে নামিয়ে দিয়েছিল সমীরের ব্যাবসায়ে।

ছ-মাসের মধ্যে ব্যাবসা কোথায় গেছে, টাকা কোথায় গেছে কেউ হদিস পায় না। সাধন বলে, আমি কী করব ? কত রকম কথা যে বলে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বলে এখানে সই কর ওখানে সই কর—শেষে দেখি আমাদের সব টাকা তো গেছেই, ফার্মের নামে তিন-চারহাজার টাকা দেনা।

পরমেশ্বর বলে, তোর দুটো কান কেটে নেওয়া উচিত। সই করতে বলল আর ওমনি তুই সই করে দিলি ? কেন সই করছিস একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করলি না ?

সাধন ক্লিষ্টমুখে বলে, ব্যাবসাটা ওই চালাচ্ছে কিনা, আমি ভাবলাম...

তোরা ভেবে ভেবে ভাবুক হস বলেই ঠকিস। অত না ভেবে হাঁদার মতো জিজ্ঞাসা করলেই হত কেন সই করব ? হাঁদার মতো বুঝবার চেষ্টা করলেই হত সই করার মানেটা ?

তারপর অনেক ঘাটে জল খেয়েছে সমীর অল্পসময়ের মধ্যে। বিধুভূষণ এবং তার ঠিকানা পৃথক হয়ে গিয়েছে।

পরমেশ্বরের ভালো করে জানা ছিল না। আজ প্রথম জানতে পারে। অর্থাৎ তাকে জানতে হয়।

মহেশ্বর একখানা চিঠি দেয় তার হাতে। খামের চিঠি কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত।

সমীর লিখেছে তার বড়োই বিপদ, অবিলম্বে তার পাঁচশো টাকা চাই। আগের টাকার ব্যবস্থা এখনই করতে না পারলেও, এই টাকাটা সে দু-তিনমাসের মধ্যে শোধ দিয়ে দেবে।

বিশেষ ভণিতা নেই, দশটা অজুহাত খাড়া করবার চেষ্টা নেই, গাম্ভীর্যপূর্ণ সহজ স্পষ্ট দাবি জানিয়ে চিঠিখানা লেখা।

পরমেশ্বর একটু হাসে।

তুমি আমায় সংসারে জড়িয়ে ছাড়বে।

একটু না জড়ালে চলে না আর। একলা আমি—

বোঝা কমালেই পার !

মহেশ্বরের মুখ দেখে পরমেশ্বর হাসিমুখেই আবার বলে, যাক, যাক। চিঠি পড়লেই বুঝতে পারা যায় বাবাজি বিগড়ে গেছেন। আগে অনেকবার নিয়েছে, না ?

অনেকবার। আরও অনেকের কাছে ধার করেছে।

চিঠি লেখার ধরণ থেকে সেটা অনুমান করেছি। এ ব্যাবসায়ে বেশ পাকা হয়ে না উঠলে অনেকবার টাকা নেওয়ার পর এ রকম চিঠি লেখার ক্ষমতা হয় না—এ কায়দা সাধারণ লোকের খেয়াল হবার কথা নয়।

মহেশ্বর নিশ্বাস ফেলে বলে, বিপদের কথাটা মিথ্যা ?

ঠিক মিথ্যা নয়। টাকার খুব দরকার—এটাই ওর আসল বিপদ—অন্য কোনো বিপদ নেই। ভেবেচিন্তে বুদ্ধি খাটিয়ে চিঠিখানা লিখেছে। সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে হঠাৎ বিপদে পড়লে বাধ্য হয়ে যদি লিখত—সে চিঠিই হত অন্যরকম। লজ্জা দুঃখ ফুটে বেরোতো প্রত্যেক লাইনে—পড়লেই বোঝা যেত অনিচ্ছায় লিখেছে।

কী করা যায় ? এভাবে টাকা দিলে তো আরও পেয়ে বসবে ?

এক কাজ করো। পুজোয় ওদের আসতে লিখেছ—আজকালের মধ্যে তুমি নিজেই চলে যাও। বলবে, বিপদের কথা পড়ে ছুটে গিয়েছ—কী বিপদ কিছুই লেখেনি, কাজেই খুব ভাবনা হয়েছিল। বিপদের কথা একটা বানিয়ে বলবে—এ সব লোক মিথ্যা বলতে ওস্তাদ হয়। এবারের মতো টাকাটা

দিয়ো, ছেলে আর জামাই গোল্লায় গেলে খানিকটা ঝঞ্ঝাট পোয়াতেই হবে। কিন্তু খুব ভালো করে তোমার নিজের বিপদটা বুঝিয়ে দিয়ে এসো—ভবিষ্যতে আর যেন প্রত্যাশা না করে।

সুরমাকে নিয়ে আসব তো ?

আনবে বইকী।

রাত্রের গাড়িতেই মহেশ্বর কাশী চলে যায়।

বাড়িটা একটু থমথম করে সেদিনটা। পরদিন সে ভাব অনেকটা কেটে যায় বটে কিন্তু আরও গভীর হয়ে ঘনিয়ে আসে মেয়ে আর নাতি-নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে মহেশ্বর ফিরে এলে।

মহেশ্বরের মুখ শুকনো এবং গম্ভীর। সুরমার মুখ ম্লান এবং বিষণ্ণ।

সুরমার গালে কালশিটের মতো একটা লম্বা দাগ।

গালে কীসের দাগ দিদি ?

পরমেশ্বর বলে, তা দিয়ে তোমার কী দরকার ? ওর শখ হয়েছে কপালে টিপ না পরে গালে দাগ কেটেছে। বোকা মেয়ে কোথাকার।

প্রতিমা ম্লানমুখে বলে, সত্যি আমি বোকা !

পরমেশ্বর হেসে বলে, নিজেকে যে বোকা বলতে পারে সে কিন্তু সত্যি বোকা হয় না।

সুভাগিনী কাঁদো কাঁদো মুখে বলে, আমি আর মেয়েকে পাঠাব না।

সাধন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরমেশ্বর বলে, আলাপ-আলোচনাব ঢের সময় পাওয়া যাবে—খিদের সময় খেতে পেলে কাজ দেয়।

জামাই গোল্লায় যাচ্ছে এটা শুধু শোনা কথাই ছিল, এতদিন, এই কুৎসিত সত্যটার প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তিব মতো সুরমাকে সামনে উপস্থিত দেখে আর সমস্ত কথাই মন থেকে মুছে গিয়েছিল সকলেব। অথচ সোজাসুজি স্পষ্টভাবে জানবার সাহসও হচ্ছিল না কারও যে ব্যাপারটা ঠিক কতখানি গড়িয়েছে, কতদূর অধঃপাতে গিয়েছে সমীর।

আশা করার কী আছে কী নেই !

মহেশ্বর বাড়িতে ঢুকে সোজা নিজের পূজার ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করায় ভয় আর দুর্ভাবনা সকলের আরও বেড়ে গিয়েছিল।

পরমেশ্বর তাদের সংবিৎ ফিরিয়ে আনে। তখনকার মতো ভুলে যাবার চেষ্টা করা হয় সমীরের সমস্যা—এতক্ষণে নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে সুভাগিনী আদর শুরু করে।

সমীরের কাহিনি শোনা যায় সুরমার কাছে।

আগে পূজায় যখন বাপের বাড়ি এসেছিল —বিধুভূষণের দাদার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে কয়েক মাস থাকার সময় মাঝে মাঝে হঠাৎ সমীরের সঙ্গে এসে নানাছলে কিছু কিছু টাকা নিয়ে গিয়েছিল—তখনও সে শোনাতে পারত অনেক কিছুই। কিন্তু সেবার সে ঘুণাক্ষরে কিছু প্রকাশ করেনি—তার যে কপাল ভাঙছে, সমীরের স্বভাব যে খারাপ হচ্ছে, এ কথা একেবারে চেপে গিয়েছিল।

এমন ভাব দেখিয়েছিল যেন সে খুব আনন্দেই আছে স্বামীর কাছে।

সমীরের চেহারাটা খারাপ দেখাচ্ছিল কিন্তু তার কথাবার্তা চালচলন থেকে কেউ টেরও পায়নি ভিতরে তার ঘুণ ধরেছে, মানুষটাই সে যাচ্ছে বিগড়ে।

এবার সুরমা খুলেই বলে সবকথা।

পরমেশ্বর শুনতে চায়নি—নেহাত তাকে ডেকে এনে বসতে বলায় না শুনে উপায় থাকে না।

চাকুরে ছেলে, ভালো ছেলে দেখে অনেক টাকাপয়সা খবচ করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুবমার। তখন কল্পনাও করা যায়নি সেই ছেলে কোনোদিন এভাবে অমানুষ হতে পারবে। সমীরের বিগড়ে যাবার কাহিনি শুনতে শুনতে সকলের মুখেই বেদনার ছাপ পড়ে, শুধু নির্বিকারভাবে শুনে যায় পরমেশ্বর।

বছর দুই আগে চাকরি যায় সমীরের। তারপর থেকে সে খারাপ হতে আরম্ভ করে।

প্রথম অতটা বুঝতে পারেনি সুবমা। নানাকথা বলে দু-একখানা গয়না নিতে আরম্ভ করার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত টেরও পায়নি আসল ব্যাপারটা কী। এমনভাবে বানিয়ে বানিয়ে নানাকথা বলে সমীর তাকে ভোলাত।

পরমেশ্বর বলে, এখন সব ধাপ্পা ধরতে পার ?

সুরমা বলে, না। সব বিষয়ে ভোলায় না কি না—দশটা সত্যি কথার সঙ্গে দুটো মিথ্যে কথা মিলিয়ে বলে।

ওদের কায়দাই হল তাই।

চাকরির জন্য বা অন্য কোনো সদুপায়ে রোজগারের চেষ্টাও আব সমীর এখন করে না। তার মনটাই আর যায় না ওদিকে। এখন দিবারাত্রি তাব শুধু চেষ্টা কোথা থেকে কার কাছে কোন ফিকিরে টাকা ধার করবে, কাকে কীভাবে ঠকাবে।

দু-তিনজন বন্ধুকে সে নাকি এমনভাবে ঠকিয়েছে যে ইচ্ছা করলেই তাবা ওকে জেলে দিতে পারত। নেহাত বন্ধু বলেই তারা রেহাই দিয়েছে।

পরমেশ্বর বলে, এটাও ওরা হিসাব কষে। কে কোনদিকে কতটা দুর্বল হবে, কতটা ক্ষমা করবে, সব ঠিক করা থাকে।

সুরমা বলে, আমায় খুব মারধোর করে ভেবো না। এমনি ব্যবহার বরং ভালোই করে। হঠাৎ একদিন হাতের ছড়িটা দিয়ে গালে মেরে বসেছিল—সেই একবার।

পরমেশ্বর বলে, সেটা ভালো, তবু একদিন মেরেছে।

মহেশ্বর বলে, কী বলছ তুমি ?

পরমেশ্বর বলে, বলছি আমি ঠিক কথাই। ওর নষ্টামি হল চালাকিবাজি--ধূর্তামি। সব সময় হিসেব করে চলে, মানুষকে ভুলিয়ে ঠকায়। ভালো ব্যবহার করলে যদি সুরমার গয়না মেলে, ওর বাপের কাছে টাকা মেলে, মারধোর করার বদলে বরং হিসাব করে মিষ্টি ব্যবহার করবে। তার তো কোনো দাম নেই, সে তো শুধু ছলনা। একদিন শুধু হিসেব-টিসেব ভুলে ঝোঁকের মাথায় মেরে বসেছে—হৃদয়টা একেবারে অসাড় হয়ে যায়নি।

সুরমা বলে, আমি তো এভাবে ভাবিনি !

পরমেশ্বর বলে, এও একটা বিকার। এভাবে যারা বিগড়ে যায় তাদের সম্পর্কে সব চেয়ে ভাবনার কথা হল—সব রকম সেন্টিমেন্ট ধীরে ধীরে ভোঁতা হয়ে যায়। লজ্জাশরম মানঅপমান জ্ঞানও যেমন ঘুচে যায়, তেমনই মায়ামমতা রাগ অভিমান এ সবও থাকে না। কীসে নিজের স্বার্থটুকু সিদ্ধ হবে—তাই শুধু ভাবে আর নির্বিকার চিত্তে মতলব ভাঁজে।

শোধরাবে ? না সে আশা নেই ?

মহেশ্বর প্রশ্ন করে।

আশা আছে বইকী ! তবে শোধরানো খুব কঠিন।

তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে দাদা ?

পরমেশ্বর হাসে।

তুমি যা ভাবছ তা হবার নয় মহেশ্বর !

অনুতাপের সঙ্গে সবিতা চুপিচুপি সুরমাকে বলে, আমি সব শুনে ফেলেছি সুরমাদি। না শুনে পারলাম না, কাজটা ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। লাভের মধ্যে হল এই— মনটা খারাপ হয়ে গেল।

শুনে ফেলেছ, উপায় কী।

সংসারে কত রকম মানুষ থাকে। সুখে থাকতে কোনো বাধা নেই, তবু ইচ্ছা করে অসুখী হবে !

কিছু একটা ব্যাপার আছে নিশ্চয়।

ঠিক। আমারও তাই মনে হয়।

মনমরা হয়ে থাকবার এত বড়ো কারণ থাকলেও বাড়িতে পূজা থাকায় বাড়াবাড়িটা সম্ভব হয় না। নতুন জায়গায় নতুনভাবে পূজার সব আয়োজন করা সহজ ব্যাপার নয়, বাড়ির মেয়েপুরুষ সকলকেই কোমর বাঁধতে হয়।

কেবল তাই নয়। পাড়ার কয়েকজন ছেলেমেয়েও আয়োজনে মেতে যায়।

ফলে বাড়তি হইচই হয় অনেক। সুরমা পর্যন্ত টের পায় না কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়— রাত্রে শ্রান্ত দেহ নিয়ে বিছানায় কাত হলে কোথা থেকে ঘুম এসে অচেতন করে দেয়।

রেশন কার্ড করা হয়েছে সকলের। কিন্তু রেশন আনবার অন্য লোক থাকায় পরমেশ্বর আর দোকানে যায় না। যারা ধরে নিয়েছিল রেশন আনতে গিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে হাসি-তামাশা করাটা তার একটা নেশা, আড্ডাবাজ মানুষের আড্ডা বাদ দেবার মতো সপ্তাহে একদিন রেশনের দোকানে গিয়ে ফষ্টিনষ্টি বাদ গেলে তারই পেট ফুলে যাবে—দেখা যায়, তাদের ধারণা ভুল।

রেশনের দোকানে না গেলেও পরমেশ্বরের দিন দিব্যি কেটে যায়।

সকালবেলা অন্য কাজ সেরে দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় বরং তাকে ডেকে নিতে হয় রেশনার্থীদের মধ্যে।

বরুণ বুটির কুপন লিখতে লিখতে মুখ তুলে অনুযোগ দিয়ে বলে, আমাদের যে একেবারে ভুলে গেলেন ঈশ্বরবাবু !

আদিত্য বলে, আপনি না এলে রেশন নেওয়াটাই যেন জমে না মশায়।

রবীন্দ্র বলে, আসেন না কেন ? অন্যেরা রেশন নিয়ে যাবে, আপনি সঙ্গে এসে শুধু দাঁড়াবেন, দুটো কথাবার্তা কইবেন, ব্যাস !

রেণুকা আজও উপস্থিত ছিল।

তার দিকে চেয়ে পরমেশ্বর সকলকে শুনিয়ে বলে, কী জানেন, ভয়ে আসি না। আমার বয়সটাই দেখছেন, আসলে মানুষটা আমি ভারী ছেলেমানুষ। উনি সেদিন যে রকম ধমকে দিলেন, তারপর আর সাহস হয় না আসতে !

সকলে হেসে ওঠে।

কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করে রেণুকাও সে হাসিতে যোগ দেয়।

বলে, আপনি সত্যি অদ্ভুত মানুষ !

পরমেশ্বর হাসিমুখে বলে, দেখুন, আপনাকেও হাসিয়ে ছেড়েছি। হাসতে হয়। ভগবান আছেন কী নেই জানি না, হাসতে জেনে হাসব না কেন ?

বারো

পূজার কয়েক দিন আগে সমীর আসে।

চেহারাটা খারাপ হয়েছে। দেখে মনে হয় কোনো অসুখে ভুগছে। তাছাড়া তার বেশভূষা কথাবার্তা চালচলন দেখে সহজে বুঝবার উপায় নেই মানুষ হিসাবে সে কতখানি নেমে গেছে।

সহজে বুঝবার উপায় নেই, কিন্তু বোঝা যায়।

সাধারণ কথা ব্যবহার তার প্রায় আগের মতোই আছে। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে টের পাওয়া যায় সর্বদাই তার যেন কী একটা অস্বস্তি চাপবার চেষ্টা, সাধারণ স্বাভাবিক চিন্তাভাবনার আড়ালে যেন তার একট' গোপন দুশ্চিন্তা সর্বদা সক্রিয় থেকে চাপ দিচ্ছে।

পরমেশ্বর বলে, তুমি ইচ্ছে করলে আর চেষ্টা করলে বড়ো হতে পারতে—অনেক বড়ো হতে পারতে।

সমীর যেন চমকে ওঠে !

অনেকে বড়ো হতে চায়, হাজার চেষ্টা করেও পেরে ওঠে না। তাদের শুধু ইচ্ছাটাই থাকে—ইচ্ছাপূরণের জন্য যে গুণগুলি দরকার সেগুলি থাকে না। তোমার সবগুলি গুণ ছিল—বেশি পরিমাণে ছিল। চেষ্টা করলে তুমি যে কোথায় উঠতে পারতে তুমি নিজেও কল্পনা করতে পারবে না।

সকলে অবাক হয়ে শোনে।

সকলের সামনে সমীরের এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা—যে গোল্লায় গেছে বলেই ধরে নিয়েছে সকলে, নিন্দা করার বদলে তার গুণকীর্তন ! তার মতো অসাধারণ গুণের অধিকাবী খুব কম লোকেই হয়।

সমীর যে অধঃপাতে গেছে সে জন্য কী এতটুকু আপশোশ নেই পবমেশ্বরের ?

সমীর বলে, বড়ো হতে কে না চায় বলুন ?

পরমেশ্বর হাসিমুখে মাথা নাড়ে, সবাই চায় না। অনেকে সুখীই হতে চায় না, বড়ো হতে চাইবে ! সংসারে সকলে যাকে সুখ বলে অনেকের পুরোমাত্রায় সেটা ভোগ করাব সুযোগ থাকে। কিন্তু ও রকম সুখ তার ভালো লাগে না। সে ইচ্ছা করে চেষ্টা করে নানারকম দুঃখ এনে কষ্ট পায়—কষ্ট ছাড়া জীবনটা তার মনে হয় একঘেয়ে, আলুনি। তুমি ইচ্ছা করলেই বড়ো হতে পার, কিন্তু তুমি ওই ক্ষমতাটা অন্যদিকে লাগাতে চাও। বড়ো হবার সাধ তোমার নেই !

সমীর খানিক চুপ করে থাকে।

কোন দিক দিয়ে বড়ো হবার কথা বলছেন ?

টাকা-পয়সা মান-সম্ভ্রম প্রভাব প্রতিপত্তি—যেভাবে বড়ো হওয়াকে সংসারে বড়ো হওয়া বলে ! বড়ো নেতা হবার ক্ষমতা তোমার আছে।

প্রতিমা ফোড়ন কেটে বলে, এখনও আছে ?

এখনও আছে। কিন্তু ওই যে বললাম, যেটা তোমার আসল গুণ সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার দোষ।

কীরকম ?

তোমার একটু সমাজবিরোধী ঝোঁক আছে। ঠিক বিরোধী ঝোঁক নয়, সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতা। যারা বড়ো হয় সমাজ সম্পর্কে তাদেরও এক ধরনের উদাসীনতা থাকে—সমাজের সাধারণ চলতি নিয়ম-নীতি সম্পর্কে, সংস্কার সম্পর্কে। তারা অন্য মানুষের চেয়ে অনায়াসে ও সবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, ও সব তুচ্ছ করে দিতে পারে। কিন্তু সমাজ তাদের কাছে তুচ্ছ হয় না, সমাজের কাছে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য বিশেষ মাথাব্যথা নেই, বাইরের খোলসটা বাদ দিয়ে তুমি আসল ব্যাপারটা চট করে ধরতে পার—কিন্তু মুশকিল হল, এটা সমাজের দিকে আকর্ষণ না বাড়িয়ে তোমার মধ্যে জন্মিয়েছে

অবজ্ঞা। বাজে পচা একটা সমাজ, সমাজের জন্য তোমার টানও নেই, সমাজের কাছে সম্মান পাবাব ইচ্ছাও নেই।

প্রতিমা বলে, বিশেষ গুণ থাকা দেখছি বিপদ !

পরমেশ্বর বলে, বিপদ বইকী। বিশেষ গুণ থাকা মানেই তাকে আর সাধারণ মানুষ থাকতে দেবে না—বিশেষ দিকে টানবে, বিশেষ মানুষ করে তুলবে।

এর চেয়ে জামাইবাবু সাদাসিধে সাধারণ মানুষ হলেই বরং ভালো ছিল।

পরমেশ্বর সমীরের গোমড়া মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলে, তা কী জোর করে বলা যায় ? কতদিকে গতি নেয় মানুষের জীবন—কত কী ঘটতে পারে। আজ ইচ্ছা নেই—একদিন হয়তো বড়ো হবার জন্য সমীব পাগল হয়ে উঠবে !

পূজার খরচের জন্যই নগদ টাকাগুলি বাড়িতে এনেছিল মহেশ্বর। ব্যাংক বন্ধ হবার আগের দিন।

সকালে দেখা যায়, টাকা নেই। চুরি গেছে।

বাড়ির লোকেই যে চুরি করেছে তাতেও সন্দেহ করার কোনো কারণ থাকে না।

মহেশ্বর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

চুরি নিয়ে হইচই করার ভরসাও বাড়ির লোকে পায় না। নিচুগলায় শুধু আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে যে এখন কী কবা উচিত।

সমীর বাড়িতেই ছিল। আজ ভোরে সে বেড়াতেও বাড়ির বাইরে যায়নি।

পরমেশ্বর বলে, টাকা বাড়িতেই আছে। তবে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

কীরকম ?

সন্দেহ প্রকাশ করলেই জামাই ভীষণ চটে যাবে। সুটকেস বিছানা নিযে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। গায়ের জোর যদি খাটাতে পার তাহলেই টাকাটা পাওয়া সম্ভব।

তাই কী পারে মানুষ ?

আমিও তাই বলছি। সমীরও সেই হিসাব করেছে। শুধু সন্দেহ করে যদি চুপ করে থাক, ভালোই। যদি সন্দেহ প্রকাশ কর, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ পাবে।

সাধন বলে, সার্চ করব ?

সুভাগিনী বলে, না।

পরমেশ্বর বলে, বিপদ তো এইখানে। টাকা গেলে টাকা আসবে, জামাই গেলে আসবে না।

সুরমাকে প্রথমে কেউ জানায়নি।

বেলা একটু বাড়তে সকলের রকম-সকম দেখে তার মনে লাগে খটকা।

সে জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে ?

প্রতিমা বলে, বাবার টাকা চুরি গেছে।

শুনেই মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় সুরমার। সে যেন নিজেই চুরি করেছে টাকাগুলি !

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে সে খানিকক্ষণ ভাবে। তারপর ঘরে যায়। সমীর খাটে হেলান দিয়ে বসে কাগজ পড়ছিল।

আজ যে তুমি বেবোলে না ?

বেরোব। মামাব সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছি।

একান্ত নির্বিকার শান্তভাব সমীরের।

গায়ে তার গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি। অতগুলি টাকার নোট গায়ে কোথাও গুঁজে রাখা সম্ভব নয়।

সুরমা বলে, তোমার সুটকেসের চাবিটা দাও তো ?

কেন ?

একটু দরকার আছে।

কী দরকার ?

জামাকাপড়গুলি গুছিয়ে রাখব।

গোছানোই আছে।

চাবিটা দাও না তুমি। চাবি দিতে আপত্তি করছ কেন ?

তোমারই বা সকালবেলা হঠাৎ আমার সুটকেস খুলবাব কী দরকার পড়ল বলো না ?

তবু সুরমা শান্তভাবে সুটকেসের চাবিটা আদায করার চেষ্টা করে, কিন্তু চাবি সমীর দেয না।

তখন গম্ভীর হয়ে সুরমা বলে, বাবার টাকাটা দিয়ে যাও।

কীসের টাকা ?

তুমি যে টাকা চুরি করেছ।

দেখা যায়, পরমেশ্বর যা বলেছিল অবিকল সেই ব্যাপার ঘটে ! সমীর প্রথমে তামাশা বলে উড়িয়ে দেয় সুরমার কথাটা, তারপর রেগে আগুন হয়ে ওঠে !

এত বড়ো আস্পর্ধা তোমাদের ? আমায় চোর বলো !

সঙ্গে সঙ্গে উঠে সে বিছানা বাঁধতে আরম্ভ করে।

সুরমা বলে, টাকাটা না দিয়ে যদি যাও, এ জন্মে আমি তোমাব মুখ দেখব না। মনে করব আমি বিধবা হয়েছি।

সমীর কথা কয় না।

সুরমা বলে, বেশ, তুমি নাওনি টাকা। আমি ভুল বলছি। তুমি শুধু আমায সুটকেসটা খুলে দেখতে দাও। টাকা যদি না পাই—যে শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেব।

তবু সমীর কথা কয় না।

সুরমা বলে, খুলে না দেখালে সুটকেস নিয়ে তোমাকে আমি যেতে দেব না।

বিছানাব বান্ডিল বগলে নিয়ে সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে সে যাবার জন্য প্রস্তুত হলে সুবমা দুহাতে সুটকেসটা চেপে ধবে।

এত জোরে তাকে ধাক্কা দেয় সমীর যে সে ছিটকিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়।

সমীর গটগট করে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

আঘাতের বেদনা ভুলে সুরমাও বাইরে এসে চেঁচিয়ে বলে, সুটকেস নিয়ে যেতে দিয়ো না—কেড়ে নাও সুটকেসটা। দাঁড়িয়ে দেখছ কী তোমরা, কেড়ে নাও।

সমীর যেতে যেতে দাঁড়ায়। সুটকেসটা কেড়ে নেবার সময় ও সুযোগ দেবার জন্যই যেন খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে।

সাধন এক পা এগোতেই সুভাগিনী তার হাত চেপে ধরে ধমক দিয়ে বলে, সাধন ! মাথা খারাপ করিস না !

পুতুলের মতো সকলে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি তবে আসি।

বলে ধীরে ধীরে সমীর বেরিয়ে যায়।

পূজার জন্য টাকা দরকার।

অগত্যা সুভাগিনীর গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার করতে হয়।

ক্রমে ক্রমে টের পাওয়া যায়, কেবল শ্বশুরের কিছু টাকা বেদখল করেই সমীর বিদায় হয়নি, সে উদ্যোগী পুরুষ। যে কয়েকদিন এখানে সে ছিল তার মধ্যে অনেকের কাছ থেকে নানাছুতায় যা পেরেছে আদায় করে নিয়ে গেছে, পাড়ার লোককে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি।

আজ এ আসে কাল ও আসে। তাগিদ দিতে হওযার জন্য রীতিমতো সংকোচের সঙ্গে বলে, টাকাটা আজ দেবেন নাকি মহেশ্বরবাবু ?

কীসের টাকা ?

আপনার জামাই চেয়ে এনেছিল। বললে হঠাৎ দরকার পড়েছে, আপনার গোটা কুড়ি টাকা চাই, বিকেলেই দিয়ে দেবেন ?

ও, হ্যাঁ, একেবারেই ভুলে গেছিলাম। নানাহাঙ্গামায় মাথার ঠিক নেই।

লোকের কাছে মান বাচাতে আরও টাকা বার করে দিতে হয় মহেশ্বরকে।

পরমেশ্বর বলে, আগেই বলেছি ওর প্রতিভা আছে।

তেরো

বছর ঘুরে আবার পূজা এগিয়ে এল।

কিন্তু এবার পূজা হবে না মহেশ্বরের বাড়িতে।

সাতপুরুষের পূজা এবার বন্ধ থাকবে।

বিশ্বাস করতে প্রাণ চায় না কারও। কিন্তু প্রাণ না চাইলেও বিশ্বাস না করে উপায় নেই। বাস্তব কানে ধরে অনেক কিছুতে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ে।

মনে মনে সকলেই জানে এবার পূজা সত্যই হবে না। এ কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছা খেয়াল খুশির কথা নয়। সামান্যভাবে পূজা করার সাধ্যও এবার মহেশ্বরের নেই।

পুঁজি শেষ হয়ে গেছে। সুভাগিনীর গয়নাও নেই।

সাধনের কোনো উপার্জনের ব্যবস্থা হয়নি।

সাধনই ছিল শেষ আশা। তার যদি উপার্জন হয়, মা যদি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেন। কিন্তু গত পূজার পর শীত গেল গ্রীষ্ম গেল বর্ষা যাই যাই আর শরৎ আসি আসি করছে, আর করে ঘটবে সেই অঘটন।

বহু দিক দিয়েই জীবনটা শূন্য হয়ে গেছে। এ আবার ঘনিয়ে এল আরেক মহাশূন্যতা। সময় যখন আসবে প্রাথমিক আযোজন আর বিধিনিয়ম পালনের ব্যবস্থা আরম্ভ করার, কাজের চাপ ও বাড়ির সকলের ব্যস্ততা দিন দিন বেড়ে যাবে, যখন সময় হবে প্রতিমা আনবার এবং চারিদিক থেকে শব্দ শোনা যাবে ঢাকে কাঠি পড়ার, এ বাড়িতে মহেশ্বর পোড়া প্রাণ ধরে থাকবে কী করে ?

দিন দিন বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে আরও ঘনিবিড় বেদনার ছায়া নেমে আসে মহেশ্বরের। তার কথা কমে যায়। সে যেন ঝিমিয়ে পড়তে থাকে।

ভাগ্য তার মন্দ সব দিক দিয়েই। এবার চরমে উঠল দুর্ভাগ্য।

পরমেশ্বর বলে, দুর্ভাগ্য নয়, পরীক্ষা। আর কতকাল একভাবে টানবে ? এবার পালাবদলের পালা।

মহেশ্বর বলে, তুমি কোনো ব্যবস্থা করতে পার না ?

ব্যবস্থা বলে দিতে পারি। চাঁদা তুলে পূজা করো।

মহেশ্বর চুপ করে থাকে।

সাতপুরুষের একটানা পুজো !

সুভাগিনী মেঝেতে কপাল ঠোকে।

আগেকার তুলনায় এক রকম কোনো সমারোহই হয়নি গত দুবছরের পূজায়। তবু সে দিনগুলির কথা স্মরণ করলে, দিনগুলি এবার আর ঘুরে আসবে না ভাবলে এখন থেকেই বেঁচে থাকা যেন নিরর্থক হয়ে গেছে মনে হয়।

এদিক ওদিক কাছাকাছি আরও পূজা হয়। কিন্তু দুটি বদ্ধ গলি ও ফাঁকা জমিটুকু ঘিরে প্রায় ত্রিশখানা ছোটো বড়ো বাড়ি আর গা-ঘেঁষা ছোটো উদ্‌বাস্তু কলোনিটা নিয়ে তাদের এই ছোটো পাড়াটি ধরলে, এখানে শুধু তারই বাড়িতে পূজা হয়েছে গত দুবছর

তার ছোটো উঠানে সারাদিন ভিড় করে থেকেছে পাড়ার ছেলেমেয়েরা, বুড়োরা পুজোমণ্ডপের পাশে বারান্দায় আসর জমিয়েছে, ছেলেমেয়েদের সমবয়সি বন্ধুরা হইচই করে খেটেছে, মেয়ে বউ গিন্নিরা সকালসন্ধ্যায় এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আরতি দেখেছে।

এ বছর আলো জ্বলবে না, বাজনা বাজবে না, কেউ আসবে না তার বাড়িতে। ছোটো পাড়াটুকুও তার বাড়ির মতোই ডুবে থাকবে পূজাহীন নিরানন্দ অন্ধকারে।

সুরমা বলে, মা-বাবা মরবে নাকি দাদা ? কাল মাঝরাতে উঠে দেখি, দুজনে চুপচাপ জেগে বসে আছে। এত সর্বনাশ সইল, পুজোটা বন্ধ করা সইছে না ?

তার কাঁদো কাঁদো মুখের দিকে চেয়ে সাধন বলে, আস্তে আস্তে সয়ে যাবে। প্রথমবার কিনা, খুব কষ্ট হচ্ছে।

খবর শুনে তেতলা বাড়ির সদাশিব উল্লাসের সঙ্গে বলে, পুজো করবে না এবার ? আমি আগেই জানি। আরশোলার উড়বার শখ।.উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস, বেশ করেছিস, এত তোর লোকদেখানো বাহাদুরি কেন।

অনুগত দু-চারজন চুপ করে থাকে। অন্যেরা তার মন্তব্যে সায় দিতে পারে না।

পঙ্কজ বলে, এটা কী বলছেন সদাশিববাবু ? উনি কি বাহাদুরি দেখাতে পুজো করেন ? এটা ওনার ঠাকুর্দার আমলের পুজো।

পঙ্কজকে সদাশিব অত্যন্ত অপছন্দ করে। সে সাধনের বন্ধু, মহেশ্বরের পরিবারটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে, শুধু এ জন্য নয়। ছোকরা এই বয়সে পাড়ার মধ্যে খানিকটা নেতাগোছের হয়ে উঠেছে বলেও নয়। তাকে একেবারে খাতির করে না বলে, পাড়ার প্রতিপত্তি খাটাবার মস্ত বাধা হয়ে উঠেছে বলে।

মুখ বাঁকিয়ে সদাশিব বলে, ভিখিরির আবার ঠাকুর্দার আমল।

প্রৌঢ় রমেশ বলে, নিজের দোষে কী ভদ্রলোক ভিখিরি হয়েছেন ? তবু দুটো বছর চালিয়ে এসেছেন, পাড়ায় একটা পুজো হয়েছে।

দীনেশ বলে, লোকটির ব্যবহার ভালো। ছেলেরা কী সহজ গোলমালটা করেছে সারাদিন, কখনও বিরক্ত হননি। সকলকে ডাকা, খাতির করে বসানো, এ সব ত্রুটি হয়নি।

মহেশ্বরের প্রশংসায় সদাশিবের গা জ্বালা করে, কিন্তু উপায় কী। দেখা যায় পাড়ার অধিকাংশ লোকেরই এই অভিমত। মহেশ্বরের বাড়ি পুজো হবে না শুনে সকলেই কমবেশি দুঃখিত হয়েছে।

বাড়ির কাছে একটা পুজো হলে সর্বদাই বিশেষ একটা রং লাগে মনে, পুজোর দিন ক-টিকে যেন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আরও প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া যায়। একজনের বাড়ি পুজো হলে প্রতিবেশীরা হয় অংশীদার, ঘরোয়া শব্দ গন্ধ দৃশ্যের মতো পুজোকে অনেকটা নিজের করে পাওয়া যায়।

পাড়ার এই সার্বজনীন খেদটা অনুভব করে পাড়ার সার্বজনীন পুজো করার কথাটা গিরীনের মনে আসে।

ছোটো পাড়া, ব্যবসায়ী সদাশিব আর পেনশনভোগী বিনোদবিহারী ছাড়া সকলেই হয় মোটামুটি অবস্থার কিংবা গরিব মানুষ, চাঁদা তুলে দুর্গাপুজো করা কঠিন ব্যাপার।

কিন্তু সকলের যদি ইচ্ছা হয় উৎসাহ জাগে, অসম্ভব হবে না।

জোয়ানেরা কথা পাড়ামাত্র উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বড়োদের সঙ্গে কথা বলেও দেখা যায় যে পুজো হোক এটাই সকলের ইচ্ছা—যদি সম্ভব হয় !

সদাশিবের কাছে কথাটা পাড়তেই সে সায় দিয়ে বলে, ভালোই তো ! পাড়ায় একটা পুজো হবে, এ তো আনন্দের কথা। চাঁদায় যদি না কুলোয়, বেশি যা লাগবে আমি দেব।

তাকে এই উদারতার জের টানবার সুযোগ না দিয়ে গিরীন বলে, আমরা ভাবছিলাম মহেশ্বরবাবুকে প্রেসিডেন্ট করা হবে। পাড়ার সবাই সায় দেবে মনে হয়। উনি দুবছর পুজো করেছেন, এবার নেহাত দায়ে ঠেকে পারছেন না—

রমেশ বলে, পাড়ার লোকের মিটিংয়ে অবশ্য এ সব স্থির হবে। কথাটা আমরা ভাবছিলাম আর কী।

দেখা যায়, সদাশিবের উৎসাহ নিভে গেছে। সে এবার উদাসভাবে বলে, বেশ তো মিটিং ডাকা হোক, দেখা যাক কতদূর কী হয়।

তার মানেই তাই। সদাশিবকে প্রেসিডেন্ট করলে সে এগিয়ে আসবে, নিজে দায়িত্ব নিয়ে পূজা সম্পন্ন করবে। নইলে তাকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাকে প্রেসিডেন্ট করার মানেও সবাই জানে। সে গ্রাস করবে সার্বজনীন পূজাটা, নিজের একটা কীর্তিতে পরিণত করবে। যে সব বৃহৎ ব্যক্তিদের কল্যাণে তার চোরাকারবার চলে, নিজের নামে ফলাও করে নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে তার প্রভাব প্রতিপত্তির একটা প্রমাণ হিসাবে।

বাড়িতে হাজার ঘটা করে পূজা করলেও এটা হয় না। পয়সা আছে, পূজা করছে—তার মধ্যে প্রমাণ নেই পাড়ার লোকে তাকে কত খাতির করে !

শনিবার সন্ধ্যায় আলোচনা ও পরামর্শের জন্য পাড়ার লোকের একটা বৈঠক ডাকা হবে স্থির করে সাধনকে পঙ্কজ বলে, তোমাদের বাড়িতে হোক না ?

সাধন বলে, হোক।

সাধন সায় দেওয়ায় মহেশ্বরের মত নেওয়ায় কথাটা মনে পড়ে না পঙ্কজের।

সকালে ভবানী অমল আর সুরেশকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি খবর দিয়ে কাজে চলে যায়, বিকালে বাড়ি ফেরামাত্র ডাক আসে মহেশ্বরের কাছে।

প্রতিমা তাকে ডাকতে এসে বলে, বাবাকে এ পুজোর ব্যাপারে জড়ানো চলবে না।

পঙ্কজ বলে, সে কী ? আমি তো বিশেষভাবে ওঁকেই জড়াতে চাইছিলাম !

বাবার মন ভেঙে গেছে।

মহেশ্বরকে দেখেই সেটা টের পাওয়া যায়। শুধু মন নয়, শরীরটাও তার ভাঙবার দিকে চলেছে।

মহেশ্বর বলে, পোড়া ঘায়ে দাগা দিচ্ছ কেন বাবা ? তোমরা পুজো করবে, অন্য কোথাও বৈঠক ডেকে পরামর্শ করো।

পঙ্কজ বলে, আপনাকেও তো আমরা চাই। আমরা ভাবছিলাম আপনাকে প্রেসিডেন্ট করব।

সকরুণ হতাশার হাসি ফোটে মহেশ্বরের মুখে।

বাপ-ঠাকুর্দার পুজো বন্ধ কবলাম, তাঁরা আমায় স্বর্গ থেকে অভিশাপ দিচ্ছেন। এমন কুলাঙ্গার আমি, কোন মুখে তোমাদের পুজোয় প্রেসিডেন্ট হব ? না বাবা, আমায় রেহাই দাও। আমার জ্বালা বাড়িয়ো না।

সাধনের সঙ্গে কথা কয়ে পঙ্কজ টেরও পায়নি পূর্বপুরুষের দুর্গাপূজা বন্ধ করে দেবার জ্বালাটা সত্যই কত তীব্র হতে পারে। সাধন আর বুড়ো মহেশ্বরের পার্থক্যটা এখন সে বুঝতে পারে। সব গেছে মহেশ্বরেব কিন্তু তবু সে ভাবেনি সব শেষ হয়েছে। বছরকার পূজার পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে তাঁর কাছে বেঁচে থাকার মানেটাই শুধু শেষ হয়ে যায়নি, জীবনটা হয়ে গেছে ব্যর্থ, অভিশপ্ত।

মহেশ্বর আবার বলে, পুজোব ক-দিন আমি ঘর থেকেই বেরোব না। দরজা জানালা বন্ধ করে শুধু মাকে ডাকব স্থির করেছি।

সুভাগিনী কাছে দাঁড়িয়েছিল। পঙ্কজ চেয়ে দ্যাখে, তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

সাধন বলে, তুমি বড়ো বাড়াবাড়ি করছ বাবা।

পঙ্কজ বলে, তুই থাম।

সাধনের হাত ধরে টেনে নিয়ে সে বেরিয়ে যায়। কিছু বলার নেই, কিছু করার আছে কি না সন্দেহ। নিজের জীবন যেমন মহেশ্বরের কাছে আমাব জীবন, বাড়ির পূজাও তার কাছে তেমনই আমার পূজা। ঠাকুরদাদা তার বাপকে জন্ম দিয়েছিল আব দিয়েছিল এই পূজার দায়িত্ব। শিশুকাল থেকে বাপের কাছে এই জন্মগত দায়িত্বের মানে শিখেছে মর্মে মর্মে, বুড়ো বয়স পর্যন্ত নিজে পালন করে এসেছে দায়িত্ব।

নিজের বাড়ির নিজের এই পূজা ছাড়া আর সব পূজা তার কাছে মিছে।

মুখের কথায় বুঝিয়ে কী আজ তার চেতনা জন্মানো যায় যে তার এই হতাশা কাতরতার পিছনে আছে তারই হৃদয় মনের ক্ষুদ্র সংস্কার আর সংকীর্ণতা ?

নিজের পয়সায় নিজের বাড়িতে পূজা করতে পারবে না বলে মানুষেব দুর্গোৎসব পর্যন্ত মিথ্যা হয়ে যাওয়ার আব কোনো মানে হয় না ?

কোথায় ছিলাম আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদেব চোখের সামনে কীভাবে বদল হয়ে যাচ্ছে জীবন আর জগৎ। পরিবর্তিত জগতের এই বাস্তবতা যদি ঘরের পূজার শোক ভুলিয়ে দশে পূজায় অংশ নেবাব চেতনা না জাগাতে পেরে থাকে, কীসে তাব চেতনা হবে ?

সকালে হঠাৎ প্রতিমা তার কাছে আসে।

একটা কাজ করা যায় না ? আপনাদেব পূজাটা আমাদেব বাড়িতে করলে হয় না ?

উৎকণ্ঠায় কালো হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। পূজা বন্ধ হওয়ার জন্য তার যত না দুঃখ হয়েছে, বাপের চিন্তাতেই সে হয়ে পড়েছে কাহিল। এ ধাক্কা সামলে উঠে মহেশ্বর কি বাঁচবে ?

কিন্তু মিথ্যা আশা জাগিয়ে লাভ নেই পঙ্কজকে বলতে হয় যে সার্বজনীন পূজা কারও বাড়িতে করা যায় না। দশজনে সেটা মানবে কেন ?

প্রতিমা বলে, দশজনকে যদি বুঝিয়ে বলা যায় ? সবাই তারা পাড়ার লোক, বাবাকে ভালোও বাসেন অনেকে। পুজো তো এক জায়গায় আপনাদের করতেই হবে—আমরা বাড়িটা আপনাদের ছেড়ে দেব। মাঠে প্যান্ডেল তোলার খরচাটা আপনাদের বেঁচে যাবে।

কথাটা মনে লাগে পঙ্কজের। মহেশ্বরের খাতিরে যদিই বা না হয়, অন্তত প্যান্ডেল বাঁধার খরচ বাঁচাবার যুক্তিতে অনেকে রাজি হবে।

খরচটাই তাদের পাড়ার পূজার আসল সমস্যা।

কিন্তু মহেশ্বর রাজি হবে কী ?

প্রতিমার সঙ্গে পঙ্কজ তাদের বাড়ি যায়। ফাঁকা জমিটুকু পেরোবার সময় লক্ষ করে প্রতিমার পরনের শাড়িটা কয়েক জায়গা সেলাই করা হলেও ছেঁড়া রয়ে গেছে। সাবধানে গায়ে জড়িয়ে রেখেছে শাড়িটা। হাঁটতে পর্যন্ত অসুবিধা হয়।

তার কথা শুনে মহেশ্বরেব শীর্ণ মুখে হাসি ফোটে।

তোমরা খেপেছ নাকি ? দশজনের পুজো কখনও কারও বাড়িতে হয় ? না, হওয়াতে পারলেও সেটা করতে আছে ?

বোঝা যায়, নিজের বাড়ির পূজা বন্ধের শোকে মানুষটার বাস্তববুদ্ধি লোপ পায়নি।

মহেশ্বর একটা নিশ্বাস ফেলে;—তুমি বুদ্ধিমান। কিন্তু তুমি ব্যাপারটা বুঝছ না বাবা। ঘা হয়েছে আমার প্রাণে, মলম লাগিয়ে কি এ ঘা তুমি সারাতে পারবে ?

পঙ্কজদের বাড়িতে শনিবারের বৈঠকে দশ-বারোজনের বেশি লোক হয় না। কিন্তু সেটা দুর্লক্ষণ নয়। অনেকে আসেনি বলে তার মানে এই নয় যে তারা পূজা হোক চায় না।

পূজা চায় সকলেই। তবে এই সব বৈঠকে যোগ দিয়ে চাঁদা দেবার বেশি দায়িত্ব কয়েকজন নিতে চায় না, বৈঠকেব আজেবাজে কথা কাটাকাটি আর নীরস আলোচনায় ধৈর্যও অনেকের থাকে না,—তার চেয়ে শনিবারের সন্ধ্যাটা সিনেমা দেখে এলে কাজ দেবে। কয়েকজনের অন্য জরুরি কাজ আছে। এরা কেউ কেউ পরের বৈঠকে আসবে। আসুক বা না আসুক, বৈঠকের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে।

এতটুকু পাড়ায় প্রথম দিনের বৈঠকে ডজনখানেক ওজনদার লোক এসেছে, সেটাই যথেষ্টরও বেশি।

সদাশিব আসেনি। সে অন্য কাজে গেছে।

আলোচনার গোড়ার দিকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই কথাটা যে মহেশ্বরের বাড়ি পূজা হবে না বলেই পাড়ায় একটা পূজা করার প্রয়োজন সকলে উপলব্ধি করছে। মহেশ্বরের জন্য সকলের যে সহানুভূতি প্রকাশ পায়, সাধনকে তা অভিভূত করে দেয়। জানালার ও পাশে প্রতিমার চোখে জল এসে পড়ে। মহেশ্বর উপস্থিত থাকলে কৃতার্থ হয়ে যেত।

মাঝবয়সি জিতেন সম্প্রতি বেকার হয়েছে। আজ সকালেই সদাশিবের সঙ্গে তাকে অনেকক্ষণ কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। আলোচনার প্রথম দিকে সে চুপচাপ বসে শুধু উশখুশ করে।

তারপর হঠাৎ একসময় বলে, আমি বলি কী. মহেশ্বরবাবুর পুজোটা হবে না বলেই তো আমরা একটা পুজো করার কথা ভাবছি। তা সেটা বোধ হয় দরকার হবে না। সদাশিববাবু এ বছর পুজো করবেন ঠিক করেছেন।

সকলে যেন আকাশ থেকে পড়ে।

আর কেউ তো কিছুই শোনেনি এ বিষয়ে !

সদাশিবের মনের কথা কেবল একটি লোকের একলা জানা সত্যই খাপছাড়া ব্যাপার। বেশ বোঝা যায়, জিতেন বড়োই অস্বস্তি বোধ করছে। সদাশিবের মতো লোকের অনুগত হবার আর্ট এখনও সে ভালো আয়ত্ত করতে পারেনি। হঠাৎ বেপরোয়ার মতো সে সত্য আর সরলতার আশ্রয় নেয়।

বলে, কথাটা ভাবছিলেন ক-দিন ধরে, এখনও প্রকাশ করেননি। সকালে আমায় বললেন প্রায় মনস্থির করে ফেলেছেন। কথাটা এইভাবে আপনাদের জানাতে বলেছেন।

দীনেশ হেসে বলে, দরকার হলে যাতে পিছোতেও পারেন।

পাড়ায় নতুন এসেছে বিনোদবিহারী। ন-দশবছর পেনশন ভোগ করছে। সায়েবদের প্রিয় হাকিম ছিল। চোর-ডাকাত গুন্ডা বদমাশদের কঠোর শাস্তি দিতে দিতে কী যে তার অভ্যাস জন্মে গিয়েছিল,

স্বাধীনতা চাই বলার জন্য স্কুল-কলেজের ছেলেদের ধরে এনে হাজির করা হলে তাদের চাঁদমুখ দেখে যত পারে কড়া সাজা দিয়ে বসত !

বিনোদবিহারী গিরীন ভবানীদের চাঁদমুখের দিকে তাকায়। হাকিমি কড়াসুরে বলে, সদাশিববাবু পূজা করবেন তো ছেলেদের কী এল গেল ? ছেলেরা উৎসাহ করে লেগেছে পাড়ায় একটা পুজো করবে, সেটা বাদ যাবে কেন ? তোমরা ঘাবড়ে যেও না হে, আমি তোমাদের পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দেব।

পঙ্কজ চুপিচুপি সাধনকে বলে, সেরেছে। সদাশিব আড়াল থেকে কোপ মারছে, ইনি সামনা-সামনি ঘাড় ভাঙতে চান ! আজকের বৈঠক ভেঙে দেওয়া যাক।

সে তাড়াতাড়ি সকলকে বলে, অনেকে আসেননি, আজ কোনো শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। তবে উপস্থিত সকলের মত আছে পূজা হোক, এটা ঠিক রইল। কাল রবিবার সবাই আসবেন আপনারা, কালকেই সব কথা আলোচনা কবা যাবে।

বিনোদবিহারী আবার ক্ষণকাল পঙ্কজের চাঁদমুখের দিকে চেয়ে রায় দেয়, ঠিক কথা। তুমি ঠিক বলেছ। কাল আমার বাড়িতেও সকলকে ডাকতে পার।

এই সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে ছেলেরা অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করে। তিন বছর আগে পাড়ায় বারোয়ারি পুজো নিয়ে ঠিক এই কারণে ছেলেদের উৎসাহ ভেস্তে গিয়েছিল। কাবণটা এবার আরও স্পষ্ট হয়েছে। সদাশিব কিংবা বিনোদবিহারীকে পান্ডা হতে দিলে অনায়াসে পূজা হয়—ছেলেদের হইচই মাতামাতি বাদ দিয়ে বড়দের গম্ভীর আনুষ্ঠানিক পূজা। ছেলেরা শুধু হুকুম পালন করে যাবে।

কারণ, শুধু এই একটি মাত্র শর্তে সদাশিব বা বিনোদবিহারী পূজা সম্পন্ন করাবার দায়িত্ব নেবে। সব বিষয়ে কৃতিত্ব চাই। নইলে দু-পাঁচটাকা চাঁদা দিয়ে সরে দাঁড়াবে !

বিনোদবিহারী পঞ্চাশ টাকা দেবে বলেছে ? কারও সাধ্য হবে না সে টাকা আদায় করে। কৌশল খুব সোজা। কোনো একটা বিষয়ে মতের অমিল হবে। রাগ দেখিয়ে বলবে, চ্যাংড়া ছোঁড়াদের এ সব ব্যাপারে আমি নেই।

বলে চাঁদাও দেবে না !

পাড়ার জোয়ান আর বুড়োদের বিরোধ এটা নয়। মুশকিল হল এই যে পাড়াটা ছোটো, জোয়ানদের দাবিয়ে রাখতে চাইবে না এমন বয়স্ক মানুষই পাড়ায় বেশি কিন্তু তাদের একজনেরও সাধ্য বা সাহস নেই যে সব দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ভালোয় ভালোয় একবার পূজা হয়ে গেলে পরের বার অনেকে সাহস কবে এগিয়ে আসবে। প্রথম বছর বলেই এবার মুশকিল। কী হবে না হবে জানা নেই। দায়িত্ব নিয়ে হয়তো বিপদে পড়তে হবে। অথচ বয়স্ক মানুষ যে এগিয়ে আসবে দশজনের কাছে সেই হবে দায়ি।

অমল কলেজে পড়ে। সে বলে, বড়োদের দরকার নেই। আমরাই এক-একজন এক-একটা দায়িত্ব নেব।

পঙ্কজ বলে, বড়োদের বাদ দিয়ে পাড়ার পুজো হয় না।

নিখিল ব্যাংকে কাজ করে। সে বলে, পুজো যখন হচ্ছেই না, বিনোদবাবুকে প্রেসিডেন্ট করলে দোষ কী ?

সকলে সমস্বরে প্রতিবাদ জানায়।—না, না, অমন পূজায় আমরা নেই !

সকলে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে। রাত দশটা বেজে গিয়েছে। সকালে বৈঠক বসবে এবং পণ্ড হয়ে যাবে। পঙ্কজের গা জ্বালা করে। মনের মধ্যে একটা মরিয়া ভাব জাগে।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলো সবাই মিলে মহেশ্বরবাবুর কাছে যাই। শেষ চেষ্টা করে দেখি।

পাড়ার কমবয়সি উৎসাহী বাছা বাছা কয়েকজনকে তারা বাড়ি থেকে ডেকে বাব করে সঙ্গে নেয়।

বস্তি থেকে ডেকে আনে জিতেন আব অঘোরকে।

মহেশ্বর শুয়ে পড়েছিল। এত রাত্রে পাড়ার এতগুলো লোক তার বাড়িতে হানা দিয়েছে শুনেই সে দুর্গানাম জপ করতে শুরু করে। ভয়ে নয়, বিরক্তি আর বেদনায়। সে তো স্থির কবেই ফেলেছে যে মহামায়াকে এবার যেমন আনা যাবে না তেমনই জীবনের মায়াতেও আর সে জড়িয়ে পড়বে না। পাড়ার এই ছেলেমানুষগুলি কিছু বুঝবেও না, তাকে রেহাইও দেবে না কিছুতেই।

মহেশ্বর বাগ হয়। প্রচণ্ড রাগ হয়। তিনপুরুষ ধরে তাদের মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করে আসা বন্ধ করে দেবার মতো গুরুতর ব্যাপারটা এরা একটু দরদ দেখিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়, একটা ছেলেখেলার পূজার ব্যবস্থা কবে দিয়ে তাকে ভোলাতে চায়। খেলনা দিয়ে ছেলে ভোলানোর মতো।

কিন্তু রাগ হলে কী হবে। দুর্গাপূজা করে বুড়ো হয়েছে, বাড়িতে মানুষ এলে সানন্দ অভ্যর্থনা জানিয়ে বসানোটা দাঁড়িয়ে গেছে স্বভাব। বিয়ের রাতে মেয়ের বাপ হয় বিনয়ে কাতর, পূজাবাড়ির কর্তা পূজার ক-দিন বিনয়ে পায় উল্লাস। দশজনে পূজা উপলক্ষে বাড়িতে এসেই তো তাকে ধন্য করে

একটু গম্ভীরভাবে বিষণ্ণভাবে হলেও সকলকে ডেকে বসাতে হয়।

কী ব্যাপার ?

পঙ্কজ বলে, আমবা একটা নালিশ নিয়ে এসেছি। আপনার জন্য আমাদেব পুজো পণ্ড হযে যাচ্ছে।

মহেশ্বর সচকিত হয়ে বলে, কীবকম ? আমি তো কিছুই করিনি বাবা তোমাদের !

কিছু করেননি, কিছু কববেন না বলেই আমাদেব পুজো হবে না। আপনি এগিযে এলে পুজো হবে, না এলে হবে না।

মহেশ্বব নীরবে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বলে, আমাদের হিসাব না বোঝেন, আপনার নিজের হিসাব ধবুন। মা এবাব আপনার পুজো পাচ্ছেন না। আমবা পুজো করব, আপনি এগিয়ে না এলে এ পুজোও মা পাবেন না। মাকে দুটি পুজো থেকে বঞ্চিত করার দায়ি হবেন আপনি।

মহেশ্বর প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, এ কথা আগে বলনি কেন ? কী কবতে হবে আমায ?

সকালে বৈঠক বসে রমেশের বাড়িতে। পাড়ার ছেলেবুড়ো প্রায় সকলেই উপস্থিত হয। ছেলেবা মনে জোর পেয়েছে, তাদের উৎসাহ যেন শতগুণ বেড়ে গেছে রাতাবাতি। সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের কবলমুক্ত সার্বজনীন দুর্গোৎসব সম্ভব হবে তাদের পাড়ায়।

সদাশিব আর বিনোদবিহারী প্রথমে আসেনি। তিনবার তাদের ডাকতে লোক পাঠিয়ে অগত্যা শুরু করে দিতে হয়েছে বৈঠকের কাজ। তারপর একে একে দুজনেই এসেছে।

না এসে উপায় কী ? সমস্ত পাড়াটাকে বর্জন করে তো পাড়ায় থাকা যায না !

সদাশিব হাজির হতেই একজন প্রশ্ন করে, পাড়াতে এবার তাহলে দুটো পুজো হচ্ছে সদাশিববাবু ?

সদাশিব বলে, না, আমি আর করছি না। পাড়াতেই যখন হচ্ছে, আর দরকার কী ?

বিষণ্ণ ম্লানমুখে মহেশ্বর এসে বৈঠকে বসেছিল। পূজা নিয়ে এলোমেলো কথায় মুখর হয়ে উঠেছে বৈঠক, কিন্তু তার নির্জীব বিষণ্ণ ভাব ঘোচে না। যার নিজের ছেলে মারা গেছে তাকে যেন টেনে আনা হয়েছে অন্যের ছেলের বিয়ের উৎসবে। মা ফাঁদে ফেলেছেন, উপায় কী। মরার উপর

খাঁড়ার ঘা দেবার সাধ হয়েছে মার। বৈঠকের কাজ আরম্ভ হয়, তাকে প্রেসিডেন্ট করে পূজাকমিটি গঠিত হয়, প্রত্যেকের নাম ধরে চাঁদার অঙ্ক ফেলা হয়, উদ্‌বাস্তু কলোনির প্রতিনিধি কলোনি থেকে চাঁদা তুলবার ভার নেয়, একজন পূজা মণ্ডপের জন্য ত্রিপল আর বাঁশ দেবে জানায়, নানাপ্রশ্ন ওঠে, তর্ক বাঁধে—একেবারে জমে যায় বৈঠক। সদাশিব আর বিনোদবিহারী পর্যন্ত কখন আলোচনায় যোগ দিয়ে বসে নিজেরাই টের পায় না।

মহেশ্বর বসে থাকে উদাস মনোবেদনার প্রতিমূর্তির মতো।

তারপর একজন প্রস্তাব করে, মোট কীরকম টাকা উঠবে জানা গেল।

এবার মোটা খরচগুলি ছকে ফেললে হত না ?

আরেকজন বলে, এটা মহেশ্বরবাবু ভালো পারবেন।

গতবারের খরচেব হিসাবটা মহেশ্বর সঙ্গে এনেছিল। পকেট থেকে সেটা বার করে সে একে একে মোটা খরচগুলি বৈঠকে পেশ করে।

প্রতিমার কথায় বলে, আমার প্রতিমা খুব ছোটো হয়েছিল। দশজনের পুজোয় আরও বড়ো প্রতিমা দরকার হবে। পনেরো-বিশটাকা বেশি পড়বে।

পঙ্কজ এতক্ষণ চিন্তিতভাবে মহেশ্বরকে লক্ষ করছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে মহেশ্বেব ভাবান্তর দেখে বিস্ময়ের তার সীমা থাকে না। বিষণ্ণতা আছে কিন্তু অন্যমনস্ক উদাস ভাবটা যেন উপে গিয়েছে মন্ত্রবলে।

ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে। এ রকম সভা করে কমিটি গড়ে পূজার কথা আলোচনা করার সঙ্গে তার পরিচয় নেই, এতক্ষণ কোনো আলোচনাই তার মনকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু বাড়ির পূজার হিসাব তাকে ছকতে হয়েছে প্রতিবছর। গত দুবছর পুঁজিভাঙা গয়না বেচা টাকায় বাজাবে আগুন লাগা এই দুর্দিনে খরচের হিসাব ছকতে বসে কী যুদ্ধটাই না জানি তাকে করতে হয়েছে !

পূজার প্রথম বাস্তব কাজ খবচের হিসাব করতে বসেই তার উদাসীনতা ঘুচে গেছে।

পঙ্কজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

বিকালে মহেশ্বরের বাড়িতে বসে নির্বাচিত পূজাকমিটি বৈঠক। এ বৈঠকে মহেশ্বরকে পূজাব ব্যাপারে আরও মনোযোগী দেখে সমস্ত বাড়িটাও যেন নিশ্বাস ফেলে স্বস্তির !

পঙ্কজকে ভেতরে ডেকে তার হাত চেপে ধরে আনন্দে প্রতিমা কেঁদে ফেলে।

তারপর আসে পূজা। পূজামণ্ডপে পাড়ার প্রথম বার্ষিকী সার্বজনীন দুর্গোৎসবেব উদ্‌বোধনের দিন মহেশ্বরকে দেখে টেরও পাওয়া যায় না এটা তার নিজের বাড়ির সাতপুরুষেব পূজা নয়—বাড়ির কর্তা হিসাবে করাব বদলে পূজাকমিটি প্রেসিডেন্ট হিসাবে সে সব দেখাশোনা কবছে, সকলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

চোদ্দো

পূজা ছিল তাদের সাতপুরুষের। বংশানুক্রমে তারা বাড়িতে করে এসেছে পূজা।

সেই পূজাই এবার সকলের পূজা হয়ে গেল ? ভদ্রপাড়ার মানুষ, বস্তির মানুষ, উদ্‌বাস্তু কলোনির মানুষ—সকলের নিজস্ব পূজা ?

তাই ভালো। মা তো কারও সম্পত্তি নয় !

মহেশ্বর এদিক দিয়ে শান্তি পেয়েছে।

প্রাণটা তার জ্বলে যায় শুধু সুরমার জন্য।

হতভাগি মেয়ে। আগের জন্মে বোধ হয় অনেক পাপ করেছিল, এ জন্মে তাই এক পাষণ্ডের হাতে পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল জীবনটা।

মানুষ এমনভাবে বয়ে যেতে পারে, এত নীচে নামতে পারে অধঃপতনের পথ ধরে ? মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে পারে এমনভাবে ?

সুরমা দেখা পর্যন্ত করে না, সদর দরজা থেকে বিদেয় করে দেওয়া হয়, তবু সমীর মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায়। সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য হাত পাতে মহেশ্বরের কাছে।

বলে, এবার সে নিজেকে শুধরে নেবে।

বলে, তিনদিন সে কিছু খায়নি।

না দিয়ে পারা যায় না পাঁচ দশটা টাকা।

পরমেশ্বর বলে, ও জানে সবাই হাল ছেড়েছে, তোমরা এখনও আশা ছাড়তে পারনি। সত্যই হয়তো শুধরে যাবে, তোমাদের এই নিরুপায় আশা কাজে লাগবে।

কিন্তু এখনও শোধরায় না কেন ?

এ প্রশ্ন সকলেরই মনে জাগে। এখন তো সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে এ পথে কত সুখ ? বাড়িতে গেলে আত্মীয়বন্ধু দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। বদ উপায়ে কোনো রকমে দুটো পয়সা হাতে এলে বাজে খেয়ালে দুদিনে তা উড়ে যায়। আবার সম্বল করতে হয় রাস্তা, আবার ফিকিরে ঘুরতে হয় কী করে দুটো পয়সা আসবে। এত কষ্ট পায়, তবু নিজেকে সংশোধন করে না কেন ?

পরমেশ্বর বলে, কষ্ট পাওয়াটাই নেশা দাঁড়িয়ে গেছে উগ্র নেশা। এ রকম অস্বাভাবিক জীবন ছাড়া ওর সব ফাঁকা মনে হয়।

সুরমা বলে, মরলেও তো বাঁচা যেত !

অনায়াসে আজ সে নিজের স্বামীর মরণ কামনা করে !

সুরমার জন্য জ্বালা আর সাধনের জন্য দুশ্চিন্তা ও হতাশা।

সমীরের সঙ্গে মোটা টাকা নিয়ে ব্যাবসায়ে নেমে নয় সমীরের জন্য সর্বনাশ হয়েছিল। তারপর নিজেও তো কতদিকে কতভাবে চেষ্টা করল, ফল হল না কিছুই। নিজের খরচটা চালাবার জন্য সামান্য বেতনের একটা চাকরিও জোটে না।

মন ভেঙে যাবার বিপদ দেখা দিয়েছে সাধনের। সবিতার মতো একটা অসহায়া মেয়ে পর্যন্ত বাইরে থেকে চাল এনে বেচে আর মাঝে মাঝে কোনো সভায় গান গেয়ে কিছু কিছু রোজগার করে, আর পুরুষমানুষ সে বাপের ঘাড় ভেঙে পেট ভরায়।

সবিতা তাকে সাহস দেয়, তার হতাশা দূর করার চেষ্টা করে। নিজের রোজগারের কঠোর বাস্তবতা নিয়ে খেদও সে প্রকাশ করে সাধনের কাছেই।

না, এভাবে চাল কেড়ে নেবে, ঘুষ আদায় করবে, অপমানের একশেষ করবে—চাল এনে বেচে রোজগার করা চলে না আর।

অল্প চাল এনে বিক্রি করে হয় সামান্য উপার্জন। কোনো মেয়েই বেশি চাল কিনে আনতে পারে না একেবারে। তাতেও যদি ঘুষ দিতে হয় তবে লাভ থাকবে কী করে ?

তীব্র জ্বালার সঙ্গে সবিতা বলে, আমার পিছনেই যেন বেশি করে লাগে !

সাধন বলে, লাগবে না ? এমন সুন্দর চেহারাটি বাগিয়েছিলে কেন !

তোমায় রানির হালে রেখে পুষবার জন্য কত লোক ওত পেতে আছে—তুমি কিনা চাল এনে বেচবে ! এ কী লোকের সয় ?

ওই ব্যাবসাই করি এবার। আশা হয়েছিল গান গেয়ে বুঝি কিছু হবে। যোগসাজশ হলে নমাসে ছমাসে পাঁচ-দশটাকা। আরও কতকাল শিখতে হবে ঠিক নেই। এখন আর তো কোনো পথ দেখছি না ঝি-গিরি ছাড়া।

সাধন নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমি ছেলেমানুষ তায় মেয়ে—তবু তো তুমি যা হোক কিছু রোজগার করছ। প্রায় তিন বছর চালিয়ে দিলে। আমি খালি লোকসান দিলাম, বাবার টাকাগুলি নষ্ট করলাম।

সবিতা সখেদে বলে, সত্যি ! আপনার কথা ভাবলে এমন খারাপ লাগে আমার !

যা ধরি তাই যেন ফস্‌কে যায় !

গভীর সমবেদনায় তার হাত চেপে ধরে সবিতা নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সাধন তার চোখে তার মনের ছায়া দেখতে পায়।

ঢোঁক গিলে বলে, ভাগ্যে বিশ্বাস করতাম না, আজকাল করতে ইচ্ছা হয়। অনন্ত বাবার ভাগ্যে। মেয়েটা বিয়ে দিলেন ভালো চাকরে ছেলে দেখে—একেবারে গোল্লায় গেল। বারবার আমাকে সুযোগ দিলেন কিছু করার, আমি শুধু টাকাগুলিই নষ্ট করলাম। এবার পুজো করার টাকাও বাবার জুটল না ! এত চেষ্টা করে একটা চাকরি খুঁজে পাচ্ছি না সামান্য টাকার।

অনির্দিষ্ট আশার কথা বলা ছাড়া কিছুই করার নেই। সবিতা সেই আশাই জানাবার চেষ্টা করে।

ঠিক হয়ে যাবে।

আর কবে ঠিক হবে ?

হতাশ হতে নেই। দোষ তো আপনার নয়—দোষ হল দেশের অবস্থার। একেবারে চরম দশায় পৌঁছে দিয়েছে পাজির দল—ভালোভাবে আপনাকে রোজগার পর্যন্ত করতে দেবে না। আপনি পথ না পেলে কী করবেন ? কাজেই হতাশ হয়ে লাভ নেই।

হতাশা নয় গো—এ হল প্রাণের জ্বালা। আমি একটা কথা ভাবছিলাম—বাড়িতে না জানিয়ে কিছু ফিরি করব। অন্তত নিজের হাতখরচটা তো উঠবে।

কী ফিরি করবেন ?

এখনও ঠিক করিনি। মালটা তোমার ঘরে রাখব ভাবছি।

পূজার মধ্যে সমীর একবার এসেছিল।

তার চেহারা দেখে মহেশ্বরের মনে হয়েছিল আর বেশি দিন বোধ হয় মেয়েকে তার বিধবা হবার কামনা টেনে চলতে হবে না, শীঘ্রই কামনা পূর্ণ হবে।

কয়েকটা টাকা তাকে দিয়েছিল মহেশ্বর। বলেছিল, তুমি আর এসো না বাবা আমার কাছে। আমার আর সাধ্য নেই। এ বছর পুজো বন্ধ করেছি—পাড়ার লোকেরা চাঁদা তুলে এ পুজো করছে।

সমীর চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

এবার এলে বাধ্য হয়েই তোমায় খালি হাতে ফিরিয়ে দেব।

বিসর্জনের কয়েকদিন পরে আবার সমীরকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে মহেশ্বরের শরীরটা অবসন্ন হয়ে আসে।

এ ক-দিনেই আরও কদর্য কুৎসিত হয়ে গেছে তার চেহারা। কোটরে-বসা চোখে একটা অদ্ভুত ঝিমানো ভাব, মুখে ঘর্মাক্ত ক্লেদের মতোই যেন ক্লান্তি মাখানো।

মহেশ্বর প্রায় কাতর অনুনয়ের সুরে বলে, আবার কী চাও বাবা ? সেবার এত করে তোমায় বুঝিয়ে দিলাম যে আমি আর পাবব না, তবু আবার তুমি এসেছ ? আমি নিজে এক রকম ফকির হয়ে বসেছি, তোমাকে একটা পয়সা দেবার সাধ্যও আমার নেই।

আগে কোনোবার করেনি, এবার সমীর ধীরে ধীরে ঝুঁকে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। বলে, আজ্ঞে, টাকা চাই না। আমি আজ টাকাব জন্য আসিনি।

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হয় না মহেশ্বরের !

কী বলছ ?

আপনার মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা কবতে চাই। ক-টা দরকারি কথা আছে।

মহেশ্বর ভাবে, কে জানে এবার কী নতুন চাল ? কে জানে আবার কী নতুন মতলব হাসিল করতে এসেছে সমীর ?

মুখে বলে, সে তো তোমার সঙ্গে দেখা করবে না বাবা।

সমীর বলে, একটু গিয়ে বলবেন, বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে শুধু দুটো কথা বলুক, তারপর আমি চলে যাব। আমি কিছুই চাই না।

দাঁড়াও তবে। জিজ্ঞেস করে আসি।

জিজ্ঞাসা কবতে তাকে ভেতরে যেতে হয় না। জানালা দিয়ে সমীরকে আসতে দেখে সুরমা বাইরের দরজাব আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল--নিজেব কানেই সে সব কথা শুনছে সমীরেব।

সে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, বাবা, বলে দাও দেখা কবে কাজ নেই, আমি দেখা করব না, কথাও বলব না।

মহেশ্বব নিচু গলায় বলে, কী বলতে চায় শুনলে হত না ?

সুরমা জোর দিয়ে বলে, না। কোনো লাভ নেই। আমি জানি, নতুন কোনো ফন্দি এঁটেছে। বানিয়ে বানিয়ে কত রকম কী বলবে, মাথাটা ঘুরে যাবে আমাব। মিথ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে কোনো লাভ নেই বাবা।

চলে যেতে বলব ?

তাই বলো। আব যেন না আসে। নিজেকে বিধবা ভেবেছি, তাই আমার ভালো।

সমীর নিজেই সব শুনেছে। বাইবে গিয়ে তবু মহেশ্বব অপরাধীর মতো জানায়, সুরমা তোমার সঙ্গে দেখা করবে না।

মাতা নত কবে সমীব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

মহেশ্বর টের পায় এ পাশের ও পাশের সামনেব বাড়ির জানালা দিয়ে অনেকগুলি কৌতূহলী মুখ উঁকি দিচ্ছে।

সমীবের বিষয় জানতে কারও বাকি নেই। মেয়ে তাব এ বাড়িতে আছে, তবু জামাই এসে কীভাবে বাড়ির সদর দরজা থেকে চোরের মতো ফিরে যায় দেখবার জন্য ঔৎসুক্যের তাদের সীমা নেই।

এ দৃশ্য দেখা অনেক সিনেমার চেয়ে কুৎসিত আর রসালো।

সমীর আবার বলে, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুমিনিট কথা বলেই চলে যেতাম।

মহেশ্বর অসহায়ভাবে তাকায়।

ভিতর থেকে সুরমার সুস্পষ্ট জবাব আসে · আমি বিধবা হয়েছি। ভূতপ্রেতের সঙ্গে এক মিনিটও আমি কথা বলব না।

সমীর চোখ তুলে চায়। কিন্তু সুরমাকে দেখতে পায় না।

মাথায় ঝাঁকি দিতে গিয়ে সে যেন নিজের শীর্ণ দেহটাকেও ঝাঁকানি দেয়। ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের খুঁট তুলে মুখে চাপা দিয়ে কয়েকবার কাশে।

তারপর আবার মহেশ্বরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নীরবে ধীরে ধীরে চলে যায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যে দু-দুবার পাষণ্ড অমানুষ জামাইয়ের প্রণাম পেয়ে মহেশ্বর হতভম্ব হয়ে বসে থাকে।

দুদিন পরে পদ্মাকে এ বাড়িতে দেখা যায়।

প্রায দুবছরের উপব সে এ পাড়ায় আসেনি।

আজও সে আসে দামি গাড়িতে চেপে এবং সে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসে সেই আগেকার ড্রাইভ্যর কান্তিলাল।

বিধুভূষণের অবস্থা কি ফিরেছে আবার ?

আবার সে বাড়ি করেছে, গাড়ি কিনেছে ?

পদ্মাকে দেখে সত্যই অবাক হয়ে যায় পাড়ার মানুষ এবং এ বাড়ির মানুষ।

এবার তার সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা।

মহেশ্বরের মেয়েকে বিয়ে করে সমীর অধঃপাতে গিয়েছে বলে এতই চটেছে বিধুভূষণ যে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে নিমন্ত্রণ করা দূরে থাক একটা খবর পর্যন্ত দেযনি ছেলের শ্বশুরবাড়িতে।

পরমেশ্বর বলে, এসো মা এসো। মায়েব আমাব নতুন মূর্তি দেখছি !

হাসিমুখে আগের সুবেই সে অভ্যর্থনা জানায় কিন্তু পদ্মার কানে যেন অনেক নীবস প্রাণহীন ঠেকে তার কথার সুর।

সুবমা ননদকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার সিঁথিতে সিঁদুর উঠল কবে ?

পদ্মা বলে, বছর দেড়েক হবে।

আমি একটা খবর পেলাম না কেন ?

ভারী তো বিয়ে তার আবার খবর !

নিজের বিয়ের ব্যাপার যেন তুচ্ছ কবে উড়িয়ে দিয়ে প্রসঙ্গটাই পদ্মা চাপা দিতে চায়। প্রায় একসঙ্গেই বলে, আমি দাদার খবর জানতে এসেছি।

আমরা তো খবর রাখি না তোমাব দাদাব।

পদ্মা যেন হতাশ হয়ে যায়।

কোথায় থাকে কী করে কিছুই জানো না ?

না। মাঝে মাঝে টাকা ভিক্ষা করতে আসে, টাকা নিয়ে চলে যায়। তোমাদের ওখানে যায় না টাকা চাইতে ? ভারী আশ্চর্য তো ! আত্মীয়বন্ধু কাউকে বাদ দেবাব মানুষ তো ও নয় !

পদ্মা বলে, ঠিকানা জানলে বোধ হয় যেত। আমার ঠিকানা তো জানে না।

পরমেশ্বর বলে, তোমার কথাবার্তা কিন্তু ভারী রহস্যময় ঠেকছে মা।

সুরমা বলে, আমিও বুঝতে পারছি না তোমার কথা। এব মধ্যে ও একবারও বাবার কাছে সাহায্য চাইতে যায়নি ?

পদ্মা বলে, আমি তো জানি না। আমি বাবার কাছে যাই না।

কেন ?

বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে।

পরমেশ্বর একটু হাসে।

রহস্য আরও গভীর হল।

পদ্মা বলে, বছর দেড়েক আগে বাবা আমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমার বিয়ের সময়। আমার বিয়ের ব্যাপারেই রাগ করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমিও রাগ করে বাপের বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি না।

সুরমা বলে, ও বাবা, তোমার বিয়ে নিয়ে এত কাণ্ড হয়েছে। বাবা রাগ করলেন কেন ?

প্রতিমাও কৌতূহল চাপতে পারে না, বলে, বলুন না একটু শুনি আপনার বিয়ের ব্যাপারটা ?

পদ্মা খানিক চুপ করে থেকে বলে, ব্যাপার আর কী, ড্রাইভারকে বিয়ে করব বলেছিলাম, বাবা, জ্যাঠামশায় এদের তাই অপমান হয়েছিল।

সুরমা বলে, বুঝেছি। সেই কান্তিলাল তো ?

পদ্মা নীরবে সায় দেয়।

ওর সঙ্গে এসেছ না তুমি ?

হ্যাঁ। গাড়িতে বসে আছে।

পরমেশ্বর বলে, ছি ছি, বাড়ির মেয়ের নন্দাই, তাকে কিনা পরের মতো বাইরে গাড়িতে বসিয়ে রাখা হয়েছে ! যাই, ডেকে নিয়ে আসি ভেতরে।

পদ্মা বলে, থাক না।

পরমেশ্বর হাসিমুখে উঠে যেতে যেতে বলে, থাকবে কী মা ? তোমার স্বামীকে ঘরে ডেকে বসাব না এমনই ছোটোলোক পেয়েছ আমাদের ?

কান্তিলাল ভেতরে এসে বসে।

পদ্মা যে এমন আচমকা সমীরের খবর জানতে এসেছে তার কারণটা তার কাছে শোনা যায়।

আগের দিন সে রাস্তায় গাড়ি হাঁকাবার সময় ফুটপাতের ধারে সমীরকে বসে থাকতে দেখেছিল—বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে। সে তখন ছিল ডিউটিতে, দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় ছিল না।

গাড়ি থামিয়ে সে সমীরকে তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে।

সমীর জানায় তাকে সেখানেই পাওয়া যাবে।

কিন্তু পরে ফিরে এসে সেখানে আর তাকে কান্তিলাল খুঁজে পায়নি।

কান্তিলালকে চা-জলখাবার এনে দিয়ে সুরমা পদ্মাকে বলে, তোমাকে সব জানিয়ে দেওয়াই ভালো। তোমার ভায়ের সম্পর্কে আমরা সব আশা ত্যাগ করেছি। বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় না, আমি কথা কই না। পরশু দিন এসে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছিল, আমি দেখা করিনি।

পদ্মা বলে, ও !

খানিক মাথা নিচু করে থেকে সে বলে, ওর কাছে যা শুনলাম তাতে বেশি দিন আর বাঁচবে মনে হয় না।

সুরমা বলে, আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। মরে যাবে কিন্তু শোধরাবে না।

খানিক পরে সাধন বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরে।

বাসের দুআনা পয়সা বাঁচাতে সে প্রায় আধমাইল রাস্তা বাজার করে হেঁটে বাড়ি ফেরে।

পদ্মাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে, হঠাৎ কোত্থেকে এলেন ? বিয়ে-টিয়ে হয়ে গেছে দেখছি !

বলতে বলতে তার চোখ পড়ে একই মাদুরে বসা কান্তিলালের দিকে।

তার হাঁ করে তাকিয়ে থাকার রকম দেখে কান্তিলালের মুখে হাসি ফোটে, পদ্মাও হেসে ফেলে।

সুরমা বলে, ওর সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে।

তাই নাকি ! বেশ বেশ।

পদ্মার ড্রাইভার স্বামীকে সাধন কীভাবে নেবে একটা খটকা ছিল সুরমার মনে কিন্তু দেখা যায় সাধনও আর সে সাধন নেই।

সহজভাবে অনায়াসে সে কান্তিলালকে বলে, বসুন, মুখ-হাত ধুয়ে এসে আলাপ করব। এত নোংরা বাজার, হাতে-পায়ে সাবান না দিলে গা ঘিনঘিন করে।

যা বলেছেন।

পদ্মা নিশ্বাস ফেলে বলে, দাদার জন্য না হলে আজকে এসে আমার কত ভালো লাগত !

পরমেশ্বর বলে, একটা মানুষ কত মানুষের আনন্দ নষ্ট করতে পারে। নিজেকে ঠিক রেখে চলার দায়িত্ব তো এই জন্যই মানুষের।

পরদিন বিকালের ডাকে একখানা পোস্টকার্ড আসে সমীরের।

পেনসিলের অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা লেখা, কিন্তু চেষ্টা করে পড়া যায়।

সমীর শিয়ালদা স্টেশনে পড়ে আছে।

তার সমস্ত অপরাধ যেন সকলে ক্ষমা করে। সম্ভব হলে শেষবারের মতো ছেলেমেয়ে দুটিকে সে একবার দেখতে চায়।

এই পরিণতিই ঘটে সমীরদের চিরকাল—পাপের এই বাঁধাধরা পুরস্কার। সে জাত-বজ্জাত নয়, বেপরোয়া ঔদাসীন্যের সঙ্গে যারা পাপের পথে হিসেব করে হাঁটতে শুরু করে একদিন মোটর হাঁকায়—ওদের ধাতু দিয়ে সে গড়া নয়।

পাপ তার পেশা নয়, নেশা।

স্বাভাবিক সুস্থ জীবন আয়ত্তে থাকলেও অসুস্থ জীবনের অস্বাভাবিক তীব্র উন্মাদনা বিষাক্ত মারাত্মক নেশার মতোই তার মতো মানুষকে অল্পদিনে ধ্বংস করে ছাড়ে।

খবর শুনেই সুভাগিনী হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।

সুরমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল, কিন্তু মুখের ভাব তার কঠিন।

সে বলে, আ, থামো না মা ! ব্যাপারটা বুঝতে দাও আগে। এমন হাউহাউ করে তুমি মাথা গুলিয়ে দিয়ো না আমাদের। এ আরেকটা মিথ্যে চালও তো হতে পারে ? ও মানুষটার কোনো কথায় বিশ্বাস আছে ?

সুভাগিনীর কান্না আচমকা থেমে যায়।

সেটা অসম্ভব নয়। ছল চাতুরী মিথ্যা আর প্রতারণার নতুন নতুন মতলব ভাঁজতে সে যে কত বড়ো ওস্তাদ, এদিকে তার যে কী রকম অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি, সমীর তার পরিচয় খুব ভালো করেই দিয়েছে বটে।

তবু মেয়ের মুখের দিকে অবাক হয়েই চেয়ে থাকে সুভাগিনী। এ তার সেই মেয়ে, কারও একটু আঙুল কেটেছে দেখলে যে একদিন কেঁদে ফেলত, যার কোমল প্রাণের বাড়াবাড়ির পরিচয় মাঝে মাঝে তার কাছেও বিরক্তিকর ঠেকত, আজ সে স্বামীর কাছ থেকে এই চিঠি পেয়েও এমন শক্ত হয়ে আছে পাথরের মতো !

কী করা যাবে ?

বাবা আসুক।

মহেশ্বর কাজের চেষ্টায় বেরিয়েছিল। সন্ধ্যার আগেই সে ফিরে আসে।

চিঠি পড়ে তার মুখে নেমে আসে বিমর্ষতা।

একবার তো যেতে হয় তাহলে ?

সুরমা বলে, তুমি অস্থির হয়ো না বাবা। কতবার তোমায় কতভাবে ঠকিয়েছে মনে নেই ?

তাই বলে তো আর মরতে দেওয়া যায় না !

পরমেশ্বর বলে, কোনো বিষয়েই বাড়াবাড়ি করতে নেই। আবার যদি ঠকায়, ঠকাবে। কিন্তু এ অবস্থায় চুপ করে থাকলে তোমার অন্যায় হবে—তোমার সে অধিকার নেই। কারণ, এটা যেমন ওর আরেকটা মতলবও হতে পারে, তেমনই আবার সত্যও হতে পারে কথাটা। ওর চেহারা তো তোমরা দেখেছ।

একটু থেমে সে যোগ দেয়, এইভাবেই মারা যায় এ সব মানুষ।

মহেশ্বর আবার বলে, না না, যাই করে থাক—একেবারে মরতে দেওয়া যায় না কিছুতেই !

সুরমার মুখের ভাব নরম হয় না।

বলে, মরতে কী আর সত্যি দেওয়া যায় বাবা ? আমরা যাব চলো—কিন্তু তোমাকে শক্ত থাকতে হবে। আগে বুঝতে হবে সত্যি লিখেছে কি না, তারপর যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে। ব্যাকুল হয়ে ওর আর কোনো ফাঁদে আমরা পা দেব না।

মহেশ্বরও অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারও মনে হয় যে কী ছিল তার মেয়ে আর কী দাঁড় করিয়েছে তাকে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা !

সত্যই বোকা সমীর, তিলে তিলে সত্যই সে আত্মহত্যা করেছে! নইলে এমনভাবে কেউ মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করে দেয় যে রাস্তার ধারে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকার সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখলেও তার নিজের স্ত্রীর সন্তানের জননীর সন্দেহ থেকে যায় যে এটা তার মানুষ ঠকাবার আরেকটা কৌশল হওয়া অসম্ভব নয় !

পরমেশ্বর মাথায় হাত রাখে সুরমার।

বলে, অত মনের জোর দেখাতে হবে না। ভেতরে তো কাঁপছিস !

মনে যাই ভাবুক আর মুখে যাই বলুক ভেতরটা সত্যই শান্ত হয় না। ঢোক গিলতে গিয়ে কয়েকবার চেষ্টা না করে গিলতে পারে না। আতঙ্কের চাপে তার শ্বাসযন্ত্রের খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে—সে ছোটো ছোটো নিশ্বাস ফেলে।

তুমি যাবে জ্যাঠামশাই ?

আমায় আবার কেন জড়াবি ?

আমরা কি মাথা ঠান্ডা রাখতে পারব ?

সব সময় মাথা ঠান্ডা রাখলেই কি চলে ? ঠান্ডা হিসাবের ফল ভালো হয় ? আমার মাথা নয় ঠান্ডা, তোর তো তা নয় ! আমার বিচার হয়তো ভুল দাঁড়াবে তোর পক্ষে—ফলটা খারাপ হবে। ভুলও যদি করিস, এ অবস্থায় তোর নিজের করা উচিত।

তারা বেরোবার জন্য প্রস্তুত হলে পরমেশ্বর সুরমাকে বলে, একটা উপদেশ বরং শুনে যা। এটা মনে রাখিস—মন স্থির করতে সুবিধা হবে। সংসারে চোর-ছ্যাচর পাপীতাপী অনেক আছে কিন্তু তাই বলে মানুষ খারাপ নয়, মানুষকে ছোটো ভাবতে নেই। মানুষ মহৎ এটাই হল খাঁটি হিসাব—তারপর কোনো একটা বিশেষ মানুষ সম্পর্কে দরকার মতো হিসাব কষা।

অসহায় নিরুপায় উদ্‌বাস্তু মানুষে-ভরা শিয়ালদ স্টেশন। শিশু থেকে বুড়ো, মেয়েপুরুষ, ছোটোবড়ো পরিবার, একলা মানুষ। একদিন তাবাও নেমেছিল এই স্টেশনে এমনই উদ্‌বাস্তুদের ভিড়ের মধ্যে—আজও সেই ভিড় কমেনি।

এই ভিড়ের মধ্যে খুঁজে বাব করতে হবে সমীরকে।

চারিদিকে তাকায় আর সুরমা ভাবে, সমীবকে নয় নিজের দোষে এখানে এসে শেষশয্যা পাততে হয়েছে মরণের প্রতীক্ষায়, এরা কার কাছে কী দোষ করেছিল ? কী পাপে কার পাপে এই শিশু নারী যুবক বৃদ্ধের এই পরিণাম, এই শাস্তি ?

একপ্রান্তে সমীরকে পাওয়া যায়।

ভাঁজ করা শতরঞ্চিতে সে একটা কাপড়েব পুঁটুলি মাথায় দিয়ে শুয়েছিল। তার দিকে একনজর তাকালেই তার অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা হয়ে যায়।

সুরমা শিউরে উঠে চোখ বোজে।

মহেশ্বর নাম ধরে ডাকতে সমীর অতিকষ্টে চোখ মেলে তাকায়।

খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে বিহ্বলের মতো চেয়ে থাকে।

সুরমা তার গায়ে হাত দেয়।

জ্বর নেই দেখে সে পরম স্বস্তি বোধ করে।

মহেশ্বর বলে, আমাদের চিনতে পারছ না ?

একটু মাথা হেলিয়ে সমীর জানায়, চিনতে পেরেছে।

কথা বলবার জন্য ঠোঁট ফাঁক করে, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয না।

মহেশ্বর মেয়ের মুখের দিকে তাকায়।

একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি ?

আনো।

অগত্যা বাড়িতেই আনতে হয় সমীরকে।

উপায় কী। সত্যই তো তাকে প্ল্যাটফর্মে পড়ে একলা একলা বিনা যত্নে বিনা চিকিৎসায় মবতে দেওয়া যায় না—যত অন্যায়ই সে করে থাক ! যথাসাধ্য চেষ্টা করতেই হবে তার মরণকে ঠেকাবাব জন্য।

যদি বাঁচানো যায় তাকে, যদি সুস্থ সবল করে তোলা যায় চিকিৎসা আর সেবা দিয়ে, হযতো শক্তি ফিরে পেলেই আবার নিজের মূর্তি ধরবে।

কিংবা হয়তো এই অভিজ্ঞতা মোড় ঘুরিয়ে দেবে তার জীবনেব।

দেখা যাক কী দাঁড়ায়।

জামাকাপড় ছাড়িয়ে সমীরকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়—জীবনটা এভাবে ধ্বংস না করলে এ বাড়িতে এসে যে খাটের যে বিছানায় মহাসমাদরের সঙ্গে শোয়ার অধিকার তার সর্বজনস্বীকৃত ছিল !

বিপিনকে ডাকা হয়।

বিপিন খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে সমীরকে, ডাক্তারের পক্ষে যতখানি যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব।

পরীক্ষা শেষ করে বলে, একটু গরম দুধ আনতে হবে।

সুরমার বাচ্চা দুটির জন্য যে দুধটুকু ছিল সেটা গরম করে এনে সমীরকে খাইয়ে দেওয়া হয়।

দুরুদুরু বুকে সকলে অপেক্ষা করে ডাক্তারের রায় শোনার জন্য।

বিপিন পরমেশ্বরের ঘরে গিয়ে বলে, ওষুধ একটা লিখে দিচ্ছি—তবে ওষুধের চেয়ে সেবা আর পথ্যের দরকার বেশি। আর কিছু হয়নি, শরীরটা একটু দুর্বল।

একটু দুর্বল ? একটু ?

সুরমা ঠোঁট কামড়ায়।

পরমেশ্বরে বলে, খেতে না পাওয়াটা রোগ নয় কিন্তু না খেয়েও মানুষ মরে ভুলিস না।

সুরমা ঢোক গেলে।

পরমেশ্বর আবার বলে, না মনে কোনো খটকা রেখো না। সেটা কিন্তু বোকামি হবে। ঘরে এনে তুলেছ, সেবাযত্ন করতেই হবে। মন খুলে দরদ দিয়ে না করলে ও সেটা টের পেয়ে যাবে। মনে রাখিস, সেবাযত্ন দরদের স্বাদ পেয়ে হয়তো ওর জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে। অন্তত আমরা তাই আশা করব।

সুরমা নিশ্বাস ফেলে বলে, তা ঠিক।

সাধন সমীরের ওষুধ আর পথ্য আনতে যায়।

সুরমা যায় সমীরের কপালে হাত বুলিয়ে দিতে। কর্তব্য পালন করতেই হবে তাকে।

মানুষ খবর নিতে আসে।

পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই আসে বেশি।

মজা দেখতে অবশ্য আসে দু একজন কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ আসে কৌতূহল মেটাতে।

বস্তি থেকে ডুমুর পর্যন্ত জানতে আসে—জামাই এসেছে নাকি ?

সকলকেই বলা হয় জামাইয়ের বড়ো অসুখ।

কী অসুখ ? না, সাধারণ অসুখ।

সুরমা বলে, কী বিশ্রী কৌতূহল মানুষের।

পরমেশ্বর শুনে বলে, তোর কী কিছুতেই শিক্ষা হবে না ? জীবনের অ আ ক খ ও শিখবি না ? এ কৌতূহল সস্তা হল তোর কাছে ? চারিদিকে কত মানুষ খাপছাড়াভাবে মরছে—কে কার খবর রাখে ? তোর স্বামী মর-মর অবস্থায় এসেছে শুনে সবাই খবর জানতে এল, এর চেয়ে খাঁটি দরদ আছে নাকি ? তুই কি চাস যে তোর সোয়ামির অসুখ বলে পৃথিবীর সব লোক বুক চাপড়ে কাঁদবে ? কৌতূহল হল, খবর নিতে হল—এতেই তো তুই ধন্য হয়ে যাবি।

আমার মাথার ঠিক নেই জ্যাঠামশাই।

পরমেশ্বর তার মাথায় হাত রেখে বলে এ অবস্থায় মাথায় ঠিক না থাকাই ভালো।

সবিতাও যখন বেশি রাতে খবর নিতে আসে সুরমা তখন আর বিরক্ত হয় না।

বলে, এসো ভাই।

সমীরকে দেখে সবিতা বলে, ইস, কী চেহারা হয়েছে ?

সুরমাকে বাইরে ডেকে সবিতা বলে, এবার আর ছেড়ো না কিন্তু। প্রাণপণে আঁকড়ে থাকবে। এ সব মানুষকে গায়ের জোরে মায়া করে ঠিক রাখতে হয়।

গায়ের জোরে মায়া ?

হ্যাঁ, শক্ত তেজি মায়া। এক রকম মায়া আছে না, ভীরু তুলতুলে মায়া, কেঁদে-কঁকিয়ে দরদ দেখানো ? এ সব মানুষের ও জিনিস মোটে পছন্দ নয়। ওভাবে কিছু করতে বারণ করলে এরা সেটা করবেই। এদের জোর করে বলতে হয় তোমায় আমি এভাবে নিজের অনিষ্ট করতে দেব না, তোমায় দরদ করি বলে তোমায় ঠেকাবার অধিকার আমার আছে, দেখি তুমি কী করে এটা কর।

সুরমা আশ্চর্য হয়ে বলে, ক-টা স্বামী নিয়ে ঘর করেছিস ভাই ? এ সব জানলি কী করে ?

সবিতা হেসে বলে, স্বামী নিয়ে ঘর না করলে বুঝি এ সব জানা যায় না ? আমার মতো রাস্তায় বেরোও, দশটা লোকের সঙ্গে কারবার কর, কোন মানুষটার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করতে হয় শিখিয়ে দিতে হবে না।

তাই নাকি !

তবে ? দু-তিনবছরে আমার যে কত জ্ঞান বেড়ে গেছে ভাবলে অবাক হয়ে যাই। আমার কথাটা ভুলো না ভাই। সমীরবাবুর প্রকৃতি জানি তো। তুমি কাঁদাকাটা করেছ, নয় রাগাবাগি ঝগড়াঝাঁটি চালিয়েছ—তাই ঠেকাতে পারনি। এ সব না করে যদি ভালোবাসার জোর খাটাতে মানুষটা তাহলে কখ্খনো এ রকম হতে পারত না, একটা সীমা রেখে চলত।

সুরমা আশ্চর্য হয়ে সবিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মনে হয় খুব বড়ো একজন বিজ্ঞ মানুষের কাছে সে তার দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার সঠিক ব্যাখ্যা শুনছে।

পরমেশ্বর পর্যন্ত তাকে যে ব্যাখ্যা শোনাতে পারেনি।

সে ধীরে ধীরে বলে, দাদা বস্তিতে গিয়ে তোমার সঙ্গে বেশি মেশে বলে আমরা বিরক্ত হই। এখন দেখছি আমরাও তোমার সঙ্গে একটু মিশলে ভালো করতাম।

সবিতা সলজ্জভাবে হেসে বলে, রাত হল, পালাই।

সাধন সুরমাকে জিজ্ঞাসা করে, সবিতা এতক্ষণ তোমাকে কী বলছিল ?

বলছিল ওর বিগড়ে যাওয়ার পিছনে আমারও দোষ ছিল, আমি ঠিকভাবে চলতে পারিনি।

তা তোরও দোষ ছিল বইকী।

কতটা দোষ ছিল ভালো করে বুঝতে হবে।

রাত বাড়ে।

চারিদিকে নিঝুম হয়ে আসে।

সমীর খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে সুরমা মেঝেতে শোওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

সুরমার ঘুম আসে না।

সে টের পায় পাড়া ঘুমিয়ে পড়ছে, এলাকা ঘুমিয়ে পড়ছে, চারিদিক কাঁপিয়ে শুধু রাস্তা দিয়ে চলছে শেষ দু-একটা বাস।

সুরমা আকাশ-পাতাল ভাবে।

কতকাল পরে স্বামীকে ঘরে পেয়েছে। খাটে শুয়ে ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে এপাশ ওপাশ করছে।

তার মনে কিন্তু আশা নেই, আনন্দ নেই, স্বস্তি নেই। অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তা আর অতীতের স্মৃতি যন্ত্রণার মতোই চাপ দিচ্ছে মাথার মধ্যে।

স্টেশনে পড়ে থাকলে হয়তো মরে যেত।

এবাবের মতো সমীর মরবে না।

কিন্তু কী হবে তার ?

এমনিভাবে কে কতবার ঠেকিয়ে রাখবে তার অপমৃত্যু ?

আপনজনের আশ্রয় আপনজনের সেবাযত্নে সুস্থ হয়ে উঠে সে তো আপন হবে না। অশান্তিতে আবার সে অসহ্য করে তুলবে সকলের জীবন। আবার তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে বাড়ি থেকে।

কিছুদিন পরের এই আগামী ঘটনার কথা কল্পনা করে সুরমা শিউরে ওঠে।

কেন তাদের খবর দিতে যায় সমীর, শেষ দেখা দেখতে চায় ছেলেমেয়েকে ? কেন সে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে নিঃশব্দে চুপচাপ মরে গিয়ে তাদের রেহাই দেয় না, নিজে রেহাই পায় না ?

ঘরের আলো জ্বলে উঠায় সুরমা চমকে ওঠে। খাট থেকে নেমে সমীর নিজে আলো জ্বেলেছে !

ধড়মড় করে উঠে বসে সুরমা, পলকহীন চোখে মানুষটার দিকে চেয়ে থাকে।

সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন ভলান্টিয়ারের সাহায্যে যাকে স্টেশন থেকে গাড়িতে তুলতে হয়েছিল, বাড়ির সকলে ধরাধরি করে গাড়ি থেকে নামিয়ে খাটে শোয়াতে হয়েছিল, মাঝরাত্রে এখন নিজেই সে নেমে দাঁড়ায় খাট থেকে সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো।

নিজে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালে, কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খায় !

নতুন আতঙ্কে বুক কেঁপে যায় সুরমার। কে জানে কী ভয়ানক মতলব নিয়ে এই কৌশলে সমীর বাড়িতে ঢুকেছে, মাঝরাত্রে সুবিধামতো এবার নিজের মতলব হাসিল করবে !

সুরমার মনে পড়ে ডাক্তারের কথা—একটু দুর্বলতা ছাড়া সমীরের কিছুই হয়নি। একটু দুর্বলতা ! ডাক্তারের কাছে তো ফাঁকি চলে না।

জল খেয়ে সমীর একটু তফাতে বিছানায় বসে। বিশ্বাস করো, তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। আমার কোনো খারাপ মতলব নেই।

সুরমা একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সমীর বলে, ভেবেছিলাম দু-তিনদিন সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হব। দু-তিনদিন তোমাদের কাছে পাব, সেবা পাব—এটাই আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আর ছলনা ভালো লাগছে না। তোমার সঙ্গে কথা না কয়ে আর চুপচাপ পড়ে থাকতে পারলাম না।

আবার তুমি আমাদের ঠকালে ?

ঠকিয়েছি—কিন্তু এবার আমার মতলব ভালো।

সুরমা চুপ করে থাকে।

সমীর বলে, বিশ্বাস হয় না ? না হওয়াই উচিত। কিন্তু এখন যা হোক কাল তোমার বিশ্বাস হবে—অন্তত খানিকটা নিশ্চয় হবে। আমি নিজেই সকালে চলে যাব, টাকাও চাইব না, কিছু চুরিও করব না।

এ রকম করার মানে কী ?

মানে ? মানেও তুমি বিশ্বাস করবে না আজ। আমি জীবনের মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করছি। তোমাদের কাছ থেকে একটু মনের জোর জোগাড় করতে এসেছি। মনটা বড়ো দুর্বল হয়ে গেছে সুরমা। তোমাদের দেখে গেলাম—যদি মানুষ হতে পারি দুবছরে হোক পাঁচবছরে হোক, তোমাদের কাছে এসে দাঁড়াতে পারব।

সুরমা খানিক চুপ করে থাকে। কে জানে এ আবার কোন খাপছাড়া নাটকের ভূমিকা ?

সোজাসুজি এ কথা বলে এলেই হত !.

তুমি দেখা করতে আমার সঙ্গে ?

সুরমা চুপ করে থাকে।

সমীর বলে, অনেকবার পাঁক থেকে উঠবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। তোমাদের কাছে মনের জোর খুঁজতে এসেছি বললাম—কিন্তু মিথ্যে বলব কেন, তোমাদের জন্য মন কেমন করেছে কিন্তু তোমাদের জন্য নিজেকে শোধরাবার মতো মনের জোর পাইনি, স্রোতে ভেসে গিয়েছি। সব চেয়ে বেশি কাবু হতাম কীসে জানো ?—হতাশায়।

হতাশা ! কানে কথাটা বাজে সুরমার। আর কী হতাশায় সে কাবু হয় না ?

কুঁজো থেকে সে আরেকটু জল গড়িয়ে খেয়ে আসে।

সে কেমন হতাশা তুমি বুঝবে না। নিজেকে শুধরে নেব ভাবি কিন্তু জানি সেটা অল্পে হবে না, দুদিনে সহজে সম্ভব করা যাবে না। যা ভেঙেছি আবার তা গড়তে হলে অনেকদিন ধরে অনেক কষ্টে গড়তে হবে। এ কথাটা ভাবলেই মাথা ঘুরে যেত, নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হত। ভাবতাম, আমার পক্ষে আর তা সম্ভব নয়, ও সব মিথ্যা স্বপ্ন দেখে আর লাভ নেই।

সমীর একটু চুপ করে থেকে বলে, কারা আমায় এই হতাশা জয় করতে শিখিয়েছে জানো ?— উদ্‌বাস্তুরা।

উদ্‌বাস্তুরা ?

সমীর সায় দিয়ে বলে, উদ্‌বাস্তুরা। ওরা আমায় শিখিয়েছে কখনও কোনো অবস্থাতে মানুষের হতাশ হতে নেই—সব সময়েই আশা নিয়ে থাকতে হয়। অনেকদিন পথে পথে ঘুরেছি তো। সারাদিন পয়সা উপায়ে ফন্দিফিকির নিয়ে ঘুরি, রাত্রে স্টেশনে ওদের মধ্যে শুয়ে থাকি। ওদের দেখি আর অবাক হয়ে যাই। যথাসর্বস্ব গেছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে কী করবে কোথায় যাবে কিছুই ঠিক নেই, কারও হয়তো একবেলা খেলে আরেকবেলা খাওয়া কোথা থেকে জুটবে জানা নেই--কিন্তু কী মনের জোর ! হাল ছেড়ে ভেসে যাবে না কিছুতেই, একদিন আবার সব হবে। যতদিন কষ্ট করতে হয় করবে। কেউ যদি সাহায্য করে ভালো, না করলে নিজেরাই চেষ্টা করবে উঠতে। যার যত বেশি দুর্গতি তারই যেন তত বেশি আশা, তত বেশি মনের জোর।

সুরমা চুপ করে শোনে।

একটু থেমে সমীর বলে, ওদের সঙ্গে মিশতে মিশতে আমারও মনের মোড় ঘুরে গেছে। ওরা পারলে আমি কেন পারব না ? ওরা হাল ছাড়েনি, আমি কেন হাল ছাড়ব ? আমার বরং ঢের বেশি সুযোগ-সুবিধা। যে বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছি সেটা ফিরিয়ে আনতে পারলে আত্মীয়স্বজন সবাই আমাকে সাহায্য করবে।

মিথ্যে কথাকে, বানানো কথাকে সত্যের মতো করে বলার অভিনয়ে বরাবর সমীর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। বারবার ঠকেও আবার বিশ্বাস করতে হয়েছে তার কথা। কিন্তু আজ যেন তার বলার কায়দার জন্য নয় তার কথার মধ্যেই সহজ সরলতার একটা নতুন সুর শোনা যায়।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও হয়, একটু যেন ভরসাও হয়।

বহুকাল পরে মাঝরাত্রে একঘরে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে বসে সত্যই আবার নতুন আশার ক্ষীণ গুঞ্জনের সুর ওঠে সুরমার মনে !

পরমেশ্বরের কথা মনে পড়ে। সমীর অসাধারণ মানুষ--তার অসাধারণত্ব খারাপ দিকে ঝুঁকেছে তাই, অন্যদিকে ঝুঁকলেও সে অসাধারণ মানুষ হতে পারত।

সে অসাধারণত্বের নতুন পরিচয় কি সমীর এবার দেবে ?

ধীরে ধীরে সুরমা বলে, তোমার মন বদলে গেছে বলছ। এটা কী তার নমুনা ? এ সব কথা চিঠিতে লিখলেই হত সোজাসুজি ? এ রকম ছলনা করা উচিত হয়নি।

তোমরা কি বিশ্বাস করতে ?

প্রথম প্রথম নাই বা করতাম ? আমাদের বিশ্বাস জন্মাবে এটাও তোমার ভালো হবার চেষ্টা করারই শামিল। সত্যি যদি তুমি ভালো হতে চাও ক-দিন আমরা তোমায় অবিশ্বাস করব ? তোমার সুমতি হোক, তোমায় বিশ্বাস করা যাক, এটাই তো আমরা সবাই মানত করছি দিনরাত।

সমীর চুপ করে ভাবে।

সুরমা চোখ নামায়। আপশোশের সঙ্গে বলে, তোমার মনটাই বাঁকা হয়ে গেছে, নইলে এ রকম কৌশলে এখানে আসবার কথা মনেও আসত না তোমার। তুমি কী করে ভালো হবে, নিজেকে বদলে দেবে ?

সমীর উৎসাহিত হয়ে বলে, কী আশ্চর্য, তুমিও সে কথা ভেবেছ ? খাটে শুয়ে শুয়ে আমিও এই কথাটাই ভাবছিলাম—আমার মন বাঁকা হয়ে গেছে। তোমাদের কাছে দুদিন থাকব, তোমাদের দেখে মনের জোর পাব,—এ জন্য তোমাদেরই যে ধাপ্পা দিচ্ছি, আগে এটা খেয়ালও হয়নি। কী রকম একটা উত্তেজনার ভাব এসেছিল, এখানে আসার পর ধীরে ধীরে সেটা কেটে গেছে। ভেবেছিলাম তিন-চারদিন তোমাদের কাছে থাকব, কিন্তু বুঝতে পারলাম যে, না, এটা করা আমার উচিত হয়নি। সেই জন্যই উঠে পড়লাম —ছলনার জের টানব না।

ছেলের গায়ে হাত রেখে সে আবার বলে, আমি যা চাইছিলাম, পেয়ে গেছি সুরমা। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে শান্ত হয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে শুতে কেমন লাগে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ আবার ধরতে পেরেছি।

সে একটু হাসে।

বাঁকা মনটাও সোজা হচ্ছে। উঠবার সময় ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে কথা বলে এই রাত্রেই চলে যাব। বেশ একটা নাটক করা হবে।

কিন্তু আর নাটক ভালো লাগছে না। কাল সকালে চা-টা খেয়ে যাব ঠিক করেছি।

সেই ভালো।

ভোরে ঘরের বাইরে যেতেই দেখা যায় পরমেশ্বর কলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে।

তাকেই খুঁজছিল সুরমা।

তাকে সে সব জানায়।

এ তো সুখবর।

সুরমা চিন্তিত মুখে বলে, কিন্তু আমার যে খটকা যাচ্ছে না ? মনে হচ্ছে, সবটা আরও বড়ো একটা ছলনা ? বাইরে কষ্ট পাচ্ছে, আমাদের এখানে থাকবার মতলব করে এ সব করেছে, এ সব বলছে ? ভেবেছে, আমরা এবার থাকতে বলব ?

বেশ তো। তাতে হয়েছে কী ?

আমি ভাবছি, থাকতে বলব না। চলেই যাক—সত্যি সত্যি যদি শোধরায় মানুষটা, সে তো আর অজানা থাকবে না।

পরমেশ্বর হেসে বলে, তুইও ওর সঙ্গে মতলবের পাল্লা দিবি নাকি ?

সুরমা চুপ করে থাকে।

তোরও মাথা খারাপ হয়েছে। কষ্ট পাচ্ছে বলে ক-দিন বাড়িতে একটু আরামে যদি থাকতেই চায়—তুই তাতে বাদ সাধবি ? রাস্তায় পড়ে থাকবে—এই তোর ইচ্ছা ? আমি ভালো হতে চাই বলে যতবার আসবে ততবার সুযোগ দিতে হবে। ঠকিয়ে যায় ঠকবি। এদিক থেকে আমরা একেবারে নিরুপায়—আমাদের যে আশা করতেই হবে। প্রত্যেকবার ভাবতেই হবে যে আগে অনেকবার ধাপ্পা দিয়েছে, কিন্তু এবার হয়তো সত্যি নিজেকে শোধরাতে চায়।

সুরমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবে।

যতবার ভালো হবার সুযোগ চায়, ততবার সুযোগ দিতে হবে !

তারা নিরুপায় !

সমীরকে চা আর খাবার দিয়ে সুরমা বলে, ভালোই যখন হতে চাও, তুমি বরং এখানেই থাকো। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে কেন ? শরীরটা ভালো করো, কাজের চেষ্টা করো।

সমীর মাথা নাড়ে।

স্পষ্ট ভাষায় জোর দিয়ে বলে, না। তোমাদের আদলে মন নরম হয়ে যাবে। আমি ভাবছি, কোনো উদ্‌বাস্তু কলোনিতে নিজে হোগলার কুঁড়ে তুলে থাকব। মাঝে মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাব।

থাকতে বললেও সমীর থাকতে চায় না !

সত্যই তবে সে ছলনা দিয়ে অভিনয় দিয়ে মন ভুলিয়ে তাদের কাছে আরামে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবার মতলব নিয়ে আসেনি ?

মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুরমার।

সে বলে, দ্যাখো, নিজেকে শোধরাবার জন্য তুমি যা দরকার করবে, আমি জোর করে বাধা দেব না। তুমি আবার আশা জাগালে, কোথায় পড়ে আছ কত কষ্ট পাচ্ছ ভেবে প্রাণটা আমার ছটফট করবে, তবু তোমায় জোর করে থাকতে বলব না। তুমি নিজে যদি মনে কর আমাদের কাছে থাকলে মন নরম হবে না, তবেই তুমি থেকো। একটা কথা বলি তোমায়, আমি কিন্তু আর সেই সুরমা নেই। আমি তোমায় দুর্বল করে দেব না, বরং মনের জোর বাড়াতেই সাহায্য করব।

সমীর চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুরমা আবার বলে, উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে থাকতে চাও, একলা কেন ? আমিও তোমার সঙ্গে থাকব, কষ্ট করব।

সমীর ম্লানমুখে বলে, এখন যে চালাতে পারব না। শরীরটা একটু ভালো না হলে—

সুরমা জোর দিয়ে বলে, তাহলে তোমার এখানে থাকাই উচিত। উদ্‌বাস্তুদেব মধ্যে মনের জোর খুঁজে পাও, বাড়ি থেকে ওদের মধ্যে যাবে, মেলামেশা করবে। এই তো সামনের বস্তিতে কত ঘর উদ্‌বাস্তু আছে। সময়মতো খাওয়া আর নিয়মমতো ঘুমোতে পারলে তবেই তো শরীরটা সারবে তাড়াতাড়ি ? শরীর ভালো হলে দেখবে মনের জোরও বেড়ে গেছে।

সমীর ইতস্তত করে।

সুরমা কৃতজ্ঞতা বোধ করে সবিতার কাছে।

এই কথাই তো সবিতা তাকে বলেছিল—দুঃখে আনন্দে কেঁদে ফেলার বদলে ভালোবাসার জোর খাটিয়ে সমীরের যা করা উচিত তাকে দিয়ে তাই করিয়ে নেওয়া !

নিজের কথা না ভেবে, নিজে বিচলিত না হয়ে যেভাবে যে উপায়ে সম্ভব অসুস্থ বিকারগ্রস্ত মানুষটার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা, যতটা সম্ভব তার মনকে বশে রেখে ঠিক পথে পরিচালিত করা।

ঠিক কথা। মন তো সত্যই দুর্বল হয়ে গেছে সমীরের, তার দ্বিধা সংশয়ের অন্ত নেই। জোর করে ভরসা না দিলে, তাকে সাহায্য না করলে ঠিক পথে পা চালাতে সে মনের জোর কোথায় পাবে ?

সমীর সংশয়ভরে বলে, আমার কেমন সংকোচ বোধ হচ্ছে ! এত কাণ্ড করে কীভাবে এখন আরামে থাকব, সকলকে মুখ দেখাব ?

শুনে প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায় সুরমার। সমীরের সংকোচ বোধ হচ্ছে ! হৃদয় তার ভোঁতা হয়ে যায়নি, নিজের অপরাধের জন্য সে লজ্জা বোধ করতে পারে।

বুকে যেন নতুন বল নতুন ভরসা পায় সুরমা।

সে সমীরের কাছে সরে যায়।

এটাই তুমি ভুল করছ। একেবারে উলটো হিসাব করছ। তুমি স্বভাব ভালো করবে স্বাস্থ্য ভালো করবে সে জন্য যদি কয়েক মাস বসে বসে খাও বাড়ির সকলেই বরং কৃতার্থ হয়ে যাবে।

কোনোদিন নেশা-টেশা করে বসব—

বসবে। তুমি নেশা ছাড়বার চেষ্টা করছ নেশা কমিয়ে দিয়েছ শুধু এইটুকু প্রমাণ দেখালে একদিন নেশা করেছ বলে কেউ কিছু মনে করবে না। এই সোজা কথাটা কে না জানে বলো যে লাফিয়ে গাছে ওঠা যায় না ?

সমীর চেয়ে থাকে।

সুরমা বলে, তাছাড়া, নেশা ছাড়তে শুধু মনের জোরের ওপব নির্ভর করবে কেন ? এখানে থাকলে তুমি ডাক্তারের সাহায্য পাবে, কাজটা আবও সহজ হবে।

তবু সমীর ইতস্তত করে বলে, কেবল তোমার কথায় থাকাটা—

সুরমার প্রাণ আরও জুড়িয়ে যায়। এটুকু আত্মমর্যাদা জ্ঞানও বজায় আছে।

শ্বশুরের নামে পাড়ার লোকের কাছে টাকা ধার করে, পূজার খবচের টাকা চুরি করে সে একদিন পালিয়ে গিয়েছিল এ বাড়ি থেকে, তাবপর ভিখারির মতো সামান্য ক-টা টাকার জন্য শ্বশুরের কাছে এসে হাত পাততে তার বাধেনি, তবু এ চেতনা তার টিকে আছে যে শুধু বউয়ের কথায় শ্বশুরবাড়ি থাকা জামাইয়ের পক্ষে মর্যাদাজনক নয় !

সুবমা শান্তকণ্ঠে বলে, আমাব কথায় নয়। শোনো তোমায় বলি। তুমি সব বলবার পরেও আমার মনে খটকা ছিল তুমি আসলে কিছুদিন আবাম করার ফিকিবেই এসেছ। আমিই ভাবছিলাম তোমাকে থাকতে বলব না। ভোরবেলা জ্যাঠামশাই শুনে আমায় ধমকে দিলেন। তোমাব যে খাবাপ মতলব নেই কখন আমার পুরো বিশ্বাস হল জানো ? থাকতে বলতেও তুমি নিজেই যখন থাকতে চাইলে না।

তার এই সবলতা যেন সমীরকে খুশি কবে।

সে একটু ভাবে।

থাকাই ভালো বলছ ?

হ্যাঁ, থাকো।

সুবমা বিনা দ্বিধায় বলে !

সমীবের মুখে ক্ষীণ একটু হাসির আভাস দেখা যায়।

আমার মাথা ঘুরছে, সব যেন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। তবু আমাব কী মনে হচ্ছে জানো ? আমি যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কোনো একটা উদ্ভট দেশে চলে গিয়েছিলাম। এবাব ধীরে ধীরে ঘোর কেটে গিয়ে চেতনা ফিরে পাচ্ছি।

সুবমা তার হাত চেপে ধরে।

বলে, আমার দোষও কম নয়। আমি কেবল নিজের কথাই ভেবেছি।

সে কেঁদে ফেলে সমীরের কোলে মুখ গুঁজে দেয়।

পনেরো

সূর্যের আলোয় আজ যেন অনেক বেশি রং। কুৎসিত জগৎটা আজ যেন চেহারা পালটে রূপবতী হতে শুরু করেছে।

একটু বেলা বাড়তেই সুরমা হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে বস্তির দিকে এগিয়ে যায়।

সবিতার সঙ্গে কথা বলার জন্য তার প্রাণটা ছটফট করছিল।

ডুমুর বলে, ওমা ! আজ কে এসেছে গো ? অ সবিতা দিদি, ঘর থেকে বেরিয়ে দেখবে এসো।

রোয়াকে পিড়ি পেতে দিয়ে বলে, এসো সুরমাদি বোসো। সকালবেলা হঠাৎ ?

সবিতার সাথে কথা কইতে এলাম।

ডুমুর ছদ্ম অভিমানে কচিমেয়ের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, মোর সাথে নয় ?

সুরমা হেসে বলে, তোমার সাথে নয় মানে ? তোমার বাড়ি এলাম কী তোমায় বাদ দিয়ে কথা কইতে ?

ডুমুরের বাস্তববুদ্ধি আছে। সবিতা বেরিয়ে এলে দু-একটা কথা বলেই সে সরে যায়।

সবিতা বলে, কী ব্যাপার দিদি ?

এমনই এলাম কথা কইতে। তোমার উপদেশ যে আমার কত উপকারে লেগেছে কী আর বলব তোমায়।

অত বাড়িয়ো না—মুখ্যু গেঁয়ো মানুষ, অহংকারে ফুলে যাব।

রোয়াকে উঠে বসতে গিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে সুরমা আশ্চর্য হয়ে যায়।

ঘরে বসে সাধন কতগুলি জুতার সোল গুছিয়ে রাখছে।

সবিতা বলে, ধরা পড়ে গেলেন, আমার কিন্তু দোষ নেই। বাড়িতে মানুষ এলে বসতে দিতে হয়।

সুরমা আরও আশ্চর্য হয়ে বলে, ধরা পড়ে গেল মানে ?

আমার ঘরে বসে তোমার দাদা জুতোর সোল ঘাঁটছে। মানেটা তো এবাব তোমার বুঝিযে বলতেই হবে সুরমাদি ? তোমাদের কাছে গোপন যা করেছিলেন সেটা ধবা পডে গেল।

সুরমা শুধু বলে, কী যে কাণ্ড তোমরা ব্যাটাছেলেরা জুড়েছ !

সাধন রোয়াকে বেরিয়ে এসে বলে, বাড়িতে বলিস না।

কী বলব না বাড়িতে ? আমি তো মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারিছ না।

আমি আজকাল জুতোর সোল ফিরি করছি।

ও !

সুরমা কয়েকবার ঢোক গেলে।

আমাদের কাছে গোপন করে কেন ?

মা-বাবা জানতে পারলে হার্টফেল করবে তাই।

হার্টফেল করা দোষেব কী ? লেখাপড়া শিখে শেষে এই দশা হল তোমার ? জুতোর সোল ফিরি করছ !

সবিতা হেসে বলে, তুমিই যেন হার্টফেল কবে ফেলো না সুরমাদি !

আমাব হার্ট শক্ত আছে। স্বামীর পাগল হওয়া সয়ে গেছে, দাদা জুতোর সোল ফিরি করছে শুনে হার্টফেল করব ?

সাধন জিজ্ঞাসা কবে, সমীর এবার কেন এসেছে রে ? ও কী জানে না বাবা বাড়িতে পুজো বন্ধ করেছেন, আমি বেকার বসে আছি, মাছ-দুধ খাওয়া বন্ধ হয়েছে ?

সুরমা কড়া সুরে বলে, তোমাদের ঘাড় ভাঙতে আসেনি। মাথার কঠিন অসুখ হয়েছিল, পাগল হয়ে যেতে বসেছিল, তোমরা পাত্তা দিয়েছিলে ? একলাটি রোগে ভুগেছে, নিজেই নিজের চিকিৎসা করেছে ! ক-বছর ধরে এতবড়ো একটা ভয়ানক অসুখ গেল, সেরে উঠবার সময় ক-দিন আমার কাছে একটু থাকতে এসেছে।

একটু থেমে বলে, শরীরে মনে মানুষটা একটু বল পেলেই আমরা চলে যাব দাদা। তোমাদের ঘাড়ে চেপে থাকব না।

মুখ লাল হয়ে যায় সাধনের।

সাধন বলে, দিনে দু-তিনটের বেশি সিগারেট খাই না জানিস ? সিগারেটের বদলে বিড়ি ধরেছি ?

জানি বইকী। আমরা বিড়ি সিগারেটের গন্ধের তফাত বুঝি না ?

বিড়ি আর দু-তিনটে সিগারেটের পয়সা পর্যন্ত বাবার কাছে হাত পেতে চেয়ে নিতে হয়।

সুরমা ম্লানমুখে চুপ করে থাকে।

সাধন বলে, জামাকাপড় চাইতে হয় না। বাড়িতে লুঙ্গি পরি, বাইরে বেরোবার জামাকাপড় আস্ত আর ফরসা আছে কি না মা নজর রাখে। চাকরির খোঁজে বাইরে বেরোই কিনা। আগে বাবা বেরোতে দেখলেই জিজ্ঞাসা করতেন, টাকা নিয়েছ ? বাইরে বেরোলে দু-একটাকা সঙ্গে রেখো। এবার পুজোর দু-তিনমাস আগে থেকে বেরোচ্ছি দেখেও কিছু বলেন না। হাত পেতে চাইলে দ্যান কিন্তু চার আনা চাইলে কখনও পাঁচ আনা দ্যান না।

বাবার অবস্থাটা—

আহা, সেই কথাই তো বলছি। বাবা সাধে চার আনা চাইলে পাঁচ আনা দেন না ? না চাইলে কিছুই দেন না ? দেবার ক্ষমতা নেই বলেই দেন না। বাবার অবস্থাটা বুঝতে পারছি বলেই তো জুতোর সোল ফিরি করছি—হাতখরচের পয়সা চেয়ে যাতে বাবাকে বিব্রত না করতে হয়।

সুরমা কাতরভাবে বলে, কিন্তু দাদা—

সবিতা বলে, থাক না সুরমাদি ? মেয়েরা জগৎসংসারের অনেক ব্যাপার জানে না, কিন্তু যেটুকু জানে তাই নিয়ে কোমর বেঁধে তর্ক আর ঝগড়া করে।

সেটা বুঝি মেয়েদের দোষ ? পুরুষরা ও রকম বোকা হাবা করে রাখে কেন মেয়েদের ? জগৎসংসারের ব্যাপার জানতে দেয় না কেন ?

সবিতা নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে। কালও কী রকম কাদার মতো ছিল এই সুরমা, আজ তার কী তেজ !

সাধন বলে, শুধু হাতখরচ রোজগার করলে আমার চলবে কেন, এই কথা বলছিস তো ?

সুরমা নীরবে সায় দেয়।

সাধন বলে, আমিও তা ভেবেছি। কিন্তু অনেকবার অনেক রকম চেষ্টা করলাম—টাকাই শুধু লোকসান গেল। তার কারণ আর কিছুই নয়, এখনকার বাস্তব অবস্থার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। আমি বাস করছিলাম আরেক যুগে, কতগুলি মিথ্যা স্বপ্ন আর কল্পনা আঁকড়ে ছিলাম। আজকাল সকলের পক্ষেই আপিসে খেটে ব্যাবসা করে রোজগার করা কঠিন ব্যাপার—চোর-চামারদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয় কিনা। এ অবস্থাটা ভালো মতো জানা থাকলে রোজগার কিছু করতে পারি না পারি আমার ঘরের পয়সাগুলি অন্যদের আমার ঘাড় ভেঙে বাগাতে দিতাম না, বুঝতে পারলি ?

সবিতা বলে, আপনারা আছেন বলেই তো এত লোকের লোক ঠকানো ব্যাবসা চলে।

সুরমা সাধনকে বলে, তাই যদি বলো, তোমার যদি এ রকম অবস্থা হয় ও মানুষটার পক্ষে আবার সামলেসুমলে রোজগারপাতি করা কি সম্ভব হবে ? আমি বেশ খুশি মনে এসেছিলাম, তুমি আমায় দমিয়ে দিলে। ওর ব্যাপারটা সব খুলে বলি শোনো, নইলে আমার কথা বুঝবে না।

সুরমা সমীরের কাহিনি বলে।

সাধন ও সবিতা কান পেতে শোনে।

সুরমা বলে, আমি আহ্লাদে ডগমগ হয়ে সবিতাকে বলতে এলাম যে ওর পরামর্শ শুনে আমার কপাল ফিরেছে। আমি জোর দেখিয়ে ওকে আবোল-তাবোল এলোমেলো পথে নিজেকে শুধরোবার চেষ্টা থেকে ফিরিয়েছি, আমি ভার নিয়েছি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে ওকে সাহায্য করব। কিন্তু দাদা, পয়সা রোজগার করতে নেমে সুস্থ সমর্থ জোয়ান মানুষ তোমার যদি এই দশা হয়ে থাকে, ওর

কী দশা হবে ভাব তো ? একমাস দুমাস ধরে আমি নয় বাবার ঘাড় ভেঙেই ওর শরীর মনটা ভালো করলাম—তারপর ও তো নিজে রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে অস্থির হয়ে উঠবে ? তুমি যে চেষ্টায় ঘায়েল হলে, ও কী সেখানে কিছু করতে পারবে ? হতাশ হয়ে আবার বিগড়ে গিয়ে নিজেকে নষ্ট করবে মানুষটা।

সাধন বলে, কেবল নিজের হিসাব ধরলে কী আজকের দিনে চলে ? দশজনের কথা ভাবতে হয়। জীবনটা আবার নতুন করে গড়বার ইচ্ছা সমীর কোথায় পেল ? তোর কাছে পায়নি। অসহায় নিরুপায় মানুষেরা পর্যন্ত হাল ছাড়ছে না দেখেই তো !

একটু থেমে আবার বলে, দশজনের সঙ্গে মিলে পাড়ায় সার্বজনীন পুজোয় না নামলে বাবার কী দশা হত ভেবেছিস ? ঘরের পুজো বন্ধ করার শোকে বাবা পাগল হয়ে যেত।

সুরমা দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে।

সবিতা বলে, এতক্ষণ কথা কইনি, এবার মুখ খুলতে হল। সেই কথাই বলতে হল আবার, তুমি যা শুনে চটে গেলে। তুমি এত বেশি ভেবো না সুরমাদি। মনে রেখো, তুমি ঘরের কোনায় থাক, বাইরের জগৎটাকে চেনো না। যেটুকু চেনো সমীরবাবুকে দিয়ে আর বাপ-ভাইকে দিয়ে নিজের মনের মতো করে চেনো। সাধনবাবু এতদিন এলোমেলো চেষ্টা করে কাত হয়েছেন বলেই সমীরবাবু কেন লড়াইয়ের ঠিক পথটা ধরতে পারবেন না ? তোমার আমার ঘরোয়া হিসাবে মেয়েলি হাসিকান্নায় জগৎটা কিন্তু চলছে না সুরমাদি !

সুরমা অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, আমায় কী বোঝাচ্ছিস ভাই ? তিন বছর তাণ্ডব বয়ে গেল আমার ওপর দিয়ে। আমার কী বাকি আছে পুরুষদের ব্যাপার বুঝতে ? ঘরের কোণে থাকি বলেই আমার এ দশা, এটুকু বুঝিনে ?

সবিতা বলে, ওই তো বললাম। শুধু নিজেকে দিয়ে বোঝ ! তুমি আর তোমার স্বামীটি। জগতে তোমার মতো কত বউ কত স্বামী আছে জানো ? নিজের হিসাব আর নিজের স্বামীটির হিসাব দিয়ে জগৎটাকে বোঝা যায় না।

সুরমা চুপ করে থাকে।

সাধন একটা বিড়ি ধরায়।

সুরমা ডুমুরের দেওয়া পানের একটা লবঙ্গ খুলে মুখে দেয়।

সবিতা বলে, তোমরা ছিলে জমিদার ব্যাবসাদার জোতদারদের সঙ্গে—অনেক টাকাপয়সা প্রতিপত্তি ভোগ করেছে। সে অবস্থাটা ফিরিয়ে আনতে চাইলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। যে সব কর্তাব্যক্তিরা তোমাদের টাকা দিত, জমি দিত, মান-সম্মান দিত, আজকে তোমাদের দিয়ে তাদের কাজ চলে না। আগের মতো সহজে শোষণ তারা নিজেরাই চালাতে পারছে না। এখন নতুনভাবে নতুন উপায়ে নতুন লোক দিয়ে তারা নিজেদের বাঁচাতে চায়। তাই তোমাদের এই দুর্দশা। এটুকু না বুঝলে এক পা এগোতে পারবে না।

সুরমা নিশ্বাস ফেলে বলে, তুই বোন ব্যাটাছেলে গণেশ সেজে এসেছিলি না ?

সাধন বলে, সবিতা, তুমি আমার শেখানো কথাগুলি আমার বোনকে শোনাচ্ছ।

সবিতা বলে, সত্যি কথা কার কাছে শিখেছি কাকে শোনাচ্ছি ভাবলে কী চলে ? একজনের কাছে তো শিখতেই হবে। আপনিও কি শেখেননি অন্যের কাছে ?

সুরমা বলে, তুমি চুপ করো দাদা ! ওর কথা শুনতে দাও।

সবিতা বলে, আমার সেই পুরুষ সাজাটাই তোমাদের মিষ্টি লাগে। একটা মেয়েকে কেন পুরুষ সাজতে হয় ভেবেছ কী ? মেয়ে কেন এত অসহায় হয় এ দেশে ? নিজে তুমি মেয়ে সুরমাদি, নিজেই তুমি হিসেব কর না, স্বামীকে বাদ দিতে হলে কেন নিজেকে তোমার বিধবা ভাবতে হয় ? একটা পুরুষ

মানুষ জানোয়ারের অধম হয়ে গেছে, তবু হয় তাকে বাতিল করতে হবে, নয় ভাবতে হবে আমি বিধবা হয়েছি ! কেন ? আমরা মেয়েরা কী খেলার ঘুঁটি ? একটা পুরুষের সঙ্গে বনল না বলেই আমাদের জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে ?

সুরমা বলে, কী কথা থেকে কী কথায় এলাম।

সবিতা বলে, এটাই আসল কথা। তুমি বুঝতে পারছ না।

তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

কেন ? আমি তো খুব সহজ কথা বলেছি। স্বামী ছাড়া তোমার গতি নেই—স্বামীই সব।

যে আশায় আনন্দে ডগমগ হয়ে সুরমা ঘর থেকে বেরিয়েছিল, সব যেন উপে গেছে।

সে নিশ্বাস ফেলে বলে, সে তো জেনেছি অনেকদিন।

সাধনের মুখের দিকে চেয়ে সবিতা যেন অনুমতি চায় তার বোনকে কড়া কথা শোনাবার।

সাধন বিব্রতভাবে বলে, কী বলছ ?

বলব কথাটা আপনার বোনকে ?

বলো।

সবিতা সুরমার মুখের দিকে দুচোখ খুলে চেয়ে বলে, আমি তোমাদের রকম-সকম মোটে পছন্দ করি না সুরমাদি। স্বামী বিগড়ে গেছে, চুলোয় যাক। তাকে শুধরে নিতে না পারলে আমার জীবনও চুলোয় গেল, কীরকম হিসাব ?

সুরমা হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে পায়। মুখ উঁচু করে সে এবার একটু অবজ্ঞার হাসি হাসে।

হিসেব খুব সোজা। অন্য হিসেবের ব্যবস্থা নেই তাই এই হিসেব। অন্য হিসেব তৈরি হলে তখন দেখা যাবে।

সবিতা মুখ বাঁকায়।

আমরা এ রকম নরম হলে নতুন হিসেব তৈবি হচ্ছে ! সেই আশাতেই থাকো।

সবিতা রান্নাঘরে--ঘরে নয় চালায ছুটে যায়। যে শাকপাতাব চচ্চড়ি চাপিয়েছিল, সেটা পুড়ে যাচ্ছে। আলু পটলের দাম বড়ো বেশি। ডোবা পুকুরে জন্মায় অজস্র কলমি শাক। এতই অজস্র জন্মে যে গরিব দুঃখী তুলে এসে বাবুদের দুযারে বিক্রি করে। সেরখানেক শাক এনে দেওয়ার জন্য মজুরি পায় এক আনা।

তাই মানতে হয়।

বাড়ির কাছে পুকুবে ফুটে আছে, বাবুদের বউঝিরা নাইতে গিয়ে সাহস করে শুধু উপড়ে আনলে কলমি শাক বিনা পয়সায় ঘরে আসে।

তবু সেরখানেক শাক নিযে এক আনা পয়সা দেয বলেই তো এরা ভদ্রমহিলা।

সবিতা কলমি তুলে এনেছে নিজে।

ডাক্তার ডাকা হলে সমীর বিশেষ উৎসাহ বোধ করেনি।

ডাক্তার তার রোগের কী চিকিৎসা করবে !

সুরমা স্বামীকে বলে, তুমি সব কথা খুলে বলো ডাক্তারবাবুকে। বলো তো আমিও চলে যাচ্ছি।

সমীর বলে, তুমি থাকো।

অন্য সকলে চলে গেলে সমীর একটু হেসে ডাক্তারকে বলে, আমার হল চরিত্রের দোষ, স্বভাবের বিকার। আপনি কী ওষুধ দেবেন আমায় ?

ডাক্তারও হাসে।

মানসিক রোগের চিকিৎসা আমি জানি না, ওষুধ দিয়ে চরিত্রও সংশোধন করতে পারি না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বভাব বিগড়ে যাবার ফিজিক্যাল কজ থাকে। সব দিক দিয়ে ভালো মানুষ, একদিক দিয়ে মন্দ। কেন এমন হবে ? শরীরের মধ্যে নিশ্চয় কোনো খুঁত আছে। সেটা শুধরে দিয়ে হেলপ করতে পারি। নিজেকে আপনি শোধরাবেন নিজেই। যতটা পারেন খুলে বলুন।

সমীর বলে, ডাক্তারবাবু, শরীরে কোনটা খুঁত আছে, মনে খানিকটা পাগলামি আছে—এটাই তবে আসল রোগ ?

ডাক্তার হেসে বলে, শরীর সব মানুষের আছে, মনও আছে। মানুষের অনেক রকম রোগ—শরীরে মনে। শরীরের রোগ মনের রোগে তফাত করেছেন বড়োকর্তারা। আমরা কী করি, পেশার খাতিরে মেনে নিয়েছি। রোগীর বাস্তব অবস্থা আর পরিবেশ রোগের কারণ হলেও অনেক সময় আমাদের সেটাও ভুলে যেতে হয়। নইলে রোগীকে বলতে হয়, অসুখ সারিয়ে লাভ নেই, আবার হবে। নিজের অবস্থা বদলান বলার মানেও অনেক সময় দাঁড়ায় দেশের অবস্থা বদলাতে বলা।

সমীর এলোমেলোভাবে বলে যায় তার সব বিষয়ে সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে চলার ঝোঁকের কাহিনি, সব সময় রোমাঞ্চ আর উত্তেজনাব জন্য তার মনটার খাঁ খাঁ করবার কাহিনি, নিদ্রাহীন রাত্রিকে মদ দিয়ে বশ করার কাহিনি।

মদের পয়সা না থাকলে সস্তা ওষধি জাতীয় বিষের সাহায্য নেবার কাহিনি।

সুরমা পর্যন্ত টের পায় যে সে বাড়িয়ে বলছে, যতটা বাড়াবাড়ির কথা সে বলেছে ততটা বাড়াবাড়ি সত্যই করে থাকলে অনেক আগেই সে মরে যেত।

ডাক্তার বলে, বুঝেছি। ফিজিক্যাল অসুবিধাটাই আপনার প্রধান অসুখ। অবস্থা আর পরিবেশের চিকিৎসা আমি করতে পারব না, তাহলে ডাক্তারি ছেড়ে রাজনীতি ধরতে হয়। তবে আপনার মতো অবস্থা আর পরিবেশের সব মানুষ তো বিগড়ে যায় না—

সমীর মাথা উঁচু করে জোরের সঙ্গে বলে, আমার চেয়ে হাজার গুণ খারাপ অবস্থা আর পরিবেশেও হাজার হাজার মানুষ বিগড়ে যায় না। আমি নিজে দেখেছি।

ডাক্তার সায় দিয়ে বলে, আমিও তাই বলছি। আপনার শরীরের অসুবিধাটাই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার শরীরে কতগুলি দরকারি ভিটামিন নেই, আপনার লিভাবটার মেজাজ ভালো নয়, আপনার নার্ভগুলিতেও গোলমাল আছে। দেহে স্বস্তি না থাকলে মনের জোর খাটানো মুশকিল হয় বইকী। সেই জন্যই আমি ওষুধ আর পথ্যের ব্যবস্থা করছি, দু-চারদিনের মধ্যেই শরীর অনেকটা হালকা বোধ করবেন। নেশা কাটিয়ে ওঠা আজ যত কঠিন মনে হচ্ছে তখন আর ততটা কঠিন ঠেকবে না।

সমীর নিয়ে নিয়েই সুরমার গয়নাগুলি প্রায় শেষ করেছিল। দু-একখানা যা অবশিষ্ট ছিল তারই একটি সে সমীরের ওষুধ ও পথ্যের জন্য সাধনের হাতে তুলে দেয়।

সাধন বলে, চোখ-কান বুজে নিতেই হবে, না ?

সুরমা বলে, হাসিমুখেই নাও। বেশির ভাগ গেছে গোল্লায়, এটা সত্যিকারের কাজে লাগল। সুরমা সত্যই হাসে।

আজ সত্যি আশা করতে পারছি যে হয়তো একদিন আবার সব হবে।

তবে আমিই বা সংকোচ করি কেন ? আমিও আশা করি যে আজ তোর কাছ থেকে এটা নিতে হলেও একদিন হয়তো আমি তোকে ফিরিয়ে দিতেও পারব।

নিশ্চয় পারবে। চিরদিন মানুষের কী সমান যায়।

বোঝা যায় ডাক্তার আরও জোরালো করে দিয়ে গেছে সুরমার আশার বাস্তব সম্ভাবনা। নিরুপায়ের মতো নয়, সে আজ সতেজে আশা করতে পারছে।

সমীরকে সে বলে, পদ্মা ঠাকুরঝির বিয়ের খবর তুমি বোধ হয় কিছুই জানো না ?

লোকের মুখে শুনেছিলাম।

একবার দেখতে যাবে কেমন ঘবসংসার পেতেছে ?

ঠিকানা জানো ?

সুরমা তাকে পদ্মা ও কান্তিলালের আচমকা তাদের বাড়িতে আসার গল্প শোনায়।

বলে, বেশ সুখীই মনে হল ঠাকুরঝিকে। কলেজে পড়া এমন ফ্যাশুনে মেয়ে একজন ম্যাট্রিক পাস ড্রাইভারের সঙ্গে দিব্যি আছে। দেখে অবাক হতে হয়।

এ রকমটাই ওর দরকার ছিল। মার্জিত রুচি ভদ্র নরম মানুষের সঙ্গে ওর খাপ খেত না।

কাল-পরশুর মধ্যে বেরোবে ? গায়ে জোর পাবে ?

সমীর উৎসাহিত হয়ে বলে, আজকেই চলো। ট্রামে-বাসে যাব, গায়ে জোর পাব না কেন ? বিকালে তারা দুজনে বেরোয়।

সমীরকে বিছানা ছেড়ে উঠে জামাকাপড় পরে সুরমাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরোতে দেখে চোখে পলক পড়ে না বাড়িব লোকের।

সুভাগিনী আনন্দে কেঁদে ফেলে।

পবমেশ্বর বলে, এবার বুঝি একটা স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলতে পারবে মহেশ্বর।

মহেশ্বর বলে, ওদের বেড়াতে যাবার খরচটা পর্যন্ত আমাকে দিতে হয়েছে।

পরমেশ্বর নিজেই নিশ্বাস ফেলে বলে, হিসাবে ভুল কর কেন ? যাদের জন্য এত টাকা দিযে স্বাস্থ্য দিলে, তারা বেড়াতে যাবে বলে ট্রামে-বাসের ভাড়াটা দিতে তোমার কষ্ট হচ্ছে !

ষোলো

কান্তিলালের বাসার ঠিকানা খুঁজে নিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। শহরতলিতে বাসা হলেও কীভাবে চিনে যেতে হবে পদ্মা সেদিন ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

সমীরের চেহারা দেখে পদ্মা কেঁদে ফেলে।

এমনি করে শরীরটা শেষ করেছ ?

সমীর বলে, কাঁদিস নে। এক মাসের মধ্যে মুটিয়ে গেছি দেখতে পাবি

শুনে সুরমার আশান্বিত মনটা একটু বিগড়ে যায়। এ তো আরেক রকম ধাপ্পাবাজি। এক মাসের মধ্যে রোগ সারবে কিনা সন্দেহ, সমীর জোর গলায় বলছে সে মুটিয়ে যাবে।

ছোটো বাড়িটি পদ্মার। একখানা ঘর আর একটি টালির ছাওয়া রান্নাঘর। কে একজন নিজে বাস করার জন্য এক টুকরো জমিতে ব্যবস্থাটুকু করেছিল, কোনো কারণে নিজে থাকতে না পারায় কান্তিলালকে ভাড়া দিয়েছে।

বিয়েতে কিছুই পায়নি পদ্মা। গয়নাগাঁটি জামাকাপড় বাসনকোসন আসবাবপত্র এক রকম কিছুই নয়। বিধুভূষণ কিছুই দিতে দেয়নি, পদ্মার মা লুকিয়ে পাঠিয়েছিল গলার একছড়া হার এবং জ্যাঠামশায় ধরে দিয়ে গিয়েছিল নগদ কিছু টাকা।

সমীর তখন হাবুডুবু খাচ্ছে নিজের অধঃপতনে, সে জানতেও পারেনি তার বোনের একটা বেখাপ্পা বিয়ে হয়েছে—তার বোনেরই জিদে।

বিলাসের জিনিস ফ্যাশানের জিনিস নয়, ক্রমে ক্রমে সংসারের দরকারি জিনিস কিনে কিনেই পদ্মা ঘরখানা ছবির মতো সাজিয়েছে।

সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেলাইয়ের বড়ো মেশিনটা। তারা আসবার সময় পদ্মা বোধ হয় সেলাই করছিল, কয়েক রকম ছিট এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে।

অ্যাতো জামা সেলাই করছ ভাই ? এগুলো তো পরের জামা ?

পরের জামা সেলাই না করলে পয়সা জোটে ? পয়সা না দিলে রেশন দেয় না।

সমীর বলে, তোর টেস্ট অনেক বদলে গেছে পদ্মা।

পদ্মা বলে, বদলায়নি। আগে অন্যের চাপানো টেস্টের তলে আমার আসল টেস্ট চাপা পড়ে থাকত। সব ছিল এলোমেলো, একখানা শাড়ি পছন্দ করতে কী যন্ত্রণাই হত। খালি ঘাঁটছিই, কোনোটাই পছন্দ হয় না, খুঁতখুঁতনি যায় না।

এখন ?

এখন নিজের পছন্দ দিয়ে বিচার করি—কোনটা ভালো লাগছে ভাবতে হয় না।

সুরমা হেসে বলে, মনের মানুষটাকে পছন্দ করতে পারলে এ রকম হয়। মন ঠিক করা সহজে হয়নি নিশ্চয় ? এদিকে আবার অঞ্জনবাবু ছিলেন।

সমীর বলে, আমিও অবাক হয়ে গেছি। নিজে থেকে এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারা তোর পক্ষে আশ্চর্য ব্যাপার।

পদ্মা নীরবে একটু হাসে।

ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করে, তুমি রাগ-টাগ করনি তো ?

রাগ করলে বাড়িতে আসতাম ? কিন্তু আমার মনে একটা খটকা আছে। কান্তিলালের কথাটা বুঝতে পারি, ওর সঙ্গে নয় বনল। ওর আত্মীয়স্বজনের জন্য অসুবিধা হয় না ? তাদের বরদাস্ত করা তো তোর পক্ষে সম্ভব নয় !

সেভাবে বরদাস্ত করতে হয় না। এমনই হয়তো কেউ বেড়াতে আসে, দেখা করে চলে যায়। আমার একটুও খারাপ লাগে না। আমার লোক-দেখানো অহংকারটার জন্যই আমি এত কষ্ট পেতাম। সত্যিকারের অহংকার নেই, অহংকার বানিয়ে লোকের কাছে বাহাদুরি দেখাবার চেষ্টা—তার মতো যন্ত্রণা আছে ?

সুরমা জিজ্ঞাসা করে, গাড়োয়ান মশায় কখন বাড়ি আসেন ?

রাত হয়।

সারাদিন একলাটি কী কর ?

সেলায়ের কাজ করি। আসল দর্জি বনে গেছি—শুধু দোকান, খুলিনি এই যা। পাড়ার অনেক বাড়ি থেকে কাজ দেয়, ও জানা লোকদের কাছ থেকে কাজ নিয়ে আসে। শুধু মাইনের টাকায় কী কুলোয় বাড়িভাড়াটাড়া দিয়ে ?

সুরমার সন্দেহ হয়েছিল পদ্মার বোধ হয় ছেলেপিলে হবার কথা। খুব স্পষ্ট না হলেও কিছু কিছু লক্ষণ যেন টের পাওয়া যায়।

সে হেসে বলে, তাছাড়া খরচ বাড়বার সময়ও তো আসছে।

পদ্মার মুখ লাল হয়ে যায়।

বোনের মুখের দিকে চেয়ে সমীর অবাক হয়ে ভাবে, এ কী তার সেই বোন পদ্মা ?

চা খাবার করার জন্য পদ্মা আগেই এক ফাঁকে উনানে আঁচ দিয়ে এসেছিল।

উনান ধরে এলে সে আর সুরমা রান্নঘরে যায়।

দাদা কী খাবে ?

দুধ ডিম ছানা—ঘি বাদ। বেশি দিয়ো না, হজম করতে পারবে না। পেট গরম হলে মাথা গরম হবে—মাথা গরম হলে গরম জিনিস খাবে। বুঝতে পারছ ?

পদ্মা ম্লানমুখে সংক্ষেপে বলে, বুঝেছি।

সুরমা শান্তভাবে বলে, অমন করে বুঝেছি বলার আর দরকার নেই। তুমি যেমন বিবিগিরির ঝঞ্ঝাট ছেড়ে একটা গাড়োয়ানের ঘরে এসে সামলাতে পেরেছ, তোমার ভাইও এবার উঠে পড়ে লেগে সত্যি নিজেকে শুধরে নিচ্ছে !

পদ্মা হাত চেপে ধরে সুরমার।

সত্যি বলছ ?

সত্যি বলছি। ক-দিনে রকম-সকম বদলে গেছে মানুষটার। আমার কিংবা ছেলেমেয়ের খাতিরে শুধু নয়, আমরা তো বোঝা। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে কাজ করার জন্য ছটফট করছে ভেতরে ভেতরে। যেমন একগুঁয়ের মতো অধঃপাতে গিয়েছিল, তেমনই একগুঁয়ের মতো এবার উঠবে। ইস, কাল রাত্রে কী ছটফটই করেছে। হঠাৎ ছাড়তে পারবে না, মদ নেই জানলে রাত্রে ভীষণ একটা প্যানিক হয়, প্রায় উন্মাদের মতো হয়ে যায়—আমি নিজে মদ আনিয়ে রেখেছিলাম। যন্ত্রণায় যেন দাপড়াচ্ছে—আমার কি ঘুম আসে ? আমিও জেগে চুপচাপ শুয়ে আছি। দু-তিনবার উঠল, খেতে গিয়ে খেল না। আস্তে আস্তে আমায় ডাকল। বলল, ঘুমের কোনো ওষুধ আছে বাড়িতে, দিতে পার ? আমি বললাম, ঘুমের ওষুধ আছে, আমার নিজেরই আছে—কিন্তু ওই জিনিসটাই তুমি একটু খাও না ? বলল, কাল হয় তা খাব, আজ খাব না, ঘুমের ওষুধ দাও।

পদ্মা মুখ উঁচু করে চেয়ে বলে, আমার ভাই কখনও একেবারে বিগড়ে যায় ?

সুরমা প্রশ্ন করে, তোমার টাইম আসছে কী নাগাদ ?

মাস ছয়েক বাদে।

আমি এসে সামাল দেব। সময় ঘনিয়ে এলেই আমায় ডেকো কেমন ?

ডাকতে হবে কেন ?

ও হ্যাঁ, তাই তো বটে ! মনটা কেমন হয়ে গেছে দেখেছ ? সোজা হিসাব ভুল হয়ে যায়। দেখা সাক্ষাৎ এবার থেকে তো চলবে সর্বদাই।

সুরমা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে।

তারপর বলে, দাদাকে ডেকে এনে বসাও। এখানে বসে আমাদের সঙ্গে গল্প করুক।

পদ্মা বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

সতেরো

পরমেশ্বরের মুখে সেই চির-পরিচিত সর্বক্ষণের আনন্দময় হাসি নেই। সর্বদা মানুষকে হাসাবার ক্ষমতায় যেন তার ভাটা পড়েছে। তাকেও আজকাল মাঝে মাঝে রীতিমতো চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখায় !

মানুষ বলাবলি করে, কী হল তাদের পরমেশ্বরের ?

অশাসনে কুশাসনে চুরিচামারি নিপীড়নে মানুষের মুখ থেকে হাসি গেছে মুছে, অভাব আর ক্ষোভে জীবনটা হয়েছে অসহ্য একটা বোঝা—অন্য কাউকে হাসতে দেখলে চটে যেতেই যেন ইচ্ছা

হয় মানুষের। কিন্তু পরমেশ্বরের হাসি দেখে, তার আনন্দের স্পর্শ পেয়ে দুদণ্ডের জন্য প্রাণ যেন জুড়িয়ে যেত সকলের, অসংখ্য সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রক্রিয়াটা যেন থেমে যেত।

হাঁড়িমুখি রেণুকার মতো মানুষকে পর্যন্ত পরমেশ্বর একদিন হাসি দিয়ে বশ করেছে, তাকে হাসতে শিখিয়েছে।

সেই পরমেশ্বরের সহজ হাসি আর অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার কী তবে নিঃশেষ হয়ে এল !

একে একে প্রায় সকলেই তাকে জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যাপার ঈশ্বরবাবু ? শরীর খারাপ নাকি ?

না, শরীর মশায় ঠিকই আছেন !

জবাব দিয়ে পরমেশ্বর হাসে।

ব্যাকুলভাবেই আবার প্রশ্ন করা হয়, একটু যেন কাহিল কাহিল লাগছে আপনাকে ? সে রকম ফুর্তি নেই, একটু মনমরা ভাব ?

বয়স হল, মন বুঝি মরার কথা-টথা ভাবছে। মন বড়ো অবাধ্য, মোটে পছন্দ করি না মনটাকে। আনন্দে আছিস, থাক—তা নয়, নিরানন্দের নেশা নইলে চলবে না ব্যাটার।

কিন্তু সকলকে এভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

পঙ্কজ সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, আপনার আবার কী হল ? এতদিনে হার মানলেন ?

হার আমি মানি না। হেরে গিয়েও ভেবেছিলাম জয়ী হয়েছি—এখন কী করে জয়ী হব ভাবছি।

পঙ্কজ বিষণ্ণ মুখে বলে, আমিও আগেই ভেবেছিলাম, ভাইদের এনে আপনি হয়তো মুশকিলে পড়বেন। চিরদিন একা একভাবে কাটালেন, সকলকে এনে একসাথে থাকলে কতদিন আর ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে পারবেন!

পরমেশ্বর হেসে বলে, তুমি এখনও আমায় বুঝলে না পঙ্কজ। ওদের এনে কী আর আমি ঝঞ্ঝাটে পড়েছি, একসাথে একবাড়িতে থাকার জন্য ? ওদের এ বাড়িতে না আনলেও আমার এই ঝঞ্ঝাট হত, ওদের এখানে রেখে অন্য কোথাও চলে গেলেও এই ঝঞ্ঝাট হত ! এই সোজা সরল সহজ কথাটা আমি এতদিন বুঝতে পারিনি।

কিন্তু আমি তো বুঝতেই পারছি না আপনার সোজা সরল সহজ কথাটা কী ?

আমি আনন্দ নিয়ে মশগুল ছিলাম, একটা সোজা হিসাব ধরিনি। দেশে ঢের সম্পত্তি আছে, ভাই মাসে মাসে টাকা পাঠায়, আধখানা বাড়িভাড়া নিয়ে সব রকম ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে আমি দিব্যি আমার আনন্দ নিয়ে থাকি। কিন্তু ভাই এবার ফতুর হয়েছেন, আমায় আনন্দে থাকার জন্য প্রতিমাসে টাকা দেবে কে ?

পঙ্কজ বলে, তাই তো !

পরমেশ্বর হেসে বলে, আমার টাকাই আমায় পাঠাত মহেশ্বর—আমার অংশের খুব সামান্য টাকাই পাঠাত। কিন্তু ওর কাছ থেকে টাকা না পেলে আমার যে আনন্দে থাকা চলবে না, এটা স্রেফ ভুলে মেরে দিয়ে বসেছিলাম ! বরুণ আমার কথায় খিলখিলিয়ে হাসে, কিন্তু বিনা পয়সায় সে তো আমার রেশন মাপবে না !

হাসিটা থেমে যায় পরমেশ্বরের।

আমি আমার আনন্দ নিয়েই মশগুল। ভাই ওদিকে সব বেচে দিলে, এখানে এসে সব টাকা বাপব্যাটা-জামাইয়ে মিলে নষ্ট করলে—আমি আনন্দ নিয়েই বিভোর ! পরামর্শ চাইতে এলে কী বলতে চায় না শুনেই বলি—তোমরা যা খুশি কর। ভেবেছি, আমার আনন্দ আছে, আমার ভাবনা কী !

পঙ্কজ অভিভূত হয়ে শোনে।

পরমেশ্বরের অনেক কথা মেনে না নিতে পারলেও তার সরলতা সম্পর্কে কোনোদিন তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগেনি। মানুষটা যা ভাবে তাই বলে।

অবশ্য সবাইকে বলে না—যাকে বলা যায় তাকেই বলে।

আজও দ্বিধামাত্র না করে সোজাসুজি খোলাখুলিভাবে সে তার ভুলের কথা তাকে শুনিয়ে দিচ্ছে !

পরমেশ্বর বলে, আমার উচিত ছিল গোড়াতেই দায়িত্ব নিয়ে ব্যবস্থা করা—আমার আনন্দে থাকার প্রধান উপায়টি যাতে না ভেস্তে যায়।

প্রধান উপায় ! পঙ্কজ আশ্চর্য হয়ে শোনে।

এ তো গেল এককথা। সব চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হল কী জান ? আমি টের পেয়ে গেছি—একলা একলা আমার আনন্দে থাকার কোনো মানে ছিল না !

আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি জ্যাঠামশায়। কিন্তু এ কথাটা মানতে পারলাম না।

পরমেশ্বর তার স্বভাবসুলভ রসালভাবে ফিরে গিয়ে বলে, সে তো করবেই—আরও বেশি করে শ্রদ্ধা করার ব্যবস্থাও করছ। গুরুজন হলে আমিও কি শ্রদ্ধাভক্তি না পেলে ছেড়ে কথা কইব ?

পঙ্কজ বলে, গুরুজন হলেও আমার শ্রদ্ধা বাড়বে না। কিন্তু আপনার এ কথাটার মানেও বুঝলাম না,—একলা একলা আনন্দে থাকার কোনো মানে ছিল না। আমি অনেকবার আপনাকে বলেছি—আপনার আসলে বৈরাগ্য। একলা একলা আনন্দে থাকার তাছাড়া কোনো মানে হয় না। কিন্তু আপনি বরাবর অস্বীকার করে এসেছেন।

আজও অস্বীকার করছি।

পঙ্কজ ভড়কে গিয়ে বলে, তাহলে কী বলছেন ? আপনার কথাটাব মানে কী ?

পরমেশ্বর বলে, তোমরা বড়োই যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছ। বাস্তব ভোলা থিয়োবিবাদীদের এই দশা হয়। এতকাল চেষ্টা করে আমি তোমাকে বোঝাতে পারলাম না—স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার না করার মানেই বৈরাগ্য নয়। তোমার মনটা ওই দিকে পড়ে আছে—তুমি ভাবছ, সংসার না করে মানুষ ভোগ করতে পারে না ! শশধরও তো সংসার করে না, আত্মীয়স্বজন কারও ধার ধারে না, রোজ শুধু প্রাণ ভরে মদ খায়। ওর কি বৈরাগ্য হয়েছে ?

শশধরের সঙ্গে আপনার তুলনা !

এটা তুমি বোকার মতো কথা কইলে বাবা ! আমি 'ক মানুষ হিসাবে শশধরের সঙ্গে আমার তুলনা করছি ? মাসে কতবার দিনের বেলা আমার কাছে এসে ও যে আপশোশ করে আর জানায় এবার নিশ্চয় মদ ছেড়ে দেবে,—সে খবর রাখ ? কথাটা তা নয়। আসলে আমার বৈরাগ্য আসেনি—ওই নেশার মতোই একটা ভাবে বিভোর হয়ে ছিলাম। দেশ থেকে ভাই টাকা পাঠায়, আমি খাই-দাই ঘুমাই আর আনন্দের নেশায় বিভোর হয়ে থাকি। শশধরের নেশা তো জমে সন্ধ্যার পর মদ পেটে গেলে—আমি সর্বদাই আমার নেশায় মেতে থাকতাম। একে স্বার্থপরতাই বলা যায়—নিছক আত্মকেন্দ্রিকতা।

পরমেশ্বর নিশ্বাস ফেলে।

তবে একটা ভাগ্যের কথা—দশজন মানুষকে আশেপাশে না পেলে, তারা আমার আনন্দের ভাগ না নিলে, আমার নেশা জমত না ! মদ যায় শশধরের নিজের পেটে, পেট থেকে আনন্দের সঞ্চার হয় ওর নিজের মগজে। কিন্তু বেচারা ভুলতে পারে না দশজনের কাছে ওর ফুর্তির কোনো দাম নেই। লোকে বরং নিন্দেই করে। আমার আনন্দকে সকলেই দাম দিত সেই জন্যই আজ নেশা কেটে গেলেও হতাশ হতে হয়নি, জ্বালা বোধ করতে হয়নি। দশটা মানুষের জীবনের সুখদুঃখের অংশীদার হলে, দশজনের লড়ায়ে ভাগ নিলে জীবন বেশ জমে যায়।

পঙ্কজ এবার চুপ করে থাকে।

মানেটা হল এই, আনন্দ সবাই চায়। হতাশা নিরানন্দ দুঃখ কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু আনন্দ তো আকাশ থেকে নামে না বৃষ্টির মতো কিংবা প্যাঁচ টিপলে কলের জলের মতো। আনন্দও অন্য

সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে সৃষ্টি করতে হয়। দুঃখ না থাকলে আলাদা কথা—কিন্তু দুঃখ যখন আছে, সেটাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় কী করে ? এটাই আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাবতাম মানুষ বোকা, ইচ্ছা করে দুঃখ বাড়ায়, ঝঞ্ঝাট ডেকে আনে—মানুষ আনন্দ ভুলে গেছে। এখন বুঝতে পেরেছি একেবারেই মিথ্যা আমার ধারণাটা। দুঃখে ডুবে থেকেও মানুষ দুঃখটা আয়ত্ত করে, নিজেকে সামলে রাখে, সব সময় আনন্দ চায়। রোগ শোক দুঃখ বেদনার বন্যা বয়ে চলেছে—কিন্তু মানুষকে ভাসিয়ে নিতে পারেনি। এ অবস্থায় হাসি আনন্দ যেটুকু আছে সেটুকু বজায় রাখাই কী সহজ কথা, সাধারণ ব্যাপার !

পঙ্কজের মুখে হাসি ফোটে। হঠাৎ তাকে আশ্চর্যরকম খুশি মনে হয়।

পরমেশ্বর বলে, আমি হাসাই, পাঁচজনে হাসে। আগে ভাবতাম, এটা আমার বাহাদুরি। আজ অবাক হয়ে ভাবছি, আমি নয় দুঃখ এড়িয়ে চলি, আমার নয় হাসানো ছাড়া কোনো কাজ নেই—কিন্তু পাঁচজনে ওরা হাসে কী করে ?

পঙ্কজ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, এইবার আপনাতে-আমাতে অমিল ঘুচে গেল ! আমিও বস্তিতে কলোনিতে মানুষগুলিকে দেখে অবাক হয়ে থাকি।

অবাক হবারই কথা। সামাজিকভাবে ধরলে মানুষের কী মনের জোরের পরিচয়টাই যে পাওয়া যায় ! সমীরকে কেউ শোধরাতে পারেনি, উদ্‌বাস্তুদের বাঁচার জন্য লড়াই করতে দেখে ওর জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

পঙ্কজ অভিভূত হয়ে থাকে।

পরমেশ্বর বলে, আমি তোমাদের রবিবারের সভায় আসছি। আর একটা কথা—আমায় মেম্বার করে নিতে হবে। আমি কিছু কিছু কাজ করব।

সর্বদা যে মুখে থাকত হালকা আনন্দের ছাপ, ক্রমে ক্রমে সে মুখে নেমে আসে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা।

মহেশ্বরের মুখ সর্বদা হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

জামাই যে তার অধঃপতনের প্রায় চরম সীমা থেকে আশ্চর্যভাবে ফিরে এসেছে এ আনন্দও যেন তার তুচ্ছ হয়ে গেছে জীবনের অন্য সমস্ত দিকের ব্যর্থতার কাছে।

বিমর্ষ মুখে সে দিনরাত শুধু চিন্তা করে।

তাকে দেখে মনে মনে কতগুলি হিসাব ঠিক করে নেয় পরমেশ্বর।

মহেশ্বর চিরদিন তার অত্যন্ত অনুগত, মনেপ্রাণে তাকে সে শ্রদ্ধা করে। তার প্রতিটি কথা সে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে প্রস্তুত। হতাশায় ডুবে থাকার বদলে কাজের মধ্যে নতুন অবলম্বন খুঁজে নিতে বললে সে পালন করবে কিন্তু ওভাবে শুধু উপদেশ দিয়ে মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায় কী ?

একটা দৃষ্টান্ত সামনে রাখা বোধ হয় উচিত।

তারপর কয়েকদিন পরমেশ্বর খুব বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়।

জিজ্ঞাসা করলে বলে, একটা দরকারে যাচ্ছি। যথাসময়েই জানতে পারবে।

প্রতিমা একটু চিন্তিতভাবে পঙ্কজকে বলে, কী যেন হয়েছে জ্যাঠামশায়ের।

পঙ্কজ সহজভাবেই বলে, জ্যাঠামশায়ের ভুল ভেঙেছে।

ভুল ভেঙেছে ? ভুল ?

নিজে নিজে একলা আনন্দে থাকার ভুল। এখন থেকে উনি সবার সুখদুঃখে ভাগ নেবেন, সবার লড়ায়ে হাত মেলাবেন।

নিজে বলেছেন এ সব কথা ?

নিজে বলেছেন।

পঙ্কজের মুখে হাসি ফোটে।

আরও একটা কথা যা বলেছেন—

কী কথা ?

পঙ্কজের রকম দেখে প্রতিমা উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বলে, কথায় কথায় আমি সেদিন বলেছিলাম যে আমি ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করি। উনি কী বললেন শুনবে ? গুরুজন করে নিয়ে আরও বেশি শ্রদ্ধা করবে।

প্রতিমা হেসে বলে, এ আর নতুন কথা কী হল ? এ তো সবাই জানে।

তারপর একদিন সকালে পরমেশ্বর মহেশ্বরকে ডাকে।

বলে, মহেশ, এসো আমরা বসে একটু পরামর্শ করি। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে কী ব্যবস্থা করা যায় দেখা যাক।

মহেশ্বর খাটের প্রান্তে বসে। বাড়ির পুজো বন্ধ করে তাকে সার্বজনীন পুজোর দায়িত্ব নেবার পরামর্শ অথবা নির্দেশ অবশ্য পরমেশ্বর দিয়েছিল—কিন্তু চিরকালের গা-বাঁচানো ভাব ছেড়ে দিয়ে সে নিজে থেকে যেচে তার সঙ্গে পরামর্শ করবে সংসারের অচল অবস্থা সম্পর্কে—এটা মহেশ্বর কল্পনাও করেনি।

মুখ দেখেই বোঝা যায় সে অভিভূত হয়ে গেছে। আশার এক নতুন আলো ফুটেছে তার মুখে।

পরমেশ্বর বলে, ভবিষ্যতের কথাটা পরে বিবেচনা করা যাবে। সে জন্য একটু বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। অবিলম্বে কী করা সম্ভব ঠিক করে ফেলি এসো।

দিনরাত তাই ভাবছি—ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।

কষ্ট আমাদের করতেই হবে—যতটা পারি করতে হবে।

সে তো বটেই।

পরমেশ্বর ধীরে ধীরে বলে, অবস্থাটা আমাদের দাঁড়িয়েছে প্রায় অচল। এর একটা প্রতিকার না করলে আমরা চোখে অন্ধকার দেখব—অবস্থার বড়ো রকম পরিবর্তনের কথা চিন্তাও করতে পারব না। দুদিক দিয়ে সমস্যাকে ধরতে হবে। কিছু পয়সা আনার ব্যবস্থা করা আর খরচ কমানো। আমরা ভদ্রলোক, পাঁচজনের কাছে মানসম্ভ্রম আছে, আগে সুখে ছিলাম—এ সব মনে রাখলে চলবে না। আমরা ছেঁড়াকাপড় পরব, শাকভাত খাব। একটি একটি খরচ ধরে হিসাব করতে হবে—কোনটা বাদ দেওয়া যায়, কোনটা কত কমানো যায়। তার আগে আয়ের কথাটা ভাবি এসো।

সুভাগিনী বলে, ওটাই তো আসল।

তার শাঁখা সম্বল নিরাভরণ দেহের দিকে চেয়ে পরমেশ্বর বলে, আসল বইকী। তাই তো বুড়ো বয়সে চাকরি নিলাম।

মহেশ্বর বিভ্রান্তের মতো বলে, চাকরি নিয়েছেন ?

নইলে উপায় কী ? তোমার জন্যও চেষ্টা করছি—তোমাকেও খেটে কিছু পয়সা আনতে হবে।

মহেশ্বর খানিকক্ষণ অভিভূত হয়ে থেকে বলে, আপনি পারলে আমি খাটতে পারব না ?

পরমেশ্বর বলে, পারবে বইকী। দরকার হয়েছে, করতেই হবে। তাছাড়া আরেকটা কথা আছে। আমি বলি কী, একতলা কিংবা দোতলাটা ভাড়া দেওয়া যাক।

সম্পূর্ণ ?

সম্পূর্ণ। আমার মতে দোতলাটা ভাড়া দেওয়াই ভালো, বেশি ভাড়া পাওয়া যাবে। আমরা সবাই একতলাতে থাকব। সাধন আমার ঘরে থাকবে।

সুভাগিনী সখেদে বলে, আপনাকে আমরা সবাই মিলে একেবারে ডুবিয়ে দিলাম। গোটা একতলাতে একলা ছিলেন—আজ আপনার একটি ঘরেও ভাগ বসাব !

পরমেশ্বর তার আগের আনন্দময় হাসি হাসে।

কী ছিলাম কেমন ছিলাম—ভেবে আর লাভ নেই। আমার নেই, তোমাদের নেই, আরও অনেকের নেই।

মহেশ্বর বলে, জিনিসপত্র আঁটবে কী ? খাট আলমারি—

বাড়তি জিনিস নিলাম করে দেব।

তা মন্দ নয়। এ বাড়তি বোঝা দিয়ে কী হবে ?

হ্যাঁ, জীবনটার বোঝা কমাবার লড়াই চলেছে—বাজে বোঝার দরকার নেই।

এদিকে পরমেশ্বর বাড়িতে মহেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করে, ওদিকে সাধন সবিতার সঙ্গে চালায় কিছু রোজগারের জন্য তাদের অস্থায়ী উপায়টার প্রস্তুতি।

সে একটা বিড়ি ধরায়।

আরেকটা গান লিখেছি, শিখবে ?

শিখব না ?

সাধন লেখা গানটি সবিতার হাতে দেয়। মোটা গলায় পদগুলির মোটামুটি সুর গেয়ে শোনায়। সবিতা মন দিয়ে শোনে—তারপর সেই পদটি সুরে ঝংকার দিয়ে ওঠে তার গলায়।

ডুমুর এসে চুপ করে দরজার বাইরে বসে। একে একে ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ যারা এসে জোটে তাদের সে হাতের মুখের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় যে টুঁ শব্দটি করা চলবে না, ইঙ্গিতেই তাদের সে নির্দেশ দেয় চুপচাপ বসে পড়ার।

গান অভ্যাস করার ফাঁকে সবিতা বলে, এমনি শুনলে হবে না, পয়সা লাগবে। রেশন আনার পয়সা নেই। না খেয়ে শুকোলে গলায় গান খোলে না।

বাইরে থেকে জিতু বলে, পয়সা দিয়ে পচা সিনেমা দেখি, বিনা পয়সায় গান শুনব কেন ? চাঁদা আমরা তুলে দিচ্ছি—কিন্তু গান শেখা শুনব শুধু ? শেখা গান দু-একটা হবে না ?

হবে বইকী।

দরজার কাছে এগিয়ে এসে সবিতা পুরানো গান ধরে। গতর খাটিয়ে, ফসল ফলিয়ে, জিনিস বানিয়ে মানুষের উপোসি থাকার গান।

মহেশ্বরের সঙ্গে কথা শেষ করে পরমেশ্বর বস্তির দিকে পা বাড়ায়।

সাধন আর সবিতার সমস্যার একটা মীমাংসা দরকার।

কিন্তু তার আগেই সাধন আর সবিতা বেরিয়ে গিয়েছিল।

সবিতার মা বলে, দুজনে সকালবেলা বেরিয়ে গেছে একসাথে।

কোথায় গেছে ?

কে জানে কোথায় যায়, কী করে। আমায় কী আর জানায় কিছু। জিজ্ঞেস করলে মেয়ে শুধু বলে, রোজগার করতে যাচ্ছি।

সাধন বাড়ি ফিরলে সেদিন পরমেশ্বর তাকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাও কী কর বলতে পারবে না ?

না জ্যাঠামশায়, জানতে চাইবেন না। এ মাস থেকে আমি কিছু কিছু সংসারখরচ দেব।

সে ভালো কথা। সংকোচটুকু কাটাতে পারলে আরও ভালো হত। চুরি কর না নিশ্চয় ?

সাধন হাসে।

দিন তিনেক পরে আপিস যাবার পথে পরমেশ্বর হঠাৎ ট্রাম থেকে নেমে পড়ে।

ধীরে ধীরে ভিড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

সাধন আর সবিতা ভাটিয়ালি সুরে গান গাইছে—দেশের দুঃখদুর্দশার গান সবাই মিলে তার প্রতিকার করার গান।

আনন্দের মূল্য আছে, কিন্তু শুধু গান শুনিয়ে তারা রোজগার করছে না। সাধন বিক্রি করছে জুতোর সোল, সবিতা কীসের মোড়ক।

সুরমাকে বাইরে ডেকে সবিতা বলে, এবার আর দেরী না কিন্তু। প্রধানদের ওঁদেরই থাকবে। শুধু মানুষটিকে আমারও কেমন যেন মনে হয় ঠিক বুঝতে হয়।

: আমারও কেমন যেন?

: হ্যাঁ, খুব বেশী যেন। একেবারে যেন আসে না, উনি তুলনাহীন মানুষ, দেখে মনে হয় নতুন দেখছেন? আমার মানুষটিও ও কিন্তু সোজা কথা নয়। ওখানে কিছু বলতে গেলে বলেন এটা সোজা ব্যাপার। এদের বোধ হয় জেনে রাখতে হয় তোমার আমি একটু নিজের ভাবনায় কাজে দেখ না, তোমার নতুন করে বলে তোমার জীবনের সাধারণ আমাদের মত; তোমার তুমি কি বলে এর মত।

সুরমা আশ্চর্য হয়ে বলে, কারুর স্বামী নিয়ে এত ভাবতেও হয়? এমন দেখলি কি বলে?

সবিতা হেসে বলে, স্বামী নিয়ে যা না বললে তুমি এমন বুঝবে না? আমাদের মত মানুষের দেখেও, স্বামী লোকেরা সঙ্গে কথাবার্তা বলে, যেমন মানুষটির সঙ্গে মিশতে দুঃখের বলতে হয় শিখিয়ে দিতে হবে না।

: তাই নাকি!

: তবে? দু'দিন দেখে আমার যে এত ভয় ছিল সেসব ভেঙে অবাক হয়ে যাই। আমার ধারণার ভুলের না এই। সাধারণ প্রকৃতি বোঝেনি তো। তুমি ওঁদের বাড়ি, যত জানতে পারো আত্মীয়স্বজন ভাল বলবে — তাই বোঝাতে পারা গেল। আমার মনে হয় যদি ভালবাসার কোন খাতিরে মানুষটির বন্ধুত্বের এখানে হতে পারত না, একটা জীবন দেখে চলত।

সুরমা আশ্চর্য হয়ে সবিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মনে হয় খুব ও এখন [illegible] মানুষটি আছে সে [illegible] [illegible] ত্যাগের এক সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।

বড়মামার পর্যন্ত ডেকে যে বাঁধা পেরোতে পারে নি।

সে হঠাৎ চীৎকার বলে, মানুষ অন্তরে নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হোক বলে আমার ভিতর হই। এমন সোজাসুজি তোমার ও তোমার সঙ্গে একটু মিশলে ভাল লাগবে।

সবিতা সকৌতুকে হেসে বলে, ওঃ তাই, আমারই।

নাগপাশ



নাগপাশ প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

১

কত কথাই মনে হয় !

কথাই কী মনে হয় ? মন কী কথা দিয়ে ভাবে ? ভাব থেকে ভাবনা পর্যন্ত সবই কী রূপ নেয় কথায় ?

কালিদাসের সেই অপরূপ উপমাটিই আজ বারবার নরেনের মনে পড়ে। পার্বতী ও পরমেশ্বরের একতাকে বাক্য ও অর্থের চিরন্তনী অবিচ্ছিন্নতা হিসাবে কল্পনা করা।

মানে ছাড়া কথা নেই। কথা ছাড়া মানে নেই।

কিন্তু মন ?

মনেরও কী কথা ছাড়া গতি নেই ? এটাই মনের শেষ মানে দাঁড়ায় ?

হঠাৎ যেন সচেতন হয়েই নরেন নিজের মনে একটু হাসে।

মনোবিজ্ঞানের এত মোটা এমন বিখ্যাত একটি বই শেষ করে আনমনে নানাকথা ভাবতে ভাবতে চিন্তাটা শেষে এইখানে এসে ঠেকল !

লক্ষ্যভেদ করে অর্জুনের লাভ হয়েছিল দ্রৌপদী। মনের রহস্য ভেদ করে তার কী লাভ হল ?

মানসিক একটু সুখ ?

সকালবেলা ধরণীর বাড়ির রোয়াকটুকুতে দাবার ছক পেতে বুদ্ধির যুদ্ধে নেমে, ধরণী আর অবিনাশ কিস্তিমাতের যে সুখ আশা করছে ?

কয়েকজন একমনে তাদের লড়াই দেখে সুখের যে অংশ ভাগ পাচ্ছে ?

তাছাড়া কোনো মানে হয় না তার বইপড়ার জ্ঞানচর্চা করার। সত্যই তো, আর কিছু করার নেই সামান্য চাকরিটা করা ছাড়া, তাস পাশা দাবা কিংবা নিছক হাসি গল্পের আড্ডা তার ভালো লাগে না, বই পড়ে তবু উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন জীবনটার কথা ভুলে থাকতে পারে, সময় কাটে।

লোকে ভাববে, জ্ঞানলাভের জন্য কী আগ্রহ তার, কী সাধনা ! জ্ঞানের সাধক বিখ্যাত জ্ঞানীর প্রাণের ছোঁয়াচটা তার প্রাণেও লেগেছে।

রাত জেগে বইটা পড়েছিল। বেশি রাত পর্যন্ত না হলেও আলো নিভিয়ে শুতে এগারোটা বেজে গিয়েছিল বইকী। পরীক্ষা পাসের পড়া যারা করে, পাড়ায় তারাও তখন রাত্রির সাধনা সাঙ্গ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঝুম হয়ে গিয়েছে চারিদিক।

দিনে যে শব্দ ওঠে না, উঠলেও কানে পৌঁছায় না, মাঝে মাঝে সেই সব শব্দেই শুধু সাড়া দিয়েছে, জীবন্ত মানুষ ও প্রাণীর পৃথিবী—এই পাড়াটুকু।

ভোর চারটেয় উঠে আবার বইটা পড়তে শুরু করেছিল। তবে ঘুমন্ত পৃথিবীতে একা জ্ঞানলাভের সাধনা করার গর্ব ভোররাত্রে বজায় থাকেনি। চোখে পড়েছিল প্রতিবেশীর ঘরের জানালার ফাঁকের আলো। কানে এসেছিল বাঁধা সুরে শব্দ করে পরীক্ষার পড়া আবৃত্তি করার অস্পষ্ট অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ।

পরীক্ষা পাস করতে হবে না, তবু রাত জেগে আর রাত থাকতে উঠে বই পড়ে,— মোটা বই, কঠিন বই।

লোকে তো ভাববেই সে জ্ঞানের মস্ত বড়ো সাধক।

কিন্তু নিজে তো সে জানে, কেন তার পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বই পড়া !

না, বিদ্যার জন্য জ্ঞানের জন্য বইপড়ার সে আগ্রহ তার নেই।

গ্র্যাজুয়েটত্ব লাভ করে পড়া ছেড়ে দিয়ে আশি টাকার একটা চাকরিতে গাঁথা হয়ে গিয়ে জ্ঞানী হবার বিদ্বান হবার সাধ, তার ভোঁতা হয়ে গেছে।

এ তো জানা কথাই যে আর হবে না, জ্ঞানচর্চা এখন তার কেবলমাত্র অবাস্তব মানসচর্চা।

শেখার জন্য জানার জন্য কী সীমাহীন আগ্রহ আর ব্যাকুলতাই তার ছেলেবেলা থেকে ছিল।

লেখাপড়া শেখার সে কষ্টকর ইতিহাস মনে করলে আজ গা জ্বালা তো করে, হাসিও পায় !

সমগ্র বাস্তবতা ছিল তার বিদ্যালাভের বিরুদ্ধে, তবু সে নিজে চেষ্টা করে গায়ের জোরে বিদ্বান হবে !

বুদ্ধি ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, চেষ্টা ছিল। স্ক্রু-বল্টু আলগা হয়ে নড়বড়ে হয়ে যাওয়া সেকেলে একটা ধীর মন্থর পরিবারের ছেলে হয়েও লেখাপড়া শেখার জন্য, জ্ঞানলাভ করার জন্য, তার সক্রিয় উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে আত্মীয়স্বজন, পাড়ার লোকে তারিফ করত।

বলত, এ ছেলে একদিন মস্ত বড়ো বিদ্বান হবে, মস্ত বড়োলোক হবে, মোটা মাইনের চাকরি করবে।

কীভাবে বাধা পেয়ে অসাধারণত্ব ঘুচতে ঘুচতে একেবারে ভোঁতা হয়ে গেল বিদ্যালাভের সেই কামনা বাসনা !

চাকরি পেয়েছে ? এই বাজারে যেমন হোক একটা চাকরি ! লোকে তাই বলে। বাড়ির লোকে তো আরও বেশি জোর দিয়ে বলে। কত বেকার ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা চাকরির জন্য, তার বন্ধু নন্দন আজ পর্যন্ত কিছু জোগাড় করতে পারল না।

সে একটা চাকরি পেয়েছে !

পরীক্ষা পাসের পুরস্কার শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে এই, বেকারদের সঙ্গে তুলনায়। প্রথম বয়সটা গেল পরীক্ষা পাস করার ধাক্কায়, বাকি জীবনটা কাটবে জেলখানার কয়েদির মতো কলম পিষে।

তাও পরের জন্য।

খাওয়াপরা হাতখরচের জন্য পরের কাছে হাত পাততে হয় না, নিজের তার শুধু এই গর্বটুকু সম্বল।

আজ ছুটির দিন।

মাধবকে বইটা ফেরত দিয়ে আসতে হবে। একটু আলোচনা ও তর্কও করে আসবে।

শিষ্যের মতোই করবে অবশ্য। অতবড়ো বিদ্বান লোকটার শিষ্য হবার যোগ্যতাও বুঝি সে এত সাধ নিয়েও অর্জন করতে পারেনি।

বিদ্যা আর জ্ঞানই আদর্শ মানুষটার।

অথচ ওই আদর্শবাদী বিদ্যা-পাগল মানুষটাকেও কত সামান্য টাকার জন্য চাকরি করে খেতে হয়, কত অমূল্য সময় আর শক্তি বিক্রি করতে হয় !

ছুটির দিনও ছেলেমেয়েদের চেঁচিয়ে পড়ার কামাই নেই। আশপাশে কয়েকটা বাড়ি থেকে কত রকমের গলাই যে কানে ভেসে আসে !

বাড়িতে পড়ছে বরেন।

পড়ে খুব, কিন্তু মাথা নেই। কোনোরকমে পরীক্ষা পাস করার বেশি কিছু ওর পক্ষে অসাধ্য।

মাথা থাকাটাই অবশ্য আসল কথা নয়।

মাথা থাকলেই যেন সবাই মাধবের মতো কৃতিত্ব দেখাতে পারে পরীক্ষা পাস করায়, তার মতো পণ্ডিত হবার সুযোগ পায় !

দীননাথের ছেলেটা কী অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়ই দিয়ে আসছিল স্কুলের পরীক্ষা পাস করায়। অল্প শিক্ষিত গরিব একজন দোকান-কর্মচারীর প্রায় অশিক্ষিত পরিবারে মানুষ হয়েও

ছেলেটার পরীক্ষা পাসের অদ্ভুত ক্ষমতায় মানুষ অবাক হযে থেকেছে। কেউ বলেছে এটা প্রকৃতির খেয়াল, কেউ বলেছে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা, কেউ বলেছে পূর্বজন্মের বিদ্যা অর্জনের জের।

মাধবও এই স্কুলে পড়েছিল। আজ পর্যন্ত তারটাই রযে গেছে স্কুলের সেরা ছাত্রের রেকর্ড।

মণ্টু এই রেকর্ড ভাঙতে পারে এমন কথাও কেউ কেউ ভেবেছে।

কিন্তু ঘরে-বাইরে অনেককে থ বানিয়ে দিয়ে শেষ ক্লাসে উঠবার পরীক্ষায় সে হযে গিয়েছিল থার্ড !

নিজের অসুখ-বিসুখ বা বাড়িতে কোনো বিপদ-আপদ, এ রকম কোনো কারণই ঘটেনি।

বরেনের কাছে শুনে তার নিজেরও বিশ্বাস হতে চায়নি। বরাবর যে শুধু প্রথম হয়েই পাস করেনি, দ্বিতীয়জনের সঙ্গে ব্যবধান বজায় বেখে এসেছে একরাশি নম্বরের—তার এ কী রকম ধপাস করে অধঃপতন ঘটা !

সকালে নরেন গিয়েছিল ব্যাপার বুঝতে। দীননাথ আর মণ্টুর সঙ্গে সবে কথা শুরু করেছে, বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল হেডমাস্টার হৃদয়বাবু।

পরীক্ষা দিয়ে মণ্টু একদিনও স্কুলে যায়নি। হৃদয় তাই নিজেই ব্যাপার বুঝতে এসেছিল।

এটা কীরকম ব্যাপার হল তোমার ?

জানি না স্যার। বুঝতে পারছি না।

হৃদয় গম্ভীর মুখে বলেছিল, আমি বুঝেছি ব্যাপার। লেখাপড়ায় ঢিল দিয়ে অন্যদিকে মন দিয়েছ। অহংকাব বেড়ে গেছে তোমার, এত ভালো ছেলে, বেশি না পড়লেও ফার্স্ট হয়ে যায়।

লেখাপড়ায় একটুও ঢিল দিইনি স্যার। পড়ার সময়, বরং আগের চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি।

দীননাথ সায় দিয়ে বলেছিল, হাঁ, আগের চেয়ে বেশি পড়ে আজকাল।

আজ স্কুলে যাবি !

বলে হৃদয় গম্ভীর মুখেই চলে গিযেছিল।

ছেলের মুখের দিকে চেযে দীননাথ হাসিমুখে বলেছিল, এত ভড়কে যাবার কী হল ? এ রকম হয়ে যায় দু-একবার।

নরেন বলেছিল, উঁহুঁ, তা বললে হবে না। হয়ে তো যায়, কিন্তু কেন হয়ে যায় ? যাই ঘটুক তার একটা কারণ থাকবে তো ! মণ্টুর পরীক্ষা খারাপ হওয়ারও নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।

মণ্টু বলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝবার চেষ্টা করা যাক এসো। বরাবর পরীক্ষা ভালো হয়েছে এবার অন্যরকম হল কেন ? ভালো হয়েছে না মন্দ হয়েছে সে কথা ভুলে যাও, শুধু ধরে নাও ফলটা অন্যরকম হয়েছে। কেন হয়েছে ?

দীননাথ ও মণ্টু দুজনেই তার মুখেব দিকে চেয়ে চুপ করেছিল।

রেজাল্ট বদলাতে পারে কী করে ? দুরকমভাবে এটা সম্ভব। যে পরীক্ষা দেবে সে যদি বদলে যায় কিংবা তার পড়াশোনা করার রকমটা যদি বদলে যায়। তোমার যখন কিছুই হয়নি বলছ, মনোযোগ দিয়ে আরও বেশি সময় পড়েছ বলছ—তাহলে ধরে নেওয়া যায়, তুমি বদলাওনি। অ্যাদ্দিন যেভাবে পড়ছিলে তাতে নিশ্চয় কোনো একটা গোলমাল হয়েছে।

আরেকটু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে এসেছিল কারণটা। খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল মণ্টুর থার্ড হওয়ার রহস্যের বাস্তব মানে।

মণ্টুর বন্ধু সমীর। মণ্টু অসাধারণ ভালো ছেলে বলেই অবশ্য বন্ধু। তাদের দুজনের বাড়িতে তফাত অনেক।

সমীরদের শিক্ষিত স্বচ্ছল পরিবার। তার দিদি রমলা কাউকে বিয়ে করার বদলে স্কুলে টিচারি নিয়েছিল। সকালে সে ভাইকে পড়াত।

মণ্টু হাজির থেকে তার পড়ানো শুনত—চুপচাপ শুনত ! শোনাই ছিল তার পক্ষে যথেষ্ট।

কারণ সাধারণ ছাত্র সমীরকে রমলা এমনভাবে পড়াত যেন তার মাথাটা মণ্টুর মাথার মতোই সাফ।

তাছাড়া মাঝে মাঝে নিজে থেকে মণ্টুকে এটা ওটা প্রশ্ন করে তাকে পড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করার সুযোগও দিত।

তারপর হঠাৎ একদিন রমলা দীনেশকে বিয়ে করে চলে গেল স্বামীর ঘরে।

সমীর ও অন্য ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য যত টাকা খরচ করা দরকার তার অনেক বেশি খরচ করতেও কোনো অসুবিধে নেই সমীরের বাবার। অন্য ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়াবার জন্য মাস্টার ছিল, তবু সমীরের জন্য ভিন্ন একজন মাস্টার রাখা হয়েছিল।

রমলার ছিল খানিকটা খেয়াল, খানিকটা স্নেহ। এমন চটপট কঠিন পড়া বুঝে নিত মণ্টু, যে ভাইকে উপলক্ষ করে তাকে পড়াতে সে আনন্দ পেত। কিন্তু একজন তার নিজের ছেলেকে পড়ানোর জন্য মাইনে দিয়ে মাস্টার রাখলে কী করে তার পড়ানো শুনতে যাওয়া যায় ?

একপাশে বসে চুপচাপ শুনতে চাইলেও ?

নরেন সব শুনে বলেছিল, তবে ? সমীরের দিদি খুব যত্ন নিয়ে ভালো করে পড়াতেন না ?

জলের মতো সোজা করে বুঝিয়ে দিতেন।

তবে ? একজন টিচার নিজের ভাইকে পড়ানোর সঙ্গে তোমাকেও দরদ দিয়ে সব জলের মতো সোজা করে বুঝিয়ে দিতেন—তুমি রোজ তা শুনতে। সেটা বন্ধ হলে ফল ফলবে না ? তুমি নিজে নিজে পড়ে ফার্স্ট হবে—তাই কখনও হয় ? কেউ তা পারে না। যতই মাথা থাক, শুধু স্কুলে পড়ানো শুনে পরীক্ষায় থার্ড ফোর্থ হওয়ার চেয়ে ভালো রেজাল্ট করা যায় না।

মণ্টু বিহ্বলের মতো বলেছিল, কেন ? আমি তো সব বুঝতে পারি !

তা পারবে না ? স্কুলে সাধারণ ছেলেদের সাধারণ পাসের পড়া পড়ানো হয়, সে তো তুমি বুঝতে পারবেই ! ফার্স্ট হতে হলে আরও বেশি করে, কঠিন করে পড়ানো বুঝতে হয়, অনেকরকম ছোটোবড়ো কায়দাকানুন জানতে হয়, শিখতে হয়। এ কী সস্তা লেখাপড়া পেয়েছ, শুধু স্কুলে গিয়ে ফাঁকি দিয়ে ফার্স্ট হয়ে যাবে !

দীননাথ কথাটা বুঝেও কাতরভাবে একটা প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু কথাটা কী রকম হল ? কত ছেলেকে বাড়িতে মাস্টার রেখে পড়ানো হয়, তাদের মধ্যে কতজনা ফেল করেও যাচ্ছে তো ?

নরেন বলেছিল, তা যাচ্ছে বইকী। শুধু দশটা মাস্টার রাখলেই আবার হয় না, ছেলেমেয়ের পাস করার ক্ষমতাটাও থাকা চাই।

মণ্টু হঠাৎ বলেছিল, আমি সমীরকে ধরব, ওর বাবাকে বলে-কয়ে রাজি করাব। মাস্টারের পড়াবার সময় একপাশে বসে চুপচাপ শুধু শুনব—একটি কথা বলব না, টুঁ শব্দটি করব না।

নরেন আর কিছু বলেনি।

সে জানত ও রকম ব্যবস্থা করে নিতে পারলে কিছু উপকার হয়তো মণ্টু পাবে কিন্তু আসল কাজ হবে না।

সমীরের মাস্টার তাকে পড়াবে সাধারণ পাসের পড়া, সে পড়ানো শুনে মণ্টুর ফার্স্ট হবার সুবিধা বিশেষ কিছু হবে না।

পড়ানো শোনার ব্যবস্থা মণ্টু করেছিল।

সমীর বাপের আদুরে ছেলে, সে নাকি বাবাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে মণ্টুকে সাথে নিয়ে পড়া তার অভ্যাস হয়ে গেছে, সে কাছে না থাকলে তার কিছুতেই পড়ায় মন বসে না।

ভুবন মণ্টুকে অনুমতি দিয়েছিল।

কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয়নি। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় মণ্টু আবার থার্ড হয়ে গেছে !

যোগেশের বাড়ির পাশের সরু গলি দিয়ে পিছন দিকে দীননাথের বাড়ি।

মাধবের বইখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে নরেন মণ্টুকে ওই সরু গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পায়। কয়েকটি ছেলে মার্বেল খেলছে—মণ্টুর আজ খেলায় মন নেই।

খবর কী মণ্টু ?

মণ্টু বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ে।

চলতে চলতে নরেন ভাবে, সে ইচ্ছা করলে ওকে ফার্স্ট করিয়ে দিতে পারে।

অলস অর্থহীন মানস-চর্চা স্থগিত রেখে তার সিকি ভাগ সময়ও যদি সে খরচ করে ওর পেছনে—টেস্টে আবার ও ফার্স্ট হবে।

স্কুল ডিঙানোর পরীক্ষাতেও আশানুরূপ রেজাল্ট করতে পারবে।

কিন্তু তারপর ?

তারপর কী হবে মণ্টুর অসাধ্য সাধনের চেষ্টার ? কে তাকে পরের পরীক্ষাগুলির জন্য তৈরি করবে ?

সকাল প্রায় নটার সময় মাধব বই থেকে মুখ তোলে।

মানসী কথা বলার সাহস ও সুযোগ পায়।

মাধবকে দেখেই এখন টের পাওয়া যায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে তন্ময় হয়ে পড়ার ঘোরটা তার কেটে গেছে।

সারারাত পড়েছ—

মানসীব সুরটা রাগ আর অভিমান মেশানো অনুযোগের।

সারারাত ? তুমি সারারাত জেগে থেকে আমায় পড়তে দেখেছ নাকি ?

এগারোটায় শুনলাম, দেখলাম পড়ছ। পাঁচটায় উঠলাম, তখনও দেখলাম পড়ছ। সেই একভাবে বসে। সিগারেটের ছাই যা জমেছে দেখছি একটা উনানের ছাইয়ের চেয়ে কম হবে না। এ সব দেখে মনে হবে না, তুমি হয়তো সারারাত ঠায় জেগে পড়েছ ?

তা মনে হতে পারে বটে !

তামাশা করছি না।

নিশ্চয় না।

মানসী আলগা আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে দেয়।

নটা বাজে। ভোরে চারু উনানে আঁচ দিয়ে গেছে, সেই থেকে নিজের মনে উনান জ্বলছে। শুধু কয়লা চাপিয়ে যাচ্ছি। চারবার না পাঁচবার শুধু তোমার চায়ের জল ফুটল, ব্যাস।

কেন ?

কাল রেশন আনোনি ! আজ এখনও বাজার এলো না। থলি খালি ঝুড়ি খালি, উনানে চাপাব কী ?

এতক্ষণ বলনি কেন ?

মুখে শুধু একটা বিষণ্ণ কাতর নালিশের ভঙ্গি ফোটে মানসীর। মুখ ফুটে সে কিছুই বলে না।

মাধব শেষ সিগারেটটা ধরায়।

মানসীর মুখের ভঙ্গি আর নীরবতা দুয়ের মানেই সে জানে। তাকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে দেখে কিছু বলতে মানসী সাহস পায়নি।

বই বন্ধ করে সমাহিতের মতো চিন্তা করার সময়ও, রেশন আর বাজারের কথা জানাতে সাহস পায়নি।

প্রত্যেকবার না হোক, ওই অবস্থায় ডাকলে, কী প্রচণ্ড রাগটাই যে মাঝে মাঝে মাধব দেখায় !

সচেতন হয়ে নিজের মনে তাকে হাসতে দেখে, এদিক-ওদিক চাইতে দেখে, কথা কইতে গেলেই আর তার বোমার মতো ফেটে পড়ার সম্ভাবনা নেই জেনে, মানসী সাহস করে তাকে রেশন আর বাজারের প্রয়োজনটা জানাতে এসেছে।

রাগ আর অভিমান দেখাতেও সাহস পেয়েছে।

মানসীর মন না জোগাক, তার মন সে জানে।

এমনই তাকে সে মোটেই ভয় করে না। তার সাধারণ রাগ বা ধমকের কোনো তোয়াক্কা রাখে না। মানসী ভালো করেই জানে যে সজ্ঞানে যতই রাগুক তাকে ধমক দেবার সাহস মাধবের হবে না।

তর্ক করবে ঝগড়া করবে রাগারাগি করবে—তার সঙ্গে সমানভাবে করবে। তার বেশি নয়।

কিন্তু পড়া আর চিন্তা করার সময় অন্য এক জগতে তলিয়ে গিয়ে সে হয়ে যায় একেবারে অন্য মানুষ।

সে যেন কুকুর বেড়াল, এমনইভাবে তার উপর মাধব খেঁকিয়ে উঠতে পারে শুধু তখন, যখন সে তন্ময় হয়ে পড়ে কিংবা খাতায় নোট লেখে কিংবা একদৃষ্টে দেয়ালের দিকে চেয়ে ভাবে।

পাগলের মতো তার ও রকম খেঁকিয়ে ওঠাকে মানসী কেন ভয় করে, ও রকম অসভ্য আচরণ কেন চুপচাপ সহ্য করে যায়, সহজভাবে কথাবার্তা চলার সময় ওই ধমকানির কথা উল্লেখ করে একটু অনুযোগ অভিযোগ পর্যন্ত সে কেন জানায় না, তাও মাধবের অজানা নয়।

পড়া আর ভাবা নিয়ে তার ও রকম তন্ময় হতে পারাকে মানসী শ্রদ্ধা করে, মুনিঋষির তপস্যা ভঙ্গ করার মতো ও সময় বিরক্ত করলে, তার একেবারে খেপে উঠে তাকে ভস্ম করে ফেলতে চাওয়া সংগত মনে করে। বোমার মতো ফেটে পড়ে গাল দিয়ে তাকে যে মাধব প্রায় মারতে উঠতে পারে এটাই তার কাছে সব চেয়ে অকাট্য প্রমাণ যে মাধবের জ্ঞানচর্চায় ফাঁকি নেই, সত্যই জ্ঞানের জন্য তার অকৃত্রিম সাধনা !

নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাওয়া, একাসনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া, কোনো কোনো রাত্রে ঘুমকে সম্পূর্ণ বর্জন করা, এ সবেরও চেয়েও ওটাই বড়ো প্রমাণ। কত বড়ো কত দামি চিন্তায় কত ব্যাঘাত ঘটলে, তবেই না একটা মানুষ ওভাবে রেগে উঠতে পারে !

অন্য কেউ নয়, তার উপরে রেগে উঠতে পারে।

মাধব অসাধারণ মানুষ বইকী।

সে জন্য মানসী হয়তো গর্বও বোধ করে মনে মনে।

খুব রাগ হয়েছে, না ?

আমার আবার রাগ ?

অভিমান ? অপমান ?

নটা কিন্তু বাজল।

মাধব সুর পালটায়।

আচ্ছা, চুপ করে বসে না থেকে একটা কার্ডের রেশন নিজে আনতে পারতে না ? কাছেই তো দোকান। ভাত সেদ্ধ হতে ঘণ্টা দেড়েকের কম লাগে না, ভাতটা হয়ে থাকত। সত্যি করে বলো তো, রেশনের দোকানে যেতে লজ্জা করে, না অপমান বোধ হয় ?

কিছুই হয় না। কত বাড়ির মেয়েরা রেশন আনছে।

তবে আনোনি কেন ?

উপায় ছিল না বলে। শুধু কী চা ? বারেবারে কত কী হুকুম চালাও খেয়াল তো থাকে না। বই থেকে মুখ পর্যন্ত তোল না। এটা দাও, ওটা করো—সঙ্গে সঙ্গে না হলেই তো আমার দফা নিকেশ।

না, তেমন ঝাঁঝ নেই মানসীর কথায়।

মাধবের জ্ঞানের সাধনায় সে-ও যে কাজ লাগে এটা জানিয়ে দেবার সুযোগ পেয়ে সে যেন খুশিই হয়েছে মনে হয়।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে মানসী বলে, হয়েছে আজ রেশন আনা বাজার করা !

কে ?

নরেনবাবু।

মাধব হেসে বলে, ভয় নেই, তোমার দায় না সেরে বসব না। তোমরা গল্প করো, আমি ঘুরে আসছি।

নরেনের মুখের স্বাভাবিক রুক্ষতার ছাপটা আজ আরও বেশি স্পষ্ট মনে হয়। বোধ হয় দাড়ি না কামানো আর চুলে তেল না দেবার জন্য। রাতজাগার জন্যও হতে পারে।

একতলার ভাড়াটে অনাথের মেয়ের জিম্মা থেকে মাধবের ছোটোছেলেকে সে কোলে করে এনেছিল, মানসীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, মায়ের কাছে আসবার জন্য কাঁদছিল। কিছুতে ভুলবে না তবু বেলা ওকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে। মেয়েটা কী ? এটুকু বুদ্ধি নেই যে মা-র জন্য কাঁদছে, মা-র কাছে দিয়ে আসি ? আমি জোর করে কেড়ে নিয়ে এলাম।

মানসী বলে, ওর দোষ নেই। আমিই ওপরে আনতে বারণ করেছিলাম—বলেছিলাম আমি গিয়ে নিয়ে আসব।

নরেন আশ্চর্য হয়ে যায়।

কেন ?

ছেলে কাঁদলে ওনার কাজের ব্যাঘাত হয়, চটে যান।

নরেন বলে, ও !

তারপর বলে, তাহলে মেয়েটাকে খুব ভালোই বলতে হবে, এমনই পরের ছেলে সামলায়।

মানসী একটু হাসে।—বিনা স্বার্থে কী আর সামলায় ?

ওর স্বার্থটা কী ?

পড়া বলে দিই, গান শেখাই। নইলে ওর কীসের গরজ এতক্ষণ আমার ছেলে সামলাবে ?

নরেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মাধবের দিকে চেয়ে থাকে।

মাধব নির্বিকারের মতো বলে, ও কাঁদলে চটে যাই নাকি ? তা তো আমি জানতাম না !

মানসী বলে, জানবে কী করে ? কেন চটে যাও পরে তো আর মনে থাকে না তোমার। কাজের সময় খোকা কেঁদে উঠলে আমি মুখে হাত চাপা দিয়ে থামাই, নয় তো নীচে দিয়ে আসি।

নরেনের সামনে এ প্রসঙ্গের জের টানতে চায় না বলেই বোধ হয় টেবিলে সদ্য শেষ করা মোটা বইটার দিকে একনজরে তাকিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে মাধব তাকে বলে, আপনাকে একটু বসতে হবে। আপনারা কথা বলুন, আমি বাজার আর রেশনটা নিয়ে আসি।

নরেন বলে, বাজার আবার রেশন ! অনেক টাইম লাগবে যে ? তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, আমি একটা সারি আপনি আরেকটা সারুন।

মাধব বলে, অতি উত্তম প্রস্তাব।

মানসী হেসে বলে, আমার সঙ্গে গল্প করার চেয়ে বাজার করা রেশন আনাও বুঝি ভালো লাগে ?

নরেনও হেসে বলে, দরকার পড়লে লাগে বইকী ! আপনার সঙ্গে গল্প করলে আপনার সময় নষ্ট, আপনার কাজটা করে দিলে বরং আধঘণ্টা সময় বাঁচবে।

আমার কাজ !

আপনার জন্যেই তো। নইলে মাধববাবুর কী আর বাজাব করা রেশন আনার গরজ থাকত ? হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসতেন।

মাধব প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, মোটেই তা নয়। উনি বাপের বাড়ি গেলে আমি নিজে রান্না করে খাই।

নরেন বলে, বউদি তাহলে বাপের বাড়িও যান ? দু-একদিনের জন্য বোধ হয় ?

রেশনের সোজা হিসাব, বাড়ির বাজারের হিসাবটা মাধব ভালো জানে—মাছ তরকারি কী আনতে হবে, কতটা আনতে হবে। মাধব তাই থলি হাতে বাজারে যায়, নরেন যায় রেশন আনতে।

রেশন হপ্তার তিন দিন চলে গেছে। আপিস খোলা, বেলাও হয়েছে। দোকানটাও কাছেই। প্রার্থী কম থাকায় মাধবের অনেক আগেই নরেন রেশন নিয়ে ফিবে আসে।

বলে, দেখলেন তো, কী রকম পাকা হিসেব। রেশন আনাও হল, গল্প করার সময়ও পেয়ে গেলাম।

আপনি হিসেবি মানুষ, সব দিক বজায় রাখতে পারেন।

খোঁচা দিলেন মনে হচ্ছে ?

খোঁচাই দিয়েছি।

কারণ ?

কারণ আপনি সত্যি ভারী হিসেবি। ওঁর কাছে আপনি কী শিখছেন শুধু নামটাই জানি—কেন শিখছেন তাও বুঝিনে। যখন তর্ক করেন, কিছুই মাথায় ঢোকে না। কিন্তু আমি দেখেছি, উনি চটে উঠতে গেলেই আপনি ভারী চালাকি কায়দায় তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দেন। কী বলেন তা বুঝি না কিন্তু আপনার চালাকিটা বুঝি।

নরেনের রুক্ষ মুখে হাসি দেখা যায় কদাচিৎ, সস্মিত স্নিগ্ধ তামাশা দুষ্টামি ইত্যাদি নানাধরনের নিঃশব্দ হাসি সে যেন ফোটাতেই জানে না অথবা তার মুখে আসেই না ও সব হাসি। সে যে হাসতে জানে মাঝে মাঝে তার হো-হো শব্দে ফেটে পড়া প্রচণ্ড হাসিতে তা টের পাওয়া যায়—গত বছর তিনেকের মধ্যে মাত্র কয়েকবার হলেও তার হাসির চোটে এ বাড়িটা যেন কেঁপে উঠেছে, নীচের তলার ভাড়াটেদের অংশ পর্যন্ত !

আজই যেন প্রথম বিস্ময়ে উত্তাপে গলে তার মুখে স্নিগ্ধ স্নেহময় হাসির নীরব ব্যঞ্জনা দেখা যায়।

তার মুখে এ রকম হাসি মানসী আজ পর্যন্ত দ্যাখেনি।

আপনি এত মন দিয়ে আমাদের তর্ক করা দ্যাখেন ? তর্কের মানে বোঝেন না, তর্ক করাটা দেখতে এত ভালোবাসেন ? মাধববাবু চটে উঠলে তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়াটা আপনার চালাকি মনে হবে—কিন্তু কোনোরকম সস্তা চালাকি সত্যি ওটা নয়।

কেন নয় ? আমি স্পষ্ট লক্ষ করেছি ওনার মেজাজ একটু চড়ে গেলেই আপনি আর জোরের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। উনি নরম হয়ে যা বলেন তাই মেনে নেন।

মেনে নিই না। চুপ করে শুনে যাই।

তার মানেই মন জোগান, তোষামোদ করেন। সেটাও ভারী চালাকি করে করেন। প্রথমে এমনভাবে দেখান যেন আপনার একটা খটকা লেগেছে, ভুল হয়েছে কি না আরেকবার ভেবে দেখছেন। তারপর আস্তে আস্তে নরম হতে হতে একেবারে চুপ হয়ে যান। অর্থাৎ উনি যেন না ভাবেন যে ওঁর রাগ দেখে চুপ করেছেন, ওঁর কথাটা মেনে নিয়েছেন ভেবে উনি যেন খুশি হন।

নরেন খুশি হয়ে বলে, আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা পালটে গেল। এবার বুঝতে পেরেছি কোন গুণে আমার গুরুটিকে দিনের পর দিন সামলে চলেন—শুধু সয়ে গিয়ে নয়।

তবে ?

কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে। বাস্তববুদ্ধি দিয়ে। তলিয়ে না বুঝলে কাণ্ডজ্ঞান জন্মায় না। তলিয়ে বুঝতে হলে বুদ্ধি দরকার হয়। এই বুদ্ধিটুকু আপনার আছে জানা গেল। আমার বেলা মাধববাবু যেমন বুঝতে পারেন না আমি মানিয়ে চলছি, মত মানছি না—আপনার বেলাতেও বুঝতে পারেন না যে, আপনি ভয় করেন না, মানিয়ে চলেন।

কথা বলতে বলতেই মানসী দায় সামলাচ্ছিল। ছেলেকে দুধ খাইয়ে শুইয়ে রেখে, জ্বরে নিঝুম বছর সাতেকের মেয়েকে একদাগ রঙিন মিক্‌শ্চার খাইয়ে বছর ছয়েকের বড়োছেলের গায়ে এখন তেল মাখিয়ে দিচ্ছিল। সে ইনফ্যান্ট স্কুলে পড়ে।

মানসী বলে, ছেলেমেয়ের দিকে বেশি তাকাতে পারি না, যত্ন হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বোধ হয় পাঁচ-দশমিনিটের বেশি ওঁর খেয়াল থাকে না যে বাচ্চারা আছে। বিদ্বান হলে কী মানুষ স্বার্থপর হয় ?

শিষ্যের কাছে গুরু-নিন্দা করছেন ?

গুরুপত্নী হিসাবে করছি।

নরেন একটু চুপ করে থেকে বলে, স্বার্থপরতা বলা যায় কি ? ওনার নিজের জন্য তো জ্ঞানচর্চা নয়। বিদ্যার জন্য আদর্শের জন্য এ রকম মেতে থাকলে বোধ হয় স্বার্থপরতা হয় না।

মানসী চোখ তুলে তাকিয়ে বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে প্রশ্ন করে, আপনি এ যুক্তি মানেন ?

নরেন সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে জবাব দেয়, না। বিদ্যা বা আদর্শ কারও নিজের স্বার্থ নয়, এই অজুহাতে স্বার্থপরতা চলে না।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে আসে।

মাধবের অগোচরে তার সম্পর্কেই একটা যেন বোঝাপড়া হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। খোলাখুলি বোঝাপড়া, অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ মানুষের মধ্যেই যেটা সম্ভব হয়ে থাকে। পরামর্শ করে তারা যেন ঠিক করে ফেলল, যে মাধবের সম্পর্কে অন্তত একটা দিকে তাদের মত মিলে গেছে—মানুষটা সে স্বার্থপর এবং দুজনেই তারা তার সঙ্গে মানিয়ে চলে।

নিজেকে শিষ্য বললেও মাধবের চেয়ে সমীর বয়সে পাঁচ-ছবছরের বেশি ছোটো হবে না। মাধব লেখাপড়া শিখেছিল এক মাসির টাকায়, মাসি এক রকম জোর করে ছাত্র অবস্থাতেই তার বিয়ে দিয়ে

দিয়েছিল। গুরুশিষ্য তারা পরস্পরকে আপনি সম্বোধন করে। পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারও তাদের মোটেই গুরুশিষ্যের মতো নয়, প্রায় সমবয়সি দুজন পরিচিত মানুষের মতো।

তর্ক করতে করতে মাধব চটে যায় বটে, সেটা কিন্তু মূর্খ শিষ্যের বেয়াদবিতে গুরুর চটে যাওয়া নয়। জগতের সেরা বুড়ো জ্ঞানী ব্যক্তিরা এসে মাধবের মতামতের বিরুদ্ধে তর্ক জুড়লে তাদের উপরেও চটে উঠতে মাধবের বাধত না। বুদ্ধির জড়তা এবং তার যুক্তি না মানার অজ্ঞতা একেবারেই সহ্য হয় না মাধবের।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাধব ফিরে আসে। থলির দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায় তরিতরকারি সে এনেছে অতি সামান্যই। তবে হাতে ঝুলিয়ে এনেছে মস্ত একটা ইলিশ মাছ।

বাজারের থলিতে এত জায়গা খালি থাকতে, থলির মধ্যে মাছটা রেখে হাতটা খালি করার বদলে, মুখে সুতো বাঁধা মাছটা হাতে ঝুলিয়ে এনেছে কেন, বুঝতে নরেনের অন্তত দেরি হয় না।

ভুলো মন বলে নয়। হিসেবি মন বলেই।

সে চায় দশজনে চেয়ে দেখুক, দেখবে সে কত বড়ো একটা মাছ কিনে এনেছে তার বউ আর ছেলেমেয়ের জন্য।

দশজনে জানবে, মানুষটা সে নিজের সংসার সম্পর্কে নিষ্ঠুর রকম উদাসীন নয়। দশজনে বুঝবে, যতই সে পুঁথিপত্রে মুখ গুঁজে সকলকে এড়িয়ে চলুক, মানুষটা সে তাদেরই মতো সংসাবী। সংসারের জন্য সে বাজারেও যায়, এত বড়ো একটা ইলিশ মাছও কিনে আনে।

কিন্তু ইলিশ মাছটা দেখে মানসী যেন খেপে যায়।

মাধবের হাত থেকে মাছ আর থলিটা নিয়ে রান্নাঘরে যাবার বদলে সেইখানে সেই বিদ্যামন্দিরে বইখাতায় স্তূপাকার টেবিলটার পাশে বাজারের থলিটা উপুড় করে দেয়।

মাধবের আনা বাজার দেখে নরেনেরও হাসি। মানসীর রাগটাও সে সমর্থন করে। কিন্তু একটা কথার মানে ভেবে পায় না। যতই আপনভোলা কাছাখোলা লোক হোক, বাজার তো বরাবব মাধব নিজেই নিয়ে আসে। এতদিন বাজার করেও তার কাণ্ডজ্ঞান জন্মাল না, মাছ তরকারি কেনার মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য দরকার হয় !

দুটো আলু আর একটা বেগুন ? কপি পেলে না ? শাকপাতা পেলে না ? লাউ কুমড়ো পেলে না ? তোমার সয় না, তুমি ভালোবাস না, তাই বলে আমরাও কী খেতে পারব না ?

আশ্চর্যের বিষয়, নরেনের সামনে এ রকম ধমক খেয়েও মাধব রাগ করে না।

হাসিমুখে বলে, কী হল জানো ? প্রথমে মাছটা কিনে ফেললাম। তারপর পকেটে হাত দিয়ে দেখি পয়সা বেশি নেই। তরকারি কম কিনতে হল।

নরেন এবার হেসে ফেলে।

তরকারি কম কিনতে হল ! তরকারি কেনার নিয়মরক্ষার জন্য দুটো আলু আর একটা বেগুন না কিনলেই হত ! মানসীরও রাগ করার কারণ থাকত না। এত বড়ো একটা ইলিশ মাছ এনেছে— মাছের ঝোল দিয়ে দিব্যি ভাত খাওয়া চলে।

মুখে যা-ই বলুক, উনানটাকে মানসী একেবারে মিছামিছি জ্বলে যেতে দেয়নি। কোনোরকম একটা ডাল যে ফুটিয়ে নিয়েছে, সম্ভারের গন্ধেই সেটা জানা গিয়েছিল। ডাল আছে, তার সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা, ইলিশ মাছের ঝোল—এ তো রাজভোগ !

তবু তরকারি-প্রীতির অন্ধ সংস্কারের বশে দুটো আলু আর একটা বেগুন কিনে আনার কী প্রয়োজন ছিল মাধবের !

মানসীও পাতাল থেকে আকাশে ওঠার মতো হঠাৎ হেসে ফেলে বলে, ধন্য মানুষ তুমি !

মাধবের কৈফিয়ত শুনেই রাগ যেন তার জল হয়ে গেছে। এমন যে বিদ্যাপাগল আপনভোলা মানুষ, তার উপর কী রাগ রাখা যায় !

নরেনের মনে জাগে আপশোশ সে-ই কি মানসীকে আজ উসকে দিয়েছে বেশি করে মানিয়ে চলার জন্য, সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য ? মাধবকে নিয়ে আলোচনা করার সময় তার কথার এই মানেই কি মানসী বুঝেছে যে জ্ঞানের জন্য যে পাগল হয় তার অন্যরকম পাগলামি, চরম আত্মকেন্দ্রিকতা হোক, বা স্বার্থপবতা হোক, সে পাগলামিগুলিকেও মেনে নিতে হবে, প্রশ্রয় দিতে হবে ?

রাগ যদি নাই রাখা যায় কী দরকার ছিল অত বেশি রেগে যাবার ? মাধব একটা পাগলামি করে বসেছে এই কৈফিয়ত শুনেই রাগ জল করে দিয়ে এভাবে হেসে উঠবার ? এতে মাধব তো আরও বেশি পাগলামি করতে সাহস পাবে ! এভাবে নিজের জীবনটা নিজের কাছে অসহ্য করে তুললে শেষ পর্যন্ত কী উপায় হবে মানসীর ?

মানসী যায় মাছ কুটতে, তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে এসে মাধব বলে, আসুন আমরা বসি।

২

দর্শনের আরেকটা মোটা বই নিয়ে মাধবের বাড়ি থেকে বেরোবার সময়েও নরেন জানত সে বাড়ি ফিরে যাবে।

পথে নেমে মনে পড়ে যায় নন্দনকে।

নরেন নিজের কাছে লজ্জা বোধ করে।

এত ঢিলে হয়ে গেছে তার মন ? দরকারের চেয়েও মস্ত বড়ো একটা ইলিশ মাছ কিনতে পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ার চার পয়সার তরকারি কিনে বাজার সারা মাধবের পোষায়, মাধবকে মানায়। শুধু ছোঁয়াচ লেগে মাধবের মতো মহাপুরুষ হয়ে উঠলে তার চলবে কেন ?

কাল সে জানতে পেরেছিল যে তাদের আপিসে একটা নতুন পোস্টে একজন নতুন লোক নেওয়া হবে।

একেবারে যেন নন্দনেরই বয়স আর বিশেষ গুণাগুণ ইত্যাদি হিসেব করে সৃষ্টি করা নতুন চাকরি।

ভেবেছিল আপিস থেকে বাড়ি ফেরার পথেই নন্দনকে খবরটা দিয়ে যাবে—কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন লিখবে আর পেশ করবে, তাও জানিয়ে দেবে। সোমবার দশটায় নিজে নন্দন দরখাস্তটা দাখিল করে আসবে।

কিন্তু মোটা বইটার বক্তব্যে তার ছিল অনেকগুলি খটকা। সব চেয়ে জবুরি খটকাটা মনটা জুড়ে ছিল সারাদিন।

আপিস থেকে বেরিয়ে সে ওই কথাই ভেবেছে। রাত জেগে ওই বইটাই পড়েছে। সকালে তর্ক আর আলোচনার ভিতর দিয়ে মাধবের কাছে খটকাগুলির মীমাংসা করে নেওয়ার কথাই ভেবেছে।

বইয়ের নেশায় মেতে একেবারে ভুলে গেছে নন্দনকে।

ভুলে গেছে বন্ধুর চাকরির প্রয়োজন কত বেশি মারাত্মক বাস্তব সমস্যা। একটা চাকরির খবর জানলে বন্ধুকে খবরটা জানানো তার কত বড়ো গুরুতর কর্তব্য !

নন্দনের অদ্ভুত আশ্চর্য সহনশীলতার জন্যই কী এ রকম হয় ? এতকাল চাকরি জোটাতে না পেরেও ব্যাকুল হয় না, পাগল হয় না, ঘরে-বাইরে সমস্ত অপমান মুখ বুজে সয়ে যায়, নিদারুণ

অসুবিধাগুলি নিয়ে কখনও কারও কাছে নালিশ জানায় না,—এই জন্যই কি তারও খেয়াল থাকে না, যে যেমন তেমন একটা চাকরি জোটানো কী গুরুতর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বন্ধুর কাছে ?

মৃত বাপের জ্যাঠার সংসারে আশ্রিত নিরুপায়ের মতো অবজ্ঞা অবহেলা মেনে নিয়ে জীবনযাপন করে—কিন্তু নন্দনের যেন দুঃখ নেই, অপমান নেই, আপশোশ নেই। অন্যায় অবিচার এমনভাবে সহ্য করে চলে, যেন গ্রাহ্যই করছে না।

বাপের এক ছেলে।

তার বাবা রমেশ মরবার সময় তার জ্যাঠা হেমেন্দ্রর কাছে সমর্পণ করে গিয়েছিল হাজার পাঁচেক নগদ টাকা, হাজার পনেরো টাকার জীবনবিমা, নন্দনের মা-র হাজার তিনেক টাকার গয়নাগাঁটি—আর পাঁচ বছরের নন্দনকে।

বাসনপত্র আসবাবপত্র ইত্যাদি আর সমর্পণ করে যেতে হয়নি, হেমেন্দ্র এমনিতেই দখল পেয়েছিল।

মরার সময় শুধু তাকেই যে বাবা, হেমেন্দ্রের হাতে সঁপে দিয়ে যায়নি, নগদ টাকা জীবনবিমা গয়নাগাঁটিও দিয়ে গিয়েছিল, বড়ো হয়ে এটা জানতেও কোনো অসুবিধাই ঘটেনি নন্দনের।

আত্মীয়স্বজন কতবার যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর তাকে জানিয়েছে, সমবেদনা দেখানোর সঙ্গে কত যে পরামর্শ দিয়েছে প্রতিকারের এবং প্রতিশোধের !

নন্দন চুপচাপ শুনে গেছে।

একমাত্র লেখাপড়ার ব্যাপারে ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সব রকম দুর্ব্যবহার চুপচাপ সয়েও গিয়েছে।

ছেলেটা সত্যি চালাক।

বিনা মাইনের ছোকরা চাকরের চেয়ে খারাপ ব্যবহার পেয়েও সব সহ্য করে যায়, শুধু লেখাপড়ার ব্যাপারে করে প্রতিবাদ !

লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার জন্য তার এই লড়ায়ের ইতিহাসটা নন্দন নিজেই নরেনকে সবিস্তারে জানিয়েছে। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েও দিয়েছে কেন মাথা নিচু করে সব সহ্য করে যেত, কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারে উঠত ফুঁসে।

বলত, কেন ? বাবা মরার সময় বলে গেছেন, আমাকে লেখাপড়ার সব খরচ আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার মনে নেই ভাবছেন ? পড়তে না দিলে আমি হাঙ্গামা করব কিন্তু বলে দিলাম !

মরবার আগে পাঁচ বছরের ছেলেকে বাপ কী বলে গিয়েছিল ছেলে সেটা মনে করে রেখেছে ! হেমেন্দ্র জানে এটা অসম্ভব, কিন্তু পাপীর মন ছায়াতে ভয় পায়, ইঙ্গিতে ভড়কে যায়।

হেমেন্দ্র বোধ হয় ভাবত, ঘাঁটিয়ে কাজ নেই ছেলেটাকে, লেখাপড়ার খরচ ছাড়া আর কিছুই চায় না, ছেঁড়া জামাকাপড় মেনে নেয়, যা পায় তাই খেয়ে খুশি থাকে, মুখ বুজে ঠিক চাকরের মতো সংসারের কাজে খাটে—শুধু লেখাপড়া শিখতে চায়, শিখুক।

ছেলেটার মাথাও আছে।

ভালো রকম পাস করলে একদিন হয়তো ভালো চাকরি পাবে। সেদিন হয়তো লেখাপড়া শিখবার সুযোগ দেবার জন্য তাকে খাতির করবে, মাসকাবারে মাইনের টাকা হাতে তুলে দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবে।

অন্তত প্রথম কয়েকটা বছর তো করবেই !

হেমেন্দ্র কাটা কাপড় ছিটজামার একটা ছোটোখাটো দোকান চালায়। লোকে বলে, নন্দনের জন্য রেখে যাওয়া তার বাপের টাকা দিয়েই নাকি সে দোকানটা করেছিল।

তিনটি ছেলে মারা গেছে হেমেন্দ্রের। বড়োছেলেই কেবল বেঁচেছিল কিছু দীর্ঘকাল, তারই বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বুড়ো হেমেন্দ্রের সংসার। তেইশ বছরের গোবিন্দ ছাড়া ছোটো ছোটো তিনটি ছেলে আছে, ছবিরাণীকে নিয়ে দুটি মেয়ে।

নন্দন ভালোভাবেই পাস করেছে।

বিজ্ঞানে মাস্টার উপাধি পেয়েছে।

ভালোমন্দ একটা চাকরি কিন্তু নিজেও জোটাতে পারেনি অন্য কেউ জুটিয়েও দিতে পারেনি আজ পর্যন্ত !

পাস করার পর তিন বছর ঘুরে গেছে কবে !

নন্দন বাজারের থলি হাতে বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছিল, বন্ধুকে দেখেই সে বলে, এই যে চাকরে মহাপুরুষ, আসুন ! আসুন !

রীতিমতো নালিশের সুর, বেশ ঝাঁঝ আছে কথায়।

নরেনের মনে হয়, বাড়ির মানুষের কদর্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে বন্ধুর কাছে পর্যন্ত কখনও নালিশ জানায় না বলেই নন্দন তার সামান্য ত্রুটি পেয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে নালিশ জানাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তারই কাছে !

প্রাণটা তো তার জ্বালা করে। জ্বালাটা প্রকাশ করার সুযোগ তো খোঁজে তার প্রাণ !

কদাচিৎ হয়তো দু-একটা দিন ফসকে যেত, নন্দনের সঙ্গে ছিল তার নিত্যকার মেলামেশা। চাকরি পাবার পর সেটা কমতে কমতে এমন অবস্থায় এসেছে যে বাজারে একদিন নন্দনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর প্রায় একমাস পরে আজ আবার দেখা !

কিন্তু তাতে কী এসে যায় ?

কী কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবন-মরণের পরীক্ষায় পাসের নম্বর পাওয়া, তা কি নন্দন জানে না ?

দূরে যদি সে ভেসে গিয়েই থাকে স্রোতে, নন্দনও কি অবুঝ আত্মীয়স্বজনের মতো তাকে খোঁচা দেবে যে তার বন্ধুত্ব খাঁটি নয় ?

নরেন ক্ষুব্ধ হয়। তাই উদাসভাবে বলে, ব্যস্ত ছিলাম, তাই আসিনি !

এত ব্যস্ত ছিলি, বিষম কর্মী মানুষ হয়ে গিয়েছিলি, এর মধ্যে ব্যস্ততা শেষ হয়ে গেল ? কর্ম ফুরিয়ে গেল ?

নন্দনের ঝালঝাড়ার চেষ্টা এবার খুশি করে নরেনকে। নন্দন তবে অভিমান করার, রাগ করার এবং সেটা জোরের সঙ্গে প্রকাশ করার স্তরে নেমে এসে সাধারণ মানুষ হয়েছে, অংশীদার হয়েছে তাদের রাগারাগি ঠোকাঠুকি ভরা সাধারণ জীবনের ? কোনো বিষয়ে কারও কাছে ভুলেও কখনও নালিশ না জানানোর অসাধারণত্ব বর্জন করেছে ?

অ্যাদ্দিন গাধার মতো খাটছিলাম তাই। তোর কাছে না এসে রোজ সিনেমা দেখেছিলাম ভেবেছিস নাকি ? চাকরি করি আর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বই পড়ি। কপাল মন্দ না হলে কারও এ রকম চাকরি জোটে !

তার মানে ? চাকরি পেয়ে চাকরির কাঙাল আমার কাছে কপালের নিন্দা ?

মানে তুই বুঝবি না—আগে চাকরি হোক।

এমন হঠাৎ আসার মানে তো আছে ?

বিশেষ দরকারে এসেছি।

বিশেষ দরকার ? আমার সঙ্গে ? আয় ভেতরে এসে বোস। চা কিন্তু পাবি না। আমার নিজের চা বন্ধ।

ঘরে গিয়ে তারা বসতেই ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় হাঁক আসে—নন্দন, তুমি আড্ডা জমালে আমি কী করে নেমন্তন্ন রাঁধব ? বাজারটা এনে দাও ? কোন ভোবে উনানে আঁচ দিয়েছি—

আরও কোমল মেয়েলি গলায় জোরালো প্রতিবাদ শোনা যায়, একজন বাড়ি এসেছে, পাঁচ-দশমিনিট বলুক না কথা ? তুমি বড়ো বাড়াবাড়ি কবো মা।

ছবিরাণীর গলা ! জোর গলায় মার হুকুমের প্রতিবাদ করে সে তাকেও জানাচ্ছে যে দ্যাখো, তোমার মান রাখতে আমি কেমন মার সঙ্গেও লড়াই করি !

বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে নরেন বলে, চা বন্ধ, না ? অ্যাদ্দিনে তাহলে মুখ তুলে দুটো কড়া কথা বাড়ির লোককে বলতে পেরেছিস !

নন্দন এবার একটু হাসে।

বুঝেছি। আজ হঠাৎ আমার মুখে নালিশ কেন জিগ্যেস করছিস তো ? অন্যায় মানি আর না মানি, আমি নালিশ জানি না। ভাবছিস তো আজ নালিশ দিয়ে শুরু করেছি কেন ? ঠিক ধবেছিস, তোর মতো বন্ধু পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা !

আমি ভাগ্য-টাগ্য মানি না।

বটে ! চাকরি পেয়েছিস বলে এখুনি তো মন্দ কপালের নিন্দে করছিলি, পাঁচ মিনিট আগে।

ওটা অভ্যাস—কথার কথা বলেছি। মনের দুঃখ প্রকাশ করেছি।

অভ্যাসটাই আসল। ভাসাভাসাভাবে তুই কি বড়ো বড়ো কথা ভাবিস আর ছাড়াছাড়াভাবে ভাগ্য না মানার দু-একটা কী প্রমাণ দেখাস—তাতে কী আসে যায় ? ফ্যাসাদে পড়লে ও সব খেয়াল থাকে না—ভাগ্য-মানার অভ্যাসটাই বড়ো হয়ে ওঠে।

নরেন বাধা দিয়ে বলে, আমার বিষয়ে লেকচার না ঝেড়ে নিজের কথা কী বলছিলি বলে শেষ কর না ?

নন্দন বলে, বলছি বলছি—তোর কথাটা আগে না বললে আমার কথাটা কিন্তু জমবে না।

নরেন বলে, আমি একটা চাকরির খবর এনেছি। আমাদের আপিসে একটা নতুন চাকরি সৃষ্টি করা হয়েছে। সোমবার দশটা বাজার আগে দরখাস্ত নিয়ে আমার কাছে গিয়ে হাজির হবি। কীভাবে কী লিখতে হবে শ্লিপে লিখে এনেছি।

নন্দন প্রায় নির্বিকারের মতো শোনে।

নরেন বলে, শুধু তাতে হবে না। চাকরি হওয়ার ব্যাপার জানিস তো এ দেশে ? আজকেই মাধববাবুর একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করবি— বড়ো বড়ো ডিগ্রি আছে, তোর পেটে বিদ্যা আছে উনি এটা লিখে দিলে কাজ দেবে। তারপর যাবি তোর বাবার সেই যে উপরওলা ছিল বনমালীবাবু ?—তার কাছে। বাবার কথা বলবি, জোর করে চেপে ধরবি যে চাকরিটা করে দিতেই হবে। ওর সঙ্গে আমাদের আপিসের হারাণবাবুর খাতির আছে।

নন্দন চুপ করেই থাকে।

দরখাস্ত দিবি হারাণ ব্যাটার দপ্তরে, কিন্তু রেজেস্ট্রি করে দুলাইন একটা চিঠি পাঠিয়ে দিবি বড়ো সায়েবের কাছে। শুধু লিখবি যে চাকরিটার জন্য যথারীতি একটি দরখাস্ত যথাস্থানে পেশ করেছিস। নইলে হারাণ ব্যাটা দরখাস্ত চেপে দেবে।

এবার নন্দন একটু হাসে।

কিছু হবে না।

চেষ্টা তো করতে হবে ?

তা করতে হবে, তবে কিছু হবে না। বরং আমার কাছে খবর জেনে বনমালী চাকরিটা নিজের কাউকে বাগিয়ে দেবে।

এ সব সকলের জানা কথা, তর্ক করার কিছু নেই। নরেন তাগিদ দিয়ে বলে, তবু চেষ্টা করতেই হবে। এবার তোর কথাটা চটপট বলে বাজারে যা। এরা আবার চটাচটি করবে।

কেন ? চাকর নাকি আমি ?

ও বাবা ! তুই দেখছি ফোঁস করে উঠছিস !

নন্দন সহজভাবেই বলে, চুপ করে থাকার সময় চুপ করে থাকতে হয়, আবার ফোঁস করার সময় হলে ফোঁস করতে হয়। দাদুর কাছে কাল পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলাম। একটা চায়ের দোকান দেব। দাদু পরিষ্কার বললে, লেখাপড়া শিখিয়েছি, মানুষ করেছি, টাকা রোজগার করে আনবি যা।

তা তো বলবেই ! সে তো জানা কথাই ! পাঁচটা টাকা চাইলে দেবে না জানিস, পঞ্চাশ টাকা তুই চাইতে গেলি কোন বিবেচনায় ?

নন্দন একটু হাসে।

বিবেচনা ঠিকই করেছিলাম। টাকা ক-টা ভিক্ষা চাইনি—দাবি করেছিলাম। কাল পর্যন্ত দাদুকে কোনোদিন টের পেতে দিইনি, বাবা আমার জন্য কী রেখে গেছেন, কত রেখে গেছেন আমি সব জানি। কাল প্রথম বললাম, দাবি করলাম বাবার টাকা থেকে আমার পঞ্চাশটা টাকা চাই। কী বললে জানিস ? আমি নাকি নেমকহারাম, বজ্জাত ! বাবা যা রেখে গিয়েছিল আমার পিছনে কবে সব খরচ হয়ে গেছে—সাত-আটবছর আগে। এতদিন দাদুর টাকায় আমি খেয়েছি পরেছি লেখাপড়া শিখেছি।

নরেন চমৎকৃত হয়ে যায়।

তুই মেনে নিলি ? ঝগড়া করলি না ?

নন্দন বলে, ঝগড়া করলাম বইকী। কিন্তু মনে জোর পেলাম না, জোর গলায় কথা বলতে পারলাম না। আমার পলিসিটাই আগাগোড়া ভুল ছিল। আগে ঝগড়া করলে, দশজন আত্মীয়স্বজনকে ডেকে মধ্যস্থ মানলে হয়তো কিছু ফল হত। লেখাপড়া শেখার খাতিরে অ্যাদ্দিন চুপচাপ মেনে এসেছি যে, বাবা কিছু রেখে গেলেও দাদুই দয়া করে আমায় খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। পরীক্ষা পাস করাটাই মোক্ষম ধরেছিলাম—সেটাই হয়েছিল আসল ভুল।

একটু সে হাসে, দাদুর এক যুক্তিতে ভুলের মাশুল তাই উসুল হয়ে গেল। কথাটি কইতে পারলাম না।

কী রকম ?

দাদু বললে, ছ-সাতবছর বয়সের সময় আমার নাকি সাংঘাতিক অসুখ হয়েছিল। বাঁচা সম্ভব ছিল না। হাজার হাজার টাকা ঢেলে চিকিৎসা করে দাদু আমায় বাঁচিয়েছিল। আমি কী বুঝব ভাইয়ের ছেলে একটা দায় ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে মরে গেলে সেকেলে মানুষের কী অবস্থা হয়—আমরা তো একেলের নরাধম ছেলে। নিজের নাতি-নাতনির মরণ-বাঁচন তুচ্ছ করে দাদু আমায় বাঁচাবার দায় পালন করেছে। বাবা যা রেখে গিয়েছিল তাতে অবশ্য সাহায্য হয়েছে খানিকটা। তবু ক-জন করে এ রকম ?

নন্দন একটু থেমে বলে, ভাব দেখলে তোর ধাঁধা লেগে যেত। এমন করে আকাশের দিকে চেয়ে কথাগুলি বলছিল, যেন বাবাকে আকাশে দেখতে পাচ্ছে আর নালিশ জানাচ্ছে—তোমার দেওয়া দায় প্রাণ দিয়ে পালন করলাম, তোমার অকৃতজ্ঞ ছেলেটা কী বলছে শোনো ! কী নিয়ে ঝগড়া করব ? কোন যুক্তিতে বলব ছেলেবেলা আমার ও রকম অসুখ হয়নি, তুমি সব বানিয়ে বলছ ?

নরেন আশ্চর্য হয়ে বলে, কী বললি কথাটা ? তুই নয় ছোটো ছিলি, মনে নেই। হাজার হাজার টাকা খরচ করে তোর কঠিন রোগের চিকিৎসা হল—আত্মীয়স্বজন কেউ কিছু জানল না ? তারা তো বলতে পারবে সত্যি তোর অসুখ হয়েছিল কিনা, চিকিৎসায় হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছিল কিনা ?

নন্দন অদ্ভুত একটা মুখের ভাব করে চুপ করে থাকে।

নরেন রেগে বলে, তুই সত্যি বোকা। বলতে পারলি না কী অসুখ হয়েছিল, কোন ডাক্তার চিকিৎসা করেছিল—

চুপ কর হাঁদা। ও সব বলতে হয়নি। বলবার আগেই দাদু সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছে—আজে-বাজে তর্ক করিস না, বাপের গচ্ছিত কোটি টাকা পাওনা হয়ে থাকে, আদালতে গিয়ে আদায় কর। তার আগে সোজাসুজি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।

তবু তুই বেরিয়ে যাসনি ?

কেন যাব ? বোকামি করে বিপাকে পড়েছি। তাই বলে আরও বোকামি করে আরও বেশি বিপাকে পড়ব ? অ্যাদ্দিন বোকার মতো সব সয়ে এসেছি, এখন বুঝেছি বলেই বোকার মতো তড়বড় করে সব নষ্ট করব ? অ্যাদ্দিন যখন সয়েছে, আর ছ-মাস একবছরও সইবে। প্রতিকার করব, শোধ নেব।

দেয়ালে মাথা ঠুকে ?

ভাঙা দেয়াল, এমনিতেই ভেঙে পড়তে চাইছে। মাথার মায়া না করে ঠিকমতো ঠুকতে পারলেই ধ্বসে পড়বে !

নরেন খানিকক্ষণ চুপচাপ ভাবে ! তার নিকটতম বন্ধু, কিন্তু এতদিন তার চরিত্রের বড়ো একটা দিকই তার জানা ছিল না। ওকে সে ভাবত ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ। নিরীহ গোবেচারি বন্ধুটির জন্য বেশ খানিকটা অবজ্ঞার ভাবও বরাবর মনের মধ্যে পোষণ করে এসেছে।

আজ মনে হয়, সময় বিশেষে, অবস্থা বিশেষে, অন্যায় সহ্য করাটাও তো তেজের পরিচয় হতে পারে ! গোঁয়ার্তুমি করার জোরালো ঝোঁকটা সামলে অন্যায়কে একদিন ভেঙে চুরমার করার প্রয়োজনেই অন্যায়কে মেনে চলার মধ্যেও তো কম মনের জোর, কম তেজের পরিচয় থাকে না !

এটাও তো লড়াই করারই কায়দা। এগোবার জন্যই যখন পিছিয়ে যাওয়া দরকার তখন পিছিয়ে যাওয়া ?

নন্দন হিসাবে ভুল করে থাকতে পারে, পরীক্ষা পাস করাটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ধরে নেওয়ায় ঠকে গিয়ে থাকতে পারে—কিন্তু লক্ষ্যে পৌছবার যুদ্ধটা তো সে চালিয়ে গেছে ঠিকমতোই !

নন্দন বলে, কী ভাবছিস ? এবার ওঠ বাজারটা করে আনি।

নরেন শুনতে পায় না, একভাবে বসে থাকে। তার কানে ক্রমাগত ভেসে আসে অন্দরের রাগ বিরক্তি বাদ-প্রতিবাদের গুঞ্জন—ধমক-ধামকের মেয়েলি ও পুরুষালি গর্জন ! আর ছেলেমেয়ের এলোমেলো কান্না !

তার নাকে লাগে অন্দরেরই ডাল সম্ভারের ঝাঁঝালো গন্ধ—আধপচা মাছভাজার গন্ধ।

ছবিরাণীর গলার আওয়াজ কিন্তু মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না !

সে তাকে মনে মনে স্মরণ করেছে জেনেই যেন ছবিরাণী এবার নিজেই বৈঠকখানায় আসে। দুকাপ চা হাতে নিয়ে। বলে, বাজার আনতে আর দেরি করলে তো চলে না বড়দা। চা-টা খেয়ে চলে যাও।

চা খাব না।

বলে নন্দন গটগট করে বেরিয়ে যায়।

উদারতা দেখিযে মা-র তাগিদ ঠেকিযে সে তাদের কথা বলার সুযোগ দিয়েছিল, ঠিক কথা ফুরিয়ে আসতেই নিজে এসে তাগিদ দিয়েছে বাজারের জন্য।

সে কী করে টের পেল তাদের কথা ফুরিয়েছে ?

কথা বলার সুযোগ দিয়ে আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনছিল ?

তারা বৈঠকখানায় বসে কথা শুরু কবেছে টের পেয়েই গৌরী গলা চড়িয়ে হাঁক দিয়ে নন্দনকে ডেকেছিল—তাড়াতাড়ি বাজাব এনে দেবার জন্য।

তখন শুধু শোনা গিয়েছিল ছবিরাণীর গলা। মা-র হাঁকডাক দিয়ে হুকুম করাটা রদ করার জন্য গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করা।

তারপর থেকে ছবিরাণীর গলার একটি আওয়াজও সংলগ্ন বৈঠকখানায় পৌঁছায়নি।

বৈঠকখানাই বটে।

ঠাট পর্যন্ত বজায় রাখা যায়নি। ড্রেসিং টেবিলটা অন্দবে সরে গেছে, ছটার মধ্যে চারটে চেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে, জাপানি মাদুর বিছানো মেঝে হয়েছে অনাবৃত।

রাত্রে দুটো মশারির দুটো বিছানা হয়— পাঁচজন ঘুমায়। সকালে একঘণ্টার জন্য হয় সাতজন ছাত্রছাত্রীকে সনৎ মাস্টারের একঘণ্টা প্রাইভেট পড়ানোর যাত্রাপালা।

তারপর বৈঠকখানা খালি রাখা হয দোতলায় শয্যাশায়ী রমেন ডাক্তারের জন্য। ছবিরাণীর সে মেজো মামা। ভালো চাকরি করত—রোগে ভুগে ভুগে প্রায় পঙ্গু হয়ে চাকরি হারিয়ে হেমেন্দ্রের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

সে ডাক্তার নয, তবু ডাক্তারি করে।

যদি কোনো আবোগ্য-প্রার্থী আসে, পযসা দিযে ওষুধ ও আরোগ্য চায়—রমেন দামি শালটা গাযে জড়িয়ে অতিকষ্টে রোগীর ইচ্ছানুসারে হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধেব ব্যবস্থা দিয়ে ওষুধের দাম আর এক টাকা ফি নিয়ে আবাব দোতলায নিজেব বিছানায় শুতে যায়।

এত বেলায় চা খাব না।

ছবিরাণী অবাক হবার ভান করে বলে, ও বাবা, চাকরি পেয়ে খালি পায়াই ভারী হয়নি, এ রোগও জন্মেছে ! বেলা দশটায় তৈরি চা সামনে ধরে দিলেও বাবুমশায় খেতে চান না !

নন্দনের চা জলখাবার বন্ধ হয়েছে। নন্দনকে না দিয়ে একা তাকে দেওয়া যায় না বলেই ছবিরাণী দুকাপ চা এনেছে। তার এই দয়া মেনে না নিয়ে নন্দন চা না খেয়েই চলে গেছে বাজারে।

চা খেতে তাই বিতৃষ্ণা বোধ হচ্ছিল নরেনের। কে জানে, নন্দনের মতো পাস করা বেকার হয়ে দিন কাটালে এ বাড়িতে তারও চা জুটত কিনা !

কলেজে পড়ার সময় জুটত।—চাকরি তখন ভবিষ্যতের ব্যাপার।

পাস করার পরেও কিছুদিন জুটত।—তখন চাকরির চেষ্টা চলছে।

এত লোকের চাকরি হয়, তারও হয়তো হবে !

তারপরে ক্রমে ক্রমে সকলের মনে আশঙ্কা জাগত যে চাকরি কী এর হবে ! এত লোকের চাকরি-বাকরি নেই, এও কি তবে সেই ভাগ্যহীন নিরুপায় বেকার দলের একজন ?

চা দিয়ে আপ্যায়িত করার আগ্রহ কমতে কমতে একদিন ঠিক নন্দনের মতোই তারও কপালে ঘটত চা-বন্ধের পরিণাম !

তবে ছবিরাণীর হাসিটা অগ্রাহ্য করা যায় না। নন্দনের সঙ্গে তার ব্যবহারও তেমন খারাপ নয়।

নন্দন তার বন্ধু বলেই ছবিরাণী নিজেকে সামলে চলে কিনা অথবা বেকার দাদাটির জন্য তার বুকে একটু মমতা থাকায় অপমান করতে পারে না, এটা অবশ্য জানা নেই নরেনের। এত ভেজাল

সংসারের মায়া-মমতায়, আপাতদৃষ্টিতে যে দরদকে মনে হয় আপনা থেকে উৎসারিত, তার মধ্যেও এত ফাঁকি যে অকারণে কেউ কাউকে স্নেহ করবে, এটা সহজে বিশ্বাস হতে চায় না নরেনের।

চা খেতে খেতে নরেন বলে, নন্দনকে একটা চাকরির খবর দিয়ে গেলাম। হয়তো লেগে যেতে পারে।

বড়দার কিছু হবে না।

কেন হবে না ?

এত যার তেজ, এত যাব রাগ, তার কখনও কিছু হয় ? কারও সঙ্গে মানিয়ে চলবে না, চব্বিশ ঘণ্টা গুম খেয়ে আছে। কে ওকে চাকরি দেবে ? চাকরি কী গাছে ফলে !

শুনে নরেন অবাক হয়ে যায়। এত তেজ ! এত রাগ !

নন্দনের ?

বাড়িতে বিনা মাইনের চাকরের মতো ব্যবহার যে মুখ বুজে বরাবব সয়ে এসেছে, তাকে খাইয়ে-পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য যথেষ্টরও বেশি টাকা তার বাবা রেখে গিয়েছিল জেনেও ?

এত হিসেবি নন্দন, পরীক্ষা পাসের জন্য হিসেব করে সে বাড়ির সকলের সঙ্গে ববাবর এমনভাবে মানিয়ে চলে এসেছে—ছবিরাণী তারই নামে নালিশ করছে যে সে দশজনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না !

তাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে ছবিরাণী হেসে বলে, বন্ধুর নিন্দে প্রাণে বিঁধছে, না ? তোমার বন্ধুই শুধু নয়, আমার ভাইও তো বটে ! সেটা ভুলে যেয়ো না। সত্যি বড়ো বেয়াড়া মানুষটা। বাড়িতে থাকে কেমন করে জানো ? যেন থেকেও নেই, সবাই তার পব। সংসারের কোনো ব্যাপারে থাকবে না, কোনো বিষয়ে কথাটি কইবে না, হয় পড়বে নয় চুপচাপ গোমড়া মুখ করে থাকবে।

নরেন মরিয়া হয়ে বলে, তোমরা অনাদর অবহেলা কর বলেই বোধ হয় ও রকম করে।

ছবিরাণী তার হাসিভরা মুখের গালে হাত দেয়।

কী যুক্তিই দিলে ! বাপমরা ছেলে, বাপের জ্যাঠার ঘাড়ে খাচ্ছে পরছে, অনাদর অবহেলা জুটবে না তার ? সংসারের নিয়ম তো তাই ! ও সব সহ্য করেই হাসি মুখে থাকতে হয়। তাতে গুরুজন আর অন্য মানুষেরা খুশি হয়। ভাবে যে না, নিজের ছেলের সঙ্গে যে তফাতটা করা হচ্ছে সে জন্য ওর রাগ বা দুঃখ নেই। ও আমাদের পর ভাবে না। সব সময় গোমড়া মুখ করে থাকলে আরও চটে যাবে না গুরুজন ? আরও খারাপ ব্যবহার করবে না ?

তুমি সত্যি ভারী চালাক মেয়ে ছবি !

চালাক না হলে কি উপায় আছে নরেনদা ? যা দিনকাল, কত কিছু সইতে হবে তো ! পড়ছিলাম, একবার ফেল করলাম—বাস, পড়াশোনা বন্ধ। গান শিখছিলাম, গান শেখানোর খরচ বাড়ল,—বাস, গান শেখানো বন্ধ। কুড়ি বছর বয়স হল। বাপের ভাত খাচ্ছি, বাপের কাপড় পরছি। কত সইতে হয়, তুমি কী জানবে বলো ? পাস করে দিব্যি চাকরি বাগিয়ে গ্যাঁট হয়ে আছ। কিন্তু সইতে হয় বলে কাঁদব নাকি ? সারাদিন মুখভার করে থাকব ?

তা তো আমি বলিনি !

সোজাসুজি না বললেও রকমে-সকমে বলেছ। সব সময় হাসিখুশি থাকতে চেষ্টা করি কিনা, তোমরা ভাব কত সুখেই না আছে ছবিরাণী !

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ছবিরাণী বসে।

সুধাময় সরকারকে জান ?

তাকে কে না জানে ? আলাপ পরিচয় অবশ্য নেই। থাকার কথাও নয়। শুধু নাম শুনেছি।

ছবিরাণী হাসে।

এত বিনয় করতে নেই। কে বলতে পারে তুমিও একদিন ওর চেয়ে মস্ত বড়োলোক হবে না ? ব্যাপারটা বলি শোনো। দাদু একটা চাকরির খবর এনে সব ঠিকঠাক করে বড়দাকে সুধাময়বাবুর কাছে পাঠালেন। বলে দিলেন, গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে, জিজ্ঞাসা না করলে কোনো কথা বলবে না। যা জিজ্ঞাসা করবেন তার জবাব দেবে। তারপর একসময় চাকরির কথাটা তুলে বলবে যে স্যার, আমায় চাকরিটা করে দিন, আপনি যা হুকুম করবেন আমি তাই শুনব। দুশো টাকার চাকরি। একবার ভেবে দ্যাখো ব্যাপারটা ? এই বাজারে দুশো টাকার চাকরি ! দাদুর কথা শুনলে নিশ্চয় হয়ে যেত।

এ ইতিহাস নরেনের অজানা নয়। ছবিরাণীর মন বুঝবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করে, কী চাকরি ?

খুব ভালো চাকরি। এত লোকের এত বড়ো আপিস চালাতে হয় সুধাময়বাবুকে, তার তো জানা দরকার কোথায় কী হচ্ছে, কে কী করছে। একলা কি খবর রাখা যায় প্রায় দুশো লোকের মধ্যে কে ঠিকমতো কাজ করছে, কে ফাঁকি দিচ্ছে ? বড়দাকে তাই দুশো টাকা মাইনে দিয়ে রাখতেন কে কী করছে না করছে, কাজ ঠিকমতো চলছে কিনা এ সব খবর পাওয়ার জন্য। এমন চাকরিটা বড়দা নিজের দোষে ভেস্তে দিল।

নরেন ধীরে ধীরে বলে, ওটা কি ভদ্রলোকের কাজ ? ও তো স্পাইগিরি করা ? একটু মনুষ্যত্ব থাকলে টাকার খাতিরে এ চাকরি নেওয়া যায় না।

ছবিরাণী ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, স্পাইগিরি ! স্পাইগিরি আবার কী ? কাজ করার জন্য সবাই মাইনে পাচ্ছে, কাজে কে ফাঁকি দিচ্ছে সেটা শুধু ধরিয়ে দেওয়া। ট্রামে যে ইন্সপেক্টর এসে টিকিট বিক্রির কাগজ দ্যাখে, সকলের টিকিট দ্যাখে।—সে কি স্পাই নাকি ? সবাই ঠিকমতো কাজ করছে কিনা এইটুকু দেখার জন্য তাকে রেখেছে, সে-ও সেই কাজটুকু করছে।

নরেন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

তুমি ভুল বুঝেছ। ট্রামে-বাসে রেলগাড়িতে ইন্সপেক্টরের কাজ আর এ কাজটায় অনেক তফাত। কাজ ঠিকমতো চলছে কি না, কাজে কেউ ফাঁকি দিচ্ছে কি না, দেখার লোক সুধাময়ের আপিসে নেই ভেবেছ ? একজন নয়—কয়েকজন আছে, খোলাখুলিভাবেই আছে। ম্যানেজার, বড়োবাবু, অমুকবাবু তমুকবাবু এদের কাজই হল কেরানিদের নাকে দড়ি দিয়ে খাটানো। নন্দনকে দুশো টাকা মাইনে দিয়ে রাখতে চেয়েছিল কে কী বলছে, কে কী করছে, তলে তলে খবর নিয়ে চুপিচুপি জানাবার জন্য। আপিসের কাজের খবর নয়, কেরানিদের প্রাইভেট খবর ! বন্ধুর মতো সকলের সঙ্গে মিশবে আর সকলের হাঁড়ির খবর চুপিচুপি বড়োকর্তাদের কানে পৌঁছে দেবে।

মুখ দেখেই টের পাওয়া যায় ছবিরাণী ধোঁকায় পড়ে গেছে। চাকরিটা ফসকিয়ে যেতে দেওয়ার জন্য আজ কতকাল সে নন্দনের উপর ভীষণ চটে আছে, আজ হঠাৎ মত বদলানো বড়োই কঠিন মনে হয়।

সত্যি ? তুমি কী করে জানলে ?

আমি জানি। আমাদের আপিসেও এ রকম লোক আছে একজন। বেশি দিন তো গোপন রাখা যায় না, ধরা পড়ে যায়। সে ব্যাটা কাছাকাছি এলেই আমরা সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলি।

তবে তো বড়দার দোষ নেই।

নিশ্চয় দোষ নেই। বরং ওকে তারিফ করতে হয়। এ অবস্থায় হাতে পেয়েও দুশো টাকার চাকরি না নেওয়া কি চাট্টিখানি কথা ?

ছবিরাণী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তোমার মাইনে-টাইনে বাড়বে না ?

বাড়ছে ! কমে কিনা দ্যাখো।

ছবিরাণী এ কথাতেও হাসে। তবে হাসিটা তার তেমন তাজা মনে হয় না। হাসিখুশি থাকার নিয়মটা পালন করবার জন্যই সে যেন গায়েব জোরে হাসে।

সকালে নন্দন একবার বাজার করে এনেছিল। এত বেলায় আবার তার বাজার করতে যেতে হওয়ার কারণ গোবিন্দ। দোকান থেকে দীননাথকে দিয়ে সে খবর পাঠিয়েছে যে, দুপুরে তার খাতিরের দুজন লোক বাড়িতে খাবে—বিশেষভাবে যেন রান্নাবান্না করা হয়। মাংস না হলেও চলবে—কিন্তু কমপক্ষে দুরকম মাছ যেন হয়।

কাটাকাপড় ছিটজামার দোকান এখন গোবিন্দই চালায়। জোরালো উৎসাহ নিয়ে সে ব্যাবসা বাড়াবার জন্য কোমব বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে।

অল্পদিনে খানিকটা বাড়িয়েও দিয়েছে দোকানের বেচাকেনা।

বুড়ো হেমেন্দ্র অল্পবয়সি নাতির হাতে দোকান ছেড়ে দিতে গোড়ায় সাহস পায়নি।

বেশ চলছিল দোকানটা, আগের মতো না হলেও মোটামুটি চলে যাচ্ছিল।

গোবিন্দের মাথায় ঝোঁক চাপল দোকানটা বাড়িয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে হবে, বড়ো ব্যাবসাদাবের হুকুমে দোকান চালিয়ে ভাড়া করা মজুরের মতো শুধু দোকান চালানোর মজুবি নিয়ে সে আর দোকান চালাবে না।

দোকানকে সে স্বাধীন করবে। স্বাধীনভাবে ব্যাবসা করবে।

সে কি কেরানি ?

আপিসের কলম পেষা মজুর ?

তাদের নিজের দোকান।

তারা খুশিমতো চালাবে !

সত্তর বছরের বুড়ো হেমেন্দ্র বলেছিল, পারবি কি ? সামলে-সুমলে মিলিয়ে মিশিয়ে ? বড়ো দায়, বড়ো ঝঞ্ঝাট। সব সয়ে গিয়ে হিসেবপত্র বুঝে পারবি কি চালাতে ?

কেন পারব না ?

হেমেন্দ্র বোধ হয় খুশি হয়েছিল, মুক্তির আশ্বাস পেয়েছিল।

তেইশ বছরের নাতি তাকে মুক্তি দেবে তার দায় থেকে।

নিশ্চিন্ত মনে সে মরতে পারবে ! সত্তর বছরেব পোড়াকপালে চাপড় মেরে সে তাই বলেছিল, মানিয়ে চলাটা আসল কথা, সামলে চলাটা আসল কথা। ওদিকে ওই বড়োবাজারেব লোকগুলি ঠকাতে চাইবে, এদিকে খদ্দেররা ঠকাতে চাইবে। দুদিক বুঝেশুনে নিজের পাওনা-গন্ডা বুঝে নিলে তবেই কিন্তু দোকান চলে।

গোবিন্দ ভেবেছিল বুড়ো হেমেন্দ্র পিছনে থাকবে, সে নতুন করে ঢেলে সাজাবে দোকানটা।

হেমেন্দ্র ভেবেছিল, আর তো এড়ানো যাবে না মরণ।

গোবিন্দের ঘাড়েই চাপিয়ে যাই সব দায়।

তাই তো নিয়ম জগতের।

যৌবনকে দায় দিয়ে বড়োর মরণ বরণ করা।

তেইশ বছরের যুবক কী বুঝবে বুড়ো বয়সে কত ব্যাকুলতা জন্মে, একজনকে দায় সঁপে দিতে—শান্তিতে জীবন কাটাবার সুযোগ পেতে !

না বুঝুক। না বোঝাই ভালো। যৌবনে না জানাই ভালো। দেহমনে ঘনায়িত মৃত্যুকে কাছে নিয়ে অনুভব করেও জীবনের প্রতি কী মমতা জন্মায় ?

জীবনের নতুন মানিকদের কীভাবে শুধু বলতে সাধ যায় যে, জীবনের দিকে তাকাও, জীবনের দিকে তাকাও, মরণকে তুচ্ছ করে জীবনকে সর্বজয়ী করে দাও, জীবন থেকে বাতিল করে দাও মৃত্যুর নিয়মটা।

নাতির চেষ্টায় দোকানের খানিকটা উন্নতি হতে দেখেই তার হাতে সব ভার তুলে দিয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছে।

বয়স কম হয়নি, পট করে একদিন সে মরে গেলে গোবিন্দকেই দোকানটা চালাতে হত। বেঁচে থাকতেই চালাক।

দুজন কারা আজ বাড়িতে খাবে গোবিন্দ বলে পাঠায়নি—কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয়নি বাড়ির লোকের। কিছুদিন আগে বেশ বাবুগোছের দুজন লোককে এনে বেশ সমাদরের সঙ্গে গোবিন্দ ভোজ খাইয়েছিল।

বয়সে দুজনেই গোবিন্দের চেয়ে অনেক বড়ো—নগেনকে মাঝবয়সি বলা যায়। তার চেয়ে বিপিনের বয়স কিছু কম। দুজনেই কাপড়ের ব্যবসায়ী, বড়ো ব্যবসায়ী। হেমেন্দ্রর সঙ্গে কেবল জানাশোনা ছিল—গোবিন্দ একেবারে ভাব জমিয়ে বাড়িতে এনে ভোজ খাইয়ে খাতির করতে শুরু করেছে !

কী করে করেছে, সেই জানে !

পয়সাওলা লোক, বয়সে বড়ো, গোবিন্দকে এভাবে ভাব জমাতে দেওয়া, খাতির করতে দেওয়া, কোনো উপলক্ষ ছাড়াই গোবিন্দের ডাকে বাড়িতে এসে নেমন্তন্ন খেয়ে বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়তে রাজি হওয়া—একমাত্র গোবিন্দ ছাড়া সকলের কাছেই এটা বড়ো বেখাপ্পা ঠেকেছে।

একটা অজুহাত অবশ্য খাড়া করা হয়েছে। এটা শখের খাওয়া নয়—দরকারের খাওয়া।

ভুবন ও বিপিন দুজনের বাড়িই শহরের প্রান্ত ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে। সেদিন ব্যাবসা সংক্রান্ত বিশেষ কাজে বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসার সময় ছিল না—গোবিন্দ তাই তাদের বাড়িতে এনে খাইয়েছিল।

তারা দুজনেই কোনোদিন নাকি হোটেলে কিছু খায় না, খেতে পারে না—তাদের ঘেন্না করে।

সাজপোশাক চেহারায় এ রকম খাঁটি শহুরে বাবুর মতো দেখতে—তারা হোটেল বর্জন করে চলে শহরের ! এ কথাটাও খাপছাড়া মনে হয়েছিল সকলের।

হোটেলে না খেলেও যেন তারা নিজেদের মধ্যাহ্ন ভোজনের একটা ব্যবস্থা করতে পারে না, একবেলা অন্নব্যঞ্জন ছাড়া অন্যকিছু খেয়ে চালিয়ে দিতে পারে না !

একই লাইনের এত অল্পবয়সি এত ছোটো একজন ব্যবসায়ীর কাছে ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তার বাঁধনে বাঁধা পড়বে জেনেও, তাদের বাড়ি বয়ে এসে ছোকবার বাড়ির রান্না অন্নব্যঞ্জন খাওয়া চাই !

নন্দন যখন বাজার করে ফিরল তার একটু আগেই নরেন চলে গেছে।

বাজারে চাকরি সম্পর্কে নরেনকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার কথা মনে হয়েছিল, বাজারের থলিটা নামিয়ে রেখে সে বেরোবার জন্য পা বাড়ায়।

গৌরী বলে, আবার যাচ্ছ কোথা ?

নরেনের কাছে যাব। চাকরিটার বিষয় একটু জানবার আছে।

একটু তাড়াতাড়ি ফিরো। তোমার হাতে কালিয়াটা ভারী সুন্দর হয়, মাছটা রেঁধে দিয়ো।

শুধু কথা নয়, গৌরীর গলার সুর পর্যন্ত যেন মিষ্টি মনে হয় !

নন্দন চুপ করে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এক রকম রোজই তাকে এটা ওটা রেঁধে দেবার হুকুম করা হয়, এতদিন কিন্তু গৌরীর বলার ভঙ্গি গলার আওয়াজটাই ছিল আলাদা।

কালিয়াটা তার হাতে ভালো উতরায় শুধু এই জন্যই যেন খুশি মনে গৌরী আজ ওই পদটা রেঁধে দেবার আবদার জানাচ্ছে ! হুকুম নয়, অনুরোধ !

তার চাকুরে বন্ধু তার নিজের আপিসে একটা চাকরি খালির সংবাদ দিয়ে গেছে। সংবাদটা শুনেই এই পরিবর্তন !

নন্দন বলে, তাহলে মাছটা রেঁধেই যাই।

না না, চাকরির বিষয়ে জানতে যাবে, ওটা আগে সেরে এসো। জরুরি কাজ আগে সারাই ভালো। শেষে ভুলে যাবে, নরেনের সঙ্গে দেখা হবে না—

থেমে গিয়েই গৌরী যোগ দেয়, তাছাড়া, ওরা তো খেতে আসবে সেই সাড়ে-বারোটা একটায়।

কতকাল পরে যে নন্দনের মুখে আজ একটু হাসি দেখা যায় !

ব্যস্ত হচ্ছ কেন বউদি ? তেমন কিছু জরুরি কথা নয়—পরে গেলেও চলবে। মাছটা কেটে দাও, রেঁধে ফেলি।

নগেন আর বিপিনকে নিয়ে গোবিন্দ আসে প্রায় দেড়টায়।

নন্দন বাইরের রোয়াকে বসে তারই মতো বেকার পাড়ার ছেলে ভূপেশের সঙ্গে কথা বলছিল। নগেন নন্দনকে জিজ্ঞসা করে, কেমন আছেন ?

আছি এক রকম।

কিছু হল ?

এটা ন্যাকামি—কিন্তু বেশ অমায়িকভাবেই নগেন প্রশ্নটা উচ্চারণ করে। তার কিছু জুটে গিয়ে থাকলে গোবিন্দের কাছে জানতে যেন তার বাকি থাকত !

কই আর হল ?

বিপিন বলে, আপনাদের খাঁলি চাকরি চাকরি বাতিক। ব্যাবসা করুন, চাকবি করে কি কিছু হয় ? আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ ব্যাবসা করে খাচ্ছি, বড়ো বড়ো পাস দিতে আপনাদের বুদ্ধি কত ধারালো হয়েছে, আপনারা নামলে আমাদের হটিয়ে অনায়াসে ফেঁপে উঠবেন।

মাঝবয়সি মানুষটা তার সঙ্গে আপনি করে কথা বলে—এটা সত্যই তার পেটের বিদ্যার—তার এম এ পাস করার ক্ষমতার—সম্মান। নন্দন ভাবে, এইসব অল্পশিক্ষিত পয়সাওলা মানুষগুলি সত্যই কি ঈর্ষা করে গরিব বিদ্বানদের, তারা বেকার হলেও ?

এই ঈর্ষার জন্যই কি ম্যাট্রিক ফেল নগেন তার দোকানে খাতা লেখার কাজটা পর্যন্ত তাকে না দিয়ে নিজেব মতো অল্পশিক্ষিত একজন বুড়োকে বহাল করে ?

প্রাণটা আজও কটকট করে ঘটনাটা মনে করলে !

খাতা লেখার কাজ ? পাঠশালার বিদ্যায় যা করা যায় ? তাই সই !

নন্দন ছুটে গিয়েছিল উমেদারি করতে।

নগেন তাকে কাজটা দেয়নি।

বলেছিল, আপনি পারবেন না মশায়, এ সব কী আপনাদের কাজ ! আপনারা আপিসে কাজ করবেন।

আপিসে কাজ পাই না যে।

পাবেন পাবেন—চিরকাল কি মানুষের সমান যায় ? ও সব কী জানেন, কপালের কথা।

পোড়াকপালের কথা বললেও তবু তার কথার একটা মানে হত !

হেমেন্দ্র তাদের সাদরে সবিনয়ে অভ্যর্থনা জানায়। বাড়িতে যেন দুজন মন্ত্রীর পদার্পণ ঘটেছে এমনিভাবে কাচুমাচু করে।

কথা বেশি বলে নগেন। বিপিন একটু চুপচাপ মানুষ।

আপনার নাতির সঙ্গে পারা যায় না মশায়। কাজের দায়ে একবেলা ঘরের ভাত নাই বা জুটল আমাদের—আপনারা কেন এত ঝঞ্ঝাট পোয়াবেন ? দেখুন দিকি কাণ্ড। কিছুতে ছাড়বে না—বলে কিনা রান্নাবান্না সব হয়ে আছে, না এলে সব নষ্ট হবে। এ মোক্ষম যুক্তির তো কোনো কাটান নেই !

হেমেন্দ্র বলে, আপনাদের অনুগ্রহ। গোবিন্দের বড়ো ভাগ্য যে আপনাদের স্নেহ পেয়েছে।

সামনে বলা উচিত নয়--বুদ্ধিমান ছেলে। এ বয়সে অল্পদিনে ব্যাবসার কায়দা ঠিক বুঝে গেছে।

গোবিন্দ লজ্জিতভাবে একটু হাসে।

গৌরী ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করে। ছবিরাণীকে বিশেষভাবে আড়ালে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সামনে আসা বারণ !

খেতে খেতে তারা সহজভাবে এ কথা ও কথা বলার চেষ্টা চালিয়ে যায়, কিন্তু অস্বস্তি বোধ চাপতে পারে না ! সকলেবই অস্বস্তি--তাদেরও, বাড়ির লোকেরও।

শুধু গোবিন্দই যেন সমস্ত ব্যাপারটা সহজ ও স্বাভাবিক ধরে নিয়ে খুশি হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়া দ্যাখে !

কত সুস্পষ্ট সহজবোধ্য এই বিশেষ মানুষ দুটির এ বাড়িতে এভাবে বসে খাওয়ার অসংগতি আর অস্বাভাবিকতা ! ঠিক যেন একটা অন্যায় অসামাজিক ব্যাপার ঘটে চলেছে !

নন্দন ভাবে, ওরা কী সত্যই নাছোড়বান্দা গোবিন্দের আবদার এড়াতে না পেরে এভাবে এখানে খেতে এসেছে ?

আর কোনো মানে নেই তাদের আসার ? কিন্তু তাহলেও তো একটা বড়ো প্রশ্ন থেকে যায়—এত জোর কেন গোবিন্দের আবদারের ? কেন ওরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারে না গোবিন্দের আমন্ত্রণ ? কেন ওরা গোবিন্দকে ক্ষুণ্ণ কবতে চায় না ?

গোবিন্দ ওদের সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। বিকালে নন্দন হাঁটতে হাঁটতে দোকানে গিয়ে গোবিন্দকে বলে, একটা কথা ছিল।

টাকাপয়সা নয় তো ?

আরে না—অন্য কথা।

জন দুই খদ্দের দোকানে বসেছিল, তাদের সামলাবার জন্য দীননাথ একাই যথেষ্ট।

গোবিন্দ রাস্তায় নেমে এসে বলে, কী কথা বড়দা ?

নন্দন কদাচিৎ দোকানে আসে, তার দোকানে আসাটা কেউ পছন্দ করে না। আজ হঠাৎ এভাবে এসে কথা আছে বলায় গোবিন্দ একটু ভড়কে গেছে।

নন্দন বলে, বলছিলাম কী তোর একটু সাবধান হওয়া দরকার। তোকে আমি ভালো করেই জানি, তুই কী প্ল্যান করেছিস ভেবেচিন্তে তাও বুঝতে পেরেছি। আমার উচিত তোকে সাবধান করে দেওয়া, আমি কিন্তু কর্তালি করছি না বাবু, আগেই বলে রাখলাম। আমার যা বলার আছে বলছি, শুনে তুই যা ভালো বুঝবি করবি, আমি আর কথাটিও কইতে আসব না।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার এই লম্বা ভূমিকায় গোবিন্দ আরও ভড়কে গেল। দাদাকে সে এতটুকু গ্রাহ্য করে না—কেন করবে ? কিন্তু যতই হোক এম এ পাস করা দাদা তো, বোকাহাবা নয়। সে যখন

এমনভাবে তাকে সাবধান করে দিতে এসেছে, ব্যাপার নিশ্চয় গুরুতর ! তাও আবার বাড়িতে কিছু না বলে দোকানে বলতে এসেছে !

গোবিন্দ ওই কথাই বলে, কথাটা গুরুতর বলছ, বাড়িতে না বলে দোকানে এসে—

বাড়িতেও বলতে পারতাম। আজ না হয়, কাল হোক পরশু হোক একসময় বললেই চলত। বাড়িতে কেন বললাম না জানিস ? কথা শুনে তুই রেগে গিয়ে চেঁচামেচি জুড়বি, না মারতে উঠবি, জানা তো নেই ! বাড়িতে জানাজানি হয়ে যাবে। তুই ধরে নিবি বড়দা শত্রুতা করেছে। দোকানে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বললে রেগে চেঁচামেচি করতে পারবি না, কেউ জানবেও না কী ছেলেমানুষি করছিস। আমিও আর কথাটি কইব না। নিজে বুঝেশুনে তোর যা খুশি করবি—আমাকে জড়াতে পারবি না, দায়ি করতে পারবি না।

গোবিন্দের মুখ এবার রীতিমতো বিবর্ণ দেখা যায় ! যতই ছোটোখাটো হোক দোকানের অবস্থানটি ভালো। বোধ হয় সেই জন্যই এতদিন চলে এসেছে। এতটুকু একটা ঘরের জন্য এত মোটা ভাড়া গুনেও।

বিকালবেলা। পথের দুপাশে গিজগিজ করছে চলমান মানুষ, ফুটপাতে এটা ওটা বিক্রির জন্য সাজিয়ে নিয়ে, আর জুতো মেরামত জুতো পালিশ করে দিতে চেয়ে, অনেকগুলি ছোটোবড়ো মানুষ অস্থায়ী অনিশ্চিত জীবিকা অর্জনের লড়াই চালাচ্ছে।

রাগের মাথায় গুরুজন বলে গণ্য না করে বিশ্রী গাল পর্যন্ত কতবার গোবিন্দ তাকে দিয়েছে। আজ সে কথা কয় না। ভয়ে চুপ করে থাকে তার কথা শুনবার জন্য !

নন্দন গম্ভীর হয়ে আসল কথা বলে, আমি ভুবন বিপিনদেব কথা বলছিলাম। খুঁটিনাটি জানি না, তবে মোটামুটি তোমার প্ল্যানটা আঁচ করেছি। একটু বেশি রকম সূক্ষ্ম বুদ্ধি খাটিয়েই তুমি প্ল্যানটা করেছ। তুমি বোকা নও, তুমি জানো যে ওদের ব্যাবসাই হচ্ছে চোরামি—তার একটা দিক হচ্ছে তোমার মতো ছেলেমানুষদের ঘাড় ভাঙা। ওরা কেমন লোক, তুমি তা ভালো রকম জানো। তুমি প্ল্যান করেছ ভালো। ওরা তোমার ঘাড় ভাঙতে চায়, তুমি ওদের কৌশল উলটে দিয়ে নিজের কাজ বাগিযে নেবে।

গোবিন্দ অভিভূত হয়ে বলে, ভাবী আশ্চর্য তো, কেউ যা বোঝেনি, তুমি তা বুঝে গিয়েছ ! ঠিক ধরেছ ব্যাপারটা। ওরা ভাবছে, আমি ছেলেমানুষ, আমাকে সহজেই ফিনিস কবতে পারবে। ভুবন আর বিপিন শালাকে কাত করে যদি না আমি উঠতে পারি তো—

থাম।—চেঁচাস না।

গোবিন্দ মাথা হেঁট করে।

নন্দন চারিদিকে একবাব চোখ বুলিয়ে আনে। দিনান্ত যত ঘনিয়ে আসছে তত বাড়ছে শহরের পথে গাদাগাদি করা ভিড়। কারখানায় আপিসে যারা আটক ছিল সকাল থেকে, জীবনের জন্য জীবনান্তক শ্রম করে তারা এবার বেরিয়ে আসছে।

তার ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়ে তার কথা শোনার জন্য গোবিন্দ অপেক্ষা করে আছে।

মনে মনে নরেনের হাসি পায়। তাকে কথায় কথায় ধমকানো ছিল যার অভ্যাস, ধমক খেয়ে তার এতটুকু রাগ হয়নি ! তারই স্বার্থঘটিত ব্যাপার কিনা !

আজ সকালেই নরেনকে সে বলেছিল, বাড়ির সকলে এতদিন যে ব্যবহার করে এসেছে তার সঙ্গে, এবার তার প্রতিকার করবে, প্রতিশোধ নেবে।

এই কী তার নমুনা ?

গোবিন্দের ছেলেমানুষি মতলব বুঝে তার বিপদ টের পেয়েই ছুটে এসেছে তাকে সাবধান করে দিতে, মাধব আর বিপিনের কবল থেকে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে।

কাঁচাবুদ্ধি নিয়ে ঝানু ভুবন আর বিপিনের সঙ্গে চালাকি করতে গিয়ে কাত হয়তো হোক না গোবিন্দ ? তার কী এসে যায়? কিন্তু চুপচাপ থাকা গেল না কিছুতেই ! ছোটোলোকের চেয়ে খারাপ ব্যবহার পেয়ে মানুষ হয়েছে কিন্তু ছোটোলোক হবার সাধ্য বোধ হয় তার নেই।

শোন বলি তোকে। বোকামি করিস না, একেবারে ডুবে যাবি। তুই গিয়েছিস ওই দুটো ঘুঘুর সঙ্গে চালাকির পাল্লা দিতে ? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর। দাদুকে সব জানিয়ে দে—দাদু সামলে দেবে।

দোকানটা বাড়াব ভাবছি যে ? দাদুর সেই সেকেলে এক রকম দোকান চালানো—

তাই চলুক না কিছুদিন ? দোকানটা টিকে থাক, তোর বয়স বাড়ুক, জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা জন্মাক ? দু-চারবছর পরেই নয় দোকানটা বাড়াবি ?

গোবিন্দ গোমড়া মুখে বলে, দেখি ভেবে। তুমি কিন্তু দাদুকে কিছু বোলো না।

আমার গরজ পড়েছে বলতে।

কাছেই চায়ের দোকান, পথের ও পাশে। গোবিন্দ বলে, চা খাবে ?

না।

নন্দন আর দাঁড়ায় না।

৩

মণ্টু ঘনঘন তার কাছে আসে।

সে মাঝে মাঝে মাধবের কাছে যায় বিদ্যার জাবর কাটতে।

মণ্টু তার কাছে ঘনঘন আসে সগৌরবে পরীক্ষা পাসের হারানো ক্ষমতা ফিরে পাবার উপায় সম্পর্কে উপদেশ চাইতে, পরামর্শ করতে।

পাস করা। প্রথম হয়ে, সেরা হয়ে পরীক্ষায় পাস করা। এ ছাড়া মণ্টুর কোনো চিন্তা নেই, কামনা নেই। উচ্চাশাও তার নেই।

সারাবাংলার যত ছেলে আগামীবার স্কুলান্তক পরীক্ষা দেবে তাদের সকলকে হারিয়ে সবার উপরে সে হতে চায় না। এতদিন যেটুকু তার কৃতিত্ব ছিল তার স্কুলের তার ক্লাসের শখানেক ছেলের চেয়ে এগিয়ে থাকার ক্ষমতা ছিল—সেইটুকুই সে ফিরে পেতে চায়, বজায় রাখতে চায়।

শুধু এই স্কুলে ফার্স্ট হয়ে পাস করে কী করবি মণ্টু ?

ফার্স্ট হব, আবার কী ?

বড়ো হবে। সকলে প্রশংসা করবে। দীননাথ আনন্দে কেঁদে ফেলবে। বড়ো চাকরি পাবে। মা-বাবা ভাইবোনদের সুখে আরামে রাখবে। বিয়ে করে টুকটুকে বউ ঘরে আনবে। দশজন মানী লোকের মধ্যে সম্মানের আসন পাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি কামনাগুলি সত্যই অস্পষ্ট মণ্টুর মনে।

অতসব সে বোঝে না। তার যেন শুধু জিদ যে সে বরাবর এই স্কুলে ফার্স্ট ছিল এবারও ফার্স্ট হয়ে পরীক্ষা পাস করবে।

নিছক একগুঁয়েমি।

পাস না করে বড়ো হওয়া যায় না ? কত মানুষ পরীক্ষায় কাত হয়েও জীবনে কত বড়ো হয়েছেন।

মণ্টু এ সব কথার ধাঁধা জানে।

সে তো আলাদা কথা। সবার কী সব ক্ষমতা থাকে ? আপনি চাইলেই পঙ্কজবাবুর মতো গান গাইতে পারবেন, মানকরের মতো ক্রিকেট খেলতে পারবেন ? যেটা যার ধাতে থাকে। আমার পড়ার দিকে ঝোঁক আমি পড়ব।

নরেন টের পায়, উপায় ও পরামর্শ চেয়ে মণ্টু কেবল তার কাছেই আসে না এবং মণ্টুর পরীক্ষা পাসের সমস্যা একমাত্র তাকেই শুধু বিচলিত করেনি।

পাড়ার প্রৌঢ় উকিল বিনোদ যেচে তাকে পড়িয়ে ফার্স্ট করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে শুনে সে আশ্চর্য হয় না।

বিনোদও স্কুলে ফার্স্ট হত। খুবলে খুবলে প্রায় সব বিষয়ে বিদ্যাচর্চার একটা ঝোঁক আজও বজায় আছে, সাহিত্যচর্চার চেষ্টা পর্যন্ত মাঝে মাঝে চলে। বোধ হয় এই জন্যই ওকালতিতে তেমন পশার জমেনি, কোনো রকমে চলে যায়।

নরেনকে সে বলে, তুমি নাকি মণ্টুকে বলেছ ভালো কোচিং ছাড়া ফার্স্ট হওয়া যায় না ? খুব খাঁটি কথা। কিন্তু সমীরের মাস্টার তো ভালো পড়ায় ?

কিন্তু পড়ায় তো সমীরকে—সমীরের স্ট্যান্ডার্ডে ফার্স্ট যে হবে তাকে ফার্স্ট করার জন্য পড়াতে হবে।

আমিই পড়াব ভাবছি। দেখি যদি উতরে দিতে পারি। মনে হয় ছেলেটার ফিউচাব আছে।

পারবেন ?

এককালের ভালো ছাত্র এম এ, বি এল, বিনোদ আহত হয়ে বলে, একটা স্কুলের ছেলেকে পড়াতে পারব না ?

সে রকম পারার কথা বলিনি। একটা ছেলেকে ভালো করে পড়ানো তো কম ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার নয় !

ক-টা মাস চালিয়ে দেব।

নরেন মনে মনে ভাবে, ক-টা মাস নয়, চালিয়ে দিলেন, মণ্টু উতরে গেল, কিন্তু তারপর কে চালাবে ? মুখে সে আর কিছুই বলে না।

বিনোদ খুব উৎসাহ করে মণ্টুকে পড়াতে আরম্ভ করে। কিন্তু দুচারদিনেই টের পাওয়া যায় যে নরেনের আশঙ্কাটা মিথ্যা নয়, এককালের ভালো ছাত্র হলেও তাব দ্বারা এ কাজ হবে না।

এমনিতেই অবশ্য তার অকাজের সীমা নেই। যেচে যেচে পাঁচজনের দায় ঘাড়ে নিয়ে আর পরের উপর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই তাব দিন যায়।

কিন্তু দেখা যায় মণ্টুকে পড়াতে না পারার কারণ মোটেই সেটা নয়। সকালে বিকালে একঘণ্টা করে পড়াবার সময় সে করে নেয় কিন্তু পড়াতে গিয়ে টের পায়, ছেলে পড়ানোটা একেবারেই তার ধাতে নেই।

মণ্টুকে পড়াতে হলে তাকে বেশ কিছুদিন খেটেখুটে ছেলে পড়ানো শিখতে হবে। এ তো বিদ্যা বা জ্ঞানলাভ নয়—কতগুলি বই পড়ে ছেলেদের পরীক্ষা পাস করার উদ্ভট ব্যবস্থা। বই পড়ানো আর পরীক্ষা সবই যেন একেবারে উদ্ভট আর জটিল এক জগাখিচুড়ি ব্যাপার।

সেই কবে এককালে স্কুলে এ সব পড়েছিল, এতকাল পরে কি কিছু মনে থাকে ? কত কিছু অদলবদলও হয়ে গেছে।

না বাবা, আমার দ্বারা হল না।

তবে বিনোদ জেদি মানুষ। নিজে পড়াতে না পারলেও মণ্টুর জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা নিশ্চয় সে করে দিত।

হঠাৎ সে চলে গেল জেলে।

শহরে সেদিন হরতাল হবে। বিনোদ রাজনীতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না। কিন্তু হরতালটা ডাকা হয়েছিল ভাতকাপড়ের দাবিতে। চাবিদিকে ভাতকাপড়ের অভাবে মানুষ কীরকম অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ভালো করেই সেটা তার নজরে পড়ছিল।

হরতালের খবর শুনেই বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, হরতাল হওয়া উচিত। মানুষ না খেয়ে মরবে নাকি ? ন্যাংটো হয়ে থাকবে ?

চারিদিকে গাঁ থেকে দলে দলে চাষিবা এসে শহরে জমে, শোভাযাত্রা করে শহরের রাজপথে। ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে বিনোদ একেবারে সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায় শোভাযাত্রার।

তারপর হয় পুলিশের হামলা। হাঙ্গামা হয় জবর। আরও কয়েকজনের সঙ্গে আহত হয়ে বিনোদ জেলে চলে যায়।

মাস কয়েক পরে টেস্ট। তারপর আসল পরীক্ষা। আশা কি ব্যর্থ হবে মণ্টুর ? দীননাথের ? স্কুলের কর্তৃপক্ষের ? এতকাল অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এসে আসল পরীক্ষায় শুধু ভালোভাবে পাস করাই সার হবে, অসাধারণ কিছু করতে পারবে না ?

কেবলমাত্র এই ক-টা মাস নিয়মমতো একজনের কাছে প্রাইভেট পড়ার সুযোগটুকুর অভাবে ?

দীননাথ বলে, আমার যদি টাকা থাকত রে মণ্টু—!

সকালে কাজে বেরিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত দীননাথ কাতরভাবে বারবার অধ্যয়নরত ছেলের দিকে তাকায়। রাত জেগে পড়েছে, আবার অন্ধকার থাকতে উঠে পড়তে বসেছে। ভাঙা ঘরে ছেঁড়া মাদুরে বসে পড়েই ছেলে তার দেখিয়ে দিতে পারত পরীক্ষায় পাস করা কাকে বলে।

একজন মাস্টারের অভাবে সে কাবু হয়ে যাবে। প্রথম দু-চারজনের মধ্যে যার ঠাঁই পাওয়া সম্ভব, স্কুলের মাস্টাররা পর্যন্ত যেটা আশা করে, সে ছেলে শুধু ভালোভাবে পাস করতে পারবে !

চোখ ফেটে জল আসতে চায় দীননাথের। বুকের মধ্যে জ্বালা করে।

সে এক রকম কিছুই করেনি ছেলের জন্য। শুধু এত বড়ো ছেলে থাকতেও সংসারের ছোটো বড়ো কোনো ঝঞ্ঝাটে তাকে না জড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে পড়াশোনা কবার সুযোগটা দিয়েছে। ছেলের নিজেব গুণেই ব্যবস্থা হয়েছে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাবার। তার যদি ক্ষমতা থাকত ক-মাসের জন্য একজন মাস্টার রেখে দেবার ! এইটুকু যদি সে করতে পারত ছেলের জন্য !

হ্যাঁরে, কত লাগে একজন মাস্টার রাখতে ?

সে অনেক লাগে। ভালো মাস্টার হলে পঁচিশ তিরিশ টাকার কম নয়।

ও বাবা !

শিক্ষকদের সহানুভূতি আছে। ক্লাসে আর কোচিং ক্লাসে তার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। বাইরেও প্রশ্ন করলে সযত্নে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিনা পয়সার তাকে নিয়মিত পড়াবার সাধ্য তাদের নেই। দুবেলা ছেলে পড়িয়েও তাদের পেট চলতে চায় না।

খানিক পরে আবার আপশোশ করে দীননাথ বলে, তোর পড়াশোনার জন্যে কিছুই করতে পারলাম না আমি।

তুমি যে এত কষ্ট করছ ?

হা ! কষ্ট ওমনিও করতাম, এমনিও করছি। তোর জন্য করলাম কচুপোড়া।

দীননাথের মুখে বেদনার সঙ্গে একটু বিহ্বলতার ছাপ। দেখে বড়োই কষ্ট হয় মণ্টুর। মানুষটা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাইরে খাটে, তার উপরে আবার একলা ঘর সংসারের সব দায় মেটায়।

সে সংসারের খুঁটিনাটি দায় বইতে চাইলেই দারুণ অখুশি হয়ে বলে, ছিছি নিজের দায় বুঝিসনে তুই ? কী বলব তোকে ! তোর কাজ তুই করে যা দিকি নিজের মনে। মস্ত বিদ্বান হবি, কেউকেটা লোক হবি নাম-যশ পাবি—মোকে তখন মোটর চাপাস। তোর খুচখাচ ব্যাপারে নজর দেয়া কেন ? দুবার সওদা এনে দিয়ে তুই রাজা করবি মোকে ?

কীরকম হয়ে গেছে মুখটা তার বাবার ? কেমন একটা শুকনো রুক্ষ ম্যাজমেজে ভাব !

মণ্টু জোর দিয়ে বলে, তুমি এত ভাবছ কেন ? ফার্স্ট সেকেন্ড না হই, অনেক ছেলেদের তো টেক্কা দিয়ে যাব। আর পরীক্ষা নেই ? সেগুলোতে দেখা যাবে।

কী আশা ! প্রথম আসল পরীক্ষা সামনে নিয়ে ভবিষ্যতে আরও কতগুলি পরীক্ষার কথা ভাবছে মণ্টু।

অবশ্য তা না ভাবলে প্রথম আসল পরীক্ষা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো মানে হয় না।

দীননাথ কিন্তু তার কথায় ভরসা পায় না।

থার্ড হয়ে যাচ্ছিস যে !

হলাম বা ? একবার হলে কী হয় ?

দীননাথ সারাদিন দোকানে খেটে বেঁচে আছে এবং বাঁচিয়ে রেখেছে বউ আর ছেলেমেয়েকে। সে কী ছেলেমানুষের এই মন ভুলানো কথায় ভোলে ? কিন্তু কিছুই তো করার নেই তার, মুখে বেশি আপশোশ করে ছেলেটাকে অনর্থক বিব্রত করে আর লাভ কী হবে ?

তাই চিরদিন যেমন হাসিমুখে স্নেহ মেশানো দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে এসেছে তেমনইভাবে তাকাবার চেষ্টা করতে করতে বলে, তুই যদি বলিস তবে আর কথা কী !

পথে বেরিয়ে নরেনের সামনে পড়ে সেদিন সে কেঁদে ফেলে।

কিছুদিন ধরে মনের মধ্যে যে কথাটা নরেন নাড়াচাড়া করছিল দীননাথের কান্নার আঘাতে এক মুহূর্তে সেটা সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে যায়।

নরেন বলে, ভেবো না, আমি তোমার ছেলেকে পড়াব। পারব কিনা জানি না, চেষ্টা করে দেখব।

দীননাথ কথা বলতে পাবে না, তার হাত চেপে ধরে আবার কেঁদে ফেলে।

নরেন সোজা সরু গলির ভিতরে ঢুকে পড়ে। মণ্টুর পাশে ছেঁড়া মাদুরে বসে বলে, আমি তোকে পড়াব মণ্টু।

আনন্দে বিহ্বল হয়ে মণ্টু শুধু চেয়ে থাকে।

এইখানে এসে পড়াব—দুবেলা। তোর যেতে হবে না। এখানে বসে পড়া অভ্যাস, এখানেই পড়ায় বেশি মন বসবে।

খবর জেনে নরেনের বাড়ির লোক বড়োই অসন্তুষ্ট হয়।

তারিণী বলে, তুমি নিজের ভাইকে নিয়ে পাঁচ মিনিট বসার সময় পাও না, পরের ছেলেকে বিনা পয়সায় দুবেলা পড়াচ্ছ !

বরেনকে পড়িয়ে কী হবে ?

কী হবে মানে ? ওর মাথা নেই, ওকেই তো ভালো করে পড়ানো দরকার। নইলে ফেল হয়ে যাবে তো।

তোমবা যা পড়াচ্ছ তার বেশি ওর দরকার হয় না। হাজার বেশি পড়লেও ওটুকুর বেশি ওর মাথায় ঢুকবে না।

মা বলে, পরের ছেলের জন্য ওর যত মাথাব্যথা। নিজের ভাই ফেল করলে বয়ে গেল।

তারিণী আরও গম্ভীর হয়ে বলে, কী যে সব খাপছাড়া কাণ্ড তোমার কিছুই বুঝিনে। ভবেশবাবু ছেলেমেয়ের জন্য একজন মাস্টার খুঁজছেন, ওদের পড়ালে তো ঘরে ক-টা টাকা আসত ? তার বদলে তুমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ। এদিকে অভাবের অন্ত নেই।

নরেন বলে, আপনারা বুঝছেন না কথাটা। মানুষের খেয়ালখুশি থাকবে না, কোনো শখ থাকবে না ? ওকে যে আমি পড়াচ্ছি, এটা আমার কাছে সিনেমা দেখা, খেলাধূলা করার মতো ওকে পড়িয়ে আমি আনন্দ পাই। একটা কিছু নিয়ে থাকবে তো মানুষ ?

শুনে মা-বাবা নির্বাক হয়ে যায়।

উষা বলে, বিয়ে করতে বলছি সবাই—

তার কথা কানে না তুলে নরেন আবার বলে, ওকে না পড়িয়ে আমি যদি সকাল সন্ধ্যা তাস পাশা খেলে কাটাতাম, তোমরা কিছু বলতে ? সেই সময়টা আমি অন্য একটা খেয়াল মেটাতে চেষ্টা করছি !

সোজা খাটুনি একটা ছেলেকে স্কুলান্তক পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার জন্য তৈরি করতে কোমর বেঁধে লেগে যাওয়া !

ছেলে পড়ানো অভ্যাস ছিল না—তবে নিজে স্কুল ডিঙিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়েছে অল্পদিন আগে। পড়া আর পড়ার খুঁটিনাটি কায়দাকানুন বিনোদের মতো ইতিমধ্যে সব ভুলে যায়নি।

কিন্তু মণ্টুকে পড়াতে পড়াতে বারবার তার উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে, দেহমনে রীতিমতো ক্লান্তি বোধ হয়।

চোখের সামনে সে দেখতে পাচ্ছে মণ্টুর এই পরীক্ষা পাসের কৃতিত্বের নিষ্ফল ভবিষ্যৎ। বৃত্তি পেলেও, পড়া চালিয়ে যেতে পারলেও বিশেষ কিছু সে আর করতে পারবে না এই লাইনে।

গরিবের ছেলে কি পাসের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে না? সে রকম দৃষ্টান্ত কি নেই ?

আছে বইকী !

তারা অসাধারণ। মণ্টুর মতো সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে তাদের তুলনা করা চলে না।

মণ্টুর সে গুণ নেই। সে নরম। তার বড়ো হবার স্বপ্ন শুধু মা-বাবা ভাইবোনদের কষ্ট দূর করা।

ঘেরা রোয়াকটুকুতে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা মণ্টুর মা রান্না করে আর থেকে থেকে মুখ তুলে তাদের দিকে তাকায়। বিষণ্ণ শুকনো মুখে মালতী ঘরের কাজ করে যায়।

মালতীকে দেখে মনে হয় তার বোধ হয় কোনো অসুখ আছে।

ছোটো ছেলেমেয়ে ক-টা বাইরে কোথায় খেলছে। মাঝখানে একবার বাড়ি এসেছিল, মালতীর ধমকে আবার পালিয়ে গেছে। মণ্টুর পড়ার সময় তাদের বাড়িতে খেলা করা বারণ।

বাড়ির মধ্যে রোজ দু-তিনঘণ্টা এভাবে বসে থাকার ফলে আপনা থেকেই এই অশিক্ষিত গরিব পরিবারটির চালচলন নজরে পড়ে নরেনের। কতকালের পুবনো কত অন্ধকার যে জমাট বেঁধে আছে এদের চেতনায়! কত সংস্কার, কত অন্ধবিশ্বাস কত ভীবুতা !

কিন্তু সমালোচনা জাগে না নরেনের মনে।

তাদের শিক্ষিত পরিবারে মানুষগুলির চেতনা তো মুক্ত নয় এ সব সংস্কার, বিশ্বাস আর ভীবুতা থেকে !

কতগুলি কেবল তলিয়ে গেছে মনের তলায়, কতগুলির ঘটেছে বূপান্তর। মিলিয়ে যায়নি, শেষ হয়ে যায়নি—নূতন ধারণা ও বিশ্বাস গড়ে ওঠেনি সেগুলির স্থান দখল করে।

তবে অন্যায় আর অনিয়মের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জন্মেছে প্রচণ্ড। যেমন তাদের শিক্ষিত পরিবারের মানুষগুলোর মনে, ঠিক তেমনই এই বাড়ির অশিক্ষিত মানুষগুলির মনেও।

একদিন এই বিক্ষোভ চেতনার সংস্কার ও ভীবুতার নাগপাশের বাঁধন ছিন্নভিন্ন করে দেবে বইকী !

একটি অন্ধবিশ্বাসে আশ্চর্য মিল তাদের শিক্ষিত এবং এদের শিক্ষায় বঞ্চিত পরিবারে। এরা যেমন অন্ধের মতো বিশ্বাস করে যে পরীক্ষা পাস করলেই রাজা হওয়া যায় তাদের বাড়ির মানুষেরাও ঠিক তেমনিভাবে এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে।

বরেনের বেলাতে পর্যন্ত তাই অসাধ্য সাধনের এত চেষ্টা !

চারিদিকে কত পাস করা বেকারের দুর্গতির অন্ত নেই, সে সব চোখে দেখেও ভুল ভাঙে না।

লাখ লাখ পাস করা আর মূর্খ মানুষের জন্য চাকরি আর কাজের কোনো ব্যবস্থাই নেই—জেনেও খেয়াল হয় না যে চাকরি আর কাজের ব্যবস্থা না হলে শুধু পাসের লড়াই চালিয়ে যাওয়া বোকামি।

এত দুর্ভো:গর পরেও নন্দনের পর্যন্ত চেতনা হয়নি যে পাস কবা আর চাকরি পাবার আসল ব্যাপারটা কী !

কিন্তু সে ও কি বুঝে ফেলেছে এ গলদের শিকড় কোথায়? তার চেতনা থেকে কি সাফ হয়ে গিয়েছে এই অন্ধবিশ্বাসের জঞ্জাল ?

মাধবকে সে বলে, কিন্তু দোষটা কী, ভুলটা কোথায় ? দেশে শিক্ষাই কম, ভীষণ রকম কম। পাস করে চাকরি পাবার আশাতে হলেও। যেটুকু ব্যবস্থা আছে, তার সুযোগ নিয়ে লেখাপড়া শেখা তো দোষের নয়। মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের আদর্শ হোক, জীবিকার জন্যও তো শিক্ষা ?

মাধব বলে, অব্যবস্থার দুটো দিককে জড়িয়ে দিচ্ছেন। একদিকে শিক্ষার ভালো ব্যবস্থা নেই, অন্যদিকে সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা নেই।

নরেন মাথা নেড়ে বলে, ওদিক দিয়ে বলিনি কথাটা। লোকে জানছে যে হাজার হাজার ছেলের চাকরি হবে না—চাকরিই নেই। তবু এত টাকা পয়সা খরচ করে ছেলেকে পড়ায় কেন? বরং পড়ার টাকাটা জমিয়ে দোকান দিলে—

মাধব হেসে বলে, সবাই দোকান দিলে কে কিনবে ?

একটু খোলসা করে বলুন।

মাধব সিগারেট ধরায়।

আপনি গোড়ার গলদটা ভুলে যাচ্ছেন—অনেক লোকের জীবিকা অর্জনের কোনো ব্যবস্থাই নেই। যে সিস্টেম চালু আছে তাতে এরা বাড়তি লোক, ফালতু লোক—এদের কাজ দিয়ে খাটালে প্রফিট বাড়বে না। এদের যে পরিমাণ বেতন দেওয়া হবে সেটা প্রফিট থেকে কাটা যাবে। একটা ছেড়ে আরেকটা ধরে তাই লাভ নেই, সেখানেও এক অবস্থা। সিস্টেমটা না পালটালে একটা মোট সংখ্যা মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা হতেই পারে না। তিন হাত চাদর দিয়ে কী চার হাত বিছানা ঢাকা যায় ? এদিক টানলে ওদিক—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মানসী বলে, ঠিক খাটো শাড়ির মতো। আঁচল এদিকে টানলে ওদিকে কুলোয় না।

এটা তার খোঁচা। সত্যই তার পরনে সস্তা না হলেও খাটো একখানা শাড়ি। কেনার সময় মাধবের খেয়াল থাকেনি যে শাড়ি শুধু পছন্দ করে কিনলেই হয় না, ক-হাত শাড়ি সেটাও জিজ্ঞাসা করে কিনতে হয়।

খাটো শাড়িখানা বদলানো যায়নি।

মাধব ক্যাশমেমো হারিয়ে ফেলেছিল !

একটু চুপ করে থেকে মাধব বলে, তাছাড়া, আপনাদের আরেকটা ভুল ধারণা আছে। ভদ্রসমাজে শুধু চাকরির জন্য লেখাপড়া শেখে না। জীবিকাটা নিশ্চয় দরকার মানুষের, কিন্তু শুধু পেটে খেয়ে মানুষের চলে না। মানুষের একটু সংস্কৃতিও দরকাব।

নরেন বলতে যায়, সংস্কৃতি কী শুধু—

মাধব জোর দিয়ে বলে, না না, কেবল শিক্ষিত মানুষের সংস্কৃতি দরকার, তা বলিনি। সমস্ত মানুষ বোঝাতেই আমি মানুষ কথাটা ব্যবহার করেছি। সব মানুষের সংস্কৃতি দরকার—চাষি মজুব থেকে সকলের।

মানসী প্রশ্ন করে, বুনো অসভ্য মানুষের ?

তাদেরও দরকাব—তাদেরও সংস্কৃতি আছে। তারা শুধু তুলনায় অসভ্য—ওই অবস্থাটাই এককালে মানুষের সব চেয়ে সভ্য অবস্থা ছিল। বুনো মানুষদেরও নিশ্চয় সংস্কৃতি আছে।

সংস্কৃতির মানে তাহলে দাঁড়াচ্ছে—

সংস্কৃতির মানে ছোটো করে ধরা হয়। প্রকৃতিকে জয় করে জীবনকে ক্রমাগত উন্নত করার জন্য যা কিছু করা দরকার যা কিছু থাকা দরকার সব কিছুই মানুষের সংস্কৃতি।

কোন কথা থেকে কোন কথায় এসে পড়েছে খেয়াল করে নরেন বিস্ময় বোধ করে। মণ্টুর পরীক্ষা আর নন্দনের চাকরিব বাস্তব সমস্যা থেকে একেবারে মানবিক সংস্কৃতির ব্যাখ্যায়।

কিন্তু যোগাযোগটা তো মিথ্যা নয় !

মণ্টুর আসল পরীক্ষার মাসখানেক বাকি ছিল।

সকালে তাকে পড়িয়ে যথাসময়ে আপিসে গিয়ে নরেন জানতে পারে, তার চাকরি নেই।

শুধু সে একা নয়, আরও তেরোজন চাকবি করে যাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত !

আঘাতটা পড়েছে তেরোজনের উপর। কিন্তু কেবল তাদেরই মনে হয়নি বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের কথাটা, আপিসের আবও প্রায় সাড়ে চাবশোর মতো কেরানির অনেকেরই এই রকম মনে হয়েছে।

নরেন বাড়ি ফেরার পর বাড়ির লোকের তো আর কোনো উপমা মনেই আসেনি।

খবরটা চেপে যাওয়ায় গোড়ার কয়েকদিন পাড়ার লোক জানতে পাবেনি—ক্রমে ক্রমে টেব পেয়েছে। নইলে তাদের মধ্যেও কতজন ব্যাপারটাকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত মনে করেছে আন্দাজ করা যেত।

ধরাবাঁধা ধারণা দিয়ে উপমা দিয়ে, ব্যাপার বোঝার মানসিক অভ্যাস বেশ কিছুদিন থেকে কেটে যেতে আরম্ভ করেছে বটে কিন্তু আজও উপমা ছাড়া যেন ধাবণাশক্তিব উপায় নেই। কোনো রকম উপমা ছাড়াই সব ব্যাপার ঠিকমতো আঁচ করতে পারা মানেই তো জীবন ও চেতনায় বিপ্লব ঘটে যাওয়া !

মেঘ কী কম ঘনিয়েছে জীবনের আকাশে ! যৌবনেব দিনদুপুরে পর্যন্ত কী কম আঁধার ঘনিয়েছে। চোখে পড়তেও কি বাকি আছে ওই আকাশজোড়া ঘন কালো মেঘ ?

তবু চাকরি করতে করতে বিনা নোটিশে আচমকা ছাঁটাই হওয়াকে মনে হয় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত !

মনটা কতদূর যন্ত্র দাঁড়িয়ে গেলে আকস্মিক বিপদ এ রকম যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া আনতে পারে !

কতকাল ধরে যন্ত্র বানাবার চেষ্টা চলে এসেছে তাদের মনকে !

কিন্তু কই, এই নিয়মে যন্ত্রের মতো শুধু হা-হুতাশ করে চলে না তো বাড়ির মানুষ আপনজনেরা !

হতাশায় মুষড়ে পড়ে শুধু তো কপাল চাপড়ায় না !

বিনা মেঘে বজ্রের আঘাতে কাবু হবার বদলে নামমাত্র খানিকটা হা-হুতাশ করে প্রতিবাদের শোরগোল তুলে দেয়।

তাকেই দায়ি করে, দোষী করে বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটার জন্য !

এত বড়ো দুর্ভাগ্যের খবরটা বাড়িতে কী করে জানাবে ভেবেই নরেন কাবু হয়েছিল সব চেয়ে বেশি।

সকলের কত আশা, কত ভরসা, তার এই চাকরির উপর ! চাতকের মতো সকলে শুধু তার মাসকাবারি বেতনের এক পশলা বর্ষণটুকুর আশায় তাকিয়ে থেকে দিন গোনে না, কত আশা ও সম্ভাবনা নিয়ে কল্পনারও মালা গাঁথে !

খেয়ে-দেয়ে যথাসময়ে যথারীতি চাকরি করতে বেরিয়েছে, ফিরে গিয়ে কোন মুখে সে ওদের জানাবে যে পরদিন থেকে নটায় তার ভাত দরকার হবে না, চাকরি করতে বেরোবার প্রয়োজন হবে না !

দেড়মাসের মাইনের টাকা এনেছে, সামনের মাস থেকে আর মাইনে আনবে না !

মা বাবা ভাই বোন কী বলবে কী করবে, কল্পনা করার চেষ্টা করেছে আর অন্ধকারে ভয়ের স্থানে ছেলেমানুষের আতঙ্কের মতোই সেদিন সে আতঙ্ক অনুভব করেছে বাড়ি ফিরতে !

রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারেনি।

চাকরি গেছে। কোথায় নিদারুণ হতাশায় একেবারে ঝিমিয়ে পড়বে তার বদলে নিজের ভিতরকার একটা অস্থির উন্মাদনার তাড়ায় আর বাড়ির মানুষের ভয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়িয়েছে রাত দশটা পর্যন্ত !

পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছে !

পকেটে একমাসের পাওনা আর বিনা নোটিশে তাড়ানোর জন্য আধমাসের ভিক্ষা দেওয়া মাইনের টাকাগুলো কিন্তু ট্রামে-বাসে পর্যন্ত সে ওঠেনি।

কয়েক আনা পয়সা বাঁচাবার জন্য নয়।

ট্রামে-বাসে উঠে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা অথবা বসবার কথা ভাবতেই তার মন বিগড়ে যাচ্ছিল।

দশটার পর বাড়ি ফিরে রাত্রে সে কিছু ফাঁস করেনি।

পরদিন সকালে জানিয়েছে।

কিন্তু বাড়ির লোক কী আর বলবে। কতই আর হা-হুতাশ করবে। কত সমবেদনা দেখাবে এই দুর্দিনের বেকারকে ?

তাই যেন ওদিকেই কেউ যায় না। আঘাতের প্রতিক্রিয়ার প্রথম উত্তেজনা কেটে যাবার পর হতাশায় কিছুটা মুখ কালো করে সকলে কিছুক্ষণ ব্যাজার হয়ে থেকে দোষারোপের শোরগোল তুলে দেয়।

দেশে বেকার অনেক কিন্তু চাকরিও তো করছে অনেক লোক। এই পাড়ারই অনেক পাস করা ছেলে ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বটে চাকরির জন্য—কিন্তু চাকরিও কী পাচ্ছে না বা করছেও না একজনও ?

রোজগেরে চাকরে মানুষের দলে ভিড়েও, এতদিন চাকরি করেও, তুই শেষে এমনভাবে বেকারের দলে এসে ভিড়লি! সব দোষ তোর। মানিয়ে চলতে পারলে কী তোর এ দশা হয় ? চাকরি যায় ?

চিরকালের অবুঝ একগুঁয়ে সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধিহীন ছেলে। এ ছাড়া তার কী গতি হবে ?

নরেন চমৎকৃত হয়ে যায়। তাকেই শেষ পর্যন্ত দোষী ঠাউরে নিল বাড়ির মানুষ ? এত ছেলের সঙ্গে বরেনের ফেল করার অপরাধের মতো তারই ঘাড়ে চাপল চাকরি খোয়ানোর দায় ? সেই হল অপরাধী ?

বাড়ির লোকে খুশি হবে না এটা তার জানাই ছিল। কিন্তু তার উপরে এতখানি বিরূপ হবে, সোজাসুজি খোলাখুলিভাবে এমন বিশ্রী ব্যবহার শুরু করবে তার সঙ্গে, এটা সে ভাবতেও পারেনি।

পাস-টাস করে প্রায় এক বছর কাজের চেষ্টার বেকারির সময় ক্রমে ক্রমে বেশি বেশি তিতো হয়ে উঠছিল সকলের ব্যবহার, দুবেলা রেশনের পচা দুর্গন্ধ চাল আর খারাপ গমের রুটিতে ভাগ বসাবার জন্য মা পর্যন্ত যেন তাকে ঘেন্না করতে আরম্ভ করেছিল।

মামার চেষ্টায় একটা চাকরি পেয়ে সেটা হারিয়ে আবার বেকার হবার ক-টা দিনের মধ্যে সকলের কাছে সে যেন চোরছ্যাঁচড়ের চেয়ে অধম ঘরের শত্রু দাঁড়িয়ে গেছে !

শুধু অবজ্ঞা করা নয়, তাকে ভাত খেতে না ডেকে, নিজে গিয়ে আসন পেতে খেতে বসলে তাকে ভাত দিতে স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখিয়ে, তাকে যেন আঘাত করতে চায় মা আর বোনেরা !

এক সকালের মধ্যে এই পরিবর্তন।

চাকরি পেয়ে সেও হাঁফ ছেড়েছিল, আশা আনন্দের উন্মাদনায় রাতারাতি সকলের কাছে আদরের খাতিরের মানুষ হয়ে ওঠাটা তার নিজের কাছেও কিছুমাত্র খাপছাড়া ঠেকেনি।

চাকরি পাওয়ার আশা আনন্দের উত্তেজনা তারও কেটে গিয়েছিল বাড়ির লোকেরও কেটে গিয়েছিল কয়েকদিনের মধ্যে—সে কিছু রোজগার করে সংসারে দেওয়ায় কয়েকটা মারাত্মক সমস্যার সমাধান হয়েছিল, পরিবারটির ভেঙে চুরমার হওয়া ঠেকানো গিয়েছিল—কিন্তু অভাব ঘোচেনি।

অনেক অভাব। যেন অন্ত নেই টানাটানির !

অভাব অনটনে পীড়িত মানুষের কি আনন্দ টেঁকে ?

এক বছরের জীবনপণ চেষ্টা অবশেষে মামার দয়ায় সার্থক হয়েছে, নরেন একটা চাকরি পেয়েছে, এটা দু-একদিনের জন্য আনন্দে পাগল করে দিতে পারে। কিন্তু একঘেয়ে একটানা কষ্টকর বাঁচা ঠিক যেন নেশার সাময়িক বাঁকা আনন্দের মতোই শুষে নেয় এই খুশি হওয়ার রসটুকু।

তবু তার আদর আর খাতির বজায় ছিল।

তার আপিসের ভাত রাঁধতে হবে নটার মধ্যে, আপিস থেকে ফিরলেই সে যাতে মুখ হাত ধোয়ার জল পায়, চা আর জলখাবার পায়, সে ব্যবস্থা করতেই হবে—টুঁ শব্দটি না করে।

বেকার হবার পর অন্তত ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে তো কমা উচিত ছিল তার এই আদর আর খাতির ? এমন বেহায়ার মতো মা বোনেরা পর্যন্ত ক-দিনের মধ্যে আদর আর খাতিরের পাট তুলে দিয়ে বিরাগ দেখানো আর ঘা মারার পাট শুরু করল কী করে ?

অনেক ভেবেচিন্তে নরেন এক ধরনের একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে।

সে অবশ্য ভাবে তার এটা ভীষণ রকম বিদ্রোহ ঘোষণা, প্রায় বিপ্লব করে ফেলার কাছাকাছি।

কিন্তু আসলে এটা যে তার আত্মরক্ষার চেষ্টা— মেয়েলি মার্কা চেষ্টা—সেটা তার ধারণাতেও আসে না।

সে বাড়িতে খাওয়া বন্ধ করে দেয়।

তাকে কেউ খেতে ডাকে না এই অজুহাতে।

তার জন্য রান্না হয়—সেও জানে যে রেশন আর এভাবে ওভাবে সংগ্রহ করা--পয়সা দিয়ে সংগ্রহ করা—খাদ্য অন্য সবার মতো তার জন্যও প্রস্তুত হয়েছে। কেউ বলেনি যে চাকরি গেছে বলেই সে খাবে না।

তবে অন্যদের ডেকে তাগিদ দিয়ে খাওয়ানো হয় ওই খাদ্য, তাকে কেউ খেতে ডাকে না।

সে তাই ঠিক করে না ডাকলে খেতে যাবে না।

সকালে চা-খাবার। দুপুরের ডালভাত। রাত্রের রুটি ছেঁচকি। কিছুই খেতে যাবে না—না ডাকলে।

তার এই বিদ্রোহে ফল হয়।

একেবারে অপ্রত্যাশিত ফল !

খেতে তাকে ডাকা হয়, কিন্তু এমনভাবেই ডাকা হয় যে অপমানে অভিমানে জ্বলে পুড়ে যায় তার হৃদয় মন।

বিদ্রোহ শুরু করার প্রথম দু-তিনটে দিন সকলের খাওয়া হবার পর বিরক্তভাবে গম্ভীরভাবে তাকে খেতে ডাকা হয়।

তারপরে শুরু হয় প্রতিক্রিয়া।

চা জলখাবার খেতে ডাকা হয় এইভাবে : কী আরম্ভ করেছ শুনি? খাবার আগলে বসে থাকব নবাব সায়েবের জন্যে? ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে নামিয়ে চা গরম করে দিতে হবে বাবুকে ?

দুপুরে ঝাঁঝের সঙ্গে বলা হয় : পিন্ডি গিলবি না ? ক-টা রাঁধুনি বামনি ঝি চাকর রেখেছিস যে হেঁসেল আগলে বসিয়ে রাখিস ?

কথাটা বলে মা।

উষা সেই সঙ্গে ফোঁড়ন কাটে, তোমার সত্যি বিবেচনা নেই দাদা, বড্ড তুমি স্বার্থপর। নিজের আরাম আয়েসটা বড্ড বেশি বোঝ।

আমি খাব না।

কথাটা বললেই হত সময়মতো? এক পয়সা রোজগার নেই, রাগ আছে দারোগার মতো।

না খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে চাকরির চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে বাইরে যে অপমান জোটে, তা যেন তুচ্ছ হয়ে যায় বাড়ির মানুষের গায়ের জ্বালায় পরিবেশন করা এই সব ঘরোয়া অপমানের কাছে।

নন্দনের বোধ হয় এ রকম অপমান জোটে না। সে তো চাকরি পেয়ে চাকরি হারিয়ে বেকার হয়নি।

তবে বিষে খানিকটা বিষক্ষয়ও হয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেই সে টের পায়, মা আর উষার মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে।

সামান্য ব্যাপার নিয়ে কী কুৎসিতভাবেই পরস্পরকে আক্রমণ করছে তার মা আর বোন ! কী রকম বিশ্রীভাবে বিগড়ে গেছে দুজনের মেজাজ।

জামার বোতাম খুলতে খুলতে নরেন তাদের গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে ঝগড়া করার কথাগুলি শোনে।

থেকে থেকে তারিণীর গর্জন করা ব্যর্থ ধমক শোনে।

হঠাৎ সশব্দে একটা চড় পড়ে উষার গালে।

উষা সশব্দে কেঁদে ওঠে।

আঠারো বছরের মেয়ে !

মা-র হাতে গালে চড় খেয়ে তাকে কাঁদতে হয়।

নিজের মনে নিরিবিলি একটু বসবার জায়গা নেই বাড়িতে।

বাড়িতে মানে তাদের ভাড়া করা বাড়ির দুখানা ঘরেব অংশটুকুতে।

বিনয়বাবুর বাড়ির সামনের রোযাকটুকুতে বসে বিত্ত সমস্যা নিয়ে তর্কের আসর জমিয়েছে পাড়ার মাঝবয়সি দশ-বারোজন চাকুরে।

জানালায় বসে বিড়ি টানতে টানতে নরেন ওদেব তর্ক শোনে—বাড়ির মানুষের কথাবার্তা শোনে।

তর্ক শুনে মনে হয় সকালবেলা খবরের কাগজে যা পড়েছিল সম্পাদকীয় এবং সংবাদ তারই মুখস্থ কবা পুনরাবৃত্তি নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা চলছে।

বাড়ির মানুষেব কথাবার্তা শুনে মনে হয় এইমাত্র মায়ে-ঝিযে যে ঝগড়া হয়ে গেল প্রাণের জ্বালায় তারই জের টেনে চলেছে মা-বাবা ভাইবোনেরা নানাছুতোয়, নানাঅজুহাতে।

রাত্রে আর তাকে খেতে ডাকতে হয় না।

নরেন যথাসময়ে গিযে ছেঁড়া চটের আসন টেনে নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে খেতে বসে যায়।

তারিণী জিজ্ঞাসা করে, কিছু সুবিধা হল ?

না।

আর কী হয় ! কুমুদ কত চেষ্টায় চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছিল। পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলাম শুধু, নইলে কী আর এত ধরাধরি করে জুটিয়ে দিত ? সেই চাকরি তুমি খুইয়ে বসলে।

আবও তেরোজনকে ছাঁটাই করেছে।

তেরোজনকে করুক, তেরোশো জনকে করুক। তুমি কেন চাকরি পেয়ে রাখতে পারবে না, চাকরি খোয়াবে ?

ইচ্ছে করে খোয়াইনি।

ইচ্ছে করলে রাখতে পারতে। আমি তো শুনেছি সব। বাহাদুরি করতে গিয়েছিলে। একবার ভাবলে না চাকরি ছাড়া তোমাব গতি নেই। ঝোঁকের মাথায অবুঝের মতো না হয় করেই বসেছিলে বোকামি—ক-মাস যে চুপ করে ছিল ওপরওলারা তার মধ্যে সায়েবের কাছে গিয়ে ঘাট মানতে পারলে না ? তাহলে কী তোমার চাকরি যায় !

এত খিদে পেটে তবু সেঁকা রুটি পাতলা ডাল তিতো লাগে !

সবাই স্ট্রাইক করল—-

মিছে কথা বোলো না। সবাই স্ট্রাইক কবলে সব্বায়ের চাকরি যেত। বেছে বেছে তোমাকে খেদালে কেন ?

আরও তেরোজনকে খেদিয়েছে।

খেদাক। তোমাকে খেদাল কেন ? তুমি নিশ্চয় বাহাদুরি করতে গিয়েছিলে ?

নরেন নীরবে খেয়ে যায়।

সংসারে অবিরাম যে কামড়াকামড়ি চলেছে, বিশ্রী কুৎসিত কলহ চালিয়ে যেতে যেতে খানিক আগে তার মা আঠারো বছরের মেয়ের গালে যে চড় কষিয়েছে—এটাও সেই ঝগড়া, এ রকম অথবা ও রকম।

কতভাবে কত কিছুর জের টেনে টেনে এবং নতুন অজুহাত আঁকড়ে ধরে যে, অভাবগ্রস্ত নিরুপায় মানুষ আত্মকলহ সৃষ্টি করে। ভবিষ্যতের আশা-ভরসা হারিয়ে গেছে বলেই যেন কারণে অকারণে মারামারি কামড়াকামড়ি করে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা বর্তমানকে তিতো করে বিষাক্ত করে বর্জন করে ফেলার ঝোঁক চাপে !

মানুষের মতো বাঁচার অধিকার যারা হরণ করেছে তাদের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়ার সুযোগ না পেয়েই যেন আপনজনদের সঙ্গে খেয়োখেয়ি করে জ্বালা জুড়োবার চেষ্টার অন্ত নেই।

নরেনও বেকার হয়ে সমান হয়েছে। দুজনে মিলে পয়সা রোজগারের একটা উপায় বার করার জন্য পরামর্শ করতে নরেনের বাড়িতে গিয়ে নন্দন পড়ে প্রচণ্ড একটা কলহের মধ্যে !

টাকাপয়সার ব্যাপার নিয়ে জামাইয়ের সঙ্গে এ বাড়ির মানুষের নগ্ন কুৎসিত একটা সংঘাতের মধ্যে।

ঊষার বড়ো বোন সন্ধ্যার বিয়ে হয়েছিল বছর তিনেক আগে।

অশোককে জামাই করা হয়েছিল এই শর্তে যে তার এম এ আর আইন পড়ার খরচটা তারিণী জোগাবে।

এ জন্য নগদ টাকা তারা নিয়েছিল সামান্যই।

এম এ আর আইন পড়ার কী সহজ খরচ ! নগদ নিলে যা পাবে, পড়ার খরচের ভারটা শ্বশুরের ঘাড়ে চাপালে লাভ থাকবে তার অনেক বেশি।

কোনো এক আত্মীয়ের উদারতায় ঝপ করে একটা চাকরি জুটে যাওয়ায় অশোক আর পড়েনি। পড়ার খরচ দেওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারিণীর কাছে দাবি করা হয়েছিল নগদ টাকা। এই নিয়ে সন্ধ্যার বিয়ের এক বছরের মধ্যে কলহ বেঁধেছিল।

দুই পক্ষে কিছু রাগারাগির পর মেয়ের মুখ চেয়ে তারিণী নগদ যত টাকা দাবি করা হয়েছিল তার অর্ধেকের মতো দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছিল।

অপর পক্ষ সন্তুষ্ট হয়নি, তবে একেবারে কিছু না পাওযার চেয়ে যা পাওয়া যায় তাই লাভ—এই নীতি অনুসারে আপস ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছিল।

বোনের বিয়ের টাকার জন্য ঠেকে গিয়ে বিপদে পড়ে এতদিন পবে অশোক আবার এসেছে তার নিজের বিয়েতে প্রাপ্য টাকার ছেড়ে দেওয়া অংশটা আদায করে নিতে।

জোর দিয়ে সে বলছে, টাকা নাকি সে ছেড়ে দেয়নি, আপস করেনি। তারিণীব একলার চাকরিতে সংসার চলছিল, টাকাপয়সা হাতে ছিল না, তাই তখন তারিণী যা দিয়েছিল তাই নিয়ে বাকিটা তার কাছেই গচ্ছিত হিসাবে রেখেছিল, পরে একসময় নেবে।

শ্বশুরকে খাতির করেই নাকি সে এতদিন তাগিদ দেয়নি, চুপ করেছিল। টাকাটা জমা আছে থাক, নিলেই তো খরচ হয়ে যাবে, জরুরি দরকার পড়লে তখন চেয়ে নিলেই হবে !

আজ তার দায়ের সময় টাকাটা না দিলে চলবে কেন ? বোনের জন্য অনেক চেষ্টায় চাকরে ছেলে পেয়েছে—একেবারে পাকা চাকরি। তারিণীর কাছে টাকা পাওনা থাকতে কয়েক শো টাকার জন্য এমন ভালো পাত্রের সঙ্গে বোনের বিয়েটা তার ফসকে যাবে ?

নন্দন বুঝতে পারে, সংঘাত শুরু হয়েছে অনেক আগেই। কথা কাটাকাটির পর্ব সাঙ্গ হয়ে এখন কলহ উঠেছে চরমে।

নন্দন বাড়িতে পা দিয়েই শুনতে পায় অশোক চিৎকার করে বলছে, দেবেন না মানে ? বাপ-ব্যাটা দুজনে মিলে চাকরি করছেন—জামাইয়ের দেনাটা মিটিয়ে দিতে আপনাদের অসুবিধা কী ? নরেনবাবুর চাকরি তো গেছে এই সেদিন—অ্যাদ্দিন তো দুজনে রোজগার করে টাকা জমিয়েছেন। এ রকম অন্যায় তো চলতে পারে না ! ছোটোলোক ছাড়া কেউ তো এভাবে মেয়ে পার করে জামাইকে ফাঁকি দেয় না।

নরেন চিৎকার করে বলে, তুমি পড়লে না কেন ? পড়লে আমরা তোমার পড়ার খরচ দিতাম। তবু আমরা তোমায় পাঁচশো টাকা নগদ দিয়েছি। আবার নগদ টাকা তোমার কীসের পাওনা ?

পড়ার খরচ দেবেন বলে নগদ কম নেওয়া হয়নি ? নামমাত্র নেওয়া হয়নি ? হিসেব করুন না দুবছর এম এ পড়ার খরচ কত—ওটা আমার পাওনা টাকা। আমি একপয়সা বেশি চাই না।

এ কী সেই অশোক ? উষাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এলে যার হাসিখুশি শান্ত অমায়িক স্বভাবে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত ? বলত যে এমন জামাই অনেক ভাগ্যে জোটে ?

এমন ছোটোলোকের মতো যে ঝগড়া করছে কয়েক শো টাকা আদায় করার জন্য—যে টাকা কোনো হিসাবেই তার প্রাপ্য নয় ! বিয়ের আগে কথাবার্তা চলার সময় এ পক্ষ থেকে স্পষ্টই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে চাকুরে না হোক, কমপক্ষে ভালোভাবে এম এ, এম এসসি পাস করা ছেলে তারা খুঁজছে।

মেয়েকে আই এ পাস করানোর পর আর পড়াতে পারেনি বটে কিন্তু তারা শিক্ষিত জামাই চায় মেয়ের জন্য। কমপক্ষে এম এ পাস।

অশোক যদি এম এ পড়ে—তাদের খরচে পড়ে—তবেই তারা সন্ধ্যাকে তার হাতে দিতে রাজি হবে।

চাকরি পেয়ে গিয়ে আর না পড়ে সে যে চাকরি করছে এতে কেউ অসুখী নয়—কিন্তু পড়ার জন্যই যে টাকা তার পেছনে ঢালার কথা ছিল,না পড়েও সে টাকা সে দাবি করে কোন যুক্তিতে ?

সন্ধ্যা দাঁড়িয়েছিল তফাতে, একা। দুখানা ঘর আর বারান্দাটুকুর সংকীর্ণতায় এতগুলি মানুষ থাকলে যতটুকু তফাতে সরে দাঁড়ানো সম্ভব।

ঝগড়া চলছে এ ঘরের ভিতরে, দুয়ারের কাছে উবু হয়ে বসে আছে নরেনের মা আর উষা।

বারান্দার কোনায় সরে গিয়ে সবার দিকে পিছন ফিরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা যেন প্রাণহীনা নিশ্চল মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেছে।

তার কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে নন্দন বলে, একটু দরকারে এসেছিলাম, দাঁড়াব না চলে যাব বুঝতে পারছি না।

সন্ধ্যা তিক্তকণ্ঠে বলে, চলে যাবে কেন ? এ তো লুকোচুরির ব্যাপার কিছু নয়। এদের ব্যবহারটা দ্যাখো না, সাক্ষী থাকো না। মেয়েকে পার করে এখন জামাইকে ফাঁকি দিচ্ছে, ঝগড়া করছে।

কী ঝাঁঝ তার কথায় ! নন্দন ভাবে, সেরেছে। বাপ-ভায়ের বিরুদ্ধে সন্ধ্যা তবে অশোকের পক্ষে !

নিজে সে কলহে কোনো অংশগ্রহণ করছে না বটে, কলহরত স্বামী আর বাপ-ভায়ের দিকে পিছন ফিরে এখানে রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তার সম্পূর্ণ সমর্থন অশোকের পক্ষে।

এবং কলহ না করলেও সেটা জানিয়ে দিতে সে নিশ্চয় কসুর করেনি। সেই জন্যই এখানে তার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা।

এ রকম ভাবাটা অবশ্য অন্যায় নন্দনের। স্ত্রী স্বামীর পক্ষ না নিয়ে কার পক্ষ নেবে ? স্বামীই তো তার সম্বল এখন। কিন্তু নন্দন কিনা ভাবছিল অন্যায়টা সম্পূর্ণরূপে অশোকের, বাস্তব অবস্থা অশোকের দাবিকে কুৎসিত হীনতায় পরিণত করলেও যে মিথ্যা করে দেয়নি, এটা তার কিনা খেয়ালেও আসেনি—সে তাই ধরে নিয়েছিল সন্ধ্যা বুঝি অশোকের ছোটোলোকোমির বিরুদ্ধে গিয়ে বাপ-ভায়ের পক্ষ নেবে !

সন্ধ্যার ভাব দেখে এবং কথা শুনে এবার ব্যাপারটা খেয়াল করে তার চমক লেগে যায়।

তাই তো বটে।

সন্ধ্যা যে অশোকের সঙ্গে এসেছে তার সোজা সরল মানেই তো এই যে সে বাপ-ভায়ের কাছ থেকে স্বামীর পাওনাটা আদায় করে নিতে স্বামীকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেই এসেছে।

নইলে সে কি আসত ? এ তো শখ বা সুখের বেড়াতে আসা নয় বাপের বাড়িতে ! ঝগড়া করে টাকা আদায় করতে আসা।

মনেপ্রাণে অশোকের পক্ষে না থাকলে, দুজনে মিলে এসে এ রকম ঝগড়া করে টাকা আদায়ের পরামর্শ না করে থাকলে—বিষের চেয়ে তিতো এই বাপের বাড়ি আসা সে কি মেনে নিত ?

অথবা অশোক তাকে কান ধরে টেনে এনেছে ?

সে ভয়ে এসেছে ? অশোকের চাকরির পয়সায় সারাজীবন তাকে খেতে পরতে হবে জেনে এত বড়ো ব্যাপারে তাকে চটাবার আতঙ্কের তলে চাপা পড়ে গেছে বাপ-ভায়ের জন্য তার স্বাভাবিক সমর্থন ও সমবেদনা ?

কলহে একটু ঢিল পড়েছে বোঝা যায়। চেঁচামেচি কমিয়ে সকলেই একটু ভাববার চেষ্টা করছে, উপায় কী, মীমাংসা কী, এখন কী করা যায় !

নন্দন মৃদুস্বরে বলে, তুমি অশোককে একটু বুঝিয়ে বলতে পারলে না সন্ধ্যা ? রাগ কোরো না, আমার কোনো কথা বলার অধিকার নেই জানি। একদিন ছেলেমানুষি ভালোবাসা হয়েছিল বলেই বিয়ের পরেও তোমাকে উপদেশ দেওয়া চলে না।

সন্ধ্যাও মৃদুস্বরে বলে, ও সব কথা থাক না। কী জ্বালায় আছি তুমি বুঝবে কী। একলা মানুষ, চাকরি কর আর সাধ মিটিয়ে স্ফূর্তি করে বেড়াও। থাক, থাক, ও সব আমি জানি, আমায় বলতে হবে না,—আমার জন্য বিয়ে করনি বলতে যাচ্ছিলে তো ? ও সব ফাঁকির কথার মানে আমি জেনে গিয়েছি।

চাকরি করে মাইনে পাবার স্বাদ আজও পাইনি সন্ধ্যা। একটা মাসের জন্যও পাইনি।

মুখ না ফিরিয়েও কণ্ঠে বিস্ময় ও তিরস্কার ধ্বনিত করে সন্ধ্যা বলে, সত্যি ? আমার জন্যে নয় তো ?

সন্ধ্যার কথা শুনে মনে মনে নন্দনের হাসি পায়। তাকে পায়নি বলে সে চাকরি পর্যন্ত বর্জন করেছে এ কথাটার কোনো মানে নেই—কথাটা বলার একটা মানে আছে। সংসারের ঝঞ্ঝাটে নিজে সন্ধ্যা পেকে গিয়েছে, তাদের এককালের ভালোবাসার ফাঁকি আর ছেলেমানুষি বুঝে গিয়েছে—কিন্তু তাকে সন্ধ্যা ধরে রেখেছে আগের দিনের সেই রকম ছেলেমানুষটি বলে।

তাই সন্ধ্যা বলতে পেরেছে কথাটা—তারই জন্য সে চাকরি করা বাদ দিয়ে সন্ন্যাসী হয়নি তো ?

ওদিকে ঝগড়াঝাঁটিটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে টের পেয়ে নন্দন স্বস্তি বোধ করে।

এখন মিনিট দশ-পনেরো ওরা খাওয়াখাওয়ি করবে।

সন্ধ্যার সঙ্গে চরম অবোঝা-অবুঝির একটু ফয়সালা করার সুযোগ সে পাবে কিছুক্ষণ। সে যে ছেলেমানুষের মতো তাকে ভালোবাসেনি, ছেলেমানুষ ছিল বলেই ভালোবাসার ছলে খেলায় সন্তুষ্ট থেকেছে, এটা সন্ধ্যাকে বুঝিয়ে দিলে নিজের প্রাণটা তো তার একটু হালকা হবে !

ওরা ওদিকে ঝগড়া করুক, পরস্পরকে যারা বাঁচাবে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করুক—এই ঝগড়ার ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসবে আগামী দিনের মিল—আমি বাঁচলে তুমি বাঁচবে, তুমি বাঁচলে আমি বাঁচব, বাঁচার এই খাঁটি নীতি।

সে বলে তোমার আশ্চর্য বোধশক্তি দেখেই তোমায় ভালোবেসেছিলাম। তুমি বোধ হয় ভাব, ভালোবাসাটা অনিয়মে ঘটে, এলোমেলো উলটে-পালটে যথেচ্ছ নিয়মে ঘটে ! এ জগতে ওটা আজ পর্যন্ত ঘটেনি। পেটের খিদে আর প্রাণের ভালোবাসা এক নিয়মে চলে এসেছে।

থিয়োরি খাটিয়ো না, দোহাই তোমায়। আগেও তুমি এ রকম বড়ো বড়ো কথা বলতে।

নন্দন আহত হয় না। রাগ করে না।

থিয়োরি নয়, ফাঁকা কথা নয়। পাস করার জন্য ছেলেবেলা থেকে কী কঠিন তপস্যা করেছি তুমি জানো, পাস করাটাই আজ পর্যন্ত সার হয়ে আছে, আর কিছুই করতে পারলাম না। ছেলেমানুষি ভাবুকতা কি থাকে এ অবস্থায় ? জ্বলেপুড়ে সব খাক হয়ে গেছে। কী রকম শক্ত নীরস হয়ে গেছে আমার মন—তুমি ভাবতেও পারবে না। কিন্তু তোমায় আমি আজও ভালোবাসি। পাসের খাতিরে তোমায় হারিয়েছি—নিজের এই বোকামির জন্য আমার আপশোশ মরলেও যাবে না। চোখ মেলে যদি একটু তাকাতাম চারিদিকে, যদি একটু বুঝবার চেষ্টা করতাম বাস্তবটা কী দাঁড়িয়েছে—মিথ্যা তপস্যায় মেতে না থেকে যদি একটু হিসাব করতাম তোমার জন্য বাঁচার জন্য কীভাবে লড়াই করা উচিত, কোনটা ঠিক পথ ! হেরে গেলেও আমার আজ আপশোশ থাকত না। লড়াই না করেই বোকার মতো ভুল করে হেরে গেলাম এর চেয়ে লজ্জার কথা, দুঃখের কথা মানুষের আর কী আছে বলো ?

সন্ধ্যা মুখ ফিরিয়ে তাকায় !

কষ্ট হয় আমার জন্য ?

হয়—বিশেষ এক রকম ভাবে হয়। তোমার জন্য কষ্টটা অন্য সব কষ্টের সঙ্গে মিশে গেছে। তোমার কথা ভাবলে প্রাণের সমস্ত ব্যথা-বেদনা জ্বালা পোড়া একসঙ্গে নাড়া খায়। কত কাজ করার থাকতে শুধু অকাজ নিয়ে মেতে থেকে জীবনটা নষ্ট করলাম।

সন্ধ্যা মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলে, ও কথা বলতে নেই। কত যেন বুড়িয়ে গেছ, জীবনটা যেন ফুরিয়ে গেছে।

নন্দন বলে, সমস্ত জীবনটার কথা বলিনি—এতদিন জীবনটা বোকার মতো নষ্ট করার কথা বলেছি। বাকি জীবনটা যাতে নষ্ট না হয়, এবার সেই যুদ্ধ শুরু করব বইকী !

ঝগড়া চলেছিল সমানে—চড়া গলায়। কে কী বলছে না বলছে সেদিকে তারা কান দেয়নি। হঠাৎ তারিণীর গলা-চেরা আর্তনাদে দুজনে তারা চমকে ওঠে।

আর্তনাদ করে ভগবানের কাছে মরণ প্রার্থনা করতে করতে তারিণী মেঝেতে কপাল ঠুকছে !

সন্ধ্যা ছুটে গিয়ে বাপকে জড়িয়ে ধরে। সকলে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

অশোকও যেন ঝিমিয়ে গেছে মনে হয়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর অশোক প্রায় কাতরভাবে বলে, সত্যি বলছেন টাকা নেই ? উষার বিয়ের জন্যও কিছু জমাননি ? তাই থেকে আমায় ধার দিন টাকাটা—আমার দায়টা উদ্ধার হোক। ছ-মাসের মধ্যে আমি যেভাবে পারি টাকা শোধ করব।

এতক্ষণে যেন স্পষ্ট হয়, মানে খুঁজে পাওয়া যায় অশোকের এ রকম মরিয়া হয়ে নাছোড়বান্দার মতো টাকা আদায়ের চেষ্টা করার। উষার বিয়ের জন্য টাকা জমানো আছে ধরে নিয়েছে বলেই তার এত রাগ, এত জবরদস্তি।

নইলে নরেনের চাকরি গেছে জেনেও কী এমন জোরের সঙ্গে দুজনে তারা টাকা আদায়ের চেষ্টা করতে পারত !

নরেন মৃদুস্বরে বলে, উষার বিয়ের জন্য জমানো টাকা ? সন্ধ্যার বিয়ের দেনা কত বাকি আছে জিজ্ঞেস করো বরং।

পরদিন সকালে সে মাধবের বাড়ি যায়।

পাঁচখানা বই খুলে সামনে সাজিয়ে রেখে মাধব একখণ্ড আলগা কাগজে কী সব নোট করছিল।

ঠিক যেন মুক্তি পেয়ে খুশি হয়ে সে বলে, আসুন, বসুন।

গলা সামান্য একটু চড়িয়ে বলে, দুকাপ চা দিয়ো।

তারপর বলে, মুখ খুব শুকনো দেখাচ্ছে ?

ভুলে যান কেন চাকরি নেই ?

সে রকম শুকনো নয়। মনে হচ্ছে যেন বড়োই মনঃকষ্টে আছেন।

চাকরি নেই, মনঃকষ্টে থাকবেন না ?

কথাটা বলে মানসী।

যেন নরেনের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বলে।

সে চা নিয়ে আসেনি। জানায় যে চায়ের জল চাপিয়ে এসেছে।

মাধব বলে, তুমি বুঝলে না আমার কথাটা।

বুঝিয়ে দিলেই বুঝব।

মাধব একটু ভাবে। একবার নরেনের দিকে একবার মানসীর দিকে তাকায়। তারপর ভয়ানক রকম গম্ভীর হয়ে বলে, আমি বলছিলাম মুখের ভাবের কথা। মুখের ভাবেরও তো রকমারি আছে ? রোগ হলে এক রকম, রাগ হলে এক রকম, মনে কষ্ট হলে এক রকম—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। চাকরি না থাকলে কী রকম মুখের ভাব হয় বলো তো, শুনে রাখি, শিখে রাখি ?

মাধব হাসে। খুব যেন খুশি হয়েছে মানসীর কথা শুনে। সানন্দে একটা সিগারেট ধরায়।

বলে, জ্ঞানবিজ্ঞান কোথায় পৌঁছেছে জানো না, তাই ভাব আমি বুঝি এলোমেলো বকছি। অ্যাটম বোমা কি আকাশ থেকে নেমে এসেছে মানুষের হাতে ? অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় মানুষ অধিকার করেছে অ্যাটম বোমা। লক্ষণ দেখে, কারণ দেখে, সূক্ষ্ম ব্যাপার বুঝতে পেরে, তবে আবিষ্কার করেছে। মনের ভাবের ছাপ মানুষের মুখে পড়বে এ তো মোটা কথা।

মানসী যেন নিজে তর্ক করে, নরেনের সঙ্গে মাধবের তর্ক ঠেকিয়ে রাখবে, পণ করে ঘরে এসেছে। মাধবের কোনো কথাই সে এখন মানবে না, সব কথার প্রতিবাদ করে তর্ক চালিয়ে যাবে।

সে গম্ভীর হয়েই বলে, মুখের ভাব দেখে বলতে পারবে আমার খিদে পেয়েছে না পেটের অসুখ হয়েছে !

মাধব অনায়াসে বলে, শুধু মুখের ভাব কেন ? তোমার মুখের ভাব দেখে যেটা বুঝতে পারছি, তোমার চালচলন কথাবার্তায় সেটার প্রমাণ পাচ্ছি।

কী হয়েছে আমার ?

রাগের চোটে তোমার মাথা ধরেছে, গা বমিবমি করছে।

খুব বলেছ। এই তুমি সবজান্তা পণ্ডিত ? আমার বলে ঘুম হয় না অর্ধেক রাত ছটফট করি—

মাধব একটু হেসে বলে, ওটা তোমার রাগেরই আরেকটা লক্ষণ। রাগের জন্য এখন তোমার মাথা ধরে আছে, গা বমিবমি করছে—রাগের জন্যই রাত্রে ঘুম আসবে না।

মানসী যেন একটু চটে যায়।

রাগের আবার কী দেখলে তুমি ? কখন আবার আমি রাগারাগি করলাম তোমার সঙ্গে ?

মাধব সঙ্গে সঙ্গে বলে, করলে না বলেই তো এ রকম হয়েছে ! রাগটা ক-দিন ভেতরে চেপে রেখেছ, দেখাচ্ছ যে রাগ তোমার হয়নি। রাগারাগি করলে তো ফুরিয়েই যেত—রাত্রেও ঘুমোতে, মাথাও ধরত না, গা বমিবমিও করত না।

মানসী হালকা সুরে বলবার চেষ্টা করে, কী বলছ পাগলের মতো ? এর মধ্যে নতুন করে রাগের কী কারণ ঘটেছে ? বিনা কারণে রাগব কেন ? রাগ হলে আমি কখনও চেপে রাখি !

মাঝে মাঝে চেপে রাখ বইকী !

কখখনো না !

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি এখন আসি। একটু দরকার ছিল—

মানসী ফোঁস করে ওঠে, না, উঠবেন না। এতক্ষণ শুনলেন, বাকিটা শুনে তবে যাবেন। কেমন বানিয়ে বানিয়ে প্যাঁচালো কথা বলে আমায় জব্দ করে একটা প্রমাণ নিয়ে যান।

মাধবের দিকে চেয়ে বলে, আমি রাগ করেছি, আমিই জানি না কেন রাগ করেছি ? অবচেতনার রাগ নাকি আমার ?

মাধব বলে, না, এমনি রাগ। রাগ যে হয়েছে তাও তুমি জানো, কেন রেগেছ তাও জানো, রাগটা চেপে যাবার চেষ্টা করছ। একটুও রাগ দেখাওনি কিনা তাই ভেবেছ আমি টের পাব না রেগেছ, কেন রেগেছ।

মানসী আবার ফোঁস করে ওঠে, ছলনা করছি ?

মাধব বলে, করছ বইকী ! তবে তোমার উদ্দেশ্যটা ভালো।

মানসী চেঁচিয়ে বলে, বলো কেন রেগেছি। তোমায় বলতে হবে।

মাধব একটু চুপ করে থাকে।

মানসী আরও ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, বলো। না বললে চলবে না। সব বিষয়ে তোমার বাহাদুরি।

মাধব ধীরে ধীরে বলে, বলতে আপত্তি কী ? দিল্লির চাকরিটা নিইনি বলে তুমি রেগেছ।

তুমি কোন চাকরি নেবে না নেবে—

তাতে তোমার কিছু আসে যায় না ? এ কী একটা কথা হল মনু ! তোমার খুব ইচ্ছা ছিল অফারটা নিয়ে নিই। তোমার সঙ্গে যখন পরামর্শ করছিলাম, এ চাকরি কেন আমার পোষাবে না বোঝাচ্ছিলাম, মনের ইচ্ছাটা তুমি চাপতে পারনি। তবে জোর করে তুমি বলনি—চাকরিটা নিতেই হবে। তুমি তো জানো বলে লাভ নেই, টাকার জন্য আমি আদর্শ ছাড়ব না, নিজেকে বিক্রি করব না।

আমি কোনোদিন বলেছি আদর্শ ছাড়তে, নিজেকে বিক্রি করতে ?

সোজাসুজি তা বলনি। কিন্তু এমন অনেক কিছু আমাকে করতে বলেছ যার মানেই দাঁড়ায়—

ওই যা ! কখন উনুনে কেটলি চাপিয়ে এসেছি !

মানসী যেন পালিয়ে যায়।

নরেন ধীরে ধীরে বলে, আপনি একটা ভুল করলেন। আমার সামনে এভাবে ওঁকে জব্দ করা উচিত হল না।

মাধব বলে, আপনি ভুল বুঝলেন। কথাটা ও তুলেছিল আপনার সামনে আমাকে জব্দ করতে। আমি ওর ভুল ধারণাটা সংশোধন করে দিলাম। ও ভেবেছে মনের মধ্যে চেপে রাখলেই বুঝি মনের বড়ো বড়ো কথা আমার কাছে গোপন করা যায়। এখনও বুঝতে পারেনি যে আমার এটা বাহাদুরি নয়, পাণ্ডিত্য নয়। এর মধ্যে ম্যাজিক কিছুই নেই। একসঙ্গে চলাফেরা খাওয়া-দাওয়া ওঠা-বসা ঘুমানো থেকে সব কিছু চলছে ক-বছর ধরে—কারও পক্ষে অন্যের কাছে কিছু গোপন রাখা সম্ভব ? মিল আর অমিল সব ধরা পড়ে যাবেই। মানে বুঝতে না পারা আলাদা কথা, কেন এ রকম হল কেন ও রকম হল না বুঝলে আসে যায় না। আসে যায় না মানে, আমাদের পক্ষে আসে যায় না।

মানসী যেন তার কথার জবাব দেবার জন্যই তৈরি চা নিয়ে ঘরে আসে—চা দেবার জন্য নয়। কারণ, কাপে চা ঢেলে দেবার চেষ্টামাত্র না করে সে বলে, মিছে আমার বদনাম দিচ্ছ। এ কী অন্যায় কথা বলো তো ? তুমি মস্ত বিদ্বান বলেই যা খুশি বলবে তাই ঠিক ধরে নিতে হবে ? তুমি উলটো

বুঝেছ। দিল্লির চাকরি নাওনি বলে রাগ করব ? চাকরিটা নিতে চাইলেই বরং আমি বারণ করতাম, নিলে রাগ করতাম। কেন জানো ?

চা-টা দিয়েই বলো না ?

মানসী নীরবে কাপে চা ঢেলে দেয়—নিখুঁতভাবে, লালিত্যপূর্ণভাবে।

বলে, আমায় তুমি খুব বোকা ভাব। বেশ আমি বোকা। আমায় তুমি স্বার্থপর ভাব। বেশ আমি স্বার্থপর। স্বার্থপর নিজের স্বার্থ দেখবে তো ? স্বার্থের হিসাবটা ভালো বুঝবে তো ? দিল্লির চাকরি তোমায় আমি নিতে দিতাম না—ক-মাস বাদে চাকরি খুইয়ে এই ভদ্রলোকের মতো বেকার হবে বলে। তোমার ধাত আমি জানি। তোমার থিয়োরি অনুসারেই জানি—এইমাত্র তুমি এঁকে বলছিলে যে বোঝাপড়া থাক বা না থাক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে কেমন মানুষ অজানা থাকে না। আমি জানি ও চাকরিটা নিলেও তুমি বেশি দিন চালাতে পারতে না—তোমার ধাতেই বরদাস্ত হত না। নিজের স্বার্থেই আমি তাই তোমায় চাকরিটা নিতে দিতাম না।

মাধব ধীরে ধীরে বলে, পারলে না। আমিও এই কথাই বলেছি। চাকরিটা নিলাম না বলেই তোমার রাগ—রাগটা তুমি চেপে গেছ আমার ধাত জানো বলে। তুমি জানো বইকী যে রাগ দেখিয়ে চাকরিটা নেওয়ালেও লাভ নেই—বেশি দিন আমি চালাতে পারব না। আমার এই ধাতটা মেনে নিতে হচ্ছে বলেই তোমার রাগ।

মানসী চুপ করে থাকে।

বরাবর যেভাবে তর্কে হেরে চুপ করে যায়।

এবার নরেন দারুণ অস্বস্তি বোধ করে।

তার সামনে এতক্ষণ দুজনের কলহ চালানোর মধ্যে এমন একটা নাটকীয় অবাস্তরতা ছিল, এমন একটা অসাধারণতা ছিল, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে দাম্পত্যকলহকে বুদ্ধির লড়াই করে রাখার এমন একটা চেষ্টা ছিল যে দুজনের বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার ঝাঁঝ পেয়েও নরেন তেমন বিচলিত হয়নি।

হার মেনে মানসী চুপ করে যাওয়ামাত্র যেন বাস্তব হয়ে গেল দুজনের কলহ—স্পষ্ট হয়ে উঠল এই সত্যটা যে বুদ্ধির লড়াই থেমে গেছে, আসল লড়াই আরম্ভ হচ্ছে না কেবল তার জন্য। সে বিদায় নেবার পরেই ওদের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে পরস্পরের প্রতি কদর্য নিষ্ঠুর আক্রমণ !

দুজনেই সাময়িকভাবে ঘায়েল হয়ে যাবে সে লড়ায়ে !

সে উঠে দাঁড়ায়।

প্রায় কাতরভাবে আতঙ্কের সঙ্গে মানসী বলে, আরেকটু বসুন না ?

মাধবও অনুরোধ জানায়, বসেই যান না খানিকক্ষণ। বেকার মানুষ, ঘুরে বেড়িয়ে কী করবেন ?

দুজনেই চায় সে আরও কিছুক্ষণ বসুক ! পিছিয়ে যাক তাদের কামড়াকামড়ি, গায়ের জ্বালার উত্তাপ খানিকটা উপে যাক, মাথা খানিকটা ঠান্ডা হোক, মেজাজ খানিকটা নরম হোক।

অগত্যা সে বসে।

মাধব একটা সিগার বাড়িয়ে দিলে অগত্যা সেটা ধরায়।

ঠান্ডা বরফ হয়ে গিয়েছিল মানসীর কাপের চা।

এক চুমুকে শরবতের মতো নিজের চা-টা খেয়ে মানসী বলে, এত লোকের সঙ্গে তোমার জানাশোনা—ওঁকে একটা চাকরি দিতে পার না ?

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে কিছু না বলেই গটগট করে বেরিয়ে যায়।

৪

না। বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয় না।

মেঘ না হলে বজ্র পড়ে না।

দেড়দিন বন্ধ থাকার পর সেদিন দোকান খুলবে। সকালে যথারীতি কাজে গিয়ে দোকানের নিজস্ব তালার উপর অন্য লোকের লটকানো তালা দেখে প্রায় অশিক্ষিত দীননাথের মনে হয় না, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়েছে।

ছাঁটাই হয়ে নরেন যেমন ভেবেছিল।

সকাল থেকে রাত্রে দরজা বন্ধ করা পর্যন্ত দোকানে তার সময় কাটে দোকানের কাজে, ভেতরের ব্যাপার সব না জানলেও খানিকটা সে আঁচ করেছিল বইকী।

গোবিন্দের ভাবসাব, চালচলন দেখে তারও আশঙ্কা হয়েছিল বইকী যে এ রকম একটা কিছু ঘটবে।

দোকানের সামনে দীননাথ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, কিন্তু গোবিন্দ বা তার বাড়ির কেউ দোকানে আসে না। একটা লরিতে কয়েকজন লোক নিয়ে হাজির হয় ভুবন !

বলে, কী খবর দীননাথ ?

আজ্ঞে খবর আর কী, দোকানে কারা তালা এঁটে দিয়েছে দেখছি।

ভুবন নতুন তালা খুলতে খুলতে হেসে বলে, আমরাই দিয়েছি। আমাদের বেচে দিয়েছে দোকানটা।

দীননাথ যন্ত্রের মতো বলে, বেচে দিয়েছে ?

নতুন তালা চাবি দিয়ে খোলার পর পুরানো তালা ভাঙার চেষ্টা আরম্ভ হয়। ভুবন লোক সঙ্গে করেই এনেছিল।

দীননাথ বলে, আজ্ঞে চাবিটা আনিয়ে নিলে হত না ?

ভুবন বলে, আর বলো কেন গোবিন্দ ছোঁড়াটার কথা—একনম্বর শয়তান। দোকানের চাবি পকেটে নিয়ে বজ্জাতটা কোথায় সটকেছে—কাল সকাল থেকে পাত্তা নেই। কাগজপত্র সই করে বুড়ো বলল, গোবিন্দ বাড়ি ফিরলেই চাবি পাঠিয়ে দেবে। সকালে লোক পাঠালাম—ছোঁড়া এখনও ফেরেনি।

দোকান বেচে দিয়েছে গোবিন্দেরা, দোকানের নূতন মালিক হয়েছে। কিন্তু দোকানটা আছে। সে এতকাল কাজ করছে দোকানে, তার কাজটাও নিশ্চয় বজায় থাকবে।

কিন্তু লরি কেন ? লরিতে মাল তুলবার কুলিরা সঙ্গে কেন ?

ভরসা করে মুখ ফুটে ভুবনকে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

তালা ভেঙে দোকান খুলে দোকানের মাল লরিতে তোলা আরম্ভ হলে সে আর চুপ করে থাকতে পারে না।

দোকানটা চালাবেন না, আজ্ঞে ?

না—জামাকাপড়ের এইটুকু দোকান চালিয়ে কী লাভ ? মালপত্র বড়ো দোকানে চালান করে দিচ্ছি। এ দোকানে শুধু উল থাকবে।

মোর কাজটা থাকবে তো, আজ্ঞে ?

তোমার কাজ ?

ভুবন তার মুখের দিকে চেয়ে একটু ভাবে। দীননাথ তাড়াতাড়ি বলে, উলের দোকানে নাই যদি হয়, কাপড়ের দোকানে একটা কাজ দেবেন তো মোকে ? কাজ গেলে খাব কী !

ভুবন দুবার মাথা হেলিয়ে তার কথায় সায় দেয়, স্বীকার করে নেয় তার কাজ থাকার প্রয়োজনটা। ধীরে ধীরে বলে, দ্যাখো, তুমি বুড়ো মানুষ, গরিব মানুষ। মিথ্যে আশা দিয়ে তোমায় আমি ভোগাব না। কাপড়ের দোকানে লোকের দরকার নেই—একজনাকে বরং ছাড়িয়ে দেবার কথা ভাবছি। উল বেচার কাজ তুমি পারবে না।

দীননাথ মূঢ়ের মতো চোখ চেয়ে থাকে।

তোমার পাওনাগন্ডা সব মিটিয়ে দেব—আজকেই দেব।

কী উদারতা ! দীননাথ একটা নিশ্বাস চেপে যায়।

এক মাস মোটে বাকি ছেলের পরীক্ষার।

দোকান উঠে যাবার খবরটা দীননাথ একেবারে চেপে যায়।

নন্দনের বাড়ি থেকে জেনে এসে নরেন পাছে কিছু বলে বসে এই ভয়ে সে তাকেও সাবধান করে দেয়, বাড়িতে বোলো না কিন্তু বাবা। কিছু যাতে জানতে না পারে—মন বিগড়ে যাবে ছেলেটার। পরীক্ষাতক চুপচাপ কাটিয়ে দেব ভাবছি। রোজ ঠিক সময়ে বেরিয়ে যাব।

নরেন তখন পর্যন্ত খবর জানত না, সে আশ্চর্য হয়ে বলে, কী, বলব না বাড়িতে ?

দীননাথের কাছে খবর জেনেই সে নন্দনদের বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

নন্দন প্রথম কথাই বলে, দুবেলা দুটো পোড়াভাত জুটছিল, এবার তাও বন্ধ হবে। এতদিন দোষ দেওয়া যেত, এবার কিছু বলতেও পারব না।

নরেন বলে, কী করে গেল দোকানটা ?

দেনায় বিক্রি হয়ে গেল। জ্যাঠার যেমন বুদ্ধি—গোবিন্দেব মতো ভদ্রবাবুকে দিলে দোকান চালাতে ! দোকান বড়ো করবে, ফাঁপিয়ে তুলবে, লাখপতি হবে ! ছোটো একটা দোকান চালাতে না শিখেই বড়োবাজারের সঙ্গে পাল্লা দেবে !

কিছুই বাঁচেনি ?

কে জানে ! আমায় কী ভেতরের কথা কিছু জানায় ? অল্পবিস্তর কিছু নিশ্চয় পাওয়া গেছে।

নরেন ভেতরে গিয়ে প্রথমেই ছবিরাণীর মুখের দিকে তাকায়।

এবারও মুখখানা তার একটু কাঁদো কাঁদো দেখাবে না ? অন্তত একটু ম্লান দেখাবে না ?

ছবিরাণীর চেনা মুখে অচেনা দুঃখ বেদনার কোনো ছাপ না দেখে সে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যায়।

তারপর ভাবে, না, এত তাড়াতাড়ি তার মুখ কাঁদো কাঁদো হবার তো কথা নয় ! সংসার চালাবার উপায়টা হাতছাড়া হয়ে গেছে এটা তার কাছে শুধু বড়োদের দুর্ভাগ্যের কথা, একটা দুর্ঘটনা।

অন্য ব্যবস্থা একটা ওরাই আবার করবে নিশ্চয় ! এ ব্যাপার নিয়ে তার মাথা ঘামাবার কী দরকার ?

মুখ সে ম্লান করতে যাবে কী জন্য ?

গৌরী বলে, আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেল বাবা।

শুনলাম সব।

গোবিন্দ শুকনো ম্লানমুখে বলে, বাহাদুরি করতে গিয়ে একেবারে ডুবিয়ে দিলাম সংসারটাকে।

নরেন তাকে যথারীতি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভুলচুক হয়ে যায় মানুষের—তুমি তো আর বদখেয়ালে দোকানটা নষ্ট করনি, ভালোই করতে চেয়েছিলে।

তফাতটা কী হল ? বদখেয়ালে নষ্ট করলে যা হত, এতেও তাই দাঁড়াচ্ছে। বোকামিও বদখেয়াল বইকী।

নরেন মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে, না, বদখেয়ালে দোকান নষ্ট হলে তোমার কোনো শিক্ষাই হত না—কিন্তু এতে তোমার অভিজ্ঞতা জন্মাল। আস্তে আস্তে তুমিই আবার গড়ে তুলবে।

গৌরী আপশোশের সঙ্গে বলে, আর গড়ে তুলেছে। কী দিয়ে গড়বে? সব জলে দিয়ে এল।

নরেন বলে, যা বেঁচেছে—

গোবিন্দ বলে, পানবিড়ির দোকান দেওয়া যেতে পারে।

তাই নয় দেবে। নয় অন্য কিছু করবে।

হেমেন্দ্র ঘরের ভিতর থেকে তাদের কথা শুনছিল, এবার ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, যা অবস্থা দেখছি চারিদিকে, আশা-ভরসা নেই আর। চাকরি-বাকরি একটা করবে এ আশাটুকু যে করব তাও তো নিজের ঘরেই দেখতে পাচ্ছি। আজ পর্যন্ত নন্দনটার একটা হিল্লে হল না। বুড়ো বয়সে কত দুঃখ আছে আমার পোড়াকপালে।

বলতে বলতে হেমেন্দ্র আবার ঘরে চলে যায়। গৌরী যায় ঘর সংসারের কাজে। গোবিন্দ মুখভার করে অন্যদিকে চেয়ে বসে থাকে।

ছবিরাণীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগের জন্য নরেন অনেকক্ষণ এ বাড়িতে কাটিয়ে দেয়। বৈঠকখানায় একা বসে থাকে মিনিট দশেক। কিন্তু ছবিরাণী গা না করায় কথা বলার সুযোগটা আর ঘটে ওঠে না।

এতক্ষণ খেয়াল করেনি, ক্রমে ক্রমে নরেনের খটকা লাগে যে এ বাড়ির মানুষগুলি তো আগের মতো ব্যবহার করছে না তার সঙ্গে! নন্দনের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই এরা করুক, নন্দনের বন্ধু বলে তাকে কোনোদিন অবহেলার ভাব কেউ দেখায়নি। সেটা বোধ হয় এদের হিসাবেই আসত না। সোজাসুজি অবজ্ঞার ভাব না দেখিয়েও আজ যেন এরা বেশ একটু অগ্রাহ্য করে চলছে তার উপস্থিতিকে।

এদের মন খারাপ বলে?

অথবা তার চাকরি নেই বলে?

কিন্তু দোকানটা গেছে বলে যতই মন খারাপ হোক তাকে তুচ্ছ করার মনোভাবে তো সেটা প্রকাশ হওয়ার কথা নয়।

এ তো ঠিক ম্লানমুখে চুপ করে থাকা নয়!

অগত্যা বিদায় নিয়ে গৌরীর সামনে নরেন ছবিরাণীকে বলে, তুমি যে আর আমাদের বাড়ি যাও না ছবি? উষা তোমার কথা বলছিল।

যাব। উষাকে আসতে বোলো।

কী ভেবে ছবিরাণী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে, আচ্ছা, আমিই যাব আজকে দুপুরবেলা। ঠিক যাব।

দুপুরবেলা ছবিরাণী যে আসবে বলেছে এ কথা সে ইচ্ছা করেই উষাকে কিছু জানায় না।

দুপুরবেলা উষা কাছেই এক বাড়িতে তার সখী তমালের কাছে যায়।

পাড়ার আরও তিন চারটি বয়স্কা কুমারী মেয়েও গিয়ে জোটে—যে যতক্ষণের জন্য পারে। তমালের ঘরে বসে তারা গল্প করে, মেয়েলি আড্ডা বসায়।

বাড়িতে পুরুষ বলতে তমালের বাবা প্রভাত একা, দুপুরে সে থাকে আপিসে। সময় থাকলে দুপুরবেলা মেয়েদের ও বাড়িতে যেতে আসতে তাই কোনো বাড়িতে আপত্তি করা হয় না।

ছবিরাণী যখন আসে প্রতিদিনের মতো উষা আড্ডা জমাতে গেছে, মা ও ঘরে ঘুমিয়ে আছে।

নরেন বলে, আমি জানি তুমি কী বলবে।

তুমি জানতেই পার না। একেবারে অসম্ভব জানা তোমার পক্ষে।

জানি। তুমি বলতে এসেছ যে তাড়াতাড়ি তোমায় বিয়ে দিয়ে পার করার চেষ্টা চলছে—এখন আমি কী বলি।

ছবিরাণী আশ্চর্য হয়ে বলে, বড়দার কাছে শুনেছ ? কিন্তু বড়দার তো জানবার কথা নয় এখনও ! শুধু মা আর দাদুর মধ্যে গোপনে পরামর্শ হয়েছে।

নরেন হেসে বলে, গোপনে পরামর্শ হয়ে থাকলে তুমি জানলে কী করে ? তোমাদের বাড়িতে কারও গোপনে কিছু বলাবলি করার জো নেই, না ? সেদিন তুমি আড়াল থেকে নন্দন আর আমার সব কথা শুনেছিলে !

ছবিরাণীও হাসে।

শুনেছিলাম তো ! আমি কৌতূহল চাপতে পারি না কী করব ? কিন্তু তুমি কী করে জানলে বলো না ?

অনুমান করলাম। সংসারের এই তো রীতি। দোকানটা গেল মানেই সামনে দুরবস্থা, আর হয় তো পারাই যাবে না তোমাকে পার করতে। তার চেয়ে নগদ আর গয়নাগাঁটিগুলি বজায় থাকতে থাকতে চোখ-কান বুজে তোমাকে পার করে দিতে পারলেই চুকে গেল। তারপর কপালে যা থাকে হবে।

আশ্চর্য তো ! মা আর দাদু ঠিক এই কথাগুলি বলাবলি করছিল ! তোমার সাংসারিক বুদ্ধি তো ভারী টনটনে !

টনটনে বুদ্ধি দরকার হয় না। এ অবস্থায় আর পাঁচজনে যা করত তোমার মা আর দাদুও তাই করছে। তুমিই হলে একমাত্র দায় যা ঘাড় থেকে নামানো চলে। অন্য দায় ঘাড়ে থাকবেই—খাওয়াপরা জুটুক আর নাই জুটুক।

ছবিরাণী বলে, ভাবলেও রাগ হয়, কিন্তু রাগ করব না। একটা কথা কিন্তু তুমি বলতে পারনি, পারবেও না। আচ্ছা, আরেকটু জানিয়ে দিই, দেখি বলতে পার কিনা। শুধু আলগা পরামর্শ হয়নি। ব্যবস্থার কথাও হয়েছে। একটি পাত্র আছেন, খুব কম মাইনে হলেও চাকরি করেন। বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো না হলেও একরকম চলে যায়। বোধ হয় চাহিদাও বেশি হবে না। কাজেই বুঝতে পারছ ব্যাপার ? হয়তো এই ফাগুনেই দাদু সব চুকিয়ে দেবে।

ছবিরাণী একটু হাসে। সত্যই হাসে। বলে, এবার ঠিক করে বলো তো আমি কেন এসেছি।

পরামর্শ করতে। আমাকে সব জানিয়ে সাবধান করে দিতে যে, সময় থাকতে ব্যবস্থা কর।

সাবধান করে দিতে এসেছি ঠিক, কিন্তু পরামর্শ করতে আসিনি। আমি কী ঠিক করেছি জানিয়ে দিতে এসেছি।

নরেন আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, কী করবে ঠিক করে ফেলেছ ?

হ্যাঁ। ঠিক করেছি বাধা দেব না।

নরেনের মুখের ভাব দেখে ছবিরাণীর মুখ এবার গম্ভীর হয়, উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন একটু ম্লানও দেখায়।

বলে, অবশ্য তুমি যদি কিছু না কর। তুমি যদি এর মধ্যে চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিতে পার তাহলে তো কথাই নেই—ওখানে কেউ আমাকে ঠেলে দিতে পারবে না। ঠেলে দিতে চাইবেও না। কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যে কিছু করতে না পারলেও তুমি যদি জোর দিয়ে বলতে পার যে দু-তিনমাসের মধ্যে একটা কিছু জোগাড় করে নিতে পারবে, আমি যে করে পারি এটা পিছিয়ে দেব।

নরেন কথা বলে না। নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকে। সে চাউনিতে যে কতরকম ভাব মেশানো !

কিছু বলছ না যে ?

কী বলব ? আমার কিছু বলার নেই। আমার বলার অপেক্ষা না করেই তুমি তো মনস্থির করেই ফেলেছ।

এবার ছবিরাণীর মুখে নেমে আসে একটা থমথমে ভাব।

সে ধীরে ধীরে বলে, দ্যাখো, আমি প্রাণ খুলে আমার কথাটা তোমায় বোঝাতে এসেছি। না বুঝে কিছু ধরে নিয়ো না, রাগ কোরো না। রাগ অভিমান পরে হবে, আগে বোঝাবুঝিটা হোক। আমি কী এটা চাই ? ভাবলেও আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে না ? কিন্তু জানি তো ইচ্ছা করলেই সত্যিসত্যি মরতে পারব না, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতেই হবে।

অমন করে বাঁচার চেয়ে---

ও সব কথা বোলো না। আমি ও সব বড়ো বড়ো কথা জানিয়ো না, বুঝিয়ো না। আমি বাবা একেলে মেয়ে—দেখছি তো সংসারের অবস্থা। উড়োকথায় চিড়ে ভেজে না জানি। একদিন তোমার চাকরি হবেই যদি ভরসা থাকত, মা আর দাদুর সঙ্গে লড়াই করে আমি এটা ঠেকাতাম।

কোনোদিন চাকরি হবে না আমার ?

একটা চাকরিই বড়দার হয় না, তোমার পাওয়া চাকরিটা গেল। আবার কী ভরসা আছে ? এটা যদি ঠেকাই, আমার কী অবস্থা হবে বুঝে দ্যাখো। মা আর দাদার ঘাড়ে পড়ে থেকে লাথিঝাঁটা খেয়ে জীবন কাটবে।

আরও বেশি আহত বা আশ্চর্য হবার ক্ষমতা নরেনের ছিল না। ছবিরাণীরও অবিকল তার বাড়িব লোকের হিসাব—চাকরি পেয়ে তার চাকরি গেছে, তার দ্বারা আর কিছু হবে না !

একটু ঝাঁঝালো হাসির সঙ্গে সে বলে, তবে এটাই লেগে যাক। চাকরে বর পাচ্ছ, ছাড়বে কেন ?

এটা তো রাগের কথা বললে।

রাগ হয়েছে বলব না ? অন্যকথা বলে লাভ নেই, তুমি বুঝবে না।

বোঝাবার চেষ্টা করো না ? কী বলতে চাও বলো, দেখি বুঝতে পারি কি না ?

নরেন বলে, তুমি ধরে নিয়েছ নন্দনের কপালে চাকরি জোটার সামান্য একটু আশা যদিই বা থাকে, আমার বেলা আর কোনো আশা নেই। আমার চান্স আমি পেয়ে গেছি, আর পাব না।

ছবিরাণী শান্তমুখে চেয়ে থাকে।

কত লোকের কাজ নেই জানো ?

অনেক লোকের নেই।

কত লোকের চাকরি গেছে জানো ?

অনেক লোকের গেছে।

সারাজন্মে এরা আর চাকরি পাবে না ? এই অবস্থা চিরদিন বজায় থাকবে ? তোমার ঘটে এটুকু বুদ্ধি নেই যে বুঝতে পার, এ রকম ভয়ানক অবস্থা বেশি দিন আর চলতে পারে না ? এ অবস্থা পালটে যাবেই ?

কী করে যাবে ? কে পালটাবে ?

আমরা পালটাব, যারা কাজ করতে চেয়ে কাজ পাই না। দেশের লোকে পালটাবে, যারা দেশকে ভালোবাসে। এ অবস্থা যারা কোনোমতে মানবে না সইবে না।

ছবিরাণী একটু রাগে।

ঘরের কোণে থাকি বলে কী ভেবেছ এ সব কথা কানে আসে না ? পেটে বেশি বিদ্যে নেই বলে, মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজটাও পড়ি না ?

তাই তো মনে হচ্ছে কথাবার্তা শুনে !

ছবিরাণী আরও রেগে বলে, রাগ কর আর টিটকারি দাও, আমি সব জানি। তোমাদের নিজেদের দোষেই কোনোদিন তোমাদের চাকরি হবে না। চাকরি নেই বলে তোমরা হাঙ্গামা জুড়েছ, চাকরির ব্যবস্থা করতে দিচ্ছ না।

নরেন হেসে বলে, কই, আমি তো কখনও কোনো হাঙ্গামা করিনি ! নিরীহ গোবেচারির মতো আপিসের দরজায় চাকরি ভিক্ষে চেয়ে ফিরছি।

ছবিরাণী এতটুকু দমে না।

এ পর্যন্ত করনি, কাল তুমিও হাঙ্গামা করবে। যে ঝাঁঝ তোমার কথায় ! মনে রেখো, অন্যেরা হাঙ্গামা করছে বলে তোমারও চাকরি হচ্ছে না।

নরেন একটু হেসে বলে, কিংবা হাঙ্গামা না করে চুপচাপ সব সয়ে এসেছি বলেই আমার এই দশা ?

কে জানে ছবিরাণী কী জবাব দিত তার এ কথার, ও ঘর থেকে মা-র প্রশ্ন আসে, কার সঙ্গে কথা বলছিস নরেন ?

ছবি এসেছে।

এ ঘরে পাঠিয়ে দে। উষাটার রোজ দুপুরে বেরোনো চাই, বললেও শুনবে না। মরণ নেই আমার !

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ছবিরাণী নরেনকে মুখ খুলতে নিষেধ করে।

আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম মাসিমা—

বলতে বলতে সে ও ঘরে যায়।

৫

জীবনটার মানে তা হলে কী দাঁড়াল ?

আপনজন বাতিল করেছে।

জোয়ান বেকারকে মানা তাদের পক্ষে অসম্ভব।

বন্ধুরা বাতিল করেছে।

বেকার বন্ধু কথায় কথায় চটে যায়, অপমানিত হয়, কথাবার্তায় রসকষ রাখতে পারে না। আবার টাকাও ধার চায় !

ছবিরাণী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, যে কোনোদিন চাকরি-বাকরি তার আর জুটবে না, হাসিখুশি ছবিরাণীও অগত্যা মুখের হাসি মুছে ফেলে তাকে বাতিল করেছে !

তাকে বাতিল না করে ছবিরাণীরও উপায় নেই।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে এভাবে বাতিল হয়ে, ছবিরাণীর কাছে বাতিল হয়ে নরেন যেন একটা অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া স্বস্তি বোধ করে।

এরা বাতিল করেছে—আর এদের খাতিরে মান-সম্মান মনুষ্যত্ব বাতিল করে চাকরির জন্য কর্তাব্যক্তিদের গেটে গেটে দুয়ারে দুয়ারে ধন্না দেওয়ার তার দরকার হবে না।

নিজেকে বাজে তুচ্ছ অমানুষ মনে করার প্রয়োজন তার ফুরিয়েছে।

সে কারও ধার ধারে না।

ইচ্ছা করলে গায়ের জ্বালায় যে আপিসে থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে আপিসে আগুন ধরিয়ে দিতে গিয়ে সে জেলে যেতে পারে।

কেউ বলতে পারবে না যে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে সে ঝোঁকের মাথায় নিজের খেয়ালখুশিতে জেলে গেল !

ছাঁটাই হয়েছে। বিনা নোটিশে বেকার হয়েছে।

কিন্তু এদিক দিয়ে সে যেন স্বাধীনও হয়েছে।

ইচ্ছা হলেই সে যে কোনো মিটিংয়ে গিয়ে চাকরি দেওয়ার মালিকদের বিরুদ্ধে জোর গলায় জেহাদ ঘোষণা করতে পারে। তার মতো যারা কাজ চায় খাটতে চায় সামান্য মজুরির জন্য, অথচ কাজ পায় না খাটতে পায় না—তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে-ও বলতে পারে, চুলোয় যাক। চুলোয় যাক এ সব লোক আর এ সব লোকের অনিয়ম অব্যবস্থা।

ছবিরাণী যেন শেষ করে দিয়েছে সহ্যের যেটুকু সীমা ছিল। প্রাণের জ্বালা বাড়তে বাড়তে ভয়ানক একটা কিছু করে ফেলার এমন জোরালো তাগিদ সে ভিতরে অনুভব করে যে নরেন বুঝতে পারে, ভদ্র আত্মীয়বন্ধুর এই পরিবেশে থাকলে তাকে পাগল হয়ে যেতে হবে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের এই সমাজের খাপ খাওয়া একেবারেই অসম্ভব তার পক্ষে। প্রতিদিন অপমান সইতে সইতে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ ভয়ানক কিছু করে বসা সত্যই অসম্ভব নয় তার পক্ষে।

তাকে পালাতে হবে এই পরিবেশ ছেড়ে।

গরিবদের মধ্যে, অশিক্ষিতদের মধ্যে, চাষি-মজুরদের মধ্যে, পালিয়ে গিয়ে তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে !

যারা অন্ধকারে থাকে, শুধু সূর্যের আর চাঁদের আলো চেনে, কৃত্রিম আলোয় মিথ্যার সত্যরূপ দর্শন করে বিভোর হয় না—তাদের মধ্যে যেতে হবে। সেখানে কেউ তো তাকে ঘৃণা করবে না অপমান করবে না সে বেকার বলে ! উসকানি দিয়ে দিয়ে তাকে পাগল করে দেবে না।

উপোস করে থাকলেও স্বস্তি আর আত্মমর্যাদা বোধটা তো তার বজায় থাকবে। অন্তত মাথাটা ঠিক রাখতে তো পারবে ওদের সঙ্গে থেকে।

মণ্টুর পরীক্ষা শেষ হওয়ামাত্র তল্পিতল্পা গুটিয়ে মানে মানে ভাড়া-গোনা ঘরটা ছেড়ে দিয়ে দীননাথ সপরিবারে তার দেশ-গাঁয়ের ছেড়ে আসা ভিটেয় ফিরে গিয়েছে।

সেখানে তার বড়োভাই প্রাণনাথ আজও টিকে আছে কোনোরকমে।

এই শহরেই অবশ্য তাকে আরেকটা চাকরি খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু ঘর ভাড়া দিয়ে একটা মাসও তার সকলকে নিয়ে এখানে থাকবার মুরোদ কই ?

মণ্টুর পরীক্ষার জন্য মাসখানেক কাজ যাবার খবরটা বাড়িতে চেপে রেখেছিল। রোজ সকালে যেন দোকানেই যাচ্ছে আগের মতো এমনিভাবে বেরিয়ে গিয়ে দুপুরে এসে নেয়ে খেয়ে আবার বেরিয়ে গিয়ে রাত করে ঘরে ফিরেছে।

খোঁজ করেছে কাজের।

একমাসে কাজের হদিস মেলেনি। আরও একমাসে যে মিলবে তারই বা নিশ্চয়তা কী ?

তার চেয়ে ওদের সকলকে দেশে ভায়ের কাছে রেখে নিজে একা শহরে ফিরে যেখানে হোক থেকে যা হোক খেয়ে কাজের চেষ্টা চালানোই ভালো।

নরেন বলেছিল, যা বলেছ দীননাথ। সংসারের বোঝা নিয়ে কাজের চেষ্টা পর্যন্ত করা যায় না।

সংসারের জন্যেই তো চেষ্টা। একটা পেটের ভাবনা কেউ ভাবে ? এমনি না জোটে চুরি ডাকাতি খুন জখম করে জেলে গেলেই চুকে গেল। সরকার থেকে খাওয়াবে পরাবে।

খাটিয়ে উশুল করে নেবে।

নিরীহ গোবেচারি দীননাথের গলায় সেদিন প্রথম রাগের আঁচ আর জ্বালার ঝাঁঝ টের পেয়েছিল।

খাটতেই তো চাইছি বাবা। প্রাণপণে খেটে খেটে দুটো পয়সা কামিয়েই তো মরতে চাইছি। সকাল থেকে রাততক খেটে আসিনি অ্যাদ্দিন ? খাটতে চেয়েই তো ঘুরে বেড়াচ্ছি কাজ ভিক্ষে চেয়ে। জুটছে কই ?

এ ভাষায় না হোক, নন্দনের মুখে কতদিন যে এই কথাই সে শুনেছে এমনি ঝাঁঝালো সুরে !

মণ্টু ভালো পরীক্ষা দিয়েছে। সে নিজেও নাকি ভাবতে পারেনি প্রশ্নপত্রের এত ভালো উত্তর সে দিতে পারবে। এটাই একমাত্র সান্ত্বনা দীননাথের।

সে জন্যই কি নরেনের মতো অত বেশি ঝাঁঝ ফোটে না দীননাথের গলায় ?

নরেন বলেছিল, আমি একবার তোমার দেশের গাঁয়ে যাব ভাবছি—ক-দিন থেকে আসব কিন্তু।

দীননাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, নিশ্চয় নিশ্চয়—সে তো মোদের ভাগ্যের কথা !

চাকরি হারিয়ে বেকার হয়েও নরেন তার ছেলেকে পড়ানো বন্ধ করেনি, দুবেলা পড়িয়ে তাকে পরীক্ষায় ভালোভাবে উতরে দিয়েছে, এ জন্য দীননাথের কৃতজ্ঞতার যেন সীমা ছিল না।

একেবারে সে কেনা হয়ে গিয়েছিল নরেনের কাছে।

কিছুদিন মণ্টুকে ভালো পাস করানোর জন্য বিনা পয়সায় জিদেব বশে পড়িয়ে কি মায়া জন্মে গেছে নরেনের ?

মণ্টুর জন্য নরেনের মন কেমন করে।

অন্যকথাও সে ভাবে।

দোকানেব সামান্য চাকরি যেতেই দীননাথ দেশে পালিয়ে গেল—গাঁয়ের ভিটেয়। ওই গ্রামে একপুরুষ আগে তাদেরও ভিটা ছিল।

একবার গেলে দোষ কী ?

শহরে দিনের পর দিন মাসের পর মাস চেষ্টা করেও কিছু হচ্ছে না, একটা বেয়ারার কাজ করে যে হাতখরচটা জুটিয়ে নেবে সে উপায় পর্যন্ত তার নেই। গ্রামাঞ্চলে গিয়ে একবার করে দেখলে হয় না জীবিকার সন্ধান ?

দীননাথ বলেছিল, গাঁয়ের মাধ্যমিক স্কুলটা হাইস্কুলে পরিণত হচ্ছে—নতুন কয়েকজন শিক্ষক দরকার হবে। চেষ্টা করে দেখলে দোষ কী ?

শিক্ষকতা না জোটে, চাষবাসের কাজ করতে পারে কিনা পরীক্ষা করে দেখবে।

নয় চাষিই সে বনে যাবে।

ছবিরাণীর দায় তো আর নেই !

কিন্তু হায় রে বেকারের কপাল ! গরিবদের মধ্যে গিয়ে একটা মাস গরিব হয়ে কাটাতে গেলে সামান্য যা পয়সা লাগে, তাও তার নেই।

আমায় পাঁচটা টাকা দেবেন ?

সোজা জবাব আসে, না। টাকা নেই।

তারপর আসে তাকে পাঁচটা টাকা দিতে না পারার বাস্তব তিক্ত ব্যাখ্যা—এগারো টাকার মতো আছে। কাল সাড়ে-সাত টাকার মতো রেশন আনতে হবে। তোমায় পাঁচ টাকা দিলে রেশন আনা যাবে না।

চাকরি খুইয়েও মণ্টুকে সে পড়াচ্ছিল বলে আরও বেশি রাগ হয়েছিল বাড়ির সকলের।

ঝাল ঝাড়বার সুযোগ জুটছিল না।

ছেলেপড়ানোর কাজও কী করতে পার না ? দুটো পয়সা আসে ?

জুটিয়ে দিন না ! একটা বেয়ারার কাজ পেলে এখুনি নিয়ে নিই, টিউশনি খুঁজছি না ভাবছেন ?

তারিণী তখন আর কিছু বলেনি।

ছেলেব চাকরির জন্য সে-ও প্রাণপণে চেষ্টা শুরু কবেছিল, এবার একটা টিউশনি জুটিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল।

রবিবার সকালে বাইরে থেকে বাড়ি ফিরেই তারিণী বলে, ভূপেশবাবুকে ধরেছিলাম, উনি তোমায় রাখতে রাজি হয়েছেন। সকাল বিকাল এক ঘণ্টা করে ছেলে আর মেয়েকে পড়াবে। ওঁর সঙ্গে আজকেই দেখা করে কথা বলে সব ঠিক করে আসবে।

কত দেবেন ?

পনেরো টাকা ?

দু-বেলা পড়িয়ে পনেরো টাকা ?

ছোটো ছেলেমেয়ে তো—নীচের ক্লাসে পড়ে। ওর বেশি দেবে না। এখন এতেই লেগে যাও, আবোগা তো খুঁজতেই হবে।

ভূপেশবাবুর না মাস্টার ছিল ?

ওকে রাখবেন না।

ভূপেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে তাকে ওই প্রশ্ন করলে সে বলে, হ্যাঁ, মাস্টার আছে—ভালো পড়ায় না। দশ টাকায় পড়াচ্ছিল—আই এ ফেল। আমি ভাবলাম পাঁচ টাকা বাড়িয়েই দি, পাস করা একজন ওদের পড়াক।

মনটা খুঁতখুঁত করে নরেনের। তাব জন্য একজনের কাজ যাবে !

সে-ও হয়তো তারই মতো বেকার। হয়তো এই দশটা টাকার টিউশনিটাই তার একমাত্র অবলম্বন।

কিন্তু সে কাজটা না নিলে কি কোনো উপকার হবে ও বেচারার ? ভূপেশ পাস করা মাস্টার চায়। আরেকজন পাস করা বেকারকে সস্তায় পেলেই ভূপেশ ওকে বিদায় করে দেবে।

হরিপদ তার আসন্ন বিপদের খবর পায় তার ছেলেমানুষ ছাত্রছাত্রীর কাছে। বাড়িতে মাস্টার বদলের আলোচনা শুনে তাদের মন খারাপ হয়ে গেছে। ন-বছরের উমা বলে, আপনিই থাকুন মাস্টারমশাই ? আপনার কাছে পড়তে ভালো লাগে।

তোমার বাবা না রাখলে কী করে থাকব ?

তারা ম্লানমুখে ছলছল চোখে চেয়ে থাকে !

রাত্রে হরিপদ নরেনের কাছে যায়। কোনো ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলে, এটা কী আপনার উচিত হচ্ছে দাদা ? নিজেকে নিচু করে একজনের চাকরি খাওয়া ?

হরিপদর বয়স তার চেয়ে অনেক কম। বোধ হয় দু-একবছরের মধ্যেই আই এ ফেল করে পড়া ছাড়তে হয়েছে।

নরেন বলে, আমার কী দোষ বলো ? ছেলেমেয়ের জন্য ভূপেশবাবু বি এ পাস মাস্টার চান।

চান বলেই আপনি যাবেন ? গ্র্যাজুয়েট হয়ে পনেরো টাকায় দুবেলা পড়াতে রাজি হয়ে আমার চাকরিটা খাবেন ? উচিতমতো বেতন দিত, আপনি পড়াতেন, আমার কিছু বলার থাকত না। আপনি গ্র্যাজুয়েট হয়েও এত সস্তায় যাচ্ছেন বলেই তো আমাকে তাড়াচ্ছে।

তুমিও তো সস্তায় পড়াচ্ছ—দশ টাকায় দুবেলা।

আমার বয়স কম, আই এ ফেল করেছি, আমার কথা আলাদা। আপনার মতো কোয়ালিফিকেশন থাকলে আমি তিরিশের এক পয়সা কমে দুবেলা পড়াতে রাজি হতাম মনে করেছেন ?

এ কথার লাগসই জবাব নরেন খুঁজে পায় না। সত্যই সে নিজেকে সস্তা করেছে। বি এ পাস করে দুবেলা পনেরো টাকায় ছেলে পড়ানো সত্যই অপমানের কথা। কিন্তু তার যে উপায় নেই।

সে তাই বলে, সে নয় বুঝলাম। কিন্তু আমি রাজি না হলে তোমার কী লাভ আছে কিছু ? ভূপেশবাবু আরেকজনকে নেবেন।

হরিপদ সঙ্গে সঙ্গে বলে, কেউ রাজি হবে না। এমনিতেই তো অল্প মাইনে দেয়, কিন্তু তারও তো একটা মোটামুটি রেট আছে—কীরকম মাস্টারকে কত দিতে হবে ? আপনি পনেরো টাকায় দুবেলা পড়াচ্ছেন জানলে পাড়ার যত বাড়িতে মাস্টার আছে তারা আপনাকে গালাগালি দেবে না ?

একটু থেমে হরিপদ আবার বলে, আপনারও তো একটু আত্মসম্মান বোধ আছে !

আছে কী আত্মসম্মান ?

তার মতো অবস্থার বেকাবের কী আত্মসম্মান থাকে ? না থাকা উচিত ?

হরিপদব ওই কথাটাই তাব বারবার মনে পড়ে—যতই সামান্য হোক গৃহশিক্ষকদেব বেতন—তারও একটা মোটামুটি মান বাঁধা আছে, তার কমে কেউ ছেলে পড়ায় না।

এ নিয়ম ভাঙলে, বিশ্বাসঘাতকতা করলে পাড়ার মাস্টারবা তাকে টিটকাবি দেবে, গালাগালি করবে !

এত অন্যায়-অবিচারের মধ্যেও তবে নিযম ও নীতি আছে ?

নরেন ভাবে। ইতস্তত করে৷

একটু ইতস্তত করেই তার মাথায চড়ে যায আগুন। নিজেকে সে ধিক্কার দেয়।

সে না মরিয়া হয়ে ভয়ানক কিছু করে ফেলার কথা ভাবে ? জেলে যাবার কথা ভাবে ? এই কী তার নমুনা ! এই সামান্য একটা বিষয়ে মনস্থির করতে, মনটা শক্ত করতে, তাকে এত ভাবতে হয়।

আগে সে যায় ভূপেশের কাছে। জানিয়ে দেয় পনেবো টাকায় সে দুবেলা তার ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারবে না।

ভূপেশ বলে, এই রাজি হয়ে গেলে—এই আবার বলছ পারবে না ? একটা কথারও কি ঠিক থাকে না তোমাদের ?

এত সস্তায় কিনতে চাইলে কী করে কথা ঠিক রাখি বলুন ? সস্তা মানুষের কথা সস্তা হবে না ?

বাড়ি ফিরেই সে তারিণীকে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়।

তারিণী রেগে বলে, পনেরো টাকা ! পনেরো টাকাই বা তোমাকে দিচ্ছে কে শুনি ? বিড়ি কেনার পয়সা তোমাকে হাত পেতে চেয়ে নিতে হয় মনে থাকে না ?

আর চাইব না।

তারিণীর গলা চড়ে যায়।

চাকরি জুটিয়ে দিলে যে চাকরি রাখতে পারে না, একপয়সা যার রোজগার করার ক্ষমতা নেই—

নরেনেরও গলা চড়ে।

ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। আমাকে রোজগার করতে না দিলে কী করব ?

সূচনা দেখেই অনুমান করা গিয়েছিল, আজ প্রলয় ঘটে যাবে বাপ-ব্যাটার মধ্যে। কিন্তু নরেন বেশি দূর গড়াতে দেয় না ঝগড়াটা, কথা-কাটাকাটি কুৎসিত গালাগালিতে পরিণত হয়ে ওঠার আগেই সে ঝগড়া থামিয়ে দেয়।

শান্ত ও সংযত হয়ে বলে, আমি আপনার বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। চাকরি জোটাতে পারলে ফিরব কিনা বিবেচনা করা যাবে।

ছেলের আকস্মিক দিক পরিবর্তনে এবং বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণায় তারিণী প্রথমটা থতোমতো খেয়ে যায়।

তারপরেই গর্জে ওঠে, বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড ! নিশ্চয় তুই কোথাও চাকরি জুটিয়েছিস। নইলে কাল টিউশনি নিবি ঠিক করে আজ মত পালটাস—বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি বলিস !

চাকরি জুটিয়েছি ? যেমন হোক একটা চাকরি জোটাতে পারলে তো সব হাঙ্গামা চুকেই যেত !

কিছু একটা না জুটে থাকলে কোন সাহসে তুই বাড়ি ছাড়ার কথা বলিস ? কোথায় থাকবি, কী খাবি ?

নরেন বলে, আপনার এখানে থাকার চেয়ে না খেয়ে মরাও ভালো। কেন আমি চলে যাচ্ছি, ভালো করে ভেবে দেখবেন।

সেদিন জামাই অশোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে তারিণী যেভাবে আর্তনাদ করে উঠেছিল আজও ঠিক সেই রকম আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠে, আমি কী করেছি তোর, যে বুড়ো বয়সে আমায় শাস্তি দিচ্ছিস ? চাকরি খুইয়েছিস বলে খেতে পরতে দিই না তোকে ? হাতখরচা দিই না ? তোর জন্যে চাকরির চেষ্টায় দিনরাত—

তারিণী হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে !

নরেন নির্বিকারভাবে চেয়ে থাকে।

যথারীতি সকলেই এসে জুটেছিল, এতক্ষণ কেউ কথা কইতে সাহস পায়নি।

এবার মা বলে, তুই বড়ো নিষ্ঠুর নরেন। বকাঝকা যদি দিয়ে থাকে, তোর ভালোর জন্যই কী দেয়নি ?

তারিণীর কান্না নরেনকে আরও শান্ত, আরও সংযত করে দিয়েছিল।

সে বলে, তা দিয়েছে বইকী ! বাপ যে ছেলের মন্দ চায় না, আমি তা জানি। কিন্তু এ রকম অবুঝের মতো ভালো চাওয়ার রকমটা এবার বদলাতে হবে। বুঝে শুনে ভালো চাইতে হবে। ছেলের যেটা দোষ নয় বরং গুণের কথা সে জন্য ছেলেকে দোষী করা চলবে না, গালমন্দ করা চলবে না।

ঊষা মুখ বাঁকায়। যার সোজা মানে এই যে, একটা কাজ জুটোবার মুরোদ না থাকলেই লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়ার মুরোদ হয় মানুষের !

কিন্তু মুখ যে সে বাঁকায় নিছক অভ্যাসের বশে, নরেন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে শুনে সে-ও যে রীতিমতো ভড়কে গেছে, সেটা বোঝা যায় তার কথা শুনে।

সে বলে, সেকেলে বি এ পাস মুখ্যু বাপ নয় কিছুই বোঝে না, একেলে বি এ পাস পণ্ডিত ছেলের উচিত তো তাকে বুঝিয়ে দেওয়া ! আমারও মনে হচ্ছে তুমি যেন ঠিক কথাই বলছ! কিন্তু মনে হলেই তো হবে না ! ভালো করে একটু বুঝিয়ে না দিলে কী বলছ তা তো বুঝতে পারবে না ! জগৎসংসার পালটে গেছে সবাই এটা জানে। মা-বাবা যে রোজ দশবার বলে এটা ঘোর কলিযুগ—তার মানে তো কই বোঝ না তুমি ? মা-বাবা তো বলছেই যে আগের যুগ নেই, নতুন যুগ হয়েছে। মুখ্যু মা-বাপকে তো বুঝিয়ে দেবে এটা কলিযুগ নয়, নতুন যুগ, সত্যযুগের চেয়ে ভালো যুগ ? বুঝিয়ে

বলার মুরোদ নেই নিজের কথা, রাগ করে বাড়ি ছেড়ে মা-বাপের মনে কষ্ট দেবার গোঁয়ার্তুমি আছে ষোলোআনা।

বোনের তিরস্কারে নরেন মাথা হেঁট করে না, স্তব্ধ হয়ে থাকে।

ছেলেমানুষ বোনটার সহজ সমালোচনায় তার আত্মসমালোচনার সংকীর্ণতা ও অসার্থকতা যেন ধরা পড়ে গিয়েছে তার কাছে।

উষা যে রোজ দুপুরে তমালের ঘরে সমবয়সি মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যায়, কারও পেটে স্কুলের সামান্য বিদ্যা ছাড়া বেশি কিছু না থাকলেও তারা যে জীবন ও জগতের নানাবিষয় নিয়ে এলোমেলো উলটো-পালটা কথা বলাবলির মধ্যে নিজেরা বুঝবার চেষ্টা করে, নতুন যুগের বড়ো বড়ো ব্যাপারগুলি—এটা একেবারেই জানা ছিল না নরেনের।

জানা থাকলে সে বুঝতে পারত উষার পক্ষে কী করে সম্ভব হল মেয়েলি লেকচার ঝেড়ে তাকে স্তব্ধ করে দেওয়া।

ভাবনাচিন্তা করার সময় ছিল না। নরেন হৃদয়ের নির্দেশ মেনে নিয়ে উষাকে বলে, আমি রাগ করে চলে যাচ্ছি না। রাগ তোরাই করিস, বুঝবার চেষ্টা করিস না।

রাগ না হলে চলে যাচ্ছ কেন ? তোমায় তো কেউ তাড়িয়ে দেয়নি বাড়ি থেকে ?

এ অবস্থায় বাড়িতে থাকা উচিত নয় বলে চলে যাচ্ছি। রাগ হলে শুধু ঝগড়া করেই চলে যেতাম। চাকরি তো আমি একলা করছিলাম না, অন্য যারা করছিল তাদেরও মা-বাপ ভাইবোন আছে। নিজের কথা ভাবতে গেলেই ওদের কথা ভাবতে হবে। একজন ছাঁটাই হলে যদি আমরা সবাই চুপচাপ থাকি—তার মানে কী দাঁড়ায় জানিস ? যাকে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা ছাঁটাই কর, আমরা যারা ছাঁটাই হইনি তারা সবাই চুপ করে থাকব। এটা কী মানা যায় ? সহ্য করা যায় ?

একজনকে বিনা দোষে ছাঁটাই করলে তাই আমরা সেটা ঠেকাবার চেষ্টা করলাম—তেরোজন ছাঁটাই হলাম। তোমাদের বুঝতে হবে, মানতে হবে, এটা আমার দোষ নয়—গুণ। এটা আমার বোকামির পরিচয় নয়, বুদ্ধির প্রমাণ !

তারিণীর কান্না থেমে গিয়েছিল নরেনের মা মুখ খুলতেই। কান পেতে সে শুনছিল মেয়ে ও ছেলের কথা।

এবার সে মুখ খোলে, একজন ছাঁটাই হলে—

বিনা দোষে ছাঁটাই হলে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথাই বলছি আমি। একজন বিনা দোষে ছাঁটাই হলে হাঙ্গামা করাটা তোমরা ভালো ভেবেছ—আর কাউকে ছাঁটাই করতে সাহস পাবে না। কিন্তু একজনের ছাঁটাই ঠেকাতে তোমরা তেরোজন যে ছাঁটাই হয়েছ, কিছু করতে পেরেছ সে জন্য ? ঘরের ভাত খেয়ে খেয়ে তেড়িবেড়ি করা ছাড়া ?

অজ্ঞতাটা প্রকাশ পায় তারিণীরই কিন্তু সে জন্য নরেন নিজে লজ্জা বোধ করে। সে শুধু ঝগড়াই করেছে বাপের সঙ্গে যে, সে একলা নয়, আরও তেরোজন চাকরি হারিয়ে বেকার হয়েছে তার সঙ্গে—এ আরেকটা খবর বাপকে জানানো সে দরকার মনে করেনি যে তেরোজনকে বরখাস্ত করার জন্য আজ তিন মাস সাড়ে সাতশো লোকের চাকরি করা বন্ধ। আপিস বন্ধ, কারখানা বন্ধ। তেরোজনকে চাকরি না দিলে কেউ তারা আপিসে চাকরি করবে না কারখানায় খাটবে না—দরকার হলে না খেয়ে মরবে। এ সব কথা কিছুই সে জানায়নি তারিণীকে। ধরে নিয়েছে যে তারিণী সব জানে, সব জেনেও চাকরি হারানোর জন্য তাকে গঞ্জনা দেয়।

নরেনের লজ্জাবোধটা কিন্তু বড়ো তাড়াতাড়ি পরিণত হয়ে যায় রাগে। কেন তারিণী এমন অজ্ঞ হবে ? এতবড়ো গুরুতর ব্যাপার সম্পর্কে কোনো খবর রাখবে না ?

একটা যেন সুযোগ জুটেছে, অজুহাত জুটেছে ঝগড়া করবার।

নরেন ঝিমিয়ে গিয়েছিল, এবার হঠাৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, রাগ করব না ? সাত-আটশো লোক কাজ বন্ধ করল, আপিস বন্ধ হল, কারখানা বন্ধ হল,—বাবা খালি বলছেন, তুই কেন চাকরি হারালি। ওদের সঙ্গেই তো চাকরি করব আমি ? না একলা সকলের বিপক্ষে দাঁড়াব ?

তারিণী বলে,—এ কথাটা তো তুমি বাপু জানাওনি আমায় ! তোমার চাকরি যাবার পর তিন-চারবার তোমার আপিসে গিয়েছি দেখেছি দিব্যি সবাই চাকবি করছে।

কিছুদিন সময় লাগবে না ? স্ট্রাইক হয়েছে পরের মাসে পয়লা থেকে।

মা বলে, যাক গে যাক, ও সব বোঝাপড়ার ব্যাপার যাক। তুই বাপু মাথা ঠান্ডা রাখো।

মাথা ঠান্ডা বাখার জন্যেই আমি আজ চলে যাচ্ছি।

আর আসবি না ?

আসব বইকী !

উষা বলে, একটু সোজা স্পষ্ট ভাষায় বলো না কোথায় যাবে, কী করতে যাবে ?

তিলককণ্ঠী আর গেরুয়া কাপড় পরা অর্ধউলঙ্গ ঠাকুর্দার তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে উদাসভাবে নরেন বলে, চাকরির চেষ্টায় মাসখানেক ঘুরে বেড়াব ভাবছিলাম। তারপর সে সোজাসুজি তারিণীকে বলে, আমায় পাঁচটা টাকা দেবেন ?

চাকরির চেষ্টায় বেরোবে ? দাঁড়াও, দেখি।

পাঁচটা টাকা চেয়েছিল, দশ টাকার নোট হাতে গুঁজে দেয়।

বলে, সাবধানে থেকো, মাঝে মাঝে পোস্টকার্ডে কুশল দিয়ো।

পোস্টকার্ডে কুশল দিতে বলার মানেই পোস্টকার্ড আর খামের দামের তফাতকে মর্যাদা দেওয়া।

দীননাথের দাদার নাম প্রাণনাথ। মা-বাবা প্রাণের চেযে ভালোবাসত। কিন্তু সে জন্য বোধ হয় নয়। তারা কী আব জানত যে ছেলেকে তারা প্রাণেব চেয়ে ভালোবাসে ? বিদ্যাসাগর মশায়ের দ্বিতীয় ভাগের প্রায় তিন ভাগ বিদ্যা ছেলেবেলা পেটে গিয়েছিল বলেই বোধ হয় যাদব ছেলের জিভ জব্দ করা, দাঁতভাঙা নাম বেখেছিল প্রাণনাথ—যদু, মধু, পাঁচু, হাঁদা ইত্যাদি এত সহজ সহজ নাম রাখবার প্রথাটা চালু থাকতেও।

বাপের বিদ্যা ফলানো কোনো কাজেই লাগেনি প্রাণনাথেব। কেউ ভুলেও তাকে প্রাণনাথ বলে ডাকে না। নিজেও সে এক রকম ভুলে গেছে তাব ও রকম একটা ভালো নাম, আসল নাম, দেওয়া হয়েছিল।

সবাই তাকে পরাণ বলেই ডেকে আসছে চিরকাল। সেই দুঃখেই কি প্রাণনাথ নিজের ছেলের আরও বেশি জমকালো নামকরণ করেছিল—জগদীশ্বর ? কিন্তু সেও দশজনের কাছে এবং নিজের কাছে পরিচিত হয়ে আছে জগা নামে !

পরাণ রোগে শয্যা নিলে তেরো বছর বয়সে নাথুপুরের কারখানার বাতি লণ্ঠনে লাগাবার কাজে ভর্তি হবার সময় সে নিজেই নিজের নাম দাখিল করে—জগা !

নাম কী লিখব রে ?

জগা লেখেন।

আরে শুয়ার, তোর নাম জগা তা জানি। পদবিটা বল ?

পদবি— ? পদবি ? পদবি লেখেন গুঁই।

নিজের জগদীশ্বর নামটা ঘোষণা না করে সে বোধ হয় মোটা কালো প্রণবেশ্বরের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

ভবেশ্বরবাবুর সুপারিশে রং মাখার কাজে অ্যাপ্রেন্টিস ভর্তি হতে এসে সে যদি বলত যে নাম তার জগদীশ্বর গুঁই, প্রণবেশ্বর চক্রবর্তী বোধ হয় হাসির চোটে ভুঁড়ি ফেটে মারা যেত।

বাড়িতে ঢুকে সবার আগে নরেনের চোখে পড়ে পরাণের একলা থাকার খুপরি ঘরটা।

সমস্ত বাড়িটা সকলকে ছেড়ে দিয়ে সে গোয়ালঘরের কোনায় হাত দুই চওড়া হাত পাঁচেক লম্বা এই খুপরিটা বানিয়েছে।

সারাদিন সে ওখানে পড়ে থাকে।

মাঠে গিয়ে চাষবাসের কাজ করার তার ক্ষমতা নেই। কোনো কাজ করারই ক্ষমতা নেই।

দুটি হাতই তার আধখানা করে কাটা। তেভাগাব হাঙ্গামার সময় ওই দুহাতে লাঠি ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে যাবার ফল।

তার ওই দিবারাত্রি থাকার খুপরিতে তিনটে কাঠের তাক।

উপরের তাকে ছোটোবড়ো নানাআকারের মাটির ভাঁড় আর সরা—চুন কালি আর ওই রকম সাধারণ ঘরোয়া রং দিয়ে বিচিত্র রকমে চিত্রিত করা। হাত থাকতে পরাণ নিজের হাতে এগুলি চিত্রিত করেছিল। প্রত্যেকটি ভাঁড় আর সরার গায়ে যেন তার চাষাড়ে মোটা হাতের স্মৃতিচিহ্নের আলপনা আঁকা।

মাঝের তাকে কয়েকটা বই আর পুঁথি। বই বলতে বাপের আমলের রামায়ণ মহাভারত আর ব্রতকথা পাঁচালির প্যামফ্লেট। সবগুলিই জীর্ণ পুরানো হয়ে গেছে। চাঁপা নিয়মিতভাবে পাড়ার মেয়েদের এইগুলি পড়ে শোনায় বলেই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশবছর বইগুলি টিকে আছে।

যে সব বই ঘাঁটাঘাঁটি হয় সে সব বইতে উই ধরে না !

নীচের তাকে কিছুই নেই।

শুধু সিঁদুর লেপা একটি ফটো। আস্ত বাতাসা একটাও নেই, ধুলোর মতো একটুখানি বাতাসার গুড়ো। দু-একটা সস্তা জবা গাঁদা শিউলি ফুল।

এই তাকের সামনে যোগাসনে বসে পরাণ রোজ সকালে বিকালে ঘণ্টা তিনেক কাটিযে দেয়। মাঝে মাঝে দু-একটা পুঁথি নিয়ে পড়ে।

বাড়ির লোক তাকে খেতে ডাকতে সাহস পায় না।

কে জানে ? হয়তো ধ্যানভঙ্গ হলে পরাণ খেঁকিয়ে উঠবে।

কোথাও কিছু নেই পরাণ গর্জন করে ওঠে, একছিলুম তামাকও তোরা দিতে পারিস না ?

হয়তো বেলা দুপুর, পেটে খিদে নিয়ে ভাতের বদলে পরাণ তামাক চায়। বাড়ির লোকে তার ধাত জানে—খাওয়ার কথা না বলে তাড়াতাড়ি তামাক সেজে দেয়।

জগা বা চাঁপারা নরেনকে চিনতে পারে না। কিন্তু নরেনকে দেখেই পরাণ বলে, চিনেছি গো, চিনেছি। জগা তুমাকে চিনলে না ? তা চেনাচিনির কারবার তো চুকিয়ে দিয়েছে তুমার বাবার বাবা, তিরিশ বছর আগে। তুমি হঠাৎ এলে কেন ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরছে বাবা।

দীননাথ বলে, মণ্টুকে পড়াতেন, একবার আসবেন বলেছিলেন।

পরাণ হাসে।

মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পনেরো-বিশদিন কামায়নি—মাসে একবারই সে কামায়।

তবু সমস্ত মুখটাই যেন তার হাসে।

এসেছ বেশ করেছ। হাজারবার এসবে। বড়ো দুরবস্থা কিনা তাই বলছিলাম কী, তেমন আদর খাতির চেয়ো না কিন্তু। সে দিনকাল নেই। ঠাকুদ্দা ফি বছর দশসেরি রুই দারোগাবাবুকে নজর দিত। বিল পুকুরে দুসেরি একটা মাছ মেলে না আজকাল।

দারোগাবাবুকে নজর দিতেও হয় না তো আজকাল।

হয় না ? আগে ছিলেন দারোগাবাবু, আজকাল কত রকমের কত যে বাবু হচ্ছেন ঠিকানা আছে ? তবে হ্যাঁ, সবার জন্যে দশসেরি রুই লাগে না।

মুখে যাই বলুক, পরাণ যথাসাধ্য অতিথিকে সমাদর করার আয়োজন আরম্ভ করে—অসাধ্য-সাধনের চেষ্টাও করে।

নরেনের বাবা যখন বছরে পূজাপার্বণ উপলক্ষে অন্তত কয়েক দিনের জন্য দেশের বাড়িতে আসার প্রথাটা পালন করে চলত, তখনও পরাণের যে পরিমাণ জমি ছিল, আজ তার সিকিও নাই ! যে পরিমাণ জমি ভাগে নিয়ে চষত, আজ তার সিকিভাগ পায় না।

জমি নিয়ে নিয়েছে বর্গাদার। অর্ধেকের বেশি নিজে খেতমজুর দিয়ে চাষ করায়।

কিন্তু তারিণীর ছেলে দুদিনের জন্য বাড়িতে এসেছে। খেয়ালের বশেই আসুক আর যে জন্যই আসুক, দরকার হলে বাড়ির সকলের দু-চারদিন উপোস করেও তাকে খানিকটা সমাদর করতে হবে।

নরেন টের পেয়েই ঝোলানো থলিতে সামান্য তল্পিতল্পা গুটিয়ে, সুজনিটা ভাঁজ করে বগলে নিয়ে বলে, আমি বাবু বিদায় হলাম।

পরাণের মেজোছেলে জেল খাটছে জমির ব্যাপার নিয়ে জমিদারের গুন্ডা লেঠেল আর পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা করার অপরাধে।

জগা অতিকষ্টে সামলে গেছে।

জগা বাঁশের লাঠিটা বাগিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখে একগাল হেসে বলে, বললেই হল বিদেয় হলাম ? অপরাধটা কী করেছি বলতে হবে তো ? চাষাভুসো মানুষ—মুশকিলে মুশকিলে মাথা-টাথা তায় আবার গুলিয়ে আছে। তা, বুঝিয়ে বললেও কী বুঝব না, ঘাট হল কীসে ?

নরেন বলে, ঘাট বইকী ! বাপদাদার ভিটে দখল নিয়েছে জ্ঞাতি খুড়োরা, তাই বলে গিয়ে উঠলে কী আদরযত্ন কম করত ? মাছ দুধ কম খাওয়াত ? পরাণ খুড়োর ঘরে কেন উঠলাম যদি না বুঝে থাক—

বলতে বলতে নরেনের খেয়াল হয় সে ভাষা ভুলে গেছে,—গেঁয়ো আর গরিব বিপন্ন চাষিদের সঙ্গে কথা বলার ভাষা !

সে বোঝে, জগার তেল পাকানো মোটা বাঁশের লাঠি বাগিয়ে রুখে দাঁড়ানোটা খাতিরেরই একটা প্রতীক, গটগট করে চলে গেলে সত্যসত্যই কী আর সে মাথায় তার লাঠি বসিয়ে দেবে অপমানে !

হয়তো নিজের মাথাতেই লাঠির একটা ঘা বসিয়ে বলবে, ধেত, মোদের জম্মো বৃথা ! যদি বা এল এ জনা, মন বুঝে রইতে দেবার বুদ্ধিটুকু ঘটে গজাল না। অবমান হয়ে রেগে চলে গেল !

সে বোঝে। কিন্তু জগা যেমন মিছামিছি লাঠি বাগিয়ে ধরে হাসিমুখে পরিষ্কার করে বুঝিয়েছে তার কথা, সে কিন্তু নিজের মিছামিছি থলি গুছিয়ে বিদায় নিতে চাওয়ায় আসল মানেটা ওকে বোঝাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না !

গেঁয়ো হোক অসভ্য হোক সমস্ত পরিবারের পক্ষ নিয়ে জগার এই প্রতিবাদের কোনো সরল সহজ জবাব খুঁজে না পেয়ে অগত্যা সে কাব্যিক ভাষা আশ্রয় করে।

মেয়েরা পর্যন্ত খিড়কিতে গোয়ালে শূন্য জীর্ণ ধান বোঝাই করার পুরানো গোলাটার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে, চেয়ে আছে স্থির উৎসুক দৃষ্টিতে। তাদেরও যেন জিজ্ঞাসা : শহর থেকে হঠাৎ আপন হয়ে কেন এলে বাবু ? আপন করতে চাইলাম বলেই রাগ করে কেন চলে যাচ্ছ।

দীননাথ বা মণ্টু মুখ খোলে না, একটি কথা বলে না। এখন মুখ না খোলাই সব চেয়ে ভালো পন্থা !

কাব্য ছাড়া গতি নেই।

নরেন বলে, প্রাণে বড়ো আঘাত লেগেছে জগাদাদা।

জগাদাদা !

চাষি মেয়েপুরুষ ক-টা চমকে ওঠে !

জগা হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ফাঁকা গোয়ালটার দিকে। মুখের হাসিটা সে আগেই নিভিয়ে দিয়েছিল ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নেভানোর মতো !

হাতজোড় করে বলে, কী অপরাধটা হল মোদের ?

নরেন তখন হিসাবনিকাশ কাব্য-কবিতা সব ভুলে বলে ওঠে, হাতজোড় করছ কেন ? তামাশা করছ কেন ? আমি কী দারোগা না নায়েববাবুর পেয়াদা এসেছি তোমাদের ঘরে ? একটু প্রাণের জ্বালা জুড়োতে এলাম তোমাদের কাছে, তোমরা খালি দূর দূর করছ—বাবু এয়েছেন, বাবুকে খাতির কর—শহরের বাবু এয়েছেন, বাবুকে খাতির কর। আমি এলাম একভাবে—

নরেন থেমে যায়। সে কেন এসেছে, কী ভেবে এসেছে, কী চেয়ে এসেছে এদের বোঝানো কি সম্ভব তার পক্ষে ?

কিন্তু তার নিরুপায় প্রাণের জ্বালার ভাষাটা বুঝে যায় সকলেই।

জগা হাত চেপে ধরে নরেনের।

বলে, ভাই, হঠাৎ কেন আসেন, হঠাৎ কী বলেন, বুঝে উঠতে পারি কী ? কেউ পারে ? জীবন মরণ সমস্যা দাঁড়িয়েছে—পাঁচ-দশবছর বাদে মোরা শেষ হয়ে যাব কি না কে জানে, বলেন ?

পরাণ বলে, জগা, বাবুকে যেতে দে। শহরে ফিরে গিয়ে যা খুশি বলুন মোদের নামে। গেরাহ্য করি নে কো।

জগা গর্জন করে ওঠে, চুপ করো দিকি বোকাহাবা ? জমিগুলো খুইয়ে দিলে বাবুদের সাথে ভালোমানষি করে। কিছু বুঝবে না। শুনবে না, ফপরদালালি করে সব গোল্লায় দেবে।

পরাণ দমে যায়। ছেলের কাছে এমন ধমক—তাও আবার দীননাথের সামনে তারিণীর ছেলের সামনে !

উঠানে নেমে এসে সে সবিনয়ে নরেনকে বলে, যাবেন কেন, থাকেন না ? কষ্ট পাবেন, তবু থেকে যান। মোরা কী অবস্থায় আছি—

জগা ধমকের সুরে বলে ওঠে, চুপ করো দিকি। মোরা কী অবস্থায় আছি জানতে কী এসেছেন ? বাবু জ্বলছেন নিজের প্রাণের জ্বালায়। একটু জুড়োতে এসেছেন মোদের কাছে। তুমি শুরু করে দিলে নিজের গাউনি।

নিজে তার কাঁধ থেকে তল্পিতল্পার থলিটা নামিয়ে নিয়ে, হাত ধরে তাকে দাওয়ার দিকে নিয়ে যেতে যেতে জগা হাঁক ছাড়ে—চাটাইটা দাওয়ায় বিছিয়ে দাও কেউ।

চাটাইয়ে বসে নরেন শান্তগলায় বলে, তুমি ভাই ধরেছ ঠিক। প্রাণের জ্বালা জুড়োতেই এসেছি। তা দেখছি কী, তোমাদের প্রাণেও জ্বালা বড়ো কম নয়।

জগা মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

জগার বউ চারু ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে কথাগুলি শোনার জন্যই দুয়ারের কাছে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ঘোমটার আধঢাকা মুখ তুলে সে নরেনের দিকে একবার তাকায়। ঘোমটা একটু টেনেছে কিন্তু পরনের কাপড়খানা আর পরবার মতো নেই—কোনোমতে কাজ চালানো।

নরেন আরও কিছু বলে কি না শোনবার জন্যই সে বোধ হয় একটু অপেক্ষা করে।

নরেন যেন নিজের মনেই বলে, ভালোই হল এসে। জ্বালা মেলাতে গিয়ে প্রাণে প্রাণে মিল হবে।

জগা বলে, মিল বরাবর রয়েছে প্রাণের—জ্বালাটা তফাত ধরে নিই বলেই তো এত ভুল বোঝাবুঝি।

তা মন্দ বলনি। তবে পেটের জ্বালা এবার সব জ্বালা একাকার করে দিচ্ছে। তোমার পেট আমার পেট একভাবেই জ্বলে কিনা। প্রাণের জ্বালাও একাকার হয়ে যাচ্ছে।

বিশেষ ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। কিন্তু শাকভাত তারা আধপেটা খাক, অতিথিকে তো পেট ভরে খেতে দিতে হবে !

সামান্য আয়োজনে যত্নের বহরটা নরেনকে বুঝিয়ে দেয়, একদিনের সম্পন্ন চাষি পরাণের অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছে।

তার একার নয়। চাষি সমাজের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে বুঝতে একবেলাও সময় লাগে না নরেনের।

নাথুপুরের নিচু স্কুলটা উঁচু স্কুলে পরিণত হতে চলেছে বটে, নতুন বছর শুরু হতেই দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া শুরু হবে বটে এবং সে জন্য কয়েকজন নতুন শিক্ষকও দরকার হবে বটে—কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা যায় নরেনের ভাগ্যে এই স্কুলে শিক্ষকতা করার সুযোগ জুটবে না।

নাথুপুর এবং আশেপাশের গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদেরই কেবল এই স্কুলে চাকরি দেওয়া হবে—আগামী স্কুলের বর্তমান অস্থায়ী স্কুল কমিটিতে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

অধিকাংশ পদের জন্য নামও স্থির হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সুতরাং নরেনের দরখাস্ত করে কোনো লাভ নেই।

মালতী বলে, দ্যাখেন কেমন জব্দ হলেন। শহর ছেড়ে গাঁয়ে এসেছেন চাকরি খুঁজতে !

জগা বলে, চাকরি খুঁজতে নয়—প্রাণের জ্বালা জুড়োতে।

মালতী বলে, চাকরি পেলেই জ্বালা জুড়োয় !

গাঁয়ে এসে মালতী তাজা হয়নি, অসুস্থতার ছাপটা তেমনই বজায় আছে তার মুখে—কিন্তু এখানে এসে তার মুখ খুলেছে। মণ্টুকে পড়াতে তাদের শহরের বাসার মধ্যে নরেনের রোজ অনেকক্ষণ সময় কাটত, মাঝে মাঝে ছোটো ভাইবোনগুলিকে ধমকানো ছাড়া মালতীর মুখে কোনো কথা শুনেছে বলে সে মনে করতে পারে না।

এখানে মালতী নিজে থেকে যেচে এ বিষয়ে ও বিষয়ে—সহজভাবে নানাকথা কয়। শহরে মূক হয়ে ছিল, গাঁয়ে এসেই সে যেন মনের ভাব প্রকাশ করায় ভাষা খুঁজে পেয়েছে।

দীননাথ আর মণ্টু হয়ে গেছে চুপচাপ !

তার দাদার অবস্থা যে এত বেশি কাহিল হয়ে পড়েছে সপরিবারে এখানে এসে পৌঁছোনোর আগে দীননাথ সেটা অনুমান করতে পারেনি।

এরা নিজেরাই পেট ভরে খেতে পায় না, তার পরিবারটিকে এদের ঘাড়ে বেশি দিন চাপিয়ে রাখা তো সুবিবেচনার কথা হবে না !

পনেরো দিন একমাস ওরা কষ্টকর জীবনযাত্রায় আরও বেশি কষ্ট আমদানি করা সয়ে যাবে কিন্তু বেশি দিন সকলকে ঘাড়ে চাপিয়ে রাখলে অভাবের জ্বালায় পুড়ে যাবে দুটি ভায়ের এবং দুটি ভায়ের পরিবারের মধ্যে এতদিন দূরে বাস করার জন্য বজায় থাকা হৃদ্যতা ও মিল।

এখানে বরাবর একসঙ্গো থেকে চাষবাসের কাজ করে এসেছিল, অন্য কথা—যতই দুঃখদুর্দশা আসুক কারও উপায় থাকত না অপরকে দায়ি করার, সকলেরই হত সমান কর্মভোগ।

কিন্তু নিজের অংশের জমিজমা বেচে দিয়ে ছেলেকে বিদ্বান করতে মানুষ করতে দীননাথ শহরে চলে গিয়েছিল। জমিজমায় কোনো অংশই তার নেই। ভিটেটুকুর অংশে কেবল তার অধিকার।

আজ ওদের এই দুরবস্থার সময় এতগুলি পেটের দায় ঘাড়ে চাপিয়ে ওদের দফা নিকেশ করা চলে না !

দীননাথ চুপচাপ এই সমস্যার কথা ভাবে।

মণ্টুও ভাবে।

দীননাথের ভাবনাচিন্তা সবই ছেলের সঙ্গে ভাগাভাগিতে করা, ছেলের সঙ্গেই সব ব্যাপার নিয়ে তার শলাপরামর্শ।

দিন তিনেক পরেই দীননাথ বলে, না, বসে থাকা কাজের কথা নয়। মণ্টুকে নিয়ে ফিরেই যাই, কাজকম্মের জোগাড় দেখি।

মণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার একটা কারণ নরেন সহজেই অনুমান করতে পাবে—পরাণের বোঝা যতটুকু পারা যায় কম করা। মণ্টু তার সঙ্গে গেলে একটা পেট ভরানোর দায় তো কম হবে পরাণ ও জগার।

মণ্টুকে সঙ্গে নেবার আরেকটা কারণ সে শোনে দীননাথের মুখে। গাঁয়ে বসে জ্যাঠার অন্ন ধ্বংস করে কী লাভ ? পড়াশোনা আর হবে কী হবে না সে তো পরের কথা—পরীক্ষার ফল বেরোলে !

শহরে গিয়ে মণ্টু যদি কিছু রোজগার করতে পারে !

দু-চারপয়সা কামিয়ে কোনোমতে নিজের পেটটা যদি চালিয়ে দিতে পারে তো তাই ঢের।

নরেন ভাবে, কী আশা দীননাথের ! নিজে সে শহরে যাবে কাজের খোঁজে, কোথায় থাকবে কী খাবে, কতদিনে কাজ জুটবে নিজেই সে তা জানে না, তবু সে মণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে যদি সে অন্তত নিজের জীবিকাটা অর্জন করতে পারে !

নরেন বলে, আমিও ক-দিন বাদেই ফিরে যাব।

৬

নরেন নামেই পরাণের অতিথি। একবেলা পাতা পাড়ে তো দুদিন আর সে গরিব বেচারাদের অন্নে ভাগ বসায় না।

পরাণ আর জগাকে বুঝিয়ে বলে, ভেব না তোমরা গরিব বলে ঠকিয়ে চলছি। চাদ্দিকে আত্মীয়কুটুমের বাড়ি ছড়ানো, দেখা করতে গেলে একবেলা না খাইয়ে ছাড়ে না। কতকাল পরে দেশ গাঁয়ে বেড়াতে এসেছি—সকলেই একটু-আধটু যত্ন করতে চায়।

পরাণ বলে, হাঁ, সে ঠিক কথা।

আত্মীয়স্বজন সত্যিই আদরযত্ন করতে চায় এবং যথাসাধ্য করেও। নরেনের ভদ্রলোক আত্মীয়স্বজন।

যথাসাধ্য করে !

কিন্তু তাদের অধিকাংশের সাধ্যটা কী পরিমাণ কমে গেছে আঁচ করে নরেন বড়ো দমে যায়। তার নিজের জীবনে যে সমস্যা, যে সংকটের সামনে আজ সে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, শহরের গাদাগাদি করা মানুষের জীবনে যা বিকটরূপে প্রকট—গ্রামাঞ্চলেও তার ব্যাপকতা তাকে বিচলিত করে দেয়।

পোষ্য অনেক। আয় নেই।

অনেকের আবার ধরাবাঁধা কিছুই আয় নেই। ধরাবাঁধা আয় নেই তবু কী করে দিন চলে এ ধাঁধার জবাব শহরে বসে খুঁজে পেত না। এখানে এসে বুঝেছে।

এই সব নিরুপায় আত্মীস্বজনের বাড়ি দেখা করতে গেলে তারা বিব্রত বোধ করেছে তাকে একেবেলা খেতে বলা দূরে থাক—একটু জলখাবারও দেয়নি। দেয়নি মানে দিতে পারেনি।

অন্যদের কারও বাড়ি একবেলা, কারও বাড়ি দু-একদিন থেকে এবং খেয়ে, এক মাসির বাড়ি সাতদিন কাটিয়ে প্রায় একটা মাস নরেন এক রকম বিনা খরচায় পার করে দিল।

মাসির অবস্থা ভালো। আরও কয়েক দিন থাকার জন্য সাধাসাধিও করেছিল। কিন্তু বিনা খরচায় পরের খেয়ে বাঁচার জন্য তো সে দেশে আসেনি !

সকলের দেওয়া আঘাতের সঙ্গে ছবিরাণীর আঘাতের বেদনা ভুলতেও আসেনি।

সে এসেছে মনটা গুছিয়ে নিয়ে শক্ত করতে।

কিন্তু আর পালিয়ে বেড়িয়ে লাভ নেই।

এবার শহরে ফিরে যাওয়াই ভালো।

মাসির বাড়ি, ভিন্ন গাঁয়ে। ওখান থেকে সোজা শহরে ফিরে না গিয়ে সে একবেলার জন্য পরাণের বাড়ি পাত পাততে ফিরে আসে।

ওদের কাছে বিদায় না নিয়ে শহরে ফেরা যায় না।

সকালে এসে দুপুরের গাড়ি ধরে কলকাতা রওনা দেবার কথা ভেবে সে আসে, কিন্তু ঘটনাচক্রে তার শহরে ফিরে যাওয়া পিছিয়ে যায় আরও পাঁচ দিন।

তার মধ্যে দুদিন কাটে হাজতে।

পরাণের বাড়ি পৌঁছে সে দ্যাখে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে—সোজাসুজি তার জন্য না হলেও তাকেও যে ঘটনার একটা উপলক্ষ বলা যায়।

একটা পোস্টকার্ড লিখে সে খবর জানিয়েছিল। তাকে দেবার মতো একদানা চাল পরাণের বাড়িতে নেই। যে চাল কিছু আছে সে চালের ভাত তাকে খেতে দেওয়া যায় না—শহরবাসী একবেলার অতিথির পাতে দেওয়া যায় না।

জমির মালিক শিবরাম জোর করে তাদের ধানও নিজের গোলায় তুলেছিল—এই নিয়ে হয়েছিল বচসা। সেই রাগে শিবরাম আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাদের ধানও আটক করেছে।

তাদের ভাগ তারা আদায় করবে, সে ব্যবস্থার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এ সব ব্যবস্থা তো চটপট হয় না গরিব চাষির ভাগ্যে। অথচ কিছু ধান না হলে এদিকে অতিথিকে অখাদ্য চলের ভাত খাওয়াতে হয়।

কাল সকালে জগা গিয়েছিল কিছু ধান চেয়ে আনতে। সঙ্গে গিয়েছিল দীনু আর হানিফ।

কিছু ধান না হলে তাদের ঘরেও উপোস শুরু হবে দু-একদিনের মধ্যে।

ভাগ নিয়ে কলহের ফয়সালা পরে হবে, আজ তাদের ভাগের ধানের সামান্য একটা অংশ দেওয়া হোক—এই দাবি তারা করেছিল শিবরামের কাছে।

জগা কী করেছিল বাড়ির লোকের জানা নেই। তবে এটুকু তারা অনুমান করতে পেরেছে যে, ধান দিতে নিশ্চয় অস্বীকার করেছিল শিবরাম, জগার মেজাজ নিশ্চয় গরম হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে শিবরামের লোক লাঠি মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

এখন পর্যন্ত জগার জ্ঞান হয়নি।

শিবরামের লোকেরাই তার মাথায় ন্যাকড়া বেঁধে দীনু আর হানিফের সঙ্গে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে।

আর দিয়েছে দশ সের ধান।

দীনু আর হানিফকেও দশ সেব করে ধান দেওয়া হয়েছে।

শিবরামের লোক বলেছে, জগা নাকি ধান মেপে দেবার পর অতিথির জন্য শিবরামের কাছে দুটি ডাব চেয়েছিল। ডাব পাড়তে গাছে উঠবাব সময় পড়ে গিয়ে জগার মাথা ফেটে গেছে।

হানিফ আর দীনু নাকি ধান নিয়ে খানিক তফাতে চলে গিয়েছিল, ডাক শুনে তারা ফিরে যায়, তারা কিছু দ্যাখেনি।

ঘোষপাড়ার বারো বছরের ছেলেমানুষ গোলক কিন্তু খানিক তফাত থেকে ব্যাপারটা দেখেছে। জগার সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছিল শিবরামের, তার লোক শম্ভু হঠাৎ জগার মাথায় লাঠি বসিয়ে দেয়।

ধান মাপা হয় পরে। জগার মাথা বেঁধে দেওয়ারও পরে।

ঘটনাটা হয় শিবরামের বাড়ির পিছনে পুকুর ধাবে—তার নিজস্ব পুকুর। শিবরাম তখন পুকুরে ছিপ ফেলছিল।

জায়গাটা এমন যে, ঘটনাটা বেশি লোকের চোখে পড়া সম্ভব না হলেও গাঁয়ের দু-একজন বয়স্ক লোক যে দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তারা চুপ করে আছে বলে জানা যাচ্ছে না ছেলেমানুষ গোলক ছাড়া আর কে জগার মাথায় লাঠি মারতে দেখেছিল।

গোলক প্রথমে কয়েকজনের কাছে ঘটনার বিবরণ দিয়েছিল, তারপর খুব সম্ভব বাড়িতে অথবা শিবরামের লোকের হাতে মারধোর খেয়ে পাংশু বিবর্ণ মুখে সে-ও এখন অস্বীকার করছে নিজের চোখে ঘটনাটা দেখার কথা।

নরেন বলে, দীনু আর হানিফ নিশ্চয় কাছে থেকে সব দেখেছে, বলছে কিছু দ্যাখেনি ! ছি ছি ! এত বড়ো অন্যায়টা চাপা পড়ে যাবে !

চাষি আন্দোলনেব পাণ্ডা, বংশী ঘোষাল, জগাব খবব নিতে এসেছিল।

নরেন তাকে বলে, গাছ থেকে পড়েছে না মাথায় লাঠি পড়েছে সেটা তো মাথা দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

বংশী বলে, তা যায় বইকী ! সেই জন্যেই তো আসল ডাক্তার আনা। নইলে মাথার ব্যান্ডেজ আমিই বেঁধে দিতে পারতাম।

চাষিরা চুপচাপ সয়ে যাবে ?

তাই কী যায় ? ওর হুঁশ হোক, কী হয়েছিল নিজের মুখে সব বলুক, তবে তো বিহিত হবে !

বংশীর এ কথাটার তাৎপর্য তখন নরেন বুঝতে পারেনি—পরে বুঝেছিল।

বংশীর তাড়া ছিল। সে চলে যায়।

পরাণকে বলে যায়, আমি আবার আসব—তার আগে যদি হুঁশ হয়তো খবর দিয়ো।

নরেন বলে, মণ্টু, দীনু আর হানিফের ঘর চিনিস ?

চিনি বইকী !

চল তো আমার সাথে।

নরেন পৌঁছেছিল খুব ভোরে, এখন সকালে সূর্য উঠেছে ডগডগে লাল। চারিদিকে হালকা কুয়াশা। মানুষের মনের টক কষ্টের ছোঁয়াচ লেগে বাতাস যেন দুধের মতো কেটে গেছে। একটা আবর্জনার স্তূপে কাল রাত্রে আগুন দেওয়া হয়েছিল, কটু ধোঁয়াটে গন্ধ চারিদিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

গুমরে গুমরে এখনও আগুন জ্বলছে আবর্জনায। ধোঁয়া উঠছে সোজা উপর দিকে, সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে।

রাস্তা ছেড়ে মণ্টু খেতে নেমে যায়। নরেনকে বলে, আল ধরে যেতে পারবেন তো ?

চুপ কর ফাজিল।

খেত ডিঙিয়ে গেলে পথ সংক্ষেপ হবে। মণ্টুর অভ্যাস আছে, পথও তার চেনা, আল ভুল করে শস্যখেতের গোলকধাঁধায় পাক খেয়ে বেড়াতে হবে না। মণ্টুব পিছনে নরেন চলতে থাকে আর ভাবে এর মধ্যেই কোনো জমির টুকবোয় হয়তো জগা ফসল ফলিয়েছিল, যে ধান আজ শিবরামের গোলায়।

দীনুর ঘরের দশা দেখেই টের পাওয়া যায়, কতকাল তাব ঘর ভালো কবে মেরামত করা হয়নি।

দীনুর বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। ভাটা-ধরা মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, এককালে লাঠিয়াল হিসাবে খ্যাতি ছিল। দশ বছর আগেও নাকি তার অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল, তার আজকের চেহারার ভাটা-ধরা অবস্থা দেখেও সেটা বোঝা যায়।

ডাক শুনে দীনু বাইরে আসে, মণ্টুব সঙ্গে নরেনকে দেখেই সে বিষম রকম ভড়কে যায়। মণ্টুকে সে চেনে, নরেন একেবারে অচেনা।

মণ্টু তাকে নরেনের পরিচয় দেয়, কিন্তু দীনুর বিব্রত শঙ্কিত ভাবটা কিছুতেই ঘোচে না।

নরেন বলে, আমি ওই হাঙ্গামার ব্যাপাবটা একটু জানতে এসেছি, পরাণের ছেলে কেন মার খেল কী বৃত্তান্ত।

পবাণেব ছেলে মার খেয়েছে নাকি ? আমি তো কিছু জানি না !

তুমি তো ওর সঙ্গে ধান আনতে গিয়েছিলে ভাই। তোমার সামনে মাথাটা ফাটিয়ে দিল লাঠি মেবে, তুমি বলছ কিছুই জানি না ?

দীনু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বলে, লাঠি মেরে মাথা ফাটিযেছে ? গাছ থেকে পড়ে গেছে শুনলাম তো।

লাঠি মেরেছে।

কী জানি, আমি জানি না। আমি আগে চলে এযেছিনু। জানে না। দীনু কিছুই জানে না। কিছু দেখা বা জানা দূরে থাক, ঘটনার সময সে ধারেকাছেও ছিল না !

হানিফের বয়স দীনুর চেয়ে কম, বেশ শক্তিশালী শক্ত চেহারা। সে দীনুর মতো ভান করল না, মাটির দিকে চেয়ে সোজাসুজি জবাব দিল, আমি এ ব্যাপাবের কিছু জানি না বাবু।

কিন্তু হানিফ—

আমি কিছু জানি না।

আমার সঙ্গে এসো দিকি একটু।

হানিফকে সঙ্গে করে দীনুর কাছে নিয়ে গিযে, নরেন প্রায় দশ-মিনিট একটানা কথা বলে যায়। খুব আবেগের সঙ্গেই সে দুজনকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে, তাদের এই অন্যায়কে মেনে নেবার ভীরুতা তাদের পক্ষেই কত মারাত্মক,—যদি তারা শক্ত না হয়, প্রতিবাদ না করে, কাল জগার মাথায় লাঠি মেরেছে আরেকদিন তাদের মাথায় মারবে।

সে চুপ করলে দীনু আর হানিফ কয়েকবাব ঢোক গেলে, কিন্তু বলে সেই এককথা—তারা কিছু জানে না।

ফেরার পথে নরেন আর মণ্টু দুজনেই চুপ করে থাকে। মণ্টুর মন খুব খারাপ। মুখে সেটা ফুটেছে বেশ স্পষ্টভাবেই। নরেনের মুখ গম্ভীর।

হাঙ্গামা থেকে সরে থাকতে চায়, গা বাঁচাতে চায়। এ কী শুধুই ভীরুতা ?

এগিয়ে গিয়ে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে না চাওয়ার ভীরুতা আছে এক রকম—নিন্দা করলেও অবস্থা বিবেচনা করে সে ভীরুতাকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু এ যে নিজের ভীরুতা দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদকে পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা !

খানিক বেলায় বংশী আবার জগার খবর নিতে এলে, নরেন তার প্রাণের আপশোশটা প্রকাশ করে বলে, ওরা এমন ভীরু ! ছিছি !

বংশী বলে, ভীবু ? হ্যাঁ, এক হিসাবে ভীরু বইকী কিন্তু ছিছি করার মতো সে রকম ভীরু নয়। কারণ আসলে ওরা ভীরুই নয়। অবস্থা ওদের ভীরু করেছে। সেটা স্বাভাবিক।

নরেন তার কথাটা বুঝতে পারে না। মানুষ ভীরু হোক কিংবা সাহসী হোক, চিরদিন অবস্থার জন্যই হয়। কিন্তু ভীরুতা ভীরুতাই—ভীরুকে ছিছি করা যাবে না কোন যুক্তিতে ?

যে জন্যই হোক, এ রকম ভীরুতা নিন্দার কথা।

ভীরুতা নিন্দার কথা বইকী ! কিন্তু এরা সত্যি ভীরু নয়। সাহসী কি মানুষ অকারণে হয়। মিছিমিছি হয় ? এমনি এমনি প্রাণ দিয়ে কেউ বীরত্ব দেখায় ? অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে যদি কোনো লাভের ভরসাই না থাকে, বরং আবও বেশি ঘায়েল হবার ভয় থাকে, কেন লোকে তা দাঁড়াবে ? ওরা একা বলেই নিজেকে দুর্বল, অসহায় মনে করে।

কিন্তু ওরা কী জানে না সবাই মিলে এক হলে—

জানে। কিন্তু ও জানার কোনো মানে নেই। এক হলে হয় বটে, কিন্তু সব কাজের বেলা এক যে সবাই হবে তার প্রমাণ কী ? একবার যদি টের পায় সবাই মিলবে, শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারবে, তখন বিশ্বাস আসে, মনে জোর পায়। তখন এদের দেখলে আপনিও বুঝবেন আজ যাদের ভীবু ভাবছেন তারা কত সাহসী।

নরেন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যই যদি এক না হতে পারে, কীসে এক হবে ?

তার রাগ দেখে বংশী বলে, আপনার বয়স কম, গাঁয়ের চাষাভুসো মানুষদের ভালো করে জানেন না—ব্যাপারটা তাই ধারণা করতে পারছেন না। জগার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে—ওরা দেখেও বলছে দ্যাখেনি। আপনি এর মধ্যে দেখছেন ভীরুতা। আসলে এটা কিন্তু ওদের সাধারণ বাস্তববুদ্ধির পরিচয়। সাক্ষী কেবল ওরা দুজন। গাঁয়ের লোক জগার ব্যাপারটা কীভাবে নেবে, না জেনে কী করে ওরা সেটা প্রকাশ করে ? সবাই যদি একজোট না হয় ? ওরা জগার মাথায় লাঠি মারার কথা বলে বেড়াচ্ছে জানলেই শিবরাম ওদের নিকেশ করে দেবে। তার চেয়ে এখন চুপচাপ থাকাই ভালো।

নরেন চুপ করে থাকে।

বংশী বলে, বনের কাছের গাঁয়ের লোকেদের মাঝে মাঝে বাঘের অনাচার সইতে হয়। কেউ একা বাঘের সামনে পড়লে বীরত্ব দেখাতে বাঘ মারতে তেড়ে যায় না, সটান প্রাণ নিয়ে চম্পট দেয়। কিন্তু বাঘমশায় সবার পক্ষেই জ্যান্ত বিপদ। কার কখন ঘাড় ভাঙবে, ছেলেমেয়ে চিবিয়ে খাবে, গোরু মারবে ঠিক নেই। বাঘটাকে মারতে তখন গাঁয়ের লোক দল বাঁধে—দা কুড়ুল লাঠি বর্শা নিয়ে সবাই মিলে ঠেঙিয়েই বাঘের দফা নিকেশ করে দেয়—বাঘের হাতেও হয়তো দু-একজন জখম হয়, মারা পড়ে।

বংশীর সহজ উপমার মানে বুঝতে নরেনের কষ্ট হয় না, কিন্তু আসল কথাটা স্পষ্ট হয় না তার কাছে।

কারও প্রাণ যাবে, কেউ জখম হবে জেনেও ওরা বাঘ মারতে এক হয়ে এগিয়ে যায় কারণ আগেও ওরা এমনইভাবে এক হয়েছে, বাঘ মরেছে। সবাই জানে যে, বাঘ মারতে সবাই এক জোট হবে। যে গাঁয়ে কোনোদিন বাঘ আসেনি, সেখানে একটা বাঘ নিয়ে ছেড়ে দিন, দেখবেন কী কাণ্ড হয়। অনেক লোক সাবাড় হয়ে যাবে—সবাই মিলে বাঘটাকে মারবার চেষ্টা করতে দেরি হয়ে যাবে। আগে কখনও তো সবাই মিলে বাঘ মেরে সবাই বাঁচেনি !

নরেনের খটকা দূর হয় না। সে প্রশ্ন করে, কিন্তু ওরা যদি না বলে যে লাঠি মারতে দেখেছে, সবাই একজোট হবে কী নিয়ে ? অন্যায়টা কী হয়েছে লোকের জানা চাই তো ?

বংশী একটু হেসে বলে, আপনি গাঁয়ের লোকের ধাত জানেন না। রাগে আপনার গা জ্বালা করছে, আপনি চাইছেন এখুনি প্রতিকার হোক। গাঁয়ের লোকের অত অস্থির হলে চলে না। লোকে কী করে জানবে বলছেন ? জগার হুঁশ হলে ওর কাছ থেকেই জানবে।

তা বটে, এটা নরেনের খেয়াল ছিল না।

বংশী আবার বলে, এটা কেউ চুপচাপ সইবে না। কিন্তু হইচই করার আগে জগার হুঁশটা ফেরা দরকার। ধরুন, এদিকে খুব হইচই বাধিয়ে দেওয়া গেল—হুঁশ হবার পর কোনো কারণে জগা নিজেই বলল ও গাছ থেকেই পড়ে গিয়েছিল, কেউ ওকে লাঠি মারেনি। তখন কী ব্যাপার দাঁড়াবে ?

লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিল, তবু বলবে লাঠি মারেনি ? তাই কী কেউ কখনও বলে ?

বলে বইকী। তেমন কারণ থাকলে বাধ্য হয়েই বলে। ভীম সাহাকে শিবরামের লোক পিটিয়ে প্রায় লাশ করে দিয়েছিল। তিন দিন বেহুঁশ হয়েছিল। হুঁশ হতে সে নিজেই বলল যে শিবরামের লোক তাকে মারেনি, ভিন গাঁয়ের অচেনা লোক মেরেছে। শিবরাম ওর বউকে চিকিৎসা করানোর ছুতোয় কিছু টাকা দিয়ে শাসিয়ে দিয়েছিল, চুপচাপ না থাকলে ঘর জ্বালিয়ে দেবে। খেতে পরতে পায় না, ভীম তাই সহজ যুক্তি খাটিয়ে হিসেব করল, মার যা খেয়েছে তা হজম হয়ে গেছে, গোলমাল করে লাভ কী ?

বংশীর কথাগুলি নরেনের মনে গাঁথা হয়ে থাকে। এত সহজ মনে হয় কথাটা, অথচ এতদিন সত্যিই এটা তার একেবারেই জানা ছিল না। দীনু আর হানিফকে একেবারে অমানুষ ভাবতে গিয়ে ভিতরটা তার অস্থির হয়ে উঠছিল। এখন সে ভাবে, সত্যিই তো, কারণ না থাকলে কেন মানুষ ভীরু হবে ? সাহসী হবে ?

এক বিষয়ে ভীরুতা দেখালেই যে মানুষ সব বিষয়ে ভীরু হবে তারই বা কী মানে আছে ?

সে প্রশ্ন করে, গাঁয়ের লোক এক হয়ে জগার পক্ষ নিলে দীনু আর হানিফও মুখ খুলবে বলছেন—সাক্ষী দেবে বলেছেন ?

নিশ্চয় দেবে। আর কেউ যদি ঘটনাটা দেখে থাকে সে-ও তখন নিজে থেকে এগিয়ে আসবে।

যদি ভয় পায় ?

ভয় পাবে—কিন্তু শিবরামকে নয়, গাঁয়ের লোককে। মুখে যাই বলুক, মনে মনে তো জানে, ওরা যে হাজির ছিল, ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছে—এটা গাঁয়ের লোকের অজানা নয়। তখন সত্যি কথা না বলা মানেই গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে যাওয়া। সে সাহস ওদের হবে না।

জগার ভালো করে জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত গাঁয়ের চাষি সমাজ, ছেলের দল আর ভদ্রলোকের মোটা অংশ, সত্যিই যেন একেবারে উদাসীন হয়েছিল, ভাগের ধানের সামান্য ভাগ চাইতে যাওয়ার অপরাধে জগার মাথায় লাঠি পড়া সম্পর্কে।

কিন্তু রাগ যে গুমরে গুমরে বাড়ছিল সকলের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া গেল, প্রতিবাদ ও প্রতিকারের দাবি করে আওয়াজ তোলামাত্র যে রকম সাড়া পাওয়া গেল তারই মধ্যে।

শুধু দীনু আর হানিফ নয় আরও দুজন সাক্ষী নিজে থেকে এগিয়ে এসে ঘোষণা করল—তারা স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখেছে।

সারা গাঁয়ে আগুন জ্বলে উঠতে চায়, পুড়িয়ে দিতে চায় শিবরাম আর তার ভাড়াটে গুন্ডাগুলিকে—বংশী এবং আরও কয়েকজন প্রাণপণে সে আগুনকে ঠেকিয়ে রাখে।

বলে যে, না, আমাদের সাক্ষীসাবুদ আছে শক্ত প্রমাণ আছে—যারা আইনের বড়াই করে তাদের কাছেই আমরা বিচার আদায় করব।

তবু হাঙ্গামা ঠেকানো যায় না।

জন পনেরো চাষি শিবরামের ধানের গোলা পাহারা দিচ্ছিল—দুপুররাতে শিবরামের লোকেরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েকজন জখম হয়, মারা যায় ভাগচাষি নন্দ কামার।

তারপর আর হাঙ্গামা ঠেকানো যায় না। শিবরাম হাঙ্গামা চাইছিল, তার আশা পূর্ণ হয়।

গাঁয়ে বসে পুলিশের ছাউনি। আরও অনেকের সঙ্গে নরেনও হাজতে চালান যায়।

নরেন হাঙ্গামায় কোনো অংশগ্রহণ করেনি। উচিত নয় বলেই গ্রহণ করেনি। সমস্ত ব্যাপারটা এমনভাবে গড়ে উঠছিল, ঘটে চলছিল যে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে যে ভালো করে বুঝে উঠতে পারছিল না, কীসে কী হয় কেন হয়।

এই অবস্থায় চুপচাপ দর্শকের ভূমিকা নেওয়াই ভালো। বাহাদুরি করতে গিয়ে কী ভুল করে বসবে কে জানে—হয়তো ভালো করতে চেয়ে মন্দই করে বসবে গাঁয়ের লোকের।

তবু তাকে হাজতে যেতে হয়। শহর থেকে এসেছে, সে-ই উসকানি দিয়ে গাঁয়ে হাঙ্গামা ঘটিয়েছে কিনা কে জানে ! তার সেই ভিন গাঁয়ের মেসোমশায়ের চেষ্টায় দুদিন পরে সে ছাড়া পায়।

৭

একমাসের বেশি সময় দেশ-গাঁ ঘুরে নরেন ফিরে এল। মাত্র দশটা টাকা সম্বল নিয়ে !

সে গ্রাম ঘুরতে যাবে কেউ জানত না।

কেউ জানত না তার বাবার চোদ্দো পুরুষের ভিটেটা যে গাঁয়ে ছিল সেখানে পালিয়ে গিয়েছিল, নিজের জীবনের লাভ-লোকসানের হিসাব কষতে আর বুঝে উঠতে সে কেন মানুষ হয়ে জন্মেছে।

এত বড়ো বড়ো মানুষ জন্মেছে পৃথিবীতে, আজও জন্মাচ্ছে। তাদের সঙ্গে তুচ্ছ মানুষ সে-ও কেন জন্মেছে।

শহরের কোনোরকমে পেট চলা চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়ে সে ছিটকে যায় গ্রাম, কাজ খুঁজতে, জীবনটার মানে খুঁজতে। নতুন স্কুলে কাজের চেষ্টা, অন্য কোনোরকম জীবিকার উপায় খুঁজে বার করা, এ সব ছিল উপলক্ষ।

ভবিষ্যৎ গড়বার জন্য শুধু দশটা টাকা নিয়ে একমাস সে বাড়ির রেশনের অন্নে ভাগ বসায়নি, অন্তত একটা পরিষ্কার জামা একটা ধুতি ছাড়া চাকরির খোঁজে বেরোনো যায় না, এ সব পুরানো চাল চালেনি,—তবু নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করেই তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে কেউ খুশি হয় না। ঝগড়া করে অতখানি তেজ দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে, একটা আশা সকলের মধ্যে জেগেছিল যে, তবে হয়তো সে নিশ্চিত কিছুর সন্ধান পেয়েছে—নইলে এত তেজ দেখায় !

মুখ বাঁকিয়ে তারিণী বলে, হ্যাঁ, ও আবাব চাকরি জোটাবে !

কিন্তু দেখা যায় নরেনের তেজ মোটেই কমেনি।

সে বলে, আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম, চাকরির খোঁজে যাইনি। বাড়িতে থাকবার জন্য ফিরিনি, চলে যাব বলেই এসেছি। থাকবার একটা জায়গা খুঁজে নিয়েই চলে যাব।

তেজ তো দেখায় মানুষ, এটুকু তেজ না দেখালে চলে না বলে। কিন্তু কী সম্বল করে যাবে ? দশটা টাকা নিয়ে এক মাসের বেশি দেশে-গাঁয়ে কাটিয়ে এল, হাতে তো পয়সাকড়ি কিছুই নেই।

বাড়িতে থাকতে হওয়ার অপমানে প্রাণটা জ্বলে পুড়ে যায় নরেনের। যার সঙ্গে দেখা হয় সেই জিজ্ঞাসা করে, কিছু হল ?

কীসের কী হল ?

চাকরি-বাকরি কাজকর্মের ?

হ্যাঁ, একটা বাগিয়ে এসেছি।

বটে বটে ! বাহাদুর ছেলে তো। মাইনে কত ?

যা আশা করে গিয়েছিলাম তার ডবল হবে।

শুনে সুন্দরের বাবা সুরেন গোঁসাই বলে, আমার ছেলেটার জন্য কিছু করে দিতে পার না ভাই ?

চেষ্টা করব বইকী ! ওকে একবার আসতে বলবেন আমার কাছে। তবে কী জানেন—

মুখটা বাঁকিয়ে রাখে নরেন।

বুড়ো সুরেন বলে, কী বলছ ?

দিনকাল বোঝেন তো ? চাকরি বাগাতে হলে কিছু ঢালতে হয় !

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় ! খোঁজে কিছু আছে নাকি ?

আছে একটা। মাইনে বেশি নয়। শ খানেকের মতো হবে—

তুমি ওটা বাগিয়ে দাও বাবা, সারাজীবন তোমার জয় গাইব। কত ঢালতে হবে ?

নরেন উদাসীনের মতো বলে, ঢালতে হয় অনেক, তবে আপনার ছেলের বেলা কমেই চেষ্টা করব। গোটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ওকে কাল পাঠিয়ে দেবেন। এ সব কথা কেউ যেন না টের পায়— সাবধান !

সকালবেলাই সুন্দর আসে।

চব্বিশ-পঁচিশবছর বয়সের হাত ছয়েক লম্বা যুবক।

কালো কুচকুচে গায়ের রং।

বাবা পাঠালেন।

টাকা এনেছ।

এনেছি। কিন্তু—

নরেনের কান ঝাঁঝাঁ করছিল, বুক ধড়ফড়ও করছিল।

একটা ফর্ম দিচ্ছি—ফিল-আপ করে দিয়ে যাও—চাকরিটা তোমার হয়ে যাবে।

সুন্দর ফর্মটার জন্য হাত বাড়ায় না।

আমি কিন্তু দুবার দুজনকে টাকা দিয়েছি—চাকরি পাইনি। একবার পঞ্চাশ টাকা, আর একবার দেড়শো টাকা। বাবা তবু বললেন যে আপনি তো আর—

নরেন বোমার মতো ফেটে পড়ে, আমায় জুয়াচোর ঠাউরেছ ? ঠক পেয়েছ ? যাও, বেরিয়ে যাও তোমার টাকা নিয়ে !

তার মূর্তি দেখে ভয়ে সুন্দর যেন পালিয়ে যায়।

নরেন নিজের মাথার চুল মুঠো করে ধরে। মাসখানেক কামায়নি, চুল বড়ো হয়ে গেছে। নিজের চুলের মুঠি ধরে নিজেকে নরেন বলে, জানিস পারবি না, তবু কেন চেষ্টা করিস ? এ সব তোর ধাতে নেই !

বোমার মতো ফেটে না পড়ে একটু ধৈর্য ধরলে, একটু গম্ভীর ও উদাসীনের মতো কথা বললে, টাকা যে সে নিজের জন্য নিচ্ছে না এটা একটু বুঝিয়ে দিলে, মনে সন্দেহ নিয়েও বুক ঠুকে আরেকবার ঠকবার জন্য, বেকার সুন্দর রাজি হয়ে যেত বইকী। কিন্তু ও রকম বুক ধড়ফড় আর কান ঝাঁঝাঁ করলে কেউ পাঁচটা মিনিটও ধীর গম্ভীর হয়ে চাল দিতে পারে ?

নিজের সমস্যাটা ভালো করে বিবেচনা করার জন্য, তলিয়ে বুঝবার জন্য, নরেন স্নান করতে যায়, শুদ্ধ হয়ে পূজা করতে বসার জন্য তারিণী খানিক আগে স্নান করে এসেছে—নরেন স্নান করতে যায় মাথাটা একটু ঠান্ডা করে নিজের ইতিকর্তব্য বিচার-বিবেচনা করার জন্য।

স্নান করে কুঁজো থেকে ঠান্ডা এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে সে প্রায় পূজা করতে বসার মতোই চৌকিতে শতরঞ্চির উপর জোড়াসন করে বসে।

একগুঁয়েমি করছে ? ছেলেমানুষি কাঁচাবুদ্ধি আর ভাবপ্রবণতা নিয়ে এতটুকু পা নুয়ে মচকে যাবার নীতি আঁকড়ে থাকার বোকামি করছে ?

কিন্তু হিসাব তো তার খুব সোজা। ভুলটা কোথায় বোকামিটা কী করছে সে তো ধরতে পারছে না !

সে জানে কয়েকটা টাকা ধার করে জোগাড় করা যায়। কিন্তু ধার তো তাকে চাইতে হবে তারই কাছে ছাঁটাই করা বেকার হওয়া সত্ত্বেও তাকে যারা একেবারে বাতিল করেনি ?

টাকা ধার করলে এদের কাছেও সে বাতিল হয়ে যাবে। স্নেহ-প্রীতি বন্ধুত্বের হিসাবে জীবনটাকে প্রায় মরুভূমির সঙ্গে তুলনা করা চলে—মরূদ্যানের মতোই এখানে ওখানে যেটুকু সরসতা আছে, সামান্য ক-টা টাকার জন্য তা-ও শুকিয়ে ফেলবে ?

না, অন্য অবস্থায়, চাকরি করার সময় পাঁচ-দশটাকা ধার চাইতে ভাবতে হয়নি—আজ কারও কাছে পাঁচটা টাকা চাওয়া হবে নিছক বোকামি, নিজেকে ঠকানো।

তাকের সাজানো বইগুলির দিকে তাকিয়ে নরেন নিশ্বাস ফেলে। তার কলেজের বইগুলি সযত্নে সাজানো রয়েছে—বরেনের আগামী প্রয়োজনের জন্য। এত তার কীসের নীতিজ্ঞান যে, বাপের পয়সায় কেনা বলেই দু-চারখানা বই বেচে দিয়ে উপস্থিত সমস্যা সমাধান করতে পারে না !

নরেন নিজের মনে মাথা নাড়ে। না, নীতিজ্ঞান নয়। বই বেচে ক-টা টাকা ! বেচে দেবার কোনো মানে হয় না—একটু নরম হয়ে চাইলে তারিণী তাকে পাঁচ-দশটা টাকা দেবে।

নিজের তেজ বজায় রাখার জন্য ওভাবে না চেয়ে তারিণীর টাকায় কেনা বই চুপিচুপি বেচে দেওয়া হবে উৎকট কুৎসিত ভণ্ডামি।

বইয়ের তাকের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ নরেনের মুখে একটু হাসি ফোটে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গিয়েছে প্রাইজ পাওয়া বই আর মেডেলের কথা !

উপার্জন করা নিজস্ব সম্পত্তি থাকতে সে ক-টা টাকার ভাবনায় পাগল হতে বসেছিল। দুটি মেডেল আর বইগুলি বিক্রি করে বাড়ি ফিরে সে বরেনের কাছে মাধবের ছাঁটাই হবার খবর শোনে।

মাধবের মতো বড়ো বড়ো ডিগ্রিওলা নামকরা আদর্শবাদী জ্ঞানী সাধক মানুষও বরখাস্ত হয় !

জ্ঞানের নেশায় মশগুল হয়ে, কলেজে ভার আঁকড়ে থাকা ছেলে পড়ানো চাকরিটা থেকে।—যে চাকরিটা বজায় থাকায় নিশ্চিন্ত মনে দিল্লি থেকে ডবল মাইনের চাকরির ডাক সে কানে তোলেনি।

ছাত্রছাত্রীর এক সভায় বক্তৃতা করে তাকে চাকরিটা খোয়াতে হল।

তার পড়ানোর কায়দা পছন্দ কববে কী করবে না, ছাত্রছাত্রীরা ভেবে পায় না। কর্তা ব্যক্তিদের অবশ্য ভাবতে হয় না, তারা সোজাসুজি তার পড়ানো অপছন্দ করে।

পাসের পড়া পড়াতে পড়াতে, পাশ কাটিয়ে সে মশগুল হয়ে এমনভাবে জীবন আর জগৎ সম্পর্কে নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা আর নতুন জীবনদর্শনের কথা বলতে থাকে, যে ছাত্র এবং কয়েকটি ছাত্রী মুগ্ধ অভিভূত হয়ে শোনে।

দু-চারজনের রোমাঞ্চও হয়।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝিমিয়ে যায় তাদের রোমাঞ্চকর উদ্দীপনা।

এভাবে এ সব কথা পড়ালে তারা পরীক্ষা পাস করবে কী করে ? পরীক্ষা পাস করার জন্যই তারা এত টাকা খরচ করে কলেজে পড়ছে, গুরুজনেরা এত কষ্টের টাকা ঢালছে।

ক্লাসে এ সব কথা কেন ?

মাধবের মতো বিদ্বান না হোক, পরীক্ষা পাসার্থী ছাত্রছাত্রী, তারাও কী এ সব কথা আলোচনা করে না, তর্ক চালাতে চালাতে ঝগড়া করে না,—আড্ডায়, বৈঠকে, চায়ের দোকানে, সংঘে, সমিতিতে ?

একবার তাদের শুধু বললেই হয় যে পাসের পড়া পড়াচ্ছি এখন, আমার কিন্তু আরও কিছু অন্য কিছু বলার আছে। শুনতে চাইলে ব্যবস্থা কর।

তারা কী ব্যবস্থা করত না ?

তারা কী শুনতে চায় না পাসের পড়ার চেয়েও দামি তার বাড়তি কথা ?

ছাত্রছাত্রীরা পরামর্শ করে তাকে তার বাড়তি বক্তব্য বলবার একটা ব্যবস্থা করে। শুধু তার ক্লাসের বা কলেজের নয় সব ছাত্রছাত্রীই শুনবে। কিন্তু মুশকিল হয় এই যে, সভার আয়োজন করে তাকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

আগেও অনেক কষ্টে কলেজের বাইরে তারা আয়োজন করেছে, এমন একটি ক্লাসে যেখানে যতক্ষণ ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, প্রাণ খুলে সে তার প্রাণের কথা বলে যেতে পারবে। কিন্তু তাকে নিয়েই যাওয়া যায়নি এ রকম কত ক্লাসে ?

প্রস্তাব শুনেই অবশ্য খুশি হয়ে বলেছে, যাব যাব—নিশ্চয় যাব। আমি নিজেই যাব।

কিন্তু বাড়ি থেকে পথ দেখিয়ে তাকে আনতে গিয়ে সভার প্রতিনিধিকে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে মানসীর।

উনি তো যেতে পারবেন না। জরুরি কাজ করছেন।

এবার কলেজের বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সভা ডেকে তারা মাধবকে করেছে প্রধান বক্তা। কলেজের সভা ? নববর্ষ উপলক্ষে ? যাবে যাবে মাধব নিশ্চয় যাবে !

কিন্তু এবারও সেই একই ব্যাপার গটে ! মানসী জানায় মাধব যেতে পারবে না। শুনে রমেন একেবারে থ বনে যায়।

যাবেন বলেছিলেন, সবাই এসে গেছে, ওঁর নাম ছাপিয়ে দিয়েছি—।

কী করা যায় বলো ভাই ? বুঝতেই পারছ ইনি সে রকম মানুষ নন। সভায় গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে নাম কুড়োলে যে আখেরে লাভ হয়—এ সব মানুষ সেটা বোঝে। কিন্তু নামের চেয়ে জ্ঞান এদের কাছে বড়ো—নিন্দা প্রশংসার চেয়ে আদর্শটা অনেক বড়ো।

মাধবের বিশ বছর বয়সি অজানা অচেনা ছাত্রটিকে বাগে পেয়ে মানসী যেন ছোটখাটো একটা লেকচার ঝেড়ে দেয় !

স্বামীর সপক্ষেই অবশ্য দেয়।

টের পায় রাগে গনগন করছে রোগা লম্বা গলাবন্ধ কোট-পরা ছেলেটা। ফরসা মুখ লাল হয়ে গেছে।

রাগ চেপে রেখে রমেন বলে, আমি ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলব। ওঁর জন্যই আমরা এবার বিশেষভাবে আয়োজন করেছি, উনি শিক্ষার বিষয়ে বলবেন বলেছেন। অন্য কলেজের ছেলেরা এসেছে। এখন উনি বলছেন যাবেন না ?

মানসীর নিজেরও যেন লজ্জা করে। রাগুক মাধব, সে তাকে সভায় পাঠাবার চেষ্টা করে দেখবে।

এত তার ভয়-ভাবনা কেন, নিজের জন্য ?

মানসী একেবারে অন্য মানুষ হয়ে ধীরকণ্ঠে জোর গলায় বলে, পাঁচ মিনিট বোসো তো ভাই। দেখি চেষ্টা করে মানুষটাকে তোমাদের সভায় পাঠাতে পারি কি না।

চারিদিকে বই ছড়ানো, কাগজপত্র ছড়ানো।

একটা প্রায় একসেরি ওজনের বইয়ের শেষের দিকের পাতায় মাধব মুখ গুঁজে আছে।

শুনছ ?

ভয়ে ভয়েই বলে মানসী।

আগেও কয়েকবার বিশেষ দরকারে সময় শুধু শুনছো বলে ডাকামাত্র মাধব খেপে গিয়ে তাকে প্রায় মারতে বসেছিল !

কেন মারেনি সেটা অবশ্য বিধাতার কারসাজি।

মারলে সে নিশ্চয় প্রতিশোধ নিত। মাধবকে মারত না, গটগট করে বেরিয়ে যেত বাড়ি থেকে। ছেলেমেয়ের মায়া কাটিয়ে যেত। স্বামীকে ছাপাবই নিয়ে মাতাল হতে দিয়ে যেত।

মায়ের পেটের বোন আছে। বড়োলোকের বউ বড়ো বোন, সটান তাব কাছে চলে যেত।

মানসী আবার বলে, শুনছ ! ছেলেটি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

মাধব বলে, বলে দাও না, আমার শবীর খাবাপ, যেতে পারব না !

আমার একটা কথা শুনবে ?

গেট আউট।

মাথায় রক্ত চড়ে যায় মানসীর, সাধ হয় খাটের ভাঙা পায়াটা কুড়িয়ে নিয়ে এক আঘাতে ভেঙে চুরমার করে দেয় মানুষটার মাথা। যা হবার হবে, তারপরে হবে।

কিন্তু শান্তসুরেই জিজ্ঞাসা করে, তোমার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে চেয়েছে, কী বলব ছেলেটাকে ?

বলে দাও, চুলোয় যাক।

সত্যি বলব ?

মাথা খারাপ নাকি তোমার ? বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝিয়ে বিদেয় করে দিতে পার না ?

মাধবী প্রাণপণ চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় করে।

একবার গেলে পারতে না ? নিজেই বলেছিলে যাবে। সবাইকে বসিয়ে রেখে বেচারা তোমাকে নিতে এসেছে—

গেট আউট। গেট আউট আই সে !

মানসী দরজার কাছে পিছিয়ে গিয়ে বলে, ইয়েস, ইয়েস, আই অ্যাম গেটিং আউট। কিন্তু ছেলেটাকে কী বলব ?

মাধব নিজে কুঁজো থেকে গড়িয়ে নিয়ে এক গ্লাস জল প্রায় মরুভূমির তৃষ্ণার্তের মতো শুষে নেয়।

আমি জানতাম তুমি এভাবে জল খাবে। এই জন্য সকালবেলা কুঁজো ভরে জল রেখেছি। ছেলেটাকে কী বলব ? পরে তুমিই আবার আমার উপর চটে যাবে !

মাধবের জ্ঞানের নেশা কেটে গিয়েছিল। সে বলে, থাক, বলেছিলাম যখন, একবার গিয়ে ঘুরে আসি।

মানসী স্বস্তি বোধ করে বলে, আমি তো তাই বলছি।

মানসী কী জানত মাধবের সেই বক্তৃতা দিতে যাওয়ার কী ফল হবে !

জানলে বোধ হয় মাধবকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে নিজেই সে ছেলেটিকে বিদায় করে দিত।

যাবে বলে থাকলেও মাধব রেগে বিরক্ত হয়ে সভায় যায়। পথে খেয়াল হয় কী বিষয়ে বলবে তাও সে ভুলে গেছে।

ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করতে সে আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনি নিজেই বলেছিলেন ছাত্রজীবন আর রাজনীতি নিয়ে বলবেন ?

ও, হ্যাঁ।

ছাত্রজীবন আর রাজনীতি নিয়েই মাধব বক্তৃতা করে—একেবারে যেন আগুন ছুটিয়ে দেয় সভায়। বলতে আরম্ভ করার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টের পাওয়া যায় সে জমে গেছে এবং রেগে আছে—নিজের বক্তব্য ছাড়া বিশ্বসংসাব ভুলে গেছে। মাধব নিজে কখনও রাজনীতি করেনি কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না—তার থিয়েরিটা পরিষ্কার।

শিক্ষার অব্যবস্থার সঙ্গে অন্য সমস্ত অব্যবস্থার অন্যায় ও দুর্নীতির যোগাযোগগুলি দেখিয়ে দিয়ে সে ঘোষণা করে যে ও সব বজায় থাকলে শিক্ষাব অব্যবস্থা কোনোমতেই দূর হতে পারে না, পৃথক করে শিক্ষার ভালো ব্যবস্থাব জন্য আন্দোলন করার অর্থ হয় না। সুতরাং ভালো শিক্ষালাভই যদি ছাত্রজীবনের একমাত্র ব্রত, একমাত্র কাজ ধরেও নেওয়া যায়—এই নীতি অনুসারে, শিক্ষার খাতিরে, ছাত্রদের কোমর বেঁধে সব কিছু ঠিক করার কাজে অর্থাৎ রাজনীতি করতে নেমে পড়তে হবে।

শুধু যুক্তিতর্ক নিয়মনীতিগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে যদি সে বলত তাহলে এতটা শোরগোল হত না তার বক্তৃতা নিয়ে। ছাত্রজীবনেও রাজনীতি বাদ দেওয়া চলে না এ কথা তো কতজনেই কতভাবে বলেছে এবং বলছে। কর্তৃপক্ষ একটু ধমকধামক দিয়ে, একটু সাবধান করে দিয়েই তাকে রেহাই দিত।

কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের সময় রাজনৈতিক সভাতেও এ রকম গরম বক্তৃতা কম শোনা যায়। বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যখন একটা গোলমাল চলছে তখন ছাত্রছাত্রীর প্রকাশ্য সভায় এ রকম বক্তৃতা করা !

তবু হয়তো ত্রুটি স্বীকার কবলে, আত্মসম্মান বজায় রেখে কৌশলে আর কবব না বলতে পারলে তার চাকরিটা যেত না।

কর্তৃপক্ষ কথাটা তুলতেই সে গেল চটে।—কেন ? কোন কথাটা ভুল বলেছি আমায় বুঝিয়ে দিন, আমি আরেকটা সভা ডেকে ভুল স্বীকার করব আমি এখন পর্যন্ত জানি, একটি কথাও আমি ভুল বলিনি।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাকে কলেজ থেকে বিদায় নিতে হল।

মাধবের চাকরি গেছে শুনেই নরেন চমকে উঠে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

তারপর ভেবেছিল, কেন ?—এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ?

তাদের মতো অংসখ্য সাধারণ মানুষের বেকার থাকার ব্যবস্থাটা যাদের, তাদের সঙ্গে মনে অমিল হলে মাধবকেও ঘায়েল হতে হবে বইকী !

এ চাকরিতে যা পেত তার ডবল বেতনে দিল্লির চার্করি যে নেয় না, চাকরিটা না নিয়ে নিজের স্ত্রীর কাছে পর্যন্ত শত্রু হয়ে দাঁড়ায়—জ্ঞানের আদর্শবাদী হলেও কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে মতে না মিললে এবং সেটা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করলে মাধবেরও চাকরি যাবে বইকী !

তার যেন আনন্দ হয়। মনে স্ফূর্তি জাগে।

মাধবকে সে যেন নিজেদের দলে পেয়েছে। মাধবও যেন তার সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে মানুষ হিসাবে।

সে ছুটে যায় মাধবের বাড়ি, গিয়ে প্রথমেই মর্মান্তিক আঘাত পায় মনে। মানসী বাড়িতে নেই।

মাধব বেকার হয়েছে শুনেই মানসী গটগট করে সোজা তার দিদির কাছে চলে গিয়েছে।

বাচ্চা ছেলেটাকে শুধু সঙ্গে নিয়েছে।

বড়ো তিনজনের দায় ফেলে রেখে গিয়েছে মাধবের ঘাড়ে !

মাধব শান্তভাবেই মানসীর বিরুদ্ধে তার নালিশ প্রকাশ করে।

কীরকম বুদ্ধি বিবেচনা একবার ভেবে দেখুন। অন্যায় করে ডিসমিস করেছে—আমি ফাইট করলে চাকরিটা আবার বজায় রাখতে ওরা বাধ্য হবে বুঝিয়ে বললাম যে কিছু ভেব না, ওরা আমাকে তাড়াতে পারবে না—মাথা নিচু করে আবাব ডিসমিস করার হুকুমটা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে। শুনে বলল কী জানেন ?

মানসী কী বলেছিল নরেন খানিকটা অনুমান করে কিন্তু অজ্ঞানীর মতো চুপ করেই থাকে।

মাধব বলে, হন্যের মতো ঝেঁঝে উঠল—দিল্লির চাকরিটা নিলে না কেন ?—বলেই বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই বেশে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। জিজ্ঞেস কবলাম, কী হল, কোথায় যাচ্ছ ? জবাব এল, দিদির কাছে যাচ্ছি—দিল্লির চাকুরিটার মতো চাকরি না হলে আমায় ডাকতে যেয়ো না।

নরেন চুপ করে থাকে।

মানসীর দিদি অতসী যে শহরের আধুনিকতম প্রাসাদগুলির একটাতে থাকে এটা তার জানাই ছিল।

কিন্তু দিদি তো কোনোদিন আসে না, চিঠি লিখে জিজ্ঞাসাও করে না মানসী কেমন আছে !

তার কাছেই মানসী কতবার গর্ব করে বলেছে : জানেন ? দিদি একটা পয়সাওলা মুখ্যু ব্যাবসাদারের বউ আর আমি একজন গরিব নাম-করা বিদ্বানের বউ বলে দিদি আমায় কীরকম হিংসা করে ? আমার বিয়ের পর একবার মোটে এসেছিল, ঘণ্টাখানেকের জন্য। তারপর আর আসেনি।

সগর্বে মাথা উঁচু করে মানসী বলেছে, খোকনের অন্নপ্রাশন হবে, নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলাম ! আমার তো উচিত নিজের দিদিকে নেমন্তন্ন করা আমার ছেলের অন্নপ্রাশনে ? গিয়ে দাঁড়াতেই দিদি বলেছিল, আমি তোকে একটি পয়সাও সাহায্য করতে পারব না মনু। কেন এসে আমায় জ্বালাতন করিস ?

নরেন আমতা আমতা করে বলেছিল, একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয় ?

মানসী বলেছিল, সামান্য ব্যাপার—তাকে কিছু হওয়া বলে না। দিদির কাছে থেকেই তো পড়তাম কলেজে ? ভোলাদা একদিন তামাশা করে আমার গালটা টিপে দিয়েছিল, দিদি দেখে ফেলেছিল। তারপরেই বোর্ডিংয়ে যেতে হল, মাধব বলামাত্র ওর সঙ্গে আমাকে গেঁথে দেওয়া হল। দিদি আর খবরও নেয় না বেঁচে আছি কী মরে গেছি।

মাধবের চাকরি যাবার খবর শুনেই বাচ্চা ছেলেটাকে বগলদাবা করে এক কাপড়ে মানসী চলে গিয়েছে তার সেই দিদির বাড়িতে !

চাকরি খোয়ানো বেকার মাধবের চেয়ে তার বড়োলোক ব্যাবসাদার ভগ্নীপতির বউ ওই দিদির কাছে যাওয়াই সে শ্রেয় মনে করল ?

মাথা ঘুরে যায় নরেনের।

এ অবস্থাতেও মাধবের মাথা বেশ ঠান্ডা আছে দেখে আরও যেন বেশি ঘুরে যায় তার মাথা !

মাধব বলে, দিদির কাছে গিয়েছে যাক, সে জন্য নয়। আমি দিল্লির চাকরি নিলাম না, এ চাকরিটাও খুইয়ে বসলাম—এর জন্য রাগ করে গিয়েছে, সে জন্যও নয়। অন্যায় করে আমায় তাড়িয়েছে, ফাইট করে এটা আমি পালটে দেব—এ সব কথা শুনেও চলে গেল, এটাই প্রাণে বড়ো লাগছে।

প্রাণে লাগছে !

প্রাণে ! মাধবের মতো জ্ঞানীর প্রাণেও তবে আঘাত লাগে।

৮

কোথায় আস্তানা গাড়বে ? দীননাথেরা যে বস্তিতে গিয়ে উঠেছে, নরেন সেখানে গিয়ে হাজির হয়।

খুব ভোরে যায়, দীননাথ কাজের খোঁজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে।

বলে, ঘরটার জন্য কত ভাড়া দাও ?

একলা তো নয়, তিনজনে থাকি, ভাগাভাগি করে দিই।

চারজনের জায়গা হয় না ? ভাড়াটা আরও ভাগাভাগি হয়ে যেত ?

কষ্ট হবে—এত গাদাগাদি অভ্যাস নেই আপনার।

কিছু কষ্ট করতেই হবে। আমাকে আর আপনি বোলো না দীননাথ—তোমাদের দলেই ভিড়ে গেছি।

বস্তির ঘরের ভাগাভাগির ভাড়াটাও আগাম দিতে হয় ! অন্য দুজন ভাড়াটে, লোচন আর ভূপাল ছেড়ে কথা কয় না।

ক-দিন এখানে কাটল।

প্রাইজের বই আর মেডেল বিক্রির পয়সা শেষ হল।

এবার দিন কাটবে কী করে কে জানে !

সারাদিন ঘুরে শ্রান্ত ক্লান্ত নরেন এই কথাটাই ভাববার চেষ্টা করে !

বাইরে রোদের তেজ কমার আগেই ঘরের ভিতরটা আবছা মেরে যাচ্ছে। ঘর খোলার হলেও মদনের ঘরটাকে তবু ঘর বলা চলে, সেই ঘরের গায়ে ঢালু চালার নীচে কায়দা করে তৈরি করা এই ছোট্ট খোপরটাকে ঘর বললে হোগলার ঘরগুলিকেও অপমান করা হয়।

তবে জানালাটা পুবের বাগানের দিকে। বিকাল হতে না হতে দিনের আলো আসা কমে যায়, সকালবেলা জানালাটা দিয়ে বারোমাস একফালি রোদ তাদের এই ঘরে ঢোকে।

সূর্য চলে উত্তরে দক্ষিণে। রোদের ফালিটাও বাড়ে কমে। বছরে একটা দিনও বাদ যায় না। অল্পক্ষণের জন্য হলেও অন্তত একটুখানি রোদ তাদের খোপরে ঝিলিক মেরে যায়।

এখানে অশিক্ষিত মানুষগুলিব মধ্যে এসে কয়েক দিন বাস করে, এদের জীবনযুদ্ধের নগ্ন বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করে নরেনের নতুন চিন্তার খোরাক জোটা ছাড়াও একটা বড়ো রকম মানসিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। শিক্ষা আর পাস করার উপর তার যে একটা বিজাতীয় ঘৃণা আর রাগ জন্মেছিল—সেটা কেটে গেছে।

গ্রামাঞ্চলে গিয়ে শিক্ষায় বঞ্চিত মানুষ নিজেরই কত মিথ্যা ধারণা ও বিশ্বাসের কাছে ক্রীতদাসের মতো বাঁধা পড়ে আছে সেটা তার নজরে পড়েছিল. কিন্তু শিক্ষার মূল্য যে কত সেটা এ রকম স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

গ্রাম্য জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে এমন একটা সামঞ্জস্য আছে অশিক্ষিত মনগুলির বিকার ও অন্ধকারের যে, শিক্ষাব অভাবের কথাটা যেন বড়ো হয়ে উঠতে পারে না, শিক্ষালাভে বঞ্চিত হবার অভিশাপটা এতখানি প্রকট হয়ে দাঁড়ায় না।

শহরের এই বস্তিতে এলে ভালো করে টের পাওয়া যায় শিক্ষায় বঞ্চিত হবার সে অভিশাপ কেমন.।

না, শিক্ষা খারাপ নয়। পাস করা খারাপ নয়।

শিক্ষার ব্যবস্থায় অনেক খুঁত আছে বলে, পাস করে বেকারি ববণ করতে হয় বলে গায়ের জ্বালায় চোখ-কান বুজে পড়াশোনা আর পাস করার উপর চটে যাওয়া উচিত নয় !

এদিক দিয়ে নরেন সত্যই পরম স্বস্তি বোধ করে। শিক্ষা আর সভ্যতার বিরুদ্ধে কী জ্বালাটাই তার মধ্যে জমেছিল ! সেটা জুড়িয়েছে।

বাইরে খোলা আকাশ আলো বাতাস। মানুষ আর পশুপাখির একটানা জীবনযাপন।

মদনের রোয়াক দিয়ে উঠান হয়ে বাইরে যাতায়াত। গোবর-লেপা স্যাঁতসেঁতে সরু রোয়াকের একদিকে মদনের বউ রান্না করে, অন্যদিকে একটা দড়ি বেঁধে ঝোলানো প্যাকিং বাক্সের দোলায় ঘুমিয়ে থাকে তার বাচ্চা ছেলেটা।

কী ঘুমটাই যে ঘুমায় দেড় বছরের বাচ্চা ছেলে ! কখন জাগে, কখন ক্ষীণকণ্ঠে একটু কাঁদে খিদেয় তেষ্টায়, নরেন যেন টেরও পায় না।

এতই কমজোরি তার কান্না।

ছোটো উঠান। লম্বাটে হলেও চারকোনা। চারদিকে চারখানা ঘর তোলাই সম্ভব এবং উচিত। কী কায়দায় যে এইটুকু উঠান ঘিরে ন-খানা কুঠুরি গড়া গেছে আর তাদের চারজনকে বাদ দিয়ে সাতটি পরিবারকে ঘর ভাড়া করে থাকতে দেওয়া হয়েছে, নরেনের মাথায় ঢোকে না।

স্কুল থেকে কলেজের ডিগ্রির ক্লাস পর্যন্ত জ্যামিতি বেশ ভালোভাবেই হজম করেছে, মজা পেয়েছে। তাই মনে হয়—হয় এই খোলার ঘরগুলি ম্যাজিকের তামাশা, নয় ওই জ্যামিতির নিয়মগুলি মিথ্যা।

বেলায় বেলায় আঁচ পড়েছে। তিনটি উনানে। আরও দুটি উনানে আঁচ পড়বে সন্ধ্যা নাগাদ। রান্না সামান্য, রুটি পাকানো অথবা চাল আর ঘাসপাতা সিদ্ধ করা—তবু সেটা বেলায় বেলায় সারলে আলোর খরচ বাঁচে।

খোলার ঘরের এরাও টের পেয়েছে যে গত মহাযুদ্ধে তাদের মতো অনেক উলুখড়ের প্রাণ দেওয়াতেই শেষ হয়ে যায়নি যুদ্ধের বিপদ, মহাযুদ্ধের আরেকটা লন্ডভন্ড ভয়ংকর কাণ্ড বাধাবার চেষ্টা চলেছে পুরা দমে।

টের না পেয়ে উপায় নেই। কী রেটে চড়ে কোথায় উঠেছে জীবনযাত্রায় দরকারি সব কিছুর দাম !

ডিবরি জ্বাললে যেন প্রাণটাও জ্বলে যায় সেই সঙ্গে—কী দামে কেনা তেল ডিবরিতে পুড়ছে ভেবে।

সাতঘর ভাড়াটে।

ক-দিন উনান ধরছে পাঁচটি।

দুটি পরিবারের কী একটু আগুন জ্বেলে পিন্ডি সিদ্ধ করে খাওয়ার দরকার ফুরিয়ে গেছে ?

তা নয়।

হারাধন আর তার বউ মোক্ষদার এসেছে পালাজ্বর—একসঙ্গে। নরেন খবর নিতে গিয়ে দেখেছিল হারাধনের আরাম করে শোয়ার বাঁশ আর নারকেল দড়ির খাটিয়াটা খালি পড়ে আছে। সংগ্রহ করা ইট আর কাঠের তক্তা দিয়ে মোক্ষদার তৈরি খাটে পুরানো ছেঁড়া তোশকের বিছানায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে জড়াজড়ি করে দুজনে পালাজ্বরের শীতে কাঁপছে !

ছেলেমেয়ে নেই তার রক্ষা।

দক্ষিণের চালাটার পুবের দিকের খোপরে থাকে সাবিত্রী। সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, কে স্বামী কোথায় থাকে, কেউ জানে না। তিনটি ছেলেমেয়ে—বড়ো মেয়েটির বয়স বছর আষ্টেক, ছোটোটির চার। মাঝেরটি ছেলে।

দিন চারেক কোনো পাত্তা নেই সাবিত্রীর।

তার উনানটাতেও আঁচ পড়ে না।

শিখা, বলাই আর চাঁপা চালিয়ে যাচ্ছে অরন্ধনের পালা। নিজেদের চেষ্টায় বেঁচে থাকার লড়াই।

নেতৃত্ব শিখার।

চেয়ে, কুড়িয়ে, চুরি করে কীভাবে তারা তিনজন দিন চালাচ্ছে খুঁটিনাটি না জানলেও নরেন মোটামুটি আঁচ করতে পারে।

কাল থেকে শানাই বাজছে গজেন সরকারের বাড়িতে। মানুষ গিজগিজ করছে। এলোপাথারি হইচই ছুটোছুটি আদর-আপ্যায়ন খাওয়া-দাওয়ার মহোৎসব চলছে প্রকাণ্ড বাড়িটাতে।

শিখার নেতৃত্বে তিনজন বিয়ের রাত্রে ওই বাড়িতে পাতা পেড়ে ভোজ খেয়ে এসেছে।

নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখেনি ! মেরে ধরে দুরদুর করে কুকুর-বেড়ালের মতো তাড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাকে ভয় করেনি।

রীতিমতো মাথা খাটিয়ে প্ল্যান করে এটা সম্ভব করেছে।

নরেন গিয়েছিল বিধুর দোকানে চিড়ে কিনতে। শিখা গিয়েছিল ধারে চার পয়সার এক টুকরো কাপড়কাচা সাবান জোগাড় করতে। চার পয়সার এক টুকরো কাপড়কাচা সাবান ধারে পাওয়ার জন্য সে কী লড়াই বুড়ো দোকানি বিধুর সঙ্গে ছেলেমানুষ মেয়েটার !

বিধু কিছুতেই ধারে তাকে চার পয়সার সাবান দেবে না, শিখাও ধারে সাবানের টুকরোটি না বাগিয়ে ছাড়বে না।

বাবা নয়তো মা বাড়ি এলেই তুমি তোমার সাবানের দাম পাবে। বলছি তো পাবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কত পাব তা জানাই আছে। যা যা ভাগ।

ভাগ ভাগ করে তাড়িয়ে দিলেও শিখা এক ইঞ্চি পিছু ভাগেনি। আলুর বস্তার উপর আরও খানিক উপুড় হয়ে সামনে ঝুঁকে সে বলেছে, চার পয়সার সাবান ধারে দেবে না তো বিধুকাকা ? বামুনের বাড়ি বিয়ে। বামুনের মেয়ে নেমন্তন্ন রাখতে যাব। একটু সাফ করা চাই তো জামা-কাপড়টা ? কেন মিছে বামুনের মেয়ের অভিশাপ খাবে চার পয়সার সাবানের জন্যে ! মা-বাবা একজন ফিরে এলেই দাম ঠিক পাবে।

বিধু সাড়ে-পাঁচআনা দামের বিদেশি কোম্পানির কাপড়কাচা সাবানটা শিখার হাতে তুলে দিয়ে বলেছে, নে বাছা, নে। তোর বাপ যে বামুন, তুই যে বামুনের মেয়ে, তোর বাপ সেটা খেয়াল রাখতে দেয় ? চাঁড়ালের অধম চালচলন হয়েছে তোর বাপের।

শিখা সাবানটা ফেরত দিয়ে বলেছিল, এত দামি সাবান চাইনি তো, চার পয়সার একটা কাপড়কাচা সাবান দাও।

কত হিসাব এতটুকু মেয়ের ! চার পয়সাব সাবানে যে কাজ চলে সে জন্য সাড়ে-পাঁচআনার সাবান ধারে নেওযাও বোকামি, শুধু এ হিসাবে নয়। সাবানটা নিয়ে অন্য দোকানে ফেরত দেবার ছলে পুরো দাম আদায় কবা কিংবা চাব-ছপয়সা কমে কারও কাছে বিক্রি করার কায়দায় কয়েক আনা লাভ করাও যে বোকামি- এ হিসাবও শিখা জানে !

সেই সাবানে শিখা সাফ করেছিল তার নিজের একটা না-শাড়ি না-ধুতি কাপড় আর ভাইবোনের ছেঁড়া জামা।

চার পয়সার সাবানে সাফ কবা পোশাক পরে তারা তিনজনে প্রকাণ্ড তিনতলা ইটের প্রাসাদ-বাড়িতে বিয়ের ভোজের সারি বেঁধে পাতা আসনের তিনটি আসন দখল করে ভোজ খেয়ে এসেছে !

সে কী খাবে ? অতটুকু মেয়ে ব্যবস্থা করে নিজে ভোজ খেয়ে এসেছে, ভাইবোনদের ভোজ খাইয়েছে—এত বড়ো জোয়ান মদ্দ গ্র্যাজুয়েট মানুষটা সে ভেবে পাচ্ছে না উপোস ঠেকানোর উপায় !

মাধবেব বইটার দিকে চোখ পড়ে।

মাধবেবও চাকরি নেই শুনে সেদিন দেখা করতে গিযে সে এই বইটা এনেছিল। এ অবস্থাতেও সে বই পড়তে চায়। পেটের খিদেয় চোখের সামনে অক্ষর ঝাপসা হয়ে আসে —তবু বই পড়ার নেশা যেন কাটতে চায় না।

কিন্তু শেষ করতে পারেনি বইটা।

নেশা আছে—খিদেয় ঝিমিয়ে গেছে নেশাটা।

বইটা পুরানো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দিলে উপস্থিত সমস্যার সমাধান হয়।

মাধবের অনেক বই আছে, তার হয়তো খেয়ালও নেই তাকে বই দিয়েছে কী দেয়নি।

মোটা বই, দামি বই। দুটো তিনটে টাকাও কী পাওয়া যাবে না ওটা বইয়ের পুরানো বাজারে বিক্রি করে ?

বই হাতে করে নবেন বেরিয়ে যায়।

ভিতরে যেন উথলে উথলে উঠতে চায় প্রতিবাদের ঢেউ,—একেবারে হৃদয়ের ভিতরে।

কষ্ট জীবনে কম পায়নি। কিন্তু ছ্যাঁচরামি করেনি কোনোদিন।

নিবুপায় হয়ে আজ তাই করবে ?

সেকেন্ড হ্যান্ড বুকশপের সামনে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে নরেন নিজের মনেই কয়েকবার মাথা নেড়ে জ্বালাভরা হাসি হাসে। তারপর সোজা মাধবের বাড়িতে চলে যায়।

বলে, শেষ হয়নি, তবু ফিরিয়ে দিতে এলাম বইটা।

কেন ? ক-দিন পরেই দেবেন।

নরেন ক্লিষ্ট হাসি হেসে বলে, না। দোহাই আপনার, আমাকে আর বই দেবেন না। এ রকম বিপদে ফেলবেন না। পেটের জ্বালায় বইটা বিক্রি করে দিতে যাচ্ছিলাম ! কাছে থাকলে হয়তো সামলাতে পারব না, ফেরত দেওয়াই ভালো।

মাধব খানিকক্ষণ চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মাধব আজ বই পড়ছিল না। মেয়ের জ্বর হয়েছে—তার কপালে জলপটি দিচ্ছিল।

জলপটি ! আইসব্যাগ নয়।

ক-দিনে চেহারা পর্যন্ত যেন অন্যরকম হয়ে গেছে মাধবের।

যদি অপমান মনে না করেন, একটা কথা বলতে চাই।

টাকা ধার নেব না কিন্তু, ওতে কোনো লাভ নেই—শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায় না। মাঝখান থেকে টিলেমি আসে।

মাধব সহজভাবেই বলে, টাকা ধার দেবার অফার নয়। একটা টেম্পোরারি কাজের কথা বলছিলাম।

কাজ করে পয়সা পাওয়ার জন্য ওত পেতে আছি। যে কোনো কাজের অফার দিন, কিছুমাত্র অপমান বোধ করব না।

কাজ করে পয়সা রোজগারের কথাই বলছি। আমার নিজের কাজ কিনা, তাই বলতে একটু সংকোচ হচ্ছিল। অ্যাদ্দিন খেটেখুটে যে বইটা লিখছিলাম, ওটা ছাপতে দেব ঠিক করেছি। ম্যানাসক্রিপ্ট রেডি কিন্তু বড্ড বেশি কাটাকুটি হিজিবিজি হয়ে আছে,—একটা ফেয়ার কপি করে প্রেসে দিতে হবে।

মাধব একটু থামে। নরেন চুপ করে থাকে।

দেখছেন তো কীরকম ঝঞ্ঝাটে আছি—ওদিকে চাকরির ব্যাপার, এদিকে ছেলেমেয়ের ঝঞ্ঝাট। তাছাড়া, ও সব কপি করার কাজ আমার একদম আসে না। আপনি ওটা নিয়ে গিয়ে যদি কপি করে দেন, প্রেসে দেবার পর প্রুফটাও দেখে দেন—

নরেনের মুখ দেখে মাধব জোর দিয়ে বলে, কাজ করে বন্ধুর কাছে টাকা নিতে কোনো অপমান নেই। আপনি না করলে আমি আরেকজনকে দিয়ে করাব—টাকা আমাকে দিতেই হবে।

নরেন বলে, অপমান নয়। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। নিজে বইটা ছাপাবেন ? কোনো পাবলিশার পেলেন না ? পাবলিশারকে দিয়ে দিলেই তো ঝঞ্ঝাট চুকে যেত।

কোথায় আবার পাবলিশার খুঁজে বেড়াব ? নিজেই ছাপছি।

সে কথাটাই ভাবছিলাম। আপনাদের মতো লোকের কাছে পাবলিশাররা আসে না কেন ? আপনার ম্যানাসক্রিপ্ট তৈরি আছে জানা থাক বা না থাক, তাগিদ দিয়ে আপনাদের দিয়ে বই লেখায় না কেন ?

তাদের কী গরজ ?

গরজ বইকী—বই প্রকাশ করাই তাদের ব্যাবসা। ভালো বই হলে তাদেরও লাভ। ওদের এটুকু খেয়াল হয় না যে আপনাদেব মতো যারা দামি বই লিখতে পারেন তাদের আবার পাবলিশার খুঁজে বেড়াবার ঝঞ্ঝাট পোষায় না ? এ রকম অনেকে আছেন, জীবনে শুধু বই পড়ে জ্ঞানের চর্চাই করে যান—বই লেখার কথাটা মনেও আসে না। এটা সবারই লোকসান অনেক দামি কথা নতুন কথা ভেবেছেন, লিখে রেখে গেলেন না বলে আমরা পেলাম না।

মুখে এ কথা বলে বটে কিন্তু মনে মনে নরেনের খটকা লাগে, সত্যই কি এটা লোকসান ? জ্ঞানী ব্যক্তিরা বই তো কিছু কম লেখেনি, লেখাতে কামাইও পড়েনি—দোকানে দোকানে রাশি রাশি বই !

তার মধ্যে বেশির ভাগই অবশ্য পুরানো জ্ঞানের জাবরকাটা, যা মানুষ আগেই জেনেছে সেটাই আবার অন্যভাবে বলার চেষ্টা।

পুরানো মোটা কথাকে সরু করে এবং সরু কথাকে মোটা করে নূতনত্ব ফলাবার চেষ্টা। জেনেশুনে সকলেই যে ফাঁকি দিয়ে নাম করার জন্য এ রকম চেষ্টা করে তা নয়। অনেকের জানাই

থাকে না যে জ্ঞানের জাবর কেটে ফাঁকির কারবার চালাচ্ছি, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে আমি নতুন কথা বললাম, মানুষের জ্ঞান বাড়িয়ে ধন্য হলাম !

কিন্তু মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে জমা করার মতো নতুন জ্ঞান খাঁটি জ্ঞান যদি কারও দেওয়ার থাকে, প্রকাশকদের উদ্যোগের অভাবে সেটা কেন চাপা পড়ে যায় ?

তবু এত জ্ঞান কোথায় পেল মানুষ, এতদূর এগোল কী করে ?

কার্ল মার্কসকে দেশ থেকে দূর করে দিলেও কী তার নতুন জ্ঞানের প্রচার এবং প্রসার প্রকাশকের অভাবে চাপা পড়ে গেছে ?

বিদেশে দারিদ্র্য ভোগ করেও কী সারা জগতের স্বীকৃত পুরানো সত্যমিথ্যার জ্ঞানকে অবলম্বন করেই নতুন আলোকে নতুন সত্যমিথ্যার জ্ঞান সৃষ্টি করে সারা জগতে ছড়িয়ে দেওয়া ঠেকে থেকেছে ?

কী ভাবছেন ?—প্রস্তাবটা পছন্দ হল না ?

পছন্দ হয়েছে বইকী। কাপড়ের দোকানে খাতা লেখার কাজ চেয়ে পাইনি—আপনি তো আমায় যেচে মস্ত সম্মান দিলেন, আমার বিদ্যাকে মূল্য দিলেন।

মাধব ভারী খুশি হয়।

একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়ে বলে, শুনে আপনি হয়তো চমকে যাবেন, তবু আপনাকে বলি। মানসীর ব্যবহারে আমার যত রাগ দুঃখ জ্বালা হয়েছিল, সব প্রায় মিলিয়ে গেছে। ও যদি এ রকম ব্যবহার না করত, আমাকে এ রকম বিশ্রী অবস্থায় ফেলে চলে না যেত— আমি বোধ হয় কোনোদিন টেরও পেতাম না কী রকম ছাঁকা জ্ঞান নিয়ে মেতে আছি।

নরেন উৎসুক ও উৎসাহিত হয়ে বলে, আমায় কিছু খেতে দিয়ে তারপর বলুন। খিদেটা জুড়োলে আপনার কথা ভালো বুঝতে পারব। আমি অন্যভাবে ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম।

মাধব মিষ্টি সুরে ডাকে, শুভা ? একটু শুনে যাও ?

বাইশ-তেইশবছরের একটি রোগা ছিপছিপে শ্যামবর্ণা মেয়ে ঘরে এসে বলে, কী কন ?

ম্লান বিষণ্ণ মুখ। ধীরতা স্থিরতার যেন প্রতিমূর্তি।

মাধব কেন ডেকেছে, সে কী বলবে শোনার জন্যই যেন সে এ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে—আর কিছুই সে দেখবে না, কিছুই সে শুনবে না—তার কোনো কৌতূহল নেই, কোনো সাধ নেই।

মাধব যেন আবেদনের সুরে বলে, এঁকে কিছু খেতে দিতে পার ? বাড়িতে কিছু আছে, না আনতে হবে ?

আছে।

সুস্পষ্ট জবাব দিয়ে সুস্পষ্ট পদক্ষেপে শুভা ফিরে যায়।

নরেন বলে, খেয়ে নিয়ে তারপর বড়ো কথাটা ভালো করে শুনব। খিদেয় মাথা ঘুরছে, গা গুলোচ্ছে—কী বলবেন হয়তো বুঝবই না। ইনি কে ?

সে যে এ প্রশ্ন করবে সেটা তো জানাই ছিল। মাধব নিজে থেকে শুভাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেও কোনো দোষ হত না।

মাধব বলে, রাঁধুনি রাখতে হল একজন, উপায় কী ?

উদ্‌বাস্তু মেয়ে না ?

বোধ হয় উদ্‌বাস্তু।

মাধব একনজর তার মুখের দিকে চেয়ে আবার বলে, আপনি নানারকম কত কী ভাববেন মনে করে একটা কথা বলব না ভেবেছিলাম। মেয়েটি সত্যি ভালো। একবার যা করতে বলা হয় সব নিখুঁতভাবে করে যায়—দুবার বলতে হয় না। জগন্নাথবাবুকে একটা রাঁধুনির জন্য বলেছিলাম—উনি নিজে সঙ্গে নিয়ে এসে শুভাকে দিয়ে গেলেন। জগন্নাথবাবু চলে যাবার চেষ্টা করছিলেন, শুভা ছাড়ল না। বলল—

শুভার ভাষায় তার কথাগুলি শোনাতে পারবে কিনা মনে মনে আওড়ায় মাধব। বোধ হয় হার মেনেই বলে, যাবেন না আপনি, সামনে থেকে কী কাজ করব না করব বোঝাপড়া করে দিন। খাওয়া-দাওয়া দিবেন, দশ টাকা বেতন দিবেন যে কাজ করনের লেইগা দিবেন আমি তা করুম। বাড়তি কিছু করুম না। আমার কাজ প্রাণ দিয়া করুম।

নরেন শুকনো গলায় বলে, আপনি সাধক মানুষ তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করছি বাড়তি কাজ করার মানে বুঝেছিলেন তো ?

বুঝেছিলাম বইকী। আমাকে কি এতই বোকা ভেবেছেন ? জীবনে কোনো মেয়ের কাছে বাড়তি কাজ চাইনি—কোনোদিন চাইবও না।

সতেজে এ কথা ঘোষণা করে সানন্দে মাধব বলে, কিন্তু অন্যরকম বাড়তি কাজ শুভা নিজে থেকেই করছে। যতক্ষণ ভাত ফুটছিল, ইলার মাথায় নিজেই জলপটি দিয়েছে, হাওয়া করেছে।

নরেন বলে, বটে !

মাধব নিজের মনে বলে যায়, আমায় ডেকে বলল, এইবার মাছ তরকারি কাটুম ভাজুম রান্না করুম—আপনে খানিক জলপটি দ্যান। বরফ দিলে হইত না ? আইসব্যাগ নাই ? আপনাকে বলব কী ভাই, মাথাটা যেন গুলিয়ে দিল মেয়েটা। ঠিক কথা, ইলার মাথায় একটা আইসব্যাগ দিলে যে কাজ সব চেয়ে ভালোভাবে হয়—সেই কাজ আমি সারছি মাথায় জলপটি দিয়ে !

সখেদে আবার বলে, একটা মুখ্যু মেয়ের যেটা খেয়ালে আসে, আমার মতো মহাপুরুষ বিদ্বানের বুদ্ধিতে সেটা ধরাই পড়ে না।

নরেন সোজাসুজি প্রশ্ন করে, দিনরাত থাকে ?

মাধব বলে, পাগল হয়েছেন ? খাওয়াপরা দশ টাকা বেতনে দিনরাত থাকবে ? সকালে এসে রেঁধে বেড়ে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে এগারোটার সময় খাবার নিয়ে বাড়ি চলে যায়। চারটের সময় এসে বিকালের রান্না সেরে খাবার নিয়ে বাড়ি যায়। সন্ধ্যার সময় আমি ওদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। রাত নটা-দশটার সময় এসে ছেলেমেয়ের সঙ্গে শুয়ে ঘুমোয়।

নরেন চমৎকৃত হয়ে বলে, সে কী !

নরেন ভাবছিল মানসীর কথা। সে লোকনিন্দার কথা ভাবছে মনে করে মাধব বলে, লোকে কী ভাববে বলছেন তো ? ভাবলে কী করব ! ছেলেমেয়েগুলি একলা শুতে পারে না, ভয় পায়। সেই জন্য আমি বলেছিলাম, রাত্রে ওদের কাছে শুতে হবে। আমি নিজের কাজ করব না ওদের ভয় সামলাব ?

নরেন জোর করে কথা ঠেকিয়ে রাখে। কে জানে মানসীর উপর মাধবের এটা প্রতিশোধ কিনা !

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মাধব আবার জোর দিয়ে বলে, কথাটা খেয়াল করিনি ভাববেন না। জেনেশুনেই শুভাকে রাত্রে ছেলেমেয়েদের কাছে শুতে বলেছি। যার যা খুশি ভাবুক, আমি গ্রাহ্য করি না। মাইনে দিয়ে রাঁধাবাড়ার জন্য, ছেলেমেয়ে দেখবার জন্য যাকে খুশি রাখব—লোকের কী ? তাছাড়া, আমার তো মনে হয় না লোকে এই নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে।

নরেন তা জানে। দু-চারজন একটু হাসাহাসি করতে পারে, অল্পবয়সি ঝি রাঁধুনি রেখে ভদ্রলোকের বদনাম হয় না। কিন্তু মাধব কেবল লোকের কথাই বলছে—মানসীর কথাটা কি সত্যই ওর খেয়ালে আসেনি ?

ভুল বুঝে ফিরে এসে শুভার জন্যই মানসী আবার গটগট করে দিদির কাছে চলে গেলে তাকে যে দোষ দেওয়া যাবে না—এটুকু বাস্তববুদ্ধি কি তার নেই ?

অথবা সে যা ভাবছে তাই ঠিক ? জেনেশুনে মাধব প্রতিশোধ নিচ্ছে মানসীর উপর ?

আমি বউদির কথা ভাবছিলাম। মেয়েদের মন বোঝেন তো ? শুভা একেবারে ঝি-রাঁধুনি ক্লাসের মেয়ে হলে কথা ছিল না। বউদি জানলে চটে যাবেন।

মাধব উদাসভাবে বলে, যাবেন। আমি তার কী করব ? আমি যাকে পেয়েছি রেখেছি।

না, প্রতিশোধ নয়। মনের তলায় যাই থাক মাধবের, জেনে বুঝে প্রতিশোধ নেবার জন্য সে বিশেষ করে শুভাকে রাখেনি। মানসী কী মনে করবে এটাই সে গ্রাহ্য করে না।

মাধবের অবজ্ঞা আন্তরিক। মোটা মাইনের চাকরি যার কাছে মানুষের চেয়ে মূল্যবান তাকে অবজ্ঞা না করে মাধবের উপায় নেই।

ইতিমধ্যে শুভা মামলেট ভেজে এনে দেয়।

নিঃশব্দে সেটা উদরস্থ করে এক গ্লাস জল খেয়ে নরেন প্রশ্ন করে, এবার বলুন তো কথাটা—বউদি চলে যাওয়ায় আপনার কী উপকার হয়েছে বলছিলেন ?

নিজেকে চিনতে পেরেছি, আমার জ্ঞানচর্চার ফাঁকিটা ধরতে পেরেছি। আমার জ্ঞানচর্চা করেই সুখ—সেটা জগতের কোনো উপকারে লাগল কী লাগল না সে জন্য ততটা আসে যায় না। জ্ঞানটা দিয়ে কী করব সে ভাবনা না ভেবেই পড়াশোনা নিয়ে মেতে আছি।

মাধবকে নিয়ে মানসীর সঙ্গে সেদিনের আলোচনার কথা নরেনের মনে পড়ে। এদের রেশনটা এনে দিয়ে মাধবের বাজার করে ফেরার সময়টুকুর মধ্যেই মাধব সম্পর্কে তাদের একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল—মাধব স্বার্থপর। তখন তার চাকরি ছিল।

চাকরিটা যদি আজও থাকত, মাধবের এই আত্মজ্ঞান জন্মেছে দেখে তার বোধ হয় খুশির সীমা থাকত না। কিন্তু চাকরি খুইয়ে হৃদয় মনের অনেক শিক্ষাই তার জুটেছে ইতিমধ্যে। খুশি হবার বদলে আজ তাই নানাপ্রশ্ন জাগে। খটকা লাগে যে মাধব কী সত্যই বাস্তবতার আলোয় তার আত্মকেন্দ্রিকতার স্বরূপ চিনেছে ? সেটাকে নিজের স্বার্থপরতা বলে মানতে পেরেছে ? অথবা ছাঁকা জ্ঞানচর্চার মতোই এটাও তার ছাঁকা জ্ঞান যে জ্ঞান দিয়ে কী করবে না জেনেই সে এতদিন জ্ঞানচর্চায় মশগুল হয়ে থেকেছে ?

নিজের জ্ঞানচর্চার বিষয়ে এই জ্ঞানটুকু নিয়েই কি সে খুশি থাকবে ?

শুধু তাই নয়। আত্মদর্শনে তার ভুল আছে কি না বিচার করবে না ? মানসীর জন্যই তার নতুন আত্মজ্ঞান জন্মালো অথবা বরখাস্ত হওয়াও এর একটা মূল কারণ—সেটা যাচাই করবে না ?

মাধব বলে, কী হল ? কথাটা তো সোজা, বুঝতে পারলেন না ?

নরেন বলে, বুঝেছি বইকী। কিন্তু শুধু বউদিকে দায়ি করবেন ? চাকরি খোয়ানোর হিসাবটা ধরবেন না ?

চাকরির হিসাব ধরেছি। মানসীই আসল কারণ। মানসী এ রকম ব্যবহার না করলে আমি কী করতাম জানেন ? রেগে দিল্লিতে কয়েকজনের কাছে কয়েকটা চিঠি আর একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিতাম। আমার জন্যই চাকরিটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল—আমার মতো অন্য কাউকে নেওয়া হয়ে থাকলেও আরেকটা চাকরি ক্রিয়েট করে আমায় নিত। ডিসমিসড হয়ে বাড়ি ফেরার সময় এই প্ল্যানটাই মাথায় ঘুরছিল।

নরেন বলে, রাগ করবেন না কিন্তু। আমি শুধু বুঝতে চাইছি। বুঝিয়ে না দিলে আপনার সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে যাবে। আপনি বলেছিলেন, দিল্লির চাকরি নেননি, এ চাকরিটা খোয়ালেন, এ জন্য বউদি রাগ কবে চলে গেলে আপনার দুঃখ হত না। কিন্তু অন্যায় করে আপনাকে তাড়িয়েছে, আপনি ফাইট করে ওদের হুকুম বাতিল করাবেন—এ সব শুনেও বউদি চলে গেলেন বলে আপনার রাগ। দিল্লির চাকরি নেওয়ার প্ল্যান ভাঁজার সঙ্গে এ চাকরিটাব জন্য ফাইট করার প্ল্যান তো খাপ খায় না।

মাধব রাগ করে না। বরং খুশি হয়েই বলে, ইন্সটিঙ্কটিভলি মূল কথাটা ধরতে পারেন বলেই আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে ভালো লাগে। কী ঠিক করেছিলাম জানেন ? দিল্লির চাকরির খাতিরেও এ চাকরিটার জন্য ফাইট বন্ধ করব না। এরা হুকুম ফিরিয়ে নেবে, স্বীকার করবে অন্যায় হয়েছিল, তারপর এখানে রিজাইন দিয়ে আমি দিল্লি চলে যাব। মানসী এটা হতে দিল না।

নরেনের ধাঁধা লাগছিল। তবু আর কথা না বাড়িয়ে সে বলে, এবার বুঝেছি। একটা বই দিন না ?

মোটা আর ভারী ওজনের একটা বই তাকে দিয়ে মাধব বলে, বুঝতে একটু কষ্ট হবে—তবু পড়ে ফেলুন।

বস্তির ঘরে ফেরাব পথে নরেন মানসীকে নতুন দৃষ্টিতে নতুনভাবে বিচার করার চেষ্টা করে।

মানসীর জন্য সমবেদনা থাকলেও তাকে নরেন তেমন পছন্দ করতে পারত না।

সে বরাবর জানে মাধবের দার্শনিক আদর্শপন্থী স্বার্থপরতা সত্যই অসহনীয় যে কোনো স্ত্রী ও মা-র কাছে।

ওই স্বার্থপরতা মেনে নিত বলে মানসীর উপর তাব বিতৃষ্ণা জাগত না।

স্বামীকে মানতে হলে, তার ও তার সন্তানের ভরণপোষণের মালিক ও দায়িক স্বামীকে মানতে হলে, তার আত্মকেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চার স্বার্থপবতাকে না মেনে কোনো উপায় ছিল না মানসীর।

কারণ, এ রকম জ্ঞানচর্চা করে বলেই, সে এই ধরনের স্বার্থপর দার্শনিক বলেই, মাসে মাসে বেতনের নামে তাকে সাড়ে চারশো টাকা ঘুষ দিয়ে বশে রাখার প্রস্তাব আসে দিল্লি থেকে।

ঘুষ অথবা পুরস্কার অথবা মজুরি।

মাধবও খেটে খায় বইকী, বউ ছেলেমেয়েকে খাওয়ায় বইকী। সেকেলে ঈশ্বরের সাধকের মতো এই রকম জ্ঞানের সাধক সেজে, দিবারাত্রি এই জ্ঞানচর্চায় মেতে থেকে, সাধারণ মানুষের কাছে এই রকম জ্ঞানের বাজারদর বজায় রাখতে সাহায্য করছে বলেই তো মাসে মাসে তাকে সাড়ে চারশো টাকা দেওয়া সমীচীন মনে করে দিল্লির জ্ঞানীরা।

মানসীর আর্থিক উচ্চাশা এবং তার প্রতিক্রিয়া মাধবের মনে অসন্তোষ জাগিয়েছিল বলেই, অসন্তোষটা তার জানা-চেনা মানুষের কাছে আর সভাসমিতিতে বক্তৃতা করার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল বলেই, দিল্লির চাকরির নিমন্ত্রণ সে পেয়েছিল।

মানসী এ সব না বুঝতে পারে। সে জন্য নরেন তাকে দোষ দেয় না।

কিন্তু সে কেন প্রশ্রয় দিত, নিজেকে সমর্পণ করত, নত হয়ে মেনে নিত দিল্লির সাড়ে-চারশো টাকার দাম কষা ? মাধবের জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় স্বার্থপরতারও বাড়তি স্বার্থপরতা ?

তার পাগলামি করার স্বার্থপরতা ?

আগে জানত না। এখন নরেনের যেন মনে হয়, সে আগেই জানত মাধবের চাকরি গেছে শুনলেই মানসী তাকে আখের চিবানো ছোবড়ার মতো ত্যাগ করবে।

নত হয়ে মাধবের অসহনীয় স্বার্থপরতা সইতে সইতে আসছিল বলেই তো মাধবের চাকরি হারানোর ধাক্কায় ফেটে পড়তে হল—গটগট করে চলে যেতে হল দিদির কাছে। আগে থেকে প্রয়োজনেরও বেশি না মানলেই হত মাধবের স্বার্থপরতা ? এ রকম চরম বোঝাপড়ার বদলে মাধব বাড়াবাড়ি করলে রেগে উঠলেই হল যে সে বাড়াবাড়ি সইবে না ? মাধব সংযত হত।

আজ মাধব যা বুঝেছে আগেই তাহলে সেটা খানিক খানিক বুঝত। এভাবে জমানো রাগ ফেটে গিয়ে দিদির কাছে ছুটতে হত না মানসীকে।

৯

নরেন জানে, মাধব তাকে বাঁচাতে পারবে না।

চাকরি খুইয়েও মাধব যে নিজের দুবছর ধরে খেটেখুটে লেখা বই নিজে ছাপাতে চায়, বইটার প্রেসকপি তৈরি করে প্রুফ দেখার জন্য তাকে দু-চারটাকা দিয়ে বাঁচিয়ে দিতে চায়—এর মধ্যেই আছে মাধবের বাস্তববুদ্ধির অভাবের বাস্তব পরিচয়।

এত বড়ো জ্ঞানী, জ্ঞান দিয়ে জগৎসংসারটাকে জেনে ফেলেছে, বুঝে গিয়েছে বস্তু এবং শক্তির মানে, সম্পর্ক ও মর্মকথা—কিন্তু সে এই ছোটো সাধারণ সাংসারিক জ্ঞানটা চাকবি হারিয়েও অর্জন করতে পারছে না যে সে জ্ঞানী হলেও দাস।

এই দাসত্ব ঘুচিয়ে সকলের এগোনো ছাড়া, শিক্ষা সভ্যতা বাড়ানো ছাড়া, সুন্দর সুস্থ আনন্দময় জীবন চাওয়া ছাড়া মানেই হয় না তার বা অন্য যে কোনো মানুষের জ্ঞান নিয়ে মেতে থাকার।

মানুষকে এড়িয়ে মনুষ্যত্বকে এড়িয়ে মাধব চায় মানুষের জ্ঞানের সম্পত্তি একা দখল করে একচেটিয়া কারবার করতে।

বস্তিতে চারজন অশিক্ষিত জীবিকা-কামীদের সঙ্গে একটা খোলার ঘরে গাদাগাদি করে নরেন বাস করে। কোনো বেলা অন্ন জোটে কোনো বেলা জোটে না, এক মাসের আগাম ভাড়া দিয়ে পরের মাসের ভাড়া গুনতে পারবে কি না জানা থাকে না।

তবু মনে হয় এটাই ভালো। কী হবে না হবে কিছুই ঠিক না থাকলেই কিছু হওয়ানোর জন্য করানোর জন্য ঝোঁক আসে, জিদ চাপে।

গ্র্যাজুয়েট যুবক একটা চাকরি পেলেই শেষ হয়ে যায় মানুষ হিসাবে তার অন্য সব কিছু পাওয়ার ঝোঁক,—চাকরি করে কোনোবকমে বেঁচে থাকতে পারলেই যেন জীবনটা ধন্য হয়ে যায়।

মাধবের কঠিন—অতি কঠিন বইটার এগারো নম্বর ফর্মার প্রুফ মাধবের দেওয়া মোটা ডিকসনারিটার বানানের সঙ্গে সাবধানে মিলিয়ে দেখতে দেখতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল নরেনের।

চোখের দোষ ছিল না, দিনের আলোই ঝাপসা হয়ে এসেছে।

ডিম-ভরা একটা তারের ঝুড়ি হাতে নিয়ে মণ্টু ঘরে ঢুকতে নরেনের ধৈর্য আর মনোযোগ দুই-ই শেষ হয়ে যায়।

দীননাথ এখনও কাজ বাগাতে পারেনি, অন্য একটি ছেলের দেখাদেখি মণ্টু ঘুরে ঘুরে ডিম বেচা শুরু করেছে।

গোটা দুই কাঁচা খেতে দিবি মণ্টু ? কাঁচা ডিম খেলে গায়ে জোর বাড়ে।

দাম দিলে দুটো কেন দশটা দিতে পারি।

দুটো ডিম কত দিয়ে কিনলে তোর ক-পয়সা লাভ থাকবে ?

বড়ো মাদ্রাজি পাঁচ আনা জোড়া কেনেন, ছোটো দেশি সাড়ে চারআনা জোড়া কেনেন, দু-পয়সা বাগাবই।

মোটে দুপয়সা ?

পঞ্চাশ দুপয়সায় কম হল নাকি ?

নরেন আশ্চর্য হবার ভাণ করে বলে, তাই তো পঞ্চাশ দুপয়সা ! ও বাবা সে যে অনেক পয়সা রে—একেবারে কাঁটায় কাঁটায় একশো পয়সা ! পুরো এক টাকা ন আনা ! খুব লাভের ব্যাবসা ধরেছিল তো মণ্টু !

তার হালকা সুরের হালকা কথায় মণ্টু আহত হবার বদলে খুশিই হয়। আজ দিন তিনেক সে শুরু করেছে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ডিম বেচার ব্যাবসা অথবা কাজ। ব্যাবসা এটা নয়—বাজার থেকে চাকর দিয়ে ডিম আনার সাধ্য যাদের নেই, চাকরই যাদের নেই—তাদের বাজার থেকে ডিম কিনে আনবার চাকরের কাজটাই সে করে দেবে সস্তায়।

এটা হিসাব করেই নরেন হালকা সুরে কথা বলেছিল। মণ্টু যে অনেক দূরের বাজারে হেঁটে গিয়ে পাইকারি দরে ডিম কিনে এনে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে ডিম বেচে দুটো পয়সা রোজগার করছে—এটা সে আগেই টের পেয়েছিল।

গত দুদিন সে কাগজের ঠোঙায় কয়েকটা ডিম আনত কাগজের ঠোঙাতেই ডিম নিয়ে ফেরি করতে যেত।

আজ তারের ঝুড়িতে সে একেবারে পঞ্চাশটা ডিম এনেছে। ডিম বেচে লাভ করা যায় এটা হাতেনাতে না জেনে সে তার ব্যাবসা এতখানি বাড়াতে সাহস পেত না।

এতগুলো বেচতে পারবি ?

পারব। কিন্তু পচা ডিম বেরিয়ে যায়। ওদিকে বেছে আনতে দেবে না—এদিকে পচা ডিম বদল দেবার কড়ারে ছাড়া লোকে কিনবে না—লাভটা খেয়ে দেয় পচা ডিমে।

এটা সমস্যা বইকী। ডিম ফেরি করার সব চেয়ে বড়ো সমস্যা। তবু এই সমস্যাটাকে পর্যন্ত জয় করে মণ্টু কয়েক আনা লাভ করছে—যে পয়সায় একবেলা খেয়ে, আধপেটা খেয়ে একটু খাদ্যের সঙ্গে বেশি অখাদ্য মিশেল দিয়ে খেয়ে—মণ্টু কোনোরকমে বেঁচে থাকতে পারবে।

নরেন ভাবে, ডিমের ব্যাবসায়েও কি ওই এক নিয়ম ?

ছোটোবড়ো ডিম, পচা ডিম বেছে আনতে না দেওয়ার কায়দায় মণ্টুর লাভ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে সারাদিনের মজুর খাটার দামে ? মণ্টু ডিম এনে সারাদিন দুয়ারে দুয়ারে বেচে লোকসান দেবে না—একটা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট সম্বল করে একবেলা আধপেটা খাদ্য আর দুপয়সার চীনা বাদাম চানাচুর খেয়ে যথারীতি মণ্টু বেঁচে থাকবে ?

এভাবে বেঁচে থাকার জন্যই চালিয়ে যাবে ডিম বেচার মজুরগিরি ?

মণ্টু একেবারে মরে গেলে সে তো আর পাইকারি ডিম কিনে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেচতে পারবে না।

ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে মণ্টু যাতে ডিম বিক্রি করতে পারে সে হিসাবেই ঠিক হয়েছে ডিমের দর, শতকরা পচা ফেরতের নিয়ম, ডিমের দরের তারতম্য ?

সে আরও কিছু বলবে কিনা সে জন্য অপেক্ষা না করেই মণ্টু ডিমগুলি সামলে রাখার চেষ্টা শুরু করেছে দেখে নরেন ভারী খুশি হয়।

পৃথিবীর সমস্ত গরিব মানুষের বাঁচার নিয়মকে মণ্টু যেন সম্মান দিচ্ছে তার পাইকারি দরে কিনে আনা ডিমগুলি ঠিকঠাক সামলে রাখার চেষ্টা দিয়ে—যাতে ভোর ভোর বেরিয়ে চারিদিকে সমস্ত এলাকা ঘুরে এই পঞ্চাশটা ডিম বিক্রি করা শুরু করা চলে।

তখন আসে নন্দন।

অন্য বেশে, অন্য এক নন্দন।

নতুন ধুতি নতুন জামা তার ভাগ্যে জুটেছে কদাচিৎ। বরাবর সে হেমেন্দ্র আর গোবিন্দের পুরানো ধুতি আর জামা পেয়ে কোনোরকমে চালিয়ে দিয়ে এসেছে।

আজ তার পরনের ধুতি আর পাঞ্জাবির নতুনত্ব তাকালেই চোখে পড়ে। ধুতিটা বোধ হয় একবারের বেশি ধোপ খায়নি—কোরাত্বের ছাপ রয়ে গেছে। পাঞ্জাবিটা আনকোরা—ঘরে হয়তো একবার সাবানকাচা করা হয়েছে।

নন্দনের চোখেমুখেও একটা নতুন ভাবের ছাপ।

চাকরি পেয়েছিস, না ?

পেয়েছি। গোবিন্দ চাকরি করে দিয়েছে।

কথা আর বলার ভঙ্গি থেকেই নরেন টের পায় গুরুতর কিছু ঘটেছে।

সেদিন মাধবের কাছে পেটের দুরন্ত খিদেয় ঝিমিয়ে পড়ার গুরুত্ব নিয়ে গিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ কথা শোনার আগে যেমন অস্থিরতা বোধ হয়েছিল, আজ অবিকল তেমনই ব্যাপার ঘটে।

সে বোধ করে কিছু না খেয়ে বন্ধু ও তার আপনজনের জীবনে গুরুতর ব্যাপার ঘটার বিবরণ শোনার সাধ্য তার নেই।

একটু থাম। খিদেয় গা গুলোচ্ছে। ক-টা পয়সা দে—কিছু আনিয়ে খাই। তারপর শুনব।

নন্দন বন্ধুর মুখের দিকেও তাকায় না। বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, দাঁড়া আসছি।

দু-চারপয়সায় খাবার আনতে বেরিয়ে গিয়ে সে কত যে দেরি করে ফিরে আসতে !

নরেনের মনে হয়, আর বুঝি সে ফিরবে না—তার গুরুতর কথার চেয়ে খিদেকে বড়ো করায় বন্ধু বুঝি রাগ করেই চলে গেল !

নন্দন ফিরে আসে দুভাঁড় গরম দুধ আর দুখানা টোস্ট নিয়ে।

নরেন ধাতস্থ হয়। ঠিক কথা—জগৎ নিয়মে চলে। দুমুঠো মুড়ি খেয়ে দিনটা তাকে পাত করতে হচ্ছিল বলেই কি নিয়ম পালটে যাবে জগতের ?

দুটি পয়সায় মুড়ি খেয়ে কালাচাঁদের দলে যোগ দেবার শুধু ইচ্ছাটা প্রকাশ করেই রুটিমাংস পেট ভরে খেয়ে আসার তাগিদ সে যে বুঝেছে, সেটা কখনও ব্যর্থ হতে পারে ?

সে অবশ্য ভেবে পায়নি, আজকেই তার এক ভাঁড় দুধ আর একখণ্ড টোস্ট জুটে যাবে।

কিন্তু সে ভেবে পায়নি বলেই কি এটা অনিয়ম ?

নিয়ম কি তার ভাবনার তোয়াক্কা রাখে ?

বেশ গরম ছিল দুধটা। বেশ মচমচে ছিল টোস্টটা।

একেবারে রাজভোগ !

কী ব্যাপার বল তো এবার শুনি ?

গোবিন্দ স্যুইসাইড করেছে।

দুই বন্ধু নির্বাক হয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকে। ঘরে অন্ধকার গাঢ় হয়—পরস্পরকে তারা দেখতে পায় না। পরস্পরের মুখ দেখার সাধও তাদের হয় না।

গোবিন্দ আত্মহত্যা করেছে !

শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষায় নয়, অনেক দিক দিয়ে বিভ্রান্ত গোবিন্দ।

তা এ রকম বিভ্রান্তেরাই তো আত্মহত্যা করে।

কী বিষম নীতি এতকাল পালন করে এসেছে তার বাড়ির লোকেরা—কী রকম সাংঘাতিক বিপজ্জনক নীতি ! নন্দনকে চাকর করে রেখে তাকে ঘরের ছেলে হয়ে থাকার সব রকম অধিকার দেওয়ার নীতি ! মাস্টার অব আর্টস হয়েও নন্দন আজ এতকাল বেকারির বোঝা বইতে পেরেছে, দোকানটা নষ্ট হওয়ার ধাক্কায় ক-মাসে কাবু হয়ে গোবিন্দ আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ল !

এ সব স্থায়ী কারণ—একটা বিশেষ অবস্থায় পড়লে লড়াই করার বদলে আত্মহত্যার ঝোঁক চাপার কারণ।

প্রত্যক্ষ কারণও কিছু একটা ছিল নিশ্চয় ?

বাড়িতে রাগারাগি হয়েছিল, না ? ঝগড়াঝাঁটি খোঁচা দেওয়া টিটকারি এ সব শুরু হয়েছিল তো ?

নন্দন মাথা নাড়ে।

ও সব বিশেষ হয়নি। রাগারাগির বদলে সবাই আপশোশ আর হা-হুতাশটাই বেশি করে এসেছে।

সেটা সোজা টিটকারি নয়। শুনতে শুনতে গোবিন্দ নিজেকে বেশি বেশি ধিক্কার দিত, বেশি বেশি অপমান বোধ করত।

ঝগড়া একটা হয়েছিল—ছবির সঙ্গে।

ছবির সঙ্গে ?

নরেন সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়। ছবিরাণী তো মোটেই ঝগড়াটে মেয়ে নয়—সে তো কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না !

নন্দন বলে, ছবির বিয়ের ব্যাপার নিয়ে বেধেছিল। আমিও লক্ষ করছিলাম, কিছুদিন থেকে ছবি কী রকম ছটফট করে বেড়াচ্ছে—হ্যাঁরে, ছবির সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল, কথা হয়েছিল ?

নরেন সায় দিয়ে বলে, হয়েছিল। ছবির হিসেব খুব সোজা—আমার কোনো দিন চাকরি-বাকরি হবে না। কাজেই বাপ-দাদার ঘাড়ে পড়ে থাকার চেয়ে যা জুটছে তাই মেনে নেওয়া ভালো। একজনেরটা খেয়েপরে বাঁচতে হবে তো ওকে।

নন্দন গম্ভীর মুখে বলে, ও ! এবার বুঝেছি। তুই চাকরির চেষ্টা করতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিস, চাকরি না বাগিয়ে বাড়ি ফিরবি না,—এ খবরটা শোনার পরেই ছবির ছটফটানি শুরু হয়।

ছবিরাণীর ছটফটানি। অন্য সময় হয়তো এ বিষয় আরও কিছু শুনবার সাধ নরেনের হত, আজ কিন্তু ছবিরাণীর প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে সে কেবল গোবিন্দের কথা শুনতে চায়।

কী নিয়ে ওদের ঝগড়া হল ?

কিন্তু গোবিন্দের কথাতে ছবিরাণীর কথাও আসে।

নন্দন বলে, কোথাও কিছু নেই ছবি হঠাৎ জিদ ধরল, বিয়ের তারিখ দু-তিনমাস পিছিয়ে দিতে হবে। কেন দিতে হবে ? না, তাড়াহুড়ো করে একজন আজেবাজে লোকের হাতে তাকে সঁপে দেওয়া হচ্ছে—তা চলবে না। এটা হাতে থাক—কয়েকটা মাস দেখা যাক। ইতিমধ্যে গোবিন্দ নিশ্চয় কিছু

করতে পারবে—তার মন বলছে পারবে। কাজেই এ রকম দূর দূর করে তাকে তাড়াতে হবে না। গোবিন্দ ভাবল ছবি বুঝি তাকে খোঁচা দিচ্ছে, টিটকারি দিচ্ছে—দোকান খুইয়ে বোনটাকে পর্যন্ত যার তার কাছে বলি দেবার কথা বলছে। ছবি যত বলে যে গোবিন্দ নিশ্চয় কিছু করতে পারবে—গোবিন্দ তত চটে যায়। তারপর ছবিও গেল রেগে।

নন্দন একটু চুপ করে থেকে অন্য সুরে বলে, ছবিকে আমি কোনোদিন এ রকম বাগতে দেখিনি। বড়োভাই—তাকে যা মুখে এল বলতে লাগল, শাপতে লাগল। তারপর মাথা খারাপ হয়ে গেল ছবির মা-র—গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল। একবার ছবিকে গাল দেয়, একবার গোবিন্দকে গাল দেয়। তুই তো জানিস ছবির মাকে, বুঝতেই পারছিস ব্যাপারটা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটে।

নরেন ধীরে ধীরে বলে, কীভাবে—?

বিষ খেয়ে। ছবির মা মুখ খুলতে হঠাৎ গোবিন্দ কেমন চুপ হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে জামা-টামা গায়ে দিয়ে বেরিযে গেল। সকলেব একটু ভয় করতে লাগল—কিছু না করে বসে। রাত্রে বাড়ি ফিরল, শুধু একটু গুম খাওয়া ভাব, আর কিছু নয়, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে রাত্রে ঘুমোতে গেল। তারপর রাত্রে কখন উঠে বেরিয়ে গেছে কেউ টের পায়নি। শেষরাত্রে পুলিশ এসে ডাকাডাকি, নগেন আর বিপিনের বড়ো কাপড়ের দোকানের সামনে গোবিন্দ মরে পড়ে আছে—নাম ঠিকানা দিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে।

এ কী নাটক ? কী মানে এই সাধারণ পরিবারের সাধারণ একটা ছেলের সাধারণ ভোঁতা জীবনের এই নাটকীয় পরিণতির ?

নরেনের মনে হয় সাধারণ মানুষের জীবন যত অসাধারণ নাটকীয় উপাদান এবং ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ায় ঠাসা হয়ে আছে, দু-চারটে এই রকম ফেটে-পড়া নাটকীয় ঘটনা তারই ঘনীভূত নমুনামাত্র।

গোবিন্দ চাকরি করে দিয়ে গেছে বলছিলি ?

হ্যাঁ, গোবিন্দের জন্যই আমার চাকরি।

চিঠিতে গোবিন্দ প্রথামত লিখে রেখে যায়নি যে সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে, তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ি নয়। বরং মৃত্যুর জন্য অতি পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় নগেন আর বিপিনকে দায়ি করে গেছে। ওরা ঠকিয়ে তার দোকানটা নিয়েছে, তাকে বিষ খাইয়ে খুন করেছে।

পরের ঘটনা জানত না তাই নরেন বলে, ছেলেমানুষি বুদ্ধি তো। ভেবেছে এ রকম চিঠি লিখে রেখে গেলেই নগেন আর বিপিন খুব জব্দ হয়ে যাবে। পুলিশ একটু হয়রানও তো করেনি ওদের ?

নন্দন বলে, তা করেনি—শুধু কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু গোবিন্দের সবটাই কি ছেলেমানুষি বুদ্ধি ছিল ? সত্যই কি বেচারা জানত না এ রকম চিঠি লিখে রেখে গেলেও পুলিশের হাতে ওদের কিছু হবে না ? আমার মনে হয় জানত। ছেলেমানুষি ছিল চূড়ান্ত রকম—সেটা বাড়ির লোকের দোষ। কিন্তু এদিকে চালাকও কম ছিল না ছেলেটা। ও রকম চিঠি লিখে গেলে, ওদের দোকানের সামনে গিয়ে মরলে ওরা পুলিশের হাঙ্গামায় পড়ে জব্দ হবে—ঠিক এটা গোবিন্দ চায়নি। সে চেয়েছিল এই ব্যাপার নিয়ে একটা হইচই হবে, সবাই ওদের ছিছি করবে। নিজে বিষ খেলেও, ওদের জন্যই তো তাকে বিষ খেয়ে মরতে হয়েছে—এটা জানাজানি হয়ে যাবে। হলও ঠিক তাই। নানালোকে নানাকথা বলতে লাগল, টিটকারি দিতে লাগল। কতকগুলি ছেলে সুযোগ পেলেই মারধোর করবার তালে ফেরে, ঢিল-টিল ছোঁড়ে, দোকানের সামনে প্ল্যাকার্ড এঁটে দেয়—আরও কত কাণ্ড। একদিন রাত্রে দোকানের মধ্যে কারা কতগুলি পটকা ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।

নরেন বলে, বড়ো রাস্তায় দোকান, সব সময় কত লোকজন। পটকা ছুঁড়ে কি আর পালিয়ে যেতে পারত? ওরাই চুপচাপ থেকেছে—নতুন হাঙ্গামা করতে চায়নি।

মধ্যস্থ স্থানীয় কয়েকজন ব্যাপারটা নিয়ে তারপর একটু আলোচনা করেছিল নগেন ও বিপিনের সঙ্গে। তাদের দোষী করা নয়, দায়ি করা নয়, দাবিদাওয়ার কথা নয়—তবে ছেলেটা এভাবে মরল, বুড়ো হেমেন্দ্র বহুকাল কাপড়ের ব্যাবসায়ে ছিল, বাড়ির লোকের অবস্থা বড়ো কাহিল—তারা বরং উদারভাবে নন্দনকে একটা কাজ জোগাড় করে দিক।

ওই ক-জন নিজেরা যেচে মধ্যস্থতা করতে গিয়েছিল কিনা নন্দন জানে না, নগেনরাই হয়তো বেগতিক দেখে ওদের মধ্যস্থ করেছিল।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছিল। হ্যাঁ, কাজ একটা নন্দনকে তারা দেবে। এটুকু না করলে চলবে কেন ? একটা পরিবারকে তো না খেয়ে মরতে দেওয়া যায় না !

এদিকে গোবিন্দের কথা ভেবে নন্দনের প্রাণটা হুহু করে। ওই নগেনদের কাছেই শেষ পর্যন্ত তাকে কাজ করতে হবে—গোবিন্দের প্রাণের মূল্য দিয়ে জোগাড় করা কাজ ?

কিন্তু মুখে সে কিছু বলেনি।

বাড়ির লোকে যা বলবে সে তাই করবে !

ওরা যদি চায় সে কাজটা করুক, ওরা যদি পারে এই চাকরির টাকার ডালভাতে পেট ভরাতে—তার কোনো আপত্তি নেই।

সে তো নিজের জন্য চাকরিটা নেবে না।

ছবিরাণী বলেছিল, না, তা হবে না। ওদের কাছে তুমি চাকরি নিলে আমিও বিষ খাব, নয় গলায় দড়ি দেব।

বলে সে কেঁদে ফেলেছিল। গোবিন্দের জন্য তখন সকলের শোকটাই টাটকা।

হেমেন্দ্র বলেছিল, না। এ কাজ নেওয়া যায় না। চল তো নন্দন আমরা একবার বেরোই।

নন্দনকে সঙ্গে নিয়ে হেমেন্দ্র গিয়েছিল চেনা একজন বড়ো ব্যবসায়ীর কাছে। তার নাম রাধারমণ। মোটামুটি ব্যাপার জানা ছিল সকলেরই, খুঁটিনাটি আরও। সব বিবরণ জানিয়ে হেমেন্দ্র বলেছিল, এ অনুগ্রহ নেওয়া যায়, আপনারাই বলুন ? আপনারা একটা ব্যবস্থা না করলে তো উপায় নেই আর।

নগেন ও বিপিনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাধারমণ সঙ্গে সঙ্গে নন্দনকে একটা কাজে বহাল করেছিল।

চাকরিটা গোবিন্দের জন্যই। নইলে কাজ দেবার গরজ কি হত রাধারমণের ? নগেন ও বিপিন সর্বনাশ করেছে দাদুর, তার নাতিটাকে দিয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করিয়েছে—সে তাড়াতাড়ি একটা কাজ দিল নন্দনকে। লোকে দেখুক ওরাও কেমন লোক, রাধারমণই বা কেমন লোক—তুলনা করুক।

কী করতে হয় ?

হিসাব দেখা থেকে অনেক কিছু। বিশেষ বিশেষ পার্টির সঙ্গে দেখা করতেও পাঠায়—যাদের কাছে এম এ পাস করার একটু মর্যাদা আছে।

লণ্ঠনের আলোয় দুই বন্ধু মুখোমুখি বসে থাকে।

নরেনের মনে পড়ে তার চাকরি হবার পর দুই বন্ধু তারা তফাতে সরে গিয়েছিল। হিংসায় নয়, বিবাদ করে নয়—একজনের চাকরি করার এবং আরেকজনের বেকারি করার দায়ের জন্য।

আপিসে একটা চাকরি খালির খবর নিয়ে অনেকদিন পরে নন্দনের কাছে গেলে সে বেশ একটু জ্বালাও প্রকাশ করেছিল বন্ধুর অবহেলায়।

আজ আবার অনেকগুলি দিনের অদর্শনের পর নন্দন তার কাছে এসেছে চাকরি পাওয়ার খবর দিতে।

কিন্তু কী নিদারুণ সুসংবাদটা ?

নন্দন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমাদের আসল দোষ কী জানিস? জীবনযুদ্ধটা বড়ো একা একা চালাই। তোর যুদ্ধ তোর, আমার যুদ্ধ আমার। একসঙ্গে যদি লড়াই চালাতাম—

তাও চালাচ্ছি বইকী। আমাদের তেরোজনের জন্য একমাসের ওপর আপিস বন্ধ ছিল, সাতজনকে কাজে ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। আমরা ক-জন বাদ পড়লাম অল্পদিন কাজ করেছি বলে, দীননাথেরও একটা কাজ জুটে গেছে।

গোবিন্দের নাটকীয় আত্মহত্যা নিয়ে হইচই পড়ে গেলে ব্যবসায়ী সমাজের মুখরক্ষার জন্য নগেনরাই এগিয়ে এসেছিল নন্দনকে কাজ দেবার জন্য।

গোবিন্দ রেখে গিয়েছে বুকের মধ্যে কাঁচা ঘা, নন্দনেরা ইতস্তত করেছিল এই উদারতার অপমান গ্রহণ করতে।

রাধারমণ খুশি হয়ে তাদের মান রেখেছে, বলামাত্র নন্দনকে কাজ দিয়ে অর্জন করেছে ব্যবসায়ী সমাজের মুখরক্ষার গৌরব।

কেবল নন্দনকে নয়।

দীননাথকেও সে কাজ দিয়েছে।

বলেছে, গোবিন্দের দোকানে যারা খাটত তাদের সবাইকে আমি কাজ দেব—না থাক আমাব লোকের দরকার, হোক আমার লোকসান। টাকাটাই বড়ো নাকি জগতে ? ঢের টাকা কামিয়েছি, ঢের টাকা কামাব—তাই বলে নিজের মনুষ্যত্বকে বিক্রি করব নাকি টাকার কাছে ?

বলেছে, আরেকটা কে ছোকরা কাজ করত শুনলাম গোবিন্দের দোকানে ? তার কেউ পাত্তা জানো ? খোঁজ পেলে ওকেও ডেকে এনো—ওকেও আমি কাজ দেব।

তার মহানুভবতার মানে বুঝতে অবশ্য কারও দেরি হয়নি।

মৃত গোবিন্দের জন্য সে যত করবে ততই দশজনের কাছে তাব গৌরব—ততই নগেন আব বিপিনের অপমান বদনাম !

নামটাই সকলে জানত—ভোলা। কোথা থেকে জুটিয়ে এনে গোবিন্দ ওকে দোকানের কাজে লাগিয়েছিল কেউ জানে না—গোবিন্দ বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিত নামহীন গোত্রহীন ছোঁড়াটাকে।

দোকানেব মালিক বলে গোবিন্দকে যেন গ্রাহ্যই করত না ছেলেটা। বেঁটে মোটাসোটা বেপরোয়া ছেলে—ট্যাবা ট্যাবা গালে বসন্তের দাগ।

মাসে দুবার তিনবার সে কাজ ছেড়ে দিতে চাইত রুখে উঠে, গোবিন্দ নরম হয়ে তোষামোদ করে তার চাকরি বাঁচিয়ে দিত।

দু-চারটে যোগসূত্র বোধ হয় জানা ছিল দীননাথের—একই দোকানে উদয়াস্ত বালক ও প্রৌঢ় দুজনেই তারা তো করত জীবিকা অর্জন !

সূত্রগুলি ঘেঁটে ভোলাকে খুঁজে বার করার ইচ্ছা নন্দনের কেন হয়েছিল সে নিজেই জানে না।

প্রথম সূত্রই তাকে নিয়ে যায় এক ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নের দোকানে।

ঝাঁঝরায় কড়ায়ের ঘি থেকে সিঙ্গাড়া ভেজে তুলতে তুলতে শ্রীকান্ত চক্রবর্তী বলে, ভোলা ? ভোলা ফিরে গেছে মা-র কাছে।

চেঁচিয়ে বলে, তোরা কেউ জানিস নাকি ভোলার ঠিকানা ?

জোয়ানবয়সি যে লোকটা খাবার বেচছিল সে পুবের শহরতলির একটা ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, ওখানে পাবেন ছোঁড়ার মা-টাকে। ছোঁড়াকে একবার আসতে বলবেন তো মশায়।

ঠিকানায় গিয়ে নন্দন জেনেছিল, ভোলা আর তার মা দুজনেই একদিনে কলেরায় স্বর্গে চলে গেছে।

খবর শুনে দীননাথ ভেবেছিল, ভোলা যখন স্বর্গেই গেছে, ভোলাকে কাজ দিতে চেয়েও যখন কিছুতেই তার আর পাত্তা পাওয়া যাবে না—কাজটা মণ্টুকে দিলে দোষ কী হয় ?

প্রস্তাব শুনে রাধারমণ বলেছিল, তুমি তো বড়ো ছ্যাঁচড়া লোক হে ? তোমায় নিলাম তাতে খুশি নও ? ছেলেটাকেও ঢোকাতে চাও ?

দীননাথ সবিনয়ে বলেছিল, একটা ছেলেকে কাজ দিতে চাইলেন। ছেলেটা স্বগগে গেছে। মোর ছেলেটা বসে আছে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে। তাই বলছিলাম।

রাধারমণ উদারভাবে বলেছিল, সোজা কথাটা বোঝ না কেন বল দিকি ? কাজ কি আমার দেবার ছিল, লোক নেবার দরকার ছিল ? নন্দন আর তোমাকে দিয়েছি বাড়তি কাজ—তোমাদের ছাড়াই আমার কারবার চলে। কিন্তু কী করি বলো, দশজনা চাইছে, কাজ তোমাদের দিতে হল। বেঁচে-বর্তে থাকলে ভোলাটাকেও কাজ দিতে হত। তাই বলে তোমার ছেলেটাকেও আমার ঘাড়ে চাপাবে ?

১০

সে যে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে যায়নি, ও রকম ছেলেমানুষি অভিমানের ধার যে সে ধারে না, এটা প্রমাণ করার জন্য নরেন দু-চারদিন পরে পরেই বাড়ি গিয়ে সকলের খবর নিয়ে আসে।

বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

বাড়ির আপন মানুষগুলিকে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না !

তার সঙ্গে সকলের কথা ও ব্যবহারে এমন একটা কৃত্রিমতা এসে যায়, এমন একটা আড়ষ্টভাব সকলে দেখায় যে কিছুক্ষণ বাড়িতে থাকতেই নরেনের যেন দম আটকে আসে।

এর চেয়ে ছেলেমানুষি রাগ আর অভিমানের বশে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াই বরং ভালো ছিল, দেখা করতে এলে মা বাবা ভাইবোন খানিকটা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারত, এ রকম বিব্রত হওয়ার বদলে তার রাগ ভাঙাবার চেষ্টা করতে পারত।

বাড়ির লোক তার সঙ্গে কেন এ রকম করে নরেন তার কারণটা বোঝে। কিন্তু সেটা এমন একটা কারণ যে প্রতিকারের উপায় ভেবে পায় না।

সে রাগ করে যায়নি, না ডাকতেই এসে আপনজনের খবর নিচ্ছে, সহজভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে, এটা ওটা খেতে দিলে খাচ্ছে—দেখাচ্ছে যেন খাপছাড়া কিছুই ঘটেনি—তার বাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা অতি সাধারণ তুচ্ছ একটা ব্যাপার।

এর ফলে সকলে যেন অপরাধী বনে গিয়েছে তার কাছে। সে যাই বলুক আর যাই করুক, তাদের খারাপ ব্যবহারেই যে তাকে বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে—এই সত্যটা সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে।

তারা করেছে ছোটোলোকামি—কিন্তু সেটাও নরেন উদারভাবে ক্ষমা করেছে ! তাদের জন্য পরের মতো বস্তিতে গিয়ে বাস করতে হলেও পর সে তাদের পর করে দেয়নি, নিজে পর হয়ে যায়নি।

কেবল দেখিয়ে দিয়েছে তারা কত সস্তা মানুষ, কত ছোটো তাদের মন।

এই অপরাধের বোধটাই সকলের কথা ও ব্যবহারে আড়ষ্টতা এনে দেয়, প্রাণ খুলে সহজভাবে কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে পারে না।

উষা একদিন খুব ভয়ে ভয়েই একটা প্রস্তাব জানায়। নরেন টের পায় কথাটা তার নিজের মাথায় গজায়নি—মা-বাবাই কথাটা ভেবেছে এবং পরামর্শ করে নিজেরা না বলে উষাকে দিয়ে তাকে বলাচ্ছে।

উষা বলে, তুমি এক কাজ করলে তো পার দাদা ? তুমি বাড়িতে থাকলে তো কোনো বাড়তি খরচ নেই—সেই বাড়িভাড়া গুনতেই হবে। বাড়িতে এসে থাকো, ওখানে যেমন নিজের সব ব্যবস্থা নিজে করছ এখানেও তাই কর। আমাদের এ রকম বিশ্রী লাগবে না।

বিশ্রী লাগবে না ? আরও বেশি বেশি লাগবে।

তুমি বুঝছ না। এখন কীরকম হয়েছে জানো ?—আমরা যেন তোমায় বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছি। লোকে বলছেও তাই। বাড়িতে থাকলে আমাদেরও ও রকম মনে হবে না, লোকেও কিছু বলতে পারবে না।

মেয়ের কথায় সায় দিয়ে মা ব্যগ্রভাবে বলে, ঠিক কথাই তো। তুই বলছিস রাগ করিসনি, রাগ করে বাড়ি ছাড়িসনি। তবে বাড়িতেই এসে থাক—ওখানে যেমন ব্যবস্থা করে খাচ্ছিস, এখানে তেমনি করবি।

নরেন শান্তভাবে বলে, তা হয় না।

উষা বলে, তার মানে তুমি রাগ করেছ সত্যিই, দেখাচ্ছ যে রাগ করনি। একবাড়িতে আমাদের সাথে তুমি থাকতে চাও না।

কেন সে বস্তির ঘর ছেড়ে এখানে এসে থাকতে রাজি নয় তার কাবণটা নরেন বলবে না ভেবেছিল কিন্তু এবার না বলে উপায় থাকে না।

একটা কথা হিসেব করছিস না। একবেলা খেয়ে, চাট্টি মুড়িচিড়ে খেয়ে, কোনোদিন কিছু না খেয়ে আমাকে দিন কাটাতে হয়।'এখানে এসে আমি না খেয়ে থাকব—তোরা খাওয়া-দাওয়া করবি—আরও বিশ্রী লাগবে না সেটা ?

তারা চুপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে সে গেলে আরও বেড়ে গিয়েছিল সকলের বিব্রতভাব, কথাবার্তার কৃত্রিমতা।

তারা তাকে শুধু বস্তির ঘরেই তাড়ায়নি, তাদের জন্য সে আধপেটা খেয়ে, উপোস করে দিন কাটায় ! তার কাছে নিজেদের আরও বেশি অপরাধী মনে হয় সকলের।

কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাঝে মাঝে এভাবে বাড়িতে খবর নিতে না গেলে সন্ধ্যার ব্যাপারটা জানতে নরেনের হয়তো অনেকদিন দেরি হয়ে যেত।

সন্ধ্যা সেদিন একলা বাপের বাড়ি আসে। ছেলেমেয়ে দুটিকে বহন করে।

অশোকের সঙ্গে এই সেদিন যে সন্ধ্যা একা এসেছিল যুদ্ধ করে বাপ-ভায়ের কাছে টাকা আদায় করার জন্য—তার গ্র্যাজুয়েট স্বামী আরও পাস করে মাস্টার অব আর্টস হবার যুদ্ধে নামবে বলে বাপ-ভাই যে টাকা খরচ করতে রাজি হয়েছিল সেই প্রতিশ্রুত খরচের বাকি অংশ আদায়ের জন্য—এ সন্ধ্যা যেন সে সন্ধ্যা নয়।

সন্ধ্যা ঝগড়া করতে আসেনি। সন্ধ্যা মান-অপমানভরা স্বামিত্ব-গর্বিণী মেয়ে হিসাবে আসেনি।

সন্ধ্যা আসেনি অশোক বা অশোকের পরিবারের কোনো বিপদকে আপন করে নিয়ে অশোকের পক্ষ নিয়ে বাপ-ভায়ের সঙ্গে লড়াই করতে।

তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে অশোকের বাপ-মা। প্রতিবাদ না করে নীরবে চেয়ে থেকেছে অশোক।

চাকরে ছেলের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেওয়াটা হাসিল করতে বেচারা আপিসের মাত্র সাতশো টাকা সরিয়েছিল—বাড়িতে কঠোর দারিদ্র পালন করে তিনমাসের মধ্যে বেআইনিভাবে নেওয়া টাকাটা শোধ করার পরিকল্পনা নিয়ে।

সে তো জানে তার আপিসেই লক্ষ টাকার কীরকম এদিক গমন ওদিক গমনের হিসাবটা টাকা পয়সার হিসাবে উহ্য থাকে।

দুমাস কী বড়ো জোর তিনমাস। তিনমাসের মধ্যে নিশ্চয় সে পারবে টাকাটা যথাস্থানে পূরণ করে দিতে।

মোটা তহবিল নয়। আসল তহবিল থাকে ক্যাশিয়ার ফণীবাবুর হেপাজতে। তার দশ হাজার টাকা জামানত দেওয়া থাকলেও আরও দুজন মোটা জামানত দেনেওলা কর্মচারীর সই ছাড়া মোটা টাকা নাড়াচাড়া করার অধিকার ফণীবাবুর নেই।

বিলাতি বড়ো সায়েব নিজে সপ্তাহে যখন তখন দু-তিনবার এসে তহবিল পরীক্ষা করে যায়।

হাজার তিনেক নগদ টাকা অশোকের হেফাজতে সব সময় রাখতে হয়। এত বড়ো আপিসের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে দেওয়ার জন্যই বাধ্য হয়ে রাখতে হয়।

তারও পাঁচশ টাকা জামানত আছে। হাফ পার্সেন্ট সুদে জামানত টাকাটা গোকুলে বাড়ছে তিলে তিলে। সে জানত যত কম টাকা দিয়ে তার কাজটা চালানো যায় কেবল তত টাকাই তার হেফাজতে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে তাকে ফণীবাবুর কাছ থেকে টাকা বার করে এনে আপিসের কাজ চালাতে হয়।

তার তহবিল কেউ কোনোদিন পরীক্ষা করতে আসে না। তার কোনো প্রয়োজনও নেই। কোম্পানির পক্ষে কাকে সে খুচখাচ কত টাকা দিয়েছে তার হিসাব থাকে অন্যত্র।

তার কাজটাই হল বড়ো সায়েবের আর তিনজন বড়ো কর্মচাবীর সই করা বা ইনিসিয়াল করা সাদা কাগজের টুকরো যে আনবে তাকে পাঁচ-দশ-বিশটাকা নগদ দিয়ে দেওয়া।

পুরো সই করা কাগজের টুকরো যে আনবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে। ইনিসিয়াল করা কাগজের টুকরো যে আনবে তাকে আধঘণ্টা বসিয়ে রেখে !

বছরের পর বছর চলে আসছে এ নিয়ম—কে জানত তিন মাসে ঠিক করে দেওয়ায় প্ল্যান করে মোটে সাতশো টাকা কাজে লাগাতে যাওয়ামাত্র প্রয়োগ হবে দুর্নীতি দমন নীতির তাণ্ডব ? লাখ লাখ টাকা যারা এদিক ওদিক করে এসেছে তারাই তাকে ধরবে ?

বড়োই বিপদে পড়েছে অশোক।

এ তো গেল দুঃসংবাদ।

এবার আসল সংবাদটা কী? এভাবে সন্ধ্যার একলা আসার কারণ কী? কারণ সকলেই বুঝেছে, কিন্তু সন্ধ্যার মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত সে প্রসঙ্গ তোলা যায় না।

সন্ধ্যা বোধ হয় আশা করেছিল মা-বাবা একজন কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করবে, এ রকম একলা যে এলি ?

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে বুঝতে পারে প্রশ্ন তাকে কেউ করবে না, আপনা থেকেই তাকে কথা তুলতে হবে।

ক্ষোভে সন্ধ্যার চোখে বোধ হয় জল আসে। জিজ্ঞাসা করা হলে হঠাৎ এভাবে আসার কারণ কীভাবে বলবে মনে মনে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে রেখেছিল, এখন সব গুলিয়ে যায়।

সোজাসুজি সে দাবি জানিয়ে বলে, এবার আমাদের ওই পাওনা টাকাটা দিতে হবে বাবা।

টাকার কথা কী ?

বলরামবাবু ক্যাশিয়ারবাবু ব্যাপারটা চাপা দিয়ে রেখেছেন—বদখেয়ালের জন্য নয়, বোনের বিয়ের দায় সামলাতে নিয়েছে, আস্তে আস্তে টাকা ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই নিয়েছে। তিন দিনের মধ্যে টাকাটা জমা দিলে ওঁরা কিছু করবেন না বলেছেন, চাকরিও যাবে না। শুধু এ কাজ থেকে অন্য কাজে সরিয়ে দেবেন। তোমার কাছে ওর পাওনা টাকা পেলে বাকিটা জোগাড় করে নেব।

পাওনা টাকা ! পড়ায় ফাঁকি দিয়েও পড়ার খরচের টাকাটা পাওনাই রয়ে গেল অশোকের।

সন্ধ্যার গায়ে একখানাও গয়না নেই। তার খালি গায়ের কথাটা এতক্ষণ কেউ উল্লেখ করেনি, এবার তারিণী বলে, তোর গয়না দিয়ে বাকিটা জোগাড় হবে তো ?

দু-একখানা করে লাগবে—আমার আর শাশুড়ির। কিছু টাকা ধার করার চেষ্টা হচ্ছে, ধার পাওয়া গেলে আর গয়না লাগবে না। তোমার টাকাটা পেলেই হাঙ্গামা মিটিয়ে দেওয়া যাবে।

তারিণী নিশ্বাস ফেলে।

সে নিশ্বাসের অর্থ এই যে এ জীবনে আমারও হাঙ্গামা মিটেছে, তোমাদের হাঙ্গামাও মিটেছে। বেঁচে থাকাটাই নিছক হাঙ্গামার ব্যাপার।

আরেকটা নিশ্বাস ফেলে তারিণী বলে, কী আর বলব বল তোদের ? জানিস আমার টাকা নেই, তবু আমাকে এসেই চেপে ধরবি টাকার জন্য।

সন্ধ্যা মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বলে, বলে দিয়েছে, টাকাটা না নিয়ে যেন ফিরে না যাই।

খালি হাতে ফিরে গেলে তার কপালে কী জুটবে সে আর মুখ ফুটে বলে না।

উষা তীব্রকণ্ঠে মন্তব্য করে, অশোকদা এমন ছোটোলোক ?

বরেন আরও বেশি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, খালি অশোক কেন ? ওদের বাড়ির সবাই ছোটোলোক। ওটা ছোটোলোকের বাড়ি।

উষা বলে, তুমি আমার বিয়ে দিয়ো না বাবা—দোহাই তোমার। চিরকাল আইবুড়ো থাকব—দরকার হলে ঝি-গিরি করে খাব।

বাপের বাড়িতে সন্ধ্যা এসেছে একলাই, তবে গলির মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সঙ্গে এসেছিল একটি ছেলে।

পাঁচুকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছিল যে সন্ধ্যার বাপের বাড়িতে ঢোকা তো দূরের কথা সে গলির মধ্যে পর্যন্ত ঢুকবে না। গলির মোড় পর্যন্ত সন্ধ্যাকে পৌঁছে দিয়ে সটান বাড়ি ফিরে যাবে।

সন্ধ্যা ছেলেমানুষ পাঁচুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এই হুকুম রদবদল করাবার কোনো চেষ্টা করেনি। মুখে একবার অনুরোধ জানালে ফিরে গিয়ে পাঁচু হয়তো নালিশ করবে যে তার বাপের বাড়িতে নেওয়ার জন্য সন্ধ্যা তার হাত ধরে টানাটানি করেছিল !

তাকে শুধু গলির মোড়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিল—বাপের সঙ্গে ভায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর যদি কোনো খবর দেবার থাকে, যদি কোনো চিঠি দেবার থাকে।

তারিণীর কাছে কোনো আশা-ভরসা না পেয়েও সন্ধ্যা টাকাটা পাওয়া যেতেও পারে এই রকম একটু ভরসা দিয়ে দুলাইন একটা চিঠি লিখে নিজেই গলির মোড়ে পাঁচুর হাতে দিয়ে আসে।

বলে, তুমি পরশু সকালে একবার এসো।

আমি পারব না আসতে।

সন্ধ্যা তাকে আর কিছু বলে না। বলার দরকারও ছিল না। খামে-আঁটা চিঠিতে সে পাঁচুকে পাঠাবার কথা লিখে দিয়েছে, তার মুখের উপর যাই বলুক পাঁচু, পরশু সকালে লেজ নিচু করে তাকে আসতেই হবে।

সন্ধ্যা এসেছিল সকালে। মাধবের বইয়ের প্রুফ প্রেসে পৌঁছে দিয়ে পাওনা টাকা থেকে দুটি টাকা উশুল করিয়ে একতাড়া নতুন প্রুফ নিয়ে বিকালের দিকে নরেন আসে।

আজ আর প্রুফ দেখবে না। শুধু মন নয়, চোখও অস্বীকার করছে প্রুফ দেখতে। সব চেয়ে ছোটো ইংরাজি হরফে ঠাসবুনানি লাইনে ছাপা হয়ে বইটা বেরোবে—সাধে কী প্রুফ দেখতে দেখতে চোখ কটকট করে, বেশি খিদে পেলে চোখের সামনে অক্ষরগুলি ঝাপসা হয়ে যায় !

সব শুনে নরেন বলে, ওই বলরামবাবু না কে, অশোককে উনি একটু পেয়ার করেন, না ?

উনিই চাকরি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পড়ে আর কী হবে ?—চাকরিটা খালি হয়েছে, ঢুকে পড়ো।

তাই ভাবছিলাম। ছুতো না পেয়েই আমাদের তাড়ায়—চাকরি খসিয়ে একেবারে জেলে দেবার এমন সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছে !

সন্ধ্যা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, ও সব কথা শুনে কী হবে দাদা ? তোমরা সবাই মিলে আমার একটা বিহিত করো ?

বিহিত তো অশোকেরা করেই দিয়েছে। গয়না কেড়ে রেখে জন্মের মতো বিদেয় করে দিয়েছে।

সন্ধ্যা চুপ করে থাকে। গা তার জ্বলে যায় নরেনের কাটা কাটা কথায়, কিন্তু চুপচাপ সয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও তো তার নেই। সে আজ একূল ওকূল দুকূল হারাতে বসেছে।

নরেন বলে, ম্যাট্রিক পাস করেছিস কিন্তু তোর এতটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা হয়নি সন্ধ্যা, একফোঁটা সাংসারিক জ্ঞান জন্মায়নি। ওরা বলতেই তুই ছুটে এসে আমাদের বলছিস বিহিত করতে ! একলা সংসারটার বিহিত করে উঠতে না পেরে বাবার কী দশা হয়েছে দেখতে পাস না ? আমি কাল সারাদিন চার পয়সার মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছি। ভাগ্যে বিকালে নন্দন গিয়ে হাজির হয়েছিল, আরও চারটি মুড়ি জুটল। চোখ টাটিয়ে প্রুফ দেখে দুটো টাকা নিয়ে এসেছি—দুটো দিন চলে যাবে।

নরেন একটু থামে।

সে বুঝতে পারে কড়া ধমকের সুরে তাকে এ সব কথা বলতে শুনে সন্ধ্যার মনে আশা জেগেছে। সন্ধ্যা ভাবছে, টাকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিতে হবে বলেই তার রাগ হয়েছে—এভাবে ধমক দিয়ে সে কথা বলছে।

নিজের বোকামি আর ভাবালুতার জন্য নরেন লজ্জা বোধ করে। সত্যই তো, বিপদে পড়ে যে এসেছে সাহায্যের জন্য তাকে ফাঁকা ভর্ৎসনা আর উপদেশ দেওয়ার কোনো মানে হয় ?

নরেন শান্ত ও সংযত সুরে বলে, এটা বললাম আমার অক্ষমতার কথা। কিন্তু আমার যদি অনেক টাকা থাকত, টাকা দিয়ে তোর ফিরে যাবার বিহিত করার সাধ্য থাকত, তবু আমি এ বিহিত করতাম না।

সন্ধ্যা ক্লিষ্ট সুরে বলে, তোমার যদি অনেক টাকা থাকত, ওরাও কী এভাবে বিহিত করার জন্য আমায় পাঠাত, না পাঠালে আমিই তা সইতাম ? নিজে এসে তোমার পায়ে ধরত।

কড়া ঝাঁঝালো সুরে বোনকে ধমকাতে শুরু করেছিল, এবার নরেন প্রায় কাতরকণ্ঠে কথা বলে।

এর পরেও তুই ফিরে যাবি ?

না গেলে তোমরা আমায় খাওয়াবে ? আমার ছেলে দুটোকে মানুষ করবে ?

আমরা কেন খাওয়াব ? নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা নিজে করে নিবি। মামলা করে গয়না আদায় করবি, খোরপোষ আদায় করবি।

সন্ধ্যা অবজ্ঞার সুরে বলে, তাই বল। এ রকম ছেলেমানুষি বুদ্ধি না হলে তোমার আজ এ দশা হয় ! একটা আইন থাকলেই বুঝি তা খাটানো যায় ? এত আইন থাকতে এত বেআইনি কাজ তবে সংসারে ঘটছে কী করে ?

সন্ধ্যার কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়—কিন্তু নরেনও তো সত্যসত্যিই তাকে আইনের সাহায্য নেবার কথা বলছিল না। সে আসলে তাকে বলছিল একটু শক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর কথা, চোখ কান বুজে সব সয়ে না গিয়ে একটু তেজ দেখাবার কথা।

সে বলে, আমাব কথাটা তুই মোটেই বুঝলি না। আমি বলছি—পেটের ভয়ে অন্যায়কে কখনও মাথা পেতে মানতে নেই। শেষ পর্যন্ত তাতে লাভের বদলে ক্ষতিই হয়। ঝি-গিরি করেও যখন টিকে থাকা যায়—এত অপমান সইবি কেন ?

এবার সন্ধ্যা রেগে যায়।—অন্যায়টা কীসের ? আমার অপমান হল কাদের জন্য ? ওর পাওনা টাকা তোমরা ওকে দেবে না—আদায় করতে চাইলে হবে অন্যায়। অন্যায তো তোমাদেব ! তোমরা অন্যায় করেছ ব'লেই তো ওরা আমায় এভাবে ঝাঁটা মেরে পাঠাতে পেরেছে ? স্বামীর জেলে যাওয়া ঠেকাবার জন্য চেষ্টা আমি করব না ? এতে আমার কোনো অপমান নেই—অপমান তোমাদের।

তবে আর বলার কী আছে !

বোনের কাছে কথায় হার মানার এত লজ্জা এত ঝাল ? ঝালটা একটু সয়ে এলে নরেন বুঝতে পারে, জ্বালাটা তার সন্ধ্যার কাছে কথায় হার মানার জন্য নয়— নিজের প্রাণের কাটা ঘাযে নিজেই নুন ছিটিয়ে দেওয়ার জন্য তার জ্বালা। এবারও সন্ধ্যা ওদের পক্ষ নিয়ে তাদেব সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছে, এই বাস্তবতা তার অসহ্য ঠেকছে। বাস্তবতার কাছে এত ছেঁচা খেয়েও সে রয়ে গেছে এমনই অন্ধ নীতিবাগীশ !

কে জানে, সবটা না হলেও অনেকটাই হয়তো সাজানো ব্যাপার, বানানো কথা। আপিসের টাকা নিয়ে অশোকের বিপদে পড়ার কথাটা সত্য—কিন্তু গয়না কেড়ে নিয়ে বাপের কাছে টাকা আদায় না করে ফিরে যেতে বারণ করে সন্ধ্যাকে পাঠানোর কথাটা মিথ্যাও হতে পারে। অশোকের সঙ্গে পরামর্শ করেই হযতো সন্ধ্যা এভাবে এসেছে—চাপ দিয়ে যাতে টাকাটা আদায় করা যায়।

নরেনকে দিয়ে সন্ধ্যাই নন্দনকে খবর পাঠিয়ে ডেকে আনে।

দোকানেব কাজ সেরে নন্দন আসে রাত দশটায়।

বলে, খুব জরুরি ব্যাপার বলে এলাম, নইলে আসতাম না।

আসতে না মানে ?

আসা উচিত হত না।

বুঝিয়ে বলো। এসেই দেখি ঝগড়া শুরু করলে !

নন্দন শান্ত গম্ভীর গলায় বলে, সোজা স্পষ্টভাযায় বলি, মনে লাগলে দোষ ধরো না। এ সব কথা স্পষ্ট বলাই ভালো। এ অবস্থায় এসেছ—তোমায় এক রকম তাড়িয়ে দিয়েছে। এসেই তুমি আমায় ডেকে পাঠালে,—আমাকেও বাধ্য হয়ে রাত সাড়ে-দশটার সময় আসতে হল। আমাদের ভাব ছিল, এ তো সবাই জানে। আমি একটা চাকরি পেলে অশোকের বদলে আমার ঘরেই তুমি আসতে। চাকরি না পেলেও আসতে,—যদি একটা চাকরে বাপ থাকত। এম এ পাস করেছি অশোকের বি এ ডিঙোনোর আগেই ? অশোকও এ সব কথা অল্পবিস্তর নিশ্চয় শুনেছে। এ রকম অপমান হয়ে এসে তুমি এভাবে আমায় ডেকে পাঠালে।

সন্ধ্যা ধৈর্য হারিয়ে বলে, বাবা রে বাবা, তোমাদের সকলের কি মাথা খারাপ হয়েছে ? দাদা বললে ওরা অন্যায় করেছে, তোকে অপমান করেছে,—তুমিও সেই গাউনি গাইতে শুরু করলে ! অন্যায় কার আমি জানি নে ? আমার অপমান আমি বুঝি নে ? ওদিকে ওরা কোনো অন্যায় করেনি, আমায় কেউ অপমান করেনি।

তাই নাকি !

কী তবে ? অপমান হয়ে এসেছি, গায়ের জ্বালায় তোমায় পিবিত করতে ডেকে পাঠিয়েছি— এ সব কোন দেশি কথা ? একদিন ভাব ছিল তো আজকে কী ? আজ অন্যরকম ভাব।

নন্দন বলে, ও ! অন্যরকম ভাব।

সন্ধ্যা জোর দিয়ে বলে, তা নয় ? ভাব কী শুধু ওই এক রকমের হয় ? স্নেহ মমতার সম্পর্ক নেই ? বন্ধুত্ব নেই ?

নন্দন চমৎকৃত হয়ে শোনে।

এক ধমকে তাকে চুপ করে যেতে দেখে সন্ধ্যা প্রাথমিক জয়ের গর্বে একটু হাসে। জয়যাত্রা এগিয়ে নেবার জন্য বলে, আমি তো জানি তুমি আমার ভালো ছাড়া কখনও মন্দ চাইবে না। বিয়ে হয়নি বলে ভালোবাসা তো মরে যায় না। দরদ সবাই করে—কারও কম কারও বেশি। জানি তো তোমার দরদটাই সব চেয়ে খাঁটি ? তাই ভাবলাম, বিপদে পড়েছি, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা যাক। তোমার কাছেই খাঁটি পরামর্শ পাব।

শুনতে শুনতে নন্দনের মনে হয় আজ বুঝি সে প্রথম হদিস পেল রূপকথা আর কাব্যকথার আসল মানের, আসল তাৎপর্যের। আজ বুঝি সে প্রথম টের পেল যে মহান রূপকথা আর মহৎ জীবনকাব্যকে কীভাবে পচিয়ে গলিয়ে ছেলেভুলানো মদ বানিয়ে ছেলেবেলা থেকে তাকে নেশায় বুঁদ করে রাখাব চেষ্টা করে আসা হয়েছে !

এত বয়সেও, এম এ পাস করে এতকাল বেকারি করে আসার পরেও—বাস্তবতার কঠিন চিকিৎসায় নেশা কেটে যাওয়ার উপক্রম করলেও—ওই মদের পিপাসা কেটে যায়নি, ওই নেশাকে দাম দিতে কুণ্ঠা হয়নি।

সব চেয়ে মজা এই, যাকে কেন্দ্র করে ওই নেশা চরমে তোলা সেই আজ তার নেশা কাটিয়ে দিব্যজ্ঞান এনে দিয়েছে।

নন্দনকে বড়োই লড়তে হয়েছে সারাদিন—বড়োই খাটতে হয়েছে। কত অপমান যে মাথা পেতে মানতে হয়েছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একঘেয়ে ক্লান্তিকর খাটুনির সঙ্গে। এতদিন বেকার ছিল, নন্দন বুঝতে পারেনি তাদের মতো তুচ্ছ মানুষের দায়ে পড়ে বেতন নিয়ে পরের কাজ কবা কী বিড়ম্বনা।

নরেন একদিন তার চাকরি পাওয়া ভাগ্যের নিন্দা করেছিল—বন্ধুকে দীর্ঘকাল বর্জন করার অজুহাত দাঁড় করিয়েছিল চাকরি পাওয়া।

শুনে তখন রাগ হয়েছিল নন্দনের। কাজ পেয়ে আজ সে বুঝতে পেবেছে নরেনের অভিযোগের মানে।

সারাদিন খেটে খেটে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ আর অপমানে অপমানে তিতো বিরক্ত মন নন্দনের বিগড়ে যাবে তাতে আশ্চর্য কী ?

এ অবস্থায় নিষ্ঠুর কঠোর এক অন্যায় প্রতিশোধের ঝোঁক চাপলে তাকে দোষ দেওয়া যায় কোন নীতিতে ?

সে তো মানুষ ?

রক্তমাংসের মানুষ ?

মানুষের মতো বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষ ?

স্থিরদৃষ্টিতে সন্ধ্যার চোখে চোখে তাকিয়ে ধীর গলায় নন্দন বলে, তুমি আমায় মুশকিলে ফেলে দিলে সন্ধ্যা।

তার ভাবান্তর দেখে সন্ধ্যার জয়ের গর্ব খানিকটা উপে যায়, একটু ভড়কে গিয়ে সে বলে, মুশকিলে ফেলে দিলাম ?

তোমায় আজও আমি ভালোবাসি। এ জীবনে আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না। তোমার জন্য রাত্রে আমার ঘুম হয় না।

সন্ধ্যা চুপ করে থাকে।

নন্দন বুঝতে পারে সন্ধ্যা মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। ভালো লাগত বলেই স্কুলের মেয়ে সন্ধ্যা কলেজের ছেলে তার সঙ্গে খেলা করত বটে কিন্তু সাড়া কি আর একেবারেই জাগত না তার হৃদয়ে ? আজ শুকনো নীরস হয়ে গেছে সে হৃদয়—ভয়ে তাই সে চুপ করে আছে যে কথা বলতে গেলে পাছে নন্দন সেটা টের পেয়ে যায় !

নন্দন গলা থেকে আবেগ বিসর্জন দিয়ে বলে, জানো তো তোমার জন্যেই এত কষ্ট এত নির্যাতন সহ্য করে এম এ পাস করেছিলাম ? তোমার জন্যে না হলে কবে এদিকে ওদিকে কোনো একটা ছুটকো কাজ নিয়ে কেটে পড়তাম। যা পেতাম তাতেই বেশ বগল বাজিয়ে স্ফূর্তি করে দিন কাটাতাম।

সন্ধ্যা ভয়ে ভয়ে বলে, পাস করেও তো দেড় বছর কোনো চাকরি জোগাড় কবতে পারলে না। নইলে—

নন্দন বলে, তোমার জন্য মরি-বাঁচি পণ করে এম এ পাস করলাম—পাস করাব জন্যেই সহজে চাকরি পেলাম না। আজেবাজে চাকরি তো করতে পারি না এম এ পাস করে ? ম্যাট্রিক পাসের সঙ্গে তো কমপিট করতে পারি না ? তাই ধৈর্য ধরে থাকতে হল।

সন্ধ্যা চুপ করে শোনে।

ধৈর্য না ধরতে পারলে কি এ রকম চাকরিটা বাগাতে পারতাম ? চাবটে কারবার রাধাবমণেব, বছরে আট-দশলাখ টাকা আয়—একটা চিঠি লিখতে পর্যন্ত আমাব পরামর্শ চায়।

ছাইয়ের মতো বিবর্ণ দেখায় সন্ধ্যার মুখ।

নন্দন মমতা বোধ করে। বড়োই মমতা বোধ করে—স্কুলের বয়স থেকে যার জন্য মমতা বোধ করতে কবতে প্রেম জন্মে গিয়েছিল—অল্পবুদ্ধিতে ভালো না বেসেও ভালোবাসার ভান করে সে তাকে খেলিয়েছে বলেই কী তার জন্য মমতা বোধ না করে পারা যায় ?

সে তো রক্তমাংসের মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষের মায়া-মমতার জগতে তো তার বাস।

কিন্তু এমনই প্রচণ্ড ঝোঁক তার এসেছে অন্যায় প্রতিশোধ নেবার যে ওই মমতার বাধা ঠেলে সে বলে, তাই বলছিলাম, মুশকিলে ফেলে দিলে। মুশকিলটা কী জানো ? পাঁচশো টাকা চাপ দিয়ে যখন ইচ্ছা আনতে পারি, ভীষণ বিপদের কথা বানিয়ে বলছি বুঝলেও ওরা টাকাটা দেবে—আসল বিপদ গোপন করে একটা বিপদেব অজুহাত দিয়ে চাইছি জেনেই দেবে। অবশ্য সুদে-আসলে ঢের বেশি আদায় করে নেবার জন্যেই দেবে—কিন্তু দেবে।

সন্ধ্যা পাংশু মুখে চেয়ে থাকে।

আমি কারও জন্য এভাবে টাকা নিতাম না। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তোমার জন্য ব্যবস্থাটা করতেই হবে। সেই জন্য বলছিলাম আমাকে তুমি বড়ো মুশকিলে ফেললে।

নরেন আগেই টের পেয়েছিল, তার সঙ্গে সন্ধ্যার কথাবার্তা বলার পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্যই এ ঘরটাকে যেন আড়ালে ঠেলে দেওয়া হযেছে এতগুলি মানুষের দুটি ঘরের সংসার থেকে !

বড়ো কঠিন সমস্যার ভার নিয়ে জীবনসমুদ্রে ডুবতে বসে সন্ধ্যা তাদের ঘাড়ে চেপে তাদেরও ডুবোতে এসেছে।

বড়ো মহাজনের কাছে চাকরি করছে নন্দন। একদিন সন্ধ্যাব সঙ্গে ভাব ছিল নন্দনের, ভালোবাসা ছিল।

নন্দনকে অবলম্বন করে ফাঁড়া কাটাবার উপায় করে তাদের যদি রেহাই দিতে চায় সন্ধ্যা— তাদের দুজনকে নিরিবিলি আলাপ-আলোচনার সুযোগ করে দিতে হবে বইকী।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে সন্ধ্যা জোর দিয়ে একটু কড়াসুরেই বলে, তোমায় মুশকিলে ফেললাম ? তবে থাক !

থাকবে কেন ? আমাকে মুশকিলে ফেলার অধিকার তোমার না থাকলে কার আছে।

সন্ধ্যা নরম সুরে বলে, রাত হয়েছে, সারাদিন খেটেছ-খুটেছ, এবার বরং তুমি বাড়িই যাও।

তখনও হয়তো নিজেই প্রতিশোধের ঝোঁকটা সামলে ফিরে যেতে পারত নন্দন, ফিরে গিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করত সন্ধ্যার বিপদ ঠেকাতে—কিন্তু সন্ধ্যার কথা বলার ভঙ্গিটা তার ঝোঁকটাকেই আরও চড়িয়ে দেয়।

ভাবছ কেন ? কাল আমি সব ঠিক করে দেব। কাল যদি না তোমায় আমি নোটের তাড়া—

কথা শেষ না করেই নন্দন দরজা বন্ধ করতে গিয়ে একেবারে ছবিরাণীতে ঠোক্কর খায় !

এত রাত্রে ঘুমন্ত পুরীতে—কে জানে ঘুমন্ত কিনা ?—ছবিরাণীতে ঠোক্কর খেয়ে নন্দন পরম স্বস্তি বোধ করে।

তার সমগ্র সত্তা তখন উত্তর চাইছিল : এ কী প্রতিশোধ ? অথবা অশোক যেমনভাবে ঠকিয়ে আসছে বেচারা সন্ধ্যাকে—সে-ও তেমনইভাবে ওকে হাতের মুঠোয় পেয়ে তেমনইভাবে ঠকাতে চায় ?

তুই এখানে কী করছিস ?

বাড়ির মানুষ কেউ কোথাও নেই, ছবিরাণী বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে—একা।

ছবি বলে, এত রাত্রে তুমি এ বাড়ি এলে—কী হয়েছে না হয়েছে কিছু বলে এলে না। আমি ভাবলাম ভয়ানক কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। তাই তোমার পিছু পিছু চলে এলাম।

সন্ধ্যা নিশ্চয় দেখেছিল ছবিরাণীকে। তাই নোটের তাড়া নিয়ে পরদিন আসবার কথা বলতে বলতে চৌকি থেকে উঠে তাকে দরজা বন্ধ করতে আসতে দেখেও কথাটি বলেনি। দেহমন কুঁকড়ে যেতে চায় লজ্জা ঘৃণা আর আত্মধিক্কারে। এতদিনের লড়াই করে বজায় রাখা পৌরুষ যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

রক্ষণাবেক্ষণ সন্তানপালন ভরণপোষণ সব বিষয়ে পুরুষানুক্রমে মেয়েদের মুখাবলম্বিনী করে রেখে এসে পুরুষ জাতের আত্মকলহে হার মানার ঝাল পুরুষ হয়ে আজ সে ঝাড়তে যাচ্ছিল উপায়হীনা উন্মাদিনী সন্ধ্যার উপর।

তার নিজের ছেলেমানুষি স্বপ্ন তারই ইচ্ছায় তারই চেষ্টায় গড়তে দিয়েছিল বলে—গড়তে দিয়ে কাপুরুষ তার জীবনবিরোধী আত্মনাশকে, দুর্দিনের স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বীকার করেনি বলে—পুরুষের গুন্ডামির অধিকার খাটিয়ে সে প্রতিশোধ নিতে চাইছিল সন্ধ্যার উপর।

অপেক্ষমানা বোনের ঘাড়ে হোঁচট না খেলে সন্ধ্যাকে ভেঙে চুরমার করে কে জানে কীভাবে নন্দন জের টানত সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার।

খাঁটি আত্মধিক্কারে খাঁটি দায়িত্ববোধে তার যেন আত্মকেন্দ্রিকতার লজ্জা ভয় গ্লানি বোধ দূর হয়ে যায়।

গলা চড়িয়ে সে ডাকে, কাকিমা ? উষা ? নরেন ?

ছবিরাণী চাপা গলায় বলে, কী পাগলামি করছ ? চলো না আমরা বাড়ি ফিরে যাই ?

দাঁড়া। এদের সঙ্গে কথা বলে নিই ?

কার সঙ্গে কথা বলবে ? ওরা কেউ বাড়ি আছে নাকি ? শুধু তারিণী কাকা—কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। বুড়ো মানুষকে ডেকো না।

সবাই গেছে কোথায় ?

সেই মামার বাড়ি—নরেনদাকে যে চাকরি দিয়েছিল। তার ছোটো মেয়ের বিয়ে। তারিণী কাকার শরীর ভালো নয় বলে যাননি।

সন্ধ্যার কথা সে উল্লেখও করে না। সন্ধ্যা কেন মামাতো বোনের বিয়েতে সকলের সঙ্গে যায়নি বলা সে বোধ হয় প্রয়োজন মনে করে না।

নন্দন ভাবে, তাদের নিরিবিলি কথা বলাব সুযোগ তবে কেউ করে দেয়নি—স্বাভাবিক কারণেই বাড়িটা শূন্য হয়ে আছে।

তারিণী কাকাকেই বলে যাই কথাটা।

তার প্রথম হাঁকেই তারিণীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘরে আলো জ্বেলে চোখে চশমা আঁটতে আঁটতে সে বাইরে আসে।

নন্দন বলে, আপনি আবার উঠলেন কেন ? আমি ঘরে গিয়ে কথাটা জানাতে পারতাম।

তারিণীর গলা কেঁপে যায়।—কী কথা বাবা ?

নন্দন সোজা স্পষ্টভাষায় তারিণীকে বলে, এ রকম বিপদে পড়ে এসেছে—সন্ধ্যাকে কালকের মধ্যে পাঁচশো টাকা জোগাড় করে দিতেই হবে। নরেনের সঙ্গে কথা বলেছি, নরেনও সায় দিয়েছে। পাঁচশো টাকার জন্য—

সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে দেখে নন্দন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

নন্দন দ্বিধাহীন জোর গলায় ঘোষণা করে, নরেনের সঙ্গে পরামর্শ করেছি কালকেই টাকার ব্যবস্থাটা করে ফেলতে পারব। কালকেই সন্ধ্যা অশোকের সমস্ত পাওনা টাকা নিয়ে ফিরে যাবে।

সন্ধ্যা কেবল একটি প্রশ্ন করে, দাদার সঙ্গে আগেই তোমার টাকার কথা হয়েছিল ? দাদাকে বলেছিলে কীভাবে টাকা জোগাড় করবে ?

বলেছিলাম।

এই সান্ত্বনাটাই অবশিষ্ট আছে নন্দনের। এখানে এসে সন্ধ্যার উপর প্রতিশোধ নেবার ঝোঁক চাপার অনেক আগেই সে ঠিক করে ফেলেছিল রাধারমণের কাছ থেকে টাকা ধার করে সন্ধ্যাকে বাঁচাবে।

এত রাত্রে ছবিরাণীকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে এত কাণ্ডের পর।

কে জানে ছবিরাণী কী ন্যাকামি জুড়বে, কীভাবে তাকে জানিয়ে দেবে যে আজ থেকে ছোড়দার জন্য, তার এম এ পাস করা শিক্ষিত ছোড়দার জন্য যেটুকু শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ ভালোবাসা তার ছিল সব শেষ হয়ে গিয়ে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা তার স্থান দখল করেছে।

হয়তো সারাপথ একটি কথা না বলে সে তার এই মনোভাবটা জানিয়ে দেবে।

পথে নেমে চলতে আরম্ভ করে ছবিরাণীর প্রথম কথাতেই সে তাই চমৎকৃত হয়ে যায়।

ছবিরাণী পথে নেমেই বলে, সন্ধ্যার বিপদে তুমি পাঁচশো টাকা জোগাড় করার ভার নিতে পার। আমার সর্বনাশটা দু-একমাস ঠেকাবার জন্যে কিছু করতে পার না। মায়ের পেটের বোন তো নই, করবে কেন !

চমৎকৃত নন্দন বলে, তুই নিজেই তো বলেছিস শুনলাম ভালোবাসায় পেট ভরে না। বেকারের চেয়ে তোর চাকরে বর ভালো।

মুখে একটা কথা বললেই বুঝি সেটা প্রাণের কথা হয় ? ভুল বুঝে কেউ বুঝি কোনোদিন ভুল কথা বলে না ? সেটাই শেষ কথা ধরে নিতে হবে !

ভুলটা স্বীকার করে কথা বলে এলেই চুকে যায়।

ছেলেবেলা থেকে ছেঁচা খেয়ে খেয়ে মানুষ হয়েছ, তুমি বুঝবে না। মেয়েরা ভুল স্বীকার করতে গেলেই অন্য মানে দাঁড়িয়ে যায়।

তোদের মন বড়ো বাঁকা।

একেবারে নির্জন নয় পথ। শহরের কোনো পথ বোধ হয় কখনও একেবারে নির্জন হয় না। দু চারজন লোক, কয়েকটা পশু পথকে একেবারে নির্জন হতে দেয় না।

ছবিরাণী দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়ে বলে, তোমরা পুরুষরাই আমাদের এ দশা করেছ। মুখ খুলে কিছু বলা, নিজে থেকে কিছু করা, আমাদের বারণ। ভুল করেছি বলতে গেলে তোমার বন্ধু কী ভাববে জানো ? চাকরে ছেলেটা ফসকে গেছে, হাতের পাঁচ হিসেবে ওকে হাতে রাখতে চাইছি।

নন্দন হাই তুলে বলে, চাকরে ছেলেটাকে ফসকে দেবার কথাই তো আমাকে বলছিস তুই ?

বলছিই তো। সর্বনাশটা ফসকিয়ে দাও। তাই বলে ভুল স্বীকার করতে যাব নাকি আমি ? তা কখনও যাব না। তুমিও কিছু বলতে যাবে না। ভাববে তোমায় দিয়ে আমিই বলাচ্ছি। চাকরি পেয়েছ, বাকি জীবনটা নয় তোমার সংসারেই দাসী হয়ে থাকব। তোমার বন্ধু আসতেও তো পারে একবার ? এলে তখন ভুল স্বীকার করব—জানবে যে আমি সস্তা নই।

আমার ঘুম পেয়েছে ছবি। খিদেও পেয়েছে। চল বাড়ি যাই।

রাস্তার আলোতেই বোঝা যায় অপমানে কালো হয়ে গেছে ছবিরাণীর মুখ। চলতে আরম্ভ করে সে বলে, তুমি ছোটোলোক বনে গেছ ছোড়দা।

১১

একটা ইন্টারভিউ ছিল। কিছু হবে না জেনেও নরেন ভাগ্য পরীক্ষা কবতে যায়।

সামান্য চাকরি, তারই জন্য প্রার্থীর কী ভিড় ! কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার পরেই জানিয়ে দেওয়া হল যে একজনকে বহাল করা হয়েছে, তাদের আর অপেক্ষা করার দরকার নেই।

নরেন একজনের মন্তব্য শোনে, আজকের জন্য কী আর বাকি ছিল বাবা, বহাল আগেই হয়ে গেছে। ঘরের লোককে বহাল করবি এ তো জানা কথাই বাবা, মিছিমিছি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাঁদর নাচিয়ে পয়সা খসিয়ে হয়রান করিস কেন ?

আরেকজনকে সে বলতে শোনে, জানি তো কিছু হবে না তবু কেন লোভ দেখাস ? ট্রাম-বাসের পয়সাটাও তো নষ্ট করালি ?

ট্রাম-বাসের পয়সা ! ট্রাম-বাসেব পয়সাও নরেনের পকেটে আজ নেই। হাঁটতে হাঁটতে বস্তির ঘরে ফিরতে হবে !

তার বস্তির ঘর অনেক দূর। যে প্রেসে মাধবের বই ছাপা হচ্ছে সেটা কাছেও বটে, একটু ঘুর হলেও তার বস্তিতে ফেরার পথেও বটে।

টিকিট না করার কায়দায় গোটা দুই তিন ট্রামে ওঠানামা করে প্রেসে পৌঁছানো যাবে, হাঁটতে হবে না।

নরেন ট্রামের ফার্স্টক্লাসে উঠে গম্ভীর মুখে গদি আঁটা আসনে বসে। পকেটে যার রেস্ত নেই একটি পয়সাও, টিকিট করবে না ঠিক কবেই যে গাড়িতে উঠেছে, তাব আবার ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড-ক্লাসের হিসাব কীসের '

দুপুরবেলা, গাড়িতে লোক কম। ভীড় থাকলে কন্ডাক্টরের টিকিট চাইতে দেরি হত, বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়া চলত—এখন উঠে বসার একটু পরেই কন্ডাক্টর এসে টিকিট চায়।

পয়সা নেই ভাই।

কন্ডাক্টরের বয়স অল্প—বোঝা যায় অল্পদিন কাজে ভর্তি হয়েছে। ওদিকের কন্ডাক্টরটি প্রৌঢ়বয়সি।

কয়েক মুহূর্ত নরেনের মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে নিচু গলায বলে, আমি জোর গলায নেমে যেতে বলব—নামবেন না, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবেন।

বুঝেছি।

ওঠানামার প্ল্যাটফর্মে ফিরে গিয়ে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে কন্ডাক্টর বলে, পযসা নেই তো উঠেছেন কেন ? নেমে যান।

নরেন বলে, ভদ্রলোকের ছেলে, পকেটে পয়সা নেই বললাম, তবু একেবারে নামিয়ে দেবে ?

কী করব বলুন ? ডিউটি করতে হবে তো ?

শুধু বিলাতি কোম্পানির ডিউটি করবেন ? একজন মুশকিলে পড়েছে তার জন্য কোনো ডিউটি নেই ?

ওদিকের কন্ডাক্টর বলে, নেমে যান না মশায় ?

কিন্তু নরেন তখন বুঝে গিয়েছে ওদের ডিউটি করার মানে—টিকিট যখন করনি, কড়াসুরে তোমায় নেমে যেতে ওদের বলতেই হবে। তাতে যদি অপমান বোধ হয় নেমে যাবে ! নইলে ওটুকু সয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাক।

কে বলতে পারে, হয়তো বেশ কয়েকটা পাস দিয়েও হতে হয়েছে ট্রামের কন্ডাক্টর—ভদ্রঘরের ছেলেদের অবস্থা ওর অজানা নয় !

বেশ বড়ো এবং আধুনিক প্রেস। ম্যানেজার হিরণ্ময় মাঝবয়সি হাসিখুশি মানুষ, কাজের লোক। তার চেষ্টাতেই প্রেসের অনেক উন্নতি হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করে, কী খবর নরেনবাবু ?

নরেন বলে, আমার কিছু পাওনা নেই, না ?

সে জানে জিজ্ঞাসা করাটাই বাহুল্য, পাওনা তার কিছুই নেই। হিরণ্ময় বলে, আপনি তো ফর্মা রেডি করে দিচ্ছেন, আর টাকা নিয়ে যাচ্ছেন।

একটা চাকরির চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম, নইলে একটা ফর্মা রেডি করে আনা যেত। আমায় দুটো টাকা আগাম দিন—পকেট একেবারে গড়ের মাঠ।

হিরণ্ময় কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি অন্য কোনো কাজ করেন না ?

কাজ পেলে তো করব ?

আপনার প্রুফ দেখা খুব ভালো হচ্ছে। তবে দেখেই বোঝা যায় প্রফেশনাল নন—ধরে ধরে আস্তে আস্তে দ্যাখেন।

দেখা প্রুফে বানান ভুল টুল পাবেন না, লেখাপড়াটা ভালো করেই শিখেছিলাম। কিন্তু অভ্যাস নেই, দেখতে বেশি সময় লাগে। তবে বেকার মানুষ, সময়ের কোনো অভাবও নেই।

হিরণ্ময় একটু ভেবে বলে, আপনি আরও দু-একখানা বইয়ের প্রুফ দ্যাখেন না কেন ? সামান্য হলেও আয় তো।

দিন না ব্যবস্থা করে ?

নরেন ভাবে, সত্যি, কী যান্ত্রিক হয়ে গেছে তার মন, এ কথাটা একবার খেয়ালও হয়নি ! প্রুফ দেখাও যে একটা কাজ, সে কাজ করলে যে দু-চারটে টাকা মেলে, আগে খেয়াল না হলেও মাধবের বইয়ের প্রুফ দেখে দিয়ে পয়সা পাবার পরেও মনে হল না যে আরও দু-চারখানা বইয়ের প্রুফ সে অনায়াসে দেখে দিতে পারে !

হিরণ্ময় বলে, তা দু-একখানা দিতে পারি। তবে এ বইয়ের চেয়ে রেট কিন্তু কম হবে—ওগুলি সাধারণ বই।

নরেন বলে, বেশ তো, রেট কম হোক। দু-একখানা কেন, দু-চারখানার ব্যবস্থা করে দিন না ? পরীক্ষার জন্য মাসের পর মাস দিনরাত পড়েছি—পয়সার জন্য নয় তেমনিভাবেই খাটব।

হিরণ্ময় একটু হেসে বলে, কী জানেন, এ বড়ো এলোমেলো কাজ। কখনও হয়তো একসঙ্গে তিন-চারখানা বই পাবেন, কখনও হয়তো একখানা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

মিনিমাম একখানা হাতে থাকবে ধরে নিতে পারি তো ?

তা ধরে নিতে পারেন। কিন্তু একটা বইয়ের প্রুফ দেখে কত আর পয়সা পাবেন ?

দিন চারেকের মধ্যে হিরণ্ময় তাকে একটি ইংরাজি পাঠ্যপুস্তক এবং একটি বাংলা উপন্যাসের প্রুফ দেখার কাজ জুটিয়ে দেয়।

পুরো একটা দিন ভাববার সময় নিয়ে নরেন বলে, আমি তো চললাম রে মণ্টু।

কোথা যাবেন ?

বাড়ি ফিরে যাব।

দীননাথ খুশি হয়ে বলে, এ ভালো বুদ্ধি করেছেন। আপনজনার পরে ক-দিন রাগ রাখা যায় ?

রাগের কথা নয় হে দীননাথ—বিচার-বিবেচনা।

নরেনের হিসাব খুব সোজা। এখানে থাকলে চাকরি-বাকরির খোঁজখবর পাওয়ার বড়ো অসুবিধা। বাড়ি ফিরে যাবার উপায় থাকতে এখানে দুটাকা ঘরভাড়াই বা কেন গুনবে ? ঊষার মুখ দিয়ে সকলে তাকে যে অনুরোধ জানিয়েছিল, এখন সেটা রাখা যায়। বাড়ির লোকের উপর সে অবশ্য এতটুকু ভার চাপাবে না—বাড়ির মানুষ খাবে আর তাকে উপোস করতে দেখবে, এ অসুবিধা মোটামুটি দূর হয়েছে। নিজে রেঁধে খাব—দু-একবেলা উপোস দেবার দরকার হলে বাড়ির লোককে জানালেই চুকে যাবে যে সে বাইরে খেয়ে এসেছে।

মা থাকতে বোন থাকতে, দুবেলা রান্নার ব্যবস্থা চালু থাকতে সে ভিন্ন রান্না করবে—এটা কটু লাগবে সকলের। কিন্তু নরেন জানে, কটু লাগবে শুধু গোড়ার কয়েকদিন, তারপর সয়ে যাবে। নিজে রেঁধে খাক, শাকভাত খাক, নিজের রোজগারে সে যে খাচ্ছে এতেই খুশি থাকবে বাড়ির লোক।

আশা করবে সুদিনের।

আপশোশও করবে। এত লেখাপড়া শিখে সংসারের জন্য কিছুই সে করতে পারে না—এ আপশোশ ঘুচবার নয়। তবে এ আপশোশের ঝাঁঝ আর তেমন আর লাগবে না, সহ্য হয়ে গেছে।

একসঙ্গে কয়েকটা বইয়ের প্রুফ দেখার সুযোগ পেলে নিজে কষ্ট করে থেকে দু-পাঁচটাকা মাঝে মাঝে হয়তো দিতেও পারবে সংসারে।

বাড়ি ফিরবে ঠিক করে নরেন ভাবে, কই খুশি হওয়া তো গেল না ? প্রাণের জ্বালা তো কমল না। ?

নিজের প্রাণকেই সে যেন বলে, খুশি হওয়া যায় কী ? তোমার জ্বালা কমে কি ? কোনোমতে ঠেকনা দিয়ে টিকে থাকা কী মানুষের জীবন যে খুশি হওয়া যাবে, জ্বালা জুড়োবে ?

তল্পিতল্পা গুটিয়ে নরেনকে বাড়ি ফিরতে দেখে সকলেই খুশি হয়।

এতদিন দেখা করতে এলে সকলে তার কাছে অপরাধী সেজে থেকে যে রকম আড়ষ্টভাবে কথাবার্তা বলত, বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যে তার অনেকখানিই যেন উপে যায় !

এটাও হিসাব করেছিল নরেন। ভিন্ন রেঁধে খাক, একবাড়িতে একসঙ্গে বাস করার জন্যই সহজ স্বাভাবিক হয়ে আসবে সকলের ব্যবহার।

তাকে রান্নার আয়োজন করতে দেখে ঊষা হাসিমুখে খুশির সঙ্গে বলে, উপোস ঠেকানোর ব্যবস্থা করে এসেছ জানি ! নইলে তুমি আসতে না।

তারপর বলে, আমি রেঁধে দিলে কোনো দোষ আছে ?

নরেন একটু ভেবে বলে, একটা কথা মেনে নিলে দোষ নেই।

কী কথা বলো।

ঘাসপাতা যা রাঁধতে দেব, মুখ বুজে রেঁধে দেবে। এই দিয়ে কী করে খাবে, এতটুকুতে কী করে পেট ভরবে, এ সব দরদের কথা মুখে আনতে পাবে না।

ঊষা স্থিরদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তাই হবে। ভেবেছ পারব না ? দেখে নিয়ো—আমি তোমারই বোন !

মাধবের সঙ্গে নরেনের দেখাসাক্ষাৎ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। বইটা উপলক্ষ করে নয়, মাধব তাকে আরেকটা কাজ দিয়েছে বলে।

মাধব তাকে একদিন বলে, বই ছাপাতে হেল্প করে মজুরি নিতে অপমান বোধ করেননি বলেই সাহস করে বলছি। পয়সা নিয়ে অন্যভাবে আমাকে একটু হেল্প করুন না ?

বলুন।

কতকগুলি কাজ আছে যাতে অনেক সময় চলে যায় অথচ আমি নিজে না করলেও চলে, অন্যে করে দিতে পারে। যেমন ধরুন, একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট নিয়ে একটা বইয়ে কোথায় কী বলা হয়েছে জানতে চাই, বইটা আমার পড়ার দরকার নেই। কিন্তু আমাকে বইটা আগাগোড়া ঘাঁটতে হয়। এ রকম আরও কতগুলি কাজ আছে, আপনি যা অনায়াসে করে দিতে পারেন। একটা কোটেশন চাই, কতকগুলি ফ্যাকস অ্যান্ড ফিগারস চাই—

মাধব থামতেই নরেন বলে, কাজ বুঝেছি—তারপর বলুন।

পুরো মাইনে দিয়ে অ্যাসিস্টেন্ট রাখার ক্ষমতা আমার নেই। তাছাড়া দুদিন হয়তো এমন কাজ করব যে এ রকম হেল্প মোটেই দরকার হবে না। আপনি যদি সপ্তাহে তিন দিন কী চার দিন আসেন, দু-তিনঘণ্টা আমার এই কাজগুলি করে যান—

কিন্তু কী করে তা হবে ? আপনার এখুনি একটা কোটেশন দরকার, আমি হয়তো পরদিন আসব—আমার জন্য কাজ বন্ধ কবে বসে থাকবেন ?

মাধব একটু হাসে।—এমন জড়ানো জটিল কাজ আমার, এতদিকে এত রকম পড়া আব চিন্তা করা দরকার যে একটা কোটেশনের জন্য সাতদিন অপেক্ষা কবতে হলেও আমার আসবে যাবে না। ওদিকটা স্থগিত রেখে অন্যদিকের কাজ চালিয়ে যাব—সোজা কথা।

এবার বুঝেছি। তারপর বলুন।

মাধব বলে, আপনার এই কাজের দাম কীভাবে দেব, আমাকে অনেক ভাবতে হয়েছে। অন্য কেউ হলে আলাদা কথা ছিল, আপনার আমার মধ্যে সে রকম সম্পর্ক নয়। বেকার বলে আপনাকে দয়া কবা হবে না, আপনিও ভাবতে পারবেন না খাটিয়ে নিয়ে ঠকাচ্ছি।

নরেন চমৎকৃত হয়ে যায়।

একী সেই মাধব ? জ্ঞানের বিষয়ে ছাড়া, থিয়োরি নিয়ে ছাড়া যে সাধাবণ ব্যাপারে ছেলেমানুষের মতো উলটোপালটা এলোমেলো কথা বলত ? সে আজ এমন সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলছে, তাব মান ও নিজেব প্রয়োজন বাঁচিয়ে এমন সুন্দরভাবে প্রস্তাবটা পেশ করছে ?

মাধব একটা হাই তোলে। বেচারা শ্রান্ত বইকী—ক্লান্ত না হলেও। বসে বসে এমন একটানা মাথার খাটুনি—এদিকে ছেলেমেয়েব দায়—ওদিকে কেড়ে নেওয়া চাকরিটা উদ্ধাবেব জন্য লড়াই !

অনেকের সমর্থন পেয়েছে, অন্যায় বরখাস্ত বাতিলের লড়ায়ে মাধব খুব সম্ভব জিতে যাবে।

চাকবি হারিয়ে মানসীকে হারিয়ে কত হিসেবি হয়েছে মাধব, কত সজাগ হয়েছে তার বাস্তববোধ ! তার পরের কথাগুলি শুনে নরেন সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

মাধব বলে, ভেবেচিন্তে আমি একটা নিয়ম ঠিক করেছি। পছন্দ না হলে বলবেন কিন্তু। আপনি যতক্ষণ কাজ কববেন, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের বেতনের হিসাবে আপনার কাজের ঘণ্টা ধরে দাম দেব। আসা-যাওয়ার ফেযার দেব আর একটা টিফিন দেব।

বলেই মাধব সুব পালটে জোবের সঙ্গে বলে. আপনি এমনি এলেন, কাজ শেষ কবে দুঘণ্টা গল্প কবলেন তর্ক কবলেন-- সেটা ধবব না কিন্তু। ওটা আমাদের বন্ধুত্বের হিসাব ! রাজি তো ?

রাজি বইকী !

নিয়মিত আসে যায়, বেতনভোগী সহকারীর মতো কাজও করে আবাব বন্ধুর মতো তর্কও চালায় কিন্তু মাধব যেন একেবারে বদলে গেছে, একেবাবেই যেন বদলে গেছে তাদের তর্কেব ধারা।

অনেক রকম অনেক কথা মাধব বলে। মানসীর কথা কিছুই বলে না মাধব। একবার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করে না।

শুভা চা দেয়, এটা-ওটা জোগায়, ছেলেমেয়েকে সামলায আর রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে খাবার নিয়ে ঘরে চলে যায়।

মাধবের গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ার সময় অনায়াসে নির্ভয়ে দরকারি কথা জিজ্ঞাসা করে।

মাধব খেঁকিয়ে ওঠে না ! বিরক্ত পর্যন্ত হয় না ! ধীর শান্তভাবে তার জিজ্ঞাসার জবাব দেয় !

মাধবের এ রকম মশগুল অবস্থায় জরুরি ব্যাপারেও মানসী তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেত না !

বিয়ে করা বউটার চেয়ে, ছেলেমেয়ের মা-টার চেয়ে, মাইনে করা রাঁধুনিকে সে বেশি সম্মান করে, রাঁধুনির সঙ্গেই তার ভালো বনে।

এ কথাটা মনে হবার জন্য দু-একদিনের মধ্যেই নরেন নিজের কাছে বড়ো লজ্জা পায়। সে প্রতিজ্ঞা করে জীবনে আর কোনোদিন কোনো মানুষ সম্পর্কে সাত-তাড়াতাড়ি এ রকম সস্তা সমালোচনা খাড়া করে নিজেকে ছোটো করবে না।

মানসীর কথা সে উল্লেখ পর্যন্ত করত না বলে নরেন ভাবত, শুধু শুভা নয়, এও মাধবের একটা প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষণ।

মানসীকে একেবারে সে মুছে দিয়েছে মন থেকে।

তাই জরুরি কাজ ধামাচাপা দিয়ে মাধব সেদিন নিজে থেকে মানসীর কথা তুললে নরেন প্রথমে আশ্চর্য হয়ে যায়, তাবপর মানুষটা সম্পর্কে নিজের অনুদার মনোভাবের জন্য নিজের কাছে লজ্জা বোধ করে।

মাধব বলে, মানসীর একটা চিঠি পেয়েছি নরেনবাবু। কী জবাব লিখব ভাবতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আমি এক রকম ভেবে এককথা লিখব, উনি আরেক রকম মানে করে আরও চটে যাবেন। আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা যাক।

মাধব একটু হাসে।

এ কাজটা কিন্তু বন্ধু হিসাবে করবেন, দাম পাবেন না।

নরেন চমৎকৃত হয়ে যায়।

মানসীর চিঠি পেয়ে, চিঠির জবাব লেখার জন্য তার পরামর্শ দাবি করে, সহজভাবে হাসিমুখে এ রকম মার্জিত রসিকতাও মাধব করতে পারে এ অবস্থায় !

নরেন বলে, দাম পাব না মানে ? দাম তো আগাম পেয়ে গেলাম ! স্ত্রীর চিঠির জবাব লিখতে আমার পরামর্শ দামি ভাবছেন !

মাধব বলে, কী জানেন, এ সব সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। বড়ো বড়ো ব্যাপার নিয়ে মাথা খাটাই, এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা খাটানোর সময় কই ? কী দরকার মাথা খাটাবার ? মানসী তো শুধু ছেলেমেয়ে নিয়ে খেয়ে-পরে থাকার ব্যবস্থা চায়, সে ব্যবস্থা তো করেই দিয়েছি। আর কিছু ভাববার তো নেই আমার !

নরেন বলে, এ পর্যন্ত বুঝলাম। বউদি কী কী লিখেছেন না বললে এরপর যা বলবেন কিছুই বুঝতে পারব না।

টেবিলে বুক সেলফে তাকে আলমারিতে স্তূপাকার বই, টেবিলেও গাদাগাদি করা কাগজপত্র বই খাতা।

গেঞ্জির মতো ব্যবহার করার জন্য পাতলা কাপড় দিয়ে ঘরের কলে মানসীর সেলাই করা জামাটার বুক পকেট থেকে মানসীর চিঠিটা বার করে মাধব নরেনের হাতে দেয়।

তিন লাইন চিঠি।

স্বামীর কাছে একজন স্ত্রী ও মা-র চরম রকম গদ্য ভাষায় লেখা চিঠি। দু-পয়সার পোস্টকার্ডে লেখা !

প্রিয়তম,

আমি ভালো আছি। ছোটকু ভালো আছে। ইলা খোকনদের একটা দিনের জন্য পাঠাতে পার ? বড়োই মন কেমন করছে। একটা দিনের জন্য ওদের পাঠাতে পারলে ভালো হয়। ভালোবাসা নিয়ো।

ইতি তোমার মানসী।

চিঠি পড়ে গম্ভীর হয়ে নরেন বলে, এ তো বউদির চিঠি নয়।

মানসীর হাতের লেখা।

হোক না বউদির হাতের লেখা। হাত কি লেখে ? মন যা হুকুম দেয় হাত তাই লিখে যায়।

মাধব গম্ভীব হয়ে বলে, জবাব দেবার আগে আপনাকে কনসাল্ট করে ভালোই হল। আমিও তাই ভাবছিলাম—মানসী হঠাৎ এ রকম নত হয়ে কী করে চিঠি লিখল। ভীষণ স্বার্থপর, নিজের স্বার্থেব হিসাবটা ঠিক বোঝে। কোনো ব্যাপারে কখনও কোনোদিন রাগারাগি না করে ধমক না দিয়ে নত করাতে পারিনি ! নিজে থেকে নত হয়ে ও এ রকম চিঠি লিখল ? আপনি না বললে আমি ধরতেই পাবতাম না এ চিঠির মানে।

আপনাকে কিন্তু এবার একটু নত হতে হবে।

কেন ? আপনিই বলছেন এ চিঠি মানসী স্বেচ্ছায় নত হয়ে লেখেনি। আমি নত হতে যাব কেন ?

বউদি স্বার্থপর হলেও তিনি আপনার স্ত্রী বলে আপনার ছেলেমেয়ের মা বলে নত হবেন। এমনিতেই তো মেয়েরা সব বিষয়ে নত হয়ে আছে—মান-অভিমানের ছেলেখেলায় পুরুষকে একটু নত করতে চাইলে সেটা মানতে হয়।

মাধব গম্ভীব হয়ে দেয়ালে টাঙানো বড়ো ঘড়িটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে।

অবিবাম টকটক শব্দ করে ঘড়িটা সময় মেপে চলেছে।

হঠাৎ যেন ধ্যানভঙ্গ হয়ে মাধব বলে, আপনি যাবেন, না আমি যাব ?

তার মানে ?

আমি গেলে হয়তো না বুঝে সামান্য এটা-ওটা নিয়ে রাগারাগি করে সব ভেস্তে দেব। আপনি গেলে আমার দিকটা একটু বুঝিযে বলতে পাববেন, বুঝে-শুনে কথা কইতে পাববেন।

বেশ তো, আমিই যাব।

তিনতলা বাড়ি।

গেটে দাবোয়ান।

নবেন এ সব ব্যাপার জানে।

দরোযানকে তোষামোদ করে অন্দরে স্লিপ পাঠিয়ে আধঘণ্টা নত হয়ে বসে থাকার বদলে সে সোজাসুজি গটগট করে ভিতরে চলে যায়।

সিঁড়ি বেয়ে নামছিল মানসীর দিদি অতসী।

তাকে দেখেই নরেনের মনে হয় এত ওজনের গয়নার ভার বয়ে সে কী করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা চলাফেরা কবে !

কে ?

আমি মাধববাবুর ছোটোভাই। বউদির কাছে এসেছিলাম।

মোটা অতসীর ফরসা ফাঁপা গালে টোল খেয়ে খুশিতে ফেটে পড়া হাসি ফোটে।

তেতলায় ডান দিকের ঘরে মানসী শুয়ে আছে।

নরেনকে দেখেই মানসী বলে, আমি জানতাম নিজে আসবে না, আপনাকে পাঠাবে।

বিছানা থেকে সে মাথা পর্যন্ত তোলে না। এপাশ ওপাশ ফেবে না। ভদ্রতা করে নরেনকে বসতে পর্যন্ত বলে না।

নরেনও ভূমিকা না করেই জিজ্ঞাসা করে, অসুখটা কী বউদি ?

নার্ভের অসুখ। অতিরিক্ত চাপ সইতে সইতে বিগড়ে গেছে।

তাহলে ভয় নেই। ঠিক হয়ে যাবে।

চাপ সইতে হলেও ?

চাপ নয়—এবার বিশ্রামের ব্যবস্থা। বলছিলেন যে আপনি জানতেন মাধববাবু নিজে আসবেন না, আমাকে পাঠাবেন। নিজে না এসে আমায় কেন পাঠালেন জানেন কী ?

জানি বইকী। নিজে এলে অপমান হত।

নরেন হেসে মাথা নাড়ে।—হল না। মাধববাবু আপনাকে ভয় করেন, নিজে আসতে সাহস পেলেন না।

তামাশা করছেন ? না ছেলে ভুলোচ্ছেন ?

সত্য কথা বলছি। কী বলতে কী বলে বসবেন, এক ভেবে কথা বললে অন্য মানে বুঝে আপনি হয়তো চটে যাবেন—এই ভয়ে প্রথমে আমাকে পাঠালেন।

মানসী নীরবে চেয়ে থাকে।

নরেন সহজভাবে বলে, ছেলেমেয়ে নিয়ে উনি কাল আসবেন—নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

কী সুন্দর সকাল বৈশাখের !

কী আনন্দময় পশুপাখির জীবন।

জীবন যেন নিজের মধ্যে নিজেকে চেপে রাখতে না পেরে চারিদিকে কলরব করে উঠে নিজেকে ঘোষণা করছে আকাশে সূর্যের প্রথম আলোর ছোঁয়াচ লাগার আগেই।

অর্ধেক রাত কেটেছে ছটফট করে। বড়ো কষ্টের রাত। হতাশায় বেদনায় ব্যর্থতায় বিষাক্ত কবা রাত।

ভোর হবার আগেই নরেন আটকানো দম ছাড়তে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, ছড়ানো ইটের কোটরের মধ্যে হাত-পাঁচেক চওড়া পথটার মুক্ত আকাশটুকুর নীচে, খোলা বাতাসে।

কতটুকু আকাশ আর দেখা যায়। কতটুকু বাতাস গায়ে লাগে। কটা আর পশুপাখি গাছের ডালপালা নজরে পড়ে। তবু অনুভব করা যায় চারিদিকে যেন অস্থির চঞ্চল জীবনের স্পন্দন।

বিড়ি সিগারেট কিছুই নেই। তারিণীর হুঁকো কলকেতে তামাক সেজে নিয়ে বাড়ির সামনের রোয়াকে বসে তামাক খেতে খেতে জীবনপথের প্রবীণ স্থবির পথিকের মতো নরেন চারিদিকে তাকায় আর নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন ?

জীবন এত দুঃখ কষ্ট ব্যর্থতা হতাশা নিয়েও প্রাণে তার এত আনন্দ কেন ? লাথিঝাঁটা খাওয়া থেঁতলে দেওয়া প্রাণটাতে নিরুপায় হতাশার মেঘ সবটুকুই ঘনিয়ে আছে, সূর্য উঠলে পেটের খিদে মিটোতে এক টুকরো রুটি আজ জুটবে কিনা সন্দেহ আছে। তবু কেন গান গেয়ে উঠতে সাধ যায় ?

অ্যালুমিনিয়ামের একটা কৌটা হাতে নিয়ে হাফপ্যান্ট শার্ট-পরা নিকুঞ্জ গটগট করে হেঁটে আসে, জীবন আর জগতের সেই যেন রাজা !

এত ভোরে ?

দূর তো কম নয় ? আদ্ধেক রাস্তা যেতে যেতেই শ্যামের বাঁশি কলের ভোঁ শুনব।

চারিদিকে ফরসা হয়ে আসে।

তামাকটুকু শেষ হয়ে এসেছে। আরেক কলকে যে সেজে আনবে তার উপায় নেই। এক কলকে তামাকই বোধ হয় আছে—ওটুকু শেষ করলে তারিণী ঘুম থেকে উঠে তামাক না পেয়ে খেপে যাবে।

পাড়ার তিন বাড়ির তিনজন ঠিকা ঝি একে একে সামনে দিয়ে চলে যায়। ভুবনবাবুর বাড়ি কাজ করে থুরথুরে বুড়ি নেপার মা। নেপা কবে স্বর্গে চলে গেছে, নেপার মা আজও লোল চামড়া কঙ্কালসার দেহ নিয়ে বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দিয়ে জীবিকা অর্জন করে বেঁচে আছে।

ধীরে ধীরে কাজ করে। প্রতিদিন অন্তত দশবার ভুবনের স্ত্রী তাকে দূর দূর করে কাজ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলে !

নেপার মা কোনো কথা কানে না তুলে নিঃশব্দে কাজ করে যায়।

ভুবন আপশোশ করে পাড়ার লোককে বলে, কী ফ্যাসাদে পড়েছি মশাই বলব কী। মাগি খাটতে পারে না, একটা থালা মাজতে আধঘণ্টা লাগিয়ে দেয়, তবু ওটাকেই মাইনে দিয়ে রাখতে হয়েছে। তাড়িয়ে দিলেও যাবে না। দশ-বারোবছর কাজ করছে—

কে যেন বলেছিল, আপনার কিন্তু এবার নেপার মাকে না খাটিয়ে পেনশন দেওয়া উচিত।

ছবিরাণীও কী একদিন এ রকম থুরথুরে বুড়ি হয়ে যাবে চাকরে স্বামীর সংসার করতে করতে ? সতেরোই বৈশাখ বিয়ে হবে ছবিরাণীর। দিন সাতেক বাকি আছে। ছবিরাণীর কথা ভাবছিল বলেই ছবিরাণী একেবারে সামনে এসে দাঁড়ানোর আগে নরেন তাকে দেখতেই পায়নি।

ছবিরাণী বলে, বাঁচলাম বাবা। এত ভোরে তোমার ঘুম ভাঙে ?

ঘুম ভাঙে মানে ? ঘুম হয় না, ভাঙবে কী ! তুমি এত ভোরে ?

রাতেই হয়তো এসে পড়তাম। তোমায় ডেকে তুলতে হইচই হাঙ্গামা হবে এই ভয়ে কোনোরকমে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি।

ব্যাপারটা কী ?

বুঝতে পারছ না ? এত ভোরে পাগলের মতো ছুটে এসেছি, তবু জিজ্ঞেস করতে হয় ব্যাপার কী ? শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম— যদি তুমি যাও, যদি আমার মান রাখ। মান খুইয়ে এলাম তবু বুঝতে পারছ না ব্যাপার কী ?

নরেন হুঁকোয় টান দিয়ে পোড়া তামাক থেকে ধোঁয়া বার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে, বুঝেছি বইকী। মন ঠিক করেছিলে, মনটাকে আবার বেঠিক করেছ।

সরু রোয়াকে তার পাশে বসে ছবিরাণী হেসে বলে, জানো, ক-দিন শুধু কেঁদে কাটিয়েছি। আমি কখনও কাঁদি না জানো তো ? ক-দিন খালি কান্না আসে, যত চাপতে চাই, যত ভাবি কিছুতে কাঁদব না, তত যেন আরও বেশি করে কান্না আসে। ভেবে পাই না কেন, কী ব্যাপার। তোমার জন্য নয়, অথচ কান্না পাচ্ছে। কাল বুঝলাম, হিসেবটাতে নিশ্চয় ভুল হয়েছে। একেবারে উলটো হয়ে গেছে হিসাব।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ গো। তোমার চাকরি বাকরি নেই বলে কোথায় আরও বেশি করে তোমায় আঁকড়ে ধরব, তোমার হয়ে সবার সাথে লড়াই করব, তার বদলে তোমায় বাতিল করে দিলাম ! একেবারে উলটো হিসাব নয় ? কী বোকাই ছিলাম আমি !

নরেন তার বাঁ হাতটি মুঠো করে ধরে বলে, এভাবে এসেই হয়তো বেশি রকম বোকামি করছ !

ছবিরাণী সমস্ত চোখ-মুখ দিয়ে হাসে।

না। আমি এবার ঠিক বুঝেছি। কাল কী ভাবলাম জানো ? ভাবলাম তোমার চাকরিটা থাকতে থাকতে যদি আমাদের বিয়ে হয়ে যেত ? চাকরি গেছে বলে তোমায় তখন কি ছাঁটাই করতে পারতাম ? ভেবেই ঠিক করলাম, মান চুলোয় যাক, ভোরে উঠে আমি নিজেই তোমার কাছে আসব।

[illegible]

Note : [illegible]

Note : [illegible]

Note : [illegible]

Note : [illegible]

[illegible]

Note :- [illegible]

নাগপাশ উপন্যাসের খসড়া

গ্রন্থপরিচয়

বর্তমান রচনাসমগ্রের অন্তর্গত গল্প উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে শিরোনামসহ মূলপাঠের সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সম্মত বানান অনুসৃত হয়েছে। গল্প-উপন্যাস ইত্যাদির অন্তর্গত চরিত্রনামের ক্ষেত্রে অবশ্য আদি বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কেবল গ্রন্থপরিচয় অংশের আলোচনাক্ষেত্রে, গ্রন্থসমূহ এবং অন্তর্গত রচনাবলির শিরোনাম, প্রথম প্রকাশকালে যেমন ছিল, তেমনই রক্ষা করা হয়েছে।

মূলে কোনো লিখিত জবানিতে (যেমন ৫ম খণ্ডে 'চিন্তামণি' উপন্যাসে চিন্তামণির দিদির লেখা পত্রাদির ক্ষেত্রে) লেখকের ইচ্ছাকৃত ভাষাঘটিত বিকৃতি বা অশুদ্ধি ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সেগুলি যথাযথ রেখে দেওয়া হয়েছে।

লেখকের একাধিক গ্রন্থে সংলাপের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহারে অভিন্ন রীতি লক্ষিত হয় না। এমনকী স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপিতেও সংলাপে উদ্ধৃতিচিহ্ন কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও হয়নি। চিহ্ন ব্যতিরিক্ত সংলাপ-নির্দেশই সর্বাধিক ; চিহ্ন বিরলতর। মানিক রচনাসমগ্রে একটি অভিন্ন রীতি রক্ষার প্রয়োজনে সংলাপ-নির্দেশে উদ্ধৃতিচিহ্ন বা ঊর্ধ্বকমা [' ' / " "] ব্যবহৃত হয়নি।

ইতিকথার পরের কথা

'ইতিকথার পরের কথা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনচত্বারিংশৎ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং দ্বাবিংশতিতম উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ভাদ্র ১৩৫৯ [আগস্ট ১৯৫২], প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স কলকাতা, পৃ ৪ + ২৬২, মূল্য চার টাকা : প্রচ্ছদশিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈশাখ ১৩৬৩ অর্থাৎ প্রায় চার বৎসর পরে উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, প্রকাশক, প্রচ্ছদ ও মূল্য অপরিবর্তিত ছিল। তৃতীয় সংস্করণ ১৩৫৮ ফাল্গুনে প্রকাশ ভবন কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণের তারিখ যথাক্রমে বৈশাখ ১৩৫৭ ও অগ্রহায়ণ ১৩৫৮। শেষ দুটি সংস্করণের প্রকাশক প্রকাশ ভবন, তবে মূল্য পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রচ্ছদ ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে গেছে। উক্ত দুটি সংস্করণের প্রচ্ছদশিল্পী প্রবীর সেন।

ইতিকথার পরের কথা গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে অনিলকুমার সিংহ সম্পাদিত 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার প্রথম বর্ষ ১০ম সংখ্যা মাঘ ১৩৫৭ থেকে দ্বিতীয় বর্ষ ১২শ সংখ্যা চৈত্র ১৩৫৮ পর্যন্ত মোট তেরো কিস্তিতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ সংখ্যায় সম্পাদক জানিয়েছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার কিস্তি লিখে উঠতে পারেননি। ওই বছর আশ্বিন সংখ্যাতেও উপন্যাসটির কোনো কিস্তি প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য আশ্বিন ১৩৫৮ সংখ্যায় উপন্যাসটির প্রত্যাশিত কিস্তির পরিবর্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য করার আগে' প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখক উক্ত পত্রিকার পাঠের ক্ষেত্রে 'অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হয়েছে' বলে জানিয়েছেন। সেই পাঠগত পরিবর্তন-পরিবর্জনের কিছু নমুনা এখানে সংকলিত হল।

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
স্টেশন ও কারখানার লম্বা ঘরটির মাঝামাঝি বজ্রাহত তরুটি নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে মৃত অতীতের প্রতীকের	স্টেশনের গা ঘেঁষে কারখানার লম্বা শেড। গেটের পাশে পিতলের ফলকেও নাম লেখা আছে—ছোটো ছোটো

মতো। পল্লব ঝরে গেছে, ছাল বাকল উঠে গেছে, জল বায়ু দিনের পর দিন ধুয়ে মেজে মসৃণ সাফ করে দিয়েছে গুঁড়ি আর ছড়ানো ডালপালা। কারখানার দেওয়ালে বিরাট বেমানান হরফে লেখা—নব শিল্পমন্দির।

নতুন সাহিত্য, মাঘ ১৩৫৭, পৃ ২২

অক্ষরে। আলকাতরা দিয়ে বাইরের দেওয়ালে বিরাট বেমানান হরফে লেখা—নব শিল্পমন্দির।

মা রচনাসমগ্র ৮ পৃ ১৫

[পত্রিকার পাঠে অনুপস্থিত]

স্টেশন মাস্টারের দু কামরার কোয়ার্টারটি দেখলে মনে হয় ছাদে মাথা ঠুকে যায় না তো, পা ছড়িয়ে শুতে পারে তো ?

মানিক রচনাসমগ্র ৮ পৃ ১৫

গ্রাম অবশ্যই আছে, সুজলা সুফলা বাংলার সর্বত্রই ঘন ঘন গ্রাম। একটু দূরে দূরে পড়েছে গ্রামগুলি। যেন সযত্নে হিসাব করে সমস্ত বড়ো বড়ো গ্রাম থেকে যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতেই স্টেশন করার জন্য এই স্থানটি বেছে নেওয়া হয়েছিল।

পৃ ২২

গ্রাম অবশ্যই আছে, বাংলার সর্বত্রই ঘন ঘন গ্রাম। স্টেশন থেকে একটু দূরে দূরে পড়েছে গ্রামগুলি। যেন সযত্নে হিসাব করে সমস্ত বড়ো বড়ো গ্রাম থেকে যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতেই স্টেশন করার জন্য এই স্থানটি বেছে নেওয়া।

মানিক রচনাসমগ্র ৮ পৃ ১৫

[পত্রিকার পাঠে অনুপস্থিত]

স্টেশন থেকে বারতলা পর্যন্ত সিধে রাস্তার দুপাশের কয়েকটি ছোটোখাটো গ্রাম আর ওই বারতলার যাত্রীরাই শুধু এই স্টেশন ব্যবহার করে।

রাস্তা করার সময়েও অন্যান্য বড়ো গ্রামগুলির কথা ভাবা হয়নি—জমিদার যেখানে বাস করে সেই বারতলা গ্রামটি ছাড়া যেন রাস্তাঘাটের প্রয়োজন অন্য গ্রামের নেই।

ভিড় হয় বর্ষাকালে। আশেপাশে এই রাস্তাটিই বর্ষাকালে কাদা শূন্য থাকে। খানিকটা বেশি পথ হাঁটতে হলেও অনেক গ্রামের লোক তখন এই স্টেশন দিয়েই যাতায়াত করে,—কর্দমাক্ত পিছল পথে হাঁটা যতটা সম্ভব কম করার জন্য।

মা রচনাসমগ্র ৮ পৃ ১৫

এতদূরে এখানে কি কারখানা চলে ? কাজ করার মজুর পাবে কোথায় ? কাঁচামাল যোগাবে কোথা থেকে ?

পৃ ২২

এতদূরে এখানে কি এ সব কারখানা চলে ? সে রকম বড়ো কারখানা হয়, যাকে ঘিরে আপনা থেকে একটা লোকালয় গড়ে ওঠে, ওয়াগন বোঝাই হয়ে হয়ে কাঁচা মাল আসে আর তৈরি মাল চালান যায়, সেটা হয় আলাদা কথা। স্টোভ ল্যাম্প লন্ঠনের মতো টুকিটাকি জিনিসের কারখানা এখানে চলতে পারে না।

মানিক রচনাসমগ্র-৮ পৃ ১৫

সম্প্রতি বাচ্চা পেড়েছে, সমস্ত শরীরটা কঙ্কালের চেয়ে শীর্ণ, শুধু আকণ্ঠ খিদের আগুন জ্বালা পেটটার নীচে ঝুলছে সরস দুধে ফুলে ওঠা স্তনগুলি। প্রকৃতির কি লাগসই পরিহাস।

পৃ ২৪

সম্প্রতি বাচ্চা পেড়েছে, সমস্ত শরীরটা চামড়া ঢাকা কঙ্কালের মতো শীর্ণ, শুধু আকণ্ঠ খিদের আগুন জ্বালা পেটটার নীচে ঝুলছে সরস দুধে ফুলে ওঠা স্তনগুলি।

মা রচনাসমগ্র-৮ পৃ ১৭

তবে দেশের জন্য গজেন আর তার মেয়ের ভালোবাসার পরিচয় সবাই জানে। নিন্দাটা তেমন জমাট বাঁধে না।

নতুন সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩৫৭, পৃ ৩১

তবে দেশের জন্যে তাদের দশজনের জন্যে গজেনের ঠ্যাং খোঁড়া হওয়া ছাড়াও অনেক কিছু গেছে কিনা, ওই কাজে নেমে লক্ষ্মীরও পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা জুটেছে কিনা, নিন্দাটা তেমন জমাট বাঁধে না।

মা রচনাসমগ্র-৮ পৃ ২৬

কী জন্যে মাকড়ি বেচবে তাও বলেনি, জানো ? কবে কার বৌ তাগা দিয়েছে, কার বৌ চুড়ি দিয়েছে, মোকে মাকড়ি দিতে হবে।

পৃ ৩৩

কী জন্যে মাকড়ি বেচবে আগে সেকথা কিছুই জানায়নি গাঁদাকে, এটাই তার সবচেয়ে বড়ো আপশোশ। বলেছে পরে, গুরুজনের ধমক খেয়ে ঘরে নিয়ে ঝগড়া করার সময়। ভাগচাষের জোরালো আন্দোলন চলছিল, তারই ফান্ডে কার বউ তাগা দিয়েছে, কার বউ চুড়ি দিয়েছে, গাঁদাকেও মাকড়ি দিতে হবে।

মা রচনাসমগ্র-৮ পৃ ২৬

নিজেকে মূর্ছা যাওয়ানোর ক্ষমতাটুকু যে চিরতরে কেড়ে নিয়ে[illegible] ভয়ের কম্বল থেকে।

পৃ ৩৩

আজও ভয় করে, অনেক রকম ভয়, কিন্তু কোনো ভয় আর তাকে কাবু করতে পারে না একেবারে।

মা রচনাসমগ্র-৮ পৃ ২৭

খানিক গুম খেয়ে কৈলাস বলে, সত্যি ওসব ভাবিনি লক্ষ্মী। আমি শুধু ভেবেছি দোষ কি ? তবে তুমি যদি মনে কর পাপ হবে—

পাপটাপ বুঝিনে। পাপের হিসেব যে কার ?

তোমার সোয়ামী আছে তাই—

মরেছে শুনলে কড়ে আঙুলের নখটি কাটব।

তবে তবে কেন দগ্ধে মরছ ? সারাটা রাত একা রাতে তুমি কি পচে মর ?

তার কথায় দুঃসহ ব্যাকুলতা। হাত বাড়িয়ে হাত নিও কিন্তু সে ধার্য না লক্ষ্মীর। ভালোবাসা ছাড়া কোনো বাঁধন তাদের নেই। বাধ্যবাধকতাও নেই ; স্বাধীন স্বেচ্ছাকৃত প্রেমে ও সব গোঁয়ার্তুমি চলে না। লক্ষ্মী একটা নিশ্বাস ফেলে—আফসোসের নিশ্বাস। বোঝাপড়ার অভাবটার চেয়ে কষ্টকর। আর কি আছে এ অবস্থায় ?

সে বলে, তুমি বুঝেও বুঝবে না। সেদিন দুখুর প্রাণ আছে বলে অত কথা হল। আর ফের সেই সুর গাইছ। বুকে হাত দিয়ে বলতো, একটা রাত দুটো রাতেই সাধ মিটে যাবে তোমার ?

তাই কি যায় ? তবে কিনা—

জাত যাবে, পেট ভরবে না, তবু খিদে পেয়েছে বলেই চুরি করে একটু চালাতে হবে ? তার চেয়ে উপোস করা ঢের ভালো। মোরা খেটে খাওয়ার মানুষ, মোদের কি চুরি পোষায় ?

খেটে খেতে পাচ্ছি কই ? যা বলবে আমি তাই করতে রাজী। একটা উপায় বলে দাও।

তুমি কথা কইছিলে হাসছিলে, তোমায় দেখতে দেখতে এখন রাগ ধরে গেল আজ—

আমার ওপর রাগ ?

না, এমনি। কেন, আমরা মানুষ নই ? আমাদের সাধ-আহ্লাদ নেই ? আমি ভেসে এসেছি না তুমি ভেসে এসেছ ? আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। পাপ হোক যাই হোক—

কৈলাস তার হাত চেপে ধরে।

লক্ষ্মী কাতরভাবে বলে, পাপের কথা নয় গো। পাপ হলে নয় নরকে যাব। আসলে তুমি আমি তেমন লোক নই, মোদের এ সব পোষাবে না।

কৈলাস রাগতভাবে বলে, কেন ? সোয়ামি আছে বলে ? সাত বছর খোঁজ নেয় না, দিব্যি আরেকজনের সঙ্গে ঘর করছে, তোমার অত সতীপনা কেন ?

সতীপনা চুলোয় যাক।

তবে কেন দগ্ধে মারছ ?

প্রাণ থেকে সায় দেয় না, আমি কী করব বলো ?

কৈলাসের মুখ দেখা যায় না। অতি মৃদুস্বরে লক্ষ্মী বলে, সেই ধরলে তো হাত ? মাথাটা গুলিয়ে দিতে চাও ?

কৈলাস হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, আমায় নিয়ে খেলা করছ, টের পেলাম আজ।

এতকাল পরে টের পেলে ? এদিকে তো বেশ চালাক চতুর ! আমার বেলাই কেবল গোসা করতে জানো। এটুকু বোঝো না, সবাই মোদের ঘেন্না করবে, টিটকারি দেবে ?

উপায় ? উপায় তো জানিনে। আশায় থাকি এস। যদি কিছু হয়।

আর জন্মে হবে।

কৈলাস আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। চোখের পলকেই সে যেন কুয়াশার সঙ্গেই মিশে যায়। ষষ্ঠীতলার বট গাছটার ডালে একটা রাত্রিচর পাখি কর্কশ আওয়াজ তোলে। দূর থেকে শোনা যায় কুকুরের ডাক। দু হাতে সমস্ত মুখটা দু-একবার জোরে জোরে কচলিয়ে নিয়ে লক্ষ্মীও ঘরের দিকে পা বাড়ায়। আশা ? সত্যই কি এ জন্মে তাদের কোনো আশা নেই ? কোনোদিনই একটা সামঞ্জস্য সম্ভব হবে না ? প্রকাশ্যভাবে দশজনের স্বাভাবিক স্বীকৃতি পেয়ে তাদের মিলিত হওয়া অবাস্তব কল্পনা হয়ে থাকবে ? কতদিনে কতভাবে কত মানুষের সঙ্গে জড়ানো তার জীবন। এ জীবনকে বিসর্জন না দিয়ে জীবনের এ দিকটা সার্থক করার খুব দুঃসাধ্য খুব কঠিন একটা উপায়ও যদি কেউ তাকে দেখিয়ে দিত !

পৃ ৩৪ ৩৫

জানুক না জানুক, সবাই যে জন্য ঘেন্না করবে আমি তা লুকিয়েও করতে পারব না।

লক্ষ্মী এবার নিজে হাত বাড়িয়ে কৈলাসের হাত ধরে, বলে, এই দ্যাখো খেলা করছি।

বলে, সত্যি বলব তোমায় ? নিজেকে আমার বড়ো ভয়। পুলিশের হাতে জাত গেছে, তাতে আমার বুক জ্বলে কিন্তু দশজনের সাথে বুক ফুলিয়ে মিলিমিশি, মাথা উঁচু রেখে কথা কই। মোবা নয় লুকিয়ে পিরিত করলাম, কেউ জানল না। কিন্তু আমি ঠিক জানি আমি নিজে নিজেই সবার কাছে চোর বনে থাকব।

কৈলাস বলে, তোমার বড়ো খুঁতখুঁতানি।

কী করব বলো ? যেটা আছে সেটা নেই ভাবব কী করে ? যদি পার খুঁতখুঁতানি সারিয়ে দাও—কথাটি কইব না। নয়তো অন্য উপায় করো যাতে তোমার কাছে রাত কাটিয়ে বুক ফুলিয়ে সবার সামনে হাঁটতে পারি।

গোকুল শালা বেঁচে থাকতে কোনো উপায় নেই।

লক্ষ্মী তার গলা জড়িয়ে কাঁধে মাথা রেখে বলে, তবে আজ লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরে যাও। তোমার ওই গোকুল শালাকে মেরে ফেলার উপায় করতে চাও, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমায় শুধু জানতে দিয়ো না তুমি খুন করেছ।

লক্ষ্মী চোখ বুজে ছিল, সে টের পায় না। কৈলাস হঠাৎ বলে, চট করে ঘরে যাও। পুলিশ গাঁ ঘেরাও করছে।

লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ঘরের দিকে জোরে জোরে পা চালায়।

কৈলাসও আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। চোখের পলকেই সে যেন গাছপালার সঙ্গে মিশে যায়। ষষ্ঠীতলার বটগাছটার ডালে একটা রাত্রিচর পাখি কর্কশ আওয়াজ তোলে। দূর থেকে শোনা যায় কুকুরের ডাক।

মা রচনাসমগ্র ৮ পৃ ২৮ ২৯

সেই রাত্রে লক্ষ্মী—যার ফিরবার ঘণ্টাখানেক বাদে রাবতলা থেকে গাড়ি বোঝাই পুলিশ এসে পনের মিনিট বাদে তাদের সঙ্গে জগদীশের গাড়িতে জীবন রওনা দিলে প্লট ঘোরালো হবে কি না জানি না তবে সেটা বিচ্ছিন্ন বা খাপছাড়া ঘটনা হবে না নিশ্চয়। জীবনের পা মচকে এ গাঁয়ে আশ্রয় নেওয়ারই সেটা জের। আনুষঙ্গিক ব্যাপার। জীবন পা মচকে এই চাষাড়ে গাঁয়ে আটকে না গেলে এবং সেটা গুজব হয়ে রাতারাতি না ছড়ালে গাড়ি বোঝাই পুলিশ নিয়ে জগদীশের ছুটে আসা প্রয়োজন হত না।

পৃ ৩৭

জীবনকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত পাড়াগাঁটা নিজেও ঘুমিয়ে পড়ে। এত বেশি খাটে সকলে আর এত কম খায় যে ঘুমের টনিক ছাড়া বাঁচাই অসম্ভব তাদের। ঘুমের জন্য তপস্যা করতে হয় না, চাটাই-মাটাই যাতে হোক গা এলিয়ে ছেঁড়া বালিশ বা ন্যাকড়া-জড়ানো খড়ের পুঁটুলিতে মাথা রাখলেই ঘুম যেন মশার ঝাঁকের আগেই এসে যায়। কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবার কী যো আছে গাঁয়ের লোকের, পা মচকে স্বদেশি-সাধনায় কোনো সাধক গাঁয়ে আশ্রয় নিলে ! আধঘণ্টা বাদে রাবতলা থেকে গাড়ি-বোঝাই পুলিশ এলে, পনেরো মিনিট বাদে তাদের সঙ্গে জগদীশের গাড়িতে জীবন রাবতলায় রওনা

দিলে প্লট ঘোরালো হবে কিনা জানি না তবে সেটা বিচ্ছিন্ন বা খাপছাড়া ঘটনা হবে না নিশ্চয়।

মা বচনাসমগ্র-৮ পৃ ২৯

[পত্রিকার পাঠে অনুপস্থিত]

জনতার জোরে ভাগ্য ফিরিয়ে দেবেন।

মানিক বচনাসমগ্র-৮ পৃ ৩১

ইতিকথার পরের কথা গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখক উপন্যাসটির যে সংশোধন সংযোজন পরিমার্জনার উল্লেখ করেছিলেন, তার ভাষাগত কিছু পাঠভেদের উদাহরণ মাত্র সংকলিত হল। পত্রিকায় তেরো কিস্তিতে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু অধ্যায় ছিল বারোটি। গ্রন্থাকারে অধ্যায় সংখ্যা বেড়ে হয়েছে তেরোটি, পৃষ্ঠাসংখ্যারও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে কাহিনি অপরিবর্তিত আছে। সমাপ্তিরও কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয়নি।

পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের তেরোটি কিস্তির ভিতর ছটিতে মাত্র পরিচ্ছেদ বিভাগের নির্দেশ ছিল। উপন্যাসাকারে প্রকাশকালে সংস্কার করা সত্ত্বেও লেখকের অনবধানপ্রসূত কিছু অসংগতি এই উপন্যাসেও লক্ষিত হয়। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে সরোজ দত্ত চিহ্নিত সেই জাতীয় কয়েকটি অসামঞ্জস্যের উদাহরণ নিম্নরূপ (গ্রন্থালয় প্রকাশিত মানিক গ্রন্থাবলীর অষ্টম খণ্ডভুক্ত ইতিকথার পরের কথার পৃষ্ঠাই উদ্ধৃত অংশে নির্দেশিত হয়েছে, উক্ত পৃষ্ঠাসংখ্যা বর্তমান মানিক বচনাসমগ্রের নয়)

> "বারতলা যাবার পথে দুর্ঘটনায় আহত জীবনকে, রাত্রে খাবার সময় যে বৌটি পরিবেশন করছিল, সে লোচনের বড় ছেলে ঘনরামের বৌ দয়া।' (পৃ ২৪০) এই বৌটির জীবনে একটি অভিশপ্ত দিক আছে—'দয়ার ছেলেমেয়ে হয়ে বাঁচত না। এমনিতে দয়াকে পছন্দই করত ঘনরাম কিন্তু ছেলেমেয়েকে জন্ম দিয়ে বাঁচাতে না পারায় ঘনরাম বড়ই অসুখী হয়েছিল, বড়ই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল দয়ার উপর।' (পৃ ৩৫০) অতঃপর এই মৃতবৎসা 'দয়ার অনুমতি নিয়ে তো বটেই, অনেকটা তার তাগিদেই ঘনরাম বিয়ে করেছিল রামপুরের কার্তিকের মেয়ে বেণ্ডিকে।' (পৃ ৩৫১) এ সত্ত্বেও কিন্তু বেণ্ডি সম্পর্কে প্রথমে একটা বিদ্বেষ দেখা দেয় দয়ার মনে। অবশ্য বিয়ের পর সতীনকে দয়া আদর যত্নই করেছে এবং রাত্রে ঘনরামের কাছে বেণ্ডিকে পাঠাতে তৎপরতাই দেখিয়েছে। তথাপি 'তিন বছর পরে দশমাসে ছেলে হতে গিয়ে বেণ্ডি মরে গিয়েছিল। তখন মানতে হয়েছিল ঘনরামকে যে ছেলে হয়ে না বাঁচাটা দয়ার দোষ নয়। ওরই ছেলেপিলে বাঁচবে না এটাই অদৃষ্টের বিধান।' (পৃ ৩৫১) অতএব দয়ার পুনরায় সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং সে-সন্তান বাঁচবে না জেনেও তার পরিচর্যা করতে হয়েছে দয়াকে। (পৃ ৩৫৪)
>
> "এর কিছু আগে ৩২৮ পৃষ্ঠায় আছে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের আভাস আর ৩২৯ পৃষ্ঠায় আছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে লোচনের দাওয়ায় এক আলোচনা সভার কথা। সেই আলোচনা সভাতে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত আছে ন'বছরের ছেলে মোহন। তাকে খেতে ডাকে ঘনরামের পিসি সুখতারা। দয়া মোহনের কোনো যত্নই নেয় না— 'শ্বশুরের মামলায় যাচ্ছে গায়ের গহনা, সোনা কটার পর পায়ের রূপোর মল পর্যন্ত, কোলের ছেলেটা মরে গেল বিনা চিকিৎসায়। শ্বশুর আর স্বামীর অবহেলায়। দয়া তাই নিজের ন বছরের বড় ছেলে মোহনের দিকে ফিরেও তাকায় না। মরে তো ওটাও মরুক দায় চুকে যাক দয়ার।' (পৃ ৩২৯)
>
> "হঠাৎ মনে হতে পারে মৃতবৎসা দয়ার ন বছরের ছেলে এল কি ভাবে ? এটাও লেখকের আর এক ভ্রান্তির নিদর্শন ? তা ঠিক নয় কারণ ৩৫১ পৃষ্ঠায় আরো অনেকগুলি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আছে এবং সে সূত্রে সমস্যার একটা সদুত্তর পাওয়া যেতে পারে। ৩৫১ পৃষ্ঠায় আমরা পরপর পাই—খাজনা বন্ধ আন্দোলনের প্রসঙ্গ, অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা এবং এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভের আশ্বাস আর তার ব্যর্থতার কথাও। এই আন্দোলনে কারাবরণ করে মুক্তির পর ঘনরাম বেণ্ডিকে বিবাহ করে। আর দয়ার নবছরের ছেলে মোহনকে আমরা পাচ্ছি ১৯৪৩-এ, দুর্ভিক্ষের কালে। ১৯২২ ২৩ থেকে ১৯৪২-৪৩ এর মধ্যবর্তী সময়ে দয়া তার অভিশাপ কাটিয়ে উঠে থাকবে।
>
> "সমস্যাটা এ ভাবে কাটিয়ে ওঠবার সময় আর এক গভীরতর সমস্যায় পড়ে যাই আমরা মোহনকে নিয়ে। লোচনের দাওয়ায় আলোচনা সভার গোড়ার দিকে জানানো হল দয়ার বড় ছেলে মোহন এবং তার বয়স

নবছর (পৃ ৩২৯)। আর সেই সভায় আলোচনা চলাকালীন পিসীর মেয়ে, পিসী আর মোহন সম্পর্কে আরো কিছু কথা জানালেন লেখক— 'এরা দুদিনের অতিথি। সদরে মামলা করতে গিয়ে লোচন সঙ্গে এনেছে। সঙ্গে আসার জন্য জিদ ধরেছিল মোহন। তা সে এলে পিসীমাকেও আসতে হয়, মা মরা ছেলেটা ভিন্ন পিসীর কাছে জগৎসংসারে সব কিছু মিছে—ওই হারানি ছাড়া।' (পৃ ৩৩১) এরই ধারাবাহিকতায় ঐ একই পৃষ্ঠায় লেখক আরো জানিয়েছেন যে মোহনের বাবার নাম মধু এবং শহরের এক জুতোর কারখানায় সে কুলী খাটে।

'তা হলে দয়ার নবছর বয়সী কোনো ছেলে নেই মোহন নামে ? কিম্বা দয়া নিজেই বেঁচে নেই, মোহন যখন মাতৃহারা ? মোহনের বাবা ঘনরাম নয় মধু ? এবং সে চাষী নয় জুতোর কারখানার মজুর ? এই মধুর সঙ্গে লোচনের কি সম্পর্ক যে মধুর ছেলে লোচনের কাছে জোর খাটাতে পারে ? আবার মোহন সুখতারার সঙ্গেই বা কোন সম্পর্কে যুক্ত যাতে মোহনের টানে টানেই সুখতারাকে লোচনের বাড়ি আসতে হয় ? অন্যদিকে দয়া ঘনরামের স্ত্রী এবং মোহন দয়ার ন বছরের বড় ছেলে, কেন তবে সে শহরে সুখতারার কাছে থাকবে ?

"এই উপন্যাসে, একদা স্বাধীনতা-সংগ্রামী জীবনের বয়স ৬৫ বছর (পৃ ২৪৬)। জগদীশের বন্ধু ও চিকিৎসক ভূদেব ডাক্তার (পৃ ২৪৭) জীবন-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে। ভূদেব জীবনকে বলছিলেন—'আপনি আমি বুড়ো হয়েছি, আমাদের জগদীশ প্রৌঢ় হয়েছে' (পৃ ৭৪৮),--জগদীশ ও ভূদেবের বন্ধুত্ব কি অসমবয়সী ?

"লোচনের সঙ্গে রাজেনের সম্পর্ক ভালো ছিল না। ঘটনাচক্রে রাজেনকে আশ্রয় নিতে হল সপরিবারে লোচনের মামা জগন্নাথের বাড়িতে এবং লোচনের সঙ্গেই কাটাতে হল দুটো রাত। তখন 'রাজেন ভেবেছিল, মামাকে বলে ভূষণ তাদের খেদিয়েই দেবে'—(পৃ ৩২৮)। রাজেনের আশঙ্কাটা অমূলক ছিল না, কারণ 'কথাটা লোচন ভেবেছিল একবার' (পৃ ৩২৮)। জগন্নাথের ভাগ্নের নাম কি ? লোচন না ভূষণ ?

"উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে লক্ষ্মীর বেশ গুরুত্ব আছে। সে কথা বোঝাতে গিয়ে ড সরোজমোহন মিত্র *তাঁর জীবন ও সাহিত্যগ্রন্থে* (৩ সং) ২৯০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন —'অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে লক্ষ্মীর আলাপ আলোচনা শুনে শুভ অবাক হয়ে যায়। হবারই কথা। কারণ গজেনের বালবিধবা [?] লক্ষ্মী এখন কৃষক আন্দোলনের নেত্রী।' লক্ষ্মীর সঙ্গে কৈলাসের একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এদের দুজনের পরিচয় দিতে গিয়ে ড মিত্র তাঁর গ্রন্থের ২৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'কৈলাস কালীসাধক ত্রিভুবন দত্তের পুত্র। আর লক্ষ্মী খুনের বৌ।'

"মানিক গ্রন্থাবলীর অষ্টম খণ্ডে সঙ্কলিত *ইতিকথার পরের কথা* উপন্যাসে লক্ষ্মীর কথা একটু ভিন্ন ভাবে আছে। লক্ষ্মী গজেনের মেয়ে (পৃ ২৩৮), স্বামীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, এদিকে কৈলাস তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। অধৈর্য কৈলাস একদিন লক্ষ্মীর অসম্মতির উত্তরে জানায়—'কেন ? সোয়ামী আছে বলে ? সাত বছর খোঁজ নেয় না, দিব্যি আরেকজনের সঙ্গে ঘর করছে, তোমার অত সতীপনা কেন ?' (পৃ ২৪৩) লক্ষ্মীর দ্বিধা থেকেই যায়, যদিও তার স্বামী সত্যিই তার কোনো খোঁজ নেয় না। সামাজিক সংস্কারই লক্ষ্মী কৈলাসের মিলনের প্রতিবন্ধক। শেষ পর্যন্ত হতাশ কৈলাস বলে—'গোকুল শালা বেঁচে থাকতে কোনো উপায় নেই।'

"লক্ষ্মী তার গলা জড়িয়ে কাঁধে মাথা রেখে বলে, তবে আজ লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরে যাও। তোমার ঐ গোকুল শালাকে মেরে ফেলে উপায় করতে চাও আমার কোনো আপত্তি নেই। আমায় শুধু জানতে দিও না তুমি খুন করেছ।' (পৃ ২৪৪)

"কোনো সুরাহা হয় না এ সমস্যার। কৈলাস ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা ভাবে এবং লক্ষ্মীকে বোঝায়, তার স্বামী যখন থেকেও নেই বা না থেকেও আছে তখন এটাই তাদের মিলনের সহজ পথ (পৃ ৩৩৫)। লক্ষ্মী উন্মনা হয় এবং ভাবে—'যেটুকু সুখ সার্থকতা এদেশে পাওয়া সম্ভব, সে কেন তা থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবন কাটাবে ? তার কৈশোরটুকু লুটতে লুটতে স্বামী বিগড়ে গিয়েছিল বিক্রির জন্য বাজারে সাজানো নারীর যৌবন আর নেশায়। সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছে আজ একযুগেরও বেশী। তবু সেই সম্পর্কের দায় টেনে নগদ সুখ বাতিল করে কেন সে দুঃখী হয়ে থাকবে ?' (পৃ ৩৩৭)

"শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুঃখীই থেকে যেতে হয়েছে লক্ষ্মী আর কৈলাসকে। কারণটা হল লক্ষ্মীর স্বামী কৈলাসের বেঁচে থাকা। ফলে, লক্ষ্মীকে যেমন 'বালবিধবা' বলে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না তেমনি 'খুনের বৌ' পরিচয়ও তার টিকছে না। অবশ্য এইসঙ্গে মনে রাখা ভালো, ড মিত্র যদি উপন্যাসের কোনো ভিন্ন পাঠ অবলম্বন করে লক্ষ্মীর ঐ পরিচয় দিয়ে থাকেন তবে সেটা একটা মূল্যবান তথ্য যার ভিত্তিতে উপন্যাসটির আলোচনা নতুন বাঁক নিতে পারবে। এখানে বরং যেটুকু জানা গেল—লক্ষ্মীই তার স্বামীকে ত্যাগ করেছে, লোকে অবশ্য বিপরীতটাই সত্য বলে জানে। লক্ষ্মীর এই প্রতিবাদী রূপ তার বাকি কার্যকলাপের সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। 'বালবিধবা' 'খুনের বৌ' লক্ষ্মীকে ড মিত্র কোথায় পেয়েছেন যদি জানাতেন।

'অন্য এক প্রসঙ্গে যাওয়া যাক এবারে। লোচনের ছোট ছেলে, গাঁদার স্বামী মহিম নিরুদ্দেশ, তাই গাঁদার একেবারেই ভালো লাগে না রাত্রে। সে তাই লক্ষ্মীর কাছে ঘুমোতে চায়। লক্ষ্মী তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ফেরৎ পাঠায় তার শাশুড়ীর কাছে, যাতে মহিম ফিরে এসে নিঃসংশয় থাকতে পারে গাঁদার সম্পর্কে (পৃ ২৪১)। ৩৩৯ পৃষ্ঠায় দেখা যায় গাঁদা লক্ষ্মীর পাশেই শুয়ে আছে, এবং ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লেখক বেশ গুছিয়ে লিখেছেন – 'গাঁদাকে পাশে নিয়ে লক্ষ্মী রাতে শান্ত হয়ে ঘুমোয়, ছেলেমানুষ গাঁদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুমোয়।' হয়তো লক্ষ্মীর মনে ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে অন্য কোনো বিবেচনা, কিম্বা গাঁদার অস্থিরতা বেড়েছে—তাই এই পরিবর্তিত ব্যবস্থা।

'এই ব্যবস্থায় অন্য এক সমস্যা পাকিয়ে ওঠে। ৩৩৮ পৃষ্ঠায় লক্ষ্মী উদার আহ্বান জানিয়েছে কৈলাসকে—'থানার ঘড়িতে এগারোটা বাজতে শুনে এস। জেগে রইব।' জেগেই ছিল লক্ষ্মী, উৎকণ্ঠায় ছটফট করছিল গাঁদাকে পাশে নিয়ে। (পৃ ৩৩৯) গাঁদার উপস্থিতি নিশ্চিত জেনেও কৈলাসকে সে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই আহ্বানে কৈলাস যদি সাড়া দিত ?

"মানিকের উপন্যাসে প্রায় নিয়মিত দুর্ঘটনা এ-উপন্যাসেও ঘটেছে , ২৪৩ পৃষ্ঠায় লোচনের বড় ছেলে ঘনরাম ২৮৪ পৃষ্ঠায় ঘনশ্যাম হয়ে গিয়েছে।"

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় —সরোজ দত্ত, ১৯৯৩ , পৃ ৮২-৮৫

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-বিষয়ে অনুপুঙ্খ গবেষণার প্রয়োজনে, পাঠসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও সংগতি অসংগতি বিষয়ক অনুসন্ধান একত্র সংকলিত করার উদ্দেশ্যেই এই প্রাসঙ্গিক অংশ বিশেষজ্ঞের আলোচনা থেকে পুনর্মুদ্রিত হল।

ইতিকথার পরের কথা উপন্যাস প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপিতে প্রাপ্ত তথ্যগুলি নিম্নে সংকলিত হল

ইতিকথার পরের কথা— Notes

স্টেশন বারতলা কারখানা 'নব শিল্প মন্দির'

জগদীশ— বারতলার জমিদার মালিক
গজেন—বারতলায় পানবিড়ি চিঁড়ে মুড়ি দোকান পুলিতে পা খোঁড়া
সনাতন —বারতলায় দেশি খাবার, তেলেভাজা ইত্যাদি—
সুষমা
লোচন —গজেনের পাড়ার চাষী পা মচকে জীবন-এর বাড়িতে উঠেছিল
রসিক—বুড়ো চাষী ঐ সবার মান্যগণ্য
ছোট বৌ লোচনের বাড়ী
কৈলাস—চাষী ঐ নন্দডাক্তারকে ডাকতে গিয়েছিল—
বনমালী—চাষী ঐ গরু গাড়ি আছে —
সাঁতরা—বাড়ী থেকে নববিবাহিত ছেলের ফর্সা বিছানা এনে জীবনের জন্য নিতাই জেলে—
ভূদেব (বিলাতফেরত ডাক্তার) জগদীশের কাকা
" স্ত্রী
মায়া—ঐ মেয়ে
লতা— জগদীশের ছোট মেয়ে
ফণীন্দ্র—জগদীশের ভাগ্নে
প্রীতিলতা —ঐ বৌ
প্লট সম্পর্কে—
নন্দডাক্তার দেশীয় রক্ষণশীল প্রগতিশীল—নতুন পথে চলতে চায় গোঁড়ামি নিয়ে
জগদীশের ছেলে—বিলাতফেরত ইঞ্জিনিয়ার + বৈজ্ঞানিক + শিল্প [পতি ?]
—প্রগতিবাদী—পাশ্চাত্যভাবে—আছাঁকা রাশিয়ান মত
ধনঞ্জয় ও এর সংঘাত—দুজনেরই দরকারি পরিবর্তনে শেষ মীমাংসা

লক্ষ্মী—গজেনের মেয়ে—আন্দোলনের সময় গরীব ভদ্রঘরে বিয়ে—অমিল—গাঁয়ে আছে—নেতৃস্থানীয়া—লক্ষ্মীর সমস্যা দেখা দিল—চাষাভুষো পল্লীপরিবেশ ছেড়ে দিলে—উচ্চস্তরে উঠে গেলে—দেশেব সেবা করেও প্রেম সার্থক হয় · তাব জগতে প্রেমেব সার্থকতা নিন্দনীয়, প্রথার বিরোধী—উচ্চসমাজে নয়। কোনটা ছাড়বে ?

Note : ভাদ্রসংখ্যায়[২] দুজন উদ্বাস্তু দোকানী কারখানার কাছে : পরে আবও আসবে।
Note : গঙ্গা [র] স্বামী জেলে—ভাদ্রসংখ্যাব শেষে এটা উল্লেখ করা হযনি।—

জেলে কর্মীদের সঙ্গে মিশে তার সংশোধনের চেতনা : মৃত্যুশয্যায় শেষ দেখা দেখতে চাওয়ায় কৌশলে বাড়ীতে আসা—রাত্রে গঙ্গাকে বলবে, ভাল হব, তাই একবার দেখতে এলাম—খুব বেশি অসুস্থ নই—

[চাব পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা শেষ দুটি Note লাল পেন্সিলে। পরবর্তী অংশটি বহু পরের পৃষ্ঠায় পৃথকভাবে লেখা। বিষয়গত সাদৃশ্যের বিচারে একসঙ্গে গ্রথিত হল।]

ঘনরামের পিসী সুখতারা
ইতিকথা :
ভুলা বাগ্দীর ছেলে বলাই—ট্রেনে কাটা। ২৩
গদা—জগদীশের বিশ্বস্ত চাকর ২৩
মাঝের গাঁ—নন্দর বাড়ী
সাবিত্রী—শুভর মা
তালতলা—গজেনদের পাড়া
সাঁতরাদের নববিবাহিত ছেলে
হরিপদ—উগ্র—পেটে আমাসায় ২৪
শুভকে অগ্রাহ্য

ইছামতী—গাঁদাব শাশুড়ী ৪৩-৪৪
ভূতো—গাঁদার ভাই ৪৫
প্রৌঢ় বয়সী শশাঙ্ক—খালি পা
খালি পায়ে খালি গায়ে আট হাতি ধুতি—শুভকে অগ্রাহ্য

Note শুভর যেমন জগদীশের সঙ্গে কৈলাসেব তেমনি কালীভক্ত ত্রিভুবনের সঙ্গে লক্ষ্মীকে নিয়ে
গোকুল—লক্ষ্মীর স্বামী—সাত বছর নেয় না—অন্য মেয়ে নিয়ে থাকে—
হেড মাষ্টাব বীরেন চাটুয্যে—
নায়েব কালীচরণ
গোষ্ঠ, সুখন
সুখন—ধীর শান্ত মনে কাঁসারি হয় কিন্তু বদমেজাজী
অমৃত—গঙ্গার স্বামী
সৌমেন জমিদাবেব ছেলে ঐ বন্ধু
শিবনাথ—জগদীশেব মন্দিরের পুরোহিত—
রায়দের বুনোবাবু—৪৫ বজ্জাত—গাঁদার দিকে নজর
মহিমের ঈর্ষা—
শম্ভু দাস—মহিমের ছদ্মনাম—উদ্বাস্তু
জনা লেভেল ক্রসিং
ইচ্ছামতী—লোচনের বৌ
পরি : ৪
ভোরে চাষীরা ধরণীর কাছে যাবে—শুভর লুকিয়া [লুকিয়ে] আলাপ শোনা
—ধরণীর বাড়ী...(মাটি থেকে[৩])

পরি : ৫
গাঁদার কাছে মহিমের চিঠি—মহিমের কলকাতার বিবরণ
৬
শুভর জন্মদিনে কলকাতার উৎসবে নন্দ—ফিরোজ রহমান
৭
নবশিল্প মন্দিরে নবজীবন—সুখনদের সঙ্গে সংঘাত
৮
বাসন কারখানা নিয়ে শুভ নন্দ তর্ক—লক্ষ্মীকে কাজে বহাল—মায়ার কারখানায় আসা—

অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র—ভূমিকা টীকাভাষ্য সম্পাদনা

উদ্ধৃত অংশে 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'-র সম্পাদক কর্তৃক চিহ্নিত ২ সংখ্যক টীকায় নতুন সাহিত্য পত্রিকার ১৩৫৮ ভাদ্র সংখ্যার কথা বলা হয়েছে। ৩ সংখ্যক নির্দেশ লেখকের পূর্ব প্রকাশিত 'মাটি' গল্পের ইঙ্গিত। উক্ত মাটি গল্পের ('মাটির মাশুল' গ্রন্থভুক্ত), মাসিক বসুমতীর অগ্রহায়ণ পৌষ ফাল্গুন ১৩৫৩ এবং বৈশাখ ১৩৫৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। উক্ত গল্পের কিয়দংশ ইতিকথার পরের কথা উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত হয়েছে।

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সরোজ দত্ত (১৩৫৭), পৃ ৮২-৮৫ উদ্ধৃতাংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা গ্রন্থালয়-প্রকাশিত মানিক গ্রন্থাবলীর অষ্টম খণ্ডের পৃষ্ঠাঙ্ক। মানিক রচনাসমগ্রের ৮ম খণ্ডে সেগুলির পৃষ্ঠাঙ্ক নিম্নরূপ :

মা গ্রন্থাবলী ৮ম	মা রচনাসমগ্র-৮	মা গ্রন্থাবলী ৮ম	মা রচনাসমগ্র-৮
পৃ ২৩৮	পৃ ৯	পৃ ৩২৮	পৃ ৬৫-৬৬
২৪০	১০-১১	৩২৯	৬৬-৬৭
২৪১	১১-১২	৩৩১	৬৮-৬৯
২৪৩	১৩	৩৩৫	৭২-৭৩
২৪৪	১৩-১৪	৩৩৭	৭৪-৭৫
২৪৬	১৫	৩৩৮	৭৫-৭৬
২৪৮	১৬-১৭	৩৩৯	৭৬-৭৭
২৮৪	২৯-৩০	৩৫০	৮৭-৮৮
২৯০	৩৩	৩৫১	৮৮-৮৯
২৯১	৩৩-৩৪	৩৫৪	৯০-৯১

মানিক রচনাসমগ্রে ইতিকথার পরের কথা-র দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ গৃহীত হয়েছে।

পাশাপাশি

'পাশাপাশি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চত্বারিংশৎ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং ত্রয়োবিংশতিতম উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রকাশকাল মহালয়া ১৩৫৯ [১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫২], প্রকাশক সাহিত্য জগৎ কলকাতা, পরিবেশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃ ২ + ২০৬, মূল্য সাড়ে তিন টাকা, প্রচ্ছদশিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৭০ শ্রাবণে [আগস্ট ১৯৬৩] রবীন্দ্র লাইব্রেরি, কলকাতা থেকে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পৃ ৪ + ১৭২, মূল্য তিন টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী প্রভাত কর্মকার।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ উপন্যাসটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যার প্রকাশক, মূল্য, পৃষ্ঠাসংখ্যা ও প্রচ্ছদ অপরিবর্তিত ছিল। মানিক রচনাসমগ্রে পাশাপাশি র প্রথম সংস্করণ (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) এর পাঠ গৃহীত হয়েছে।

পাশাপাশি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়নি— অন্তত এই সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপিতেও উপন্যাসটির কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু সরোজমোহন মিত্র প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী পাশাপাশি উপন্যাসটির পরিকল্পিত পূর্বনাম ছিল 'হৃদয়হীন' (দ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, সরোজমোহন মিত্র, ১৩৫৭)। পরবর্তী সময়ে মীমাংসা নামক লিখিত গল্পটি যা লাজুকলতা-য় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তা এই উপন্যাসের অংশবিশেষ (দ্র তদেব) ছন্দপতন উপন্যাসে নায়ক নব-র কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে যেমন লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবাদর্শগত আত্মপ্রত্যয়ের কিছু পরিচিতি সংগ্রহ করা যায়, তেমনই পাশাপাশি উপন্যাসেও সুনীলের সাংবাদিকতা চর্চার অন্তরালে লেখকের বিশ্বাস ও সত্যানুসন্ধিৎসার আভাস পাওয়া যায় বলে সমালোচকদের ধারণা। ছন্দপতন উপন্যাসের মতো পাশাপাশি-তেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখকের স্বাধীনোচিত কিছু মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া এই উপন্যাসের নায়ক সুনীলের অন্তর্মুখী ভাবনায় প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কেও লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন লক্ষ করবেন পাঠকবর্গ

> "নারী-পুরুষের পরস্পরের আকর্ষণ মোটেই তুচ্ছ ব্যাপার নয় তার কাছে, নারীদেহ বর্জন করেই পুরুষের শুদ্ধ পবিত্র উচ্চতর জীবন সম্ভব এই ধাপ্পাবাজিতেও সে বিশ্বাস করে না। নারী পুরুষের মিলন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনেরই একটা অঙ্গ। বৃহত্তর জীবনের জন্য বড়ো দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই কেবল সংযমের মানে হয়, নিজের আর আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের ফাঁকির খাতিরে সংযমের নামে আত্মপীড়নকে সে অসুস্থতা, বিকারগ্রস্ততা বলেই জানে।'

মানিক রচনাসমগ্র ৮ পৃ ২০৩

পাশাপাশি উপন্যাসে কোথাও কোথাও লেখকের অনবধানতা বা অসতর্কতাজনিত কিছু অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক সরোজ দত্ত।

> "উপন্যাসের ১৭৪ পৃষ্ঠায় আমরা নায়ক সুনীলের আত্মবিশ্লেষণের সামনে আসি। প্রেমের নামেই বিমুখ হয়ে ওঠে তার মন, কিন্তু তার খেয়াল হয় যে 'ঘটনাচক্রে যে দুটি টুইসনির খোঁজ পেয়েছিল, দুটিতেই ছিল মেয়েকে পড়াবার প্রয়োজন। তার মধ্যে একজনকে সে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু এদের দুজনকেই বাতিল করে কোনো ছেলেকে পড়াবার টুইসনি খুঁজে নেবার কথা তো তার মনেও আসেনি ?' এই বেছে নেবার প্রশ্নে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে ১৪২ ৪৩ পৃষ্ঠায়। দুটির মধ্যে যে মেয়েটিকে সুনীল ছাত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছে সে নন্দা— শচীনের বিধবা মেয়ে, মৃত প্রমোদের স্ত্রী। এই বাছাইয়ের আগে, ঐ ১৪২ পৃষ্ঠাতে সুনীল কথা বলেছে যাদবের মেয়ে উমার সঙ্গে এবং বাতিল করেছে যাদবের বাড়িতে পড়াবার সম্ভাবনা। কিন্তু যাদবের মেয়েকেই পড়াবার কথা ছিল সেখানে ? যাদবের বাড়িতে পৌঁছে সুনীল দেখেছে—'বার তের বছরের একটি ছেলে পড়ছিল, পড়ার টেবিলের অন্য পাশে বসেছিল বেরার বয়সী উমা।' যাদব সুনীলকে বলেছেন—'আমার মেয়েই অ্যাদ্দিন ওকে পড়াচ্ছিল, নিজে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে। এখন আর পেরে উঠছে না, তাই একজন লোক রাখব।' উমা নিজেও সুনীলকে বলেছে— 'কাল পরশুই আরম্ভ করুন। বেচারার বড্ড অসুবিধা হচ্ছে।' উপস্থাপনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ছেলের জন্যই যাদবের প্রয়োজন ছিল গৃহশিক্ষকের এবং ভাই বেচারার অসুবিধের কথা মনে রেখে উমা সুনীলকে দ্রুত দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানিয়েছিল। সুতরাং সুনীলের আত্মবিশ্লেষণের গোড়াতেই গলদ থেকে যাচ্ছে। একটি ছেলেকে বাতিল করেই সুনীল একটি মেয়েকে পড়াবার ভার নিয়েছে। কিন্তু লেখক আদৌ কেন এভাবে ধরতে চাইলেন সুনীলকে ? তিনি কি বোঝাতে চাইছিলেন যে সুনীলের আপাত নিস্পৃহতার আড়ালে একটা নারীসান্নিধ্য পিপাসু মন আছে ? তেমন ঘটে থাকলে লেখকের ভ্রান্তির মাধ্যমে অনেক বেশি অনাবৃত হল সুনীলের মন এবং সেইসঙ্গে বোধ হয় ঔপন্যাসিক নিজেও অনাবৃত হলেন।

"আত্মবিশ্লেষণের সূত্রে সুনীলের ভাবনার মধ্যে এমন কিছু কথা এনে ফেলেছেন লেখক যা একেবারেই অসঙ্গত ও গর্হিত। সুনীল ভাবছে--'তার বিতৃষ্ণা কি তবে প্রেম সম্পর্কে নয় ? রেবার মতো উমার মতো মেয়েরা যেটাকে প্রেম মনে করে সেটাই তার অপছন্দ ?' (পৃ ১৭৪) রেবার আচার আচরণের স্থূলত্বে রুচি বিঘ্নিত হতে পারে, কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে উমার সঙ্গে সুনীলের দ্বিতীয়বার দেখা ই হয়নি এবং তার প্রথমবারের আচরণে অসম্ভ্রমজনক কিছু তো ছিল না। সুতরাং রেবার পাশাপাশি তাকে স্থাপন করে উমাকে বকেটিস করে তুললেন কেন লেখক ?

"আরো কিছু ছোটখাট অসঙ্গতিও আছে। আগাগোড়া সুনীলের বাবার নাম ভূপেশ, ১৭৭ পৃষ্ঠায় সেটা হয়ে গিয়েছে ভূপেন। এটা মুদ্রণপ্রমাদ হতে পারে কিন্তু ১৪৬ পৃষ্ঠায় কল্পনার স্বামী অঞ্জন যে ২০৩ পৃষ্ঠায় প্রণব হয়ে গেল সেটাকে মুদ্রণপ্রমাদ বলা ঠিক হবে না। ১৮৮ পৃষ্ঠায় আছে, এক বেয়াড়া সম্পাদকীয় প্রকাশের জন্য সম্পাদক প্রদ্যোতের কারাদণ্ডের কথা আর ২২৫ পৃষ্ঠায় প্রদ্যোৎকে দিতে হয়েছে জরিমানাও, যে-কথা লেখক আগে বলেননি। ১৩৫ পৃষ্ঠায় দেখি সুনীল তিনশ টাকা মাইনের চাকুরে, ২২৭ ২৮ পৃষ্ঠায় পরিমাণটা দাঁড়িয়ে গেল সাড়ে তিনশতে। ১৩৬ পৃষ্ঠায় সুনীলের পোষ্যসংখ্যা জানাতে গিয়ে লেখক সুনীলসহ তাদের সাত ভাইবোনের কথা বলেছেন, কিন্তু ১৫৭ ও ১৬৪ পৃষ্ঠার হিসেব মিলিয়ে সংখ্যাটা ছয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মায়ার বোন ছায়া সুনীলের ভাই অনিলের সঙ্গে সিনেমায় গিয়ে, সিনেমার শেষে তার চুড়ি খুলে দিয়েছে হোটেলের খরচ মেটাবার জন্য (পৃ ১৪৯) এটা দুল হয়ে গেল ১৭৬ পৃষ্ঠায়, আবার ১৭৯ ও ২১৩ পৃষ্ঠায় চুড়ি হয়ে ফিরে এল। বিচ্ছিন্নভাবে এ সব হয়তো খুব তুচ্ছ কিন্তু অব্যবস্থচিত্ততার নজীর হিসেবে এদের একটা সামগ্রিক মূল্য আছে।

'কিন্তু ছায়া চরিত্রটিকে কাহিনীকার যেভাবে উত্তরণের দিকে নিয়ে গিয়েছেন গুচ্ছের অসঙ্গতি আছে তার মধ্যে। বিপাকে পড়ে মেয়েটি ছুটে এসেছে প্রণয়ী অনিলের কাছে, পরিত্রাণের আশায়। কি বিপদ ছায়ার ?—'ছায়া বলে বোকা সোকা মেয়ে পেয়ে মজা করলে আমাকে নিয়ে। বিপাকে পড়ে গিয়েছি মনে হচ্ছে। ও মাসে ভাবনা হয়েছিল এমাসে ভড়কে গিয়েছি। আমার কাছে ন্যাকামি না করে, পুরুষ মানুষ একটা ব্যবস্থা কর—আমি তো তোমারি। তুমি না পারলে অগত্যা আমাকে ললিতের ভরসা করতে হবে। (পৃ ১৭৭) ছায়াকে শেষ পর্যন্ত ললিতকেই অবলম্বন করতে হয়েছে, তার প্রমাণ সে রেখেছে ১৭৬ পৃষ্ঠায় অনিলের সামনে দিয়েই ললিতের পাশে বসে গাড়ি চেপে বেড়াতে গিয়ে। অনিলের পক্ষে কোনো বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি সুতরাং ছায়ার দিদি মায়া ছুটে এসেছে সুনীলের কাছে। সুনীলের সিদ্ধান্ত এখনই ছায়া অনিলের বিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না আর ছায়ার উপায় নিয়ে চিন্তারও কিছু নেই তেমন। মায়াকে আশ্বাস দেয় সুনীল— কি আশ্চর্য এই বিজ্ঞানের যুগে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার এত দুর্ভাবনা। ডাক্তাররা আছে কি জন্য ? ভয় পাবেন না আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। (পৃ .৮০)

' ব্যবস্থা কিছু হয়ে থাকবে—ললিত অথবা সুনীল যে ই করে থাক। কিন্তু ললিতের সঙ্গে ছায়ার ঘনিষ্ঠতা এত বেশি বেড়ে যায় যে মায়াকে আবার বলতে শুনি সুনীলের কাছে--'ললিত বেচারার সঙ্গে যা আরম্ভ করেছিল, কি বলব তোমায়। ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতাম, কবে বোনটি এসে কেঁদে বলে আবার মুশকিলে পড়ে গেছি।' (পৃ ২১৩) মায়া এখন খুবই প্রশংসা করে অনিলের কারণ তার দৃঢ়তার জন্যই ছায়া মুক্তি পেয়েছে ললিতের কবল থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মায়া এ কথাও বলে যে অনিলকে একটু কাবু করার আশাতেই ছায়া অতটা প্রশ্রয় দিয়েছিল ললিতকে। তবে ছায়া আবার বিপদে পড়েনি।

"এরপর ২৩৬ পৃষ্ঠায় সুনীল মায়ার কথোপকথন আমাদের প্রায় বিমূঢ় করে দেয়--

' মায়া বলে এ তো আরেক বিপদ হলো।

"কি বিপদ ?'

"ছায়াকে সব বুঝিয়ে বললাম। ওর বিয়ের ব্যবস্থার কথাও বললাম। মেয়ে বলছে, তা হবে না।

"সুনীল আশ্চর্য হয়ে বলে, বিয়ে হবে না জেনেও বলছে ?'

"মায়া বিব্রতভাবে বলে, বলছে বৈকি। সোজা স্পষ্ট—না। বলছে, ও ভুল করেছে, বোকামি করেছে, কিন্তু এমন কোন পাপ করেনি যে, সেজন্য আরেকটা অন্যায় করতে হবে। মেয়ে আমাকে পটপট করে কত কথা শুনিয়ে দিলে। কোন মুখে আমরা বলছি এটা বিজ্ঞানের যুগ—আবার আমরাই সেকেলে অসভ্য ব্যবস্থা ধরছি। বিজ্ঞানের যুগে বুঝি অকারণে ভবিষ্যৎ একটা মানুষকে খুন করা হয়। আমরা সেকেলে তাই আমরা কথাটা ভাবতে পেরেছি। অনায়াসে বলছে, খুশি হলে ওকে তাড়িয়ে দিতে পারি, ও নিজে ব্যবস্থা করে নেবে।'

"এইসব সামনে রেখে বেশ আন্দোলিত হতে হয় আমাদের। এটা কি ছায়ার প্রথম মাতৃত্ব না সে দ্বিতীয়বার অন্তর্বত্নী। প্রথম মাতৃত্ব হলে মায়া 'আবার বিপদ'-এর কথা ভেবেছিল কেন ? দ্বিতীয় মাতৃত্ব হলে ছায়ার এই

জেহাদের কোনো অর্থ থাকতে পারে না, কারণ উপন্যাসে, তার প্রথম ফসলটির ভূমিষ্ঠ বা লালিত পালিত হবার কোনো কথাই নেই। তাই ধরে নিতে হবে ঐ অসভ্য ব্যবস্থার মাধ্যমেই তার প্রথম মাতৃত্বের দায়মোচন ঘটেছে। ছায়ার এই শক্তির দিকটা অন্যভাবেও সমস্যা তৈরি করে। এতখানি দৃঢ়তা যার চরিত্রে থাকে সে অনায়াসে একজন পরিবর্তিত সঙ্গী বেছে নেয় কি ভাবে ? মায়ার বক্তব্য অনুযায়ী এটা যদি অনিলকে কাবু করার একটা কৌশলমাত্র হয় তবে সেই হীনতার বদলে অনিলের সঙ্গে একটা সরাসরি বোঝাপড়ায় আসাই সঙ্গততর হত তার ঋজুতার দিক থেকে , যেমনটা সে পেরেছে তার দিদি মায়ার বেলায়। তা ছাড়াও, ছায়া অনিলকে বলেছিল, ললিত নিজেই ব্যবস্থা করবে। কি প্রত্যাশা ছিল ছায়ার ললিতের কাছে ? ব্যবস্থা বলতে হয় ভবিষ্যৎ একটা মানুষকে অকারণে হত্যা করা অথবা পিতৃত্বের দায় মেনে নিয়ে ছায়াকে ললিত স্বীকৃতি দেবে সামাজিকভাবে , এ দুয়ের তো কোনো বিকল্প নেই। অন্যদিকে ললিতের সেই মহত্ত্ব থাকলে সে অন্যপূর্বা ছায়াকে নিয়ে খেলায় মাতবে কেন, যেটা অভিভাবকদের কাছে শঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে ? আর সবটুকু গোপন করে ছায়া যদি দায়টা ললিতের উপর চাপিয়ে দেবার কথা ভেবে থাকে তবে চরিত্রের কতটুকু অবশিষ্ট থাকে এই তেজস্বিনী কিশোরীর ? ছায়াকে যে জটিল এক চেতনার ভার বহন করতে হবে, এ কথা বোধ হয় লেখক আগে ভাবেননি। সন্তানের জন্ম ভালোবাসা থেকে কিনা সেটাই মুখ্য প্রশ্ন—Engels এর কথাটা মানিক হঠাৎই খেয়াল করে থাকবেন।

"সুনীলের বোন কল্পনার চরিত্রটিকে লেখক অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছেন একটু অন্যভাবে। কল্পনার সঙ্গে তার স্বামীর বিরোধের কারণ, মায়ার মতে, প্রণবের বাড়াবাড়ি রকমের 'কাব্যি' করার ঝোঁক। (পৃ ২০৫) আর বিভা বোঝায় প্রণবের অভাব ঐ কাব্য করার ঝোঁকের, সে 'ন্যাকা ন্যাকা ভালোবাসা জানে না।' (পৃ ২৪৪) বিভার বিশ্লেষণটাকেই লেখক মেনে নিয়েছেন কাহিনীর পরিণতি থেকে সেটা স্পষ্ট। —অর্থাৎ ঐ 'ন্যাকা ন্যাকা ভালোবাসা'র প্রত্যাশী ছিল কল্পনা। তবে যে ২৩৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছিল সুনীলের জন্যই কয়েকটা দিকে কল্পনার রুচি বদলে গিয়েছে ? এবং ২৩৮ পৃষ্ঠায় কল্পনাকে বেশ গর্বিতা দেখা যায় সে সুনীলের বোন বলে সুনীল তো ন্যাকামিকে তুচ্ছই করে ।"

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৮৫ ৮৭

উদ্ধৃতাংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা গ্রন্থালয় প্রকাশিত মানিক গ্রন্থাবলীর নবম খণ্ডের পৃষ্ঠাঙ্ক। মানিক রচনাসমগ্রের ৮ম খণ্ডে সেগুলির পৃষ্ঠাঙ্ক নিম্নরূপ

মা গ্রন্থাবলী ৯ম	মা রচনাসমগ্র ৮	মা গ্রন্থাবলী ৯ম	মা রচনাসমগ্র ৮
পৃ ১৩৫	পৃ ১৬৭	পৃ ১৮০	পৃ ২০৮ ২০৯
১৪২	১৭৩-১৭৪	২০৩	২৩০ ২৩৯
১৪২ ৪৩	১৭৪-১৭৫	২০৫	২৩২
১৪৯	১৮০-১৮১	২১৩	২৩৯ ২৪০
১৫৭	১৮৭ ১৮৮	২২৫	২৫০ ২৫১
১৬৪	১৯৪ ১৯৫	২২৭ ২৮	২৫২ ২৫৪
১৭৪	২০৩-২০৪	২৩৬	২৬০ ২৬১
১৭৬	২০৫	২৩৮	২৬২ ২৬৩
১৭৭	২০৬	২৪৪	২৬৮-২৬৯

সার্বজনীন

'পাশাপাশি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একচত্বারিংশৎ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং চতুর্বিংশতিতম উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৫৯, প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ ৪ + ২ + ২৫২, মূল্য চার টাকা ; প্রচ্ছদশিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি কোনো পত্রিকায় সম্পূর্ণ অথবা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, এই সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরিতে সার্বজনীন সম্পর্কে কিছু তথ্যাদির উল্লেখ আছে :

সার্বজনীন

১

Notes : — রেশনের দোকানে--

পরমেশ্বর
নিখিল—মার্জিতবুচি ছেলে
বরুণ—রেশন ক্লার্ক
কেষ্ট—রেশন মাপে
সুরঞ্জন : পাশ করে চাকরি · বিয়ে করেনি . ভারিক্কি বলে পরিচিত হতে সাধ :
আদিনাথ :
প্রৌঢ় রবীন্দ্র সরকার ·
ধীরেন :
সদাশিব
নরেশ :
বিশু
প্রণব
নিশীথ
অচিন্ত্য · সুরঞ্জনের বাবা
পদ্মা . বিধুভূষণের সুন্দরী মেয়ে
বিধুভূষণ :
পঙ্কজ--জ্ঞানের ছেলে

দুই
বিধুভূষণের বাড়ীটা
ঈশ্বরের কেনার কথা—
পূর্ববঙ্গের ভাইয়ের এজেন্ট
হিসাবে--

মহেশ্বরদেব আনতে যাবে—ট্রেনে গণেশের মেয়ে [ব] পরিচয় জানা
মহেশ্বর—স্ত্রী সুভাগিনী
বেলা—গণেশের কিশোরী বোন
প্রতিমা
সাধন—প্রতিমার দাদা
গণেশের বিধবা মা

[শিরোনামের পাশেই নীল পেন্সিলে লেখা : See July 25—অর্থাৎ ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত তারিখ ২৫ জুলাই-এর পৃষ্ঠায় পরবর্তী অংশ লিখেছেন। বর্তমান লেখা শুরু হয়েছে মুদ্রিত তারিখ ২৬ এপ্রিল-এর পৃষ্ঠায়। পরপর দু-পৃষ্ঠা লেখা, তারপর অন্যান্য কিছু লেখা ও বেশ কিছু সাদা পাতা ছেড়ে, ২৫ জুলাই তারিখের শুরুতেই নীল পেনসিলে লেখা : See April 26 উভয় অংশ একত্র গ্রথিত করে পরবর্তী অংশ এর পরেই মুদ্রিত হল।]

সার্বজনীন

পরমেশ্বর
অলকা—সমীরের মা
পদ্মা—সমীরের বোন
বুনো—সবিতার সাত বছরের ভাই
সুরমা—মহেশ্বরের স্ত্রী
বিধুভূষণ—পরমেশ্বর একতলার ভাড়াটে ছিল—বাড়ী কিনল—ভাইরা সপরিবারে আসবে...
সমীর—বিধুভূষণের ছেলে
পদ্মা—ওই মেয়ে
মানদা—গণেশ (সবিতা) মা
গোপেশ্বর ? (ভূপেশ)—সবিতার বাবা—মৃত—স্বভাবকবি

নমিতা—সবিতাব ছোট
সাধন —মহেশ্ববেব ছেলে —চুপচাপ
অসীম - ওই বন্ধু—সবিতাকে গান শেখাতে আসে—(পবিচয ইত্যাদি ?)
সুবমা—প্রতিমাব দিদি

পবিচ্ছেদ চাব

Note পদ্মা কান্তিলালকে তুমি বলবে গোড়া থেকে—

কালীপদ—উদ্বাস্তু
দোকানী —কাছেই দোকান
নিশীথ—পাশেব বাড়ীব ১ ঘবেব ভাড়াটে
নলিনী—ঐ বৌ
তুলসী —মহেশ্ববদেব ঝি
বস্তিতে অঘোবদেব ঘবে সবিতাবা ভাড়া নিল
মণ্টু—অঘোবেব বাচ্চা ছেলে
সবিতাব বাবা গোপেশ কাপড়েব ছোট কাববাবী স্বভাবকবি
নিশীথ—পাশেব বাড়ীব ভাড়াটে
নলিনী—ঐ স্ত্রী
[ডাযেবি ১৯৪৫।]

অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায পৃ ১৩৩ ৬৫

১৯৫২ সালেব ২৩ ১২ তাবিখেব ডাযেবিব একস্থানে লেখক লিখেছেন, 'D M সার্বজনীন পাওনা দিচ্ছে না। "

উক্ত ডাযেবিব সম্পাদকীয টীকা থেকে সার্বজনীন উপন্যাস বাবদ লেখকেব সম্মানদক্ষিণাব একটি ডাযেবি ভুক্ত হিসাবও পাওযা যায,

ডাযেবি ১৯৫০ থেকে

23 11 51	ডি এম লাইব্রেবী 'সার্বজনীন' বাবদ আগাম চেক	400/
(কপি দিলাম—১১০০ সং—২০% মুদ্রিত মূল্য)		
11 12 51	ডি এম লাইব্রেবী 'সাবজনীন' নতুন বেশি কপি দেওযায চেক আগাম	300/
26 12 52	D M Library সাবজনীন বাকী	100/

অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায পৃ ৩৯৪

লেখকেব কোনো কোনো উপন্যাসেব মতো সার্বজনীন উপন্যাসেও কাহিনিগত বর্ণনায ঘটনাক্রমে চবিত্রব্যাখ্যানে কিছু অসতর্কতাজনিত অসংগতি লক্ষ কবেছেন সবোজ দত্ত তাঁব 'ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায' গ্রন্থে। যেমন, বিধুভূষণেব বাড়ি ও ছোটোখাটো চকচকে নতুন গাড়ি কেনাব কথা বলা হযেছে একস্থানে। অথচ অন্যত্র দেখা যায, বিধুভূষণেব বাড়ি কেনা দূবে থাক, বাড়ি ভাড়া দেবাব সামর্থ্যও নেই, বাড়ি বিক্রি কবে দেনা মিটিযে তিনি দাদাব বাড়িতে আশ্রয নেন। "যাকে এভাবে পবাশ্রযী হযে থাকতে হয তাব পক্ষে নতুন গাড়ি কেনা কি সম্ভব বা বিশ্বাসযোগ্য ?" (ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায, পৃ ৮৮)।

এই জাতীয আবও কিছু অসংগতিব প্রতি ইঙ্গিত কবেছেন সবোজ দত্ত তাঁব প্রাগুক্ত গ্রন্থে (পৃ ৮৮-৯১)।

সার্বজনীন-এর প্রুফ সংশোধনকালে লেখক কিছু অংশ অতিরিক্ত যোগ করেছিলেন। উপন্যাসের শেষে তার প্রতিলিপি মুদ্রিত হল (মা রচনাসমগ্র-৮, পৃ ৪১০)।

মানিক রচনাসমগ্রে সার্বজনীন উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

নাগপাশ

'নাগপাশ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিচত্বারিংশৎ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং পঞ্চবিংশতিতম উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রকাশকাল নববর্ষ ১৩৬০ [১৯৫৩], প্রকাশক সাহিত্য জগৎ, কলকাতা , পরিবেশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা ; পৃ ২ + ১৯৬, মূল্য তিন টাকা ; প্রচ্ছদশিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসাকারে প্রকাশের পূর্বে কোনো পত্রিকায় সম্পূর্ণ অথবা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, এই সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির ২ ডিসেম্বর ১৯৫২ তারিখের লিখিত তথ্য থেকে জানা যায়, সাহিত্য জগৎ-এর কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নতুন একটি উপন্যাসের জন্য পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দিয়ে চুক্তি করে যান। সেই উপন্যাসই নাগপাশ। উক্ত ডায়েরির টাকায় উল্লিখিত তথ্য থেকে উপন্যাসটির শর্তাদি বিষয়ে আরও জানা যায় :

ডায়েরি ১৯৫০ থেকে

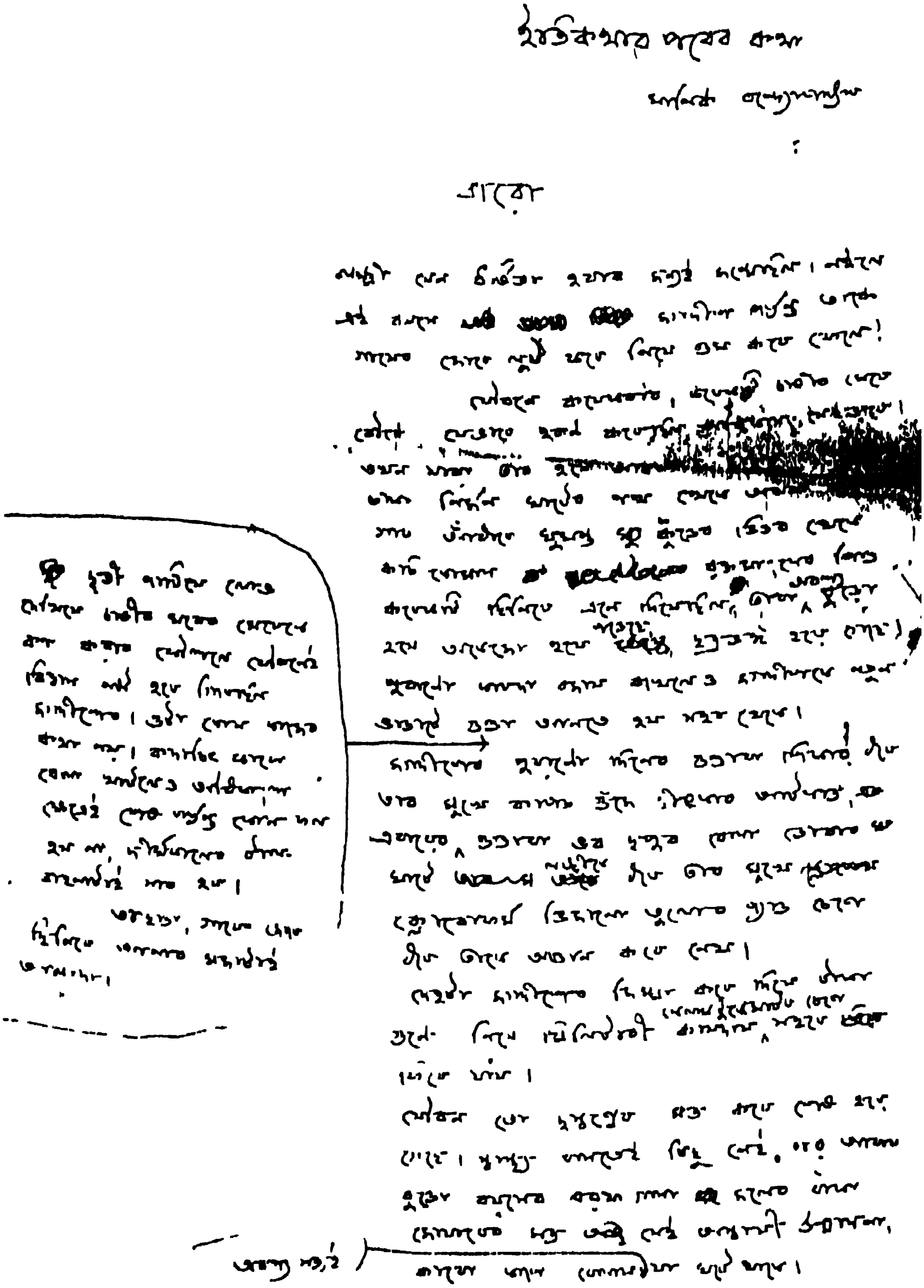
2 12 52 সাহিত্য জগত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নতুন উপন্যাস
'নাগপাশ' বাবদ আগাম 50/-

চুক্তি প্রথম সংস্করণ—

১১০০ বই ছাপবে। ১০০০ বইয়ের মোট দামের ২০% রয়ালটি দেবে। বই ১০ থেকে ১৪ ফর্মার মধ্যে হবে।
৬ মাসের মধ্যে কপি দেব। কপি দেওয়ার সময় ২০০ টাকা, বাকী বই বার হলে সাত দিনের মধ্যে।

অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৩৯৪

সম্পাদকমণ্ডলী


ইতিকথার পরের কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এগারো

ইতিকথাব পবেব কথা-ব একটি বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি চিত্র

পরিশিষ্ট

পাণ্ডুলিপি-পরিচয়

ইতিকথার পরের কথা : দুটি খণ্ডিত ও
অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা

ইতিকথার পরের কথা

ইতিকথাব পবেব কথা উপন্যাসেব কয়েকটি পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাব প্রতিলিপি লেখক পবিবাবেব সৌজন্যে উদ্ধাব কবা সম্ভবপব হয়েছে। লেখকেব বচনাবীতি ও মননেব পবিবর্তনেব অনুকূলে পাঠক ও গবেষকদেব প্রয়োজন চবিতার্থ কবতে পাবে এই বিবেচনায় উক্ত অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা দুটি নিম্নে উদ্ধৃত কবা হল।

ইতিকথাব পরের কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায

বাবো

লক্ষ্মী যেন ধর্ষিতা হবাব জন্যই জন্মেছিল। নইলে এই বযসে জগদীশ পযন্ত তাকে গাযেব জোবে লুট কবে নিযে গুম কবে ফেলে।

যৌবনে কযেকবাব কযেকটি চাষীব মেযে বৌকে যেভাবে হবণ কবেছিল অবিকল সেইভাবে। তখন যাবা তাব হযে আচমকা হানা দিযে তাকে নির্জন ঘাটেব পথ থেকে অথবা বাতেব গাঢ আঁধাবে ঘুমন্ত কুঁডেব ভিতব থেকে ..টি কোমল বক্তমাংসেব পিণ্ড কযেকটি ছিনিযে এনে দিযেছিল তাবা অবশ্য বুডো হযে অকেজো হযে পডেছে, ছত্রভঙ্গ হযে গেছে। পুবানো কাযদা বজায বাখলেও জগদীশকে নতুন ভাডাটে গুণ্ডা আনতে হয সহব থেকে।

দূতী পাঠিযে লোভ দেখিযে চাষীব ঘবেব মেযেকে বশ কবাব কৌশলে যৌবনেই বিশ্বাস নষ্ট হযে গিযেছিল জগদীশেব। ওটা কোনো কাজেব কথা নয। কদাচিৎ কাবো বেলা খাটলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত কোন ফল হয না, দীর্ঘকালেব টালবাহানাটাই সাব হয।

তাছাডা গাযেব জোবে ছিনিযে আনাব মজাটাই আলাদা। জগদীশেব পুবানো দিনেব গুণ্ডাবা শিকাব ধবে তাব মুখে কাপড গুঁজে চীৎকাব আটকাত। এবাবেব গুণ্ডাবা ভব দুপুববেলা ডোবাব ঘাটে লক্ষ্মীকে ধবে তাব মুখে ক্লোবোফর্ম ভিজানো তুলোব প্যাড চেপে ধবে তাকে অজ্ঞান কবে নেয।

দেহটা জগদীশেব জিম্মা কবে দিযে টাকা গুণে নিযে মিলিটাবী কাযদায সেলাম ঠুকে মোটব চেপে সহবে ফিবে যায।

যৌবন তো দুঃস্বপ্নেব মতো কবে শেষ হযে গেছে। স্বাস্থ্য বলতেই কিছু নেই তবু আবাব বুডো বযসেব বনফ ..লা জলেব বাঁকা জোযাবেব মতো সেই অস্থাযী উন্মাদনা, কাবো কাবো বেলায অবশ্য সত্যই যা ঘটে থাকে।

উপবি উদ্ধৃত পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠাব সঙ্গে পববর্তী মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠাটিব কোনো আপাতসম্পর্ক পাওযা যাযনি।

এটা গাযেব জ্বালা জগদীশেব। নিছক প্রতিশোধ।

গাযেব জ্বালাটা তাব ঘটেছে সংক্রামক বোগেব মত মাযাব গাযেব জ্বালাব ছোঁযাচ লেগে। মাযা তাকে স্পষ্টই জানিযে দিযেছে সে যতই উদ্ভট আব অবাস্তব মনে হোক শুভ এভাবে বিগডে গিযেছে কেবল লক্ষ্মীব জন্য।

লক্ষ্মীব জন্য শুভ উন্মাদ।

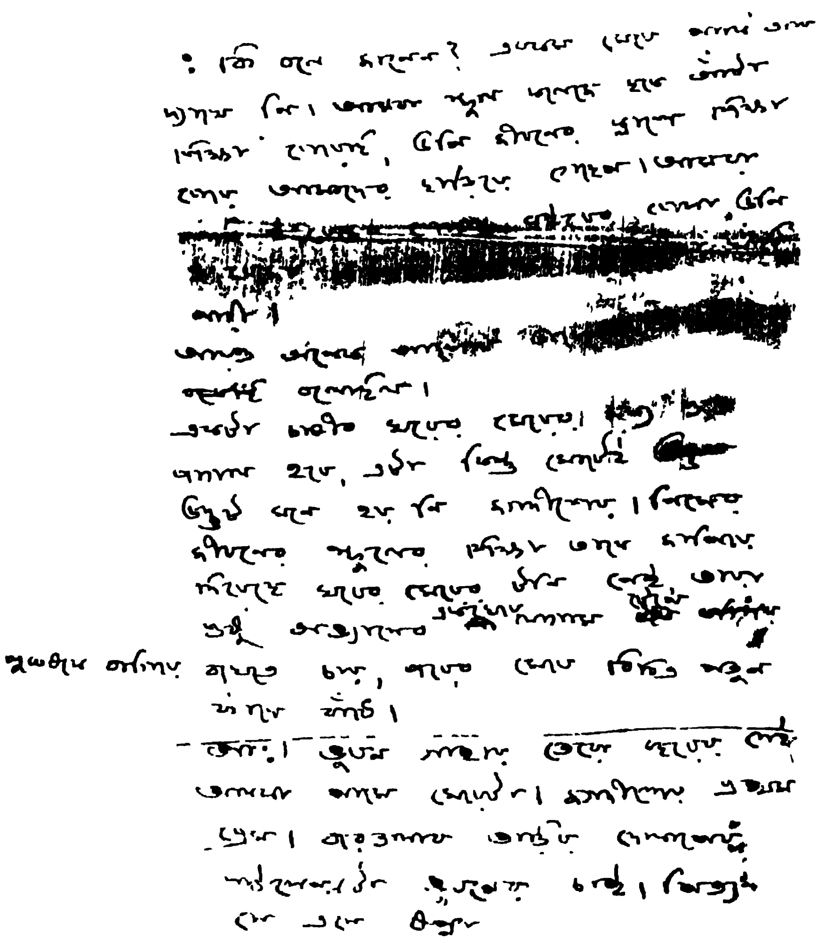
এতখানি উন্মাদ যে নবশিল্প মন্দিবেব গেটে তাদেব কডা বোদে আধঘণ্টা দাঁড কবিযে বেখে আপিস ঘবে লক্ষ্মীব সঙ্গে শুভ গল্পে মশগুল হযে থেকেছে।

গাযেব জ্বালায যাই বলুক, তাব চেযে লক্ষ্মীব জন্য শুভ বেশী পাগল হতে পাবে এটা মাযাব কাছে অসম্ভব এবং অবাস্তব। তাই প্যাঁচা মেযেব বাঁকা কথাব মত নালিশ কবাব সময তাকে জোব দিযে বলতে হয যে ব্যাপাবটা জগদীশেব উদ্ভট মনে হবে, অবাস্তব মনে হবে। কিন্তু এটা নির্জলা বাস্তব সত্য।

কি বলে ভ'লেন ? এবকম মেয়ে নাকি আব দ্যাখে নি। আমবা স্কুল কলেজে ছকে আঁটা শিক্ষা পেয়েছি। উনি জীবনেব ক্লাশে শিক্ষা পেয়ে আমাদেব ছাড়িয়ে গেছেন। আমবা নাকি ইংবেজেব পোষা বইয়েব পোকা উনি ইংবেজেব এপিসি ক্যাম্পেব সুশিক্ষিতা খাটি নাবী।

আবও অনেক আবোল তাবোল কথা মাযা বলেছিল।
একটা চাষাব ঘবেব মেয়েব জন্য শুভ পাগল হবে। এটা কিন্তু মোটেই উদ্ভট মনে হয নি জগদীশেব। নিজেব জীবনেব স্কুলেব শিক্ষা তাকে জানিয়ে দিয়েছে ঘবেব মেয়েব টান নেই, তাবা শুধু অভ্যাসেব একঘেয়ে লাগাম টেনে পুবুষকে বাগিয়ে বাখতে চায, পবেব মেয়ে বিচিত্র নতুন ফাঁদে বাঁধে।

আঃ ভুবন সাহাব তেবো বছবেব সেই অলকা নামে মেয়েটা। জগদীশেব প্রথম প্রেম। বাবতলায তাডিব দোকানেব লাইসেন্সটা ভুবনেব চাই। নিত্য যে এসে ধন্না



ইতিকথার পবেব কথা-র একটি বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি চিত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি

১৯০৮ জন্ম, ১৯ মে মঙ্গলবার। বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ। জন্মস্থান সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশে, ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালপদিয়া গ্রাম।

পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। পিতামাতার পঞ্চম পুত্র—পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম মানিক।

পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের গ্রাজুয়েট। সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং শেষ পর্যন্ত সাব ডেপুটি কালেকটর পদে পিতার চাকরির সূত্রে লেখকের বাল্য-কৈশোর ও ইস্কুলের শিক্ষাজীবন বিক্ষিপ্তভাবে অতিবাহিত হয় উড়িষ্যা, বিহার ও অখণ্ড বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে—প্রধানত দুমকা, আড়া, সাসারাম, সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ, কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া, বারাসত, কলকাতা, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে।

১৯২৪ ২৮ মে, টাঙ্গাইলে মাতৃবিয়োগ।

১৯২৬ মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯২৮ বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এসসি ক্লাসে ভর্তি হন। এই বছরেই কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসী মামী' রচনা করেন এবং বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ এর পৌষ-সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তা ছাপা হয়। প্রথম গল্পের লেখক হিসাবে ডাকনাম 'মানিক' ব্যবহারের কাহিনী নিজেই পরবর্তীকালে 'গল্প লেখার গল্প' নামক রচনায় বলেছেন।

তবে আকস্মিকভাবে প্রথম গল্প লেখার আগেই লিখিত, কৈশোরক কবিতাচর্চার নিদর্শনস্বরূপ প্রায় একশোটি কবিতা লেখা সম্পূর্ণ একটি খাতা লেখকের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভিতর পাওয়া গেছে।

১৯২৯ 'বিচিত্রা' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প 'নেকী' (আষাঢ় ১৩৩৬) ও 'বাধার পূজা' (ভাদ্র ১৩৩৬)। প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি রচনা এই বছরেই শুরু হয়। ক্রমে সাহিত্যচর্চায় অগ্রহ পারিবারিক মতবিরোধের কারণ হয়ে ওঠে—শেষ পর্যন্ত কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যকর্মেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ বঙ্গাব্দ ১৩৪১ এর বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় 'একটি দিন' নামক বড়োগল্পের আকারে প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' শুরু হয় , ক্রমে 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি', এবং শেষ পর্যন্ত 'দিবারাত্রির কাব্য' নামে ধারাবাহিক প্রকাশের পর পৌষ ১৩৪১ এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। একই সময়ে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় 'পদ্মানদীর মাঝি', কিন্তু 'পূর্বাশা'র প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ায় উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

১৯৩৫ পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বর কিংবা বর্তমান বছরের জানুয়ারি, বঙ্গাব্দ ১৩৪১ এর পৌষ সংখ্যা থেকে, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শুরু হয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এই বছরেই গ্রন্থকার হিসাবে লেখকের প্রথম আবির্ভাব। উপন্যাস 'জননী', প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসী মামী', এবং গ্রন্থরূপে পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত 'দিবারাত্রির কাব্য', পর পর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মার্চ, অগাস্ট ও ডিসেম্বর মাসে।

বর্তমান বছরেরই কোনো এক সময়ে লেখক মৃগীরোগ বা Epilepsy র আক্রমণে প্রথম আক্রান্ত হন। চিকিৎসার অতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী।

১৯৩৬ একই বছরে প্রকাশিত হয় তিনটি উপন্যাস— 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'জীবনের জটিলতা'।

১৯৩৭ একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক', লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড এর পরিচালনাধীন মাসিক ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-পদে যোগদান , 'বঙ্গশ্রী' র তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণকুমার রায়।

বর্তমান বছরের শেষভাগে টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু , পরবর্তী এগারো বছর পিতা ও অপর তিন ভ্রাতার একান্নবর্তী সংসারে, উক্ত বাড়িতেই বাস করেন।

১৯৩৮ ১১ মে, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ময়মনসিংহ গবর্নমেন্ট গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিক্রমপুর পঞ্চসার নিবাসী, প্রয়াত সুরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে উপন্যাস 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও গল্পগ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনী'।

১৯৩৯ ১ জানুয়ারি থেকে 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকরিতে ইস্তফা। প্রায় একই সময়ে, পরবর্তী ভ্রাতা সুবোধকুমারের সহযোগিতায়, 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামে ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় স্থাপন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ মাঘ-সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) 'পরিচয়' পত্রিকায় 'অহিংসা' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু (সমাপ্তি পৌষ ১৩৪৭)। অগাস্ট মাসে প্রকাশিত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'সরীসৃপ'।

বর্তমান বছরের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরতলী — সহরতলী' প্রকাশের মধ্য দিয়েই উক্ত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতি প্রবর্তিত হয়।

১৯৪০ বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে লেখকের নিজস্ব প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বৌ', সম্ভবত এর পরেই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়।

জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে 'সহরতলী' ১ম পর্ব। বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ কার্তিক-সংখ্যা 'পরিচয়'-পত্রিকায় লেখক-সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪১ প্রকাশিত গ্রন্থ 'সহরতলী' ২য় পর্ব, 'অহিংসা' ও 'ধরাবাঁধা জীবন'—তিনটি উপন্যাস।

১৯৪২ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরবাসের ইতিকথা'। ১৫ মে তারিখে প্রকাশিত উপন্যাস 'চতুষ্কোণ', একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ।

১৯৪৩ 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকা থেকে পদত্যাগের পর লেখকের দ্বিতীয় এবং শেষ চাকরিজীবন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কোনো-এক সময়ে –তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার, বেঙ্গল দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে তিনি যোগদান করেন এবং অন্তত বর্তমান বছরের শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও র কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ-বিষয়ক প্রচার ও আরও নানাবিধ বেতার অনুষ্ঠানে লেখক অংশ নেন।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ'।

বঙ্গাব্দ ১৩৫০ শারদীয় যুগান্তর পত্রিকায় 'প্রতিবিম্ব' নামক ছোটো একটি উপন্যাস—সম্ভবত একই বছরে, বা পরবর্তী বছর, উপন্যাসটি গ্রন্থরূপেও প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ ১৫ ১৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ক্রমে এ দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বর্তমান বছরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টির সাহিত্য ফ্রন্টের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। ২৫ ২৭ অগাস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সাধারণ অধিবেশনের অন্যতম সভাপতি। একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ, গল্পসংকলন 'ভেজাল'।

১৯৪৫ ৩-৮ মার্চে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। বর্তমান সম্মেলনে পুনরায় সর্বভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংঘের বাংলা শাখার নাম হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ' এবং এই সম্মেলন থেকে লেখক উক্ত সংঘের পরবর্তী বছরের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১২ মে তারিখে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'গল্প লেখার গল্প' পর্যায়ে ভাষণদান।

অক্টোবর ডিসেম্বরের বিভিন্ন দিনে, আঠারো উনিশ শতকীয় বাঙালী সঙ্গীতকার বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক বেতার ভাষণ। প্রকাশিত গ্রন্থ গল্পগ্রন্থ 'হলুদপোড়া' এবং উপন্যাস 'দর্পণ'।

১৯৪৬ পর পর প্রকাশিত হয় পাঁচখানি গ্রন্থ,

ফেব্রুয়ারি মার্চ, 'সহরবাসের ইতিকথা', উপন্যাস।

এপ্রিল মে, 'ভিটেমাটি', নাটক।

মে-জুন, 'আজ কাল পরশুর গল্প', গল্পগ্রন্থ।

জুলাই-অগাস্ট, 'চিন্তামণি', উপন্যাস।

সেপ্টেম্বর অক্টোবর, 'পরিস্থিতি', গল্পগ্রন্থ।

১৬ অগাস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দাঙ্গা বিধ্বস্ত টালিগঞ্জ অঞ্চলে, জীবন বিপন্ন করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মৈত্রী প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১৯৪৭ প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি উপন্যাস 'চিহ্ন' ও 'আদায়ের ইতিহাস' এবং গল্পগ্রন্থ 'খতিয়ান'।

ডিসেম্বরের শেষভাগে বোম্বাই এ অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্যসম্মেলনে গণসাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯৪৮ দুটি গ্রন্থের প্রকাশ গল্পগ্রন্থ 'ছোটবড়' ও 'মাটির মাশুল'।

১৯৪৯ ৫ ফেব্রুয়ারি, টালিগঞ্জ-দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়ি থেকে বরানগর, গোপাললাল ঠাকুর রোড-এর ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই বাস করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি, লেখকের পিতা তাঁর টালিগঞ্জের নিজস্ব বাড়ি বিক্রয় করে দেন এবং ৪ ডিসেম্বর তারিখে স্থায়ীভাবে লেখকের কাছে চলে আসেন। আমৃত্যু তিনি লেখকের সঙ্গেই বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন—পুত্রের মৃত্যুর দুবছর পর মুমূর্ষু পিতা মারা যান।

এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি। সংঘের পূর্বতন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে লেখক এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন - 'প্রগতি সাহিত্য' নামক প্রবন্ধরূপে এই রিপোর্ট লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তার একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় (১৯৫৭) সংকলিত হয়েছে।

চলচ্চিত্রে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ২৮ জুলাই মুক্তি পায়।

একমাত্র গ্রন্থ, 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' গল্পগ্রন্থ।

১৯৫০ জুন থেকে অগাস্টের মধ্যে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'জীয়ন্ত', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত 'মানিক গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ।

১৯৫১ বর্তমান বছরের প্রায় শুরু থেকেই দারিদ্র্যে এবং অসুস্থতায় ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকেন।

'পেশা', 'সোনার চেয়ে দামী' (১ম খণ্ড। বেকার), 'স্বাধীনতার স্বাদ' ও 'ছন্দপতন'—চারখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ আর্থিক সংকট চরমে ওঠে—তিন মাসের মধ্যে 'অন্তত পাঁচশত টাকা' সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়ে সংসার-চালনার 'ত্রৈমাসিক প্ল্যান' নেন মে-জুলাই মাসে, যদিও তা 'প্ল্যান'ই থেকে যায়।

ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'সোনার চেয়ে দামী' (২য় খণ্ড। আপোস), 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি' ও 'সার্বজনীন'—চারখানি উপন্যাস এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক 'মানিক গ্রন্থাবলী' ২য় ভাগ।

১৯৫৩ দারিদ্র্য এবং অসুস্থতার আক্রমণ অব্যাহত থাকে।

১১ ১৭ এপ্রিল, লেখকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন।

প্রকাশিত গ্রন্থ 'নাগপাশ', 'আরোগ্য', 'চালচলন' 'তেইশ বছর আগে পরে'—চারখানি উপন্যাস এবং দুটি গল্পগ্রন্থ, 'ফেরিওলা' ও 'লাজুকলতা'।

১৯৫৪ দারিদ্র্য, এবং অসুখ ও আসক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ আত্মরক্ষার সংগ্রাম—আত্মরক্ষা এবং আত্মহনন ক্রমেই একাকার হয়ে যায়।

বর্তমান বছরের একেবারে গোড়া থেকেই লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরির লেখায় ঘুরে-ফিরে দেখা দেয় একপ্রকার অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক প্রসঙ্গ।

প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি উপন্যাস, 'হরফ ও 'শুভাশুভ'।

১৯৫৫ স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্য এবং চিকিৎসাতীত ব্যাধির যুগপৎ আক্রমণে অস্তিত্বসুদ্ধ বিপন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, স্থায়ী চিকিৎসার জন্য ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৭ মার্চ, চিকিৎসকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়ি চলে আসেন।

বিপর্যস্ত শরীর মনের শেষ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয় লুম্বিনি পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে—২০ অগাস্ট সেখানে ভর্তি হন এবং দুমাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২১ অক্টোবর বাড়ি ফেরেন।

একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরাধীন প্রেম', উপন্যাস।

১৯৫৬ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'হলুদ নদী সবুজ বন'। বর্তমান বছরের গোড়া থেকেই ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির আক্রমণে একাধিকবার আক্রান্ত হন এবং ২৫ জুন তারিখে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। জুন মাসেই প্রকাশিত হয় জীবিতকালের শেষ গল্প-সংকলন 'স্বনির্বাচিত গল্প'। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, লেখকের জীবিতকালে সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস, 'মাশুল'।

১ ডিসেম্বর, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হন।

৩ ডিসেম্বর (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩, ১৭ অগ্রহায়ণ), সোমবার অতি প্রত্যূষে উক্ত হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নিমতলা শ্মশানঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মানিক রচনাসমগ্র

প্রথম খণ্ডের সূচি

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচি

তৃতীয় খণ্ডের সূচি

চতুর্থ খণ্ডের সূচি

পঞ্চম খণ্ডের সূচি

ষষ্ঠ খণ্ডের সূচি

সপ্তম খণ্ডের সূচি